আরো দশটি উপন্যাস

প্রফুল্ল রায়

করুণা প্রকাশনী।। কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ঃ প্রণবেশ মাইতি

করুণা প্রকাশনীর পক্ষে ১৮এ টেমার লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে বামাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, বর্ণ সংস্থাপনে রেজ ডট কম ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ এবং শ্রীদুর্গা প্রেস, ১২১/এ, এ. পি. সি. রোড কলকাতা কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীমতী গীতা মাইতি
শ্রী চিত্তরঞ্জন মাইতি
স্বজনেষু

সূচীপত্র

অগ্নিবিন্দু

ম্যাটিনি শো ভাঙার পর জলোচ্ছ্বাসের ঢল নামার মতো সিনেমা হলটা থেকে দর্শকরা বেরিয়ে আসছিল। তাদের মধ্যে রয়েছে কুড়ি একুশ বছরের চারটি টগবগে, স্মার্ট তরুণী। তারা তুমুল হইচই বাধিয়ে সমানে হেসে চলেছে। শুধু তারাই নয়, দর্শকদের অনেকেই হাসির তোড়ে বেঁকে চুরে যাচ্ছে।

সিনেমা হলের দিকের ফুটপাথ ঘেঁষে লাইন দিয়ে শপিং আর্কেডগুলোতে অজস্র দোকান—কোনোটা ঘড়ির, কোনোটা রেডিমেড গারমেন্টের, কোনোটা জুতোর, কোনোটা এক্সক্লুসিভ শাড়ির, কোনোটা বা হ্যান্ডিক্রাফটের। এ ছাড়া রয়েছে বিরাট বিরাট ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। প্রতিটি দোকানের শো-উইণ্ডো নানা মডেল দিয়ে চমৎকার সাজানো। রাস্তার ওধারে নিউ মার্কেট, সেখানেও সারিবদ্ধ সব দোকান। ডান পাশের শেষ প্রান্তে কলকাতার বিখ্যাত ল্যাণ্ডমার্ক—একটা চৌকো, উঁচু টাওয়ারের মাথায় প্রকাণ্ড ঘড়ি। খুব সম্ভব ওটার বয়স একশ পেরিয়েছে।

রাস্তার মাঝখানে অনেকটা লম্বা জায়গা জুড়ে পার্কিং জোন। সেখানে কাতার দিয়ে দু লাইনে দাঁড়িয়ে আছে নানা ধরনের ঝকঝকে প্রাইভেট কার—টাটা সুমো, ফিয়েট, মারুতি থাউজেণ্ড থেকে অ্যামবাসাডর, মাতিজ, টোয়োটা ইত্যাদি। আর আছে অসংখ্য টু-হুইলার। সামনের লাইনের গাড়িগুলোর মুখ এদিকে ফেরানো। পেছনের গাড়িগুলোর মুখ নিউ মার্কেটের দিকে।

মে মাসের মাঝামাঝি। নিউ মার্কেটের টাওয়ার ক্লকে পাঁচটা বেজে সাতাশ। বেলা পড়ে এলেও এখনও চারপাশে প্রচুর রোদ ; গ্রীষ্মের গরম বাতাসে যথেষ্ট ঝাঁঝ। দূরে, চৌরঙ্গির ওপারে ময়দানের শেষ মাথায় আকাশের গায়ে সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো প্রকাণ্ড লাল সূর্যটা আটকে আছে। সন্ধে হতে এখনও অনেক দেরি।

নিউ মার্কেটের চারদিকে ফ্যাশনেবল দোকানপাটই নয়, রয়েছে অগুনতি সরকারি আর বেসরকারি অফিস এবং ডজন দেড়েক ব্যাঙ্ক। অফিসগুলোতে সবে ছুটি হয়েছে। ফলে যেদিকে তাকানো যায় থিকথিকে ভিড়—যাকে বলে জনসমুদ্র।

প্রতিটি দোকানে এখন মেলা লেগে আছে। বাঙালি, অবাঙালি, অভারতীয় কত যে মহিলা এবং পুরুষ, মহিলার সংখ্যাই বেশি—পছন্দমতো জিনিসপত্র বাছাবাছি করছে বা ক্যাশ কাউন্টারে নোটের তাড়া দিয়ে বিল মেটাচ্ছে, তার হিসেব নেই। অভাব, আনএমপ্লয়মেন্ট, দারিদ্রসীমার নিচে দেশের ষাট শতাংশ মানুষ—এখানে এলে ঘুণাক্ষরেও তা টের পাওয়া যায় না।

জনস্রোতে ভাসতে ভাসতে সেই চার তরুণী অর্থাৎ মেঘনা, সুরূপা, বৈশালী আর মধুরা ফুটপাথে চলে এসেছিল। গাদা গাদা মানুষের ভিড়ে আলাদা করে ওদের যদি ক্যামেরার লেন্সের আওতায় আনা যায়, দেখা যাবে মেয়ে চারটি শুধু স্মার্টই নয়, সুন্দরীও। ওদের সবার পরনেই জিনস আর নানারকম ছাপ মারা টপ। চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা, পায়ে কারো উঁচু হিলের জুতো, কারো বা স্নিকার। হাতে বিদেশি ইলেকট্রনিক ঘড়ি। গলায় কারো সোনার চেন, কারো কিছুই নেই। ইণ্ডিয়ার নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের এটাই খুব সম্ভব জাতীয় পোশাক।

চার তরুণী এখনও হেসেই যাচ্ছে। আসলে এই মাত্র যে ছবিটা দেখে তারা সিনেমা থেকে বেরিয়েছে সেটা জমজমাট কমেডি। এক শুঁটকো ক্লার্ক, নাকের তলায় চৌকো গোঁফ, মাথার মাঝখানে সিঁথি, চুল চামড়া ঘেঁষে ছাঁটা, পরনে বেঢপ ঢলঢলে ফুলপ্যান্ট আর ডবল-কাফ দেওয়া শার্ট, চোখে নিকেলের গোল চশমা—হঠাৎ এক দূর সম্পর্কের খুড়োমশাই চোখ বোজায় প্রচুর টাকার মালিক হয়ে যায়। এত অর্থ হাতে পেয়ে তার ইচ্ছা হয় সুন্দরী যুবতী জুটিয়ে একটু ফুর্তিফার্তা করে। কিন্তু তার স্ত্রীটি বিপুল আকারের অতীব জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ। যেমন খাণ্ডার তেমনই সন্দেহপরায়ণ। কিভাবে স্বামীর পেছনে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর লাগিয়ে তার একের পর এক গোপন অভিসারের প্রচেষ্টাগুলি সে বানচাল করে দেয় এবং চূড়ান্ত ভাবে হেনস্থা করে তাকে ফের নিরীহ গৃহপালিত প্রাণীতে পরিণত করে, তাই নিয়ে এই মজার কমেডি। স্বামী-স্ত্রীর রোলে দুই আর্টিস্ট একেবারে মাতিয়ে দিয়েছেন। গল্পের সিচুয়েশনগুলো এত নিপুণভাবে সাজানো হয়েছে যে ছবিটা দেখতে দেখতে হাসি আপনা থেকেই পেটের ভেতর থেকে উথলে বেরিয়ে আসে। ছবি দেখার পরও তার রেশ থেকে যায়।

মধুরা, বৈশালী, মেঘনা আর সুরূপা—ছেলেবেলা থেকেই ওদের চারজনের দারুণ বন্ধুত্ব। একটা মিশনারি স্কুলের নার্সারি ক্লাসে তারা একই বছর ভর্তি হয়েছিল। স্কুলের সীমানা পেরুবার পরও ওদের ছাড়াছাড়ি হয় নি, একই কলেজে সবাই পড়ছে। অবশ্য সাবজেক্ট আলাদা। বৈশালী আর মধুরার অনার্স ইংরেজিতে, মেঘনার ফিজিকস আর সুরূপার হিস্ট্রি।

বৈশালী, সুরূপা এবং মেঘনা বাঙালি। মধুরা গুজরাতি, ওদের পদবি পারেখ। আদি বাড়ি ছিল সবরমতীতে, গান্ধিজির জগদ্বিখ্যাত আশ্রমের কাছাকাছি। কিন্তু পিতৃভূমির সঙ্গে যোগাযোগটা খুব সরু সুতোয় ঝুলছে। পাঁচ সাত বছর পর পর হয়তো কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনের বিয়েতে কিংবা পারলৌকিক কাজে সেখানে যাওয়া হয়। কয়েক প্রজন্ম ধরে ওরা কলকাতায় আছে। মধুরার জন্ম এই শহরেই। বাংলাটা ভালই বলতে পারে, তবে উচ্চারণে অবাঙালিদের মতো একটু টান আছে।

মধুরার বাবার ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের বিরাট বিজনেস। ওরা থাকে ল্যান্সডাউন রোডে।

বৈশালীদের বাড়ি ফার্ন রোডে। ওর বাবা একটা বড় সরকারি ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর। মেঘনারা থাকে যোধপুর পার্কে, ওর বাবা ইনকাম ট্যাক্সের কনসালটেন্ট। সুরূপাদের বাড়িও যোধপুর পার্কেই। ওর বাবা নাম-করা সার্জন।

মধুরার বাবা মেয়ের ব্যবহারের জন্য একটা মারুতি জিপসি দিয়েছেন। প্রায়ই নিজস্ব এক্সক্লুসিভ এই গাড়িটায় অন্য তিন বন্ধুকে তুলে সারা শহর চক্কর দিতে বেরোয় সে। কোনো কোনো দিন ওরা ডায়মণ্ডহারবার বা ব্যারাকপুরের গঙ্গার ঘাট কিংবা অন্য কোথাও চলে যায়।

ওদের কলেজে গরমের ছুটিটা এবার একটু আগে ভাগেই পড়েছে। আজ সকালে টেলিফোনে ওরা ঠিক করেছিল, গ্লোব সিনেমায় কমেডি ছবিটা দেখে এধারে ওধারে খানিকক্ষণ ঘুরে কোনো রেস্তোরাঁয় খাবে। তারপর যে যার বাড়ি চলে যাবে। অবশ্য মধুরাই তাদের পৌঁছে দেবে।

হাসতে হাসতে ভিড়ের ভেতর দিয়ে ওরা সামনের কার পার্কিং জোনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। মধুরার মারুতি জিপসিটা ওখানেই পার্ক করা রয়েছে।

মেঘনা বলছিল, 'পিকচারটা সিম্পলি হিলারিয়াস। আর একবার দেখব।'

চার বন্ধুই খুব হই হই করতে পারে, দারুণ হল্লোড়বাজ। তবে সবার ওপর দিয়ে যায় মধুরা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। বলে, 'ঠিক হ্যায় ইয়ার, চল অ্যাডভান্স টিকেট কেটে নিয়ে আসি।'

সুরূপা বলল, 'না রে, এই উইকে হবে না। কাল বম্বে থেকে আমার ঠাকুমা, ছোট কাকা অ্যাণ্ড হিজ ফ্যামিলি আসছে। যে ক'দিন থাকবে আই অ্যাম ফিনিশড। ওল্ড লেডি বকর বকর করে সারাদিন আমাকে কোড অফ কনডাক্ট শেখাবে। হ্যান করবে না, ত্যান করবে না, হুটহাট বাড়ি থেকে বড় আন-ম্যারেড মেয়েদের বেরুতে নেই, এটসেট্রা, এটসেট্রা। তার ওপর কাকিমা আর খুড়তুতো বোন রিলেটিভদের বাড়ি যাবে, গড়িয়াহাটায়, এয়ার-কন্ডিশনড মার্কেটে কি নিউ মার্কেটে শপিং করবে। আমাকে তাদের গাইড হতে হবে। নো ওয়ে, এই উইকে কোনোভাবেই হচ্ছে না।'

বৈশালী কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার চোখে পড়ল তার বাবা সব্যসাচী—সব্যসাচী দাশগুপ্ত ওধারের রোয়ের একটা গাড়ি থেকে নেমে নিউ মার্কেটের দিকে যাচ্ছেন। সঙ্গে একজন মহিলা।

বাঙালিদের তুলনায় সব্যসাচীর হাইটটা বেশ ভালই, পাঁচ ফুট আট ন ইঞ্চি হবে। গৌরবর্ণ যাকে বলা হয়, তিনি তা-ই। এই ফেব্রুয়ারি মাসে পঞ্চান্নয় পা দিয়েছেন। এই বয়সেও মাথায় প্রচুর চুল, তার প্রায় সবটাই কালো। মুখ খানিকটা চৌকো ধরনের। পরনে শার্ট আর ট্রাউজার্স। চোখে চশমা।

পেছন দিক থেকে মহিলাটিকে ভাল দেখা যাচ্ছে না। ডিম্বাকৃতি মুখের একাংশ, পিঠের মাঝামাঝি পর্যন্ত নেমে আসা শ্যাম্পু-করা চুল, ধারাল নাকের বাঁ দিকটা, ফর্সা না হলেও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—এর বেশি আর কিছু চোখে পড়ছে না। তবে বোঝা যাচ্ছে, মহিলাটি সুন্দরী এবং তার বয়স তিরিশের বেশি কখনই নয়।

আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কেউ হলে ঠিক চিনে ফেলত। কিন্তু যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে একেবারে অচেনা মনে হচ্ছে না, আগে যেন কোথাও দেখেছে। ঠিক কোথায়, মনে করতে পারল না বৈশালী।

এই অনাত্মীয় তরুণীটি কে হতে পারে? বাবার অফিসের কোনো সহকর্মিণী কী?

এর মধ্যে সব্যসাচী হেসে হেসে মহিলাকে কী যেন বলতে বলতে মার্কেটের দিকে অনেকখানি

এগিয়ে গেছেন। হয়তো কোনো মজার কথা হচ্ছিল। মহিলাও মাথা অল্প অল্প ঝাঁকিয়ে খুব হাসছে।

সব্যসাচী তাদের পরিবারে একজন আইডল। বৈশালীরা তাঁকে যেমন ভালবাসে, তার চেয়ে অনেক বেশি শ্রদ্ধা করে। আজন্ম সে তার বাবাটিকে দেখে আসছে। সৎ, আদর্শবাদী, মালিন্যহীন। ঘুণাক্ষরেও তাঁর সম্বন্ধে এমন কিছু শোনে নি যাতে বৈশালীর এতকালের ধারণাটা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। মনে মনে বাবাকে অপার্থিব দেবমূর্তির মতো উঁচু বেদিতে স্থাপন করে রেখেছে।

যদি ধরেও নেওয়া যায় মহিলাটি তাঁর সহকর্মিণী বা কলিগ, তবু বাবা হেসে হেসে তাকে নিয়ে নিউ মার্কেটে যাবেন, এটা ভাবা যায় না। লোকে মার্কেটে যায় কেন? নিশ্চয়ই কেনাকাটা করতে। বৈশালী ভাল করেই জানে, বাবা বাড়ির জন্য কোনোদিন দেশলাইয়ের একটা বাক্স, ধূপকাঠির প্যাকেট বা তুচ্ছাতিতুচ্ছ কিছুই কখনও কিনে আনেন নি। মানুষ মাঝে মধ্যে দু-একদিন বাজার টাজারে যায়। বাবার সেরকম কোনো শখই নেই। দোকান বাজার থেকে শুরু করে নতুন জামা কাপড় কেনা—সবই হয় মায়ের তত্ত্বাবধানে।

সব্যসাচী মহিলাটির সঙ্গে কী কিনতে মার্কেটে যাচ্ছেন? নাকি মহিলাটি কিনবেন আর তিনি তাকে সঙ্গদান করবেন?

যে বাবাকে সে শ্রদ্ধা করে তাঁর সপক্ষে মোটামুটি একটা যুক্তি খাড়া করতে চেষ্টা করে বৈশালী। এমনও তো হতে পারে, মহিলাটির সঙ্গে এখানে কোথাও বাবার দেখা হয়েছে এবং সে তাঁকে সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ করেছে। কিন্তু যুক্তিটা এতই নড়বড়ে আর দুর্বল যে নিজের কাছেই তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবনাটা নাকচ করে দেয় বৈশালী। সব্যসাচী সম্পর্কে আজন্মের ধ্যানধারণাটা কিছুতেই অটুট রাখতে পারছে না সে।

হতবুদ্ধি বৈশালী একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। তার চোখের সামনে দিয়ে সব্যসাচী আর মহিলাটি নিউ মার্কেটের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেঘনারা তাকে লক্ষ করছিল। মধুরা জিজ্ঞেস করল, 'হোয়াট হ্যাপেনস ইয়ার?' কথায় কথায় ইয়ার বলে থাকে সে। মুদ্রাদোষ আর কি।

মেঘনা বলল, 'ওদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী দেখছিস?'

সুরূপা জানতে চাইল, 'এনি প্রবলেম?'

বৈশালী হকচকিয়ে গেল। এই মাত্র যা সে দেখেছে, বন্ধুদের তা বলা যায় না। অস্বস্তির সুরে বলল, 'না না, কিচ্ছু না।' ভেতরে ভেতরে সে এতটাই ধাক্কা খেয়েছে যে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারছিল না।

মেঘনা বলল, 'বাট ইউ লুক ভেরি মাচ ডিসটার্বড।'

মধুরা বলল, 'আরে ইয়ার, সার্টেনলি কিছু একটা প্রবলেম হয়েছে। আমাদের বল। উই উড হেল্প য়ু টু কাম আউট অফ ইট—'

ওদের কথার উত্তর না দিয়ে বৈশালী বলল, 'তোরা বাড়ি চলে যা। আমার জন্যে ওয়েট করিস না।' বন্ধুদের কাউকে কিছু বলার বা বাধা দেবার সুযোগ না দিয়ে পার্কিং জোনের গাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে দিয়ে একরকম দৌড়েই ওধারে নিউ মার্কেটের ভেতর ঢুকে গেল সে। বাবা এবং তাঁর সঙ্গিনী মহিলাটিকে খুঁজে বার করতেই হবে।

এদিকে মেঘনারা একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর মেঘনা বলল, 'কী হতে পারে? কাউকে দেখে ও কি ছুটে গেল?'

দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে মধুরা বলল, 'গড নোজ। বহুৎ তাজ্জবকা বাত ইয়ার।'

সুরূপা বলল, 'চল, মার্কেটে গিয়ে দেখি ব্যাপারটা কী।'

মেঘনা বলল, 'নেভার। বৈশালী আমাদের কাছে গোপন রাখতে চাইছে। আমরা নাক গলাতে যাব কেন?'

মধুরা বলল, 'রাইট। মেজাজটা বিলকুল খারাপ হয়ে গেল। চল, ফেরা যাক।'

একটা জমজমাট মজাদার কমেডি দেখার পর আরো কিছুক্ষণ হই হই করার ইচ্ছা ছিল মধুরাদের। বৈশালীর জন্য সব উৎসাহ মিইয়ে গেল। পরবর্তী অনুষ্ঠানসূচি নাকচ করে দিয়ে ওরা পার্কিং জোনের

দিকে পা বাড়াল। ওখানে মধুরার মারুতি জিপসিটা রয়েছে।

মার্কেটে ঢুকে গোল আইল্যান্ডের মতো জায়গাটায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল বৈশালী। সাইকেলের স্পোকের মতো চারদিকে রাস্তা চলে গেছে। আবার প্রতিটি রাস্তা থেকে বেরিয়েছে সরু সরু লম্বা প্যাসেজ। প্রতিটি রাস্তা এবং প্যাসেজের দু'ধারে লাইন দিয়ে অসংখ্য ছোট বড় সাজানো গোছানো ঝকঝকে দোকান আর ডিপার্টমেন্টাল স্টোর।

কী না পাওয়া যায় নিউ মার্কেটে? হাজার রকমের পারফিউম, জেন্টস ওয়্যার, মেয়েদের পোশাক, বাচ্চাদের গারমেন্টস, জুয়েলারি, লেদার গুডস থেকে ফুল, দামি দামি ফল, কেক প্যাস্ট্রি কুকিজ, ড্রেস-করা মাংস, মাখন-চিজ ইত্যাদি ইত্যাদি।

সকালের দিকে বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতাদের, বিশেষ করে ফ্যাশনেবল মহিলাদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ও বাড়তে শুরু করে। বিকেল থেকে রাত সাতটা পর্যন্ত একেবারে পিক আওয়ার্স। এখন মানুষ উপচে পড়ছে।

চারদিকে এমন জনস্রোত যে সার্কেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। এধার ওধার থেকে অনবরত ধাক্কা লাগছে। অগুনতি দোকানপশারের মধ্যে বাবা আর মহিলাটি কোথায় ঢুকে কেনাকাটা করছে, কে জানে। কিভাবে তাদের খুঁজে বার করবে বৈশালী? কিছুক্ষণ দিশেহারার মতো দাঁড়িয়ে থাকে সে। তারপর মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়। প্রতিটি লেন আর চওড়া রাস্তার দু'ধারে যত দোকান রয়েছে, সব জায়গায় সে হানা দেবে। যাবে কোথায় ওরা?

ভিড়ের ভেতর দিয়ে দিয়ে এক একটা লেন ধরে প্রতিটি দোকানে উঁকি দেয় বৈশালী। কোনো নাছোড়বান্দা আবিষ্কারকের আত্মা যেন তার ওপর ভর করেছে। অন্য কোনো দিকে সে তাকাচ্ছে না। তার একমাত্র লক্ষ্য পঞ্চান্ন বছরের এক প্রৌঢ় আর তিরিশ বছরের এক তরুণী।

ঘন্টাখানেক পাতি পাতি করে খুঁজেও দু'জনের হদিশ পাওয়া গেল না। ভীষণ ক্লান্তি বোধ করছিল বৈশালী। তার চেয়েও অনেক বেশি হতাশ। এতক্ষণের ছোটাছুটি ব্যর্থ হয়ে গেল। বাবা আর ওই মহিলাকে হাতে নাতে ধরা গেল না—ভেতরে ভেতরে এজন্য সে খুবই মুষড়ে পড়েছে।

এক ঘন্টা সময় তো কম নয়। বাবা এবং তাঁর সঙ্গিনী নিশ্চয়ই এতক্ষণে শপিং শেষ করে চলে গেছে।

ঘামে জামা ভিজে গেছে। গলদ্‌ঘর্ম, শ্রান্ত বৈশালী জনসমুদ্রের ভেতর দিয়ে মার্কেটের বাইরে বেরিয়ে এল।

মহিলার চিন্তাটা ফিক্সেশানের মতো মাথায় আটকে আছে। বাবার সঙ্গে তাকে দেখার পর থেকে বার বার একটা কথাই বৈশালী ভাবতে চেষ্টা করেছে, কোথায় দেখেছে ওকে? কতদিন আগে? কখনও কি তাদের ফার্ন রোডের বাড়িতে কারো সঙ্গে এসেছিল?

বৈশালীর স্মৃতিশক্তি রীতিমত ভাল। এ নিয়ে তার গোপন একটু অহঙ্কার আছে। একবার কাউকে দেখলে, সহজে তাকে ভোলে না। বহুকাল আগের কোনো ঘটনা হুবহু মনে রাখতে পারে। কিন্তু ওই মহিলাটির ব্যাপারে স্মৃতি সেভাবে সাহায্য করছে না। ক্লান্তি এবং নৈরাশ্যের মধ্যেও নিজের ওপর ভীষণ রাগ হতে লাগল তার।

নিউ মার্কেটের দিক থেকে একবার ওধারের ফুটপাথে তাকাল বৈশালী। না, মধুরারা কেউ নেই। তাদের থাকার কথাও নয়। সে-ই ওদের চলে যেতে বলেছে।

সন্ধে নামতে শুরু করেছে। ময়দানের ওপারে গাছপালার মাথায় সূর্যটাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

এই সময়টা ট্যাক্সি পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। বৈশালী ঠিক করে ফেলল, পাতাল রেলে কালিঘাট স্টেশনে যাবে, সেখান থেকে অটো বা ট্রাম ধরে গড়িয়াহাট। গড়িয়াহাট থেকে ফার্ন রোডে তাদের বাড়ি পাঁচ মিনিটের রাস্তা।

ফুটপাথ ধরে ডান পাশে কয়েক পা সবে এগিয়েছে, হঠাৎ বৈশালীর চোখে পড়ল, কার পার্কিং জোনে একটা নীল রঙের অ্যামবাসাডরে উঠছেন বাবা এবং সেই মহিলাটি। তাঁদের হাতে তিন চারটে

সুদৃশ্য পলি-ব্যাগ। অর্থাৎ বৈশালী যে ভেবেছিল ওঁরা কেনাকাটা শেষ করে নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে গেছেন, সেটা আদৌ ঠিক নয়।

মনে পড়ছে, এই অ্যামবাসাডরটা থেকেই কিছুক্ষণ আগে ওঁরা নেমেছিলেন। মার্কেট থেকে বেরিয়ে সে এতটাই হতাশ আর অন্যমনস্ক ছিল যে ওদিকে তাকায় নি। ধরেই নিয়েছিল, ওঁরা অনেক আগেই চলে গেছেন। খেয়াল করলে গাড়িটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত।

অ্যামবাসাডরটা বেশ খানিকটা দূরে। বৈশালী লম্বা লম্বা পা ফেলে সেদিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়েছেন বাবা। সে পৌঁছুবার আগেই ডান দিকে ঘুরে অ্যামবাসাডরটা ধরাছোঁয়ার বাইরে বেরিয়ে গেল।

দ্বিতীয় অভিযানটাও ব্যর্থ হয়ে গেল বৈশালীর।

দুই

পঁচিশ বছর আগে, বৈশালীর তখনও জন্ম হয় নি, ওদের ফ্যামিলি থাকত ভবানীপুরের মাঝারি মাপের পাঁচ কামরার দোতলা একটা বাড়িতে। ওর ঠাকুরদা প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পরেই, উনিশ শ কুড়ি কি একুশ সালে বাড়িটা তৈরি করেছিলেন। সুখী, মোটামুটি সচ্ছল, শিক্ষিত পরিবার বলতে যা বোঝা যায়, ঠিক তাই।

ঠাকুরদা দীর্ঘায়ু ছিলেন না। মাত্র উনপঞ্চাশ বছর বয়সে মারা যান। তারপর শক্ত হাতে পরিবারের লাগামটি নিজের হাতে তুলে নেন ঠাকুমা।

বৈশালীর বাবা কাকা পিসিরা মিলিয়ে সবসুদ্ধ পাঁচজন। মাথার ওপর একজন জবরদস্ত পুরুষ অভিভাবক না থাকলে ছেলেমেয়েরা মানুষ হয় না, তাদের বয়ে যাবার প্রবল সম্ভাবনা। ঠাকুরদার শূন্য আসনে বসে প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী তাদের ঠাকুমা শ্রীমতী নবতারা দেবী ছেলেমেয়েদের এতটুকু ট্যাঁ-ফোঁ করতে দেন নি।

সেই সময়ের তুলনায় নবতারা ছিলেন যথেষ্ট বিদুষী। বেথুন কলেজ থেকে ফার্স্ট ডিভিসনে আই. এ পাশ করেছিলেন। বিয়ে হয়ে যাওয়ায় পড়াশোনাটা আর চালানো সম্ভব হয় নি। তিনি বাড়িতে একটা কঠোর কোড অফ কনডাক্ট চালু করে দিয়েছিলেন। ছেলেমেয়েরা বলত মার্শাল ল।

বৈশালী শুনেছে, ঠাকুরদার শ্রাদ্ধ এবং মৎস্যমুখী হয়ে যাবার পরদিন তার বাবা-কাকাদের ডেকে পারিবারিক সভা বসিয়েছিলেন নবতারা। স্পষ্ট ভাষায় ওদের বলেছিলেন, যার যত কাজই থাক, উপযুক্ত কারণ ছাড়া সন্ধে সাতটার ভেতর বাড়ি ফিরে আসতে হবে, নেশাভাং এবং কুসঙ্গ চলবে না, পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতে হবে, কোনোরকম অসভ্যতা বা বাঁদরামো বরদাস্ত করা হবে না।

নবতারার এক হাতে ছিল লাগাম, অন্য হাতে চাবুক। লাগামের রাস এক মুহূর্তের জন্যও তিনি আলগা হতে দেন নি। আর চাবুক হাঁকড়ে ছেলেমেয়েদের তটস্থ রেখেছেন।

বৈশালীর বাবা কাকারা আজ যে অত্যন্ত কৃতী, প্রতিষ্ঠিত, সেটা সম্ভব হয়েছে তাঁদের ডিক্টেটর মাতৃদেবীর জন্য।

ঠাকুরদা বেঁচে থাকতে থাকতেই বৈশালীর বড় পিসি সুরমার বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। বড় পিসেমশাই অবনীভূষণ উচ্চশিক্ষিত, তবে চাকরি বাকরি করেন না, তাঁদের পারিবারিক বিশাল মেশিন টুলসের বিজনেস দেখাশোনা করেন। ওঁরা থাকেন লেক টাউনে।

অন্য ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে যাবার পর একে একে তাদের বিয়ে দিয়েছেন নবতারা। শুধু ছোট ছেলে সিতাংশু বাদে।

বড় ছেলে সব্যসাচী অর্থাৎ বৈশালীর বাবার বিয়ে হয়েছে উত্তর কলকাতার এক বনেদি পরিবারে। মেজ ছেলে অভিমন্যুর জন্য নবতারা যে পাত্রীটি বেছে নিয়েছিলেন তাঁর নাম মালবিকা। বৈশালীর মামাবাড়ির মতো জমকালো বংশগৌরব ছিল না মালবিকাদের। কিন্তু খুবই উচ্চশিক্ষিত পরিবার। মালবিকা নিজে ইকনমিকসের ডক্টরেট। তাঁর বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-করা অধ্যাপক। দুই দাদাও কলেজে পড়ান। অভিমন্যুরা এখন থাকেন বাই-পাসের ধারে একটা কো-অপারেটিভ হাউসিং কমপ্লেক্সের বিরাট ফ্ল্যাটে।

বৈশালীর ছোট কাকা সিতাংশু স্কলারশিপ পেয়ে লণ্ডনে পড়তে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি অ্যাংলো-ইতালিয়ান সহপাঠিনীকে, যাঁর নাম ডরোথি—বিয়ে করেন। বৈশালীদের পরিবারে এ জাতীয় বিয়ে আগে আর কখনও হয় নি। বিদেশিনী তো ভাবাই যায় না, রীতিমত ঠিকুজি কুলুজি মিলিয়ে, যৌটক বিচার করে, এতকাল নিজেদের জাতের মেয়েদের পুত্রবধূ করে আনা হয়েছে। বংশধারা বিরোধী এমন একটা প্রচণ্ড দুঃসাহসিক কাণ্ড ঘটাবার জন্য ছোট ছেলের ওপর এক নাগাড়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ছিলেন নবতারা। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আমৃত্যু সিতাংশুর মুখদর্শন করবেন না। লণ্ডনে চিঠি লিখে সেটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সিতাংশুও মাতৃআজ্ঞা পালন করে পাঁচ বছর দেশে আসেন নি।

অন্য ছেলেমেয়েরা ক্রমাগত বুঝিয়ে সুঝিয়ে মাকে শেষ পর্যন্ত নরম করতে পেরেছিলেন। আজকাল অসবর্ণ বিয়ে আকছার হচ্ছে, হচ্ছে ইন্টার-প্রভিন্সিয়াল, ইন্টার-কন্টিনেন্টাল বিয়েও। বিদেশি হলেই মেয়ে খারাপ হবে, এমন কোনো কথা নেই, স্বজাতের মধ্যেও প্রচুর দজ্জাল খাণ্ডার মেয়ে আছে যারা সংসার ছারখার করে দিতে পারে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাঁচ বছর বাদে সিতাংশুকে দেশে আসার জন্য চিঠি লিখেছিলেন নবতারা। চিঠিটা পাওয়ার চারদিন পর ছোট কাকারা কলকাতায় চলে আসেন।

ছোট কাকিমার বাবা ব্রিটিশ, মা ইতালিয়ান। ডরোথি অসাধারণ সুন্দরী। সৌন্দর্যের মধ্যে ম্যাজিক থাকে। লাল টুকটুকে ছেলের বৌকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন নবতারা।

ডরোথি শুধু সুন্দরীই নন—শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমতী। তিনি জানতেন, আজীবন ছেলের ওপর রাগ করে থাকতে পারবেন না নবতারা। সিতাংশুর সঙ্গে তাঁকেও একদিন না একদিন ইন্ডিয়ায় আসতে হবে। দূরদর্শী মহিলা সিতাংশুর কাছে বাংলা শিখে নিয়েছিলেন। স্বামীর মাতৃভাষাটা মোটামুটি ভালই বলতে পারেন।

ডরোথির স্বভাবটি খুবই মধুর। সেবায় যত্নে মাধুর্যে শাশুড়িকে কয়েক দিনের মধ্যে হাতের মুঠোয় পুরে ফেলেছিলেন। ভাসুর ননদ এবং জায়েদের মুখেও তাঁর অফুরন্ত প্রশংসা। সেবার ছ সপ্তাহ কলকাতায় ছিলেন, তার মধ্যেই শ্বশুরবাড়ির হৃদয়টি জয় করে নিয়েছেন।

এখনও সিতাংশুরা লণ্ডনেই আছেন। দু'জনেই চাকরি করেন। আনোয়ার শা রোডে একটা ফ্ল্যাট বুক করেছেন। ওঁদের ইচ্ছা, রিটায়ারমেন্টের পর বাকি জীবনটা কলকাতায় কাটাবেন। ফি বছর পুজোর সময় তিন উইকের জন্য এখানে আসেন।

বৈশালীর ছোট পিসি মনীষার বিয়েটা সদ্বংশ, শিক্ষিত পরিবার দেখেই দিয়েছিলেন নবতারা। কিন্তু সেটা টেকে নি। অশান্তি এমন চরম সীমায় পৌঁছয় যে দু বছরের ভেতর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। এরপর আর বিয়ে করেন নি মনীষা। পুরুষদের সম্পর্কে তাঁর প্রচণ্ড আক্রোশ এবং ঘৃণা। একটা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে তিনি ইংরেজি পড়ান, ঢাকুরিয়ায় এক কামরার ফ্ল্যাট কিনে একাই সেখানে থাকেন। দুই দাদা সব্যসাচী আর অভিমন্যু ডিভোর্সের পর তাঁকে নিজেদের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, মনীষা রাজি হন নি। শ্বশুরবাড়িতে যখন অশান্তি চলছিল, ভবিষ্যতের কথা ভেবে স্কুলের চাকরিটা জোগাড় করেছিলেন। বিবাহ বিচ্ছেদ হবার পর কোনো দাদার বাড়ি যান নি, সোজা স্কুলের হস্টেলে গিয়ে উঠেছিলেন। তার অনেক দিন পর ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাটটা কিনেছেন।

এবার আগের কথা একটু বলে নেওয়া যেতে পারে।

নবতারা ছিলেন অত্যন্ত প্র্যাগমাটিক—প্রখর বাস্তব বুদ্ধির অধিকারিণী। অনেক দূর পর্যন্ত ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন। ছেলেদের বিয়ে দেবার পর বুঝেছিলেন, একটা কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। তখনও মনীষার দাম্পত্য জীবনে অশান্তি শুরু হয় নি।

মেয়েরা চলে গেলেও তাদের ফাঁকা জায়গায় এসে গেছে দুই ছেলের বৌ। তাদের ছেলেপুলে হবে, ক্রমশ বাড়িতে মানুষ বাড়বে। নতুন বংশধরদের জন্য অনেক ঘর দরকার হবে। ভবানীপুরের বাড়িটা এমনভাবে তৈরি যাতে ওটা আর বাড়ানো সম্ভব নয়। তা ছাড়া পুত্রবধূরা যদিও ভাল ভাল বংশ থেকে এসেছে, আপাতদৃষ্টিতে দু'জনেরই চালচলন আচার ব্যবহার বেশ সন্তোষজনক কিন্তু ওদের মনে কী আছে কে জানে। নবতারা অবশ্য যতদিন বেঁচে আছেন কাউকে টুঁ শব্দটি করতে দেবেন না। কিন্তু তিনি তো অমর নন যে চিরকাল সংসার আগলে বসে থাকবেন। তাঁর মৃত্যুর পর জায়েদের

মধ্যে সদ্ভাব যে বজায় থাকবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। পরের বাড়ির মেয়েরা যদি অশান্তি শুরু করে সেটা তাঁর ছেলেদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধ ঠেকাবার একটা রাস্তা ভেবে ভেবে বার করেছিলেন নবতারা। একদিন ছেলেমেয়েদের ডেকে তিনি বলেছিলেন, ভবানীপুরের বাড়িটা বিক্রি করা হোক। তার কারণগুলো ভাল করে ওদের বুঝিয়েও দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা, বাড়ি বেচে যে টাকাটা পাওয়া যাবে সেটা ছ ভাগে ভাগ করা হবে। পাঁচ ছেলেমেয়ের পাঁচ ভাগ, তাঁর এক ভাগ। এক একজনের অংশে যা পড়বে তা দিয়ে নতুন বাড়ি করা সম্ভব নয়। বড় দুই ছেলে অফিস বা এল আই সি থেকে কিছু টাকা লোন নিয়ে ভাগের টাকার সঙ্গে যোগ করে পছন্দমতো বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনে নিক। ছোট ছেলে তখন লণ্ডনে। তার টাকা ব্যাঙ্কে জ' থাকবে। নবতারা বাড়ি টাড়ি করবেন না, দুই ছেলের কাছে পালা করে থাকবেন, তবে ওদের মুখা'ক্ষী হবেন না। নিজের ভাগের টাকা ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করে যে ইন্টারেস্ট পাবেন তাই দিয়ে ার খরচ চলবে। যখন যার কাছে থাকবেন, খাওয়া পরার জন্য যা লাগবে তাকে দেবেন। বড় মেয়ে সুরমা এবং মনীষার শ্বশুরদের বিরাট বাড়ি। ওদের টাকা দিয়ে ওরা যা ভাল বোঝে তাই করবে। নবতারার দৃঢ় ধারণা, এক জায়গায় থেকে তিক্ততা এবং ঝগড়াঝাঁটি করার চেয়ে আলাদা আলাদা থাকলে ছেলেদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে।

নবতারার কথাগুলো ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছিল।

এর পর তিন মাসের ভেতর ভবানীপুরের বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। বৈশালীর বাবা বছর পাঁচ ছয়েক ভাড়া বাড়িতে কাটিয়ে ফার্ন রোডে পুরনো একটা বাড়ি কিনে পুরোপুরি রেনোভেট করে নিয়েছেন। মেজো কাকা অভিমন্যু বাই-পাসের ধারে ফ্ল্যাট কিনেছেন।

এই ক'বছরে তাদের পরিবারে দুটো চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গেছে। ছোট পিসি মনীষার বিবাহ বিচ্ছেদ আর ছোট কাকার সঙ্গে অ্যাংলো-ইতালিয়ান মেয়ের বিয়ে।

এই দুই ঘটনার জের কাটিয়ে ওঠার পর বেশ কিছুদিন নতুন কোনো সমস্যা দেখা দেয় নি। মসৃণভাবে কয়েকটা বছর কেটে গেছে। তারপর নবতারার জীবনে একটা দুঃখজনক ব্যাপার ঘটে যায়। হঠাৎ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হওয়ার কারণে ছ'টি মাস তাঁকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়। ধাক্কাটা সামলে নিয়ে মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি। কিন্তু স্মৃতিটা প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। ছেলেমেয়ে নাতিনাতনীদের চিনতে পারেন না, কেউ সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। ভাবতে চেষ্টা করেন আগে কোথাও দেখেছেন কিনা।

যে নবতারা চাবুক হাঁকিয়ে প্রবল প্রতাপে একদিন সমস্ত সংসারটা চালিয়েছেন তাঁকে দেখলে এখন কষ্ট হয়।

মোটামুটি এই হল বৈশালীদের পরিবারের রেখাচিত্র। তাদের ভবানীপুরের জয়েন্ট ফ্যামিলি অনেকদিন আগেই ভেঙে গেছে কিন্তু তার রেশ এবং স্পিরিট এখনও নষ্ট হয় নি। আলাদা আলাদা থাকলেও মনের দিক থেকে বৈশালীর বাবা কাকা পিসিরা বিচ্ছিন্ন নন। ঠাকুমার জায়গাটা এখন নিয়েছেন তার বাবা। ভাইবোনদের কারো জীবনে সমস্যা দেখে দিলে, কিংবা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে সব্যসাচীর কাছে তাঁরা ছুটে আসেন। তিনি যা বলেন সেটাই শেষ কথা, মুখ বুজে সবাই তা মেনে নেন।

সমস্ত পরিবারের কাছে, এমন কি আত্মীয়স্বজনদের চোখেও সব্যসাচী হচ্ছেন আইডল বা রোল মডেল। বাবাকে পৃথিবীর সব চেয়ে সৎ, সব চেয়ে শুদ্ধ মানুষ বলে জানত বৈশালী। মনে হত, চারপাশের নোংরা স্বার্থসর্বস্ব দুশ্চরিত্র লোকজনের থিকথিকে ভিড়ে তাঁর দীর্ঘ উজ্জ্বল ভাবমূর্তি যেন আকাশের উচ্চতাকে ছুঁয়ে আছে।

কিন্তু নিউ মার্কেটে আজ এ কোন সব্যসাচীকে দেখল বৈশালী? পায়ের তলা থেকে মস্তিষ্কের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রচণ্ড নাড়া খেয়ে গেছে তার। মনে মনে সে ঠিক করে ফেলল, বাবার সঙ্গিনী ওই মহিলাটি কে এবং দু'জনের সম্পর্ক কতটা গভীর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, সেটা তাকে জানতেই হবে।

তিন

ফার্ন রোডে নিজেদের বাড়িতে বৈশালী এসে যখন পৌঁছুল, সাতটা বাজতে তখনও মিনিট সাতেক বাকি।

বাড়িটা মাঝারি মাপের ছিমছাম দোতলা। মাস তিনেক আগে নতুন রং করানো হয়েছে। কাছাকাছি এলে পেইন্টের ফিকে একটু গন্ধ এখনও নাকে লাগে।

সামনের দিকে এক ফালি চৌকো জায়গায় সমান করে ছাঁটা মখমলের মতো সবুজ ঘাস। তার ধারে ধারে ফুলের গাছ।

নিচু গেট খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল বৈশালী। বাইরের দিকের দরজাটা বন্ধ রয়েছে। কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে দিল মহাদেব। সে এ বাড়ির কাজের লোক। দারুণ হাসিখুশি। বৈশালীর বয়স যখন এক কি দেড়, তখন থেকেই তাদের কাছে আছে। কোনোরকম পিছুটান নেই। বিয়ে একটা করেছিল, ছেলেপুলে হয় নি। স্ত্রীও বেশিদিন টিকল না, বিয়ের তিন বছরের মাথায় মরে ফৌত হয়ে গেল। বৈশালী এবং তার চার সাড়ে-চার বছরের বড় দাদা রাহুল মহাদেবের কোলেপিঠে চড়ে বড় হয়েছে। মহাদেব এখন এ বাড়িরই একজন।

পরনে চেক-কাটা হাফ শার্ট আর আধময়লা খাটো ধুতি। বার মাস মহাদেবকে এই পোশাকেই দেখা যায়। শীতের সময়টায় অবশ্য তার ওপর একটা তুষের চাদর জড়িয়ে নেয়।

মহাদেব হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, 'বন্ধুদের সঙ্গে খুব ঘোরাঘুরি করলে, তাই না?'

বৈশালীর বন্ধুবান্ধবদের সবাইকে চেনে মহাদেব। দুপুরবেলা মধুরা, মেঘনা এবং সুরূপা এসে যে তাকে গাড়িতে করে নিয়ে গিয়েছিল সেটা ওর জানা।

আবছা গলায় বৈশালী বলল, 'হুঁ—'

মহাদেব বলে, 'সিনেমা দেখলে বুঝি?'

ভেতরে ভেতরে বিধ্বস্ত হয়ে আছে বৈশালী। কথা বলতে একেবারেই ভাল লাগছে না। মহাদেবের পাশ দিয়ে বাড়ির মধ্যে যেতে যেতে আগের মতো গলার ভেতর অস্পষ্ট শব্দ করল, 'হুঁ—'

মহাদেব মানুষটা বেজায় ভাল কিন্তু দোষ একটাই। একটু বেশি কথা বলে। দরজা বন্ধ করতে করতে মহাদেব শুধোয়, 'তোমরা তো বাংলা বই দেখ না। কী দেখলে—হিন্দি, না ইংরিজি?' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার সব কিছু জানা চাই।

মহাদেবকে খুবই পছন্দ করে বৈশালী। তার মধ্যে শিশুর মতো সারল্য রয়েছে, আর আছে অপার কৌতূহল। ছেলেবেলা থেকে অসীম মমতায় লোকটা তাকে জড়িয়ে রেখেছে। অন্যদিন হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কথা বলত বৈশালী। যে ছবিটা দেখে এসেছে তার গল্প এবং মজার মজার সিচুয়েশনগুলোর অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিত। আজ কিছুই ভাল লাগছে না। মহাদেবের পাশ দিয়ে সে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল।

আগে তেমনভাবে বৈশালীকে লক্ষ করে নি মহাদেব। হঠাৎ তার খেয়াল হল, মেয়েটা কেমন যেন চুপচাপ আর মনমরা। সে জানতে চাইলে বৈশালী জবাব দেবে না, এমনটা আগে কখনও হয় নি। বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকে মহাদেব ভাবতে লাগল, কোথাও কি কিছু গোলমাল হয়েছে?

বৈশালীদের বাড়িটার একতলায় ডাইনিং-কাম-ড্রইং রুম। আর আছে কিচেন, দুটো বেডরুম, স্টোর ইত্যাদি। ড্রইং রুমের পাশ দিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওপরে চলে এল বৈশালী।

দোতলায় কিচেন নেই। সব মিলিয়ে এখানে অ্যাটাচড টয়লেট-ওলা তিনটে বেডরুম। বাঁ পাশেরটা বৈশালীর, মাঝখানেরটা তার মা-বাবার, ডান দিকেরটা রাহুলের।

বৈশালীদের খাওয়ার ব্যবস্থা নিচে। ডাইনিং টেবল আর চেয়ার টেয়ার না থাকায় দোতলায় ড্রইং রুমের জন্য অনেকটা জায়গা পাওয়া গেছে। প্রায় বড় একটা হল-ঘরের মতো। দু সেট সোফা, দুটো সেন্টার টেবল ছাড়াও রয়েছে পঁচিশ ইঞ্চি স্ক্রিনের রঙিন টিভি, নিচু স্ট্যাণ্ডে টেলিফোন, সুদৃশ্য ওয়াল-ক্লক। দু ধারের দেওয়াল ঘেঁষে সাড়ে চার ফুট হাইটের লম্বা বুক-কেস। সেগুলোর সামনের দিকে কাচের স্লাইডিং ডোর, ভেতরে ঠাসা বই। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র তো আছেনই, আছেন শেকসপিয়ার ব্রেশট শ হেমিংওয়ে, আছে বাঙালীর ইতিহাস, এনসাইক্লোপিডিয়া, চার্চিলের ছ ভলিউম 'দা সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার', দেশভাগের ইতিহাস ইত্যাদি। বুক-কেসগুলোর মাথায় নানা শেপের পেতলের টবে বেশ কিছু অর্কিড আর বনসাই।

রোজ সন্ধে সাড়ে ছ'টার পর দোতলার ড্রইং রুমে পা দিলে যে দৃশ্য চোখে পড়ে, আজও তার

হেরফের নেই। একেবারে সিনেমার রিপিট শো। বৈশালী দেখল, সুচরিতা একটা সোফায় বসে পলকহীন টিভির দিকে তাকিয়ে আছেন।

সুচরিতা ওর মা। তাঁর বয়স সবে পঞ্চাশ পেরিয়েছে। গোলগাল, আদুরে ধরনের চেহারা। পান পাতার মতো ভরাট মুখ, ফর্সা রং। ভাসা ভাসা, টানা চোখ। এই বয়সেও প্রচুর চুল। প্রায় সবটাই কালো, খোঁজাখুঁজি করলে দু-চারটে রুপোর তার পাওয়া যেতে পারে। পরনে পাটভাঙা টাঙ্গাইল শাড়ি যার ছ ইঞ্চি চওড়া লাল পাড়ে চমৎকার নকশা। দু হাতে ছ গাছা করে সোনার চুড়ি, শাঁখা আর পলা। গলায় লকেটওলা সোনার চেন, নাকে হীরের নাকছাবি। সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর, কপালে একটাকা সাইজের সিঁদুরের টিপ। টিপক্যাল বঙ্গলক্ষ্মী মার্কা তরল আলতা বা সিঁদুরের বিজ্ঞাপনে ঠিক যেমনটি দেখা যায়।

কার্পেট বিছানো মেঝেতে, সুচরিতার সোফার দু পাশে বসে আছে সাবিত্রী আর ময়না। তাদের চোখও টিভির দিকে। ওরা এ বাড়ির কাজের মেয়ে—সুচরিতার সর্বক্ষণের সঙ্গী এবং বিশ্বস্ত অ্যাসিস্টান্ট।

সাবিত্রীর বয়স চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। মোটা মোটা হাড়ের ফ্রেমে তার মজবুত, কর্মঠ চেহারা। শক্ত চোয়াল। চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। স্বামী অনেক কাল আগে অন্যের বৌকে ভাগিয়ে নিয়ে দুর্গাপুর না আসানসোল কোথায় যেন চলে গেছে। বউয়ের খোঁজও নেয় না। একটা মেয়ে হয়েছিল, তারও বিয়ে হয়ে গেছে। সাবিত্রীর পরনে ক্যাটকেটে হলুদ রঙের শাড়ি। ক্ষণস্থায়ী বিবাহিত জীবন কবেই চুকেবুকে গেছে, তবু তার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সিঁথিতে এখনও সরু করে সিঁদুর লাগায়। আজও লাগিয়েছে। দু হাতে রুপোর বালা, গলায় রুপোরই গোট হার। মহাদেবের মতো সেও ঝাড়া হাত-পা, এবং এ বাড়িরই একজন হয়ে গেছে।

প্রয়োজন নেই, কাজের লোকও রয়েছে, তবু সুচরিতা নিজের হাতে দু বেলা রান্নাটা করে থাকেন। তাঁর লজিকটা এই রকম। ট্র্যাডিশনাল হিন্দু ফ্যামিলির গৃহিণীদের এটা নাকি না করলেই নয়। সাবিত্রী মাছ কুটে, মশলা বেটে, আনাজ কেটে তাঁকে সাহায্য করে। তা ছাড়া বাড়ি ধোয়ামোছা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা—এই সব ভারি ভারি খাটুনির কাজগুলোও তার ভাগে পড়েছে।

ময়নার বয়স বার তের। রং কালো হলেও বেশ সুশ্রী। এখনও লম্বা ঝুলের ঢিলেঢালা ফ্রক পরছে। কিন্তু সতেজ গাছের চারার মতো যেভাবে বাড়ছে, কিছুদিনের মধ্যে শাড়ি না ধরলেই নয়। মেয়েটা সারাক্ষণ পোষা বেড়ালের মতো সুচরিতার গায়ে গায়ে লেগে থেকে তাঁর ফাইফরমাশ খাটে।

সুচরিতার প্রতিদিনের রুটিনে টিভি দেখাটা ধর্ম পালনের মতো ব্যাপার। সকালে উঠে মুখ টুখ ধুয়ে চা খেয়ে তিনি কিচেনে ঢোকেন। ন'টার ভেতর রান্না শেষ। সাড়ে ন'টার মধ্যে খেয়েদেয়ে স্বামী অফিসে চলে যান, ছেলেমেয়ে কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে। এগারটায় স্নান সেরে সুচরিতা ঘড়ি ধরে একটি ঘন্টা লক্ষ্মী সিদ্ধিদাতা গণেশ বাবা লোকনাথ এবং আদ্যা মা এবং অন্য দেবদেবীর পুজো করেন। সাড়ে বারটায় দুপুরের খাওয়া চুকিয়ে দিবানিদ্রা। চারটেয় উঠে চা খেয়ে রাতের রান্না সারতে সারতে ছ'টা বেজে যায়। তারপর গা ধুয়ে লন্ড্রি থেকে কেচে আসা একটি শাড়ি পরে, অর্থাৎ শুদ্ধ পোশাকে এবং শুদ্ধ চিত্তে সাবিত্রী এবং ময়নাকে সঙ্গে নিয়ে টিভি দেখতে বসেন। দশটা পর্যন্ত যত সিরিয়াল, গানের প্রোগ্রাম আর কুইজ টুইজ হয়, চোখ টান করে দেখে যান। পৃথিবী রসাতলে যাক, এই সময়টা টিভির সামনে থেকে সুচরিতাকে নড়ানো যাবে না।

দোতলায় ওঠার পর সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বৈশালী। একদৃষ্টে সে মাকে লক্ষ করছে। সিঁড়ি ভাঙার সময় তার পায়ের শব্দ হয়েছে কিন্তু সুচরিতা তা শুনতে পান নি। টিভি দেখার সময় পারিপার্শ্বিক সমস্ত কিছু তার কাছে লুপ্ত হয়ে যায়। টিভি ছাড়া অন্য কোনো শব্দ কানে পৌঁছয় না, অন্য কোনো দৃশ্য দেখতে পান না।

হঠাৎ মায়ের প্রতি অসহ্য রাগে মস্তিষ্কের ভেতর পর্যন্ত জ্বলে যায় বৈশালীর। ভদ্রমহিলা কেমন নিশ্চিন্তে, বিভোর হয়ে টিভি দেখে চলেছেন। অথচ চোরা বান নিঃশব্দে তাঁর দাম্পত্য জীবনের ভিত ক্ষইয়ে দিচ্ছে, সে সম্বন্ধে তাঁর এতটুকু হুঁশ নেই। যে পুরুষটিকে ঘিরে তিরিশ বছর ধরে সোনার সংসার গড়ে তুলেছেন সে যে কত অসৎ, কত বড় বিশ্বাসঘাতক, তিনি জানতেও পারেন নি। টেরও পান নি, কিভাবে তাঁকে ঠকানো হচ্ছে।

ছেলেবেলা থেকে বৈশালী দেখে আসছে বাবার প্রতি মায়ের বিশ্বাস অকুণ্ঠ, আস্থা দ্বিধাহীন। বাবার পায়ে নিজের সমস্তটুকু আনুগত্য সঁপে দিয়ে তিনি ঘরসংসার করে চলেছেন। কিন্তু এটা কোনোভাবেই চলতে পারে না।

মায়ের দিকে চোখ রেখে কোনাকুনি বৈশালী নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

ময়না তাকে দেখতে পেয়েছিল। সুচরিতাকে সে বলল, 'মা, দিদি এসেছে।'

টিভির পর্দা থেকে দৃষ্টি সরালেন না সুচরিতা। নিশি-পাওয়া মানুষের মতো সিরিয়াল দেখতে দেখতে বললেন, 'তনি এলি?'

বৈশালীর ডাক নাম তনি। বিকেল থেকে তার মাথায় যে উত্তাপ জমা হচ্ছিল তার খানিকটা বেরিয়ে আসে। ঝাঁঝাল গলায় সে বলে, 'হ্যাঁ।'

মেয়ের মেজাজের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করলেন না সুচরিতা। বললেন, 'চা খাবি?'

বৈশালী উত্তর দিল না।

সুচরিতা অন্যমনস্কর মতো বললেন, 'চা খেলে ময়নাকে বলিস। করে দেবে।'

চুপচাপ, থমথমে মুখ, আরো ক'পা গিয়ে সব্যসাচী আর রাহুলের ঘরের দিকে তাকাল বৈশালী। দুটো বেডরুমই ফাঁকা, তবে আলো জ্বলছে। রাহুল এ বছর ইকনমিকসে এম. এ দিয়েছে। রেজাল্ট এখনও বেরোয় নি। ইউনিভার্সিটির শেষ পরীক্ষাটা দেবার পর একেবারে সাপের পাঁচ পা দেখেছে। যখন খুশি আসে, যখন খুশি বাড়ি থেকে বেরোয়। বন্ধু টন্ধু জুটিয়ে কোথায় কোথায় আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছে কে জানে।

বেশির ভাগ দিন সাতটার ভেতর বাড়ি ফিরে আসেন সব্যসাচী। অফিসের কাজে কলকাতার কাছাকাছি কোথাও গেলে ফিরতে দেরি হয়। মাঝে মাঝে দু-চারদিনের জন্য বাইরেও যান—বিশেষ করে নর্থ বেঙ্গল বা দুর্গাপুর আসানসোলের দিকে।

নিউ মার্কেটে ওই মহিলাটিকে দেখার পর সন্দেহ হচ্ছে, সব্যসাচী হঠাৎ হঠাৎ যে দেরি করে বাড়ি ফেরেন কিংবা মাসে তিন চার বার বাইরে যান তার সবগুলোই অফিসিয়াল ট্যুর কিনা। ট্যুরের বাহানা করে প্রমোদভ্রমণে যে যান না, জোর করে এখন আর তা বলা যাবে না। বাবার সম্পর্কে বৈশালীর বিশ্বাসের ভিতটা অনেকখানি নড়ে গেছে।

সব্যসাচীর বেডরুম স্বাভাবিক কারণেই ফাঁকা। বোঝাই গেছে, আজ তিনি দশটার আগে ফিরছেন না।

বৈশালী সোজা নিজের ঘরে চলে এল। এমনিতেই গরমটা আজ অন্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি। তার ওপর বাবার সঙ্গে মহিলাটিকে দেখে মাথার ভেতর আগুন ধরে আছে। একটা তোয়ালে নিয়ে সে সোজা বাথরুমে চলে গেল।

শাওয়ার খুলে মিনিট কুড়ি তার তলায় দাঁড়িয়ে থাকার পর শরীর এবং মস্তিষ্কের উত্তাপ অনেকটা জুড়িয়ে এল বৈশালীর। ভাল করে মাথা টাথা মুছে ঘরে এসে কিমোনো টাইপের পাতলা ম্যাক্সি পরে কোমরে আলগা করে ফিতে বেঁধে নিল। তারপর ধবধবে নরম বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

এখান থেকে ড্রইংরুমের বেশ খানিকটা অংশ চোখে পড়ে। বৈশালী লক্ষ করল, সুচরিতা আত্মহারা হয়ে টিভি দেখে চলেছেন। বাংলা সিরিয়ালগুলোর স্ট্যান্ডার্ড এত খারাপ যে মাথা ধরে যায়। এন্টারটেনমেন্টের নামে স্রেফ চোখের ওপর অত্যাচার। দিনের পর দিন মা যে কী করে এই সব রাবিশ দেখে চলেছে কে জানে।

সুচরিতার কথা সেভাবে এখন ভাবছে না বৈশালী। বিষপোকার মতো সেই চিন্তাটা তার মাথায় কামড় বসিয়েছে। মহিলাটিকে আগে কোথায় দেখেছে সে? হঠাৎ কুয়াশার একটা পর্দা সরে যায় সামনে থেকে। মনে পড়ে, তাদের এই বাড়িতেই এসেছিল। আট দশ মাস আগে, নাকি তারও বেশি? ভেতরে ভেতরে এক ধরনের উত্তেজনা টের পাচ্ছিল বৈশালী। কে পাঠিয়েছিল মহিলাকে? কী কারণে সে এসেছিল?

ভাবনাটা হঠাৎ ছত্রখান হয়ে যায়। দরজার সামনে কার যেন ছায়া পড়েছে। চমকে সেদিকে তাকায় বৈশালী। ময়না দাঁড়িয়ে আছে। রূঢ় গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কী চাই? কে তোকে এখানে আসতে বলেছে?'

ধমক খেয়ে মুখটা এতটুকু হয়ে যায় ময়নার। ভয়ে ভয়ে বলে, 'চা করে আনব দিদি?'

মায়ের ছায়াসঙ্গী হলেও ময়না এর মধ্যেই বুঝে ফেলেছে তার মতো মেয়েদের শুধু একজনেরই নয়, বাড়ির সবার মন যুগিয়ে চলতে হয়। তা ছাড়া চায়ের কথাটা সুচরিতাও বলেছিলেন।

ময়নার কাঁচমাচু মুখ দেখে হঠাৎ বড় মায়া হল বৈশালীর। এমনিতে সে কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলে না, বিশেষ করে কাজের লোকেদের। কিন্তু সেই মহিলাটিকে দেখার পর থেকে মেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে ছিল। নিরীহ কিশোরীটির ওপর তার খানিকটা আঁচ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে।

একটু হেসে নরম গলায় বৈশালী বলল, 'এদিকে আয়—'

ভয়টা পুরোপুরি কাটে নি ময়নার। দিদিকে এভাবে রেগে উঠতে আগে কখনও দেখে নি। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে খাটের কাছে এগিয়ে এল সে। বৈশালী তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'বকেছি বলে মন খারাপ হয়েছে?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে ময়না। আবছা গলায় বলে, 'না।'

বৈশালী বলে, 'ভেরি গুড গার্ল। এখন কষ্ট করে তোকে চা করতে হবে না।'

মিষ্টি কথায় জড়সড় ভাবটা কেটে যায় ময়নার। বলে, 'আমার একটুও কষ্ট হবে না দিদি। আমি রান্নাঘরে যাব, আর করে নিয়ে আসব।'

'না রে, এখন চা খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ রে বাবা—সত্যি।'

বৈশালী ভাবল, মেয়েটাকে একটু খুশি করা দরকার। বলতে লাগল, 'তোকে বলেছিলাম কাচের চুড়ি কিনে দেব। একদম ভুলে গিয়েছিলাম। কাল ঠিক নিয়ে আসব—কেমন?'

ময়নার মুখ ঝলমল করে ওঠে। ঘাড়টা হেলিয়ে দেয় সে। একটু আগে সে ধমক খেয়েছে, সেটা তার মনেও নেই।

মেয়েটাকে খুশি করতে পেরে অস্বস্তি অনেকখানি কেটে যায় বৈশালীর। বলে, 'যা, টিভি দ্যাখ গিয়ে—'

কাল কাচের চুড়ি পাবে। উড়তে উড়তে ড্রইং রুমের দিকে চলে যাচ্ছিল ময়না, কী ভেবে বৈশালী ডাকল, 'এই শোন—'

ময়না দরজার কাছ থেকে ফিরে আসে, 'কিছু চাই দিদি?'

সব্যসাচী সম্পর্কে একটা প্রশ্ন মাথায় এসেছে বৈশালীর। বাড়ির কাজের মেয়েকে সেটা করা ঠিক হবে কিনা প্রথমটা তা ভেবে উঠতে পারল না। পরক্ষণে দ্বিধা কাটিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা আজ অফিস থেকে মাকে ফোন করেছিল?' বৈশালী জানে, ময়না সারাক্ষণ মায়ের কাছে ঘুর ঘুর করে। সুচরিতাকে কে কখন ফোন করছে, সে সব জানতে পারে।

ময়না বলল, 'হ্যাঁ, করেছিল। বিকেলে।'

'বাবা কী বলেছে জানিস?'

'রাত্তিরে ফিরতে দেরি হবে। আপিসের কী কাজ আছে।'

এটাই ভেবেছিল বৈশালী। ফিরতে দেরি হলে মাকে আগেভাগে ফোন করে জানিয়ে দেন সব্যসাচী। স্বামী হিসেবে তিনি যে কতটা একনিষ্ঠ, কতখানি সৎ এবং বিশ্বস্ত, স্ত্রীকে না বলে একটি পাও কোথাও বাড়ান না, নিজের সম্বন্ধে এমন একটা মহান ধারণা দীর্ঘকাল ধরে, সযত্নে তিনি গড়ে তুলতে পেরেছেন। কী অদ্ভুত ক্যামুফ্লেজ। সততার চাদরে নিজেকে আগাগোড়া মুড়ে রেখে আশ্চর্য কৌশলে লোকটা প্রতারণা করে চলেছে। আজ নিউ মার্কেটে মহিলাটির সঙ্গে সব্যসাচীকে দেখা না গেলে তাঁর গোপন খেলাটা কোনোদিনই জানা যেত না।

বৈশালী বলল, 'তুই যা।'

ময়না ড্রইংরুমে গিয়ে মায়ের পায়ের কাছে বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সেই চিন্তাটা ফের বৈশালীর মাথায় ফিরে এল। আবছাভাবে মনে পড়ছে, কারো চিঠি নিয়ে মহিলাটি বাবার কাছে এসেছিল। এখন যেখানে বসে সুচরিতা টিভি দেখছেন, ওইখানে তাকেও বসানো হয়েছিল।

তখন কলেজের কী একটা পরীক্ষা চলছিল বৈশালীর। নিজের এই ঘরটায় বসে পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে তার চোখ ড্রইংরুমের দিকে চলে যাচ্ছিল। বাবা আর ওই মহিলাটির মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছে, দূর থেকে শোনা যায় নি। এ নিয়ে তার কোনোরকম কৌতূহল ছিল না। বাবার কাছে রোজই কেউ না কেউ নানা দরকারে আসে। কেউ ক্যারেক্টর সার্টিফিকেটের জন্য, কেউ মার্কশিট অ্যাটেস্ট করাতে। তা ছাড়া আসে বহু ধরনের আবেদন নিবেদন, অনুরোধ উপরোধ নিয়ে হাজার গণ্ডা লোক। শনি আর রবিবার ড্রইংরুমে মেলা বসে যায়। সব্যসাচী উচ্চপদস্থ অফিসার, অত্যন্ত ক্ষমতাবান। তাঁর কাছে উমেদারদের ভিড় তো লেগে থাকবেই।

মনে আছে, সেদিন মহিলাটি হাতজোড় করে সমানে কাকুতিমিনতি করছিল। বাবা সহানুভূতির সঙ্গে তার কথা শুনছিলেন আর হাত নেড়ে নেড়ে কী বোঝাচ্ছিলেন।

মহিলাটি প্রায় মিনিট চল্লিশেক ড্রইংরুমে ছিল। ছেলেমেয়ে ভাইবোন স্ত্রী ছাড়া এতটা সময় বাইরের কাউকে কখনও দেন না সব্যসাচী।

এত সব ডিটেল মনে আছে। মহিলার নাম, কী উদ্দেশ্যে, কার চিঠি নিয়ে সে এসেছিল, পরে শুনেছে বৈশালী। সব্যসাচী তাকে সোজাসুজি বলেন নি। রাত্তিরে খাবার টেবলে মায়ের সঙ্গে মহিলাকে নিয়ে তাঁর আলোচনা হয়েছিল। কাছাকাছি বসে খেতে খেতে কানে এসেছে বৈশালীর। আশ্চর্য, সেই বিকেল থেকে স্মৃতির ভেতরটা কতবার তোলপাড় করে ফেলেছে কিন্তু সবচেয়ে জরুরি তথ্যগুলো ভুলে গেছে।

আসলে বাবার সঙ্গে যারা দেখা করতে আসে তাদের ভেতর থেকে আলাদাভাবে একজনকে মনে করে রাখার কথা কখনও বৈশালীর মাথায় আসে নি। অতি সাধারণ, অতি তুচ্ছ এক সাক্ষাৎপ্রার্থিনী ভবিষ্যতে যে বড় আকারের সমস্যা হয়ে দেখা দেবে, কে ভাবতে পেরেছিল!

নিজের ওপর অসহ্য রাগে মাথার চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা করছে বৈশালীর। ভাবনাটা একই বৃত্তে পাক খেয়ে চলেছে। কে পাঠিয়েছিল মহিলাটিকে? বড় পিসি কী? —না। ছোট পিসি?—না। বড় কাকা?—না। জানাশোনা কেউ? বোঝা যাচ্ছে না। তবে এমন কারো চিঠি নিয়ে এসেছিল যার জন্য মূল্যবান চল্লিশটি মিনিট বাবাকে অপচয় করতে হয়েছে।

টিভি থেকে একটানা চড়া যাত্রামার্কা টুকরো টুকরো ডায়লোগ ভেসে আসছে। আজকাল বাংলা চ্যানেল কি একটা? সবগুলো চ্যানেলের যাবতীয় প্রোগ্রাম সুচরিতার মুখস্থ। চ্যাট শো, মিউজিক শো, কুইজ—এসব তাঁর তেমন ভাল লাগে না। তাঁর নাম্বার ওয়ান পছন্দ হল সিরিয়াল। যে চ্যানেলটা দেখছেন সেখানে অন্য প্রোগ্রাম শুরু হলে রিমোট কনট্রোলের বোতাম টিপে তক্ষুনি তিনি আর এক চ্যানেলে চলে যান। কোথাও না কোথাও সিরিয়াল পাওয়া যাবেই। দশটা পর্যন্ত বাড়ির লোকের নার্ভের ওপর এই টরচার চলতে থাকবে।

এরই মধ্যে সেই চিন্তাটা তার নিজস্ব প্রক্রিয়ায় বৈশালীর মাথার ভেতর চলছেই। কিন্তু মহিলা সম্পর্কে ভাইটাল তথ্যগুলো এখনও মনে পড়ছে না। স্মৃতি এক অদ্ভুত ব্যাপার। কিছু ধরে রাখে, বাকিটা ফেলে দেয়।

হই হই করতে করতে বাড়ি ফিরল রাহুল। সে ফার্ন রোডের মোড়ে এলে এখান থেকে টের পাওয়া যায়। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলা, হুল্লোড়বাজি, ছটফটানি, জোরে জোরে শব্দ করে হাসা—এই হল রাহুল। যখন যেখানে থাকে, একেবারে ঝড় বয়ে যায়।

রাহুল বৈশালীর চেয়ে সাড়ে চার বছরের বড়। স্বাস্থ্য এবং হাইট, দুইই ভাল। ছাত্র হিসেবে মোটামুটি ব্রাইট। স্কুল ফাইনালে স্টার, হায়ার সেকেণ্ডারিতে রেজাল্ট কিছুটা নেমে এসে দুটো লেটার সুদ্ধ ফার্স্ট ডিভিসন, বি. এ'তে হাই সেকেণ্ড ক্লাস। এম. এ'তেও তার বেশি হবে বলে মনে হয় না। সে অ্যাভারেজ আর ব্রিলিয়ান্টের মাঝামাঝি। মুখটা গোল, চুলের একটা দিক সামান্য খাড়া খাড়া—বয়সের তুলনায় তাকে ছেলেমানুষ দেখায়।

রাহুল একা আসে নি, সঙ্গে রয়েছে তার বন্ধু অমল। মাঝারি হাইটের স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ চেহারা। চোখে মেটাল ফ্রেমের ফ্যাশনেবল চশমা। লম্বাটে মুখ। দুই বন্ধুর স্বভাবে মিল নেই বললেই হয়। রাহুলের তুলনায় অনেক ধীর স্থির এবং গম্ভীর। এ বছর তারা একসঙ্গে এম. এ দিয়েছে।

গলা চড়িয়ে অমলকে কী বলতে বলতে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এসেছিল রাহুল। হঠাৎ খেয়াল হল সুচরিতা টিভি দেখছেন। এই সময়টা বাড়িতে এক ধরনের মার্শাল ল জারি করা থাকে। চেঁচানো, জোরাল আওয়াজ করা—সব বারণ। তিনটি ঘন্টা কোনোভাবে সুচরিতা বিরক্ত হন বা তাঁর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়, এমন কিছু করা চলবে না।

রাহুল গলা নামিয়ে অমলকে বলল, 'মাতৃদেবী সিরিয়াল দেখছেন। এখন নো আর্গুমেন্ট। চুপচাপ চলে আয়।'

অমল প্রায়ই এ বাড়িতে আসে। সুচরিতার টিভি দেখার সঙ্গে আনুষঙ্গিক যা যা জড়িত, সব তার জানা। উত্তর না দিয়ে একটু হাসল শুধু।

খাটে শুয়ে রাহুলদের লক্ষ করছিল বৈশালী। ওদের কথাবার্তা অস্পষ্টভাবে কানে আসছিল। সে দেখতে পেল, ওরা নিঃশব্দে ড্রইংরুমের মাঝামাঝি চলে এসেছে।

নিজের ঘরে যেতে যেতে হঠাৎ রাহুলের নজর এসে পড়ে বৈশালীর ওপর। কী ভেবে কোনাকুনি ক'পা এগিয়ে তার ঘরের সামনে চলে আসে। অমলও সঙ্গে এসেছে।

রাহুল জিজ্ঞেস করল, 'কি রে, তুই বাড়িতে রয়েছিস! তোর ব্রিগেড তোকে টেনে বার করে নি?' বৈশালীর বন্ধুদের মজা করে ব্রিগেড বলে সে।

আস্তে আস্তে উঠে বসে বৈশালী। এখন কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। খুব সংক্ষেপে জানালো, 'বেরিয়েছিলাম।'

'এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি যে?'

'আমি সাতটার পর বাইরে থাকি?'

তড়বড় করে রাহুল বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন একা একা শুয়ে থাকতে হবে না। আমার ঘরে আয়।'

বৈশালী জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'কেন আবার, আড্ডা মারব।' বলে হাত তুলে একটা সুদৃশ্য পলিথিনের প্যাকেট দেখায় রাহুল, 'তা ছাড়া, এটাতে কী আছে জানিস?'

আগে প্যাকেটটা লক্ষ করে নি বৈশালী। জিজ্ঞেস করল, 'কী আছে?'

'লেটেস্ট পপ-এর ক্যাসেট। সবে মার্কেটে বেরিয়েছে। শুনবি চল।'

দুই ভাই বোনই পপ সঙ্গীত দারুণ পছন্দ করে। রাহুলের ঘরে মিউজিক সিস্টেম রয়েছে। বৈশালী বলল, 'মা কিন্তু এখন টিভি দেখছে।'

রাহুল বলে, 'আমি কি জোরে চালাব? ভলিউম খুব নিচু করে রাখব।'

অমল এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার বলল, 'এস না বৈশালী। গানগুলো দারুণ হিট করেছে। য়ু উইল এনজয়।'

অমল তিন চার বছর এ বাড়িতে নিয়মিত যাওয়া-আসা করছে। গোড়ার দিকে আসত বন্ধুর সঙ্গে চুটিয়ে গল্প টল্প করতে। পরীক্ষা টরীক্ষার আগে দু'জনে একসঙ্গে খুব সিরিয়াসলি পড়াশোনাও করত। পরে অমলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুটি সামান্য সরে যায়। বন্ধুর চেয়ে বন্ধুর বোনের ব্যাপারে বেশি মনোযোগী হয়ে ওঠে।

মেয়েরা হল উইকার সেক্স। শারীরিক দিক থেকে দুর্বল হলেও তাদের ইন্দ্রিয়গুলো পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি প্রখর। অমল সেভাবে কখনও তাকে কিছু বলে নি। সে চাপা, অন্তর্মুখী ধরনের যুবক, প্যাশনকে গোপন রাখার কৌশল ভালই জানে।

কিন্তু অমলের চালচলন, কথাবার্তার ভঙ্গি, তাকানো—এ সবের মধ্যে অনেক ইঙ্গিত থাকে। সেগুলো না-বোঝার মতো অতটা সরলা বালিকা নয় বৈশালী। অমলকে মোটামুটি তার ভালই লাগে। কারণ দাদার এই প্রিয় বন্ধুটি ভদ্র, শান্ত; তার আচরণ কখনও শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যায় না।

বৈশালী বলল, 'না অমলদা, গানটান শুনতে এখন একদম ইচ্ছে করছে না।'

অমল সামনের দিকে খানিকটা এগিয়ে আসে, 'কী ব্যাপার—মুড অফ?'

বৈশালী উত্তর দেয় না।

বন্ধুর এই সহোদরাটিকে এখনও ভাল করে বুঝে উঠতে পারে নি অমল। এমনিতে দারুণ হাসিখুশি, প্রাণবন্ত। রসিকতার মর্ম বোঝে। মজার কথা বললে ততোধিক মজাদার উত্তর আসে তার কাছ থেকে। অমলের মনে হয়, এ সবই মেয়েটার বাইরের দিক। ভেতরে এমন কিছু আছে—গভীর এবং অদৃশ্য, গোপন আর রহস্যময়—যার নাগাল পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সেখানকার প্রবেশ পথটি যে কোথায়, তিন চার বছর এ বাড়িতে আনাগোনা করেও তার হদিস মেলে নি।

অমল বৈশালীকে এমন চুপচাপ আর বিমর্ষ কখনও দেখে নি। শুধু তাই না, বেশ চিন্তাগ্রস্তও। রীতিমত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কোনো কারণে আর য়ু ডিসটার্বড?'

এবারও বৈশালীর জবাব পাওয়া যায় না।

রাহুলের ধৈর্য-টৈর্য কম। ভীষণ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল সে। হঠাৎ ঘরে ঢুকে বৈশালীর একটা হাত ধরে জোরে টান দেয়, 'কিসের ডিসটার্বড? ওল্ড হ্যাগার্ডদের মতো একা একা বসে থাকার মানে হয়? আয়—'

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বৈশালী কঠিন চোখে তাকায়, 'দাদা, ডোন্ট ইনসিস্ট। আমার কিছু ভাল লাগছে না। লিভ মি অ্যালোন। তোরা যা—'

কোনো কিছু তলিয়ে ভাবার মতো মানসিক গড়নই নয় রাহুলের। খেপে গিয়ে বলল, 'অত সাধাসাধির দরকার নেই। চল অমল—'

বন্ধুকে নিয়ে চলে গেল রাহুল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে বৈশালী। তারপর ধীরে ধীরে বিছানায় শরীর এলিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পুরনো চিন্তাটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

চিন্তার ফোকাসটা একসময় গতিপথ পালটে রাহুলের ওপর চলে যায়। বৈশালীর একার পক্ষে হয়তো মহিলাটিকে খুঁজে বার করা সম্ভব হবে না। কারো দিকে অ্যাকিউজিং ফিঙ্গার তুলতে হলে তার হদিস তো পাওয়া চাই। মহিলাকে একবার ধরতে পারলে সব্যসাচী সমেত দু'জনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়।

বৈশালী একবার ভাবল, বাবার অধঃপতনের বিবরণ দাদাকে জানিয়ে তার সঙ্গে মহিলাটি সম্পর্কে পরামর্শ করবে কিনা। পরক্ষণে মনে হল, রাহুলকে বলার সঙ্গে সঙ্গে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে দেবে। ওর পেটে কথা থাকে না। কোনো সমস্যা দেখা দিলে ভালভাবে না শুনেই চিৎকার জুড়ে দেয়। এমন উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে তাকে সামলানো মুশকিল হয়ে ওঠে। রাহুলের প্রতিক্রিয়া সবসময় তাৎক্ষণিক. এবং ভয়ানক উগ্র।

যে অস্বস্তিকর প্রবলেমটি আজ বৈশালীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, দাদাকে বলার সঙ্গে সঙ্গে সারা ফার্ন রোড জেনে যাবে। অথচ এটা এমন এক পারিবারিক লজ্জা যা হাট করে বলা যায় না। লোক জানাজানি হলে পাড়ায় মুখ দেখানো যাবে না।

সাহায্যকারীর তালিকা থেকে রাহুলের নামটা, অতএব নাকচ হয়ে যায়। না, আপাতত কাউকে বলবে না বৈশালী। নিজের মতো করে মহিলার খোঁজ চালাবে, বাবার গতিবিধির ওপর যতটা সম্ভব লক্ষ রাখবে। সলিড তথ্য প্রমাণ হাতে এলে কী করা উচিত, তখন ভেবে দেখবে।

চার

রাত পৌনে দশটায় সব্যসাচী ফিরে এলেন। নাক মুখ ধারাল, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, চওড়া কপাল, দৃঢ় চিবুক। হাতে অ্যাটাচি। সফল, কৃতী মানুষদের চেহারায় আলাদা ঔজ্জ্বল্য থাকে। সব্যসাচীকে ঘিরে তেমনই কিছু চোখে পড়ে। জ্যোতির ঝলমলে একটা বলয়।

ড্রইংরুমের দিকে মুখ করে আগের মতোই শুয়ে আছে বৈশালী। এর মধ্যে গান শুনে আড্ডা দিয়ে চলে গেছে অমল। যাবার সময় মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে দূর থেকে হাত নেড়েছিল। বৈশালীও অন্যমনস্কর মতো হাত নেড়েছে। না নাড়লে খারাপ দেখায়।

এখন সে লক্ষ করল, সব্যসাচী সিঁড়ির মুখে জুতো খুলে পা টিপে টিপে অ্যাটাচি কেসটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে সুচরিতার পাশাপাশি একটা সোফায় বসলেন।

সুচরিতা স্বামীর দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসলেন। সব্যসাচীও হেসে মৃদু গলায় কিছু বললেন। হাসির

আদান প্রদান হয়ে যাবার পর সুচরিতা ফের সিরিয়ালে মগ্ন হয়ে গেলেন।

অন্য দিন বাবা ট্যুর ফুর না থাকলে আগে ফিরে আসেন। তবে ড্রইংরুমে বসেন না, সোজা নিজের বেডরুমে চলে যান। গরম কালে স্নান টান করেন, শীতের সময় হাতমুখ ধুয়ে নেন। তারপর পোশাক পালটে অফিসের কাগজপত্র নিয়ে বসেন। অফিসটা তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে জুড়ে গেছে। মা কিন্তু ড্রইংরুম থেকে ওঠেন না। সাবিত্রীকে আগেই তার অবশ্য পালনীয় ডিউটিগুলি সম্পর্কে একশ বার তালিম দিয়ে রেখেছেন। সাবিত্রী টিভি দেখা স্থগিত রেখে বাবার ঘরে চা এবং খাবার দিয়ে আসে।

আজ কিন্তু সব্যসাচীর ওঠার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অনুগত, পত্নীপ্রেমিক স্বামীর মতো স্ত্রীকে সঙ্গ দেবেন বলে মনে হচ্ছে। গিল্টি কনসায়েন্স? বাইরে একটি যুবতীর সঙ্গে আমোদফুর্তি করে এসে হয়তো কিঞ্চিৎ গ্লানিবোধ হয়েছে। স্ত্রীকে সঙ্গদান করে সেটা ক্ষালন করতে চাইছেন। বুঝিবা স্বগতোক্তির ঢংয়ে বিড় বিড় করে নিজেকে শুনিয়ে বলছেন, বাইরে যাই করি না কেন, স্ত্রীকে অবহেলা বা উপেক্ষা করি না।

বাবা ফিরে আসামাত্র অন্য দিন তাঁর কাছে ছুটে আসে বৈশালী। তাঁকে সে যতটা শ্রদ্ধাভক্তি করে, তার চেয়ে বেশি ভালবাসে। সব্যসাচীর কাছে তার যত আবদার, তাঁর সঙ্গে যত খুনসুটি।

বৈশালী একদৃষ্টে তাকিয়েই আছে। স্ত্রীর কাছে সব্যসাচীর বসার ভঙ্গিটা এতই ঘনিষ্ঠ, মনে হয়, তাঁরা বিজ্ঞাপনের সেই 'মেড ফর ইচ আদার'। বাবার মুখে স্বর্গীয়, নিষ্পাপ একটু হাসি ফুটে আছে। কথার কচকচিতে-ভরা হাইলি মেলোড্রামাটিক, সুচরিতার এই সব থার্ড ক্লাস সিরিয়াল দেখার শখটাকে আগে আর এমন মর্যাদা দিতে তাঁকে দেখা যায় নি। পার্শ্ববর্তিনী সতীসাধ্বী রমণীটি জানেন না, তিনি কত বড় ফেরেববাজ।

সব্যসাচীর গায়ে অন্য একটি মেয়েমানুষের গন্ধ লেগে আছে, এটা কল্পনা করতেই গা ঘিন ঘিন করে ওঠে বৈশালীর। আজ সকালেও যাঁকে নিষ্কলঙ্ক বাবা, একনিষ্ঠ স্বামী, নিবেদিত-প্রাণ পরিবারের কর্তা বলে মনে হয়েছে, কয়েক ঘন্টার ভেতর তাঁর সম্বন্ধে ধারণাটা পুরোপুরি ওলটপালট হয়ে গেছে। ওই যে পঁচিশ ফুট দূরত্বে সুচরিতার পাশে যে লোকটা বসে আছে সে যেন আজন্মের পরিচিত তার বাবা নন—অচেনা কেউ। ঘৃণ্য, নোংরা এবং প্রতারক। আচমকা সব্যসাচীর জীবনের 'আদার ওম্যান'টির অস্তিত্ব আজ জানা না গেলে তিনি চিরকাল বৈশালীর শ্রদ্ধাভক্তি আনুগত্য পেয়ে যেতেন।

একসময় সব রিচুয়াল মেনে সিরিয়াল দেখার পর্ব শেষ হয় সুচরিতার। টিভি বন্ধ করে উঠে পড়েন তিনি। সাবিত্রী, ময়না আর সব্যসাচীও উঠে দাঁড়িয়েছেন।

সুচরিতা সাবিত্রীকে বললেন, 'নিচে গিয়ে খাবার গরম কর।' ময়নাকে বললেন, 'তুইও যা। টেবল সাজিয়ে ফেল।'

ওবেলা হয়ে ওঠে না। এক একজনকে এক এক সময় বেরুতে হয়। কিন্তু একসঙ্গে বসে রাতের খাওয়াটা এ বাড়িতে বাধ্যতামূলক। অলিখিত নিয়ম চালু আছে, ঠিক সাড়ে দশটায় সবাইকে খাবার টেবলে হাজির থাকতে হবে।

যখন বৈশালীর ঠাকুরদা ঠাকুমা বাবা কাকারা ভবানীপুরে থাকতেন, পরিবার ছিল একান্নবর্তী, তখন থেকে এটা চলে আসছে। ফ্যামিলি টুকরো টুকরো হয়ে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়লেও তার হেরফের হয় নি। বৈশালীদের ফার্ন রোডের বাড়িতে তো বটেই, কাকার ফ্ল্যাটেও একই নিয়ম। জয়েন্ট ফ্যামিলির পুরনো ট্র্যাডিশনগুলো বংশের ছেলেরা পারতপক্ষে কেউ ভাঙে নি।

ডিনারটা নিছক একসঙ্গে বসে খাওয়া নয়, এর পেছনে একটা চমৎকার পরিকল্পনা আছে। দিনের বেলা তো হয়ে ওঠে না, তাই রাত্তিরে খাবার টেবলটা পারিবারিক গেট-টুগেদারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। খেতে খেতে নানা বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। বাড়ির নতুন রং কী হবে—পিংক, না লাইট ব্লু, কিংবা হোয়াইট অ্যাণ্ড গ্রিন; পুজোর ছুটিতে কোথায় বেড়াতে যাওয়া হবে—উটি, না নৈনিতাল, গোয়া, না কুলু মানালি; পুরনো ফ্রিজ পালটে এক্সচেঞ্জ অফারে কোন কোম্পানির নতুন ফ্রিজ আনা হবে—সমস্ত কিছু সকলের মতামত নিয়ে স্থির করা হয়। পুরোপুরি ডেমোক্রেটিক পদ্ধতি। একজনের সঙ্গে আর একজনের ভুল বোঝাবুঝি হলে সেটা মিটিয়ে নেবার জায়গা এই খাবার টেবল।

ফ্যামিলি মেম্বারদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য একসঙ্গে বসাটা ভীষণ জরুরি।

সাবিত্রী আর ময়না একতলায় নেমে গিয়েছিল। সব্যসাচী এবং সুচরিতাও তাঁদের বেডরুমে চলে গেছেন। ড্রইংরুমটা একেবারে ফাঁকা।

বৈশালী এখনও একভাবে কাত হয়ে শুয়ে আছে। সে আগেই ঠিক করে ফেলেছে, বাবা এবং ওই মহিলাটির কথা দাদাকে জানাবে না। সুচরিতার টিভি দেখার ব্যাঘাত ঘটবে বলে তাঁকেও বলতে পারে নি। বললে তাঁর কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে, তা ভেবে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। হয়তো কেঁদেকেটে দেওয়ালে মাথা ঠুকে বাড়ি তোলপাড় করে ফেলবে।

বৈশালী ভাবল, সোজাসুজি বাবাকে চার্জ করলে কেমন হয়? কিন্তু সলিড তথ্যপ্রমাণ হাতে না পেলে সরাসরি কনফ্রনটেশনে যাওয়া ঠিক হবে না। সব্যসাচী যদি তার অভিযোগ পুরোপুরি উড়িয়ে দেন? হয়তো বলবেন, ওটা তার চোখের ভুল। নিউ মার্কেটে কাকে দেখতে কাকে দেখেছে। না, অ্যাকিউজিং ফিঙ্গারটা এখনই তুলবে না, কৌশলে মহিলাটির ব্যাপারে জানতে চেষ্টা করবে।

শুয়ে শুয়ে বৈশালী লক্ষ করল, রাহুল তার ঘর থেকে বেরিয়ে একতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। তার কয়েক মিনিট পর সব্যসাচী আর সুচরিতা ওঁদের বেডরুম থেকে বেরুলেন। কথা বলতে বলতে ড্রইংরুমের মাঝামাঝি অব্দি গিয়ে কী ভেবে একবার রাহুলের ঘরের দিকে তাকালেন, তারপর তাঁদের নজর এসে পড়ল বৈশালীর দিকে।

সব্যসাচী বললেন, 'কি রে, এখনও শুয়ে আছিস যে? নিচে আয়।' বলে ওঁরা এগিয়ে গেলেন।

বৈশালী উত্তর দিল না। মানসিক দিক থেকে সে এমনই বিপর্যস্ত, এতটাই অস্থির যে খাওয়ার ইচ্ছা নেই। বিছানা থেকে তার ওঠার লক্ষণ দেখা গেল না।

মিনিট পাঁচেক বাদে সাবিত্রী এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। বলল, 'কী হল দিদি, সবাই তোমার জন্যে বসে আছে। এস—'

বৈশালী বলল, 'আমি খাব না।'

সাবিত্রী বলল, 'কী হয়েছে?'

বৈশালী খুব ঠান্ডা গলায় বলল, 'কিছু হয় নি। খাব না—ব্যস। তুমি যেতে পার।'

অন্য দিন টেবল সাজানো হলে, প্রথমেই নিচে নামে বৈশালী। আজ কী এমন হতে পারে? হতভম্ব সাবিত্রী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পায়ে পায়ে ড্রইংরুম পেরিয়ে একতলায় চলে গেল। বৈশালীর না-খাওয়ার কারণ সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন করতে তার সাহস হয় নি।

কিন্তু একা চুপচাপ, নির্জন বেডরুমে সব্যসাচী এবং সেই মহিলাটি সম্পর্কে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি যে ভেবে বার করবে তার উপায় নেই। সব্যসাচী এবার স্বয়ং হাজির হলেন। বললেন, 'সাবিত্রী গিয়ে বলল, তুই নাকি খাবি না?'

শুয়ে থাকা গেল না, আস্তে আস্তে উঠে বসে বৈশালী বলল, 'হ্যাঁ।' যেটা বলতে পারল না তা হল, 'তোমার সঙ্গে এক টেবলে বসে খেতে ঘেন্না লাগছে।'

'শরীর খারাপ হয়েছে?'

'না।'

'তা হলে?'

বিপর্যয়টা দৈহিক নয়, সম্পূর্ণ মানসিক এবং তার কারণ যে স্বয়ং সব্যসাচী সেটা বলা গেল না। সেই বিকেল থেকে বাবার বিরুদ্ধে সমস্ত অস্তিত্বের ভেতর একটু একটু করে বারুদ জমাচ্ছে। তাঁকে একা পেয়েও বিস্ফোরণটা ঘটানো যাচ্ছে না।

আসলে জন্মের পর থেকেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে বাবা সম্পর্কে পরিষ্কার কনসেপ্ট বা ধ্যানধারণা তৈরি হয়ে যায়। বাবা 'ক্যান ডু নো রং'। তাঁর কোনো কাজের বা কথার প্রতিবাদ করতে নেই। তাঁকে সর্বক্ষণ মান্য কর, ভজনা কর। তিনি যা বলবেন বা করবেন, চোখ বুজে মেনে নাও। সন্তানরা এমন কিছু করবে না যাতে তাঁর মর্যাদার হানি হয়। ছেলেমেয়ের নিঃশর্ত আনুগত্যই বাবার প্রাপ্য। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ ইত্যাদি।

এতকাল এইভাবেই ভেবে এসেছে বৈশালী। শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা—সব মিলিয়ে মনের ভেতর

সব্যসাচীর একটা উজ্জ্বল আইকন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেটা এমনই বিশাল, এতই পরাক্রান্ত যে হঠাৎ তাকে আঘাত হানা প্রায় অসম্ভব।

সব্যসাচী এগিয়ে এসে হাত ধরে বৈশালীকে টেনে তুললেন। বললেন, 'বোকা মেয়ে, সারা রাত না খেয়ে থাকলে কাল শরীর ভীষণ দুর্বল লাগবে না? আয়—'

এই সব্যসাচী বৈশালীর চেনা—স্নেহময়, কোমল, সন্তানের প্রতি মনোযোগী। তাঁকে বাধা দেবার শক্তি তার নেই।

সব্যসাচী মেয়ের কাঁধে একটা হাত রেখে সিঁড়ির দিকে চললেন। নিঃশব্দে বৈশালী তাঁর পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। ভালও লাগছে, আবার ঘৃণাবোধও রয়েছে। এক মিশ্র অনুভূতি।

নিচে এসে রেক্টাঙ্গুলার টেবলের এক মাথায় নিজের নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসলেন সব্যসাচী এবং ডান পাশে মেয়েকে বসালেন। তাঁর বাঁ ধারে সুচরিতা আর রাহুল বসে আছে। এই অর্ডারেই রোজ রাতে এ বাড়ির সবাই খেতে বসে।

সকলের সামনে খালি প্লেট গ্লাস ফর্ক চামচ ইত্যাদি সাজানো রয়েছে। মাঝখানে নানা আকারের পোর্সিলিনের পাত্রে ভাত ডাল মাছ মাংস নিরামিষ তরকারি রুটি স্যালাড। ভাত-রুটি মিলিয়ে এ বাড়িতে খাওয়ার রেওয়াজ। শেষ পাতে একটা সুইট ডিশ থাকে। কোনোদিন পায়েস, কোনোদিন পুডিং, রাঙা আলুর পুলি বা আইস ক্রিম।

খানিক দূরে কিচেনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সাবিত্রী আর ময়না। ডিনারের সময় দরকার হলে ওদের ডাক পড়ে। যতক্ষণ না খাওয়া হচ্ছে, অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে ওদের খাড়া থাকতে হয়।

মাছ মাংসের পাত্রগুলো থেকে ধোঁয়া উড়ছে। কিছুক্ষণ আগে ওগুলো গরম করা হয়েছে।

বড় হাতায় করে সবার পাতে ভাত, প্লেটে প্লেটে ডাল, তরকারি, মাছ মাংস টাংস দিলেন সুচরিতা। রাহুল মাছ একেবারেই পছন্দ করে না, তাকে বাটি ভর্তি করে মাংস দেওয়া হল। সব্যসাচী দুপুরে বাড়িতে খান না, ন'টায় তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয়। ছুটির দিন ছাড়া লাঞ্চটা বাইরে খান। স্বামীর দুপুরের খাওয়া নিয়ে খুব চিন্তা সুচরিতার। কী ছাতামাথা খান, পেট ভরে কিনা, কে জানে। রাত্তিরে তাই তাঁকে ঠেসে ঠেসে খাওয়ান। সব্যসাচীর জন্য একটা বড় রুই মাছের মুড়ো রেখে দিয়েছিলেন। সেটা তাঁর পাতের কাছে সাজিয়ে দিয়েছেন।

খেতে খেতে কথা হচ্ছিল।

সুচরিতার কণ্ঠস্বর খুব মৃদু, কখনও উঁচুতে ওঠে না। আজ কিন্তু বেশ একটু কড়া সুরে বৈশালীকে বললেন, 'কী হয়েছে? খাবার জন্যে এত ডাকাডাকি করতে হচ্ছে কেন?' বোঝা যাচ্ছে, তিনি বেশ বিরক্ত হয়েছেন।

বৈশালী উত্তর দিল না। পাতের এক পাশে একটুখানি ডাল ঢেলে অন্যমনস্কর মতো মাখতে লাগল।

সব্যসাচী বললেন, 'খাবে না বলছিল।'

সুচরিতা বললেন, 'খাবে কী করে? ওর বন্ধুগুলো এসেছিল। নিশ্চয়ই চাট-মাট, ফুচকা টুচকা খেয়েছে। ও সব খেলে খিদে থাকে! এই করে পেটটা শেষ করবে।'

সব্যসাচী বললেন, 'এই বয়েসের ছেলেমেয়েরা আজকাল এ সব খাচ্ছে। চারদিকে কত ফাস্ট ফুডের দোকান। তুমি তো রাস্তায় বেশি বেরোও না। ফুড হ্যাবিট কত যে পালটে যাচ্ছে!'

'পালটাক। বাঙালির পেটে অত ঝাল মশলাওলা নর্থ ইণ্ডিয়ান হাবিজাবি খাবার কী সয়!'

সব্যসাচী হাসলেন। তাঁর স্ত্রীটি যে টিপিক্যাল বঙ্গলক্ষ্মী মার্কা মহিলা, সেটা তাঁর চাইতে ভাল আর কে জানে। বাঙালির রান্নাবান্না, বাঙালির পোশাক আশাক, গয়নাগাটি, বাংলা গান, বাংলা সিনেমা থিয়েটার—এ সবের বাইরে তিনি একটি পাও ফেলবেন না। একেবারে অনড় এবং অপরিবর্তনীয়। শক্ত মুঠোয় বাঙালি ট্র্যাডিশনের ঝুঁটি ধরে ফার্ন রোডের এই বাড়িতে তিনি বসে আছেন।

ওধার থেকে রাহুল হঠাৎ বলে ওঠে, 'জানো বাবা, তনির আজ কী যেন হয়েছে! সামথিং মাইট বি রং।'

সুচরিতা বললেন, 'টিভি দেখতে দেখতে আমিও লক্ষ করেছিলাম, সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে তনি ওর ঘরে চুপচাপ শুয়ে রইল। কিছুক্ষণ বাদে রণো আর অমল এসে কত ডাকাডাকি করল। অন্যদিন

দাদাদের সঙ্গে কত আড্ডা দেয়, আজ বিছানা থেকে উঠলই না।'

বৈশালী ভাত নাড়াচাড়া করতে করতে এক পলক মায়ের দিকে তাকাল। যে সুচরিতার টিভি দেখার সময় বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়ে যায়, তাঁরও তা হলে সন্ধেবেলায় তার ওভাবে শুয়ে থাকাটা অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। বৈশালী কিছু বলল না।

সব্যসাচী মেয়ের দিকে ফিরে মজার গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে, বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া টগড়া হয়েছে?'

বৈশালী নিচু গলায় বলল, 'উই আর সাফিসিয়েন্টালি গ্রোন-আপ। ঝগড়া করব কেন?'

'য়ু আর জলি গুড গার্ল। সবাইকে আনন্দে মাতিয়ে রাখিস।' সব্যসাচী বলতে লাগলেন, 'এত ডিপ্রেসনের কারণটা কী?'

অমলও এই ধরনের কিছু বলেছিল। অর্থাৎ তার চুপচাপ হয়ে থাকাটা সকলেরই নজরে পড়েছে। বৈশালী বলল, 'কোথায় ডিপ্রেসন? আমি ঠিক আছি।'

আর কোনো প্রশ্ন করলেন না সব্যসাচী। খাওয়ার দিকে বেশি করে মন দিলেন। খেতে তিনি ভালবাসেন। একসময় তাঁর খেয়াল হল, পাতের পাশে বিরাট প্লেটে রুই মাছের মস্ত মুড়োটি গোটা ডাইনিং টেবল আলো করে রেখেছে। আদা বাটা, পেঁয়াজবাটা, বাদামবাটা এবং প্রচুর ঘি তেল মশলা দিয়ে রান্না করা ঘন ঝোলে রয়েছে কিসমিস আর টুকরো টুকরো আলু। প্লেটটা থেকে ধোঁয়ার সঙ্গে উঠে আসছে প্রাণ-মাতানো সুগন্ধ।

মাছের মুড়ো টুড়োগুলো চিরকাল পরিবারের কর্তাদের ভাগেই পড়ে। এটা নিয়ম হিসেবে চলে আসছে। বৈশালী এবং রাহুল মাছ টাছ ছুঁতে চায় না। মুড়োর কাঁটা বেছে খাবে, অত ধৈর্য ওদের নেই। স্ত্রীকেও কোনোদিন সব্যসাচী বলেন নি, আজ তুমিই খাও। মুড়োর সর্বস্বত্ব তাঁর জন্যই সংরক্ষিত। আজ এক কাণ্ডই করে বসলেন সব্যসাচী। আচমকা মুড়োসুদ্ধু প্লেটটা সুচরিতার পাতে ঢেলে দিলেন।

সুচরিতা চমকে উঠেছিলেন, 'এ কী, এ কী, আমাকে দিচ্ছ কেন?'

সব্যসাচী হেসে হেসে বললেন, 'তনি আর রণোকে দিলে তো খাবে না। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে, তুমি খাও।'

সুচরিতা মুহূর্তে কোনো টাইম মেশিনে চড়ে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর আগের এক নবীনা কিশোরী হয়ে গেলেন। মুখ লাল হয়ে উঠেছে তাঁর। স্বামীর দিকে লাজুক দৃষ্টি হেনে বললেন, 'তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।'

সুচরিতাই শুধু চমকে ওঠে নি। চমকটা বৈশালীর মস্তিষ্কের ভেতর দিয়েও খেলে গিয়েছিল। একবার এক জাগলারকে দু হাতে দশটা রঙিন বল নিয়ে দুরন্ত গতিতে লোফালুফি করতে দেখেছিল। লোকটা প্রায় পনের মিনিট ধরে একটানা খেলাটা দেখিয়েছিল। একটা বলও হাত ফসকে মাটিতে পড়ে নি। তেমনই কোনো সুচতুর ভোজবাজি চালিয়ে যাচ্ছেন সব্যসাচী। দুটি নারীকে নিয়ে খেলছেন। তিনি জানেন, এ জাতীয় খেলায় স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখা দরকার। সুচরিতা যাতে ঘুণাক্ষরে টের না পান, স্বামী অন্য কোথাও মজা লুটছেন। তিনি যে তাঁর প্রতি উদাসীন নন, আগের মতোই মনোযোগী, আগের মতোই তাঁকে ভালবাসেন, সর্বক্ষণ তার প্রমাণ দাখিল করে যেতে হবে। পাতের মুড়ো তুলে দেওয়াটা তারই নমুনা। স্ত্রী যদি তাঁর আচরণে সন্দিগ্ধ হন, তা হলেই বিপদ। 'অল কোয়ায়েট অন দা ডোমেস্টিক ফ্রন্ট'—এটা বজায় রেখে যেতে পারলেই হল।

অসহ্য রাগে মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে বৈশালীর। তিরিশ বছর মা-বাবার বিয়ে হয়েছে। সে শুনেছে, এর মধ্যে মা বাবাকে ছেড়ে বেশিদিন কোথাও গিয়ে থাকেন নি। বাপের বাড়ি তো এই কলকাতা শহরেই, সেখানে গেলেও দু'দিন বাদেই ফিরে এসেছেন। পাশাপাশি এতকাল কাটিয়ে দিলেন, সব্যসাচীর দু'দুটো সন্তানের মা হলেন, চব্বিশ ঘন্টা একসঙ্গে ওঠাবসা চলাফেরা, পরস্পরের শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে দু'জনে জড়িয়ে আছেন। অথচ সুচরিতা টেরই পেলেন না তাঁর স্বামীটি কতটা লম্পট। বেড়ালের মতো বাইরে হাঁড়ি চেটে মুখ মুছে রোজ যে বাড়ি ফিরে আসেন, তাঁর সঙ্গে হাসিঠাট্টা গল্প করেন, রাত্তিরে পাশে শুয়ে ঘুমোন কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেন না। আশ্চর্য!

বৈশালী লক্ষ করল, তিরিশ বছরের স্বামী এবং প্রেমিকের উপহার সেই মাছের মুড়োটা ভেঙে

বিগলিত ভঙ্গিতে কাঁটা চুষে চুষে খাচ্ছেন সুচরিতা। তার বোকা সরল জননীটি জানেন না, কত বড় একটা জুয়াচোর অনুগত স্বামীর ছদ্মবেশে তাঁর পাশে বসে আছে। মায়ের ধারণাই নেই, তাঁর এত বছরের দাম্পত্য জীবনের ভিতের তলায় চোরা স্রোত ঢুকে কতখানি সর্বনাশ ঘটিয়ে দিয়েছে।

খাবার টেবলে যে স্বর্গীয় প্রেমের দৃশ্যটি তৈরি হয়েছে, এই মুহূর্তে তা চুরমার করে দিতে পারে বৈশালী। প্রচণ্ড রাগটাকে অনেক কষ্টে সামলে নিল সে। নিজেকে বোঝাল—না, এখন নয়।

রাহুল খুব হাসছিল। গভীরভাবে কিছু চিন্তা করার শক্তিই তার নেই। বলল, 'বাবা, য়ু আর রিয়েলি গ্রেট—'

কপালে সামান্য ভাঁজ ফেলে সব্যসাচী বললেন, 'মানে?'

'অতবড় মাছের মুড়োটা মাকে দিয়ে দিলে! তোমার স্যাক্রিফাইসের তুলনা হয় না।'

সব্যসাচী হেসে ফেললেন।

রাহুল এবার বলল, 'তোমার লাভ ফর ওয়াইফ শুধু দু'জনের সঙ্গে কমপেয়ার করা চলে। শাজাহান আর এডোয়ার্ড দ্য এইটথ। ওদের এক্জিবিশনের বিশাল ম্যাগনিটিউড; হোল ওয়ার্ল্ডের মানুষ জানে। আমি তনি সাবিত্রীদি আর ময়না ছাড়া তোমারটা অন্য কেউ জানতেই পারল না।'

সব্যসাচী হাসতে হাসতে যেন গড়িয়ে পড়বেন। বললেন, 'দারুণ বলেছিস। ফ্যানটাস্টিক।' বাইরে প্রচণ্ড রাশভারি অফিসার হলেও ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার বন্ধুর মতো।

সুচরিতা সোজা উঠে দাঁড়ালেন। রাগত সুরে ছেলেকে বললেন, 'অসভ্য বাঁদর ছেলে। মা-বাবার সঙ্গে এরকম ইয়ার্কি করতে হয়! আমি খাব না।'

সব্যসাচী স্ত্রীকে ফের বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'আরে বাবা, এত খেপে গেলে চলে! ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে। দে আর লাইক আওয়ার ফ্রেণ্ডস।'

সুচরিতা ঘাড় গোঁজ করে দুই হাত কোলের কাছে রেখে বসে রইলেন, স্বামীর কথার উত্তর দিলেন না।

রাহুল মায়ের ডান হাতটা তুলে তাঁর প্লেটে রখে আদুরে গলায় বলল, 'মাই ডিয়ার মাম্মি, তুমি না খেলে আমরাও কিন্তু খাব না।'

বাঁ হাতে ছেলের গালে আলতো চাপড় মেরে সুচরিতা বললেন, 'পাজি কোথাকার!'

আবার খাওয়া শুরু হল। এ বাড়ির ডিনারটা কার্নিভালের মতো ব্যাপার। হাসি ঠাট্টা এবং মজায় জমজমাট।

খেতে খেতে সব্যসাচী স্ত্রীকে বললেন, 'এবার পুজোর ছুটি কোন মাসের কত তারিখে পড়েছে জানো?'

সুচরিতা বললেন, 'না তো।'

'তেত্রিশ কোটি দেবদেবী নিয়ে এত মাতামাতি কর, ঠাকুর ঘরে রোজ দু ঘন্টা করে কাটাও, আর বাঙালির সব চেয়ে বড় ফেস্টিভ্যালটারই খবর রাখ না!'

'সবে তো মে মাস। পুজোর এখনও অনেক দেরি।'

'খুব একটা দেরি কোথায়! অক্টোবরের আর্লি পার্টে পুজোর তারিখ পড়েছে। দেখতে দেখতে এসে যাবে।'

একটু অবাক হয়ে সুচরিতা জিজ্ঞেস করলেন, 'হঠাৎ পুজোর চিন্তা মাথায় ঢুকল কেন?'

সব্যসাচী বললেন, 'বা রে, বেড়াতে যাব, এখন থেকে তার একটা প্ল্যান করতে হবে না?'

পুজোর ছুটিতে দেশভ্রমণ এ বাড়ির বহুকালের রেওয়াজ। পুজো আসবে আর সব্যসাচী সপরিবারে বেড়াতে যাবেন না, এটা ভাবা যায় না। পুজোর ছুটির সঙ্গে দশ পনের দিন আর্নড লিভ জুড়ে তাঁরা বেরিয়ে পড়েন।

সব্যসাচী বলতে লাগলেন, 'ট্র্যাভেল এজেন্টকে বলে অ্যাডভান্স টিকেট কাটিয়ে রাখতে হবে, হোটেল বুক করতে হবে। আজকাল মুখের কথায় ট্র্যাভেল হয় না। সো মেনি ঝঞ্ঝাট। তবে সব চাইতে যেটা আর্জেন্ট তা হল সিলেকশন অফ প্লেস—কোথায় যাওয়া হবে?'

রাহুল হই হই করে উঠল, 'বাবা, লাস্ট থ্রি ফোর ইয়ারস ধরে বলে আসছি সিঙ্গাপুর-ব্যাঙ্কক-

কুয়ালালামপুর চল। এই ব্যাপারটা এ বছর নয় ও বছর করে তুমি ঝুলিয়ে রেখেছ। 'এবার কিন্তু তোমাকে ছাড়ছি না।'

স্ত্রীর দিকে ফিরে সব্যসাচী জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মনোবাসনাটা জানাও।'

এ বাড়িতে লিবারেল গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু আছে। পরিবারের সর্বময় কর্তা বলে নিজের মতামত অন্যের ওপর কখনও চাপিয়ে দেন না সব্যসাচী। যা কিছু ঠিক করা হয় সবই কনসেনসাসের ভিত্তিতে।

সুচরিতা বললেন, 'সাউথ ইণ্ডিয়ায় দু'বার গেলেও কর্নাটকে যাওয়া হয় নি। বাঙ্গালোর নাকি দারুণ সুন্দর শহর। গোটা স্টেটটাই চমৎকার। এবার ওখানেই চল।'

দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের কাঁটার মতো সব্যসাচীর আঙুল এবার বৈশালীর দিকে ঘুরে গেল। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই কোথায় যেতে যাস?'

সব্যসাচীকে পলকহীন লক্ষ করে যাচ্ছিল বৈশালী। লোকটা কী চতুর অভিনেতা! একই সঙ্গে স্নেহশীল বাবা, অনুরক্ত স্বামী, পরিবারের কর্তব্যপরায়ণ কর্তার রোলে কী দুর্দান্ত অভিনয়ই না করে চলেছে! রুপোলি পর্দার মেগাস্টার সুপারস্টাররা এর পায়ের তলায় বসে পাঁচ বছর অ্যাক্টিংয়ের তালিম নিতে পারে। স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ের শখ সাধ মেটাতে, তাদের আনন্দে রাখতে লোকটার কত না চিন্তা!

এই সব্যসাচীকে আজন্ম দেখে আসছে বৈশালী। যত দেখেছে ততই অভিভূত হয়েছে। কিন্তু কে ভাবতে পেরেছিল হিমশৈলের এটা ওপরের অংশ। নিচের দিকে কত কী গোপন রয়েছে, নিউ মার্কেটে ওই মহিলাটিকে দৈবাৎ দেখে না ফেললে তার বিন্দুমাত্র আভাসও কোনোদিন পাওয়া যেত না। লোকটাকে কয়েক ভাগে ভাগ করলে তার কোন অংশটা বাবা, কোন অংশটা দায়িত্বশীল অফিসার এবং ভদ্র নাগরিক, আর কোন অংশটা ধূর্ত লম্পট, আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে না। কী অদ্ভুতভাবেই না একটার সঙ্গে আরেকটা মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।

সব্যসাচী তাড়া লাগালেন, 'কি রে তনি, চুপ করে আছিস যে! বল—'

মহিলাটিকে আজ না দেখলে, দাদার মতোই হইচই বাধিয়ে বলত, 'রাজস্থান।' পাহাড়, মরুভূমি, বিরাট আকাশছোঁয়া দুর্গ উট ময়ূর আর মধ্যযুগের রাজপুত যোদ্ধাদের অসীম বীরত্বের ইতিহাস— সব মিলিয়ে রাজস্থানের তুলনা নেই। ভারতবর্ষে এমন একটা জায়গা থাকতে পারে, ভাবাই যায় না। কিন্তু আজ কিছুই ভাল লাগছে না বৈশালীর। শুকনো, নিরুৎসুক সুরে বলল, 'এখনও তো অনেক দেরি আছে। পরে ভেবে দেখব।'

সব ব্যাপারেই রাহুলের তাড়াহুড়ো। তার তর সইছিল না। সে বলে, 'অত ভাবাভাবির কী আছে! এক্ষুনি বল—' আজই ভ্রমণের প্রোগ্রামটা ঠিক করে ফেলতে চাইছে সে।

বৈশালী উত্তর দিল না।

টেবলের ওপর দিয়ে বোনের দিকে ঝুঁকে রাহুল বলল, 'সিঙ্গাপুর ব্যাঙ্কক কুয়ালালামপুরের ওপর স্ট্রেসটা দে। তোর ভোটটা পেলে মাকে ম্যানেজ করে ফেলব। তিনটে ভোট একদিকে হলে বাবা কর্নার হয়ে যাবে। প্লিজ তনি, না বলবি না।'

বৈশালী এবারও চুপ।

ফের কী বলতে যাচ্ছিল রাহুল, তাকে থামিয়ে দিলেন সব্যসাচী, 'কেন জোর করছিস? ও দু তিনদিন পরেই না হয় বলবে।' খুব মনোযোগ দিয়ে কিছুক্ষণ খাওয়ার পর বললেন, 'দ্যাখ রণো, আমার যা বাজেট তাতে সিঙ্গাপুর টুর হবে না। ইন্ডিয়ার কোনো একটা স্পট ঠিক কর—হিল স্টেশন, সী-শোর অর রিজার্ভ ফরেস্ট টরেস্ট।'

উত্তেজিত রাহুল হাত ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমি জানতাম। কোনো বছরই তো তোমার বাজেট পারমিট করে না। ইণ্ডিয়ায় দেখার আছেটা কী? আমি তোমাকে সুইজারল্যাণ্ড ভেনিস যাবার কথা বলছি না। ব্যাঙ্কক ট্যাঙ্কক কত আর দূরে! কী আর এমন খরচ হত! ইণ্ডিয়ার যে কোনো টুরিস্ট স্পটে গেলে যা লাগত তার চেয়ে না হয় থার্টি ফোর্টি থাউজেণ্ড এক্সট্রা।'

ছেলের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে খুব নরম গলায় সুচরিতা বললেন, 'অত রাগারাগি করতে নেই। বাবা যখন বলছে তখন নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধা আছে।'

বৈশালীর চোখ সুচরিতার দিকে ঘুরে যায়। কী বুঝদার স্ত্রী! স্বামীর খরচ বাঁচাবার জন্য ছেলেকে

কত ভাবে না শান্ত করতে চেষ্টা করছেন।

কিন্তু সহজে কি রাহুল ঠাণ্ডা হয়! গজ গজ করতে থাকে সে, 'যখনই বলি তখনই শুনি বাজেট কম। সিঙ্গাপুরে টুরে কোনোদিনই যাওয়া হবে না।'

সব্যসাচী বললেন, 'ডোন্ট বি ইমপেশেন্ট। নেক্সট ইয়ার পুজোর ছুটিতে আমাদের ডেস্টিনেশন সিঙ্গাপুর অ্যাণ্ড ব্যাঙ্কক অ্যাণ্ড—'

তাঁর কথার মধ্যেই রাহুল প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'প্রমিস?' তার দু চোখে খুশির ঝলক।

'প্রমিস—'

'থ্যাংক য়ু বাবা—'

ডাইনিং-রুমের আবহাওয়া ফের স্বাভাবিক হয়ে আসে।

অন্যমনস্কর মতো দেখে যাচ্ছিল বৈশালী। নিউ মার্কেটের সেই দৃশ্যটা মাথার ভেতর কাঁটার মতো বিঁধে আছে। ঠিকই করে ফেলেছিল, আজ কিছু জিজ্ঞেস করবে না। নিজেকে সংযত রাখবে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে অস্থিরতা চলছেই। হঠাৎ ফস করে, নিজের অজান্তেই, বলে ফেলে, 'আচ্ছা বাবা, প্রত্যেক উইকেই তো অফিস ছুটির পরও তোমার অনেক কাজ থাকে—না?'

সহজ সুরে সব্যসাচী বললেন, 'হ্যাঁ, থাকেই তো।'

'কী কাজ?'

'বেশির ভাগ দিনই আমাদের ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারির বাড়ি যাই। এত বড় একটা ডিপার্টমেন্ট। অ্যানুয়াল বাজেট কোটি কোটি টাকা। এই নিয়ে অনেক ডিসকাসন থাকে, যেটা অফিসে বসে সব সময় হয়ে ওঠে না। সারাক্ষণ ভিজিটর। সাব-অর্ডিনেটরা গণ্ডা গণ্ডা ফাইল নিয়ে আসছে, নানারকম ইনস্ট্রাকশন চাইছে। অফিসে সময়ের খুব সমস্যা। তা ছাড়া আমার ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে আরো অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়, তাদের কাছেও যাই।'

বৈশালী বলল, 'আজ কোথায় গিয়েছিলে?' প্রশ্নটা করেই সে বুঝল, এমন সরাসরি জিজ্ঞেস করা উচিত হয় নি। কিন্তু এখন আর কিছুই করার নেই। একটা অদৃশ্য ফ্লাড় গেট বোধ হয় খুলেই গেল। সেই স্রোত ঠেকানো যাবে কিনা কে জানে।

সব্যসাচী থমকে গেলেন। এ জাতীয় প্রশ্ন তো কখনও করে না মেয়েটা। এতক্ষণ যেটাকে নির্দোষ কৌতূহল মনে হচ্ছিল সেটা খুব সম্ভব ততখানি সাদাসিধে নয়; আপাত সারল্যের তলায় গোপন অর্থবহ কিছু আছে। স্থির দৃষ্টিতে বৈশালীকে দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা ভাবনা মাথার ভেতর চমক দিয়ে যায়। মেয়েটাকে আজ যে এত চুপচাপ, এত মুহ্যমান দেখাচ্ছে তার সঙ্গে কি ওর প্রশ্নটার কোনো সম্পর্ক আছে? খুব সতর্কভাবে তিনি বললেন, 'সেক্রেটারির বাড়ি গিয়েছিলাম। কেন?'

অবাক হয়ে বৈশালী দেখছে, কী মসৃণ মুখ করেই না লোকটা মিথ্যে বলে গেল! সেই বিকেল থেকে সব্যসাচীকে দুশ্চরিত্র মনে হচ্ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে চূড়ান্ত মিথ্যেবাদীও। অবশ্য মিথ্যে ছাড়া নিজের দুষ্কর্ম ঢেকে রাখবে কী করে?

সব্যসাচীর ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারিকে ভালই চেনে বৈশালী। দু-তিন বার তিনি তাদের ফার্ন রোডের বাড়িতেও এসেছেন। একবার তাঁকে ফোন করার কথাও ভাবল সে। পরক্ষণে মনে হল, এমনও তো হতে পারে, মহিলাটির সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়ে সব্যসাচী সেক্রেটারির বাড়ি গিয়েছিলেন। তা ছাড়া সেক্রেটারিকে ফোন করলে তিনি যদি জিজ্ঞেস করেন, বাবার গতিবিধি সম্পর্কে সে খোঁজখবর নিচ্ছে কেন? তখন কী উত্তর দেবে বৈশালী? ব্যাপারটা গোপনও থাকবে না। সেক্রেটারি সব্যসাচীকে তার ফোনের কথা নিশ্চয়ই জানিয়ে দেবেন।

না, সেই মহিলাটির আইডেনটিটি না জানা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল। বৈশালী বলল, 'এমনিই জিজ্ঞেস করেছি।'

উত্তরটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না সব্যসাচীর। মেয়েটার আজকের আচরণ, কথাবার্তা—সব কেমন যেন অস্বাভাবিক। মনের একটা দিক সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তাঁর। কিসের একটা অস্বস্তিকর সংকেত পেয়েও যেন পাচ্ছেন না।

মেয়েকে আর কোনো প্রশ্ন করলেন না সব্যসাচী। কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে চোখ

নামিয়ে নিলেন। তারপর শ্লথ ভঙ্গিতে চামচ দিয়ে পুডিং কাটতে লাগলেন।

ডিনার শেষ হলে সবাই দোতলায় উঠে যে যার ঘরে চলে গেল।

অন্যদিন এই সময়টা বৈশালী রাহুলের বেডরুমে গিয়ে খানিকক্ষণ গল্প টল্প করে, গান শোনে। কিন্তু আজ কিছুই ভাল লাগছে না।

খাবার টেবলে চেঁচামেচি রাগারাগি করে নেক্সট ইয়ারে সিঙ্গাপুর টুরে যাবার ব্যাপারটা বাবাকে দিয়ে প্রমিস করিয়ে নিয়েছে রাহুল। এত বড় একটা দিগ্বিজয়ের পর বোনের সঙ্গে খানিকক্ষণ হই চই করার ইচ্ছা ছিল তার। বৈশালীকে নিজের ঘরে নিয়ে যাবার জন্য টানাটানিও করেছিল। কিন্তু বৈশালী কোনোরকম উৎসাহ দেখায় নি। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের বেডরুমে এসে খাটে চুপচাপ বসে থাকে।

ড্রইংরুমের বড় ওয়াল ক্লকটায় এখন এগারটা বাজতে ছ'মিনিট বাকি। এ বাড়ির লোকজন বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকে না। কাঁটায় কাঁটায় এগারটা বাজলেই আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে।

একটু পরেই সমস্ত বাড়িটা ঘুমের আরকে ডুবে যাবে। বৈশালী জানে, আজ খুব সহজে তার ঘুম আসবে না। স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে আছে।

বৈশালী ঠিক করল, নিঝুম অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে স্মৃতিশক্তিকে ক্রমাগত উসকে দিয়ে সেই মহিলাটির কথা চিন্তা করে যাবে। এ বাড়িতে সব্যসাচীর কাছে যে এসেছিল সেটা মনে পড়েছে। তার নাম এবং ঠিকানাটাই শুধু ভেবে বার করতে হবে।

ড্রইংরুমে টেলিফোন বেজে উঠল।

এ বাড়িতে দুটো ফোন আছে। একটা মা-বাবার বেডরুমে, আর একটা ড্রইংরুমে। বাবার ফোন টোন তাঁর ঘরেই আসে। ড্রইংরুমেরটা বাকি সবার জন্য।

কাকা দুই পিসি এবং অন্য আত্মীয়স্বজনেরা এ বাড়ির ধাত জানে। এগারটা কি তার পরে ফোন করা মানে বিছানা থেকে বৈশালীদের টেনে তোলা। খুব একটা এমার্জেন্সি না হলে কেউ পারতপক্ষে এ সময় বিরক্ত করে না।

সারা দিন গোটা শহর চষে বেড়ালেও বাড়ি এসে একটা কুটোও নাড়তে চায় না রাহুল। ছেলে হয়ে জন্মানোর একস্ট্রা প্রিভিলেজ। অবশ্য আদরটা বৈশালীও খুব কম পায় না। তবু পাল্লাটা দাদার দিকেই ভারি। এখন ফোন ধরার জন্য সে ঘর থেকে কিছুতেই বেরুবে না।

ডিনারের পর সুচরিতা যদি একবার শুয়ে পড়েন, পৃথিবী রসাতলে গেলেও তাঁকে বিছানা থেকে তোলা যাবে না। হেড অফ দা ফ্যামিলি সব্যসাচীর তো কথাই নেই, তিনি উঠে এসে ফোন ধরবেন তা ভাবাই যায় না।

বৈশালী জানে, ফোনটা তাকেই ধরতে হবে। বিছানা থেকে সে উঠে পড়ে।

পাশাপাশি দুই বেডরুম থেকে রাহুল আর সুচরিতার গলা ভেসে আসে, 'দ্যাখ তো তনি কার ফোন।'

বৈশালী ড্রইংরুমে এসে ফোন তুলে 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে মধুরার গলা শোনা যায়। প্রথমটা অবাক হল সে, সেই সঙ্গে একটু দুশ্চিন্তাও হচ্ছে। আত্মীয়স্বজনদের মতো তার বন্ধুদেরও এ বাড়ির রীতিনীতি অভ্যাস এবং জীবনযাপন পদ্ধতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে। এ সময় তারাও কেউ ফোন করে না।

বৈশালী জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার মধু?'

মধুরা বলল, 'জানি, এত রাতে ফোন করলে তোদের ডিসটার্ব করা হয়। য়ু অল কিপ গুড আওয়ার্স। অনেক আগেই করতাম কিন্তু সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরতেই প্রবলেম। য়ু নো ইয়ার, আমার পেরেন্টদের মধ্যে ফর আ লং টাইম নাউ, একটা টেনসন চলছে। ভেরি ভেরি স্ট্রেইনড রিলেশানস। মাঝে মাঝে ইট টেকস অ্যান এক্সট্রিমলি ব্যাড শেপ। আজও একটা খারাপ ব্যাপার ঘটেছিল। সে সব ঝামেলা এখনকার মতো মিটতে সাড়ে দশটা বেজে গেল। টেম্পোরারি সিজ-ফায়ার। যে কোনোদিন যে কোনো সময় আবার ফ্লেয়ার আপ করবে। এই কারণে তোকে ফোন করতে দেরি হল।'

মধুরার মা-বাবার মধ্যে অনেকদিন ধরেই কী একটা সমস্যা চলছে। বিশদভাবে সে কখনও তা জানায় নি, বৈশালীও জানতে চায় নি। সেই ব্যাপারেই কি মধুরা তাকে কিছু বলবে? কোনোরকম পরামর্শ চাইবে? কিন্তু নিজের বাবাকে নিয়ে বৈশালী বিপর্যস্ত হয়ে আছে। এই অবস্থায় বন্ধুকে কী পরামর্শ দেবে? খুব সতর্কভাবে সে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু দরকার আছে?'

'হ্যাঁ।'

রাহুল আর সুচরিতা জিজ্ঞেস করেন, 'কার সঙ্গে কথা বলছিস?'

মাউথপিস থেকে মুখ সরিয়ে বৈশালী বলল, 'মধুরার সঙ্গে।'

কেউ আর কোনো প্রশ্ন করল না।

বৈশালী এবার মধুরাকে বলল, 'একটু হোল্ড কর।' টেলিফোনটার সঙ্গে অ্যাটাচড কর্ডলেস সেটও রয়েছে। কর্ডলেসটা তুলে হাতের ফোনটা নামিয়ে রেখে নিজের ঘরে ফিরে এসে বলল, 'কী দরকার বল—'

মধুরা বলল, 'সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে নিউ মার্কেটে কাকে দেখে যেন তুই দৌড়ে গেলি। ডাকাডাকি করলাম, ফিরেও তাকালি না, মার্কেটের ভেতর ভ্যানিশ হয়ে গেলি। আমাদের ভীষণ গুস্সা হল। প্রথমে ভাবলাম গোলি মার বৈশালীকো। পরে সুরূপা, মেঘনা আর আমার মনে হল, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। উই আর গুড, সিনসিয়ার ফ্রেন্ডস। একজনের কোনো প্রবলেম হলে তাকে হেল্প করা উচিত। উই শুড অ্যাণ্ড মাস্ট ডু সামথিং ফর য়ু।'

তা হলে নিজের মা-বাবার ব্যাপারে নয়, তার জন্যই ফোনটা করেছে মধুরা। শুধু সে-ই না, অন্য দুই বন্ধুও তাকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে রেখেছে। ওদের এই আন্তরিকতাটুকু খুব ভাল লাগল বৈশালীর।

মধুরা বলতে থাকে, 'সুরূপা আর মেঘনা তোকে ফোন করেছে?'

বৈশালী বলল, 'না।'

'আজ যখন করে নি, কাল নিশ্চয়ই করবে। এবার বল, তোর কি কোনো প্রবলেম হয়েছে?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে বৈশালী। তার বন্ধুরা বিশ্বাসযোগ্য, আন্তরিক, কিছু বললে ঢাক পিটিয়ে চারদিকে চাউর করে বেড়াবে না। সেই বিকেল থেকে রাগে যন্ত্রণায় কষ্টে সে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। একসঙ্গে চারদিক থেকে মনের ওপর এতগুলো চাপ সহ্য করতে পারছে না। বন্ধুদের জানালে হয়তো ভাল পরামর্শ পাওয়া যাবে। মেজ কাকা এবং পিসিদের জানানো যায়, ছোট কাকাকেও লণ্ডনে চিঠি লেখা যেতে পারে। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া কতটা তীব্র হবে, বোঝা যাচ্ছে না।

বৈশালী খুব আস্তে বলল, 'হ্যাঁ, প্রবলেম একটা হয়েছে।'

'কী সেটা?' যে মধুরা কোনো সমস্যাকেই গুরুত্ব দেয় না, তুড়ি মেরে সব উড়িয়ে দেয়, গলা শুনে মনে হল সে বেশ উৎকণ্ঠিত।

বৈশালী উত্তর দিল না।

মধুরা স্বর উঁচুতে তুলে বলল, 'কী হল? বলবি তো। এনিথিং পার্সোনাল?'

বৈশালী বলল, 'না।'

'ফ্যামিলি-রিলেটেড?'

বৈশালী বলল, 'আজ তোকে কিছু বলছি না। কাল দুপুরে সুরূপা, মেঘনা, তুই আর আমি সামহোয়ার মিট করব। তখন সব জানতে পারবি।'

'ফাইন।'

'কোথায় বসা যায় বল তো?'

'মেঘনাদের নিয়ে তোদের বাড়ি চলে যাব?'

বৈশালী চমকে ওঠে, 'না না, কক্ষনো না।'

মধুরা বলল, 'আমাদের বাড়ি আসতে বলতাম কিন্তু ইয়ার, এখানকার অ্যাটমসফিয়ার এখনও ঠিক নরমাল নয়।' বলতে বলতে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় তার, 'আরে, সুরূপাদের বাড়ি এখন ফাঁকা। ওর মা আর বাবা বাঙ্গালোর গেছেন। ঠাকুমা আর সুরূপা ছাড়া অন্য কেউ নেই। আমরা

ওখানেই বসতে পারি। ওর সঙ্গে কাল সকালে কথা বলে সব ঠিক করে নেব। তুই, সে অ্যাবাউট টু ও ক্লক অ্যাট নুন, ওখানে চলে যাস।'

বৈশালী বলল, 'আচ্ছা।'

'এখন ছাড়ছি। সুইট ড্রিম।'

ফোনটা বন্ধ করে এক পাশে রেখে দেয় বৈশালী।

পাঁচ

বৈশালীর জন্ম উনআশির সতেরই জুন। নতুন মিলেনিয়ামের প্রথম জুনের ঠিক ওই তারিখটিতে সে একুশে পা রাখবে। সে আধুনিকা, ঝকঝকে মেয়ে। যদিও ভুরু প্লাক করে, চুলে তার বয়েজ কাট, তবে মাসকারা বা নখরঞ্জনীর চিহ্নমাত্র নেই তার ড্রেসিং টেবলে। তার পোশাক-টোশাক বলতে বেশির ভাগ সময়ই জিনস এবং শার্ট, ঢোলা স্কার্ট এবং টপ, কচিৎ সালোয়ার কামিজ, পুজোর সময় জোর করে মা দু-একদিন শাড়ি পরান—হাজার হোক বাঙালির মেয়ে, হয়তো সেটুকু মনে করিয়ে দেবার জন্য। গলায় সোনার সরু চেনে টোটেম জাতীয় লকেট ছাড়া গয়না টয়না বলতে আর কিছু নেই। বাঁ হাতে ইলেকট্রনিক ঘড়ি, বাইরে বেরুলে স্নিকার বা উঁচু হিলের লেডিস শু।

বৈশালী ওয়েস্টার্ন পপে মজে-থাকা মেয়ে। রবীন্দ্রসঙ্গীত একটু আধটু পছন্দ করে। ভাটিয়ালি, পুরাতনী বা বাউল—এ সব তার কাছে পাতি বাংলা গান। নো রিদম, নো লাইফ—মনোটোনাস, ফ্ল্যাট।

বৈশালী লিঙ্গ বৈষম্য মানে না। এই নিয়ে ডিবেটে যোগ দিয়ে অডিটোরিয়াম তোলপাড় করে ফেলে। তাদের কো-এড কলেজ, ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশায় এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। চুটিয়ে তাদের সঙ্গে আড্ডা দেয়।

গত শতকে জন্মালেও তার মাত্র কুড়িটা বছর সে পেয়েছে। যদি মোটামুটি সত্তর বছরের আয়ু পায়, এই সেঞ্চুরিতে তার পঞ্চাশ বছর, অর্থাৎ জীবনের অধিকাংশটাই কাটবে নতুন সহস্রাব্দে। সেদিক থেকে সে নিউ মিলেনিয়ামের প্রোডাক্ট।

যতই স্মার্ট হোক, বেশভূষায় বিপ্লব ঘটাক, লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে তলোয়ার হাতে ময়দানে নেমে পড়ুক, নিউ মার্কেটের সেই দৃশ্যটি সমস্ত কিছু ওলটপালট করে দিয়েছে। এতকাল বুঝতে পারে নি, কিন্তু আজ হঠাৎ একটা বড় রকমের ধাক্কা খেতেই টের পাচ্ছে তার ভেতর একশ বছর কি তারও বেশি বয়সের এক প্রাচীন নারী ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে। পুরনো অভ্যাস, পুরনো ধ্যানধারণা, পুরনো ভ্যালুজ ছেড়ে সে এক পাও সামনের দিকে এগোয় নি। ঠিক তার ঠাকুমা শ্রীমতী নবতারা দেবীর রেপ্লিকা। এখন না হয় স্মৃতিভ্রষ্ট, প্রায়-অথর্ব, সুস্থ অবস্থায় প্রবল প্রতাপে মহিলা একটা পারিবারিক প্যাটার্ন তৈরি করে দিয়েছিলেন। তিনি নাকি বলতেন, একজন পুরুষকে বাবা হিসেবে হতে হবে নিষ্কলঙ্ক, স্বামী হিসেবে একনিষ্ঠ, পরিবারের প্রধান হিসেবে চরিত্রবান, তার গায়ে কালির সামান্য একটা ছিটেও যেন না পড়ে।

একজন মডেল পুরুষের এই কনসেপ্টটা বৈশালীর জিনের মধ্যেই থেকে গিয়েছিল। নিজের অজান্তেই উত্তরাধিকার সূত্রে এটা তার পাওয়া। চোরা স্রোত নিঃশব্দে, কোনোরকম জানান না দিয়ে যেভাবে ভেতরে ঢুকে যায়, এটাও তেমনি তার অস্তিত্বের গভীর স্তরে পৌঁছে গেছে।

বার বার বৈশালীর মনে হয়েছে, ঠাকুমা যদি সুস্থ থাকতেন, ছেলের অনাচার জানতে পারলে কিছুতেই সহ্য করতেন না। নবতারার সন্তানেরা তো বটেই, অন্য যাঁরা তাঁকে চেনেন, শতমুখে তাঁর হান্টারওয়ালী ইমেজের কথা এখনও বলেন। বৈশালী নিশ্চিত, সব্যসাচীকে চাবুক হাঁকিয়ে তিনি টিট করে দিতেন।

কাল প্রায় সারাটা রাত অস্থিরতার মধ্যে কেটেছে বৈশালীর। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কার ডাকাডাকিতে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল সে। চারদিক থেকে নানারকম আওয়াজ বুঝিয়ে দিচ্ছে, সারা বাড়ি জুড়ে কর্মব্যস্ততা চলছে। জানালার বড় বড় পর্দাগুলোর ফাঁক দিয়ে মে মাসের তেজী রোদের লম্বা লম্বা ফালি ঘরের মেঝেতে এসে পড়েছে। আর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ময়না।

ভুরু কুঁচকে বৈশালী বলল, 'কি রে, অমন চেঁচাচ্ছিস কেন?'

ময়না বলল, 'কত বেলা হয়েছে জানো? আর কত ঘুমুবে?'

বৈশালীর চোখ ওয়াল ক্লকের দিকে চলে যায়। আটটা বেজে বত্রিশ। অসুখবিসুখ না হলে এত বেলা পর্যন্ত সে কখনও ঘুমোয় না।

ময়না ফের বলে, 'দু বার চা নিয়ে ঘুরে গেছি। আবার করে আনব, না আরো খানিকক্ষণ ঘুমুবার ইচ্ছে?'

রোজ সকালে বেড-টি খাওয়ার অভ্যাস বৈশালীর। সেটা করে আনে ময়না। শুধু তাই না, জানালার পর্দাগুলো সরিয়ে দেয়, ধামসানো কোঁচকানো বিছানা পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখে।

বিছানা থেকে নেমে পড়ে বৈশালী। বলে, 'না না, তুই চা নিয়ে আয়। আমি মুখ টুখ ধুয়ে আসি।'

'আনছি। তার আগে বিছানা ঠিক করে দিই।' বেড-শিট টান টান করতে করতে ময়না বলে, 'বাবা তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল।'

অ্যাটাচড বাথরুমের দিকে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ায় বৈশালী। ঘুম ভাঙার পর সব্যসাচীর কথা তার মনে পড়ে নি। এখন পড়ল। সামান্য রুক্ষ গলায় বলল, 'কী কথা?'

ময়না বলল, 'তোমার ঘুম ভেঙেছে কিনা—'

'ও—' আগ্রহশূন্যের মতো শব্দটা গলার ভেতর উচ্চারণ করে বাথরুমে ঢুকে গেল বৈশালী।

মিনিট পনের বাদে বাথরুম থেকে বেরিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সে দেখল বিছানা একেবারে ফিটফাট। জানালার পর্দাগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরের ভেতর এখন উজ্জ্বল আলোর ছড়াছড়ি। ময়নাকে অবশ্য দেখা গেল না।

মুখ মোছা হয়ে গিয়েছিল। যে চেয়ারে বসে পড়াশোনা করে তার গায়ে সেটা ঝুলিয়ে দিয়ে বিছানায় এসে বসল বৈশালী। আর তখনই ময়না ফিরে আসে। তার হাতে একটা ট্রেতে চা, লুচি তরকারি এবং একটা মিষ্টি।

এখন একেবারেই খাবার ইচ্ছা নেই। চায়ের কাপটা রেখে বাকি সব ফিরিয়ে দিল বৈশালী।

ময়না তবু দাঁড়িয়ে থাকে, 'কিছু খাবে না দিদি?'

বৈশালী গলা চড়িয়ে বলে, 'বলছি তো না।'

তার দিকে তাকাতে তাকাতে ময়না চলে যায়। কাল থেকেই মেয়েটার মনে হচ্ছে, বৈশালীর কী যেন হয়েছে। ঠিক ধরতে পারছে না সে।

চা খাওয়া যখন শেষ হয়ে এসেছে, সব্যসাচী এলেন। নিখুঁত কামানো মসৃণ মুখ, চুল ব্যাক ব্রাশ করা, দামি স্যুটেবুটে সুসজ্জিত, হাতে ব্রিফ কেস। গা থেকে সেন্টের গন্ধ ভেসে আসছে।

অফিসে বেরুবার সময় বাড়ির সবার সঙ্গে দেখা করে যান সব্যসাচী। এটা তাঁর নিত্যকর্মপদ্ধতির মধ্যে পড়ে। তিনি যে কত বড় দায়িত্ববান, স্নেহময় স্বামী বা বাবা, সেটাই কি বোঝাতে চান?

আগে সব্যসাচীকে বাবা হিসেবেই দেখে এসেছে বৈশালী। অন্য কোনো দিকে নজর ছিল না। আজ প্রথম খেয়াল হল, সাজসজ্জাটা যেন অনেক বেশি পরিপাটি, দামি প্যান্ট এবং শার্টের ক্রিজে এতটুকু এদিক ওদিক নেই। জুতোয় এমনই পালিশ, মুখ দেখা যায়। আগে কখনও গায়ে সেন্ট ছড়িয়ে অফিসে গেছেন কিনা মনে পড়ল না।

সব্যসাচী বললেন, 'কি রে; ময়না বলছিল আজ অনেক দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছিস?'

পা থেকে চুল পর্যন্ত সব্যসাচীকে লক্ষ করছিল বৈশালী। এটা ঠিক অফিসের নয়; যেন গোপন অভিসারে যাবার ড্রেস। ভেনু বা সঙ্কেতস্থান যে কোথায়, যদি জানতে পারা যেত। অন্যমনস্কর মতো সে বলল, 'হ্যাঁ।'

'শরীর খারাপ নাকি?'

'না।'

সব্যসাচী বললেন, 'না বললেই হল? কোনোদিন এত বেলা হয় না, আজ হল। নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। যদি বেশি খারাপ লাগে ডক্টর চৌধুরিকে খবর দিস।'

তাঁর কথা থেকে প্রপাতের মতো মমতা ঝরে ঝরে পড়ছে। বৈশালী মনে মনে বলল, 'হিপোক্রিট।

পিতৃস্নেহের বান ডাকিয়ে দিচ্ছে।' মুখে বলল, 'সে দেখা যাবে।'

'আজ আর বাড়ি থেকে বেরুস না।'

বৈশালী উত্তর দিল না।

'অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি এখন যাই। দুপুরের দিকে ফোন করে তোর খবর নেব।' সব্যসাচী আর দাঁড়ালেন না, ড্রইংরুম পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন।

চায়ের কাপটা হাত থেকে নামিয়ে তারপরও খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে বৈশালী। সেই দুটোয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে। ফার্ন রোড থেকে যোধপুর পার্কে সুরূপাদের বাড়ি আর কত দূর? গোল পার্কের মুখ থেকে ট্যাক্সি ধরলে পাঁচ সাত মিনিটে পৌঁছে যাবে। দেড়টার আগে বেরুবার মানে হয় না। ততক্ষণ বাড়িতেই আটকে থাকতে হবে।

বিছানা থেকে উঠে পড়ার টেবলে গিয়ে বসল বৈশালী। ছুটি পড়ার পর দু তিন দিন বন্ধুদের সঙ্গে স্রেফ আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছে। বইটই ছুঁয়েও দেখে নি। আজ ঠিক করল, প্রফেসররা ক্লাসে যে নোট টোট দিয়েছেন সেই খাতাগুলো পড়ে ঝালিয়ে নেবে। বইয়ের র‍্যাক থেকে সেগুলো নামালোও। কিন্তু কিছুতেই মন বসছে না। নিজেরই হাতের লেখা, অথচ দুর্বোধ্য শিলালিপির মতো মনে হচ্ছে।

খোলা খাতার সামনে দূরমনস্কর মতো বসে থাকে বৈশালী। একসময় চোখে পড়ে রাহুল তার ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে গেল। বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে সারাদিন পুরো শহর চষে কখন বাড়ি ফিরবে কে জানে। আরো কিছুক্ষণ পর একতলা থেকে ওপরে উঠে এলেন সুচরিতা। তাঁর রান্নাটান্না শেষ। ঘর্মাক্ত, চুল উস্কখুস্ক, শাড়িতে হলুদ লঙ্কার দাগ, কপালে সিঁদুর লেপটে আছে। অবিকল এই চেহারাতেই তাঁকে রোজ এই সময়টায় দেখা যায়।

সুচরিতা ড্রইংরুমের ভেতর দিয়ে সোজা তাঁর ঘরে চলে যান। মিনিট পনের বাদে বেরিয়ে আসেন। এর মধ্যে স্নান সেরে নিয়েছেন। এখন চওড়া লালপাড় গরদে, মস্ত সিঁদুরের টিপে তাঁকে একেবারে অন্যরকম লাগছে। পিঠময় ভেজা চুল ছড়ানো, হাতে বড় রেকাবিতে ফুল বেলপাতা দুর্বো তুলসী ইত্যাদি। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে মায়ের এই ভক্তিময়ী বঙ্গলক্ষ্মী মার্কা রূপটি দেখে আসছে বৈশালী। গরদ টরদ সম্পর্কে দাদা মজা করে বলে, পূজারিণী টাইপের ইউনিফর্ম।

সুচরিতা এবার সিঁড়ি দিয়ে ছাদে চলে গেলেন। সেখানে তাঁর এক্সক্লুসিভ পুজোর ঘর। সেই ঘরে এখন মিনিমাম দুটি ঘন্টা তিনি কাটাবেন।

সব্যসাচীকে ঘিরে এলোমেলো নানা চিন্তার টানাপোড়েন চলছে বৈশালীর মাথায়। খানিক আগে বাবার যে সাজসজ্জা দেখা গেছে তার সঙ্গে মায়ের এই চেহারাটা পুরোপুরি কনট্রাস্ট। এই বয়সে দামি দামি পোশাকে, দুর্লভ পারফিউমে সব্যসাচীর কেন যে নিজের আকর্ষণী শক্তিকে বাড়ানোর এত চেষ্টা, তা কি মায়ের চোখেও পড়ে না? নাকি স্বামীর প্রতি তাঁর বিশ্বাস এমনই অটুট, আস্থা এতটাই ব্যাপক যে তাঁর পরিবর্তনটা দেখেও দেখেন না? স্বামীকে অবিশ্বাস করার অভ্যাস বা শক্তি কোনোটাই বোধহয় তাঁর নেই।

একসময় উঠে পড়ে বৈশালী। লক্ষ্যহীনের মতো নিজের ঘরে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। সেখান থেকে আসে ড্রইংরুমে। টিভিটা যে স্ট্যান্ডের ওপর, সেটার নিচে কাচ দিয়ে ঘেরা র‍্যাকে রয়েছে প্রচুর গান আর ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিকের ক্যাসেট। কয়েকটা বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। তারপর কী ভেবে জায়গামতো রেখে সোজা ছাদে চলে আসে।

ছাদের মাঝামাঝি মায়ের বিরাট পুজোর ঘর। দুধসাদা মার্বেলের মেঝে, ডিসটেম্পার-করা সাদা দেওয়াল এবং সিলিং। একটা দেওয়ালের পুরোটা জুড়ে কোমর-সমান হাইটের টানা সিংহাসন। তার ভেতর কত যে দেবদেবীর মূর্তি বা পট। লক্ষ্মী বিষ্ণু মহেশ্বর কালী রাধাকৃষ্ণ থেকে সন্তোষী মা, আদ্যা মা, এমন কি বজরংবলীকেও পরম ভক্তিভরে স্থাপন করা হয়েছে। তা ছাড়া রয়েছেন মহাপুরুষ এবং পরমা প্রকৃতিরা। লোকনাথ, রামকৃষ্ণদেব, মা সারদা, মা আনন্দময়ী, সাঁইবাবা, বিবেকানন্দ, বামাখ্যাপা, রাম ঠাকুর থেকে আরো অনেকে। সংখ্যাটা যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে আর একটা দেওয়াল জোড়া সিংহাসনের অর্ডার খুব তাড়াতাড়ি না দিলেই নয়।

এই ঘরটা পুরোপুরি প্রোটেক্টেড এরিয়া—মায়ের জন্য সংরক্ষিত। এখানে যখন তখন যেভাবে

খুশি ঢোকা যায় না। শ্রীমতী সুচরিতা দেবী সেজন্য কঠোর নিয়মাবলী তৈরি করে রেখেছেন। প্রথমত, স্নান সেরে পাটভাঙা পরিষ্কার ধুতি বা শাড়ি পরতে হবে। দ্বিতীয়ত, মাথায় গঙ্গাজল ছিটোতে হবে। সব চেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, মনটা শুদ্ধ রাখা একান্ত প্রয়োজন। এই কোডগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করার পর তবেই প্রবেশাধিকার পাওয়া যায়। তবে মন কারো শুদ্ধ বা নির্মল আছে কিনা, বাইরে থেকে তো বোঝা যায় না। কিন্তু মা নাকি মুখ দেখে টের পান।

সব্যসাচী মাঝে মধ্যে পুজোর ঘরে আসেন। সহধর্মিণীকে পুণ্যকর্মে কতটা সঙ্গদান করতে আর কতটা তাঁকে খুশি রাখতে, জানা মুশকিল। রাহুল এ ধার মাড়ায় না। দেবদেবী, ঈশ্বর টিশ্বর নিয়ে মাথা ঘামানোর ইচ্ছা তার একেবারেই নেই। তার মতে এ সব পুজোটুজো করা ফালতু সময় নষ্ট। নিজেকে এথেইস্ট বলে জাহির করতে সে গর্ব বোধ করে। রোজ নয়, বড় ধরনের স্পেশাল পুজো থাকলে, যেমন জন্মাষ্টমী, দোলপূর্ণিমা বা কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো—মাকে সাহায্য করতে আসে বৈশালী। রাহুলের মতো এক কথায় দেবদেবীকে খারিজ করে দেবার সাহস তার নেই। আবার মায়ের অচলা ভক্তিও পায় নি। দুইয়ের মাঝামাঝি একটা ব্যালান্সের খেলা খেলে চলেছে সে।

বৈশালী লক্ষ করল, ধবধবে পশমের আসনে বসে চৌকো পাথরের পাটায় চন্দন ঘষছেন সুচরিতা। সামনে পুজোর নানা উপকরণ। পেতলের পঞ্চপ্রদীপ জ্বলছে। রুপোর রেকাবিতে কাটা ফল, সন্দেশ ইত্যাদি চমৎকার সাজানো রয়েছে।

মা কোনাকুনি বসে আছেন। দরজার কাছ থেকে তাঁর মুখের একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। কী নিশ্চিন্ত মুখচ্ছবি, অসীম প্রশান্তি নিয়ে তিনি তন্ময় হয়ে রয়েছেন।

আজকাল মহিলারা কত রকম ব্যাপারে জড়িয়ে থাকে। নাটক গান সমাজসেবা পার্টি। কিন্তু সুচরিতা নিজেকে নানা দিকে ছড়িয়ে দেন নি। তাঁর জীবনের স্পষ্ট দুটি ভূভাগ। একদিকে রয়েছে দেবদেবী, পরমা প্রকৃতি আর মহাপুরুষেরা, অন্যদিকে সংসার ছেলেমেয়ে স্বামী। মাঝখানে কিছুক্ষণ আনন্দ বা বিনোদনের জন্য টিভি, কিন্তু সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। শোনা যাচ্ছে, আলমোড়া না উত্তরকাশীতে এক গুরুর সন্ধান পেয়েছেন। তিনি বছরে দু বার কলকাতায় আসেন। এবার এলে তাঁর কাছে দীক্ষা নেবেন।

মাকে বৈশালীর এক এক সময় বিস্ময়কর মনে হয়। রহস্যময়, দুর্বোধ্য, ধরাছোঁয়ার বাইরে। এই মহিলাই কো-এড কলেজ থেকে একদা হিস্ট্রি অনার্স নিয়ে পাশ করেছিলেন। ডিবেটিংয়ে ইন্টার-কলেজ চাম্পিয়ান হয়েছেন, ভাল ব্যাডমিন্টন আর বাস্কেট বল খেলতেন। সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সংসার ধর্ম আর ঈশ্বর ছাড়া এখন অন্য কোনোদিকে মন নেই। অথচ কত সুযোগ ছিল তাঁর। শিক্ষিত, বিরাট অফিসারের স্ত্রী, অসংখ্য যোগাযোগ—কতভাবেই না জীবনের প্রসারণ ঘটাতে পারতেন!

আচ্ছা, এই যে রোজ সুচরিতা পুজোর ঘরে এসে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে তুষ্ট করেন, তার কারণটা কী? এঁদের কাছে তিনি কী প্রার্থনা করেন? নিশ্চয়ই সংসারের অপার সুখশান্তি, সমৃদ্ধি, ছেলেমেয়েদের মঙ্গল এবং অবশ্যই সংসারের মূল কেন্দ্রে যিনি আছেন সেই স্বামীর কল্যাণ। অথচ যে সব্যসাচী তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাসে, প্রতি মুহূর্তের শ্বাসবায়ুতে জড়িয়ে আছেন, যাঁর কল্যাণ কামনায় নিজেকে অসীম নিষ্ঠায় ঈশ্বরের কাছে নিয়োজিত রাখেন, তিনি কি জানেন সেই লোকটা কত বড় বিশ্বাসঘাতক!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পলকহীন মাকে অনেকক্ষণ লক্ষ করল বৈশালী। হঠাৎ কী ভেবে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন সুচরিতা। ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন। পারতপক্ষে ছেলেমেয়ে এ ধার মাড়ায় না। বিস্ময়টা থিতিয়ে যেতে বেশি সময় লাগল না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আঁতকে উঠলেন, 'তোর তো এখনও স্নান হয় নি। বাসি কাপড়চোপড়ে পুজোর ঘরে ঢুকিস না।'

বৈশালী বলল, 'না না, ঢুকব না। কী মনে করেছ, তোমার কোডগুলো আমি ভুলে গেছি?'

আশ্বস্ত হলেন সুচরিতা। উৎসুক সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'হঠাৎ তুই এখানে!'

বৈশালী বলল. 'ছাদে ঘুরছিলাম। তুমি পুজো করছ দেখে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম।'

সুচরিতার মনে খটকা দেখা দেয়। বৈশালী এখানে আসার যে কারণ জানালো, সেটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'তুই কি আমাকে কিছু বলবি?'

'আচ্ছা মা—' বলতে গিয়েও চুপ করে যায় বৈশালী।

'কী হল? বল—' সুচরিতার চোখেমুখে উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে।

বলার কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে বৈশালী শুরু করে, 'রোজ তুমি এতগুলো দেবতার পুজো কর, তার পারপাসটা কী?'

বুঝতে না পেরে সুচরিতা বললেন, 'এ কথার মানে?'

সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বৈশালী বলে, 'তুমি নিশ্চয়ই সিনসিয়ারলি এত সব দেবতার কাছে চাও, আমার ভাল হোক, দাদার ভাল হোক, বাবার ভাল হোক, তাই কিনা?'

সুচরিতা বললেন, 'হ্যাঁ, চাই তো। নইলে রোজ এই পুজোটুজো কিসের জন্যে?'

'অথচ তুমি যদি জানতে পার, আমাদের ভেতর কেউ তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে তখন সমস্ত কিছু মিনিংলেস হয়ে যায় না?'

'কী আবোল তাবোল বকছিস! কাল সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরলি। তারপর থেকে তোর কী হয়েছে বল তো?'

নিজের স্বামী বা সন্তানেরা তাঁর বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারে, বা এমন কিছু করবে যাতে তিনি প্রতারিত হন, সুচরিতা তা ভাবতেই পারেন না। তাদের ওপর তাঁর আস্থা এতটাই গভীর। নিজেকে সামলে নেয় বৈশালী, 'না না, কী আর হবে। এমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম।'

সুচরিতা আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। বললেন, 'তুই এখন যা। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

বৈশালী আস্তে আস্তে দোতলায় নেমে এল।

ছয়

দুপুরের খাওয়া সেরে ঠিক দেড়টায় বেরিয়ে পড়ে বৈশালী। বেরুবার সময় মাকে অবশ্য জানিয়েছে, সুরূপাদের বাড়ি যাচ্ছে। সন্ধের আগে আগে ফিরে আসবে।

মিনিট তিনেকের ভেতর গোল পার্কের মুখে চলে আসে সে। রামকৃষ্ণ মিশনের বিশাল বিল্ডিংটার উলটো দিকে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। অনবরত যে সব অটো দক্ষিণ দিকে ছুটছে তার একটা ধরে দুটো বাজার আগেই যোধপুর পার্কে পৌঁছে যায়।

সুরূপাদের বাড়িটা তেতলা। চোখ-ধাঁধানো মডার্ন স্থাপত্যরীতিতে তৈরি। সামনের দিকে এক টুকরো চমৎকার বাগান, পাশ দিয়ে নুড়ি বিছানো ড্রাইভওয়ে।

নিচু গেট খুলে ভেতরে ঢুকে কলিং বেল বাজাতে সুরূপা দরজা খুলে বৈশালীকে তাদের একতলার বিশাল ড্রইংরুমে নিয়ে গেল। সেখানে মেঘনা আর মধুরাকে দেখা যাচ্ছে। ওরা তার আগেই এসে গেছে।

একটা সোফায় বসে পড়ে বৈশালী। ড্রইংরুমের দুই দেওয়ালে দুটো এয়ার-কুলার চালু রয়েছে। ফলে বড় পরিসরের এই ঘরখানার আবহাওয়া বেশ শীতল, মে মাসের গরমেও খুব আরামদায়ক।

বৈশালী লক্ষ করল, তিন দিক থেকে তিনজোড়া চোখের দৃষ্টি তার ওপর এসে পড়েছে। মেঘনারা যেভাবে তাকিয়ে আছে তাতে পরিষ্কার বোঝা যায়, ভেতরে ভেতরে ওরা রীতিমত উৎকণ্ঠিত।

মধুরার ধৈর্য কম। সে বৈশালীকে বলল, 'কাল হোল নাইট টেনসনে রেখেছিস। এবার বল প্রবলেমটা কী?'

সুরূপা এবং মেঘনাও জানালো কাল মধুরার ফোন পাওয়ার পর থেকে তারাও দুশ্চিন্তায় আছে। রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারে নি। বৈশালীর সমস্যাটা শোনার জন্য তারাও উদগ্রীব।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে বৈশালী। তারপর বলে, 'তোদের সব জানাব। তার আগে প্রমিস করতে হবে।'

তিনজনেই একসঙ্গে বলে ওঠে, 'কিসের?'

'আমি যা বলব তা আর কেউ যেন জানতে না পারে।'

'ঠিক আছে, জানবে না। প্রমিস।'

বৈশালী বলল, 'সিক্রেট রাখতে বলছি, কারণ এর সঙ্গে আমাদের ফ্যামিলির স্ক্যান্ডাল জড়িয়ে আছে।'

মধুরাদের শিরদাঁড়া টান টান হয়ে যায়। তারা সোজা হয়ে বসে। তবে এবার কেউ কিছু বলে না।

বৈশালী বলল, 'যতটা গেস করতে পেরেছি, আমার বাবা একটা বিশ্রী ব্যাপারে ইনভল্‌ভড হয়ে পড়েছে।'

তিনজনেই চমকে ওঠে, 'কী বলছিস তুই!'

'অলমোস্ট সিওর না হয়ে নিজের বাবা সম্পর্কে কেউ এই ধরনের কথা বলে?'

সুরূপা বলল, 'ডিটেলে সব বল।'

সমস্ত জানিয়ে বৈশালী বলল, 'কাল থেকে কী অবস্থায় কাটাচ্ছি, ভাবতে পারবি না। আই হ্যাভ ব্রোকেন ডাউন টোটালি।' বলে দু হাতে মুখ ঢাকে।

মেঘনা বলে, 'তোর বাবাকে তো জানতাম ভেরি অনেস্ট, আর ম্যান অফ স্পটলেস ক্যারেক্টর, কোনোরকম ভাইস নেই! পারফেক্ট ইণ্ডিয়ান রোল মডেল।'

বৈশালী বলে, 'আমিও তাই জানতাম।'

মেঘনা বলে, 'যে মহিলাটিকে নিউ মার্কেটে দেখেছিস তার সঙ্গে তোর বাবার ইলিশিট রিলেশান রয়েছে, এতটা ভাবছিস কেন? তোর ভুলও তো হতে পারে।'

বৈশালী মুখ থেকে হাত সরিয়ে বলে, 'নেভার। আ ম্যান অ্যাণ্ড আ ওম্যান, দু'জনের মধ্যে কোনো অ্যাফেয়ার থাকলে তাদের চোখমুখ দেখলেই সেটা বোঝা যায়।'

'তোর বাড়ির আর কেউ জানে? কাউকে বলেছিস—পার্টিকুলারলি তোর মাকে?'

'না। বাবার ওপর মায়ের এত বিশ্বাস আর লয়ালটি যে বললেও শুনবে না, আমার ওপর ভীষণ রেগে যাবে। যদি শেষ পর্যন্ত বোঝে আমি ঠিক বলছি, একেবারে ডিজাস্টার ঘটে যাবে।'

'মহিলাটিকে তুই চিনিস?'

'মুখচেনা। আমাদের বাড়িতে অনেকদিন আগে কী একটা দরকারে দু-তিন বার এসেছিল। নাম-ঠিকানা কিচ্ছু জানি না।'

এতক্ষণ মধুরা আর সুরূপা চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। হঠাৎ শব্দ করে হেসে ওঠে মধুরা।

সচকিত বৈশালী দ্রুত তার দিকে ঘুরে বসে, 'কী হল, হাসছিস কেন?'

মধুরা বলল, 'আরে ইয়ার, ব্যাপারটা ফানি বলেই হাসছি। এতদিনে তোর বাবা একজন রিয়াল অ্যাডাল্ট ম্যাসকিউলিন হল। বিফিটিং ফর দা মর্ডান সোসাইটি।'

বৈশালীর মাথার ভেতরটা অসহ্য রাগে ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না।

মধুরা হাসতে হাসতেই বলে যায়, 'একজন সাকসেসফুল ম্যান, লাইফে এসটাব্লিশড, তার একটা মিসট্রেস বা ছুপা প্রেমিকা থাকবে না, তাই কখনও হয়? রামচন্দ্রের মতো ডিভোটেড, সিঙ্গল-মাইণ্ডেড হাজব্যাণ্ডরা গ্রেট বাল্মীকির ইমানিজেশন থেকেই জন্মায়। রিয়াল ওয়ার্ল্ডে তাদের দেখা যায় না।'

বৈশালী দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'তামাশার একটা লিমিট আছে মধুরা।'

মধুরা একটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, 'এটা অত সিরিয়াসলি নিচ্ছিস কেন? আমার মা-বাবার ব্যাপার জানিস?'

একটু থতিয়ে যায় বৈশালী। ভুরু কুঁচকে বলে, 'কী হয়েছে ওঁদের?'

মধুরা বলে, 'আমার বাবার দু দুটো গার্লফ্রেণ্ড আছে। মাঝে মাঝে তাদের কাউকে নিয়ে বিজনেসের নাম করে কোনো হলিডে রিসোর্টে গিয়ে দু-চারদিনের জন্যে কাটিয়ে আসে। মাই মম টু হ্যাজ আ বয়ফ্রেণ্ড। একজন আর একজনের ব্যাপারটা জানে। অথচ একসঙ্গে একই ছাদের তলায় থাকে, সংসার টংসার করে। বাইরে থেকে কিছু বুঝবার উপায় নেই। পিসফুল কো-একজিসটেন্স। তবে বাবা একজন পুরুষ তো, আর পুরুষরা যা হয়—পজেসিভ। স্বামীর অধিকারে অ্যানাদার পারসন ভাগ বসাচ্ছে, এই চিন্তাটা যখন মাথায় চেপে বসে তখন তার রক্ত গরম হয়ে ওঠে। বাড়িতে হঠাৎ সিভিল ওয়ার শুরু হয়ে যায়। সেটা কয়েকদিন কনটিনিউ করে, তবে কখনও এক উইকের বেশি নয়। তারপরই ট্রুস—সন্ধি। ফ্যামিলি লাইফের চাকা থমকে দাঁড়িয়ে যাবার ফের স্মুদলি চলতে থাকে।'

বৈশালী থ হয়ে যায়। ল্যান্সডাউন রোডে ওদের বিশাল ফ্ল্যাটে অনেক বার গেছে সে।

মধুরা ছাড়াও কয়েকজন গুজরাতি বন্ধু আছে তার। সে লক্ষ করেছে, গুজরাতিদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগটা অত্যন্ত স্পষ্ট। একদল চূড়ান্ত আলট্রা-মডার্ন, তাদের পা দুটোই শুধু ইন্ডিয়ায় রয়েছে, বাকি সবটাই আমেরিকায় কানাডায় কি ইওরোপে। আর একটা ক্লাস আছে, যারা পুরোপুরি রক্ষণশীল, পুরনো লাইফ স্টাইল, পুজো পার্বণ, গুরু ইত্যাদি নিয়ে দিব্যি দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। মধুরারা এই মেরুকরণের মাঝামাঝি জায়গায়। পুরনো জীবনযাপন পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিকতা মিশিয়ে নতুন মিলেনিয়ামের উপযুক্ত করে তোলার চেষ্টা করে চলেছে। ওদের ফ্যামিলির ছেলেমেয়েরা জিনস পরে, পপ মিউজিকের সঙ্গে শরীর ঝাঁকিয়ে নাচে, আমেরিকায় যাবার স্বপ্ন দেখে। ওর মা বাড়িতে ম্যাক্সি বা কাফতান পরেন, পার্টিতে স্বামীকে সঙ্গ দেন, নিজেদের ইমপোর্ট এক্সপোর্টের অফিসে কম্পিউটারে হিসেব দেখেন। আবার ছুটিটুটির দিনে সাঁইবাবা কি রাধাস্বামীর মন্দিরে যান।

মধুরার মা-বাবাকে খুব ভাল লাগে বৈশালীর। দু'জনেই হাসিখুশি, আমুদে, স্নেহপ্রবণ। মেয়ের বন্ধুদের সঙ্গে প্রচুর মজা করেন। মধুরার মা এই বয়সেও দারুণ সুন্দরী, ওর বাবার হাইট বেশি না হলেও বেশ সুপুরুষ।

যতবার বৈশালী মধুরাদের বাড়ি গেছে, কখনও মনে হয় নি, ওর মা-বাবার সম্পর্কের ভেতর কোনোরকম টেনসন আছে, বরং উলটোটাই ভেবেছে, এরকম সুখী দম্পতি আর হয় না।

নিজের অজান্তেই বৈশালীর গলার ভেতর থেকে একটা শব্দ বেরিয়ে আসে, 'স্ট্রেঞ্জ!'

মধুরা জিজ্ঞেস করে, 'কিসের স্ট্রেঞ্জ?'

'আঙ্কল-আন্টিকে তো হ্যাপিয়েস্ট কাপল বলেই জানতাম। তুই যা বললি—' বলতে বলতে থেমে যায় বৈশালী।

মধুরা বলে, 'স্টেজ অ্যাক্টিংটা ওরা ভালই জানে ইয়ার। এমন অনেক কিছু আছে যার বাইরেটা চকচকে, ঝকঝকে। একটু খোঁচা দিলেই ভেতর থেকে এমন একটা চেহারা বেরিয়ে পড়ে যাতে চমকে উঠতে হয়।'

'এতদিন তো এ নিয়ে কিছু বলিস নি!'

'কী বলব—আমার বাবা এই, আমার মা সেই? টাইম হ্যাজ চেঞ্জড আ লট ইয়ার। সময় এক জায়গায় থেমে নেই। মানুষকে এখন ঘরে বসে থাকলে চলে না। কত জনের সঙ্গে রোজ দেখা হয়। কে কার সঙ্গে কখন ফেঁসে যাবে কে জানে।'

বৈশালী চুপ করে থাকে।

মধুরা থামে নি, 'এক্সট্রা-ম্যারিটাল সম্পর্ক নেই, এমন পুরুষ এখন খুব বেশি তুই পাবি না। দিস ইজ নরমাল ইয়ার, দিস ইজ পার্ট অফ আওয়ার লাইফ। দেখতে হবে যে লোকটিকে নিয়ে টেনসন সে হাজব্যাণ্ড হিসেবে, ফাদার হিসেবে ডিউটিফুল কিনা। যদি নিজের কর্তব্য সে ঠিক ঠিক পালন করে যায়, বাইরে কোথায় কী করে বেড়াল তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভটা কী?'

মধুরাকে এরকম নির্লিপ্ত দার্শনিকের মতো কথা বলতে আগে কখনও শোনে নি বৈশালী। এতকাল তাকে দেখেছে অত্যন্ত চটুল, গাম্ভীর্যহীন, কোনো সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় না, সব সময় যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। অনেকটা তার দাদা রাহুলের মতো।

একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে তার মা-বাবার ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে মধুরা। এ নিয়ে তার যন্ত্রণা বা কষ্টবোধ নেই। এক্সট্রা-ম্যারিটাল সম্পর্ক এখন নাকি জলভাত, অতএব এ নিয়ে তার মতে মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

যুক্তিটা অদ্ভুত। স্তম্ভিত বৈশালীর মাথার ভেতরটা গুলিয়ে যেতে থাকে। মা-বাবার ওইরকম গ্লানিকর জীবন যাপনের কথা জানার পরও কত স্বচ্ছন্দ মধুরা, কত দুশ্চিন্তাহীন। হুই হুই করে তার মারুতি-জিপসিতে করে বন্ধুদের সঙ্গে কলকাতা চষে বেড়িয়েছে, একসঙ্গে আড্ডা দিয়েছে, সিনেমা দেখেছে, রেস্তোরাঁয় খেয়েছে। নিজের মুখে না বললে তার মা-বাবার খরবটা জানাও যেত না।

মধুরা সামনের দিকে ঝুঁকে বলল, 'আমি একটা সাজেশান দেব?'

বৈশালী অন্যমনস্কর মতো বলল, 'কী?'

মধুরা বলল, 'রেগে যাবি না তো ইয়ার?'

'রেগে যাব, এমন কিছু বলবি নাকি?'

'আগে শোন—'

বৈশালী উত্তর দেয় না।

মধুরা বলে, 'তোর বাবার শক-থেরাপি দরকার।'

বুঝতে না পেরে বৈশালী বলে, 'মানে?'

'আঙ্কল যেমন গার্লফ্রেণ্ড জুটিয়ে নিয়েছেন, আন্টিকেও বল একজন বয়ফ্রেন্ড জোগাড় করতে। আন্টির ব্যাপারটা জানতে পারলে আঙ্কল টের পাবে, সব কিছু একতরফা হয় না। লাইক আ গুডি গুডি বয় পত্নীর আঁচলের তলায় ফিরে আসবে। অন্য কোনো দিকে তাকাবে না।'

বৈশালীর মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। বলে, 'মা-বাবাদের নিয়ে এই টাইপের অসভ্যতা আমি লাইক করি না। দিস ইজ টু মাচ—'

মধুরা বুঝতে পারছিল, বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। বৈশালীর একটা হাত ধরে বলে, 'কুল ডাউন বৈশালী, প্লিজ। যা বলেছি উইথড্র করে নিচ্ছি।'

বৈশালীর রাগ সহজে পড়ে না। তার রক্তচাপ একটা বিপজ্জনক সীমায় পৌঁছে গেছে। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে সে বলে, 'তোর কোনো কথা শুনতে চাই না।'

'অলরাইট অলরাইট, আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।'

ঘাড় গোঁজ করে বসে থাকে বৈশালী, উত্তর দেয় না।

মধুরা ফের তার হাত ধরে কাকুতি মিনতি করতে থাকে, 'প্লিজ—প্লিজ—প্লিজ—'

মেয়েটার মধ্যে অদ্ভুত এক সারল্য আর ছেলেমানুষি আছে। মেজাজ ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে বৈশালীর। সে বলে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন হাত ছাড়।'

মধুরা বৈশালীর গালে আলতো করে ঠোঁট ঠেকিয়ে বলে, 'থ্যাংক য়ু ইয়ার।'

ড্রইংরুমের আবহাওয়া আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে।

বৈশালী লক্ষ করে নি, মেঘনা প্রথম দিকে যতটা সহজ স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, পরে তার বহুগুণ মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। ম্লান মুখে অদ্ভুত এক কাতরতা ফুটে উঠেছে তার। হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে।

বৈশালীরা চমকে তার দিকে তাকায়। জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে রে?'

মেঘনা বলে, 'এতদিন তোদের একটা কথা বলিনি। দ্যাট ওয়াজ আওয়ার ফ্যামিলি সিক্রেট। আজ যখন তোরা সব বললি, আমারও এক্সপোজ করতে ইচ্ছে করছে।'

বিহ্বলের মতো মেঘনার দিকে তাকিয়ে থাকে বৈশালীরা।

মেঘনা বন্ধু হিসেবে চমৎকার। তাদের মতোই হই হই করতে পারে। তবু অস্পষ্টভাবে এতদিন মনে হয়েছে, কেমন একটু চাপা ধরনের। অনেক কিছুই সে গোপন রাখতে চায়। ওদের ফ্যামিলি সংক্রান্ত ব্যাপারে পারতপক্ষে কখনও কিছু বলে না। এই সম্পর্কে কথা উঠলে নিজেকে গুটিয়ে নেয়।

একসময় মধুরা জিজ্ঞেস করে, 'কী এক্সপোজ করতে ইচ্ছে করছে রে?'

মেঘনা বলে, 'আমার বাবা, আমার বাবা—'

'তোর বাবা কী?'

'আ পারফেক্ট স্কাউন্ড্রেল। এরকম ডিবচার খুব বেশি খুজে পাওয়া যাবে না।'

ড্রইংরুমের বাকি সবাই হতচকিত। বৈশালী সব্যসাচী সম্পর্কে বলার পর দেখা যাচ্ছে একটা ফ্লাড গেট খুলে গেছে। বন্ধুদের মুখ দিয়ে হুড় হুড় করে তাদের বাবাদের নানা স্ক্যান্ডাল বেরিয়ে আসছে। রঙিন কার্পেটের তলায় এত নোংরা জমে ছিল, কে ভাবতে পেরেছে! এই লোকগুলো শিক্ষিত, এস্টাব্লিশড, সোসাইটির চুড়োয় বসে আছে। বাইরে চকচকে পালিশ, কোট-প্যান্ট পরা এক একজন ঋষিতুল্য মানুষ। কিন্তু ভেতরটা একেবারে পচে গেছে। বাইরের রঙিন আবরণটুকু ছিঁড়ে ফেললে ভক করে দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসবে।

ঘরের শীতল পরিবেশও ভীষণ অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। বৈশালী বা মধুরা তাদের বাবাদের সম্পর্কে কিছুটা রেখে ঢেকে, মোটামুটি সংযত ভাষায় দোষারোপ করেছে। কিন্তু মেঘনার ভাষা স্পষ্ট, সোজাসুজি, চাঁচাছোলা। কম্পাসের নির্ভুল কাঁটার মতো সে অভিযোগের আঙুল তুলেছে তার বাবার দিকে। চাপা

ধরনের ইনট্রোভার্ট মেয়েটার ভেতর এমন একটা লুকনো আগ্নেয়গিরি ছিল, আর সেটা এভাবে বিস্ফোরণ ঘটাবে, কে জানতো!

মধুরা একসময় নিচু গলায় বলে, 'আঙ্কল, মানে তোর বাবাকে দু-চার বার দেখেছি। কিন্তু কখনও তো মনে হয় নি—'

মেঘনাকে উত্তেজিত দেখায়। গলার স্বর অনেকটা উঁচুতে তুলে সে বলে, 'বাইরের চেহারা দেখে কিছু বোঝা যায়? তোর মা-বাবা কি বৈশালীর বাবা সম্বন্ধে আমার ধারণাও তো অন্যরকম ছিল—ডিসেন্ট, সংসারের প্রতি ডিউটিফুল, কোনোভাবেই ইম্‌মরাল ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে পারে না। অথচ—'

মধুরা বলল, 'কিছু মনে করিস না, একটা কথা জানতে চাইছি।'

'না না, মনে করব কেন? তুই কী বলবি আমি গেস করতে পারছি। বাবা কী করেছে বা করে চলেছে নিশ্চয়ই তা জানতে চাস?'

অর্থাৎ তা-ই। মধুরা আস্তে মাথা নাড়ে।

মেঘনা শুরু করে। তার বাবা ইনকাম ট্যাক্স আর ওয়েলথ ট্যাক্সের নাম-করা কনসালটেন্ট। বড় বড় বিজনেস ম্যাগনেট আর ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা তাঁর ক্লায়েন্ট। এঁদের কেস নিয়ে মাসে কম করে তাঁকে দশ বার দিন দিল্লি মুম্বাই বাঙ্গালোর ছুটতে হয়। তাঁর ব্রিফকেসে বিভিন্ন উড়ানের গোছা গোছা ওপেন টিকিট থাকে। সবই ক্লায়েন্টদের কিনে দেওয়া। কখন কোন শহরে কার কেস পড়বে এবং তাঁকে সেখানে উড়ে যেতে হবে, আগে তো বলা যায় না। ফ্লাইট ধরার আগে ট্র্যাভেল এজেন্টকে দিয়ে টিকেটগুলো শুধু কনফার্ম করিয়ে নেন। আকাশেই তাঁর অনেকটা সময় কেটে যায়।

মেঘনার বাবা নিরঞ্জন দত্তচৌধুরির মতো ধুরন্ধর ট্যাক্স কনসালটেন্ট কলকাতায় তো বটেই, সারা ইণ্ডিয়ায় ক'জন আছেন, গুনে বলা যায়। ইনকাম ট্যাক্স আর ওয়েলথ ট্যাক্স অফিসারদের মধ্যে সবাই জিতেন্দ্রিয় শুকদেব নন। এঁদের অনেকেই তাঁর এক গেলাসের ইয়ার। আইনের নানা ফাঁকফোকর বার করে এবং অফিসারদের বন্ধুত্বটাকে শতকরা এক শ ভাগ কাজে লাগিয়ে তিনি ক্লায়েন্টদের লাখ লাখ টাকা বাঁচিয়ে দেন। মক্কেলরা তার পুরস্কার দিতে জানে। চেকে আর ক'টা টাকা দেয়! মোটা মোটা খামে কড়কড়ে কারেন্সি নোট বোঝাই করে দিয়ে যায়। এই নগদ টাকার সবটাই কালো। আর ব্ল্যাক মানি মানেই তো হাজার গণ্ডা ভাইস—অ্যালকোহল, মেয়েমানুষ এবং আনুষঙ্গিক অনেক কিছু। নিরঞ্জন দত্তচৌধুরি এর মধ্যেই মাথার চাঁদি পর্যন্ত ডুবে আছেন। লোকটা দু-কান কাটা, বেপরোয়া, লম্পট। বেশির ভাগ বদমাশেরই তবু কিছু লোকলজ্জা আছে। যা করে—লুকিয়ে ছাপিয়ে। কিন্তু নিরঞ্জনের ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। যা করেন বুক চিতিয়ে, সারা পৃথিবীকে জানান দিয়ে। মাঝে মাঝেই দারুণ মড চেহারার কোনো যুবতীকে বাড়ি নিয়ে আসেন। সঙ্গে করে আনেন হুইস্কি আর কোনো নাম-করা রেস্তোরাঁর ডিনার প্যাকেট। একটা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ড্রিংকের সঙ্গে আর যা চালান তা মুখে আনতে মাথা কাটা যায়। মেঘনা আর তার মা অন্য একটা ঘরে শ্বাসরুদ্ধের মতো জেগে থাকে। সারা রাত কাটিয়ে মেয়েটা পরদিন সকালে চলে যায়। দিনের পর দিন এইভাবে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছেন নিরঞ্জন।

মধুরা ম্রিয়মাণ সুরে বলে, 'আনথিংকেবল। যা বলছিস সত্যি তো?'

মেঘনার ওপর হিস্টিরিয়া ভর করে যেন। চিৎকার করে বলে, 'সত্যি সত্যি সত্যি। হানড্রেড পারসেন্ট ট্রু। লোকটা কত বড় শয়তান, কত বড় ডেভিল, ভাবতে পারবি না।' বহুদিনের অবদমিত ক্রোধ ক্ষোভ এবং ঘৃণা ফেটে বেরিয়ে আসে তার গলার ভেতর থেকে।

'তোরা কিছু বলিস না? প্রোটেস্ট করতে পারিস না?' তীব্র গলায় এবার চেঁচিয়ে ওঠে মধুরা।

আগের সেই হিস্টিরিয়ার ঘোরটা হঠাৎ মেঘনার ওপর থেকে সরে যায়। অনন্ত হতাশা তাকে যেন গ্রাস করে। ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, 'নো ওয়ে। কোনো উপায় নেই।'

'মানে?'

মেঘনা যা উত্তর দেয় তা এইরকম। তার মা চারুলতা গরিব স্কুল মাস্টারের মেয়ে। অসাধারণ রূপসী বলে তাঁকে বিয়ে করেছিলেন নিরঞ্জন। অবশ্য তখন এমন জমকাল পশার ছিল না তাঁর, শত

দিক থেকে এত অঢেল টাকাও আসত না।

নিরঞ্জনের কুকর্মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে বাড়ি ছাড়তে হবে মেঘনাদের। কিন্তু কোথায় যাবে? তার স্কুল টিচার দাদামশাই অনেক আগেই মারা গেছেন। একমাত্র মামা ছোটখাট একটা চাকরি করে, কোনোরকমে টায়টোয় সংসার চালায়। তারা গেলে বাড়তি বোঝা টানার মতো শক্তি তার নেই। অতএব চূড়ান্ত অমর্যাদা এবং গ্লানির ভেতরেই তাদের পড়ে থাকতে হবে।

মেঘনা ভাঙা গলায় বলতে তাকে, 'উই হ্যাভ নোহোয়ার টু গো—নোহোয়ার। যার এতটুকু সেলফ রেসপেক্ট আছে সে ও বাড়িতে একটা সেকেণ্ডও থাকতে পারে না। কিন্তু মা আর আমি মানুষ নেই, কুকুর-বেড়ালেরও নিচের লেভেলে পড়ে আছি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

সুরূপা একদৃষ্টে মেঘনাকে লক্ষ করছিল। আচমকা বলে ওঠে, 'এতদিন তোদের বলি নি। আই টু সাসপেক্ট মাই ফাদার। হি ইজ নট আ ক্লিন পার্সন।'

সবাই চমকে ওঠে। মধুরা সামনের দিকে ঝুঁকে বলে, 'মানে?'

সুরূপা বলে যায়। তার বাবা বিখ্যাত সার্জন ডাক্তার অনিমেষকান্তি বর্ধনের কেসটা মধুরা বা মেঘনার বাবাদের মতো অতটা নির্লজ্জ বা খোলামেলা নয়। তিনি একজন ছুপা রুস্তম। তাঁর নিজস্ব বিশাল একটা নার্সিং হোম রয়েছে। হঠাৎ একদিন হাওয়ায় হাওয়ায় গুঞ্জন ভেসে এল, নার্সিং হোমের এক সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী ও.টি নার্সের সঙ্গে তাঁকে এমন এক ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে দেখা গেছে যা যেমনই দৃষ্টিকটু তেমনই আপত্তিকর।

সুরূপার মা মৃণালিনী জবরদস্ত মহিলা। তিনি সুচরিতার মতো স্বামীর শ্রীচরণে গভীর বিশ্বাসে নিজেকে সমর্পণ করার পাত্রী তো ননই, আবার মেঘনার মা চারুলতার মতো নিরুপায়ও নন। মৃণালিনী মধ্য কলকাতার বনেদি বংশের মেয়ে, অঢেল টাকা তাঁদের, নিজেও উচ্চশিক্ষিত। অর্থাৎ বাপের বাড়ির দিক থেকে যথেষ্ট খুঁটির জোর আছে। বাবা হাইকোর্টের জজ ছিলেন, দুই দাদা প্রতিষ্ঠিত। একজন আই পি এস, আর একজন চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট। সব চেয়ে বড় কথা, মৃণালিনীর প্রচণ্ড অধিকারবোধ। স্বামী তাঁর আঁচলের তলা থেকে বেরিয়ে অন্য মাঠে চরতে যাবে, এটা তিনি কিছুতেই মেনে নেন নি। গুজবটা কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে নার্সিং হোমে হানা দিয়ে সেদিনই নার্সটিকে বরখাস্তের নোটিশ ধরিয়ে দিয়েছেন। সেদিন থেকেই নিজে স্বামীর ছায়া হয়ে গেছেন। ডাক্তার বর্ধন যখনই নার্সিং হোমে বেরোন, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গাড়িতে উঠে বসেন। ফেরেন একসঙ্গে। স্বামীর গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্য দু-একটা স্পাইও লাগিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু কোনো কিছুই পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হবার মতো ফুল-প্রুফ নয়। নার্সিং হোমে চোখে চোখে রাখা সম্ভব। কিন্তু মাঝে মাঝে ডাক্তার বর্ধনকে পেশেন্টের বাড়ি যেতে হয়। সেখানে মৃণালিনী সঙ্গে যাবেন, সেটা যেমন শোভন নয় তেমনি অসম্ভবও। পাহারাদারি করার জন্য তিনি স্বামীকে পুলিশ মার্কিং করে চলেছেন, এটা জানাজানি হলে স্ক্যান্ডালের আর সীমা থাকবে না।

ডাক্তার বর্ধনের সঙ্গে ও.টি নার্সটির সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, এটা আদৌ বিশ্বাস করেন না মৃণালিনী এবং সুরূপা। তাদের ধারণা, দু'জনের মধ্যে গোপন যোগাযোগ আছে। ডাক্তার বর্ধন যে রোগীদের বাড়ি যান—এই সময়টা হল এরিয়া অফ ডার্কনেস। রোগী দেখতে যাবার ছুতোয় তিনি নিশ্চয়ই নার্সটির কাছে যান।

সুরূপা বলল, 'বাবা কাল বাঙ্গালোর গেছে। অল ইণ্ডিয়া হার্ট সার্জনদের একটা কনফারেন্স আছে সেখানে। বাবা ভাইস প্রেসিডেন্ট। মা আর আমি সিওর, ওই নার্সটিকে বাবা গোপনে সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছে। মা ইচ্ছা করেই প্রথমে বলেছিল বাবার সঙ্গে যাবে না। বাবা দারুণ খুশি কিন্তু কাল প্লেনের টিকেট কাটার আগে হঠাৎ বলে বসল, যাবে। তখন বাবার চেহারা যদি দেখতিস! একেবারে মিইয়ে গেল। অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করল, এই লাস্ট মোমেন্টে টিকেট পাওয়া যাবে না। মা বলল, টিকেটের জন্যে ভাবতে হবে না। আমার আই পি এস মামাকে দিয়ে ভি আই পি কোটায় একটা টিকেট বার করে বাবার সঙ্গে বাঙ্গালোর চলে গেছে।'

'তারপর?'

'তারপর বলতে?'

'সেই নার্স মহিলাটির কী হল?'

'দ্যাট আই কান্ট সে। খুব সম্ভব বাবা তার যাওয়াটা ক্যানসেল করিয়েছে। আর যদি সত্যিই গিয়ে থাকে, দ্যাট উড আ টেরিবিল থিং। আমি ভাবতে পারছি না।' বলে একটু থেমে সুরূপা ফের শুরু করে, 'মা আজ সকালে ফোন করেছিল, কোনোরকম খারাপ ইনডিকেশন নেই। তারপর দেখা যাক।'

মধুরা জিজ্ঞেস করে, 'তোর মা, মানে আন্টি কী ঠিক করেছেন, বাকি লাইফ আঙ্কলকে চোখে চোখে রাখবেন?'

'পুলিশ মার্কিং ছাড়া উপায় কী। বাবাকে এভাবে যতটা কনট্রোলে রাখা যায়। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

সুরূপা জানায়, ঘরের যে বেড়াল ঠিক করেছে, লুকিয়ে চুরিয়ে বাইরের এঁটোকাঁটায় মুখ দেবে, তাকে পুরোপুরি আটকানো মুশকিল।

হঠাৎ মধুরার খেয়াল হল, কথায় কথায় তারা বহুদূরে সরে এসেছে। বৈশালীর ব্যক্তিগত সমস্যার কথা শুনে তার একটা সলিউশন বার করার জন্য তারা সুরূপাদের এই ড্রইংরুমে জড়ো হয়েছে। কিন্তু ফোকাসটা আর সেখানে নেই।

বৈশালীর দিকে ঘুরে বসে মধুরা। বলে, 'এখন দেখলি তো অল দা ড্যাডিস আর ডিবচিস—এক একটি দু-কান কাটা লম্পট। ডে টু ডে লাইফে তোদের যখন কোনোরকম অসুবিধে হচ্ছে না তখন ব্যাপারটা মাথা থেকে বার করে দে। লাইফ ইজ নাউআডেজ সো কমপ্লিকেটেড ইয়ার। বাবার স্ক্যান্ডাল ধরে বসে থাকলে অন্য কোনো দিকে মন দিতে পারবি না।'

বৈশালী দূরমনস্কর মতো ভাবছিল। মধুরার কথাগুলো কিছু কিছু তার কানে যাচ্ছে, বাকিটা শুনতে পাচ্ছিল না। সব্যসাচীর ব্যাপারটা যেন মায়াদর্পণ। সেখানে শুধু তাঁরই গোপন ছায়া পড়ে নি, মধুরা সুরূপা এবং মেঘনার বাবাদেরও প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। তবে কি ধরে নিতে হবে, যে কোনো একটি পুরুষকে ভাগ করলে তার একটা অংশ স্বামী, একটা অংশ বাবা, একটা অংশ সামাজিক মানুষ এবং বাকি অংশটা লম্পট? তার লাম্পট্যের চেহারাটা কখনও, কখনও গোপন থাকে। যারা মেঘনার বাবার মতো বেপরোয়া, তারা ডুবে ডুবে জল খায় না। যা করার সবার চোখের সামনেই করে। কে কী ভাবল না ভাবল, গ্রাহ্যই করে না।

মধুরা ফের বলে, 'জানিস তো, মেয়েদের বয়স হলে সেক্স সম্পর্কে ইন্টারেস্ট কমে যায়। কিন্তু পুরুষদের ব্যাপারটা টোটালি ডিফারেন্ট। পঞ্চাশ থেকে ষাট, এই এজ গ্রুপের ভেতর যারা পড়ে তারা ডেঞ্জারাস। স্ত্রীর কাছ থেকে স্যাটিসফ্যাকশন পায় না। তখন লুকিয়ে চুরিয়ে পচা নালিয়ায় গিয়ে মুখ গোঁজে। সো—'

বৈশালী বলে, 'সো হোয়াট?'

'তোর বাবা যা করছে করুক। ফরগেট ইট।' বলে মধুরা অন্য বন্ধুদের দিকে তাকায়, 'কি রে, ঠিক বললাম?'

বন্ধুরা জানায়, এ ছাড়া উপায় কী? বাবাদের বদমাইশির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে পারিবারিক বিপর্যয় ঘটে যাবে। বৈশালী খুশি হয় না। নিজের অজান্তেই বংশের সম্ভ্রম এবং পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব যেন তার ওপর এসে পড়েছে। অসুস্থ আর স্মৃতিভ্রষ্ট হবার আগে ঠাকুমা বুঝিবা পারিবারিক সুনামের পতাকাটি তার হাতে তুলে দিয়েছেন। সেটা উঁচুতে তুলে রাখতেই হবে। এই মূল্যবান লিগ্যাসির গায়ে সে কালির ছিটে লাগতে দেবে না।

বৈশালী বলল, 'তোদের অ্যাডভাইস মেনে নিতে পারছি না।'

মধুরা সামান্য অসহিষ্ণু সুরে বলল, 'আরে ইয়ার, সময় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। অত ভিক্টোরিয়ান পিউরিটানিজম ধরে বসে থাকলে চলে না।'

বৈশালী উত্তর দেয় না। মধুরাদের মতো হতে পারলে বাবার ব্যাপারটা সে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারত। কিন্তু বনলতা দেবী আর ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন তার অস্থি-মজ্জায় বহুদূর পর্যন্ত শিকড় ছড়িয়ে রেখেছে। সেটা উপড়ে ফেলা অসম্ভব।

মধুরা ফের বলে, 'অ্যাডজাস্ট করে নে।' তার বক্তব্য, এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে অত ভাবতে নেই। মিউজিক, ডান্স, ট্র্যাভেল, ফিল্ম, ফান—জীবন প্লেটে করে কত কিছু সাজিয়ে রেখেছে। ফালতু কষ্ট না পেয়ে, জাস্ট এনজয়।

বৈশালী ধীরে ধীরে বলে, 'দ্যাখ, আমার মাইণ্ডসেটটা অন্যরকম। তোদের সঙ্গে ঠিক মিলবে না।'

মধুরা স্থির চোখে বন্ধুর দিকে তাকায়। বৈশালী মরালিটির ব্যাপারে যে এতটা একগুঁয়ে তার ধারণা ছিল না। অবশ্য এ বিষয়ে আগে কখনও তাদের কথা হয় নি। হলে ওর অনমনীয়তাটা টের পাওয়া যেত।

মধুরা জিজ্ঞেস করল; 'কী করতে চাস তুই? আঙ্কলের সঙ্গে স্ট্রেটওয়ে কনফ্রনটেশন?'

রীতিমত জোর দিয়ে বৈশালী বলে, 'এগজাক্টলি তাই। আই মাস্ট নট লেট হিম অফ সো ইজিলি। কিন্তু সেই মহিলাটির নাম ঠিকানা জানি না। তাকে খুঁজে বার করতে না পারলে কিছুই করা যাবে না। বাবা যদি জিজ্ঞেস করে কে সেই মহিলা? উত্তর দিতে পারব না। বাড়ির পরিস্থিতিটা তখন কিরকম দাঁড়াবে, ভাবতে পারিস? আমাকে হয়তো ঘাড় ধরে বার করে দেবে।'

মধুরা বলল, 'সো ফাইণ্ড আউট দ্যাট ওম্যান। যদি এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য দরকার হয় করব। অ্যান্ড দেন—'

'দেন কী?'

'এক মেয়ে আর তার ফাদারের ব্যাটল রয়ালের জন্যে ওয়েট করে থাকব।'

সাত

দিন পাঁচেক কেটে যায়।

এর ভেতর কোথাও এতটুকু হেরফের ঘটে নি। বৈশালীদের ফার্ন রোডের বাড়ির সমস্ত কিছু একই আহ্নিক গতির নিয়মে চলছে। দাদার টো টো করে বেড়ানো, ঘড়ির কাঁটা ধরে বাবার অফিসে যাওয়া, মায়ের রান্নাবান্না, পুজোর ঘরে দু ঘণ্টা কাটানো, সন্ধে থেকে টিভিতে বাংলা সিরিয়াল দেখা—সবই এক ছকে বাঁধা, গতানুগতিক। একটা দিন যেন আর একটা দিনের হুবহু জেরক্স কপি।

এই পাঁচ দিনে স্মৃতির ভেতর পাতি পাতি করে খুঁজেও সেই মহিলার হদিস পাওয়া যায় নি। অসহ্য রাগে নিজের চুলের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকাবার হিংস্র একটা ইচ্ছা মাঝে মাঝে তাকে পেয়ে বসেছে। স্মৃতিশক্তি নিয়ে তার একটা গর্ব ছিল, সবাই বলত তার নাকি ফোটোগ্রাফিক মেমোরি। কিন্তু এই জায়গাটায় ডাহা ফেল সে।

চারপাশের সকলকে দেখে মনে হয় কেমন নিশ্চিন্ত, ভারমুক্ত, ফুরফুরে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। তাকেই শুধু অদ্ভুত এক অস্থিরতা তাড়া করে বেড়াচ্ছে। খেতে ভাল লাগে না, চোখে ঘুম আসে না, পড়ায় মন নেই, সর্বক্ষণ অন্যমনস্ক। বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও না বেরুলে চোখের ওপর আড়াআড়ি দুই হাত রেখে চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকে। মাথার ভেতর মহিলার চিন্তাটা ঘুণপোকার মতো শিরা কেটে যায়। কেন যে সে এত জেদী, এত একবগ্‌গা? কেন মধুরাদের মতো হতে পারে না সে? যে চিন্তাটা ফিক্সেশনের মতো তার মস্তিষ্কে আটকে আছে সেটা ঝেড়ে ফেললেই তো হয়। কিন্তু পারছে কই?

এই পাঁচ দিনে স্মৃতি হাতড়ানো ছাড়াও অন্যভাবে মহিলার খোঁজ করেছে বৈশালী। একদিন ডিনার টেবলে সব্যসাচীকে লক্ষ করতে করতে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আচ্ছা বাবা, তোমার কাছে অনেকে আসে। কেউ চাকরির জন্যে, কেউ ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট নিতে, কেউ অন্য দরকারে।'

সব্যসাচী বলেছেন, 'হ্যাঁ, আসেই তো। দেখিস না, এক এক দিন মেলা লেগে যায়।' একটু থেমে কী ভেবে জিজ্ঞেস করেছেন, 'হঠাৎ ওদের কথা জানতে চাইছিস?'

'এমনি মনে হল। যাদের তুমি সার্টিফিকেট দাও বা যাদের রেকমেণ্ড কর, তাদের নাম-টাম মনে থাকে?'

'এত নাম মনে রাখতে হলে তো মাথার ভেতর কম্পিউটার বসাতে হয়।'

বৈশালী বলেছে, 'যাদের নাম তুমি রেকমেণ্ড কর, কি যাদের ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দাও, সেগুলো

নিশ্চয়ই ওরা চাকরি টাকরির জন্যে নানা জায়গায় দেখায়?'

'দেখাবার জন্যেই তো দেওয়া।'

'ধর যেখানে যেখানে ওগুলো দেখানো হয় সেই সব জায়গা থেকে তোমাকে কন্ট্যাক্ট করল, জানতে চাইল তোমার সার্টিফিকেটগুলো জেনুইন কিনা, তখন কী করবে? নাম টাম মনে না থাকলে হয়তো বলে ফেললে এমন কাউকে চেনো না। তখন কী অবস্থা হবে—'

বৈশালীকে থামিয়ে দিয়ে সব্যসাচী বলেছেন, 'এই ব্যাপার? যাদের সার্টিফিকেট দিই তাদের নাম ঠিকানা একটা খাতায় তারিখ দিয়ে লিখে রাখি। খাতাটা দেখে বলে দিই। কি, টেনসন কাটল?'

বৈশালীর মনে পড়েছিল, কেউ সার্টিফিকেট নিতে এলে সব্যসাচী রেক্সিনে বাঁধাই মোটা খাতা নিয়ে বসেন। তাদের সঙ্গে কথা বলে কী সব টুকে রাখেন। সে ঠিক করে ফেলেছিল, ওই খাতাটা খুঁজে বার করবে। ওটার ভেতর সেই মহিলার হদিস পাওয়া যেতে পারে।

পরদিন বাবা অফিসে বেরিয়ে যাবার কয়েক মিনিট বাদেই দাদা চক্কর দিতে বেরুল। তার কিছুক্ষণ পর মা রান্নাটান্না চুকিয়ে রুটিন অনুযায়ী পূজারিণী বেশে ছাদে চলে গেলেন। দোতলাটা এখন একেবারে ফাঁকা। এই সুযোগটার জন্য নিজের ঘরে বসে অপেক্ষা করছিল বৈশালী। তাড়াতাড়ি উঠে ড্রইংরুমে চলে এসেছে সে।

তখন এগারটা বেজে পাঁচ। সুচরিতা বারটার আগে নিচে নামবেন না। পুরো এক ঘন্টা সময় বৈশালীর হাতে আছে। এর ভেতর যা করার করে ফেলতে হবে।

খাতাটা সম্পর্কে আগে কখনও বিন্দুমাত্র কৌতূহল হয় নি তার। হলে খোঁজাখুঁজির দরকার হত না। সব্যসাচী কোথায় সেটা রাখেন আগেই সে লক্ষ করত এবং চট করে সেখান থেকে বার করে আনতে পারত।

কোথায় থাকতে পারে খাতাটা? বৈশালী ভাল করে ভেবে নিয়েছে। দু'ধারের দেওয়াল জোড়া যে বুক কেস রয়েছে, তার ভেতরেই কি? কাচের স্লাইডিং দরজাগুলো ঠেলে প্রতিটি তাক তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে কিন্তু বই ছাড়া আর কিছুই নেই।

ড্রইংরুম থেকে এবার মা-বাবার বেডরুমে চলে যায় বৈশালী। ঘরটা বিশাল। পঁচিশ ফিট বাই বিশ ফিট। মাঝখানে ডবল-বেড খাটে নিভাঁজ ফিটফাট বিছানা। ওয়ার্ডরোড, ড্রেসিং টেবল, ইত্যাদি ছাড়াও সব্যসাচীর ফাইল দেখা এবং নোট লেখার জন্য রয়েছে একধারে টেবল চেয়ার আলমারি ইত্যাদি।

আলমারি এবং ওয়ার্ডরোবের গায়ে চাবি ঝুলছিল। মা বেশ ভুলো টাইপের। আলমারি টালমারি বন্ধ করে চাবির থোকা যে লুকিয়ে রাখবে সেটা খেয়ালই থাকে না। হয়তো থাকত, যদি এ বাড়ির কাজের লোকেরা চোর ছ্যাঁচড় হত। কিন্তু ময়না সাবিত্রী এবং মহাদেব অত্যন্ত বিশ্বাসী। টাকাপয়সা গয়না টয়না কত সময় সুচরিতা এখানে ওখানে ফেলে রাখেন। আজ পর্যন্ত একটা পয়সাও খোয়া যায় নি।

আলমারি, ওয়ার্ডরোব, সব্যসাচীর টেবলের ড্রয়ার, এমন কি মায়ের ড্রেসিং টেবল পর্যন্ত ওলট পালট করে দেখেছে বৈশালী কিন্তু রেজাল্ট শূন্য। গুপ্তধনের সন্ধান নেই। ঘন্টাখানেক জামা কাপড় এবং নানা জিনিসপত্র হাঁটকে ফের সেগুলো গোছগাছ করে রেখে যখন নিজের ঘরে ফিরে এল, স্বাভাবিক কারণেই তখন সে বেশ হতাশ। হঠাৎ তার মনে হয়েছে, সব্যসাচী কি ওই খাতাটা অফিসে রাখেন, নাকি ওটা তাঁর অ্যাটাচিতে থাকে? তা হলে পাওয়ার আশা নেই বললেই হয়। বাবাকে তো বলা যায় না, খাতাটা আমাকে দাও।

মহিলার চিন্তাটা এক সেকেণ্ডও বৈশালীকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না; অনবরত তাকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে। এর ভেতর একদিন দুপুরে পড়ার টেবলে বসে টেক্সট বুকের পাতা ওলটাচ্ছে; মা তাঁদের ঘরে ঘুমোচ্ছেন, হঠাৎ তার মনে হল, এমনও তো হতে পারে মহিলা বাবার অফিসেও মাঝে মাঝে যায়। এ ধরনের সম্ভাবনার পেছনে জোরাল যুক্তি নেই। একজন অত্যন্ত দায়িত্ববান বড় মাপের অফিসার তাঁর গোপন প্রেমিকাকে অফিসে আসতে বলবেন, এটা ভাবা যায় না। সব্যসাচী অতটা নির্বোধ নন।

কিন্তু বেয়াড়া একটা জেদ বৈশালীর মাথায় ভর করে। যে লোক জাহান্নামের রাস্তায় পা বাড়িয়েছে সে যত চতুরই হোক, কখনও না-কখনও বোধবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। সে ঠিক করে ফেলল এখনই বাবার অফিসে হানা দেবে। মহিলার দেখা পাওয়ার চান্স নিরানব্বই পারসেন্টই নেই, তবু যাবে।

একটা ঢোলা কাফতান পরে ছিল বৈশালী। সেটা ছেড়ে জিনস্ আর শার্ট পরল, চুলে বারকয়েক দ্রুত চিরুনি চালাল। তার পর রিস্টওয়াচ হাতে লাগিয়ে স্টিলের ব্যান্ড আটকাতে আটকাতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল।

ড্রইংরুমে ময়না আর সাবিত্রী শুয়ে ছিল। দুপুরটা ওদের বিশ্রামের সময়। য়ে থাকলেও ওরা কেউ ঘুমোয় নি। একধারে জুতোর র‍্যাক থেকে একজোড়া স্লিপার পায়ে গলাতে গলাতে সে সাবিত্রীকে বলল, 'আমি এখন একটু বেরুচ্ছি। বিকেলে ফিরে আসব। মায়ের ঘুম ভাঙলে বলে দিও। যদি দেরি হয়, ফোন করব।'

'আচ্ছা—' মাথা নাড়ল সাবিত্রী।

গোল পার্কের মুখ থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সব্যসাচীর অফিসের সামনে চল্লিশ মিনিটের ভেতর পৌঁছে গেল বৈশাখী।

অফিস বিল্ডিংটা বিশাল হাই-রাইজ। বাড়িটা সে আগেই চিনত, তবে কখনও ভেতরে ঢোকেনি। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে প্রকাণ্ড গেট পার হয়ে কমপাউণ্ডের মধ্যে চলে এল। একে ওকে জিজ্ঞেস করতে করতে লিফটে করে সেভেনথ ফ্লোরে এসে সব্যসাচীর চেম্বারের খোঁজ পাওয়া গেল।

চেম্বারের বাইরে একটা বেয়ারা বসে ছিল। সব্যসাচীর সঙ্গে দেখা করবে বলতেই স্লিপ প্যাড বৈশালীকে দিয়ে বলল, 'নাম ঠিকানা লিখে দিন।'

বৈশালী বলতে পারত, সব্যসাচী দাশগুপ্ত তার বাবা, কিন্তু বলল না। নিঃশব্দে নামটাম লিখে দিল।

কাছেই, চেম্বারের বাঁ পাশে ঘেরা জায়গায় লম্বা তিন চারটে সোফা। ওটা দর্শনার্থীদের ওয়েটিং রুম। সেখানে পাঁচ ছ'জন বসে আছে। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে বেয়ারাটা বৈশালীকে বলল, 'আপনি ওখানে বসুন।' বলে স্লিপটা নিয়ে সব্যসাচীর চেম্বারে ঢুকে গেল।

ক'পা এগিয়ে তীর্থের কাকের মতো যে লোকগুলো অপেক্ষা করছে, তাদের পাশে বসে পড়ল বৈশালী। হঠাৎ নতুন একটা চিন্তা তাকে অন্যমনস্ক করে ফেলে। তাকে দেখলে সব্যসাচীর কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে? অসন্তুষ্ট হবেন, না খুশি? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। বৈশালী সামান্য অস্বস্তি বোধ করল। পরক্ষণে ভাবল, যা-ই হোক, সে পরোয়া করে না।

বেয়ারাটা ভেতরে ঢোকার পর তিরিশ সেকেণ্ডও কাটল না, প্রায় ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলেন সব্যসাচী। বললেন, 'কী রে, তুই!'

বাবা যে কতটা অবাক হয়েছেন সেটা তাঁর চোখ মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল। বৈশালী উঠে দাঁড়ায়।

সব্যসাচী বললেন, 'ভেতরে চল—'

চেম্বারটা বিরাট। ওয়াল-টু-ওয়াল কার্পেট, ঝকঝকে ক্যাবিনেট, দুই দেওয়ালে এয়ার-কুলার, মাঝখানে আধখানা বৃত্তের আকারে বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবল, নানা রঙের চার পাঁচটা টেলিফোন, দামি পর্দা ইত্যাদি দিয়ে চমৎকার সাজানো।

সেক্রেটারিয়েট টেবলটার ওধারে একটা রিভলভিং চেয়ার। বোঝাই যায় সেটা সব্যসাচীর জন্য সংরক্ষিত। টেবলের ওধারে আরো আট দশটা গদিমোড়া আরামদায়ক চেয়ার রয়েছে। তেমন একটা চেয়ারে দামি স্যুটপরা একজন মধ্যবয়সী অবাঙালি ভদ্রলোক বসে ছিলেন। তাঁকে পরের সপ্তাহে আসতে বলে সব্যসাচী বৈশালীকে বললেন, 'বোস—'

ভদ্রলোক চলে গেলেন। বৈশালী বসে পড়ল। সব্যসাচীও তাঁর চেয়ারটিতে বসলেন। তাঁর চোখে মুখে চাপা ঔৎসুক্য। বললেন, 'হঠাৎ তুই আমার অফিসে!'

বাবার এ ধরনের কৌতূহল যে মেটাতে হবে, বৈশালী তা জানত। বলল, 'মধুরাদের সঙ্গে এদিকে এসেছিলাম। ভাবলাম এত কাছে যখন এসেছি তোমার সঙ্গে দেখা করে যাই। তাই—'

সব্যসাচী তার সব বন্ধুকেই চেনে। মজা করে ওদের চারজন সম্বন্ধে বলেন, চতুর্ভুজ ক্লাব। বললেন,

'একা এলি কেন? ওদের নিয়ে এলেই পারতিস।'

'মধুরা এই রাস্তাতেই অন্য একটা বিল্ডিংয়ে ওদের বাবার অফিসে গেছে। মেঘনা আর সুরূপা নিচে গাড়িতে বসে আছে। ওরা আসতে চাইল না।' বলেই বুঝতে পারল মিথ্যে বলার অনেক বিপদ। প্রথমত সে জানে না, মধুরার বাবার ইমপোর্ট এক্সপোর্ট অফিসটা ঠিক কোথায় এবং এই এলাকাতেই কিনা। এ সম্পর্কে সব্যসাচী যদি খুঁটিনাটি জানতে চান এবং বেয়ারা পাঠিয়ে মেঘনা এবং সুরূপাকে ডেকে আনতে বলেন, ভীষণ বিপাকে পড়তে হবে। অস্বস্তি হতে লাগল বৈশালীর।

কিন্তু সব্যসাচী মধুরার বাবার অফিস বা মেঘনা আর সুরূপা সম্পর্কে কোনোরকম আগ্রহ দেখালেন না। বললেন, 'কী খাবি বল—'

বৈশালী অনেকটা আরাম বোধ করল। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তার এতদূর ছুটে আসা ফের সেটা মস্তিস্কের ভেতর সক্রিয় হয়ে ওঠে। সব্যসাচীর চেম্বারের সামনে তাঁর দর্শনার্থীদের জন্য যে এনক্লোজার রয়েছে সেখানে সেই মহিলাকে দেখা যায় নি। চেম্বারের ভেতরেও সে নেই। নিশ্চিত ভাবেই থাকবে না, তবু যদি বাবার ভুলচুক হয়ে যায়, সেই সুযোগটাই নিতে চেয়েছিল সে।

সব্যসাচী বললেন, 'কী রে, চুপ করে আছিস যে! কী আনাব বল—'

মহিলা নেই। বৈশালীর দুই চোখ টেবিলের ওপর রাখা নানা ধরনের ফাইল, ডায়েরি, দেওয়ালের ধার ঘেঁষে নিচু ক্যাবিনেটগুলোর ভেতর প্রচুর বইপত্রের ভেতর অস্থিরভাবে ছোটাছুটি করতে লাগল। তারই মধ্যে খানিকটা অন্যমনস্কর মতো বলল, 'এই তো সবে ভাত খেয়েছি। এক ঘন্টাও হয়নি। এখন আর কিছু খাব না।'

সব্যসাচী বললেন, 'খাব না বললেই হবে নাকি? ঠিক আছে, তোর বলতে হবে না।'

চেম্বারের সামনের সেই বেয়ারাটিকে ডেকে কী সব আনতে বললেন সব্যসাচী, ভাল করে শুনতে পেল না বৈশালী। তার দুই চোখ চারদিক তল্লাশি চালিয়েই যাচ্ছে। বাবার সেই বাঁধানো মোটা খাতাটার কী রং ছিল— মেরুন, সবুজ, নীল, না গোলাপি? এক্ষুনি মনে পড়ছে না। তবে স্মৃতির ভেতর আবছাভাবে সেটা থেকে গেছে। একবার দেখলেই চিনতে পারবে।

টেবলের ওপর বিভিন্ন ধরনের ফাইলটাইল বা দুটো ক্যাবিনেটের ভেতর বইপত্রের ভেতর খাতাটা দেখা যাচ্ছে না। তবে কি ওটা তাঁর টেবলের ড্রয়ার বা অ্যাটাচিতে রয়েছে? তা হলে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। বাবাকে তো বলা যায় না তোমার ড্রয়ার বা অ্যাটাচিটা সার্চ করব।

সব্যসাচী মেয়েকে লক্ষ করছিলেন। বললেন, 'অত খুঁটিয়ে কী দেখছিস রে?'

বৈশালী চমকে ওঠে। পরক্ষণে সামলে নিয়ে একটু হেসে বলে, 'তোমার চেম্বারের ক্যাবিনেটগুলো খুব সুন্দর। তাই দেখছিলাম।'

সব্যসাচীদের ফার্ন রোডের বাড়ির আসবাবপত্রের বেশির ভাগই বৈশালীর পছন্দ অনুয়ায়ী তৈরি করানো হয়েছে। তার রুচি ভাল। কোথাও নতুন ধরনের ক্যাবিনেট দেখলে তার ইচ্ছা হয় তাদের বাড়িতেও ওইরকম একটা বানানো হোক। সব্যসাচী ভাবলেন, তাঁর অফিসের ওই নিচু ক্যাবিনেটটা বৈশালীর ভাল লেগেছে। হয়তো এরকম একটা করে দেবার জন্য সে ফরমাশ করবে।

হাসিমুখে সব্যসাচী বললেন, 'যা না, সামনে দিয়ে দ্যাখ।'

সুযোগটা সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগাল বৈশালী। বড় বড় পা ফেলে ক্যাবিনেটটার সামনে চলে এল। তারপর মুখ ফিরিয়ে একবার বাবার দিকে তাকাল। সব্যসাচী মগ্ন হয়ে একটা ফাইল দেখছেন। বৈশালী নিঃশব্দে কাচের মসৃণ স্লাইডিং ডোর ঠেলে একের পর এক বই বার করে দেখতে লাগল। কিন্তু না, খাতাটা নেই।

কিছুটা হতাশ হয়েই ফের বাবার সামনে এসে বসে সে। শিশুর অপার সারল্য নিয়ে এবার টেবলের ওপর ডায়েরি টায়েরি দেখতে থাকে। ফাইলে চোখ রেখেই সব্যসাচী বললেন, 'টুকরো টাকরা অনেক দরকারি কাগজ আছে। দেখিস পড়ে না যায়—'

'না না, পড়বে না।'

বেয়ারা প্রচুর খাবার নিয়ে এল। প্রন কাটলেট, পকোড়া, মাংসের সিঙাড়া। সব্যসাচী জানেন, এসব তাঁর মেয়ের খুবই প্রিয়। মিষ্টি একেবারেই পছন্দ নয়। মুখ তুলে বৈশালীকে বললেন, 'খা।'

বৈশালী বলল, 'এত খাওয়া যায় নাকি?'

'যা পারিস খা না—'

সব্যসাচীকে দেখে এখন ভাবাই যায় না, লোকটা পরিবারের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে। এই মুহূর্তে তাঁর রোল একজন স্নেহপ্রবণ বাবার।

সামান্য একটু আধটু খেয়ে উঠে পড়ল বৈশালী। বলল, 'বাবা, আমি যাচ্ছি।'

'সোজা বাড়ি যাবি তো?'

'এধারে ওধারে একটু ঘুরব। তারপর—'

'রোদের ভেতর বেশি টো টো করিস না। শরীর খারাপ হবে। তাড়াতাড়ি চলে যাস।'

'আচ্ছা—'

চেম্বারের দরজা পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এলেন সব্যসাচী। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যিই এদিকে এসেছিলি বলে আমার সঙ্গে দেখা করে গেলি? না, অন্য দরকার ছিল?'

সামান্য চমকে ওঠে বৈশালী। বাবার মনে কি কোনো খটকা দেখা দিয়েছে? যে কখনও আসে না, হঠাৎ সে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই, হাজির হয়েছে, এটা বোধহয় পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন নি সব্যসাচী।

বৈশালী বলল, 'সত্যি বলছি বাবা, এমনিই এসেছিলাম।' সেই মহিলাটিকে খুঁজে বার না করা পর্যন্ত কিছুতেই সে ধরা দেবে না।

চেম্বার থেকে বেরিয়ে লিফটে করে নিচে নামতে নামতে চারদিক থেকে অদ্ভুত এক নৈরাশ্য বৈশালীকে যেন পেয়ে বসে। আজকের অভিযানটা তার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেল।

পাঁচদিন পর হঠাৎই সব্যসাচীর সেই খাতাটার খোঁজ পেয়ে গেল বৈশালী। ক'টা দিন উদ্‌ভ্রান্তের মতো কাটিয়ে যখন সে এক অন্ধকার সুড়ঙ্গে ঢুকে গেছে, কোথাও আলোর এতটুকু সংকেত নেই, সেই সময় মিরাকলটা ঘটল। এর জন্য গোটা শহর চষে বেড়াতে হয় নি। রাত জেগে স্পেশাল পরিকল্পনা ছকতে হয়নি। ব্যাপারটা ঘটেছে কোনোরকম উদ্যোগ ছাড়াই—অনায়াসে, বিনা প্রচেষ্টায়।

ক'টা দিন হিস্টিরিয়ার ঘোরে চারদিকে ছোটাছুটি করার পর বৈশালীর খেয়াল হল, টেক্সট বুকের একটা পাতাও পড়া হয় নি। এভাবে চললে পরীক্ষার রেজাল্ট কী হবে তা জলের মতো পরিষ্কার। আজ সকালে উঠে জোর করে বইয়ের পাতায় মন বসাতে চেষ্টা করছিল। এই সময় চোখে পড়ল চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটি যুবককে সঙ্গে করে এনে সামনের ড্রইংরুমটায় বসিয়ে সব্যসাচীর বেডরুমের সামনে গিয়ে তাঁকে কী যেন বলে একতলায় নেমে গেল মহাদেব।

দু-এক পলক যুবকটিকে লক্ষ করল বৈশালী। এরকম প্রায়ই কেউ না কেউ সব্যসাচীর কাছে আসে। এতটুকু আগ্রহ বোধ করল না সে। চোখ নামিয়ে পড়তে লাগল।

মিনিট পাঁচেক বাদে সব্যসাচী ড্রইংরুমে এলেন। তাঁকে দেখে যুবকটি তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ায়। তাকে হাতের ইঙ্গিতে বসতে বলে তিনি তার মুখোমুখি বসলেন। কিছুক্ষণ কথা বলে ফের নিজের ঘরে চলে গেলেন এবং একটা সাদা এনভেলপ নিয়ে ফিরে এসে যুবকটিকে দিলেন। ছেলেটি তাঁকে প্রণাম করে নিচে চলে গেল।

সব্যসাচী কিন্তু তক্ষুনি নিজের ঘরে ফিরে গেলেন না। টিভিটা যে স্ট্যাণ্ডের ওপর থাকে তার তলায় ক্যাসেট রাখার জন্য কাচ দিয়ে ঘেরা অনেকগুলো তাক। সবচেয়ে নিচের তাক থেকে মেরুন রঙের একটা মোটা খাতা বার করে কী সব লিখতে লাগলেন।

পনের ফুট দূরত্বে বসে দৃশ্যটা দেখতে দেখতে বৈশালীর সারা শরীরে তড়িৎপ্রবাহ খেলে গেল। স্মৃতির ভেতর ঝাপসা হয়ে থাকা খাতাটা দেখামাত্র চিনে ফেলেছে। ওটার জন্য সারা বাড়ি তোলপাড় করেছে সে, সব্যসাচীর অফিসে হানা দিয়েছে, ক'টা রাত ভাল করে ঘুমোতে পারে নি, অথচ গুপ্তধন এত কাছে, চোখের সামনেই ছিল, ভাবতে পারে নি। ভেতরে ভেতরে দারুণ এক উত্তেজনা টের পাচ্ছে সে।

বোঝা যাচ্ছে, সব্যসাচী ওই যুবকটিকে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দেবার পর খাতায় তার নামটাম

টুকে রাখলেন। লেখা হয়ে গেলে খাতাটা ফের টিভির তলার তাকে চলে গেল। সব্যসাচী তাঁর ঘরে ফিরে গেলেন।

বইয়ের পাতা চোখের সামনে খোলা রয়েছে। কিন্তু সেদিকে আদৌ লক্ষ্য নেই বৈশালীর। সারি সারি ছাপা হরফগুলো কেমন যেন দুবোর্ধ্য হিজিবিজির মতো লাগছে।

সবাই বেরিয়ে গেলে ড্রইংরুমে চলে আসে বৈশালী। নিঃশব্দে টিভি স্ট্যাণ্ডের তলার র‍্যাক থেকে বাঁধানো খাতাটা বার করে নিজের ঘরে ফিরে আসে।

আগে বহুবার সব্যসাচীর প্রেমিকা সেই মহিলাটির কথা ভেবেছে বৈশালী। আজও খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে সমস্ত স্মৃতি তোলপাড় করে ভাবতে লাগল। কবে সে এসেছিল তাদের বাড়িতে? আট দশ মাসের আগে কখনই নয়। বছরখানেকও হতে পারে।

সব্যসাচীর অনুগ্রহপ্রার্থীদের মধ্যে পুরুষরাই বেশি, মেয়েদের সংখ্যা সেই তুলনায় কম। কবে কাকে কী ধরনের সার্টিফিকেট দিয়েছেন, পাতায় পাতায় নাম ঠিকানা তারিখ ইত্যাদি দিয়ে তিনি লিখে রেখেছেন।

গত ছ মাস থেকে এক বছরের ভেতর সবসুদ্ধু পনের জনকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন সব্যসাচী। তাদের মধ্যে পুরুষ দশ, মেয়ে পাঁচ। অমিতা সরকার, নীলাঞ্জনা সান্যাল, নমিতা চৌধুরি, বিপাশা মজুমদার এবং সুদীপ্তা রাহা। পুরুষদের নিয়ে আদৌ ভাবছে না বৈশালী। তার নিশ্চিত ধারণা এই পাঁচ মহিলার ভেতর একজন সব্যসাচীর প্রেমিকা।

একটা কাগজে মেয়েদের নামটাম টুকতে টুকতে দেখা গেল, অমিতা সরকার এবং বিপাশা মজুমদারের দুটো কনট্যাক্ট ফোন নাম্বার আছে। অর্থাৎ ওই নাম্বারগুলোয় যোগাযোগ করলে ওদের ডেকে দেবে। নমিতা চৌধুরির নামের পাশে ছোট্ট একটা নোট চোখে পড়ল। বৈশালীর বড় পিসি সুরমা তাকে সব্যসাচীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। বাবা লিখেছেন, 'দিদি বিশেষভাবে রিকোয়েস্ট করেছে, এই মেয়েটিবে যেন সাহায্য করি।'

বৈশালী মোটামুটি আন্দাজ করে নিল, এই মহিলাদের খোঁজখবর নিলে সব্যসাচীর গুপ্ত প্রমোদ সঙ্গিনীকে ধরা যাবে। যে দু'জনের টেলিফোন নাম্বার আছে তাদের সন্ধান এখনই পাওয়া যেতে পারে। দোতলাটা পুরোপুরি নির্জন। ফোনে কথা বললে কেউ শুনতে পাবে না। গোয়েন্দাগিরিটা এই মুহূর্ত থেকে শুরু করার জন্য ভেতরে ভেতরে প্রবল উত্তেজনা বোধ করতে থাকে বৈশালী। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ড্রইংরুমে চলে আসে সে। বাবার ডায়েরিটা জায়গামতো রেখে প্রথমে অমিতা সরকারের কনট্যাক্ট নাম্বারে ফোন করে।

কিছুক্ষণ পর ওধার থেকে কোনো বয়স্ক মহিলার গলা ভেসে আসে, 'কাকে চাইছেন?'

বৈশালী বলে, 'অমিতা সরকারের সঙ্গে কথা বলব। ওঁকে একটু ডেকে দেবেন—'

মহিলা বললেন, 'ওকে পাবেন না।'

একটু থতিয়ে গেল বৈশালী। মহিলাটির সঙ্গে অমিতাদের কী সম্পর্ক, বোঝা যাচ্ছে না। একটু চিন্তা করে সে জিজ্ঞেস করল, 'ওদের বাড়িতে আর কেউ নেই?'

মহিলা বললেন, 'ওর মা আছে। ডেকে দেব?'

অমিতার সঙ্গে আদৌ যদি সব্যসাচীর গোপন সম্পর্ক থেকে থাকে, ওর মা কি তা জানবেন না? অন্তত মেয়ের চালচলন দেখে নিশ্চয় খানিকটা আঁচ করতে পারা উচিত। কায়দা করে, এতটুকু বুঝতে না দিয়ে, আসল তথ্যটা অমিতার মায়ের কাছ থেকে বৈশালীকে বার করে নিতে হবে। সে বলল, 'ডেকে আনতে আপনার হয়তো কষ্ট হবে। কিন্তু—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে মহিলা বললেন, 'না, কষ্ট আবার কী। অমিতারা একতলায় থাকে। ওর মায়ের উঠে আসতে সময় লাগবে। ফোনটা ধরে থাকুন।'

অমিতার মাকে কতটা উঁচুতে উঠতে হবে, দোতলায় না তেতলায়, আন্দাজ করা যাচ্ছে না। ব্যস্তভাবে বৈশালী বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ধরে আছি।'

মিনিট খানেক বাদে অন্য একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আমি অমিতার মা। আপনি কে বলছেন?'

গলাটা ভাঙা ভাঙা, দুর্বল। একটু হাঁপাচ্ছেনও। মনে হল, অমিতার মা বেশ অসুস্থ। বৈশালী বলল, 'আমি অমিতার বন্ধু। একসঙ্গে কলেজে পড়েছি। ও আমাকে এই ফোন নম্বরটা দিয়েছিল। ওর সঙ্গে

খুব দরকার। তাই—'

অমিতার মা বললেন,'অমিতা তো কলকাতায় নেই। মাস চারেক আগে স্কুলে চাকরি পেয়ে পুরুলিয়া গেছে।'

'এর মধ্যে কলকাতায় আসে নি?'

'না। চিঠি দিয়ে জানিয়েছে আসছে মাসে আসবে।'

বৈশালীর মনে হল, নিউ মার্কেটে বাবার সঙ্গে সে যে মহিলাটিকে দেখেছে সে খুব সম্ভব অমিতা নয়। পুরুলিয়ার নতুন চাকরি ফেলে সব্যসাচীর সঙ্গে প্রমোদভ্রমণ করতে আসবে, অতটা মনে হয় না। আবার নিশ্চিতভাবে কিছু বলাও যায় না। মেয়েমানুষ খারাপ হয়ে গেলে সে না পারে হেন কাজ নেই। এমনও তো হতে পারে, দু-একদিনের ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে সে কলকাতায় আসে, নিজেদের বাড়িতে না গিয়ে কোনো হোটেলে ওঠে, সব্যসাচীর সঙ্গে বেলেল্লাপানা করে ফিরে যায়। অমিতা সম্পর্কে একেবারে সংশয়মুক্ত হওয়া যাচ্ছে না, একটা খটকা থেকেই যাচ্ছে।

অমিতার মা বললেন, 'মেয়ের বন্ধু যখন, তোমাকে আপনি করে বলছি না।'

বৈশালী বলল, 'না না, তুমি করেই বলবেন।'

'তোমার যদি খুব প্রয়োজন থাকে ওকে চিঠি লিখতে পার। আমি তার ঠিকানা দিচ্ছি। রঘুনাথপুর হরসুন্দরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, থানা রঘুনাথপুর, জেলা পুরুলিয়া। ও স্কুলের হস্টেলে থাকে।'

'ঠিকানাটা পেয়ে ভাল হল। আমি ওকে চিঠি লিখব।'

অমিতার মা বললেন, 'পরশু ওর একটা চিঠি পেয়েছি। দু-এক দিনের ভেতর উত্তর দেব। এতক্ষণ কথা বলছি। তোমার নামটাই জানা হয় নি। তোমার কী নাম মা?'

নাম জানানো কি উচিত হবে? জানালে অমিতা তার মায়ের কাছ থেকে জানতে পারবে। আর যদি অমিতার সঙ্গে সব্যসাচীর কোনোরকম সম্পর্ক থেকে থাকে, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে জেনে যাবেন। কয়েক পলক চুপ করে থেকে মনস্থির করে ফেলে বৈশালী। আসল নামটাই বলবে। একদিন না একদিন সব্যসাচীর সঙ্গে কনফ্রনটেশন তো হবেই। যত তাড়াতাড়ি সেটা হয় ততই ভাল। মাথায় প্রচণ্ড টেনসন নিয়ে কত কাল আর কাটানো যায়!

বৈশালী নিজের নাম জানিয়ে দিল।

অমিতার মা বললেন, 'অমিতার চিঠির যে জবাবটা দেব তাতে তোমার কথা লিখব।'

'আচ্ছা—'

ধীরে ধীরে ফোন নামিয়ে রাখে বৈশালী। অমিতার ব্যাপারটা পুরোপুরি মিটল না, অদৃশ্য সুতোয় খানিকটা ঝুলে রইল।

মিনিট পনের নিঃশব্দে কাটিয়ে দেবার পর বৈশালী আবার ফোন তুলে নেয়। এবার তার টার্গেট বিপাশা মজুমদার। ডায়াল করতেই ওধার থেকে ভোতা ধরনের পুরুষের গলা শোনা যায়, 'হ্যালো, কে বলছেন?'

বৈশালী নিজের নাম বলে বিপাশা মজুমদার বা তাদের বাড়ির অন্য কাউকে ডেকে দেবার জন্য অনুরোধ করল।

লোকটা জানায়, এক্ষুনি ডেকে দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা ওটা একটা ওষুধের দোকান। বিপাশাদের বাড়ি ওখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে। ডেকে আনতে আনতে লাইন কেটে যাবে। বলল, 'আপনার নাম আর ফোন নাম্বারটা দিয়ে টেলিফোনের কাছে কিছুক্ষণ বসে থাকুন। ওদের বড়িতে খবর দিচ্ছি। কেউ এসে আপনাকে ফোন করবে।'

নিজেদের ফোন নাম্বার আর নাম জানিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল বৈশালী।

মিনিট পনের বাদে টেলিফোন বেজে ওঠে। সেটা তুলতেই ওপাশ থেকে অল্পবয়সী কোনো কিশোরের গলা কানে আসে, 'বৈশালী দাশগুপ্তর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

বৈশালী বলে, 'আমিই বৈশালী।'

'একটু আগে আপনিই কি আমাদের ফোন করতে বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।'

অমিতা সম্পর্কে যা বলেছিল, এবারও তাই বলল বৈশালী। অর্থাৎ বিপাশা তার কলেজের বন্ধু। একসঙ্গে অনেকদিন পড়েছে। বিপাশার সঙ্গে একটা জরুরি ব্যাপারে সে কথা বলতে চায়।

ছেলেটি বলল, 'দিদিকে তো পাবেন না। তিন মাস আগে ওর বিয়ে হয়েছে। জামাইবাবু জব্বলপুরে চাকরি করেন। দিদি এখন সেখানে আছে।'

'এর ভেতর কলকাতায় আসে নি বিপাশা?'

'না তো। সেই পুজোর ছুটিতে আসবে।'

বিপাশা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেল। বাবার সঙ্গে যাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে সে আর যে-ই হোক বিপাশা নয়। বিপাশার ভাই আবার কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই লাইন কেটে দিল বৈশালী।

এখনও তিনজন বাকি আছে—নীলাঞ্জনা, সুদীপ্তা আর নমিতা। এদের ফোন নেই, যোগাযোগ করার মতো কনট্যাক্ট নাম্বারও সব্যসাচীর খাতায় পাওয়া যায় নি। প্রত্যেকের ঠিকানা অবশ্য আছে। ওদের চিঠি লিখতে হবে, নইলে নিজেকে ওই সব ঠিকানায় সশরীরে হাজির হতে হবে।

নীলাঞ্জনা এবং সুদীপ্তার কথা পরে ভাবা যাবে। কিন্তু নমিতার ব্যাপারটা তুলনায় অনেক সহজ। বড় পিসিকে ফোন করলে তার হদিস নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ঠিকানা অবশ্য সব্যসাচীর খাতায় লেখা আছে, কিন্তু মেয়েটা কেমন, এরই সঙ্গে বাবার গোপন সম্পর্ক হয়ে থাকলে বড় পিসি তা টের পেয়েছেন কিনা, সে সব সে জানতে চায়।

ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ফোনের বোতাম টিপতে শুরু করল বৈশালী।

বড় পিসেমশাই অবনীভূষণ ওধার থেকে ভারি গলায় বললেন, 'কে?'

বৈশালী বলল, 'আমি তনি, ফার্ন রোড থেকে বলছি।'

'কী ব্যাপার? কখনও তো খোঁজখবর নিস না!' অবনীভূষণ বলতে লাগলেন, 'আজ হঠাৎ কী হল?'

অবনীভূষণরা ক্ষুব্ধ হতেই পারেন। এমনিতে মাঝেমধ্যে ফোনটোন করেও বড় পিসিদের খোঁজখবর নেয় না বৈশালী। তার যে অনিচ্ছা তা নয়, আসলে খেয়াল থাকে না। পুজোপার্বণ বা পারিবারিক কোনো অনুষ্ঠান ছাড়া লেক টাউনে ওঁদের বাড়ি তার যাওয়াই হয় না। কাঁচুমাচু মুখে বৈশালী বলে, 'পড়াশোনার এত প্রেসার যে—'

'তুই ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো ছেলেমেয়ে তো পড়াশোনা করে না। এখন বল কেন ফোন করলি? কোনো দরকার আছে?'

বৈশালী একটু ভেবে বলল, 'তেমন কিছু নয়। বড় পিসিকে একটু দিন।'

অবনীভূষণ বললেন, 'দিচ্ছি। ফোনটা ধরে থাক।'

কিছুক্ষণ পর সুরমার গালা শোনা গেল, 'কি রে তনি, সূর্য আজ কোন দিকে উঠেছে? হঠাৎ বড় পিসির খোঁজ পড়ল?'

সুরমা বেজায় মোটা। সবসময় হাঁসফাঁস করেন। কথা বলার সময় জোরে জোরে শ্বাস পড়ে। ফোনে তার আওয়াজ ভেসে আসছে। বৈশালী বলল, 'মা-বাবা তো রোজই তোমাদের ফোন করে। তাদের কাছে খবর পাই। তাই—'

'মা-বাবা ফোন করে বলে তোর করতে নেই?'

'ঠিক আছে। এবার থেকে আমিও রোজ করব। হল তো?'

তার বড় পিসি মানুষটি সরল, সাদাসিধে। ঘোরপ্যাঁচ নেই, একটুতেই খুশি হন। বললেন, 'কেমন করিস দেখব।'

বৈশালী বলল, 'দেখো।'

'তোর কলেজে তো এবার আগে আগে গরমের ছুটি পড়েছে।'

ভারি শরীর বলে নড়াচড়া করতে কষ্ট হয় সুরমার। লেক টাউনের বাড়ি থেকে কচিৎ কখনও বেরোন। কিন্তু ওখানে বসেই টেলিফোনে ভাইবোন ভাইপো ভাইঝি আত্মীয়স্বজনদের নিয়মিত খবর নেন।

বৈশালী বলল, 'হ্যাঁ। আগে যেমন পড়েছে, কলেজ খুলবেও অন্যদের থেকে আগে।'

'পড়াশোনা ঠিকমতো করছিস, না বন্ধুদের সঙ্গে সারাদিন টো টো করে বেড়াচ্ছিস?'

'টো টো করার কথা মা বলেছে?'

'মা কেন বলবে? আমি বুঝি না? একটা কথা শোন—'

'বল।'

সুরমা বললেন, 'রোদে বেশি ঘোরাঘুরি করবি না। আজকাল এক ফ্যাশন হয়েছে—চাট, ফুচকা, ফাস্ট ফুড খাওয়া—সে সব একদম খাবি না। শরীর খারাপ হবে।'

সুরমা খুবই ভালমানুষ কিন্তু কথাটা একটু বেশিই বলেন। তার ওপর উপদেশ। এটা করবি, ওটা করবি না। নানা ব্যাপারে তাঁর হাজারটা নিষেধাজ্ঞা। একবার যখন বাইরে ঘোরা আর খাওয়া নিয়ে শুরু হয়েছে, সহজে থামবেন না। উপদেশের বান ডেকে যাবে। গোড়াতেই তাঁকে ঠেকানো দরকার।

সুরমার দুই মেয়ে, এক ছেলে। রিনি, ঝিনি আর রাজা। তাদের ভাল নাম মীনাক্ষী, পরমা এবং রাজর্ষি। রিনির বিয়ে হয়ে গেছে, সে থাকে চেন্নাইতে। ঝিনি বাঙ্গালোরের এক মেডিক্যাল কলেজে হস্টেলে থেকে পড়ে। রাজা পড়ে কানপুর আই আই টি'তে— মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। ওরা সবাই বৈশালীর থেকে বয়সে বড়।

বৈশালী জিজ্ঞেস করল, 'রিনিদি, ঝিনিদি আর রাজাদা কেমন আছে? ফোন টোন করে?'

ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে প্রচুর অভিযোগ সুরমার। জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলতে লাগলেন, 'আজকালকার ছেলেমেয়ে, কী যে মতিগতি বুঝি না বাবা। রিনি তার সংসার নিয়ে এখন ঝালাপালা, ঝিনি আর রাজার এতই পড়ার চাপ যে মা-বাবার খোঁজ নিতে সময়ই নাকি পায় না। আমাকেই দিনে দু-তিন বার করে ফোন করতে হয়।'

বৈশালী জানে, তিন ছেলেমেয়েকে দিনে দু-তিন বার করে ফোন করেন সুরমা। ওরা বাঙ্গালোরেই থাক, কিংবা চেন্নাই কি কানপুরে, বড় পিসির ধারণা রিমোট কনট্রোলটা তাঁর হাতেই আছে। কলকাতায় বসেই তিনি তাদের চালান। ছেলেমেয়ের গতিবিধি কতটা তাঁর নিয়ন্ত্রণে, কে জানে। তবে দু মাস পর পর যে অঙ্কের টেলিফোন বিল আসে তা মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো।

সুরমা নতুন উদ্যমে ফের বললেন, 'ওরা বলে তো ভাল আছে। রিনি দুটো দামাল বাচ্চাকে কী করে সামলায়, ঝিনি আর রাজা ঠিকমতো খায় কিনা—ভেবে ভেবে রাত্তিরে ঘুম আসে না।'

বড় পিসি যেভাবে সাতকাহন ফেঁদে বসেছেন, সহজে থামবেন না। অথচ বৈশালী যে কারণে ফোন করেছে, তা আরম্ভই করা যাচ্ছে না। কতক্ষণ আর ঘ্যানঘ্যানানি শোনা যায়? হঠাৎ তার মনে হল, টেলিফোনে সেই নমিতা চৌধুরির কথা জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না। সুরমা যদি পালটা প্রশ্ন করেন, কেন হঠাৎ নমিতার কথা জানতে চাইছে, কী উত্তর দেবে বৈশালী? সঠিক উদ্দেশ্যটা জানালে কী প্রতিক্রিয়া হবে, কে জানে। হয়তো সুরমা হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন। তার চেয়ে লেক টাউনে গিয়ে নানা কথার ফাঁকে নমিতা সম্পর্কে জেনে নেওয়াই ভাল।

বৈশালী বলল, 'বড় পিসি, অনেকদিন তোমাকে দেখি না। বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে। কাল তোমাদের ওখানে যাব।'

গলার স্বর অনেকটা উঁচুতে তুলে সবিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন সুরমা, 'আমার কী সৌভাগ্য রে! কাল কেন, এখনই চলে আয়।'

বড় পিসির এই এক স্বভাব, কিছু একটা মাথায় ঢুকলে তর সয় না। কিন্তু এক্ষুনি হুট করে বেরিয়ে পড়া সম্ভব নয়। বাবা অফিসে, অন্তত মাকে জানিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সুচরিতা পুজো টুজো সেরে বারটার আগে নিচে নামবেন না। রান্না হয়ে গেছে। না খেলে রেগে যাবেন। খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে বেরুতে বেরুতে দেড়টা দুটো। লেক টাউনে গেলে বড় পিসি কি সহজে ছাড়বেন? তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

বৈশালী বলল, 'আজ হবে না বড় পিসি।'

সুরমা একটু রেগে গেলেন, 'এখন ছুটি চলছে। তোমার কী এমন রাজকার্য যে আসতে পারবে না?'

'আমার অসুবিধা আছে।'

'তা হলে কাল সকালে চলে আসবি। দু-চারটে বাড়তি জামাকাপড় নিয়ে আসিস। মা-বাবাকে বলবি ক'দিন আমার কাছে থাকবি। আমিও বুড়ো আর সুচরিতার সঙ্গে কথা বলে নেব।'

বুড়ো সব্যসাচীর ডাকনাম। বৈশালী ভাবল, এখন যদি বলে লেক টাউনে কয়েকদিন থাকতে পারবে না, খেপে যাবেন সুরমা। কাল সকালে গিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিকেলে ফিরে আসবে। বলল, 'ঠিক আছে।'

আট

পরদিন সকালে ন'টার ভেতর লেক টাউনে পৌঁছে গেল বৈশালী।

বিরাট কমপাউণ্ডের ভেতর সুরমাদের প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ি। সামনের দিকে বাগান, নুড়ির ড্রাইভওয়ে, পেছনে গ্যারাজ এবং কাজের লোকেদের থাকার জন্য টালির চালের চার পাঁচটা ঘর।

বাড়িটা ধর্মশালা টাইপের, সারাক্ষণ গম গম করে। বড় পিসে অবনীভূষণ মা-বাবার একমাত্র সন্তান। তাঁর মেজাজটা পুরনো উদার ফিউডাল ধরনের। বাড়িতে বেশ কিছু দুঃস্থ আত্মীয় পরিজনকে আশ্রয় দিয়েছেন। নদীয়া ডিস্ট্রিক্টে ওঁদের আদি বাড়ি। সেখান থেকে কলকাতায় কেউ এলে তাঁর কাছেই ওঠে। নতুন মিলেনিয়াম শুরু হয়ে গেছে। সবাই যখন আত্মকেন্দ্রিক, নিজেদের স্ত্রী ছেলেমেয়ে আর পরিবারের সংক্ষিপ্ত গণ্ডিটুকুর বাইরে সমস্ত ব্যাপারে উদাসীন, তখন এমন একটা বাড়ি যে থাকতে পারে, ভাবা যায় না।

দোতলা আর তেতলা নিয়ে থাকেন অবনীভূষণরা। ছেলেমেয়েরা দোতলায় থাকত। একজনের বিয়ে হয়ে গেছে, বাকি দু'জন কলকাতার বাইরে। দোতলাটা তাই এখন ফাঁকা। তেতলাটা সুরমা আর অবনীভূষণের। নিচের তলার পুরোটা আশ্রিতদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বৈশালী সোজা তেতলায় উঠে এল। চমৎকার সাজানো বিশাল হল-ঘরে সোফায় বসে ব্রেকফাস্ট করছিলেন অবনীভূষণ। এর মধ্যেই তাঁর স্নান-টান হয়ে গেছে। পরনে বাইরে বেরুবার পোশাক—ট্রাউজার্স, শার্ট এবং টাই।

বয়স পঁয়ষট্টি ছেষট্টি। এখনও অবনীভূষণের সতেজ, টান টান চেহারা। মাথাভর্তি ব্যাক ব্রাশ করা কাঁচাপাকা চুল। শরীরে মেদ প্রায় জমে নি বললেই হয়। সকালে ঘন্টাখানেক যোগ-ব্যায়াম করে নিজেকে এই বয়সেও যথেষ্ট তরতাজা রেখেছেন।

কাছাকাছি বসে তাঁর খাওয়ার তদারক করছেন সুরমা। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওঁদের কাজের মেয়ে চঞ্চলা। কিছু দরকার হলে হাতের কাছে যুগিয়ে দেবে।

অবনীভূষণ দারুণ আমুদে মানুষ। কাজের ব্যাপারে ভীষণ সিরিয়াস, তখন পান থেকে চুন খসার উপায় নেই। অন্য সময় হুল্লোড়বাজ, হাসিতে ঠাট্টায় সবাইকে মাতিয়ে রাখেন।

খেতে খেতে বললেন, 'আরে তনি, আয় আয়—'

সুরমা বললেন, 'যাক, শেষ পর্যন্ত এলি! বোস—'

বৈশালী একটা সোফায় বসে পড়ে।

সুরমা চঞ্চলাকে বললেন, 'তনির জন্যে খাবার নিয়ে আয়।'

বৈশালী জানায়, এইমাত্র বাড়ি থেকে ব্রেকফাস্ট সেরে এসেছে। কিন্তু তার কথা কানেই তুললেন না সুরমা। চঞ্চলা বিপুল পরিমাণে কর্নফ্লেক্স কলা দুধ অমলেট ইত্যাদি নিয়ে এল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটু আধটু খেতেই হয় বৈশালীকে।

অবনীভূষণ বললেন, 'এমন দিনে এলি, আমাকে এক্ষুনি একটা আর্জেন্ট ব্যাপারে ফ্যাক্টরিতে বেরিয়ে যেতে হবে। বিকেলে ফিরে আসব। তখন খুব গল্প করা যাবে—কী বলিস?'

বিকেলেই যে ফিরে যাবে, সেটা বলতে যাচ্ছিল বৈশালী কিন্তু তার আগেই সুরমার নজরে পড়ল, একেবারে খালি হাতে এসেছে মেয়েটা। তাঁর ভুরু সামান্য কুঁচকে গেল। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে তনি, তোর জামাকাপড়ের ব্যাগ কই?'

ঢোক গিলে ভয়ে ভয়ে বৈশালী বলে, 'আজ আমাকে বাড়ি চলে যেতে হবে বড় পিসি। তাই—'

'তবে যে কাল বললি আমার কাছে এসে ক'দিন থাকবি! বাড়িটা ফাঁকা। রিনি ঝিনি রাজা, সবাই বাইরে।' সুরমা বলতে লাগলেন, 'ভাবলাম দিনকয়েক তোকে নিয়ে আনন্দ করব। তা না, আসতে না আসতেই ফেরার জন্যে পা বাড়িয়ে আছিস। বুঝি না বাপু তোর মতিগতি।'

অবনীভূষণও বললেন, 'এটা কিন্তু ঠিক হল না তনি।'

বোঝা যাচ্ছে, দু'জনেই বেশ মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন। ছেলেমেয়েরা কাছে থাকে না। আত্মীয় পরিজনেরা অবশ্য আছে, কিন্তু সন্তানদের জায়গা তো তাদের দিয়ে পূরণ হয় না। বৈশালী থাকলে আন্তরিকভাবেই তাঁরা খুশি হতেন। কাঁচুমাচু মুখে সে বলল, 'এখনও তো মাস খানেকের মতো ছুটি আছে। নেক্সট উইক কি তার পরের উইকে এসে যে ক'দিন বলবে থেকে যাব।'

'প্রমিস?'

'প্রমিস।'

অবনীভূষণের তাড়া রয়েছে। তিনি আর বসলেন না, খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে গেলেন।

বৈশালীরও খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। চঞ্চলা টেবল থেকে প্লেট গ্লাস টাসগুলো তুলে নিয়ে গেল। ড্রইংরুমে এখন সুরমা আর বৈশালী ছাড়া অন্য কেউ নেই।

সুরমা তার ভাইবোনদের মধ্যে সবার বড়। তিনি যেমন সকলের খোঁজখবর নেন তেমনি চান দাশগুপ্ত বংশের অন্যরাও পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুক; নইলে বংশের বন্ধন অটুট থাকবে না, সমস্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

বৈশালীর বাবা-কাকা-পিসিদের একটা করে ডাক-নাম আছে। যেমন সব্যসাচীর বুড়ো, মেজ কাকা অভিমন্যুর লালু, ছোট কাকা সিতাংশুর ভোলা, সুরমার মিনু এবং ছোট পিসি মনীষার সোনা।

সুরমা জিজ্ঞেস করলেন, 'লালু আর সোনাদের বাড়ি যাস? নাকি সারাদিন টই টই করে সময় পাস না?'

কচিৎ কখনও মেজ কাকা আর ছোট পিসির বাড়ি যাওয়া হয় বৈশালীর। কাঁচুমাচু মুখে সে বলে, 'ওরাই তো রবিবার রবিবার আসে। তখনই দেখা হয়। তাই আর—'

'ওরা আসে বলে তোর যেতে নেই? এবার থেকে যাবি।'

'হ্যাঁ, যাব।'

আরো কিছুক্ষণ বক বক করে পারিবারিক সম্পর্ক কিভাবে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় তার পদ্ধতি বিশদভাবে বাতলে দিয়ে সুরমা বললেন, 'এবার সত্যি কথাটা বল তো—'

একটু হকচকিয়ে যায় বৈশালী, 'মানে?'

সুরমা বললেন, 'সহজে যার লেক টাউনে পা পড়ে না, হঠাৎ সে এসে হাজির হল। নিশ্চয়ই তার অন্য গরজ আছে। সেটাই জানতে চাইছি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে বৈশালী। তারপর বলে, 'সত্যি বড় পিসি, একটা বিশেষ দরকারে তোমার কাছে এসেছি।'

উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সুরমা, কোনো প্রশ্ন করেন না।

বৈশালী বলে, 'আমি যা বলব সেটা তোমাকে কিন্তু গোপন রাখতে হবে।'

'কাউকে কিছু বলব না, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'কয়েক মাস আগে কোনো মহিলাকে, বেশি বয়েস নয়, আটাশ তিরিশের মতো—বাবার কাছে পাঠিয়েছিলে?'

সোফায় কাত হয়ে ছিলেন সুরমা। ভারি শরীর টেনে তুলে সোজা হয়ে বসলেন। কপালে ভাঁজ ফেলে একটু চিন্তা করে বললেন, 'হ্যাঁ, কাকে যেন পাঠিয়েছিলাম—'

তাঁর স্মৃতিটাকে উসকে দেবার জন্য বৈশালী বলল, 'তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। মহিলার নাম নমিতা চৌধুরি।'

এবার মনে পড়ে যায় সুরমার। বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মেয়েটাকে পাঠিয়েছিলাম।' তাঁর চোখেমুখে আগ্রহ ফুটে বেরোয়। সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'হঠাৎ নমিতার কথা জানতে চাইছিস?'

প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে বৈশালী বলে, 'কী জন্যে পাঠিয়েছিলে মনে আছে?'

'খুব সম্ভব একটা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটের ব্যাপারে। চাকরি টাকরির জন্যে কোথায় দরখাস্ত করবে, তাই গেজেটেড অফিসারের সার্টিফিকেট দরকার ছিল। সে জন্যে—'

'মহিলাকে তুমি কতটা চেনো?'

'খুব বেশি নয়।'

'যাকে ভাল করে জানো না তার ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটের জন্যে বাবার কাছে পাঠিয়েছিলে কেন?'

এমনিতে সুরমা খুবই স্নেহপ্রবণ মানুষ, চোখ দুটি শান্ত। স্নিগ্ধ হাসি চাপা আলোর মতো সে দৃষ্টিতে সারাক্ষণ মাখানো থাকে। দৃষ্টিটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে তাঁর। বললেন, 'এ সব জিজ্ঞেস করছিস কেন? কোনোরকম গোলমাল হয়েছে?'

বৈশালী বলল, 'আগে আমার কথার উত্তর দাও। তারপর বলছি।'

সুরমা বললেন, তাঁর ছেলে রাজা যখন স্কুলে পড়ত, কয়েকটা বছর তার প্রাইভেট টিউটর ছিলেন সুরপতি মজুমদার। রাজা পাশ করে বেরিয়ে যাবার পরও সুরপতির সঙ্গে এ বাড়ির সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় নি। মানুষটি চমৎকার। সময় পেলে এখনও মাঝে মাঝে সুরমাদের সঙ্গে দেখা করে যান। তিনিই একদিন নমিতাকে নিয়ে এসেছিলেন। বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন, সুরমা যেন ওর জন্য সব্যসাচীর ক্যারেক্টর সার্টিফিকেট জোগাড় করে দেন। সুরপতির মুখের ওপর না বলা যায় নি, সুরমা নমিতাকে সব্যসাচীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

সুরমা বললেন, 'তোর বাবার কাছে অনেকেই তো মার্কশিট অ্যাটেস্ট করাতে কি ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট আনতে যায়। সুরমাও গেছে। সমস্যাটা কী?'

সোজাসুজি সুরমার চোখের দিকে তাকিয়ে বৈশালী বলল, 'বাবাকে একটি মহিলার সঙ্গে আমি ঘুরতে দেখেছি। বুঝতে পারছি না সে নমিতা চৌধুরি কিনা।' একটু থেমে বলল, 'আমার ধারণা নমিতা চৌধুরি হলেও হতে পারে।'

সুরমা খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'তুই যখন কথাটা তুললি তখন বলি কিছুদিন ধরে একটা কানাঘুষো শুনছি। তোর বড় পিসে দুদিন একটা মেয়ের সঙ্গে বুড়োকে দেখেছে। শুধু সে-ই না, আরো একজন দেখে আমাকে খবরটা দিয়েছে।'

'তুমি বাবাকে কিছু বল নি?'

'কী বলব? একটি মেয়ের সঙ্গে কাউকে দেখা গেলেই তার চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে, এটা সবসময় ভাবার কারণ নেই।'

সুরমার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বৈশালী জিজ্ঞেস করল, 'তুমি তা হলে বাবাকে বেনিফিট অফ ডাউট দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছ?'

সুরমা বললেন, 'কী আশ্চর্য, আপত্তিকর খারাপ অবস্থায় কেউ তাকে দেখে নি। এই ব্যাপারটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে দেখার কারণ আছে বলে আমি মনে করি না।'

'বড় পিসি, তুমি কিন্তু খুব ছেলেমানুষের মতো কথা বললে।'

'মানে?'

বৈশালী বলে, 'কেউ যদি কারো সঙ্গে গোপন ইমমরাল রিলেশান গড়ে তোলে, সেটা কি ঢাক পিটিয়ে সবাইকে জানাবে, না রাস্তায় দাঁড়িয়ে এমন আচরণ করবে যাতে সকলে টের পেয়ে যায়?'

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর সুরমা বললেন, 'ধরা যাক, বুড়োর সঙ্গে যাকে ঘুরতে দেখেছিস সে নমিতা, তার সঙ্গে ওর একটা বাজে সম্পর্কও হয়ে গেছে, তা হলে কী করতে চাস?'

বৈশালী বলল, 'কী করব, আমি ঠিক জানি না। তবে আগে নমিতা চৌধুরিকে খুঁজে বার করব। তবে এটা তোমাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, বাবাকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।'

সুরমা আঁতকে উঠলেন, 'কী বলছিস তনি! বাবার সম্বন্ধে এই ধরনের কথা কেউ বলে!'

বড় পিসির দুটি বাক্যেই স্পষ্ট, বাবা যেমনই হোক, সন্তানদের কাছে তিনি হবেন শ্রদ্ধার পাত্র, যদি শত অন্যায়ও করেন চোখকান বুজে থাকতে হবে। আবহমান কাল ধরে বাবা সম্পর্কে একটা

মিথ তৈরি করা হয়েছে। সর্বক্ষণ তাঁর প্রতি অনুগত থাকতে হবে, তাঁর কোনো কথা বা আচরণের প্রতিবাদ করা চলবে না। অচলা ভক্তি এবং নিঃশর্ত প্রশ্নহীন বশ্যতাই পিতৃদেবদের একমাত্র প্রাপ্য।

সুরমা বলতে লাগলেন, 'এ নিয়ে কারো সঙ্গে কথা বলবি না, একেবারে চুপচাপ থাকবি। এখন তুই ছাত্রী, পড়াশোনাই ধ্যানজ্ঞান হওয়া উচিত। গুরুজনেরা কী করছে না করছে সেদিকে তাকাতে নেই।'

অর্থাৎ নোংরা ময়লা কোনো কিছুই যেন লোকের চোখে না পড়ে, সব কার্পেটের তলায় ঢুকিয়ে দাও। ভেতরে যত দুর্গন্ধই থাক, বাইরেটা যেন ফিটফাট, চকচকে থাকে।

সুরমা বোঝাতে লাগলেন, 'ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়ে থাকে আর সেটা যদি জানাজানি হয়, আমাদের বংশের গালে চুনকালি পড়বে। কারো কাছে আমরা মুখ দেখাতে পারব না।'

বৈশালী বলল, 'তার মানে তুমি বলতে চাও, সেই তিন জ্ঞানী বাঁদরের মতো বাবারা যে অপরাধই করুক, কিচ্ছু দেখব না, শুনব না, কোনো কথাও বলব না।'

সুরমা এবার সত্যিসত্যিই রেগে গেলেন, 'ছোট ছোটর মতো থাকবি। অনধিকার চর্চা একেবারেই করবি না। মনে রেখ, ছেলেমেয়েদের সব ব্যাপারেই একটা সীমা আছে। তার বাইরে পা ফেলার চেষ্টা করো না।'

বড় পিসি যে বাবার বিরুদ্ধে একটা আঙুলও তুলবেন না, সেটা মোটামুটি জানত বৈশালী। নতুন মিলেনিয়ামে পা রাখলেও পরিবার সম্বন্ধে তাঁর ধ্যানধারণা বিশ শতকের গোড়ার দিকের মতো। তখনকার জীবনযাত্রাটাকে নতুন শতাব্দীতে তিনি স্থাপন করেছেন। তাঁর মতে পুরুষদের শত খুন মাপ। তারা যা-ই করুক না, টুঁ শব্দটি করা চলবে না।

সুরমার কথা শুনে গেল বৈশালী, জবাব দিল না। মনে মনে যা স্থির করে রেখেছে সেটা সে করবেই। নিজের সিদ্ধান্ত থেকে তাকে এক চুলও সরানো যাবে না।

নয়

দুদিন পর অফিসের জরুরি কাজে এক সপ্তাহের জন্য ট্যুরে বেরিয়ে গেলেন সব্যসাচী। নর্থ বেঙ্গলের কয়েকটা শহরে তাঁকে ঘুরতে হবে।

নমিতা চৌধুরি যদি তাঁর গোপন প্রেমিকা হয়, প্রমোদসঙ্গিনী হিসেবে তিনি কি তাকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন? রীতিমত ধন্দে পড়ে গেল বৈশালী।

বাবার যা মতিগতি তাতে নিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। এমনি বেড়াতে গেলে এতটুকু সংশয় থাকত না। কিন্তু যেহেতু অফিসিয়াল ট্যুর, মহিলাকে ওখানকার অফিসের অন্য লোকজন দেখে ফেলতে পারে। এই নিয়ে সামনাসামনি না হলেও আড়ালে নিশ্চয়ই গুঞ্জন শুরু হয়ে যাবে। সব্যসাচী এত বড় একটা [illegible] নেবেন বলে মনে হয় না। তা ছাড়া, বৈশালীর ধারণা, তিনি এখনও এতটা দু কান কাটা হয়ে [illegible]ঠেন নি।

নমিতা চৌধুরির গড়পার রোডের ঠিকানাটা বাবার বাঁধানো খাতা থেকে টুকে রেখেছিল বৈশালী। আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর সে ঠিক করে ফেলে সেখানে চলে যাবে। মধুরারা তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে চেয়েছিল। ওদের কাউকে সঙ্গে নেবে কি? কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তার মনে হল, একা যাওয়াই ভাল। তেমন দরকার হলে পরে মধুরাদের কথা ভাবা যাবে।

মুখ টুখ ধুয়ে বাসি পোশাক পালটে, ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়ে বৈশালী।

দুটো মিনিবাস পালটে ন'টার ভেতর গড়পারে নমিতাদের একতলা বাড়িটার সামনে পৌঁছে গেল সে।

এটা কলকাতার পুরনো অঞ্চল। বাড়িটাও অনেক কালের, পঞ্চাশ ষাট বছর বয়স তো হবেই। তবে সম্প্রতি সারাই টারাই করে রং করানো হয়েছে। টাটকা পেন্টের গন্ধ নাকে আসছে।

কলিং বেল টিপতে একজন বয়স্কা বিধবা মহিলা দরজা খুলে দিলেন। কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা চুলের বেশির ভাগই সাদা। একসময় যথেষ্ট সুন্দরী ছিলেন। ফর্সা রং জ্বলে গেছে, গায়ের চামড়া কুঁচকে জালি জালি, মুখটা ভাঙাচোরা। পরনে সরু কালো-পাড় ধুতি আর ব্লাউজ। জীবন সংগ্রাম বলে গালভরা

একটা কথা আছে, সেটা তাঁর দিকে এক নজর তাকালেই টের পাওয়া যায়।

একটি ঝকঝকে স্মার্ট অচেনা তরুণীকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রীতিমত অবাকই হয়ে গেছেন বর্ষীয়সী মহিলাটি। মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে মা?'

বৈশালী বলল, 'আমাকে আপনি চিনবেন না। এটা কি নমিতা চৌধুরিদের বাড়ি?'

'হ্যাঁ।'

'আমি নমিতাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই—'

'কার সঙ্গে কথা বলছ মা?' বলতে বলতে বাড়ির ভেতর দিক থেকে যে বয়স্কা মহিলার পাশে এসে দাঁড়াল তাকেই ক'দিন আগে নিউ মার্কেটে সব্যসাচীর সঙ্গে দেখেছিল বৈশালী। তা হলে সঠিক ঠিকানাতেই পৌঁছে গেছে সে। নিজের অজান্তেই স্নায়ুমণ্ডলী টান টান হয়ে যায় তার।

নমিতার সমস্ত শরীর মুহূর্তে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে যায়, চোখের দৃষ্টি স্থির। বৈশালীকে সে-ও চিনতে পেরেছে।

বৈশালী লক্ষ করল, সদ্য স্নান করেছে নমিতা। ঘরে পরার একটা সাধারণ শাড়ি আলগাভাবে গায়ে জড়ানো। ভেজা চুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে।

বৈশালী বলল, 'আমি আপনার কাছে এসেছি।'

নমিতার মুখ পলকের জন্য সাদা হয়ে যায়। কেউ যেন সব রক্ত কোনো অজানা প্রক্রিয়ায় শুষে নিয়েছে। নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় লাগে তার। তারপর বয়স্কা মহিলাটিকে বলে, 'মা, তুমি ভেতরে যাও। আমি এর সঙ্গে কথা বলব।'

নমিতার মা বৈশালীর দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাতে তাকাতে চলে যান।

বৈশালীকে তুমি করে বলবে, না আপনি, ঠিক করে নিতে একটু সময় লাগে নমিতার। তারপর মনস্থির করে বলে, 'এস আমার সঙ্গে।'

মোটামুটি সাজানো একটা ড্রইংরুমে নিয়ে গিয়ে বৈশালীকে বসিয়ে ফ্যান চালিয়ে দেয় নমিতা। বলে, 'তুমি কি মিনিট দশেক একা একটু বসবে? সবে স্নান করেছি। জামাকাপড়টা চেঞ্জ করে আসি।'

বৈশালী বলল, 'ঠিক আছে।'

দশ মিনিট লাগল না, তার আগেই ফিরে এল নমিতা। ভেজা চুল ভাল করে মুছে, আঁচড়ে পিঠময় ছড়িয়ে দিয়েছে। পরনে ঢোলা ম্যাক্সি। বৈশালীর মুখোমুখি একটা সোফায় বসল সে। ভঙ্গিটা সামান্য আড়ষ্ট, জড়সড়।

বৈশালী বলল, 'নাম জানা থাকলে কথা বলতে সুবিধা হয়। আপনার নাম আমার জানা আছে। আমি বৈশালী।' শুধু নামই নয়, নিজের পরিচয়ও দিল সে।

নমিতা উত্তর দিল না, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

বৈশালী এবার বলে, 'এত তাড়াতাড়ি স্নান করে নিয়েছেন। মনে হচ্ছে, কোথাও বেরুবার তাড়া ছিল?'

নমিতা বলল, 'হ্যাঁ, অফিসে। তুমি এসেছ, আজ আর বেরুব না। পরে অফিসে ফোন করে দেব।'

নমিতার অফিসে যাওয়া হল কি হল না, বৈশালীর কাছে সেটা খুব জরুরি ব্যাপার নয়। নমিতার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে সে বলে, 'সময় নষ্ট না করে কাজের কথায় আসা যাক।'

নমিতা নিঃশব্দে বৈশালীকে লক্ষ করতে থাকে।

নিজেকে সব দিক থেকে প্রস্তুত করেই গড়পারে এসেছিল বৈশালী। যদি দেখা যায়, নমিতাই সব্যসাচীর প্রমোদসঙ্গিনী, রূঢ় আঘাতে তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। পাঁচ ফুট দূরত্বে যে বসে আছে, যৌবনের শেষ সীমান্ত এখনও সে পেরিয়ে যায় নি। সেক্স অ্যাপিল বা যৌন আবেদন বলে একটা কথা আছে। সেটা তার সমস্ত শরীর জুড়ে ছড়ানো। তাকে দেখতে দেখতে বৈশালী বলে, 'কয়েক মাস আগে আপনি আমাদের ফার্ন রোডের বাড়িতে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়ে নমিতা, 'আমার একটা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটের দরকার ছিল। তোমার বড় পিসিমা সুরমাদেবীকে ধরে তোমার বাবার কাছে গিয়েছিলাম।'

বৈশালী বলল, 'সার্টিফিকেটের চেয়ে আরো অনেক কিছু আমার বাবার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছিলেন, তাই না?'

প্রশ্নটা ভাল করে বোঝার চেষ্টা করে নমিতা। তারপর বলে, 'এখন যে চাকরিটা করছি সেটা তোমার বাবার জন্যে সম্ভব হয়েছে। তাঁর কাছে আমাদের পুরো পরিবারের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।'

মুখ শক্ত হয়ে ওঠে বৈশালীর। সে বলে, 'কৃতজ্ঞতা টৃতজ্ঞতার কথা বাদ দিন। চাকরিটা পাওয়ার জন্যে আপনাকে কী কী করতে হয়েছে?'

'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'ঠিকই বুঝেছেন। স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছে।'

কিছুক্ষণের জন্য বসার এই ঘরটায় অস্বাভাবিক নৈঃশব্দ নেমে আসে।

তারপর বৈশালী বলল, 'আপনাকে আর আমার বাবাকে নিউ মার্কেটে যেভাবে দেখেছি সেটা বলতে সংকোচ হচ্ছে। শুধু আমি না, আরো কয়েকজন আপনাদের আপত্তিকর অবস্থায় দেখেছে। এসব অস্বীকার করতে পারেন?'

মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ বসে তাকে নমিতা। একসময় আস্তে আস্তে মুখ তুলে বলে, 'না, করছি না।'

গলার স্বর অনেকটা উঁচুতে তুলে বৈশালী বলে, 'আপনাদের বাড়িতে এসে মনে হয়েছে, বেশ ভদ্র পরিবার। এমন একটা ফ্যামিলির মেয়ে হয়ে আপনি এত নিচে নামতে পারেন, ভাবতে পারি না।'

নমিতা চুপ, রুদ্ধশ্বাসে বসে থাকে।

বৈশালী থামে নি। অসহ্য রাগে এবং উত্তেজনায় তার মুখে শরীরের সব রক্ত যেন উঠে এসেছে। একই সুরে বলে যায়, 'আমাদের বংশের একটা রেপুটেশন ছিল। আপনি সেটা টেনে হেঁচড়ে কোথায় নামিয়ে এনেছেন জানেন? আমাদের সবার গালে যে চুনকালি মাখিয়ে দিয়েছেন তা কোনোদিনই মোছা যাবে না।'

নমিতার স্তব্ধ, ম্রিয়মাণ ভাবটা হঠাৎ যেন কেটে যায়। শিরদাঁড়া টান টান করে সে উঠে দাঁড়ায়। খুব স্বাভাবিক গলায় বলে, 'আমার সঙ্গে একটু কষ্ট করে আসবে?'

এর জন্য প্রস্তুত ছিল না বৈশালী। সামান্য হকচকিয়ে যায় সে। জিজ্ঞেস করে, 'কোথায়?'

'দূরে কোথাও নয়; আমাদের এই বাড়ির ভেতরেই।'

'কেন?'

'তোমাকে কয়েকটা দৃশ্য দেখাতে চাই।'

যতটা অবাক হচ্ছিল বৈশালী, তার চেয়ে অনেক বেশি কৌতূহল বোধ করছিল। সেও উঠে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, 'সেগুলো দেখা কি খুব দরকার?'

নমিতা বলে, 'আমার তাই মনে হয়।'

'বেশ, চলুন।'

বাড়িটা ইংরেজি 'এল' আকারের। সব মিলিয়ে চারখানা ঘর, চৌকো শান-বাঁধানো উঠোন, উঠোনের ওধারে রান্নাঘর, বাথরুম ইত্যাদি। প্রতিটি শোবার ঘরের সামনে দিয়ে চওড়া, ঢাকা বারান্দা চলে গেছে।

ডান দিকের শেষ বেডরুমটায় প্রথমে বৈশালীকে নিয়ে গেল নমিতা। সেখানে আধময়লা বিছানায় একটি লোক আধশোয়া হয়ে চা খাচ্ছিল। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, ভাঙাচোরা চেহারা, ক'টা দাঁত পড়ে যাওয়ায় গাল বসে গেছে, মুখে খোঁচা খোচা দাড়ি, চোখের তলায় কালির পোঁচ, কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, চুল উঠে উঠে কপালটা মাঠের মতো চাওড়া। পরনে লুঙ্গি আর হাত-কাটা পুরনো গেঞ্জি। লোকটার শরীরের নিচের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে বৈশালী। হাঁটু থেকে ডান পা'টা তার কাটা।

নমিতা বৈশালীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। লোকটা তার দাদা— পরিমল চৌধুরি। তার দাদাকে জানায়, 'বৈশালী একটা কাজে আমার কাছে এসেছিল। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম।'

পরিমল অদ্ভুত হাসল, 'একটা ঠ্যাঙ-কাটা, অন্যের ওপর ডিপেনডেন্ট লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে কী লাভ?'

পরিমলের ঘর থেকে বেরুতেই চোখে পড়ল, একটি সুশ্রী মেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। চেহারায় নমিতার আদলটি বসানো। বৈশালীরই সমবয়সী হবে।

নমিতা বলল, 'আমার ছোট বোন অমিতা, বি.এ পড়ছে।'

তাদের বাড়ির নতুন আগন্তুকটি কে, অমিতা জানতে চাইল না। কৌতূহলশূন্য চোখে তাকিয়ে রইল শুধু।

এবার আর একটা ঘরে যেতে হল বৈশালীকে। সেখানে একজন বিধবা মহিলা, বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশ, দুটো অল্প বয়সের ছেলেমেয়েকে পড়াচ্ছে। তাদের সঙ্গেও পরিচয় হল। মহিলাটির নাম সুমিতা—নমিতার দিদি। বাচ্চা দুটো তারই—সুনু আর পল্টু। আলাপ পরিচয় হবার পর ফের বাইরের ঘরে বৈশালীকে নিয়ে আসে নমিতা। বলে, 'আমাদের ফ্যামিলির সবাইকে দেখিয়ে দিলাম। কিছু বুঝতে পারলে?'

নমিতা সারা বাড়ি ঘুরিয়ে একটা বিচিত্র পারিবারিক প্রদর্শনী দেখিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার কারণটা খুব পরিষ্কার হচ্ছে না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে।

নমিতা বলে, 'ওই যে আমার দাদা পরিমলকে দেখলে সে ছিল ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। বি.এসসি পড়ার সময় টেরোরিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। স্বপ্ন দেখত সশস্ত্র মুভমেন্ট করে সোসাইটি বদলে দেবে। কিন্তু পুলিশ তাকে একটা হাইড-আউট থেকে ধরে জেলে পোরে, প্রচণ্ড টরচার চলে তার ওপর। একদিন জেল থেকে পালাতে গিয়ে সেন্ট্রিদের গুলি লাগে পায়ে। পা'টা কেটে বাদ দিতে হয়। বার বছর জেল খাটার পর সে যখন বেরিয়ে আসে বিপ্লবের স্বপ্ন তার চোখ থেকে মুছে গেছে। সে এখন অকর্মণ্য, পঙ্গু, টোটালি বাতিল একটা মানুষ। সারাদিন অন্ধকার ঘরের কোণে চুপচাপ পড়ে থাকে। অথচ ওর কাছে আমাদের ফ্যামিলির কত আশা ছিল।' শেষ দিকে গলাটা ঝাপসা হয়ে আসে নমিতার।

শুনতে শুনতে নিজের মধ্যে কোথায় যেন একটা ধাক্কা লাগে বৈশালীর। সে চুপ করে থাকে।

নমিতা কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে নিয়ে আবার শুরু করে, 'আমার মাকে দিদিকে আর ছোট বোনকে দেখেছ। বাবা একটা কোম্পানিতে মোটমুটি ভাল চাকরি করত। কিন্তু হঠাৎ কোম্পানিটা বন্ধ হয়ে গেল। দাদা তখন জেলে। আমাদের বয়স তখন অল্প। শকটা বাবা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। সারা রাত ঘুমতো না, দিনের বেলা চুপচাপ বসে থাকত। চিন্তায় চিন্তায় একদিন স্ট্রোক হল, হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগেই ডেথ। বাবার অফিস থেকে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর গ্র্যাচুইটির কিছু টাকা পাওয়া গিয়েছিল; তাই দিয়ে মা আমাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে এমন একটা লড়াই শুরু করল যার একমাত্র রেজাল্ট ডিফিট।'

বৈশালী উত্তর দিল না।

নমিতা থামে নি, 'বাবা বেঁচে থাকতে থাকতে দিদির বিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। জামাইবাবু লোকটা ছিল চমৎকার—হাসিখুশি, আমুদে, বড় হৃদয়ের মানুষ। বাস অ্যাকসিডেন্টে হঠাৎ মারা যাওয়ায় সমস্ত ওলটপালট হয়ে গেল। শ্বশুরবাড়িতে দিদির আর জায়গা হল না। দুটো বাচ্চাকে নিয়ে আমাদের কাছে চলে এল। তারপর থেকে এখানেই আছে। তা ছাড়া, আমার ছোট বোনকেও তুমি দেখেছ।'

ফার্ন রোড থেকে গড়পার খুব একটা দূরে নয়, বেশি হলে দশ বার কিলোমিটার। এই কলকাতারই সেটা একটা অংশ। কিন্তু বৈশালীর মনে হচ্ছিল, সে যেন বহু আলোকবর্ষ পার হয়ে এক অচেনা গ্রহে চলে এসেছে এবং অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় কোনো কাহিনী শুনছে। তাদের বাড়ির, তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের যা লাইফস্টাইল তার সঙ্গে গড়পারের এই বাড়ির কিছুই মেলে না—সব বিষাদময় এবং অত্যন্ত অস্বস্তিকর।

নমিতা অদ্ভুত হাসল, 'এই হল আমাদের ফ্যামিলির ব্যাকগ্রাউণ্ড। শুনতে নিশ্চয়ই তোমার ভীষণ খারাপ লাগছে। আমারও বলতে ভাল লাগছে না।'

বৈশালী এবারও চুপ করে থাকে।

নমিতা বলল, 'তবু তোমাকে আমাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি কেন শোনালাম? কারণ এর দরকার ছিল।'

নিজের অজান্তেই বৈশালী জিজ্ঞেস করে, 'কী দরকার?'

'তার আগে তোমাকে আমার সম্বন্ধে কিছু জানানো প্রয়োজন। ছাত্রী হিসেবে দাদার মতো ব্রিলিয়ান্ট না হলেও খুব একটা খারাপ ছিলাম না। টুইশন করে পড়ে হিস্ট্রি অনার্সে সেকেণ্ড ক্লাস সেকেন্ড হয়েছিলাম। পরিবারের যা অবস্থা তাতে পড়া আর চালানো গেল না।'

বৈশালী উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কোনো প্রশ্ন করে না।

নমিতা একটানা বলে যায়, 'এবার দরকারের কথাটা বলা যাক। আমাদের পরিবারের যা অবস্থা তাতে সমস্ত দায়িত্বটা শেষ পর্যন্ত আমার ওপরেই এসে পড়েছে। বুঝতেই পারছ, একটা চাকরি না পেলে এতগুলো মানুষকে স্রেফ না খেয়ে মরতে হবে। আমি মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে লাগলাম। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে কতবার যে গেছি তার হিসেব নেই। চিন্তা কর, কী বিচিত্র এই ওয়েস্ট বেঙ্গল! একজন সেকেণ্ড ক্লাস সেকেন্ড অনার্স গ্র্যাজুয়েট, চার পাঁচ বছর ঘোরাঘুরি করে একটা ইন্টারভিউ পর্যন্ত পাই নি।'

'তারপর?'

'সুরপতি মজুমদার নামে একজন মাস্টার মশাইকে ধরে তোমার বড় পিসিমা সুরমা দেবীর কাছে যাই। আমার সব কথা শুনে তিনি আমাকে তোমার বাবার কাছে পাঠান।' বলে একটু থামে নমিতা। একনাগাড়ে কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। জোরে শ্বাস টেনে ফের বলে, 'তোমার বাবা খুবই ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পারসন। তাঁর ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট আর রেকমেণ্ডেশনের অনেক দাম।'

বৈশালীর ঔৎসুক্য এবার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকে সে জিজ্ঞেস করল, 'বাবার সঙ্গে যখন দেখা করতে যান তখন আপনাকে দেখেছি। বাবার সার্টিফিকেট বা রেকমেণ্ডেশন তা হলে কাজে লেগেছে?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে নমিতা। তারপর বলে, 'আমাকে কিছু করতে হয় নি। তোমার বাবা আমার সম্বন্ধে ইন্টারেস্ট নিয়েছিলেন। তিনিই নিজে নানা জায়গায় যোগাযোগ করে আমার চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। তাঁর চেষ্টায় যে চাকরিটা পেয়েছি সেটা খুব ভাল, যা মাইনে পাই স্বপ্নেও তা ভাবি নি।'

বৈশালীর মুখটা এবার একটু কঠোর দেখায়। সে বলে, 'আমি আপনাকে একটা স্ট্রেট প্রশ্ন করতে চাই। পরিষ্কার উত্তর দেবেন।'

নমিতার চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেছে। সরাসরি বৈশালীর দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'লুকোচুরি আমিও পছন্দ করি না। তোমার স্ট্রেট প্রশ্নের স্ট্রেট জবাবই পাবে।'

'আমার বাবার কাছে অনেকে আসে। গরিব স্ট্রাগলিং ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর প্রচুর সিমপ্যাথি।' বৈশালী বলতে থাকে, 'যে যায় তাকেই তিনি ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দেন বা কোথাও রেকমেণ্ড করেন। কিন্তু নিজে কখনও কারো চাকরির জন্যে কাউকে গিয়ে পারসোনালি রিকোয়েস্ট করেন না। আপনার সম্পর্কে বাবার এত ইন্টারেস্টের কারণটা কী?'

ঘরের ভেতর কিছুক্ষণের জন্য অপার নৈঃশব্দ নেমে আসে। তার মধ্যে বৈশালীর উত্তরটা মনে মনে গুছিয়ে নিয়েছে নমিতা। সে বলল, 'তোমার কী মনে হয়?'

বৈশালী জবাব দেয় না।

নমিতা এবার জিজ্ঞেস করে, 'কারণটা কী, তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছ?'

বৈশালী বলে,'এখনও করিনি। তবে নিশ্চয়ই করব। তার আগে আপনার কথাটা শোনা যাক।'

'কারণটা হল আমি একটি মেয়ে। তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, সব কিছু বোঝার মতো বয়েসও তোমার হয়েছে। এরপর আর ব্যাখ্যা করার কি প্রয়োজন আছে?'

'আছে।'

'বল, আর কী জানতে চাও?'

বৈশালী বলে. 'আমার বাবার কাছে অনেক মেয়েই এসেছে। কিন্তু তাদের কারো সম্পর্কেই বাবাকে তো এত ইন্টারেস্টেড হতে দেখিনি।'

নমিতাকে এতটুকু বিচলিত দেখাল না। খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, 'হতে পারে ওঁর কাছে যে মেয়েরা যায়, আমি তাদের সবার চেয়ে অ্যাট্রাক্টিভ। তা ছাড়া, কোনো বিশেষ একজনকে কারো ভাল

লাগতেই পারে।'

তীব্র গলায় এবার বৈশালী বলে, 'তার মানে এটাই কি ধরে নেব, একটা এজেড লোকের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে আপনি চাকরিটা জোগাড় করেছেন?'

'অত ঘুরিয়ে ভদ্রভাবে বলার তো দরকার নেই বৈশালী।'

'মানে?'

'স্পষ্ট ব্যাপারটা হল, তোমার বাবার বিছানায় আমাকে বহুবার উঠতে হয়েছে।'

মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে বৈশালীর। সে প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। তারপর তীক্ষ্ণ, চাপা গলায় বলে, 'এই কথাগুলো বলতে আপনার লজ্জা করল না! স্ট্রিট বিচরাও এতটা শেমলেস নয়।'

বিন্দুমাত্র উত্তেজনা নেই নমিতার। তার মুখে বিচিত্র একটু হাসি ফুটে ওঠে, 'তুমি খুব সম্ভব ঠিকই বলেছ। আমার একেবারেই লজ্জা হচ্ছে না।'

কী উত্তর দেবে, ভেবে পেল না বৈশালী। কোনো মেয়ে যে এমন অকপটে নিজের স্ক্যান্ডাল সম্বন্ধে বলতে পারে, ভাবা যায় না।

খুব নিরুত্তেজ, শান্ত স্বরে কথা বলছিল নমিতা। হঠাৎ তার ওপর হিস্টিরিয়া যেন ভর করে। মুহূর্তে মুখচোখের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে যায়। উগ্র গলায় সে বলে, 'একটা কথা কি তুমি জানো, পৃথিবীতে কিছু না দিলে কিছু পাওয়া যায় না?'

নমিতার মুখটা ভেঙেচুরে অস্বাভাবিক বিকৃত দেখাচ্ছে। চোখ টকটকে লাল, মনে হয় শরীরের সব রক্ত সেখানে উঠে এসেছে। সে একটানা বলে যায়, 'আমার এই যে শরীরটা দেখছ, এটা একটা পণ্য—স্রেফ পণ্য। এর বদলে আমি একটা চাকরি পেয়েছি।'

বৈশালী চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, 'এর জন্যে আপনার পাপবোধ নেই?'

একটু আগের সেই উগ্রতা সমস্ত শরীর থেকে মুছে যায় নমিতার। ফের তাকে খুব শান্ত দেখায়। হঠাৎ জোরে জোরে হাসতে থাকে সে। আর হাসতে হাসতেই বলে, 'তুমি ফার্ন রোডে সোসাইটির যে লেভেলে থাক, সেখান থেকে আমাদের কথা ঠিক বুঝতে পারবে না। সময় ভীষণ খারাপ বৈশালী। তোমার মধ্যে শরীরের শুচিতার বাতিকটা ডালপালা ছড়িয়ে বসে আছে খুব সম্ভব। কিন্তু ফিজিক্যাল পিউরিটির চেয়ে সারভাইভ্যাল অনেক বড় ব্যাপার। বেঁচে থাকতে হলে আমাদের মতো মেয়েদের কত কিছু করতে হয় সেটা তুমি বুঝবে না।'

বৈশালী নিশ্চিতভাবেই টের পাচ্ছে, নমিতার সঙ্গে অঘোষিত একটা লড়াইয়ে সে ক্রমশ পিছু হটছে। কিন্তু যুদ্ধে কখনও তিন পা এগুলে দু পা পিছোতে হয়। সেটা রণকৌশলেরই একটা অংশ। সে বলল, 'আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাবটা দেন নি।'

'কোন প্রশ্ন?'

'যা করছেন তার জন্যে আপনার পাপ বা অনুতাপ নেই?'

সামান্য উত্তেজিত দেখাল নমিতাকে। সে বলল, 'কী আশ্চর্য, তোমাকে এতক্ষণ ধরে কী বললাম!' একটু থেমে ফের এভাবে শুরু করল, 'বেশ, আরো স্পষ্ট করেই বলছি। কোনোরকম পাপ বা অনুতাপ আমার নেই। আমাদের মতো মেয়েদের এই ধরনের বিলাসিতা থাকা উচিত নয়। পাপপুণ্যের কনসেপ্ট নিয়ে যারা মাথা ঘামায়, আমি তাদের মধ্যে পড়ি না। ইন ফ্যাক্ট—' বলতে বলতে থেমে যায় সে।

একটি মেয়ে যে এভাবে বলতে পারে, গড়পারে আসার আগে কল্পনাও করতে পারে নি বৈশালী। হতভম্বের মতো খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে সে। তারপর বলে, 'ইন ফ্যাক্ট কী?'

'ওয়ার্ল্ডের শেষ দেওয়ালে আমার পিঠ ঠেকে গেছে। সেখানে পাপপুণ্য একেবারে মিনিংলেস। বেঁচে থাকা, টিকে থাকাটাই একমাত্র লক্ষ্য। এ ছাড়া আর কিচ্ছু নেই।'

অনেকটা সময় নীরবতার ভেতর কেটে যায়।

তারপর বৈশালী বলে, 'আপনার বয়েস খুব একটা বেশি নয়। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও কি আপনি ভাবেন না?'

নমিতা বলে, 'কিসের ভবিষ্যৎ? তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'চিরকাল তো এভাবে চলতে পারে না। ধরুন, আপনার বিয়ে হল, তখন—' কথাটা শেষ করে

না বৈশালী। কিন্তু তার অসম্পূর্ণ বাক্যটির মধ্যে যে প্রশ্নটি রয়েছে তা আদৌ অস্পষ্ট নয়।

সেই হিস্টিরিয়াটা আবার নমিতার ওপর ভর করে। শরীর বাঁকিয়ে চুরিয়ে পাগলের মতো হাসতে থাকে সে। যেন এমন অবিশ্বাস্য কথা আগে কখনও শোনে নি। কণ্ঠস্বর কখনও খাদে নামিয়ে, কখনও উঁচুতে তুলে বলতে থাকে, 'আমার বিয়ে! তোমার মাথায় এমন একটা উদ্ভট চিন্তা এল কী করে?'

বৈশালী উত্তর দেয় না, শুধু তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে নমিতা বলে, 'আমার মতো মেয়েদের বিয়ে হয় না। যদি রূপকথার মতো একটা কাণ্ড সত্যি সত্যিই ঘটে যায়, মানে কেউ আমাকে বিয়ে করতে চায়, তাকে খোলাখুলি সব জানিয়ে দেব। আমার দেহটি যে পবিত্র নেই তা শোনার পরও তার যদি আপত্তি না থাকে তখন ওটা নিয়ে ভাবা যেতে পারে। তবে—'

'তবে কী?'

'আমাদের এই মেল-ডমিনেটেড সোসাইটিতে পুরুষরা যত লম্পট আর দুশ্চরিত্রই হোক না, চাইবে তার ধর্মপত্নীটি সতী সাবিত্রীর মতো শুদ্ধ, নিষ্পাপ নারী হোক। ট্র্যাডিশন—বুঝলে বৈশালী, ট্র্যাডিশন। সেটা কেউ ভাঙবে না।'

বৈশালী বলল, 'একসেপশনও তো থাকতে পারে?'

একটু থমকে যায় নমিতা। তারপর বলে, 'হয়তো পারে। রিয়ালি তেমন কেউ যদি আমার জীবনে আচমকা এসে পড়ে তখন বলব, শুধু আমার দায়িত্ব নিলেই চলবে না, আমার হোল ফ্যামিলি, ভাই বোন মা বোনপো বোনঝি সুদ্ধ সবার ভার কাঁধে তুলে নিতে হবে। নষ্ট মেয়েকে হয়তো অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া যায় কিন্তু তার সঙ্গে আরো সাতজনের দায় নেবে, এমন মহানুভব মহাপুরুষ বাংলা দেশে জন্মেছে বলে মনে হয় না।' খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, 'বিয়েটিয়ের কথা আমি ভাবি না।'

বৈশালী বলে, 'সেটা অবশ্য আপনার ব্যাপার। কিন্তু আপনি আমাদের ফ্যামিলির ভীষণ ক্ষতি করছেন। আমাদের বংশের সুনাম মর্যাদা অনার—'

নমিতার চোখের ভেতর থেকে এক ঝলক আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসে যেন। হাত তুলে বৈশালীকে থামিয়ে দিতে দিতে দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'সুনাম মর্যাদা অনার—এ সব যদি সত্যিই নষ্ট হয়ে থাকে তার জন্যে আমি কত পারসেন্ট দায়ী আর কত পারসেন্ট তোমার বাবা, সেটা ভেবে দেখেছ?'

নমিতা যে পালটা আক্রমণ করে বসবে, চিন্তা করতে পারে নি বৈশালী। ক্রোধ, আক্রোশ এবং অপরিসীম ঘৃণা মাথায় নিয়ে এ বাড়িতে এসেছিল সে। ঠিক করেছিল, যে নোংরা মেয়েমানুষটা সব্যসাচীকে টেনে নরকে নামিয়ে এনেছে, আঘাতে আঘাত তাকে ধরাশায়ী করে ফেলবে। আর মুহ্যমানের মতো সে মাথা নিচু করে বসে থাকবে। কিন্তু তার বদলে সে রুখে দাঁড়িয়েছে।

নমিতা বলে, 'ভাবতে পার বৈশালী, একটা অসহায় মেয়ে তার ফ্যামিলিকে বাঁচানোর জন্য একজন বিরাট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল অফিসারের কাছে গিয়েছিল। আর সেই অফিসার সাহায্য তাকে করেছে বটে, কিন্তু পুরো দামটাও নিয়ে নিয়েছে। সারেণ্ডার করা ছাড়া মেয়েটির কি কিছু করার ছিল? আমিও তো কম নিচে নামি নি! ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ, যদি তোমাদের ফ্যামিলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েই থাকে, তার জন্যে দায়টা কার বেশি?'

কিছু একটা জবাব দিতে চেষ্টা করে বৈশালী, কিন্তু গলায় স্বর ফোটে না।

নমিতা থামে নি, 'আমরা গরিব, স্ট্রাগলের শেষ নেই। তবু সামান্য হলেও কিছু আত্মসম্মান বোধ আমাদেরও ছিল। পৃথিবীর সব দেশে যে প্রোসেডিওরে চাকরি হয়, আমারও যদি সে ভাবেই কিছু একটা জুটে যেত, তোমার বাবার কাছে যাবার প্রশ্নই থাকত না। ক্ষতি আমারও কম হয় নি বৈশালী।'

বৈশালী আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

নমিতা বলতে থাকে, 'তুমি হয়তো ভেবেছিলে, একজন বড় মাপের ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোককে হাতে পেয়ে আঙুলের ডগায় তাকে নাচাচ্ছি। ভারি আমোদে আছি। আশা করি, এখন বুঝতে পারছ তো, তোমার ধারণাটা ঠিক নয়।'

মহিলা অদ্ভুত থট-রিডার। নিশ্চিতভাবে এটাই ভেবেছিল বৈশালী। সে উত্তর দিল না। আস্তে আস্তে

দাঁড়িয়ে বলল, 'আজ চলি। আপনার খানিকটা সময় নষ্ট করে গেলাম। অনেক খারাপ কথাও বলেছি।'

নমিতা অল্প হাসে, 'আমিও তোমাকে খুব ভাল কথা বলি নি। আমার ব্যবহারে আঘাত পেলে ক্ষমা করে দিও। সরি, রিয়েলি আই অ্যাম সরি।'

'ক্ষমাটা আমারও চাওয়া উচিত। আচ্ছা নমস্কার—'

'একটা কথা ছিল—'

নমিতার চোখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে বৈশালী। তারপর বলে, 'আমার বাবার সম্বন্ধে যে সব কথা বললেন, তাঁকে সেগুলো জানাব না—এই তো?'

বৈশালীকে যতটা মনে হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে, তার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমতী। আস্তে আস্তে মুখ নামিয়ে চাপা গলায় নমিতা বলে, 'হ্যাঁ। এখনও আমার চাকরিটা পার্মানেন্ট হয় নি।'

অর্থাৎ সব্যসাচী অসন্তুষ্ট হলে নমিতা অসুবিধায় পড়ে যাবে। বৈশালী বলল, 'আপনি বিপদে পড়ুন, এমন কাজ আমি কখনও করব না।'

নমিতাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সামনের ট্রাম রাস্তার দিকে যেতে যেতে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছিল বৈশালীর। নিজেকে রণসাজে সাজিয়ে নমিতাদের বাড়ি এসেছিল সে। ঘন্টাখানেকের মতো এখানে থেকেছে। টের পায় নি, কিভাবে কখন যে নমিতা একটি একটি করে তার সব অস্ত্র নিঃশব্দে ছিনিয়ে নিয়েছে। ভীষণ অবসন্ন বোধ করছে বৈশালী।

দশ

শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড জেদী এক আবিষ্কারকের মতো সব্যসাচীর গুপ্ত প্রমোদসঙ্গিনীকে খুঁজে পাওয়া গেছে। এতদিন নমিতাকে তাই ভেবে এসেছে বৈশালী। কিন্তু গড়পারে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে, তাদের বাড়ির লোকজনদের দেখে একটা সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছে সে। নিম্নবিত্ত পরিবারের একটি মেয়ের অসহায়তার সুযোগ নিয়েছেন সব্যসাচী। যে অস্বস্তিকর ঘটনা একদিন তাকে ক্রমাগত উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে তার নাটের গুরু তারই বাবা। এমন একটি নোংরা মানুষ, অধঃপতনের শেষ প্রান্তে যে পৌঁছে গেছে সে কিনা তারই সন্তান! ঘৃণায় কুঁকড়ে গেছে বৈশালী। নিজেকে শতবার ধিক্কার দিয়েছে। তার প্রতিজ্ঞা, তার জেদ, সব্যসাচীকে সে ছাড়বে না।

বড় পিসি সুরমা যে তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করবেন না সেটা তাঁর সঙ্গে কথা বলেই টের পাওয়া গেছে। বাবা বা ভাইরা কোনো অপরাধ করতে পারে না, তাঁর কাছে এটা স্বতঃসিদ্ধ। সুরমার ভাবনাচিন্তা যেমনই হোক, বৈশালীর আর এক পিসি এবং এক কাকাও এই শহরে রয়েছেন। আছেন মা এবং দাদা। এঁরা ছাড়া রয়েছেন মামারা এবং মামীরা। ঠাকুমা যদিও এখন পর্যন্ত জীবিত, তাঁর থাকা না-থাকা সমান। স্মৃতিভ্রষ্ট, পঙ্গু মানুষটি যদি সুস্থ থাকতেন, তাঁর মস্তিস্ক সক্রিয় থাকত, সারা পৃথিবী তোলপাড় করে ফেলতেন। অধঃপতিত সন্তান কোনোভাবেই পার পেত না। কিন্তু তাঁর কথা ভেবে এখন লাভ নেই, জীবন থেকেই তিনি বাতিল হয়ে গেছেন।

বৈশালীর মধ্যে সেই অনমনীয় একগুঁয়েমিটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। মেজ কাকা অভিমন্যু, ছোট পিসি মনীষার সঙ্গে সে দেখা করবে। তারপর মামাবাড়ি যাবে। মা এবং দাদার সঙ্গেও কথা বলবে। লণ্ডনে ছোট কাকা সিতাংশুকেও চিঠি দিয়ে সব জানাবে। প্রথমে পারিবারিক প্রতিক্রিয়াটা সে বুঝে নিতে চায়। আর শেষ বোঝাপড়া বা যুদ্ধটা হবে সব্যসাচীর সঙ্গে।

আজ রবিবার।

ছুটির দিনে অভিমন্যু পারতপক্ষে বাড়ি থেকে বেরোন না। মানুষটা আয়েসী ধরনের। শুয়ে বসে আড্ডা মেরে কি টিভি দেখে ছুটি কাটাতে ভালবাসেন। বাড়িতে গেলে আজ তাঁকে পাওয়া যাবেই।

সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখটুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়ল বৈশালী। মা বাবা দাদা এখনও ঘুমোচ্ছে। ছুটির দিনে সবাই অনেকটা বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়। কারো বেরুবার তো তাড়া থাকে না।

মা-বাবারা ঘুমোলে কী হবে, বাড়ির কাজের লোকেরা এর মধ্যে জেগে গেছে। একতলায় আসতে দেখা গেল, ময়না চা তৈরির তোড়জোড় করছে। সাবিত্রী কিচেনের ওধারের শান-বাঁধানো চাতালে

বাসন মাজছে।

বৈশালীকে দেখে দু'জনেই খুব অবাক। এত সকালে সে কখনও বেরোয় না। কোথায় যাচ্ছে সেটা আর জিজ্ঞেস করল না ওরা। শুধু বলল, 'চা খেয়ে যাও দিদি।'

বৈশালী বলল, 'ফিরে এসে খাব। এখন সময় নেই।'

রবিবারের সকালে রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকে। গোলপার্কের মুখ থেকে ট্যাক্সি ধরে বাই-পাসে অভিমন্যুদের আবাসনে পৌঁছুতে কুড়ি মিনিটও লাগল না।

অভিমন্যুর সংসার বৈশালীদের চেয়েও ছোট। অভিমন্যু, তাঁর স্ত্রী মালবিকা এবং ওঁদের একমাত্র ছেলে টিপু, যার ভাল নাম সৌরদীপ। টিপু একটা নাম-করা মিশনারি স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ে। বৈশালীদের মতোই এ বাড়িতে দু'জন কাজের মেয়ে। একজনের দায়িত্ব রান্নাবান্না, আর এক জনের কাজ হল বাসন মাজা, ঘর সাফাই ইত্যাদি।

অভিমন্যুদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বিশাল ড্রইংরুমে বসে তিনি এবং মালবিকা সোফায় গা ছড়িয়ে দিয়ে খবরের কাগজে চোখ বুলোতে বুলোতে চা খাচ্ছিলেন। আর দুধে চকোলেট মিশিয়ে খাচ্ছিল টিপু।

বৈশালী যে এত সকালে আসতে পারে, ভাবতেই পারেন নি অভিমন্যুরা। অবাক বিস্ময়ে তাঁরা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপর মালবিকা এবং অভিমন্যু একসঙ্গে বলে ওঠেন, 'হোয়াট আ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ!' পরক্ষণে দ্রুত সোফায় সোজা হয়ে উঠে বসে জিজ্ঞেস করেন, 'এত সকালে এলি! কিছু হয়েছে?'

মালবিকা আরো পরিষ্কার করে বললেন, 'খারাপ কিছু?'

প্রশ্নটার সরাসরি জবাব না দিয়ে বৈশালী বলল, 'তোমাদের সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। সে সব বলার জন্যে এই সকাল বেলাতেই আসতে হল।'

অভিমন্যু কী বলতে যাচ্ছিলেন, তাকে থামিয়ে দিয়ে মালবিকা বললেন, 'দেখে তো মনে হচ্ছে, ব্রেকফাস্ট ট্রেকফাস্ট কিছুই হয় নি। কী খাবি বল?'

বৈশালী বলল, 'সত্যিই খেয়ে টেয়ে আসি নি। আগে রমাদিকে চা দিতে বল। তারপর অন্য কিছু খাওয়া যাবে।' রমা এ বাড়ির চা-জলখাবার থেকে শুরু করে যাবতীয় রান্নাটান্না করে থাকে।

রমাকে ডেকে চা করে আনতে বললেন মালবিকা।

বৈশালীকে দেখে দারুণ খুশি টিপু। সে দুধের গেলাস নিয়ে তার গা ঘেঁষে বসে বলল, 'অনেব দিন পর আমাদের বাড়ি এলে বড়দি। আজ তোমাকে ছাড়ছি না। সারাদিন এখানে থাকতে হবে।'

টিপুর কাঁধে হাত রেখে একটু হাসল বৈশালী, কিছু বলল না।

অভিমন্যুর মনে ক্রমশ একটা খটকা দেখা দিতে শুরু করেছে। হয়তো মালবিকার মধ্যেও একই সংশয়। বৈশালী মাঝে মাঝে যে তাদের বাড়ি আসে না তা নয়। কিন্তু আসার আগে ফোন করে। নিশ্চয়ই সিরিয়াস এমন কিছু ঘটেছে যাতে না জানিয়ে এই সকালবেলায় হুট করে চলে এসেছে। মেয়েটা অবশ্য জানিয়েছে তাঁদের সঙ্গে অনেক কথা আছে। কী কথা? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। দু'জনের মন কেমন যেন কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে রইল।

অভিমন্যু একটু ঘুরিয়ে বৈশালীর হঠাৎ আসার কারণ বোঝার চেষ্টা করলেন, 'তুই যে এসেছিস, তোর মা বাবা জানে?'

আস্তে মাথা নাড়ে বৈশালী, 'না। আমি যখন বেরুই মা বাবা দাদা, সবাই ঘুমোচ্ছিল। তবে সাবিত্রীদি আর ময়না উঠেছে। ওরা আমাকে বেরুতে দেখেছে, মা-বাবাকে ঠিক বলে দেবে।'

'আমাদের এখানে আসবি, সেটা সাবিত্রীদের বলেছিস?'

'না।'

রমা চা-বিস্কুট দিয়ে গেল।

অভিমন্যু বললেন, 'এতক্ষণে নিশ্চয়ই দাদাবৌদি উঠে পড়েছে। ওদের কি ফোন করে জানিয়ে দেব, তুই এখানে এসেছিস?'

চায়ে চুমুক দিয়ে বৈশালী বলল, 'না। আগে তোমাদের সব শোনাই, তারপর ফোন করো।'

কেউ আর কোনো প্রশ্ন করে না।

চা খাওয়া শেষ হয়ে গেলে বৈশালী টিপুকে বলল, 'টিপু তুই এখন ঘরে যা। আমি মেজ কাকা আর মেজ কাকিমার সঙ্গে একটু কথা বলব। এক ঘন্টা পর আবার আসিস।'

টিপু খুব বাধ্য ছেলে। তক্ষুনি উঠে পড়ল। বলল, 'আজ কিন্তু থাকতে হবে।'

একটু ভেবে বৈশালী বলল, 'ঠিক আছে। বিকেল পর্যন্ত থাকব।'

'প্রমিস?'

'প্রমিস।'

টিপু চলে গেল।

রীতিমত উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন অভিমন্যু আর মালবিকা। অভিমন্যু বৈশালীর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার বল—'

বৈশালীর মুখ ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে উঠতে থাকে। সে বলে, 'তোমরা হয়তো জানো না, আমার বাবা, মানে তোমার দাদা হ্যাজ ব্রট শেম অন আওয়ার ফ্যামিলি। সে যে কী লজ্জা আর নোংরামির কথা, তোমরা ইমাজিন করতে পারবে না।'

অভিমন্যু আর মালবিকার মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল যেন। মুহূর্তে দু'জনের শিরদাঁড়া টান টান হয়ে যায়। আকস্মিক তীব্র শকটা সামলে উঠতে তাঁদের বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগল। তারপর ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে ওঠেন অভিমন্যু, 'কার সম্বন্ধে কী বলছিস তনি! তোর মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে!'

খুব শান্ত গলায় বৈশালী বলল, 'আমার মাথা ঠিকই আছে মেজ কাকা।'

মালবিকা ভীষণ রেগে গেছেন। উগ্র গলায় বললেন, 'ষোল বছর আমার বিয়ে হয়েছে। দাদাকে তখন থেকে দেখে আসছি। হী ইজ মোস্ট রেসপেক্টেড পারসন অফ আওয়ার ফ্যামিলি, আফটার আওয়ার মাদার-ইন-ল। এক কথায় তিনি আমাদের কাছে একজন আইডল। আর তুমি কিনা তাঁর মুখে চুনকালি লাগাতে চাইছ! ছিঃ—'

অভিমন্যু বললেন, 'এত বাড়াবাড়ি ভাল নয় তনি। তোর মুখ থেকে দাদা সম্পর্কে যে এরকম নোংরা অ্যালিগেশন বেরিয়ে আসবে, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না।'

বৈশালী এতটুকু উত্তেজিত হল না। বলল, 'মেজ কাকা, মেজ কাকিমা, সব্যসাচী দাশগুপ্ত তোমাদের একজনের দাদা, একজনের ভাশুর। কিন্তু তিনি আমার বাবা। কোন পর্যায়ে পৌঁছুলে নিজের বাবার চরিত্র নিয়ে এই ধরনের কথা তাঁর মেয়ের মুখ থেকে বেরোয় সেটা একবার ভেবে দেখেছ?'

অভিমন্যু এবং মালবিকা হকচকিয়ে গেলেন। কিন্তু কেউ উত্তর দিলেন না।

বৈশালী বলতে লাগল, 'তোমাদের কি ধারণা, বাবার বিরুদ্ধে এই যে অ্যালিগেশনটা করছি সেটা আমার মনগড়া? গুজব শুনে আমি সেটা বিশ্বাস করে বসে আছি?'

নিজের অজান্তেই অভিমন্যু শ্বাসটানা গলায় বললেন, 'তা হলে?'

'তা হলে কী?'

'দাদার বিরুদ্ধে তোর অভিযোগের প্রমাণ আছে?'

বৈশালী বলল, 'যে মেয়েটির সঙ্গে বাবা ইনভলভড, আমি তার সঙ্গে দেখা করেছি। প্রচণ্ড ঘৃণা আর রাগ নিয়ে আমি তাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। তার সঙ্গে কথা বলেছি, তার হোল পারিবারিক ব্যাকগ্রাউণ্ডটা নিজের চোখে দেখেছি। ওরা ভীষণ গরিব। ওদের পভার্টি আর অসহায়তার সুযোগ নিয়েছেন সব্যসাচী দাশগুপ্ত—' মালবিকার দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাকে তোমরা এতকাল অনেক উঁচু প্ল্যাটফর্মে বসিয়ে একজন আইডল বানিয়ে রেখেছ, তাঁর মরালিটির নমুনাটা এবার বুঝতে পারছ তো?'

ড্রইংরুমে অস্বস্তিকর স্তব্ধতা নেমে আসে।

অনেকক্ষণ পর বৈশালী বলে, 'আমার কথা এখনও যদি বিশ্বাস না হয়, মহিলার বাড়িতে তোমাদের নিয়ে যেতে পারি। যেতে চাও?'

মালবিকা এবং অভিমন্যু দু'জনকেই ভীষণ বিব্রত দেখায়। অভিমন্যু বৈশালীর প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে বললেন, 'এ সব কথা তুই আর কাউকে বলেছিস?'

বৈশালী বলল, 'বলেছি।'

রুদ্ধশ্বাসে অভিমন্যু জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকে?'

'বড় পিসিকে।'

'কী বললে দিদি?'

বৈশালী বলল, 'পরে শুনো। এখন বল, তোমার দাদার ব্যাপারে, যাকে চিরকাল রোল মডেল হিসেবে পুজো করে এসেছ, তার সম্বন্ধে কী করতে চাও?'

অভিমন্যু চমকে ওঠে, 'কী করতে চাই মানে?'

'একটা লোক এত বড় একটা ডিসগ্রেসফুল অন্যায় করে সারা বংশের নাম ডুবিয়ে দিচ্ছে, আর তোমরা তাকে ছেড়ে দেবে! তোমাদের মা, মানে ঠাকুমা সুস্থ থাকলে কী স্টেপ নিত একবার ভেবে দেখ।' বৈশালীর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কঠোর শোনায়।

অভিমন্যু একটু ভেবে বলেন, 'মানুষ ভগবান নয় তনি। কখনও কখনও তার জীবনে অ্যাকসিডেন্ট ঘটে যায়। ধরে নে, এটা সেরকম একটা ব্যাপার।'

অর্থাৎ বড় ভাইয়ের হয়ে পুরোপুরি সাফাই গাইছেন অভিমন্যু। দুর্ঘটনা বলে সব্যসাচীর অধঃপতনকে হালকা করে দিতে চাইছেন। তাঁর ভূমিকা রামায়ণের লক্ষ্মণের মতো।

মালবিকা বললেন, 'এ নিয়ে আর মাথা ঘামাস না তনি। গুরুজনদের যদি কোনো ফল্ট হয়ে থাকে, সেদিকে তাকাতে নেই।'

দেখা যাচ্ছে, তাদের পরিবারের সবার ভাবনাচিন্তার প্যাটার্নটা এক ধরনের; একই ছাঁচে ঢালাই করা। বড় পিসিও ঠিক এই রকম কথাই বলেছিলেন। বৈশালী বলে, 'আচ্ছা কাকিমা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। ঠিক ঠিক উত্তর দেবে?'

বৈশালীকে আজ ভীষণ আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দেখা যাচ্ছে। কী প্রশ্ন সে করে বসবে কে জানে। মালবিকা রীতিমত অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। সতর্কভাবে বৈশালীকে লক্ষ করতে করতে বলেন, 'উত্তর জানা থাকলে নিশ্চয়ই দেব।'

'সব্যসাচী দাশগুপ্ত আমার বাবা, তোমার ভাশুর কি মেজ কাকার দাদা না হতেন, আর এমন একটা জঘন্য ক্রাইম করতেন, তোমরা কি চুপ করে থাকতে, না আমাকে মুখ বুজে থাকতে বলতে?' বৈশালী বলতে লাগল, 'অপরাধটা যে করেছে, কিছুতেই তাকে ছাড়তে না।'

মালবিকা ঢোক গিলে বললেন, 'আফটার অল, এটা আমাদের ফ্যামিলির ব্যাপার। সুনাম তৈরি করতে জেনারেশনের পর জেনারেশন কেটে যায়, কিন্তু সামান্য একটা স্ক্যান্ডালে এক মুহূর্তে তা ধ্বংস হয়ে যায়। তনি, আমাদের কারো এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে লোকের চোখে আমরা নিচু হয়ে যাই।'

বৈশালী বলল, 'তোমরা চাও, নিজেদের পরিবারে যে যত অন্যায়ই করুক, তাকে প্রশ্রয় দিতে হবে।'

'একে প্রশ্রয় দেওয়া বলে?'

'কী বলে তা হলে? লোকটা অন্যায় করছে, আর তোমরা তা চেপে রাখতে চাইছ। যেহেতু ঠাকুমার পর সে সিনিয়রমোস্ট, তাকে কিছু বলার সাহস তোমাদের নেই।'

হঠাৎ ভীষণ রেগে গেলেন অভিমন্যু। বৈশালীর দিকে ডান হাতের তর্জনী নাচিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিস তনি। তোর এত স্পর্ধা হয়েছে, ভাবতে পারি না। একটা কথা তোমাকে স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি—'

স্থির চোখে অভিমন্যুর দিকে তাকিয়ে থাকে বৈশালী।

অভিমন্যু কণ্ঠস্বর একই জায়গায় রেখে বলতে থাকেন, 'আমাদের কাছে যা বলেছিস সেখানেই যেন ব্যাপারটা শেষ হয়ে যায়। আমি বা তোর কাকিমা চাই না, এই নিয়ে পারিবারিক অ্যাটমসফিয়ারটা ভিশিয়েট করে তোল।'

বড় পিসির মতো মেজ কাকা এবং মেজ কাকিমাও চান, সব ধুলোবালি নোংরা ময়লা কার্পেটের তলায় লুকনো থাক। যেহেতু তিনি বড় ভাই, তাই তাঁর অন্যায়টাকে কেউ অন্যায় হিসেবে মনেই

করছে না। অপরাধটা কিন্তু যেখানে ছিল সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বৈশালীর মস্তিষ্কে প্রচণ্ড একগুঁয়েমি যেন চেপে বসে। টের পায়, রক্তচাপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো গলার স্বর উঁচুতে চড়িয়ে সে বলে, 'নিজেদের লোক হলে ন্যায় অন্যায়ের মাঝখানের বাউন্ডারি লাইনটা বুঝি ঝাপসা হয়ে যায়, তাই না মেজ কাকা?'

ভুরু কুঁচকে অভিমন্যু বলেন, 'মানে!'

'তোমরা তোমাদের দাদাকে শিল্ড করে চলেছ। কিন্তু নমিতা চৌধুরির কথা একবারও ভাবছ না তো!'

'তার কথা কী ভাবব?'

'তোমাদের দাদার জন্যে একটা লোয়ার মিডল ক্লাস ফ্যামিলির মেয়ের কত বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে, সেটা বুঝি একেবারেই মনে পড়ছে না?'

অভিমন্যু তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, 'ওই সব মেয়েরা—'

অভিমন্যুকে শেষ করতে দেয় না বৈশালী। তার আগেই গলার স্বর অনেকটা উঁচুতে তুলে বলে, 'মেজ কাকা, তুমি যা ইঙ্গিত দিতে চাইছ তা বুঝতে পারছি। নমিতা চৌধুরি ওই মেয়েদের ক্লাসে পড়ে না। যাকে দেখ নি তার সম্বন্ধে এরকম কমেন্ট করা শুধু আনফরচুনেটই নয়, একে আমি অফেন্সই বলব। নিজের ভাইকে বাঁচাতে একটা হেল্পলেস মেয়ের ঘাড়ে দোষ চাপিও না।'

মালবিকা শান্ত বিচক্ষণ গম্ভীর ধরনের মানুষ। হঠাৎ তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, 'তনি, কার সঙ্গে কথা বলছিস সেটা কি খেয়াল আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে।'

'বড়দের যে সম্মান দিতে হয় সেটা জানিস না? কী লেখাপড়া শিখছিস তা হলে?'

বৈশালী মালবিকার দিকে ফিরে বলে, 'লেখাপড়া শিখছি বলেই তো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারছি। সব কিছু মুখ বুজে, চোখ বন্ধ করে মেনে নিচ্ছি না।' তার কণ্ঠস্বর উত্তেজনাশূন্য কিন্তু দৃঢ়।

অভিমন্যুর চোয়াল পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠেছে। চোখদুটো তাঁর জ্বলছিল। তিনি চিৎকার করে ওঠেন, 'এনাফ। আর একটা কথাও তুই বলবি না। আমি যেন না শুনি দাদা সম্বন্ধে অন্য কোথাও মুখ খুলেছিস।'

বৈশালী তীরের মতো সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে যায়।

মালবিকাও উঠে পড়েছিলেন। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তিনি ডাকতে থাকেন, 'তনি—তনি, তুই তো ব্রেকফাস্ট করেও গেলি না।' তিনি বুঝতে পারছিলেন, বৈশালীর সঙ্গে ব্যবহারটা বেশ রূঢ়ই করে ফেলা হয়েছে।

বৈশালী ফিরেও তাকাল না।

এগার

অভিমন্যুদের বিল্ডিং কমপ্লেক্স থেকে বাই-পাসে আসার পর মস্তিষ্কের উত্তাপ অনেকটা জুড়িয়ে আসে বৈশালীর।

উত্তর-দক্ষিণে পুবে-পশ্চিমে এখন হু হু করে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে আড়াআড়ি। সূর্য দূরের গাছপালার আড়াল থেকে অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। রাস্তার দু'ধারের বিশাল ল্যাণ্ডস্কেপের ওপর রোদ ঝক ঝক করছে। দিনের তাপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

সকালে বৈশালী যখন এদিকে আসে রাস্তায় গাড়ি টাড়ি মানুষজন তেমন চোখে পড়ে নি। এখন চারদিকে বেশ ভিড়, তা ছাড়া প্রচুর প্রাইভেট কার, বাস, অটো দেখা যাচ্ছে।

নমিতার সঙ্গে সব্যসাচীর অবৈধ গোপন সম্পর্কের ব্যাপারে তাঁর দুই ভাইবোনের সঙ্গে দেখা করেছে বৈশালী। কিন্তু ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগটা তাঁরা আমলই দিচ্ছেন না, বরং তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছেন। অদ্ভুত তাঁদের লজিক। সব্যসাচীর জীবনে যে দ্বিতীয় একটি নারীর প্রবেশ ঘটেছে এবং তিনি তার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছেন, প্রথমত এটা তাঁরা বিশ্বাসই করছিলেন না, আর করলেও

তার সমস্ত দায়টা চাপিয়ে দিচ্ছেন একটি দরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অসহায় তরুণীর ওপর।

বৈশালীর বড় পিসি এবং মেজ কাকা, দু'জনেই শিক্ষিত, সামাজিক ন্যায় অন্যায় সম্পর্কে তাঁদের ধ্যানধারণা পরিষ্কার। কিন্তু নিজেদের পরিবার কোনো স্ক্যাণ্ডালে জড়িয়ে গেলে তাঁদের বিচারবুদ্ধি একেবারেই কাজ করে না। সর্বশক্তি দিয়ে তাঁরা বংশের মর্যাদা রক্ষা করতে চেষ্টা করবেন। সব্যসাচী অন্যায় করছেন বুঝেও একগুঁয়ে জেদ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে একটি শব্দও কানে তুলবেন না। এ বিষয়ে যাবতীয় নীতিবোধকে তাঁদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেবেন না। এমনকি, মেজ কাকিমা মালবিকা, যিনিও অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত, দাশগুপ্ত পরিবারে বিয়ে হবার পর এখানকার ছাঁচেই নিজেকে ঢালাই করে নিয়েছেন। ভালমন্দ ন্যায় অন্যায়ের বোধটা তাঁর মধ্যে আর কাজ করছে না। আশ্চর্য!

বৈশালী বিষণ্ণ বোধ করে। নিজেদের পরিবার এবং বংশ সম্পর্কে তার যে ধ্যানধারণা ছিল, সব্যসাচীর ওই ঘটনায় তা পুরোপুরি টলে গেছে।

অন্যমনস্কর মতো হাঁটছিল বৈশালী। হঠাৎ মামাদের কথা মনে পড়ে গেল। সেই সঙ্গে ছোট কাকা এবং ছোট পিসির কথাও। তারপর রয়েছেন মা আর দাদা। বাবার সম্পর্কে এঁদের মনোভাবও যাচাই করা দরকার। অবশ্য এ সব আগেই ভেবেছে সে। এখন আবার নতুন করে মনে পড়ল। দেখাই যাক, এঁরা কেউ বংশের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় মানুষটির নীতিবিরুদ্ধ একটা কাজের প্রতিবাদ করেন কিনা। ছোট কাকা সিতাংশুকে হাতের কাছে পাওয়া যাবে না। দু-এক দিনের ভেতর সব জানিয়ে তাঁকে একটা চিঠি লিখতে হবে।

বাস স্টপে চলে এসেছিল বৈশালী। পর পর গড়িয়াহাটের দুটো বাস এসে গেল। প্রায় ফাঁকা। একটায় উঠে পড়ল সে।

যদিও সুরমা এবং অভিমন্যু কোনোও রকম উৎসাহ দেখান নি, বরং অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ভাইয়ের স্ক্যাণ্ডালটা চাপা দিতে চেয়েছেন। শুধু তাই না, চুপচাপ না থেকে সমস্যাটা নিয়ে বৈশালী যে একটা হেস্তনেস্ত করতে চাইছে সে জন্য অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। মেজ কাকা এবং বড় পিসির প্রতিক্রিয়া যেমনই হোক, সে কিন্তু দমে যায় নি। কাবার্ডের ভেতর কঙ্কালের সন্ধান যখন পাওয়া গেছে তখন শেষ না দেখে ছাড়বে না।

গড়িয়াহাটে এসে বৈশালী মনস্থির করে ফেলে, আপাতত বাড়ি ফিরবে না। সোজা বাগবাজারে মামাবাড়ি চলে যাবে। সব্যসাচীর স্ক্যান্ডাল শোনার পর তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় এবং স্নেহভাজন ভগ্নিপতি সম্পর্কে মামাদের প্রতিক্রিয়া কী হয় সেটা জানা দরকার। মুখ দেখেই টের পাওয়া যাবে, তাদের নাড়ির গতি কতটা বেড়ে গেছে।

আজ পাতাল রেল এ বেলা বন্ধ। অগত্যা দু'বার মিনিবাস পালটে বাগবাজারে চলে এল বৈশালী।

মামাবাড়িটা বড় রাস্তার ওপরেই। বড় পিসিদের মতো এই বাড়িটাও অনেকটা জায়গা জুড়ে। চারপাশ ঘিরে কাচের টুকরো বসানো উঁচু কমপাউন্ড ওয়াল। সামনের দিকে লোহার মজবুত গেট। সেখানে বহুকালের পুরনো দারোয়ান লালবিহারী সিং একটা উঁচু টুলের ওপর বসে আছে। লোকটা রাজপুত ক্ষত্রিয়। সত্তরের কাছাকাছি বয়স হলেও শরীর এখনও বেশ মজবুত। মাথায় পেল্লায় পাগড়ি, গালে জমকাল গালপাট্টা, পরনে টাইট করে পরা ধুতি আর কুর্তা। প্রায় চল্লিশ বছর সে এ বাড়িতে স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে আছে। দেশে ফিরে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

পিসি বা কাকাদের বাড়ির মতোই বিশেষ অনুষ্ঠান না থাকলে মামাবাড়িতে আসা হয় না বৈশালীর। তাকে দেখে দারুণ খুশি লালবিহারী। কথায় একটু টান থাকলেও বাংলাটা নির্ভুল বলে সে।

সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ে লালবিহারীর। বলল, 'এস এস, দিদি।'

বৈশালী একটু হেসে বলল, 'তুমি ভাল আছ তো লালবিহারী দাদা?'

'খুব ভাল—' লালবিহারী মাথাটা অনেকখানি হেলিয়ে বলে, 'তুমি একা যে? আর কেউ আসে নি?'

'না। বড়মামা ছোটমামা বাড়ি আছে?'

'আছেন। যাও, ভেতরে যাও—'

গেটের পর থেকে নুড়ি-বিছানো ড্রাইভওয়ে। তার দু পাশে লাইন দিয়ে সিলভার পাম। রাস্তাটার

দুধারেই পামের সারির পর ফুলের বাগান।

ড্রাইভওয়ে দিয়ে তিরিশ গজের মতো হাঁটলে ফিকে গোলাপি রঙের দোতলা বাড়ি। ছাদে রাধাকৃষ্ণের চুড়োওলা মন্দির। মামাবাড়িতে সারা বছরই এ-পুজো সে-পুজো লেগে আছে। রাধাকৃষ্ণ এঁদের প্রিন্সিপ্যাল দেবতা হলেও কালী লক্ষ্মী চণ্ডী শিব, কেউ বাদ যান নি, ভক্তিভরে সবারই ভজনা করা হয়। বাপের বাড়ির এই লিগ্যাসি কাঁধে চাপিয়ে শ্বশুর বাড়িতে পা রেখেছিলেন সুচরিতা এবং সেটা সযত্নে রক্ষা করে চলেছেন, এতটুকু হেরফের হতে দেন নি।

ড্রাইভওয়ের ডান পাশে বাগানের ধার ঘেঁষে শেডের তলায় রয়েছে পুরনো আমলের একটা ফোর্ড গাড়ি, একটা শেভ্রলে আর হালের মারুতি এসটিম এবং ইন্ডিকা। একসময় ওঁদের দুটো ফিটন ছিল, ছিল দামি দামি তিন চারটে ঘোড়া। ফিটনের দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধুই উদ্দাম গতি। ঢিমে চালে রাজকীয় মেজাজে আজকাল কেউ আর বেড়ায় না। এতদিনের একটা পারিবারিক ট্র্যাডিশন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও, ভারাক্রাংন্ত মনে বিদায় দিয়েছেন মামারা। সে দুটোর জায়গায় এসেছে মারুতি এবং ইন্ডিকা। তবে ফোর্ড এবং শেভ্রলে তাদের প্রাচীন মর্যাদা আর গাম্ভীর্য নিয়ে এখনও থেকে গেছে।

একতলার হল-ঘরের একধারে তিরিশ জন একসঙ্গে বসে খাবার মতো ডাইনিং টেবল এবং চেয়ার। আর একধারে পুরু গদিওলা সিংহাসন মার্কা পাঁচ সেট সেকেলে ডিজাইনের সোফা। এ ছাড়া দেওয়াল ঘেঁষে মেহগনি কাঠের আলমারিগুলোতে কোনোটায় বই, কোনাটায় নানা ধরনের শৌখিন জিনিস, মাথার ওপর থেকে ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকের দেওয়ালে এই বংশের পূর্বপুরুষদের পেতলের ফ্রেমে বাঁধানো বিশাল বিশাল সব অয়েল পেন্টিং। হল-ঘরটা ঘিরে বেশ কয়েকটা বেডরুম কিচেন স্টোর ইত্যাদি। এক পাশ দিয়ে চওড়া সিঁড়ি পাক খেয়ে খেয়ে দোতলায় উঠে গেছে। সেখানেও একই ধরনের হল-ঘর, বেডরুম ইত্যাদি। তবে ডাইনিং টেবল নেই। কিচেন টিচেনও না।

হল-ঘরের মাঝখানে বড় মামা এবং ছোট মামা দাবা নিয়ে মত্ত হয়ে আছেন। বড় মামা চামড়ার গদিওলা একটা বড় ডিভানে কাত হয়ে রয়েছেন। মাঝখানে একটা চওড়া কাশ্মিরি টেবল। তার এধারে একটা সোফায় বসে আছে ছোট মামা।

বড় মামা অর্ধেন্দুশেখরের বয়স সাতষট্টি-আটষট্টি। টকটকে ফর্সা রং, গোলগাল, মাথায় পাতলা কাঁচাপাকা চুল, সামান্য লম্বাটে মুখ, চোখে মেটালের ওভাল শেপের চশমা, পরনে ফিনফিনে ধুতি আর ডান পাশে বোতাম লাগানো বেনিয়ান। এ বাড়ির পুরুষদের এটাই ঘরে পরার পোশাক। ডিভানের তলায় পাতলা বেডরুম স্লিপার। বহু ব্যাপারেই এখানে সাবেক চাল বজায় রয়েছে।

এ বাড়ির কারোরই চাকরি বাকরি করার প্রয়োজন নেই। পূর্বপুরুষেরা যে টাকা ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করে গেছেন বা বড় বড় ব্লু-চিপ কোম্পানিতে খাটাবার ব্যবস্থা করেছেন, সে সব জায়গা থেকে যা ইন্টারেস্ট বা ডিভিডেণ্ড পাওয়া যায় তা দিয়ে অর্ধেন্দুশেখররা তো বটেই, তাঁদের পরবর্তী চোদ্দ জেনারেশন পায়ের ওপর পা তুলে রাজার হালে কাটিয়ে দিতে পারেন।

কিন্তু একজন পুরুষমানুষ, লেখাপড়ায় ভাল, কলকাতা ইউনিভার্সিটির এম.কম, অকর্মার ধাড়ি হয়ে বাপ-ঠাকুরদার পয়সায় খেয়ে ঘুমিয়ে সারা জীবনটা আলস্যে কাটিয়ে দেবে, তা তো আর হয় না। তিনি ব্যাঙ্কে চাকরি নিয়ে তর তর করে অনেক উঁচুতে উঠে রিটায়ার করেছেন।

ছোট মামা আনন্দশেখরের মুখের আদলটা হুবহু তাঁর দাদার মতো। তবে হাইটটা বেশি, মেদহীন পেটানো চেহারা। তিনি আর্মিতে ছিলেন। কর্নেল হবার পর বছর দুই আগে অবসর নিয়েছেন। জবরদস্ত অফিসার হিসেবে সেনাবাহিনীতে নাম ছিল। কঠোর ডিসিপ্লিন মেনে চলতেন এবং তাঁর আন্ডারে যারা ছিল তাদের চলতে বাধ্য করতেন। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর সাবেক ঢিলেঢালা চালে দিন কাটাচ্ছেন। দাদার মতোই পরনে ধুতি-বেনিয়ান। দুই ভাইয়েরই প্রচণ্ড দাবার নেশা। তাঁদের ধারণা, এই খেলাটায় নাকি মস্তিষ্কের পুষ্টি হয়। ছুটির দিনে এ বাড়িতে ঢুকলেই দেখা যাবে দুই ভাই ঘাড় গুঁজে দাবার ছকের ওপর ঝুঁকে আছেন।

অর্ধেন্দুশেখরের দুই মেয়ে, এক ছেলে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। তাদের একজন থাকে আলিপুরে, আর একজন পণ্ডিতিয়া রোডে। দুই জামাইই খুব কৃতী এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত। একমাত্র ছেলে সঞ্জয় নাম-করা চা কোম্পানিতে ভাল চাকরি করে কিন্তু তার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, বিয়ে করবে না। সঞ্জয়ের

একমাত্র প্যাশন ক্রিকেট। বয়স সাঁইত্রিশ। আগে ফার্স্ট ডিভিসন ক্লাবে খেলত, ব্যাটসম্যান হিসেবে খুব নাম করেছিল। রঞ্জি ট্রফিতে রেগুলার তো খেলতই, ইস্টার্ন জোনে দশ বছর মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলে এসেছে। এখন অবশ্য খেলে না, কিন্তু নিয়মিত কোচিং করিয়ে যাচ্ছে। ছুটির দিনে তাকে বাড়িতে পাওয়া অসম্ভব।

আনন্দশেখরের এক ছেলে, এক মেয়ে। বিয়ের পর মেয়ে অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে। ছেলে পড়ে আমেদাবাদের আই আই এমে। ওখানেই হস্টেলে থাকে।

বৈশালী দোতলায় উঠে দুই মামার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাঁরা এমনই বিভোর হয়ে আছেন যে টের পান নি। বেশ খানিকক্ষণ পর ঘোড়ার চাল দিতে গিয়ে হঠাৎ অর্ধেন্দুশেখর যেই মুখ তুলেছেন অমনি ভাগনীকে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হই হই করে উঠলেন, 'মাই গড, শুভ্রা মল্লিকা, তাড়াতাড়ি এসে দেখ কে এসেছে—' শুভ্রা হলেন বড় মামীমা, মল্লিকা ছোট মামীমা।

দু'জনে ডান পাশের দুটো ঘর থেকে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এসে বৈশালীকে দেখে প্রথমটা দারুণ অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর একই সঙ্গে মজার গলায় বললেন, 'এ কাকে দেখছি!'

আনন্দশেখর বললেন, 'হার হাইনেস শ্রীমতী তনি দাশগুপ্ত—'

শুভ্রা বললেন, 'রাস্তা ভুল করে নাকি রে?'

বৈশালী হেসে হেসে বলল, 'না বড় মামী, অনেকদিন ধরেই আসব আসব ভাবছিলাম। সকালে ঘুম ভাঙার পর ঠিক করে দেখলাম, আজই যাব। মুখ টুখ ধুয়ে, বাসি ড্রেস চেঞ্জ করে বেরিয়ে পড়লাম।'

মল্লিকা কী বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বৈশালী বলল, 'আরে আরে, একটা দারুণ ভুল হয়ে গেছে—'

মল্লিকা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ভুল রে?'

'বাড়িতে কাউকে বলে আসি নি। সাবিত্রীদি আর ময়না অবশ্য আমাকে বেরুতে দেখেছে। তোমরা নিশ্চয়ই দুপরবেলা আমাকে ছাড়বে না।'

'এতদিন বাদে এলি। তাড়াতাড়ি কে তোকে ছাড়ছে?'

'দাঁড়াও, আগে মাকে ফোন করে জানাই, ফিরতে দেরি হবে।'

হল-ঘরের একধারে উঁচু স্ট্যান্ডে যে এ বাড়ির ফোনটা থাকে সেটা বৈশালীর জানা। সে গিয়ে ডায়াল করতে লাগল।

মামীরা বললেন, 'কী পাগল মেয়ে!'

ফোনটা সুচরিতাই ধরেছিলেন। বৈশালী বলল, 'মা, আমি তনি, বাগবাজারে মামাদের কাছে এসেছি।'

সুচরিতা বললেন, 'কী আশ্চর্য মেয়ে তুই! মাঝে মাঝে তোর মাথায় কী চাপে! না বলে চলে গেলি! সাবিত্রী আর ময়না বলতে পারল না কোথায় গেছিস। আমরা এদিকে ভেবে ভেবে অস্থির।'

বৈশালী বুঝতে পারল, বাই-পাসে সে যে গিয়েছিল, অভিমন্যুরা সেটা এখনও জানান নি। জানালে হাজার রকমের কৈফিয়ৎ দিতে হত। কেন মেজ কাকার ফ্ল্যাটে যাবার পর ফার্ন রোডে না ফিরে সে মামাবাড়িতে চলে গেছে, এই নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ জেরা চলত। বৈশালী সেদিক থেকে খানিকটা আরাম বোধ করল। বলল, 'যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, তোমরা সবাই ঘুমোচ্ছ। তাই আর ডাকি নি।'

সুচরিতা এ নিয়ে আর কিছু বললেন না। এখন দশটা বাজতে দু-তিন মিনিট বাকি। তার মানে পুজোর ঘরে তাঁর যাবার সময় হয়েছে। এখন অন্য কোনো দিকে তিনি তাকাবেন না। জিজ্ঞেস করলেন, 'কখন ফিরবি?'

'ধর সাড়ে চারটে পাঁচটায়।'

'ঠিক আছে।'

অন্য সময় হলে মামা-মামীদের ডেকে দিতে বলতেন সুচরিতা। তাঁদের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে অন্তত ঘণ্টাখানেক গল্প করতেন কিন্তু এখন ফার্ন রোডের বাড়ির ছাদ থেকে তেত্রিশ কোটি দেবতার ডাক এসেছে। ফোনটা তিনি ক্রেডেলে নামিয়ে রাখলেন।

বৈশালী আসায় দাবা খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দুই মামার। অর্ধেন্দুশেখর আনন্দশেখর শুভ্রা এবং

মল্লিকা তাকে ঘিরে বসলেন। এ বাড়ির সবাই দারুণ আড্ডাবাজ। বৈশালীর জন্য প্রচুর খাবার দাবার এল। খেতে খেতে মামা-মামীদের সঙ্গে গল্প করতে লাগল সে। কিন্তু মাথার ভেতর অনবরত সেই চিন্তাটা পাক খেয়ে চলেছে। সব্যসাচীর ব্যাপারটা সে কিভাবে শুরু করবে? উপযুক্ত সময় কোনটা? সেই প্রসঙ্গটা উঠলেই তাকে ঘিরে যে মজা ঠাট্টা এবং খোশ গল্পের জমজমাট পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তার সুর পুরোপুরি কেটে যাবে। না, এখন আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক।

দুপুরে স্নান টান সেরে একতলার ডাইনিং টেবলে সবাই একসঙ্গে খেতে বসল। সঞ্জয় বলে গেছে, তার কোচিং ক্লাবের ছেলেদের কী একটা টুর্নামেন্টে খেলতে হবে। তার ফিরতে ফিরতে রাত। অর্থাৎ সঞ্জয়কে খাবার টেবলে পাওয়া গেল না। এর মধ্যে বৈশালী মনে মনে একটা পরিকল্পনা ছকে ফেলেছে। সরাসরি বাবার অধঃপতনের কথা বলবে না সে। ঘুরিয়ে, সুকৌশলে প্রসঙ্গটা তুলে মামা-মামীদের বাজিয়ে দেখবে। এর জন্য খাবার টেবলটাই সে বেছে নিল।

এলোমেলো কিছুক্ষণ কথা বলার পর বৈশালী হঠাৎ অর্ধেন্দুশেখরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানো বড় মামা, আমি একটা প্রবলেমে পড়ে গেছি।'

অর্ধেন্দুশেখর ভাগনীর সমস্যাটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিলেন না। রগড়ের সুরে বললেন, 'তোর আবার কী প্রবলেম? প্রেমে ট্রেমে পড়েছিস নাকি?'

ছোট মামা এবং দুই মামী তিন দিক থেকে বৈশালীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, 'হ্যাঁ রে, ছেলেটা দেখতে কেমন? কী করে? ভাল ফ্যামিলি তো?'

ছোট মামী মল্লিকার উৎসাহ সব চেয়ে বেশি। তিনি বললেন, 'ছেলেটার কথা তোর মা-বাবাকে বলেছিস?'

শুভ্রা বললেন, 'আরে না না, আমাদের দিয়ে বলানোর জন্যে এসেছে। নইলে যে তিনি সহজে নর্থ ক্যালকাটার দিকে পা বাড়ায় না, সে কি মামাবাড়িতে এসে হাজির হত?'

বৈশালী কিছু বলার চেষ্টা করল, পারল না। তার আগেই আনন্দশেখর বলে উঠলেন, 'উই মামাস অ্যান্ড মামীস তোর পক্ষে আছি। ডোন্ট ওরি। তবে ছেলেটাকে কিন্তু আমরা আগে বাজিয়ে দেখব। ভাল বুঝলে অল রাইট, নইলে এ বিয়ে হবে না। কবে ওকে আমাদের এখানে আনছিস?'

বৈশালী এবার গলার স্বর অনেক উঁচুতে চড়িয়ে বলে, 'আরে বাবা, ওসব কিছু নয়। আমার কথাটা আগে শুনবে তো? না শুনেই যা ইচ্ছা বলে যাচ্ছ!'

মামা-মামীরা এবার একটু থমকে গেলেন। আনন্দশেখর ভাগনীর দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন, 'ঠিক আছে, কী বলবি বল—'

বৈশালী মনে মনে বক্তব্য গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'খুব মন দিয়ে শোন। প্রবলেমটা আমার নয়, আমার এক বন্ধুর। সে আমার সাজেশন চেয়েছে। আমি কী পরামর্শ দেব বুঝতে পারছি না। দু-একজনের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা তেমন ইমপর্টান্স দিচ্ছে না। কিন্তু আমার ধারণা কেসটা ভীষণ সিরিয়াস। সব শুনে তোমরা কী বল, আমার জানা দরকার। তোমরা ছাড়াও আরো কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলব। সকলের মতামত নিয়ে বন্ধুকে জানাব তার কী করা উচিত।'

ডাইনিং টেবলে যে ফুরফুরে হালকা আবহাওয়াটা ছিল সেটা এখন অদৃশ্য। তবু আনন্দশেখর একটু মজা করে হিন্দিতে বললেন, 'তব তো কেস বহুৎ গম্ভীর হ্যায়। আগে বাড়ো—'

সব্যসাচীর ঘটনাটা নাম টাম বদলে এক বন্ধুর বাবার পদস্খলনের কাহিনী বলে জানিয়ে দিল বৈশালী। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এই ভদ্রলোকটি সম্পর্কে আমার বন্ধুর কী করা উচিত?'

অর্ধেন্দুশেখর ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। বললেন, 'ওকে তুই ভদ্রলোক বলিস! আপাদমস্তক রাসকেল—'

শুভ্রা এবং মল্লিকার ভুরু ঘৃণায় কুঁচকে গিয়েছিল। তাঁরা শুধু বললেন, 'ছিঃ ছিঃ—'

আনন্দশেখরের ভেতর থেকে অবসর নেবার পর এই প্রথম জবরদস্ত কর্নেলটি বেরিয়ে আসে। তিনি বললেন, 'শুয়োরটাকে শুট করে মারা উচিত। এই সব স্কাউন্ড্রেলের জন্যে সোসাইটি টোটালি নষ্ট হয়ে যায়।'

মামা-মামীরা এতক্ষণ যা মন্তব্য করলেন তাতে পুরোপুরি সায় রয়েছে বৈশালীর। এমন একটা কঠোর স্টেপ নেওয়াই দরকার। পরক্ষণে তার মনে অন্য একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। সে বলল, 'একটা কথার জবাব দাও তো—'

'কী?'

'এই লোকটা যদি আমার বন্ধুর বাবা না হয়ে আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনদের ভেতর কেউ হত, তা হলে তোমাদের ডিশিসনটা কী হত?'

মামা-মামীরা এবার একটু থমকে গেলেন। আনন্দশেখর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভাগনীকে লক্ষ করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের রিলেটিভদের ভেতর কেউ এটা করেছে নাকি?'

বৈশালী সতর্ক হয়ে গেল। বলল, 'না না, কে করবে? ধর, এটা একটা অ্যাকাডেমিক ডিসকাশন।'

গলা খাঁকরে অর্ধেন্দুশেখর বললেন, 'ইন দ্যাট কেস, তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সৎ পথে ফিরিয়ে আনতে হবে।'

বৈশালী বলল, 'তখন তাকে শুট করে মারা হবে না—এই তো?' বলে ছোট মামার দিকে তাকাল সে।

বিব্রতভাবে আনন্দশেখর বললেন, 'হাজার হোক, আত্মীয়—'

বৈশালী বলল,'আত্মীয় হলে ঠেকানো হবে, আর অন্য কেউ হলে তাকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করাতে হবে। একই কেসে নিয়মটা তা হলে এক নয়। ডাবল স্ট্যান্ডার্ড—'

গলার ভেতর অস্পষ্টভাবে কী একটা শব্দ করলেন আনন্দশেখর, বোঝা গেল না।

বৈশালী যা জানার জেনে গেছে। সব্যসাচীর গোপন ব্যাভিচারের কথা বললেও মেজ কাকা এবং বড় পিসিমার মতো মামা-মামীরা কিছুই করবেন না, বরং সেটা চাপা দেবার চেষ্টা করবেন এবং বৈশালীকে চুপচাপ থাকার পরামর্শ দেবেন। অভিমন্যু সুরমা অর্ধেন্দুশেখর আনন্দশেখর শুভ্রা এবং মল্লিকা—সবারই মানসিক প্যাটার্নটা একই ধাঁচের। পারিবারিক বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের স্ক্যান্ডাল তাঁরা প্রকাশ্য দিবালোকে নিয়ে আসতে দেবেন না।

বৈশালী আর কিছু বলল না। নিঃশব্দে মুখ নিচু করে খেতে লাগল।

বার

মামাবাড়ি থেকে বাড়ি ফিরে বৈশালী স্থির করল, মনীষার সঙ্গে দেখা করবে। সব্যসাচীর ব্যাপারে ছোট পিসির মনোভাবটা জানা একান্ত প্রয়োজন। ফোন করে সে জানতে চাইল, মনীষা কাল স্কুল ছুটি নিতে পারবে কিনা। মনীষা কারণ জিজ্ঞেস করলে বৈশালী বলল, কারণটা বিশেষ জরুরি। সেটা সে ফোনে বলবে না। কাল ঢাকুরিয়ায় গিয়ে জানাবে।

মনীষা বলল, 'ঠিক আছে, চলে আসিস। কালকের দিনটা তোর জন্যে ছুটি নিয়ে নেব।'

একদিক থেকে দেখতে গেলে বৈশালী ভীষণ অধৈর্য। কিছু একটা মাথায় ঢুকলে সেটা না করা পর্যন্ত অদ্ভুত এক অস্থিরতা তাকে সারাক্ষণ তাড়া করতে থাকে।

পরদিন সকালে গোলপার্কে এসে একটা মিনিবাস ধরে ঢাকুরিয়ায় মহারাজ ঠাকুর রোডে মনীষার ফ্ল্যাটে চলে এল বৈশালী।

মনীষার বয়স চল্লিশ একচল্লিশ। এমনিতে বেশ সুশ্রী কিন্তু চেহারায় একটা শক্ত ধরনের পুরুষালী ভাব আছে। চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা। পরনে ঢোলা ম্যাক্সি, চুল উষ্কখুষ্ক। সাজগোজ পোশাক আশাকের দিকে কোনোদিনই মনীষার নজর নেই। খুব সাধারণভাবে থাকতেই তিনি পছন্দ করেন।

বিয়ের অল্প দিনের মধ্যেই শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চুকে বুকে গেছে। স্বল্পায়ু বিবাহিত জীবন কোনো ছাপই তাঁর শরীর বা মনের ওপর রাখতে পারেনি। সামান্য মেদ জমলেও এখনও তাঁকে কুমারীই মনে হয়।

মনীষার এক কামরার ফ্ল্যাটে কিচেন বাথরুম ছাড়াও রয়েছে বড় একটা হল। সেখানে একটা দিক বাইরের লোকজনের জন্য সোফা টোফা দিয়ে সাজানো, আর এক দিকে টেবল চেয়ার পেতে লেখাপড়ার ব্যবস্থা।

বৈশালীর ঠাকুমা নবতারা বেশির ভাগ সময়টাই মনীষার কাছে থাকেন। বেডরুমে যে প্রকাণ্ড খাট রয়েছে সেটায় মা আর মেয়ে পাশাপাশি শোন। রাতে কখন কী দরকার হবে সে জন্য নবতারার কাছে একজনের থাকা খুবই জরুরি।

মনীষার ফ্ল্যাটের দরজা খোলা ছিল। ঠিকে কাজের মেয়েটা ন'টা নাগাদ আসে। খুব সম্ভব সে আসার পর দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছে।

ভেতরে ঢুকে বৈশালী দেখল, হল-এর কোণে টেবল চেয়ারে বসে খাতা দেখছেন মনীষা। বৈশালী জানে, প্রতি সপ্তাহে ক্লাস টেস্ট নেন তিনি। এগুলো সেই খাতা।

মায়ের পরিচর্যা, স্কুলের ক্লাস ছাড়াও, পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার পর ছাত্রছাত্রীদের স্পোর্টস, সরস্বতী পুজোয় নাটক, আবৃত্তি, গানের আসর—সমস্ত কিছুর কেন্দ্রবিন্দু মনীষা। তাঁকে বাদ দিয়ে কোনো কিছু হবার উপায় নেই। এর ফাঁকে কিছু কিছু সমাজ সেবার কাজও করেন। টাকার জন্য বস্তির কোন মেয়ের বিয়ে আটকে গেছে, কোন বাচ্চার দুধ কেনা হচ্ছে না, কে মাইনে দিতে পারছে না—এই সব খবর কানে আসামাত্র তিনি সেখানে ছুটে যাবেন। বিবাহিত জীবনের অপূর্ণতা নিয়ে মনীষার বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই। স্বল্পস্থায়ী দুঃস্বপ্নের মতো সেই দিনগুলোর কথা তিনি কবেই ভুলে গেছেন। এখন নিজেকে শতধারায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।

পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালেন মনীষা। বৈশালীকে দেখে রীতিমত খুশি হয়েছেন তিনি। তাঁর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। বললেন, 'আয়। হঠাৎ কী এমন হল যে আমাকে স্কুল কামাই করতে বললি!'

বৈশালী মনীষার কাছাকাছি একটা সোফায় বসে হেসে হেসে বলে, 'বলার জন্যেই তো এসেছি। একটু ধৈর্য ধর।'

মামাবাড়ি, মেজ কাকা আর বড় পিসির বাড়িতে ক্বচিৎ কখনও যায় বৈশালী কিন্তু মাঝে মাঝেই মনীষার ফ্ল্যাটে চলে আসে। বাবার ভাইবোনেদের মধ্যে এঁকেই সে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। অসীম ব্যাক্তিত্বের অধিকারিণী, এই বিদ্রোহিণী পিসিটিকে সবার চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করে।

কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথার পর মনীষা বলল, 'এবার শুরু কর।'

একটু ভেবে বৈশালী বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার এমন অনেক কথা আছে, শুনলে আনবিলিভেবল মনে হবে। আমার কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছি না।'

খুঁটিয়ে ভাইঝিকে লক্ষ করলেন মনীষা। সামান্য গম্ভীর গলায় বললেন, 'মনে হচ্ছে সিরিয়াস কেস?'

বৈশালী জোর দিয়ে বলল, 'ভেরি ভেরি সিরিয়াস।'

কোনো বিষয়ে কৌতূহল হলে নিজেকে সংযত রাখতে জানেন মনীষা। বললেন, 'সিরিয়াস যখন তাড়াহুড়ো না করে শোনাই ভাল। আর তিন চারটে খাতা দেখা বাকি আছে। তুই ততক্ষণ ঠাকুমাকে দেখে আয়। মিনিট পনের কুড়ির ভেতর আমার হয়ে যাবে।'

বৈশালী বলল, 'ছোট পিসি, আমি কিন্তু খেয়ে আসি নি। ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

মনীষা ব্যস্ত হয়ে পড়েন, 'আগে বলবি তো বোকা মেয়ে।' রান্নাঘরে ওঁদের কাজের মেয়ে মীনা খুট খাট আওয়াজ করে কী সব করছে। গলা উঁচুতে তুলে মনীষা তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'কী করছিস রে মীনা?'

মীনা বলল, 'বাসন মাজা হয়ে গেছে। গুছিয়ে রাখছি।'

'তনি দিদি এসেছে—দেখেছিস?'

'ও মা, তাই নাকি?'

মীনা রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। তার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। কালো, গোলগাল চেহারা। থাকে ক্যানিংয়ে। রোজ সকালে ট্রেন ধরে ঢাকুরিয়ায় কাজে আসে। এর মধ্যেই বার তিনেক বিয়ে হয়ে কাটান ছাড়ান হয়ে গেছে। এখন যাকে বিয়ে করেছে সে ভ্যান রিকশা ভাড়া নিয়ে চালায়। এ বিয়েটাও কতদিন টেকসই হবে, কে জানে।

মীনার ওপর দিয়ে ঝড়ঝাপটা প্রচুর গেছে। তা সত্ত্বেও মেয়েটা দারুণ হাসিখুশি। সারাক্ষণ মুখে হাসি লেগেই আছে। বৈশালীকে সে খুব ভাল করেই চেনে। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ভাল আছ তো দিদি?'

বৈশালী হাসিমুখে বলে, 'হ্যাঁ। তুমি?'

'আমিও ভাল আছি।'

'তোমার ছেলেরা?'

মীনার তিন বিয়েতে মোট চারটে ছেলে। প্রথম দুই পক্ষের তিন, এই পক্ষের এক। আগের স্বামীরা তাদের তিন ছেলেকে মীনার ঘাড়ে চাপিয়ে সরে পড়েছে। তিন নম্বর স্বামীটি মানুষ খারাপ নয়। সে বউয়ের সঙ্গে তার আগের ছেলেদের দায়িত্বও কাঁধে তুলে নিয়েছে। তবে এই মহানুভবতা কতদিন থাকবে সেটা আপাতত বোঝা যাচ্ছে না।

মীনা বলল, 'ভালই আছে।'

মনীষা ওধার থেকে বললেন, 'অন্য কাজ রেখে দিদির জন্য লুচি ভেজে ফেল। আলু টালু কী আছে দ্যাখ। একটু তরকারিও করিস।'

'আচ্ছা—' বলে ফের কিচেনে ঢুকে যায় মীনা।

আস্তে আস্তে উঠে পড়ে বৈশালী। হল-এর লাগোয়া ডান পাশে বেডরুম। সে সেখানে চলে আসে।

শোবার ঘরের ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড ডবল-বেড খাট। সেখানে শুয়ে আছেন নবতারা। মাথার ওপর ফুল স্পিডে ফ্যান ঘুরছে।

নবতারার শরীর শুকিয়ে এখন হাড় আর চামড়া সার। কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, হাতের মাংসহীন আঙুলগুলো কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো দেখায়। গাল তুবড়ে গেছে। হেজে-যাওয়া পাঁশুটে রঙের চুল কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা। ঘোলাটে চোখের চাউনিতে কেমন একটা ধন্দ-ধরা ভাব।

প্রায় পনের ষোল বছর ধরে নবতারাকে এভাবেই দেখে আসছে বৈশালী। কে বলবে, এই মহিলাই একদিন প্রবল প্রতাপে চাবুক হাঁকিয়ে পুরো সংসার দাবিয়ে রাখতেন। ছেলেমেয়েদের কারো এতটুকু ক্ষমতা ছিল না গলা দিয়ে টুঁ শব্দটি বার করে। আজ যদি তিনি সুস্থ থাকতেন, বড় ছেলের কীর্তিকাহিনী শুনলে সারা পৃথিবী তোলপাড় করে ফেলতেন।

নিজের অজান্তেই বৈশালীর বুকের ভেতর থেকে জোরে নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। অনেকখানি ঝুঁকে সে ডাকে, 'ঠাকুমা—ঠাকুমা—'

শব্দটা হয়তো বৃদ্ধার কানের পর্দায় সামান্য ধাক্কা দেয়। তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে নাতনীর দিকে তাকান। তাঁর গলা থেকে ঘড়ঘড়ে আবছা আওয়াজ বেরিয়ে আসে।

এবার খাটে নবতারার পাশে বসে তাঁর মাথায় এবং গালে আলতো করে হাত বুলোতে বুলোতে বৈশালী বলে, 'আমি তনি—তোমার বড় নাতনী—'

একই রকম দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন নবতারা। অসাড়, বোধশক্তিহীন। কিছুই যেন বুঝতে পারছেন না।

স্মৃতিভ্রষ্ট মানুষটিকে দেখতে দেখতে চাপা কষ্ট বোধ করতে থাকে বৈশালী। যখনই ঠাকুমার কাছে আসে, এই কষ্টটা তার বুকের গভীর স্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। সে আবার বলে, 'আমাকে তুমি চিনতে পারছ না ঠাকুমা?'

গলার ভেতরকার সেই ঘড়ঘড়ানিটা আরেকটু বেড়ে যায়। ঘষা কাচের মতো চোখ দুটোর তলা থেকে আবছা আলোর মতো কিছু যেন ফুটি ফুটি করতে থাকে। প্রায় লোমহীন ভুরুদুটো সামান্য কুঁচকে বৈশালীর মুখে কী খুঁজতে থাকেন। শীর্ণ হাতদুটো একটুখানি তুলে নাতনীর দিকে বাড়িয়ে দেন।

এত বছর নবতারাকে দেখছে বৈশালী। অর্থহীন তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো প্রতিক্রিয়া নজরে পড়ে নি। আজ একেবারে অন্য রকম লাগছে তাঁকে। ভুরু কুঞ্চন, হাত বাড়িয়ে দেওয়া, নিষ্প্রভ চোখে জ্যোতির মতো কিছু ফুটে ওঠা— দেখতে দেখতে বৈশালীর সারা শরীরে তড়িৎপ্রবাহ খেলে যায়। বহুকাল পর স্মৃতি কি ফিরে আসছে নবতারার? উত্তেজিত, ব্যগ্র গলায় বৈশালী বলে, 'ঠাকুমা, তোমার সব মনে পড়ছে কি? দেখ, আমি কত বড় হয়ে গেছি।'

নবতারা সাড়া দেন না। গলার সেই ঘড়ঘড়ে আওয়াজটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। চোখের দৃষ্টি আগের মতোই ফ্যালফ্যালে। রোগা হাতদুটো অবশ হয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে। চকিতের জন্য স্মৃতির যৎসামান্য একটা ভগ্নাংশ ফিরে আসতে না আসতেই ফের গভীর অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়।

বৈশালী আর কিছু বলে না। ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দু চোখ জলে ভরে যায়

তার। অনুভূতিহীন মস্তিষ্ককে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে হয়তো নবতারা তাঁর স্মৃতিশক্তি ফিরে পেতে প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বৃথাই।

কতক্ষণ নবতারার পাশে বসে ছিল, খেয়াল নেই বৈশালীর। বাইরের হল থেকে মনীষার গলা ভেসে আসে, 'তনি, এখানে আয়। মীনা খাবার দিয়ে গেছে।'

ঠাকুমার পাশ থেকে আস্তে আস্তে উঠে বাইরে চলে আসে বৈশালী। মনীষার কাছাকাছি একটা নিচু টেবলে দুটো বড় প্লেটে লুচি আলুর তরকারি আর সন্দেশ সাজানো রয়েছে। মনীষা বললেন, 'আয়। আমারও ব্রেকফাস্ট হয় নি। খেতে খেতে কথা শোনা যাক।'

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ খাওয়া চলল। তারপর বৈশালী জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা ছোট পিসি, ঠাকুমা তো বেশির ভাগ সময় তোমার কাছে থাকে। কখনও কি লক্ষ করেছ, তার মেমোরি মাঝে মাঝে ফিরে আসে।'

বৈশালীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে মনীষা বললেন, 'হঠাৎ ঐ কথা তোর মনে হল?'

'এতক্ষণ আমি ঠাকুমার কাছে বসে ছিলাম। মনে হল, আমাকে চিনবার খুব চেষ্টা করছে।'

'হ্যাঁ। মাঝে মাঝে পুরনো কথা ভাবার বোধ হয় চেষ্টা করে মা, কিন্তু পারে না। ডাক্তাররা বলেছে মায়ের ব্রেনের সেলগুলো প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। মেমোরি আর ফিরে আসবে না। বাকি লাইফটা এভাবেই কাটিয়ে দিতে হবে।' বলতে বলতে গলার স্বর ভারি হয়ে আসে মনীষার।

একটু চুপচাপ।

তারপর মনীষা বলেন, 'সকালবেলা যে জন্যে ছুটে এসেছিস, এবার সেটা বল—'

বৈশালী বলল, 'ছোট পিসি তোমাকে যা বলব সেটা শুনতে কিন্তু ভাল লাগবে না।'

মনীষা অল্প হাসলেন, 'তুই যে খারাপ খবর নিয়ে এসেছিস, তোর মুখ দেখে তা বুঝতে পেরেছিলাম। নে, শুরু কর।'

'বাবা এমন একটা কাজ করে চলেছে যা এত জঘন্য, এত নোংরা যে শুনলে লজ্জায় তোমার মাথা কাটা যাবে।' বৈশালী বলতে লাগল, 'তুমি ভাবতেও পারবে না, ফ্যামিলির সব চেয়ে রেসপেক্টেড লোকটা কত নিচে নেমে গেছে।'

স্তম্ভিত, হতবাক মনীষা কী করবেন, বুঝে উঠতে পারলেন না। প্রথমটা তাঁর অবিশ্বাস্য মনে হল। যাচাই করে নেবার জন্য অনেকক্ষণ পর বললেন, 'তুই কি সত্যিই বড়দার কথা বলছিস?'

'এগ্‌জাক্টলি তাই।'

'কী করেছে বড়দা?'

আগাগোড়া সব বলে গেল বৈশালী।

শুনতে শুনতে খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মনীষার। তীব্র গলায় বললেন, 'বড়দার এতটা অধঃপতন হয়েছে!'

'তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছ না ছোট পিসি?'

'এক শ বার করছি। পুরোপুরি সিওর না হয়ে কোনো মেয়ে তার বাবা সম্বন্ধে এত মারাত্মক অ্যালিগেশন করতে পারে না।'

বৈশালী বলল, 'আমি এটা জানতাম ছোট পিসি।'

মনীষা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী জানতিস?'

'আমার কথা তুমি অবিশ্বাস করবে না। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'বড় পিসি আর মেজ কাকা প্রথমে আমার কথা বিশ্বাস করে নি। প্রচণ্ড বকাবকি করেছে।'

'দিদি আর মেজদার কাছে গিয়েছিলি নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'সব শোনার পরও তোকে বকল?'

বৈশালী বলল, 'আমার ওপর ওদের কী ভীষণ রাগ, চিন্তা করতে পারবে না।'

মনীষা বললেন, 'রাগ কেন? ট্রুথটা সহ্য করতে পারছে না?'

'ঠিক তাই। ওই দুই ভাইবোনের মতে তাদের দাদা ক্যান ডু নো রং। কোনো অন্যায় সব্যসাচী দাশগুপ্তের পক্ষে করা নাকি সম্ভব নয়।'

'দিদি আর মেজদার কাছে বড়দা হানড্রেড পার্সেন্ট সেইন্ট?'

'বোধ হয় তাই।'

'তারপর?'

বৈশালী বলতে লাগল, 'আমি যখন সমস্ত প্রমাণ দিলাম তখন কী বলল জানো?'

মনীষা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী?'

'এই নিয়ে কারো সঙ্গে যেন আলোচনা না করি। মুখ খুলতে আমাকে বারণ করে দিয়েছে। বলেছে স্ক্যাণ্ডালটা জানাজানি হয়ে গেলে আমাদের বংশের রেপুটেশন নষ্ট হয়ে যাবে।'

'তার মানে ডুবে ডুবে জল খাব, অথচ কাউকে জানানো চলবে না। হিপোক্রিটের দল।'

বৈশালী উত্তর দেয় না।

একটু চুপচাপ।

তারপর বৈশালী ফের বলে, 'মামাদের কাছেও গিয়েছিলাম। ডাইরেক্টলি বাবার নাম করি নি। ঘুরিয়ে বলেছিলাম। তাদের মতামতও একই রকম। ঘনিষ্ঠ রিলেটিভদের কেলেঙ্কারি চেপে রাখতে হবে।'

মনীষা হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, 'কেন চেপে রাখা হবে? অন্যায়ও করবে, আবার ফ্যামিলির আত্মীয়স্বজনের, সবার সম্মানও পাবে, এটা কখনই হতে পারে না।'

পরিবারের সকলের থেকে যে ছোট পিসি আলাদা, সেটা আর একবার টের পাওয়া যায়। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃভক্তি সম্পর্কে অন্যদের ধারণাটা মান্ধাতার বাবার আমলের—একেবারে অচল, প্রশ্নাতীত এবং অপরিবর্তনীয়। কিন্তু মনীষা পুরোপুরি ব্যতিক্রম। তাঁর কাছে অন্যায় অন্যায়ই, কেউ সামাজিক শিষ্টাচার আর রীতিনীতির উর্ধ্বে নয়।

মনীষা বলতে থাকেন, 'একটা মেয়ের এত বড় ক্ষতি করে ডেমি-গড় হয়ে থাকবে তা হতে পারে না। হী মাস্ট বি পানিশড। অ্যাট লিস্ট আমাদের ফ্যামিলির সবার তার কাছে কৈফিয়ত চাওয়ার রাইট আছে।'

বৈশালী চুপ করে ছোট পিসিকে লক্ষ করতে থাকে। তাঁর কাছ থেকে ঠিক এইরকম প্রতিক্রিয়াই সে আশা করেছিল।

মনীষা একটু ভেবে বলেন, 'এই ব্যাপারটা যাকে সবচেয়ে আগে বলা দরকার তাকে কি জানিয়েছিস?'

বুঝতে না পেরে বৈশালী জিজ্ঞেস করে, 'কার কথা বলছ?'

'তোর মায়ের।'

'না। এখনও বলি নি।'

একটু চুপ করে থেকে বৈশালী বলে, 'মাকে তো তুমি জানো। শোনামাত্র কী কাণ্ড বাধিয়ে বসবে কে জানে—'

মনীষা বললেন, 'বাট শি মাস্ট নো ইট। তুই বলবি, না আমাকে গিয়ে বলতে হবে?'

এই অপ্রীতিকর বিষয়টা মাকে জানানো যে কী ভয়ঙ্কর সেটা বৈশালীর ভাল করেই জানা। স্বামী অন্য একটি নারীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত, এটা মেয়ে হয়ে মাকে বলা খুব সহজ নয়। কিন্তু বলতে কাউকে হবেই। কিন্তু দায়িত্বটা কে নেবে—ছোট পিসি, না সে?

বৈশালী বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

মনীষা বললেন, 'দু-একদিন ভেবে দ্যাখ। তারপর যা হোক করা যাবে।'

মীনা চা দিয়ে গেল। এদিকে লুচি টুচি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। মনীষা বা বৈশালীর আর খাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। কোনোরকমে চা টা খেয়ে উঠে পড়ে বৈশালী। বলে, 'ছোট পিসি, আজ আমি যাচ্ছি।'

মনীষা বললেন, 'এখন যাবার দরকার নেই। তোর মাকে ফোন করে দিচ্ছি। দুপুরে একসঙ্গে খাব, তারপর একটু রেস্ট নিয়ে বিকেলে বাড়ি যাস।'

'না ছোট পিসি, আজ থাক। আর একদিন এসে খাব।'

বাড়ি ফিরে এসে বৈশালী দেখল দারুণ হই হই করে রাহুলের স্যুটকেস আর হোল্ডঅল গুছনো চলছে। অবশ্য দাদা নিজে কিছু করছে না, সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। যা করার সুচরিতাই করছেন। এক ধারে দাঁড়িয়ে সব্যসাচী নজর রাখছেন, গোছগাছে কোনোরকম ত্রুটি থেকে যাচ্ছে কিনা।

কী ব্যাপার? জানা গেল রাহুল বন্ধুদের সঙ্গে গুজরাত বেড়াতে চলেছে। কাল পর্যন্ত ঘুণাক্ষরেও ব্যাপারটা টের পাওয়া যায় নি। হঠাৎ হঠাৎই রাহুল এবং তার বন্ধুদের মাথায় হুজুগ চাগাড় দিয়ে ওঠে। বলা নেই কওয়া নেই, তারা দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। তখন সারা বাড়ি জুড়ে হুলস্থুল শুরু হয়ে যায়। কোথায় শার্ট, কোথায় ট্রাউজার্স, কোথায় মোজা, কোথায় হাওয়া-বালিশ—আদুরে ছেলের জন্য সব গুছিয়ে গাছিয়ে দিতে দিতে মা আর বাবা একেবারে গলদঘর্ম।

সুচরিতা বৈশালীকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাউকে কিছু না বলে সকালবেলা কোথায় গিয়েছিলি?'

এমনিতে জোরে কথা বলেন না মা, তবু বোঝা গেল, না জানিয়ে যাওয়ায় তিনি বেশ রেগে গেছেন। বৈশালী সঠিক জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'মধুরাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। ছুটির আগে তিন দিন জ্বরের জন্যে কলেজে যেতে পারি নি। প্রফেসর যে ক্লাস নোট দিয়েছিলেন, সেগুলো দেখে এলাম।' হুট করে মিথ্যেটা বলতে বুকের ভেতরটা ভীষণ কাঁপছিল তার। কিন্তু মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে গেছে তা তো আর গিলে ফেলা যায় না। মা অবশ্য সত্যিমিথ্যা যাচাই করার জন্য মধুরাকে ফোন করবেন না। তবু সাবধানের মার নেই। কোনো এক ফাঁকে মধুরাকে জানিয়ে দেবে, মা ফোন করলে যেন বলে, সে ওদের বাড়ি গিয়েছিল।

সুচরিতা বিরক্ত গলায় বললেন, 'কোনো একটা কাজে যদি মেয়েটাকে পাওয়া যায়! ছেলেটা বাইরে যাবে, কোথায় একটু গুছিয়ে টুছিয়ে দেবে, তা নয়। সকালে উঠেই ছুটল বন্ধুর বাড়ি! কোনো মানে হয়!'

বৈশালী ঝাঁঝাল গলায় বলে, 'তোমার ছেলে যে বেড়াতে যাবে, আগে একবারও বলেছে!'

সব্যসাচী একপাশে দাঁড়িয়ে মা-মেয়ের কথা কাটাকাটি শুনছিলেন। হয়তো একটু মজাও লাগছিল তাঁর। বললেন, 'সত্যিই তো, তোমার ছেলে যে দেশভ্রমণে বেরুবে, সেটা কি তনিকে জানিয়েছিল? ও কি থট-রিডার যে কে কী ভাবছে, কে কখন কোন প্রোগ্রাম করছে, সব আগে থেকে টের পেয়ে যাবে?'

সুচরিতার পক্ষপাতিত্ব সবসময় ছেলের দিকে কিন্তু সব্যসাচীর টানটা মেয়ের প্রতি সামান্য বেশি। বৈশালী লক্ষ করল, বাবা বেশ হালকা মেজাজেই রয়েছেন। তার মানে সে এত জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাঁর অধঃপতনের ইতিহাস জোগাড় করেছে বা তা নিয়ে আলোচনা করেছে, সেটা তিনি এখনও টের পান নি। জানতে পারলে তাঁর চেহারাটাই পালটে যেত।

সুচরিতা স্বামীকে বললেন, 'মেয়েকে তুমি বড্ড বেশি আশকারা দাও।'

সব্যসাচী বললেন, 'কী আশ্চর্য, আশকারাটা কোথায় দেখলে! অবুঝের মতো কথা বলো না। ছেলের স্যুটকেস গুছিয়ে দেয় নি বলে রাগারাগি করছ। কারণ বুঝবার চেষ্টা করবে না? কোনো মানে হয়!'

উত্তর না দিয়ে গম্ভীর মুখে আরো বেশি করে মনোযোগ দিয়ে নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন সুচরিতা।

তের

তিন চারদিন কেটে যায়।

এর ভেতর চাঞ্চল্যকর বা চমকে দেবার মতো কিছুই ঘটে নি। সমস্ত কিছুই একই নিয়মে একই রুটিন মেনে চলছে—গতানুগতিক, ছকে-বাঁধা, উত্থানপতনহীন। রাহুল নেই, দিন পনের কুড়ি ভারতভ্রমণের পর সে ফিরে আসবে। সে থাকলে বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে চারদিক সরগরম করে রাখে। রাহুল না থাকায় বাড়ি এখন একেবারে চুপচাপ।

সব্যসাচীর চালচলনে বা কথাবার্তায় কোনোরকম পরিবর্তন নেই। স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে আগের মতোই হাসিঠাট্টা মজা টজা করে চলেছেন। তাঁর গোপন কুকীর্তি সম্পর্কে এতজনের সঙ্গে কথা বলেছে বৈশালী। সে খবরটা কি তিনি এখনও পান নি, নাকি পাওয়ার পরও চুপচাপ আছেন? কোনোরকম

প্রতিক্রিয়া বুঝতে দিচ্ছেন না? এ নিয়ে তাদের পরিবার সম্পূর্ণ দু ভাগ হয়ে গেছে। বড় পিসি এবং মেজ কাকা সব্যসাচীর স্খলনটাকে সম্পূর্ণ গোপন রাখতে চান। কিন্তু ছোট পিসি আর সে সহজে ছাড়বে না। ছোট কাকা সিতাংশুকে লণ্ডনে দীর্ঘ চিঠি লিখে সব জানিয়ে দিয়েছে। এখনও উত্তর আসার সময় হয় নি। চিঠি পাওয়ার পর হয়তো ছোট কাকা একটা ফোন করবেন। বৈশালীর ধারণা, সিতাংশুর সমর্থন সে পাবে।

পারিবারিক বিভাজন যেমনই হোক, সব্যসাচীকে নিয়ে একটা ঝড় সে তুলবেই কিন্তু জিরো আওয়ারটা ঠিক কখন হওয়া উচিত, সেটাই স্থির করে উঠতে পারছে না বৈশালী। দাদার ফিরে আসা কিংবা সিতাংশুর চিঠি বা ফোনের জন্য কি সে অপেক্ষা করবে? বাবার সঙ্গে যখন তার নিদারুণ বোঝাপড়াটা হবে সেই সময় কি বড় পিসি, বড় পিসে, মেজ কাকা, মেজকাকীমাকেও ডেকে নেবে? অন্তত পারিবারিক সংঘাতের দৃশ্যে কিছু দর্শকও তো থাকা দরকার।

এর ভেতর মনীষা দিনে দু-তিন বার ফোন করে সব্যসাচীর কথা জানতে চেয়েছেন। বলেছেন, বৈশালী যদি বাবার জবাবদিহি চাইতে অস্বস্তি বোধ করে বা সাহস না পায়, তিনি নিজেই ফার্ন রোডে চলে আসতে চাইছেন।

বৈশালী বলেছে, 'এখনই এ ব্যাপারে আসতে হবে না। আর দু-একটা দিন দেখি। তারপব তোমাকে বলব।' একটু থেমে আবার বলেছে, 'তোমাকে তো থাকতেই হবে। নইলে জোর পাব কী করে?'

'একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না তনি—'

'কী বল তো?'

'দিদি কি মেজদা বড়দাকে কিছু বলবে না, এটা ধরেই নিচ্ছি। বাড়ির কেউ খারাপ কাজ করলে ওরা মুখ বুজে থাকবে। ওদের মেন্টালিটিই এইরকম। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'নমিতা চৌধুরির কথা ভাবছি। স্ট্রেঞ্জ!'

'স্ট্রেঞ্জ মানে?'

মনীষা বলেছেন, 'তোর কি ধারণা, এর মধ্যে তোর বাবার সঙ্গে মেয়েটার দেখা হয় নি?'

বৈশালী বলেছে, 'কী করে বলব? বাবার চালচলন আগের মতোই নরমাল। কিছু বুঝতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, তেমন কোনোও ডিশিসান নিলে আমাকে তক্ষুনি জানিয়ে দিবি। আফটার অল, হি ইজ ইয়োর ফাদার। এমন একটা ডার্টি ব্যাপারে কথা বলতে কমফোর্টেবল ফিল করবি না। ভেতর থেকে বাধা আসবে। সো আই শুড বি প্রেজেন্ট।'

'আচ্ছা, জানাব।'

আজ বেশ রাত করেই বাড়ি ফিরলেন সব্যসাচী। দৈনন্দিন কর্মসূচি অনুযায়ী টিভি সিরিয়াল দেখা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সুচরিতার। সাবিত্রী এবং ময়না, তাঁর দুই ছায়াসঙ্গিনী তাঁর সোফার দু পাশে মেঝেতে বসে আছে।

বৈশালী তার ঘরে পড়ার টেবলে বসে টেক্সট বুকের একটা প্রশ্নের অ্যানসার লিখছিল। পায়ের শব্দে মুখ তুলে ড্রইংরুমের দিকে তাকায় সে।

অন্য দিন সুচরিতার টিভি দেখার মধ্যে ফিরে এলে তাঁর পাশে বসে কিছুক্ষণ সঙ্গদান করেন সব্যসাচী। সিরিয়ালের কিছু দৃশ্য সম্পর্কে মজাদার দু-একটা টিপ্পনী কাটেন। আজ কিন্তু সুচরিতার ধারেকাছে এলেন না, সোজা নিজেদের বেডরুমে চলে গেলেন।

ড্রইংরুমে জোরাল আলো জ্বলছিল। বৈশালী লক্ষ করল, সব্যসাচীর মুখ অস্বাভাবিক থমথমে, রক্তচাপ হঠাৎ বেড়ে গেছে। সব্যসাচীকে দেখে একটা সংকেতই পাওয়া যাচ্ছে। ক'দিন ধরে বৈশালী যে তাঁর নারীঘটিত গোপন জীবন সম্পর্কে সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছিল, হয়তো কেন, নিশ্চিতভাবেই তিনি তা জানতে পেরেছেন। বিস্ফোরণটা কিভাবে ঘটাবেন, সেটা অবশ্য এখনই বোঝা সম্ভব নয়। বৈশালী টের পেল, তার স্নায়ুমণ্ডলী নিজের অজান্তেই ক্রমশ টান টান হয়ে যাচ্ছে।

সব্যসাচী সেই যে তাঁদের বেডরুমে ঢুকেছিলেন, তারপর অনেকক্ষণ তাঁকে দেখা গেল না।

একসময় সিরিয়াল দেখা শেষ হল সুচরিতার। রিমোট কনট্রোলে টিভিটা বন্ধ করে তিনি উঠে পড়েন। ময়না আর সাবিত্রীও বসে থাকে না। তারা একতলায় নেমে যায়। তিন ঘণ্টা একটানা বিনোদনের পর এখন তাদের কর্মব্যস্ততা শুরু হবে। নিচে গিয়ে তারা খাবার গরম করবে, ডিনারের জন্য টেবল সাজাবে, ইত্যাদি।

সুচরিতা ধীরে ধীরে তাঁদের বেডরুমে চলে গেলেন। মিনিট কুড়ি বাদে সব্যসাচীর সঙ্গে তিনি বেরিয়ে আসেন। এর ভেতর সব্যসাচী স্নান সেরে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে নিয়েছেন।

বৈশালী তার টেবলেই বসে ছিল। রোজ রাত্তিরে খাওয়ার সময় সব্যসাচী তাকে ডেকে নিয়ে যান। আজ তার দিকে ফিরেও তাকালেন না; বড় বড় পা ফেলে একতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

সুচরিতা অবশ্য চলতে চলতে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'তনি, খেতে চল—'

বৈশালী বলল, 'তোমরা যাও। আমি আসছি।'

'ঠিক আছে।'

সুচরিতারা নিচে নেমে গেলেন।

তারপর দু-চার মিনিট চুপচাপ বসে থাকে বৈশালী। আজ কিছু একটা যে ঘটবে সেটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছে। সব্যসাচীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য নিজের যাবতীয় অস্ত্রগুলোকে মনে মনে সাজিয়ে নিতে লাগল সে। তবু মনে হচ্ছে, সেগুলো যথেষ্ট নয়। সে কি বাবাকে ভয় পাচ্ছে? ভয় ঠিক নয়, সেটা এমন এক অনুভূতি বা মানসিক অবস্থা যা বোঝানো যায় না। এখন মনে হচ্ছে, তার পাশে জোরাল একজনকে দরকার।

পড়ার টেবল থেকে উঠে ফাঁকা ড্রইংরুমে চলে এল বৈশালী। ফোন করে মনীষাকে ধরল সে।

মনীষা অবাক। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার তনি, এত রাতে ফোন করছিস?'

বৈশালী বলল, 'তুমি কি এক্ষুনি চলে আসতে পারবে?' সব্যসাচীর সঙ্গে সংঘাতে ছোট পিসি ছাড়া আর কাউকেই মনে পড়ছে না তার।

'যেতে বলছিস কেন? কিছু হয়েছে কী?' গলার স্বর শুনে মনে হল মনীষা বেশ চিন্তিত।

'হয় নি, তবে কিছু একটা হবে। আর সেটা আজ রাতেই।'

মনীষা জিজ্ঞেস করলেন, 'হঠাৎ তোর এরকম একটা ধারণা হল কেন?'

কারণটা জানিয়ে দেয় বৈশালী। অন্য দিনের তুলনায় আজ সব্যসাচীকে আলাদা দেখাচ্ছে। অসম্ভব গম্ভীর, চুপচাপ। যে কোনো মুহূর্তে ফেটে পড়বেন।

মনীষা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, 'ঠিক আছে, আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসছি। বড়দাকে ফেস করা তোর একার পক্ষে সম্ভব নয়। ইউ নিড মাই হেল্প।'

'কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'ঠাকুমাকে একা রেখে তুমি আসবে কী করে?'

মনীষা বললেন, 'তুই তো জানিস আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে সাহানা ওর শাশুড়ি আর ছেলেকে নিয়ে থাকে। ওর হাজব্যাণ্ড কোচিনে চাকরি করে। মাঝে মাঝে ছুটিতে কলকাতায় আসে। সাহানা খুব ভাল মেয়ে। ওকে বলব, আমি যতক্ষণ না ফিরি ও যেন মায়ের কাছে থাকে।'

বৈশালী বলল, 'আচ্ছা—'

ফোন হয়ে গেলে একতলায় নেমে আসে সে। টেবলে খাবার দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। সুচরিতা আর সব্যসাচী তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যথারীতি কিচেনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সাবিত্রী। দরকারমতো এটা ওটা এনে দেবে। ময়নাকে অবশ্য ডাইনিং টেবলের কাছাকাছি দেখা গেল না।

বৈশালী মায়ের পাশে একটা চেয়ারে বসে পড়ে।

সুচরিতা জিজ্ঞেস করেন, 'কি রে, এত দেরি করলি কেন? খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

বৈশালী উত্তর দিল না। এমনিতে সে পারতপক্ষে মিথ্যে বলে না। সত্যি বললে বলতে হয় ছোট

পিসিকে ফোন করছিল। কিন্তু আপাতত সেটা সে জানাতে চায় না। তাই চুপ করে থাকে।

অন্য দিন নানা মজার মজার গল্প করে খাবার টেবল জমিয়ে রাখেন সব্যসাচী। আজ কিন্তু একটি কথাও বললেন না। নিঃশব্দে খেতে লাগলেন।

মুখ নিচু করে বৈশালীও খাচ্ছে। মাঝে মাঝে চোখের কোণ দিয়ে সব্যসাচীকে লক্ষ করছে। তাঁর মুখচোখ আগের মতোই থমথমে। বাবার এরকম চেহারা আগে কখনও তার চোখে পড়ে নি।

বৈশালী এবং সব্যসাচী চুপচাপ থাকলেও সুচরিতা একটু আধটু কথা বলছিলেন। তিনি স্বামীকে বললেন, 'কী ব্যাপার, বাপ মেয়ে দু'জনেই আজ এত গম্ভীর কেন?'

সব্যসাচী জবাব দিলেন না।

সুচরিতা একটু অন্যমনস্ক ধরনের মানুষ। কোনো কিছু তেমন ভাল করে লক্ষ করেন না। কিন্তু বৈশালী আর সব্যসাচীর এই নৈঃশব্দ তাঁরও কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হল।

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কী বুঝতে চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, 'কী হয়েছে তোমার?'

খেতে খেতে বাবার দিকে নজর রাখছিল বৈশালী। সব্যসাচী কি একটু চমকে উঠলেন? ঠিক বোঝা গেল না। স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর দিতে সময় লাগল তাঁর। নির্বিকার মুখে বললেন, 'কী আবার হবে? কিছুই না।'

সুচরিতা কিন্তু সহজে ছাড়লেন না, 'তোমার শরীর কি খারাপ?'

'না।'

'অফিসের ব্যাপারে কিছু গোলমাল হয়েছে?'

'না।'

এত সংক্ষিপ্ত উত্তর খুব সম্ভব আশা করেন নি সুচরিতা। ভেতরে ভেতরে সামান্য ক্ষুব্ধ হলেন। বাইরে থেকে তাঁর ক্ষোভ, রাগ বা বিরক্তি বিশেষ টের পাওয়া যায় না। প্রতিক্রিয়া যা কিছু, সবই তাঁর ভেতর দিকে। সুচরিতা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

খাওয়া শেষ হলে দোতলায় উঠে এল বৈশালীরা।

সুচরিতার সিরিয়াল দেখা হয়ে গেছে, ডিনারও শেষ। নিত্যকর্ম পদ্ধতি অনুযায়ী এবার সবার শুয়ে পড়ার কথা। এ বাড়ির কেউ বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকে না।

সিঁড়ি ভেঙে সবে ড্রইংরুমে পা দিয়েছে বৈশালীরা, সব্যসাচী বললেন, 'তনি, তোমার সঙ্গে আমার আর্জেন্ট কিছু কথা আছে। এখানেই বসো।' একটা সোফা দেখিয়ে দিলেন তিনি। তারপর সুচরিতার দিকে ফিরে বললেন, 'তোমার এখানে থাকা দরকার। তুমিও বসো।'

এত রাত্রে কী এমন জরুরি কথা থাকতে পারে সব্যসাচীর, বুঝতে পারছিলেন না সুচরিতা। বিমূঢ়ের মতো একটা সোফায় বসে পড়লেন।

বৈশালী আগেও লক্ষ করেছে, কোনো কারণে রেগে গেলে সব্যসাচী তাকে 'তুমি' করে বলেন। তিন চারদিন ধরে রুদ্ধশ্বাসে সে যা ভাবছিল সেই 'জিরো আওয়ার' আজ এই রাত এগারটায় উপস্থিত। আঘাতটা সে-ই প্রথমে হানবে, ঠিক করে রেখেছিল কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সেটা আসছে উলটো দিক থেকে। সব্যসাচী কী রণকৌশল নিয়েছেন তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। কী ঘটবে, বাবা কী বলবেন, সে অনেকটাই আন্দাজ করতে পারছে। নিজেকে মনে মনে প্রস্তুত করে একটা সোফায় গিয়ে বসে বৈশালী।

ডান পাশের দেওয়াল ঘেঁষে পর পর চারটে গদিমোড়া চেয়ার সাজানো রয়েছে। তার একটা টেনে এনে বসে পড়েন সব্যসাচী। একদৃষ্টে অনেকক্ষণ বৈশালীর দিকে তাকিয়ে থাকেন। হয়তো মেয়ের শক্তি এবং সাহস যাচাই করে নিতে চাইছেন।

সমস্ত ড্রইংরুমটায় এখন অস্বস্তিকর নীরবতা। বাইরে ফার্ন রোডের অন্য বাড়িগুলো নিঝুম হয়ে এসেছে। কচিৎ দু-চারটে প্রাইভেট কার চলার আওয়াজ ভেসে আসছে।

একসময় সব্যসাচী জিজ্ঞেস করেন, 'তুই এর মধ্যে বড় পিসি আর মেজ কাকার বাড়ি গিয়েছিলি?'

বৈশালী স্থির করে ফেলে, এ ক'দিনে সে যা যা করেছে এবং যেখানে যেখানে গেছে, কিছুই

গোপন রাখবে না। যা সত্যি, জিজ্ঞেস করলে তা-ই বলবে। তার বয়স মাত্র একুশ। কিন্তু এর মধ্যে সে এটুকু বুঝতে শিখেছে সত্যের প্রচণ্ড শক্তি। এর চেয়ে পাওয়ারফুল আর কিছু আছে কিনা তার জানা নেই।

বৈশালী বাবার চোখে চোখ রেখে বলে, 'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।'

'কী বলেছিস তাদের?'

'বড় পিসিরা তোমাকে কিছু বলে নি?'

'বলেছে। তবু তোর মুখ থেকে শুনতে চাইছি।'

বৈশালী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, নিচের তলা থেকে মহাদেবের সঙ্গে মনীষা উঠে আসে।

দেখাই যাচ্ছে, তবু মহাদেব বলে, 'ছোট পিসি এসেছেন।' বলে আর দাঁড়ায় না, নিচে নেমে যায়।

সব্যসাচী এবং সুচরিতা ভীষণ অবাক। বিস্ময় কাটিয়ে উঠে সব্যসাচী মনীষাকে বলেন,' এত রাত্তিরে তুই! মায়ের কি কিছু হয়েছে?' অথর্ব, শয্যাশায়ী নবতারার চিন্তাটাই স্বাভাবিক কারণে প্রথমে তাঁর মাথায় এসেছে।

মনীষা বলেন,'না। মা একই রকম আছে। পাশের ফ্ল্যাটের বৌটিকে তার কাছে রেখে এসেছি। ভাল মেয়ে, আমি না ফেরা পর্যন্ত ঠিকমতো দেখাশোনা করবে।'

'কিন্তু—'

'হঠাৎ কেন এলাম, জানতে চাইছ তো?'

'হ্যাঁ। মানে—'

মনীষা বললেন,'তনি আমাকে কিছুক্ষণ আগে ফোন করে এখানে আসতে বলেছে।'

শিরদাঁড়া শক্ত হয়ে গেল সব্যসাচীর। তীব্র দৃষ্টিতে একবার বৈশালীকে দেখে নিয়ে মনীষার দিকে তাকালেন। দ্রুত কী ভেবে বললেন, 'তনি কি এর ভেতর তোর ওখানে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

ছোট বোনকে আর কোনো প্রশ্ন করলেন না সব্যসাচী। কী উদ্দেশ্যে বৈশালী মনীষার কাছে গিয়েছিল সেটা তিনি ঠিকই বুঝে গেছেন।

মনীষা আসায় মনোবল অনেক গুণ বেড়ে গেছে বৈশালীর। তার এই তেজস্বিনী পিসিটি কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করেন না। অত্যন্ত সাহসী, বেপরোয়া, প্রবল মানসিক শক্তির অধিকারিণী।

বৈশালী সব্যসাচীকে বলল, 'বড় পিসি আর মেজকাকাকে কী বলেছি, শুনতে চেয়েছিলে না?' সব্যসাচী উত্তর দেবার আগেই সুরমা এবং অভিমন্যুর সঙ্গে যা যা কথাবার্তা হয়েছে, সব বলে যায় সে।

মনীষাও বললেন, 'সেদিন তনি গিয়ে আমাকে ঠিক এই কথাগুলোই বলেছে।' শুধু তা-ই না, ও বাগবাজারে ওর মামাবাড়িতেও গিয়েছিল।'

খানিকটা নাটকীয় ভঙ্গিতে সব্যসাচী বললেন, 'তনি কী দেখেছে, কার কাছে কী শুনেছে, আর সেটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিরাট একটা আকার দিয়ে চাউর করে বেড়াচ্ছে। অদ্ভুত ব্যাপার। আমার মেয়ে তার বাবা সম্বন্ধে এমন ডার্টি অ্যালিগেশন আনতে পারে, এ আমি ভাবতেও পারি না।'

বৈশালী কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেন মনীষা। বলেন, 'আমিও একটা কথা ভাবতে পারছি না বড়দা—'

তাঁর কথা ঠিকমতো বুঝতে না পেরে কপাল কুঁচকে তাকিয়ে থাকেন সব্যসাচী।

মনীষা ফের বলেন, 'এতটা স্পর্ধা মেয়েটার হল কী করে?'

সব্যসাচী পলকহীন ছোট বোনকে লক্ষ করতে করতে বলেন, 'কী বলতে চাস তুই?'

'বলতে চাই, যে বাবা সন্তানের কাছে সবচেয়ে রেসপেক্টেড, তার বিরুদ্ধে মেয়ে যখন এতবড় একটা অভিযোগ করছে, নিশ্চয়ই সেটার পেছনে কারণ আছে।' মনীষা বলতে লাগলেন, 'সিওর না হলে এমন ভয়ঙ্কর অভিযোগ কি সে করতে পারত?'

'সোনা!' সব্যসাচী চাপা গলায় গর্জে ওঠেন। মনীষার ডাক-নাম সোনা।

মনীষাকে অবিচলিত দেখায়। তিনি বলেন, 'তুমি কি ধমকে আমাকে চুপ করিয়ে দিতে চাইছ?'

বাবা আর ছোট পিসির কথাগুলো চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল বৈশালী। হঠাৎ তার চোখদুটো স্বয়ংক্রিয় কোনো পদ্ধতিতে সুচরিতার দিকে চলে যায়। তার এই মা'টি ভারি নরম ধাতের মানুষ। কোনোরকম উত্তেজনা বা মানসিক চাপ তিনি সহ্য করতে পারেন না। বৈশালী লক্ষ করল, সুচরিতার মুখটা রক্তশূন্য, ঠোঁটদুটো থর থর কাঁপছে। মায়ের জন্য ভীষণ কষ্ট হতে লাগল তার। কিন্তু যে অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে বা নিজেই সে ঘটিয়েছে, এখন আর সেখান থেকে ফেরার উপায় নেই।

মনীষা খুব ঠাণ্ডা গলায় সব্যসাচীকে বললেন, 'বড়দা, তুমি আমাকে ভাল করেই জানো। চড়া মেজাজে চিৎকার করে আমাকে থামানো যাবে না।'

সব্যসাচী নিজেকে খানিকটা সামলে নিলেন। নিজের ভাইবোনদের ভেতর মনীষা যে আলাদা, অন্যরকম ধাতুতে তৈরি সেটা তিনি ভালই জানেন। মেরুদণ্ডটা শক্ত, অত্যন্ত স্পষ্টভাষী, প্রয়োজনে ভীষণ রূঢ়, এই ছোট বোনটিকে তিনি যতটা সমীহ করেন, তার চেয়ে ভয় পান অনেক বেশি। মেয়েদের যা সবচেয়ে কাম্য, সেই বিবাহিত জীবন এবং শ্বশুরবাড়িকে পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যে চলে আসতে পারে, নিজের মতো করে নিজের জীবনকে যে তৈরি করে নিয়েছে, বাপের বাড়ির কারো সাহায্য নেয়নি, সে তাঁকে পরোয়া করবে কেন?

সব্যসাচী বললেন, 'তনি তো ওর বড় পিসি আর মেজ কাকার কাছেও গিয়েছিল। ওরা কি এসব রাবিশ বিশ্বাস করেছে?'

মনীষা অদ্ভুত হাসে।

সব্যসাচী বলেন, 'হাসছিস যে?'

মনীষা ঘাড় সামান্য হেলিয়ে বললেন, 'বড়দি আর মেজদা হাজার বার বিশ্বাস করেছে। একটা পারিবারিক স্ক্যান্ডাল হবে বলে তনিকে চুপ করে থাকতে বলেছে।'

অনেকক্ষণ মুখ নিচু করে বসে থাকেন সব্যসাচী। তারপর আবছা গলায় বলেন, 'ওই মেয়েটা, মানে নমিতা ইজ অলমোস্ট এ হোর। আমি ওর ট্র্যাপে পড়ে গিয়েছিলাম। তাই—'

রিলে রেসে এক দৌড়বাজের হাত থেকে ব্যাটন অন্য দৌড়বাজের কাছে চলে যায়। এতক্ষণ ব্যাটনটা মনীষার হাতে ছিল। ফের সেটা বৈশালীর হাতে চলে আসে। সে কড়া গলায় বলে, 'আটার লাই—এর চেয়ে মিথ্যে আর কিছু হতে পারে না।'

সব্যসাচী চমকে ওঠেন, 'মানে।'

'আমি গড়পারে নমিতা চৌধুরিদের বাড়ি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছি। ভদ্র, ভাল, ডিসেন্ট মহিলা। কিন্তু হেল্পলেস আর গরিব। হোল ফ্যামিলিটা তার ওপর ডিপেণ্ড করে আছে। ওদের পভার্টির পুরো সুযোগটা তুমি নমিতার ওপর নিয়েছ।' তীব্র গলায় বৈশালী বলে, 'অস্বীকার করতে পার?'

সব্যসাচী উত্তর দিলেন না, তাঁর মাথা বুকের ওপর ঝুলে পড়ে।

মনীষা এবার বলেন, 'বড়দা, একসময় উই ইউজড টু ওয়রশিপ ইউ। তুমি ছিলে আমাদের আইডল। এই বয়সে হোল ফ্যামিলির মুখ পুড়িয়ে দিলে! সবচেয়ে বড় সর্বনাশ করেছ তুমি ওই মহিলাটির—' বলে সুচরিতার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলেন।

সুচরিতা কোলে দুই হাত রেখে বিহ্বলের মতো বসে আছেন। তাঁর দুচোখ দিয়ে অবিরল জল ঝরে যাচ্ছে।

সব্যসাচী বুঝতে পারছিলেন, পৃথিবীর শেষ দেওয়ালে তাঁর পিঠ ঠেকে গেছে। অদ্ভুত এক পাপবোধে তিনি প্রায় কুঁকড়ে যান। কোনোরকমে ভাঙাচোরা মুখ তুলে কাঁপা গলায় বলেন, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে।'

মনীষা বললেন, 'দ্যাটস নট এনাফ। আমাদের সঙ্গে তো বটেই, বড় বৌদির সঙ্গে তুমি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। তোমার সামনে দুটো রাস্তা খোলা আছে।'

কোনো প্রশ্ন না করে ছোট বোনের দিকে তাকান সব্যসাচী।

মনীষা বলেন, 'চরিত্র, হিউম্যান ভ্যালুজ, সব তোমার নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি বৌদিকে ডিভোর্স

করে নমিতাকে বিয়ে করতে পার। তা হলে বুঝব তুমি অনেস্ট।'

এমন অবিশ্বাস্য কথা আগে কখনও শোনেন নি সব্যসাচী। আতঙ্কগ্রস্তের মতো বললেন, 'কী বলছিস সোনা!'

'বৌদির যতটা ক্ষতি তুমি করেছ, তার চেয়ে নমিতার ওপর এতটুকু কম অন্যায় করো নি। ওর ক্ষতিপূরণ কিভাবে করবে?'

'তাকে তো আমি চাকরি করে দিয়েছি।'

'সেটাই কি যথেষ্ট। সামাজিক দিক থেকে যেখানে তাকে নামিয়ে এনেছ তার কমপেনসেশন কেমন করে হবে?'

সব্যসাচী স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। বুঝতে পারেন বৈশালী এবং মনীষা জটিল গভীর এক সমস্যার মাঝখানে তাঁকে ছুঁড়ে দিয়েছেন। আর সেটা ফাঁসের মতো তাঁর গলায় ক্রমশ শক্ত হয়ে আটকে যাচ্ছে।

বৈশালী বলল, 'বাবা, এ বাড়িতে থাকতে আমার আর ইচ্ছা করছে না। আমি ছোট পিসির কাছে গিয়ে থাকব। যদি কোনোদিন তোমাকে শ্রদ্ধা করতে পারি ফিরে আসব।'

মনীষা বললেন, 'সেই ভাল। চল আমার সঙ্গে।'

বৈশালীকে নিয়ে মনীষা বেরিয়ে যান। দুটি মূর্তির মতো ড্রইংরুমে বসে থাকেন সব্যসাচী আর সুচরিতা। কত কাছাকাছি, কিন্তু তাঁদের মাঝখানে লক্ষ কোটি মাইলের দূরত্ব।

গোলপার্কের কাছে এসে বৈশালীরা জানতে পারে, শেষ বাস মিনিবাস আর অটোও চলে গেছে। ট্যাক্সিও পাওয়া গেল না।

গোলপার্ক থেকে ঢাকুরিয়া বেশি দূরে নয়। দু'জনে হাঁটতে শুরু করে।

নবতারা, মনীষা এবং বৈশালী—একই বংশের তিন প্রজন্মের তিন তেজস্বিনী নারী আপাতত একসঙ্গেই থাকবে।

জটিলতা

কলেজ ছুটি হয়েছিল দুটোয়। তারপর বন্ধুরা ছাড়ল না; একরকম জোর করেই এই মফঃস্বল শহরের একমেব সিনেমা হলটায় বনানীকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। চমৎকার একখানা বিদেশি ছবি এসেছে— দস্তুরমত আর্টফিল্ম। নাম ভূমিকায় সোফিয়া লোরেন।

কলকাতা থেকে একশ মাইল দূরে এই ম্যাড়মেড়ে শহরে ছবি বলতে পুরনো মাইথোলজির সদাব্রত— যথা, 'রামভক্ত হনুমান,' 'লঙ্কা বিজয়' কিংবা 'পান্ডবদের অজ্ঞাতবাস'। বড়জোর 'ঘরের লক্ষ্মী,' 'সিঁথির সিঁদুর' জাতীয় দু'চারখানা সামাজিক মেলোড্রামা। যে শহরের রুচি পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে আছে সেখানে বিদেশি আর্ট ফিল্মের আবির্ভাব চমকে দেবার মতো ঘটনা। কাজেই বন্ধুরা অর্থাৎ রাজপুর ডিগ্রি কলেজের ছেলে ছোকরা প্রফেসরের দল আর লোভ সামলাতে পারেনি।

বনানী বাধা দিতে চেয়েছিল, 'আপনারা দেখে আসুন ভাই। আমি বরং বাড়িই চলে যাই।'

বোটানির আরতি সেন হঠাৎ প্রশ্ন করেছিল, 'আচ্ছা বনানীদি, এই রাজপুর কলেজে আপনি কতদিন কাজ করছেন?'

বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বনানী বলেছিল, 'বছর দুই হবে। কেন বলুন তো?'

আরতি সেন ক্ষোভের গলায় বলেছিল, 'এই দু বছরে একটা দিনও কলেজ ছুটির পর আপনাকে আটকানো যায় নি। ছুটি হলেই বাড়ি পালিয়েছেন। বন্ধু হিসেবে, আড্ডা দেবার সঙ্গী হিসেবে, আমরা কি এতই খারাপ?'

বিব্রতভাবে বনানী কী যেন বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় ইংরেজির অবনী সোম বলে উঠেছে, 'বাড়ি পালাবেন না তো কী, বাড়িতে ওঁর সুধা আছে যে। মিস্টার মিত্রের সঙ্গ ছাড়া বনানীদির কিছুই ভাল লাগে না।'

ফিলজফির সাধনা সান্যাল ফস করে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কতদিন আপনার বিয়ে হয়েছে বনানীদি?'

ভয়ে ভয়ে বনানী বলেছিল, 'সাত বছর।'

'সাত বছর!' সাধনা সান্যাল সরু গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'সাত বছর পরও মিস্টার মিত্রকে পলকে হারিয়ে ফেলেন!'

বনানী চুপ।

সাধনা সান্যাল আবার বলেছিল, 'আরতিদি, ইকনমিকসের মাধবীদি, বাংলার সুমনাদি, আমি— আমাদের বাড়িতেও তো একটা করে মূর্তিমান স্বামীজি রয়েছেন। কিন্তু কই, আপনার মতো বাড়ি ফেরার জন্য আঁকুপাকু করি না। দুবছর, চার বছর, ছবছর করে একেক জন ম্যারেড লাইফ কাটাচ্ছি। স্বামী নামে প্রাণীগুলোর পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত চেনা হয়ে গেছে; আর কোনো চার্ম নেই।'

কেমিস্ট্রির জয়ন্ত ঘোষ বলেছিল, 'আপনাদের স্বামী আর বনানীদির স্বামী এক নন। বনানীদির কাছে মিস্টার মিত্রের চার্ম দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে।'

ইংরেজির অবনী সোম এই সময় আবার বলে উঠেছিল, 'আজেবাজে কথা থাক। মোদ্দা ব্যাপার হল, আজ এক্ষুনি বনানীদিকে ফিরতে দেওয়া হচ্ছে না। ঘন্টা তিনেকের জন্য মিস্টার মিত্রের সঙ্গ সুধা থেকে ওকে বঞ্চিত করা হবে।'

বাকি সবাই গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'প্রস্তাব পাশ।'

ওদের সঙ্গে না গিয়ে পারা যায় নি। চোখের সামনে দিয়ে ছবির পর ছবি চলে যাচ্ছিল, কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না বনানী। এক বর্ণ সংলাপও তার কানে ঢুকছিল না। সব দৃশ্য আর শব্দ ছাপিয়ে বার বার একটা মুখই বনানীর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল—সে মুখ নির্মলের।

অবনী-জয়ন্ত-সাধনা—ওরা জানে না, কলেজ ছুটির পর তিন ঘন্টা আটকে রেখে বনানীর কতখানি ক্ষতি করে দিয়েছে। ওদের ধারণা, নির্মল আর বনানী আদর্শ স্বামী-স্ত্রী। মাঝে মাঝে ওরা ঠাট্টা করে বলে 'চখা-চখী' কিংবা 'কপোত-কপোতী'। কিন্তু ওরা জানে না, বছর দুই আগে ক্যানসারে একটা পা কাটা যাবার পর থেকে কী ভয়ানক সন্দেহপরায়ণ হয়ে উঠেছে নির্মল। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে

সব সময় তাকে সন্দেহ। কলেজ ছুটির পর ফিরতে এক মিনিট দেরি হলে রক্ষা নেই, হুলস্থুল কাণ্ড শুরু করে দেয়।

ভেতরের এই সব কথা তো লোককে ডেকে ডেকে বলা যায় না; সুন্দর একটি প্রলেপ দিয়ে মুড়ে রাখতে হয়।

একসময় শো ভাঙল।

সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে বনানী দেখতে পেল, মে মাসের সন্ধে এই ছোট্ট শহরের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। সূর্যটাকে দেখা যাচ্ছে না। সামান্য যে আলোটুকু রয়েছে তার রং বাসি হলুদের মতো।

জয়ন্ত বলল, 'গণেশ কাফেতে চলুন, একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক। আড়াই তিন ঘন্টা চোখ টান করে বসে থেকে মাথা ধরে গেছে।'

অন্য সবাই বলল, 'সত্যি, চা না হলে এখন আর চলছে না।'

বনানী বলল, 'আমাকে কিন্তু ক্ষমা করতে হবে ভাই।'

'এক কাপ চা খেতে কতক্ষণ আর লাগবে, ম্যাক্সিমাম দশ পনের মিনিট—'

'এক মিনিটও আমি আর দেরি করতে পারব না।'

সাধনা সান্যালের হয়তো করুণা হয়ে থাকবে। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'বনানীদিকে আজ ছেড়ে দিন। একদিনে এত জুলুম করলে কখনও চলে!'

মুক্তি পেয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতেই চলতে শুরু করল বনানী। বাড়ির দিকে যত এগুচ্ছে, বুকের ভেতরটা ততই টিপ টিপ করতে লাগল। কবে কখন কলেজ ছুটি হয়, নির্মলের মুখস্থ। ঘন্টা তিনেক দেরি করে আসার কৈফিয়ত কী দেবে, ভেবে পাচ্ছিল না বনানী। গল গল করে সে ঘামতে শুরু করেছে।

দুই

বাড়ির কাছাকাছি এসে বনানী অবাক। নিজের অজান্তে কখন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, সে জানে না।

একতলা ছোট্ট বাড়িটার সামনে ঢালা বারান্দা। সকাল থেকে অনেকটা রাত পর্যন্ত রোজ সেখানে একই দৃশ্য দেখা যায়। ঢালু ইজি চেয়ারে আধশোওয়া হয়ে পড়ে থাকে নির্মল। সেটার গায়ে তার ক্রাচটা হেলান দেওয়া থাকে। ডান পাশে ছোট্ট টি-পয়। তার ওপর সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার, অ্যাশ-ট্রে এবং খবরের কাগজ সাজানো থাকে।

দুবছর এ শহরে এসেছে তারা। রোজ এই এক দৃশ্য দেখে দেখে বনানীর চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

আজ কিন্তু তার ব্যতিক্রম। বারান্দায় একা নির্মল নেই; তার পাশে একটি স্বাস্থ্যবান সুদর্শন যুবক বসে আছে। আর কী আশ্চর্য, নির্মল হেসে হেসে, হাত নেড়ে নেড়ে তার সঙ্গে খুব গল্প করছে।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়েই থাকল বনানী। কতদিন পর এমন হাসতে, এমন গল্প করতে দেখল সে নির্মলকে? ক্যানসারে ডান পা'টা হাঁটু পর্যন্ত কাটা যাবার আগে এরকম হাসত নির্মল? এমন গল্প করত? মনে পড়ে না। দুবছর আগের সেই জীবনটা একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে। এখন প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে শুধু ঝগড়া, সন্দেহ। তারা দু'জন ছাড়া এ বাড়িতে আর কেউ নেই। কিন্তু ছোট্ট সংসারের ক্ষুদ্র পরিবেশটি গ্লানি আর অবিশ্বাসে সর্বক্ষণ পরিপূর্ণ।

বনানী সব চাইতে অবাক হয়েছে অচেনা যুবকটিকে দেখে। হঠাৎ কোথা থেকে সে এল, মায়াবী জাদুকরের মতো নির্মলের মুখে হাসি ফোটাল, বুঝতে পারা যাচ্ছে না। বনানী জানে, নির্মলের বন্ধু-বান্ধব নেই। মানুষের সঙ্গ সে পছন্দ করে না। বনানীর কলেজের প্রফেসররা কেউ এলে মনে মনে খুবই বিরক্ত হয়। ভদ্রতার খাতিরে কথা টথা অবশ্য বলে, কিন্তু তারা চলে গেলে চেঁচামেচি চিৎকার জুড়ে দেয় ।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, বনানীর খেয়াল নেই। এক সময় মুখ ফেরাতে গিয়ে নির্মল তাকে দেখতে পেল। তক্ষুনি ভুরু কুঁচকে গেল তার। রুক্ষ গম্ভীর গলায় ডাকল, 'এদিকে এস।'

কাঠের গেটটা ঠেলে ছোট্ট বাগানের ভেতর দিয়ে বারান্দায় উঠল বনানী।

নির্মল আবার বলল, 'এতক্ষণে বাড়ি ফেরার কথা মনে পড়ল? ক'টা বাজে হুঁশ আছে?'

মৃদু আধফোটা গলায় কী একটা উত্তর দিল বনানী।

নির্মল বলতে লাগল, 'কলেজ ছুটি হয়েছে দুটোয়। তারপর এতটা সময় কোথায় কাটিয়ে এলে?'

'কলেজের অন্য একটা কাজ ছিল।' প্রায় মরিয়া হয়ে মিথ্যেই বলল বনানী।

'রোজই তোমার কলেজের কাজ!'

'রোজ কোথায়?'

'এই তো পরশুদিন কলেজ ছুটির পর দু ঘন্টা দেরি করে এলে। সোমবার এসেছ আড়াই ঘন্টা পর।'

'সেক্রেটারি ডেকে পাঠালে কী করব?'

টেনে টেনে হিংস্র গলায় নির্মল বলল, 'মনে করেছ আমি কিছুই বুঝি না! আমার চোখে ধুলো দেবে তুমি!'

অন্য সময় হলে তেমন গায়ে মাখত না বনানী। কিন্তু অচেনা লোকের সামনে এরকম করে বলাতে লজ্জায় ক্ষোভে অপমানে তার মাথার ভেতরটা জ্বালা করতে লাগল। মনে হল, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসবে।

নির্মল আবার কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ওধার থেকে সেই যুবকটি চেঁচিয়ে উঠল, 'উঁহু-উঁহু, আমার সামনে দাম্পত্য কলহ নয়। ওসব পরে হবে। এখন তোর বৌর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দে নির্মল।'

কিছুক্ষণ গজ গজ করে খুব নীরস গলায় নির্মল পরিচয় করিয়ে দিল। যুবকটি তার দূর সম্পর্কের মামাতো ভাই। নাম অশোক। সম্পর্কে ভাই হলেও তারা বন্ধুর মতো। বনানীর বিয়ের আগে অশোক আমেরিকা চলে গিয়েছিল। ক'দিন আগে দেশে ফিরেছে। ফিরেই তাদের ঠিকানা জোগাড় করে রাজপুর চলে এসেছে। দিনকয়েক এখানে থাকবে।

এক পলক নির্মলকে দেখে নিয়ে চোখ নামাল বনানী। বুঝতে পারল, সিনেমায় যাবার ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না; আপাতত মুলতুবি রইল মাত্র। পরে যে কোনো সময় এ নিয়ে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটাবে নির্মল। সেই ভয়ে বনানী কাঁটা হয়ে রইল।

যাই হোক, হাত তুলে নমস্কার করল অশোক। বলল, 'নির্মল আমার চাইতে মোটে সাতদিনের বড়। ওকে দাদা বলি না। আপনাকে নাম ধরে ডাকব, না বৌদি বলতে হবে?'

বনানী এবার ভাল করে লক্ষ করল। দূর থেকে যতটা মনে হয়েছিল, অশোক ঠিক ততটা যুবক নয়। গালে, চিবুকের তলায় এবং কোমরের কাছে চর্বি জমেছে। চোখের কোলে, কপালে এবং গলায় সরু সরু রেখা দেখা যাচ্ছে। ওগুলো বয়সের লক্ষণ।

নির্মল আবহাওয়াটা গুমোট করে তুলেছিল। হালকা করবার জন্য মৃদু হেসে বলল, 'ওকে দাদা না বলতে পারেন। আমাকে কিন্তু বৌদি বলতে হবে। সাত দিনের বড় হলেও তো বড়ই।'

'তথাস্তু। তবে প্রণাম ট্রণাম কিন্তু করতে পারব না। ওটা আমার ঠিক আসে না।'

'বৌদি বললেই যথেষ্ট। প্রণামের আর দরকার নেই। অতি ভক্তি কিসের লক্ষণ জানেন তো?'

অশোক হেসে ফেলল।

বনানী বলল, 'আমাদের এখানে কখন এসে পৌঁছেছেন?'

অশোক বলল, 'দুপুরবেলা।'

'চিনে আসতে অসুবিধা হয় নি?'

'একটুও না।' বলতে বলতে হঠাৎ কী একটা মনে পড়তে হেসে উঠল অশোক।

খানিক অবাক হয়ে বনানী বলল, 'কী ব্যাপার, হাসছেন যে?'

অশোক বলল, 'স্টেশনে নেমে একটা মজার কাণ্ড হয়েছিল।'

'কী?'

'একটা সাইকেল রিকশাওলাকে ডেকে বললাম, নির্মল মিত্রের বাড়ি নিয়ে চল। রিকশাওলা চিনতেই পারল না। আমার মা'র কাছে শুনেছিলাম, আপনি এখানে প্রফেসরি করছেন। রিক্সাওয়ালাকে এবার

আপনার নামটাই করলাম। কী আশ্চর্য, ঠিক চিনে ফেললে। তারপর সোজা এখানে নিয়ে এল। ছোকরা বেশ রসিক। আসতে আসতে কী বলছিল জানেন?'

'কী?'

'কলেজের দিদিমণিদের সবাইকে ও চেনে।'

'তা চিনতে পারে। ছোট জায়গা, সবাই সবার মুখ চেনা।'

অশোক ঠোঁট ছুঁচলো করে হাসতে হাসতে বলল, 'তা ঠিক। তবে রিকশাওলা ছোকরা দিদিমণিদের মুখগুলো একেবারে জপের মালা করে রেখেছে। সে যাক গে, রাজপুরে নেমেই টের পাওয়া গেছে, আপনি একজন স্বনামধন্যা লেডি।' বলতে বলতে কী মনে করে হঠাৎ নির্মলের দিকে ফিরল। তরল স্বরে বলল, 'তোর চাইতে তোর বউকে লোকে বেশি চেনে যে রে—'

নির্মল অদ্ভুত হাসল, 'আমি তো স্ত্রীর নামেই ধন্য হয়ে আছি। স্ত্রীর পয়সায় খাই, স্ত্রীর পয়সায় পরি। বুঝলি অশোক, প্রফেসর বনানী মিত্রের স্বামী ছাড়া আমার আর কোনো পরিচয় নেই।'

চমকে নির্মলের দিকে ফিরল বনানী। তার মনে হতে লাগল, নির্মলের মুখটা গনগন করছে, তার চোখমুখ থেকে অসহ্য চাপা উত্তাপ বেরিয়ে আসছে।

নির্মল থামে নি, 'কিন্তু ব্যাপারটা কী জানিস অশোক—'

অশোক হকচকিয়ে গিয়েছিল। গলার ভেতর জড়ানো একটা শব্দ করল। নির্মল বলতে লাগল, 'আমি স্ত্রী-নামে ধন্য হতে চাইলে কী হবে, কে এক ব্যাটাচ্ছেলে অনেক দিন আগে একটা বেয়াড়া শ্লোক লিখে গেছে।'

'কী শ্লোক?'

নির্মল শ্লোক আওড়াতে লাগল ঃ

'স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ,
পিতৃনামা তু মধ্যমঃ।
মাতৃনামাধমঃ প্রোক্ত,
স্ত্রীনামা তদধমঃ।'

অশোক জানতে চাইল, 'এর মানে কী?'

'অতি সরল। যে পুরুষ স্বনামে পরিচিত সে ধন্য। কৃতী বাপের ছেলে হিসেবে যে পরিচিত সে মধ্যম। মায়ের নামে যে পরিচিত সে অধম। আর সব চাইতে ওঁচা হচ্ছে সে, যে স্ত্রীর নামে পরিচিত।'

অশোক বলল, 'কী যা তা বলছিস! তোর মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে।'

নির্মল উত্তর না দিয়ে সেই অদ্ভুত শব্দহীন বিকৃত হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলতে লাগল।

বনানী কী বলতে চেষ্টা করল; পারল না। এই মুহূর্তে তার মাথায় একটা আগুনের চাকা ঘুরে চলেছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর অত্যন্ত সহজ গলায় নির্মল বলল, 'সেই দুপুরবেলা অশোক এসেছে। এখনও কিন্তু ওকে চা'টা কিছুই দেওয়া হয়নি।'

বনানী খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'হারুর মা তো ছিল, তাকে বললেই পারতে।' হারুর মা এ বাড়ির কাজের লোক। রান্না-বান্না, বাজার-হাট থেকে যাবতীয় কাজ করে থাকে।

অশোক তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আতিথ্যে ত্রুটি হয় নি বৌদি। নির্মল হারুর মাকে চা'টা করতে বলেছিল। আমি বারণ করেছি। বলেছি, আপনি কলেজ থেকে ফিরলে একসঙ্গে গল্প করতে করতে খাওয়া যাবে।'

'আমি চা নিয়ে আসছি।' বনানী আর দাঁড়াল না, দ্রুত পায়ে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

তিন

চা খাবার-টাবার নিয়ে বনানী যখন আবার বাইরের সেই ঢালা বারান্দায় এল, দিনের শেষ আলোটুকু মুছে গেছে। জলে কালি গুলে দেবার মতো আবছা-আবছা অন্ধকার চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। মে মাসের

বিলম্বিত সন্ধে খুব ধীরে ধীরে রাজপুরের ওপর নেমে আসছে।

হারুর মা সঙ্গে এসেছিল। বনানী বলল, 'একটা বেতের মোড়া আর ছোট টেবলটা আমাদের শোবার ঘর থেকে নিয়ে এস।'

হারুর মা মোড়াটা নিয়ে এল। বনানী সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে অশোক আর নির্মলের সামনে চায়ের কাপ এবং খাবারের প্লেট সাজিয়ে দিল। তারপর নিজের চা'টা নিয়ে মোড়ায় বসল। হারুর মায়ের দিকে ফিরে বলল, 'একবার চট করে জেলেপাড়া থেকে ঘুরে এস। ভাল মাছ পেলে আনবে। নইলে আমজাদের দোকান থেকে মাংস কিনে এনো। মিষ্টিও আনবে।'

হারুর মা চলে গেল।

বনানীদের বাড়ির সামনে খোয়ার রাস্তা। তারপর বিশাল মাঠ। ঘাস আর চোরাকাঁটায় ছেয়ে আছে। মাঠের এক ধারে দুটো গোল পোস্ট দেখা যাচ্ছে। মাঠের পর দু চারটে বাড়ি, তার ওধারে নদী। এই সন্ধেবেলায় নদী বা বাড়ি টাড়ি দেখা যাচ্ছে না। এমনকি সামনের মাঠটা পর্যন্ত ঝাপসা হয়ে গেছে। তবে ওখানে জোনাকি উড়ছে প্রচুর। আলোর পোকাগুলো একবার জ্বলে, একবার নেভে। জ্বলা আর নেভার খেলা তাদের রাতভোর চলবে।

সারাদিন পর এই সন্ধেবেলায় দক্ষিণ দিক থেকে হাওয়া দিয়েছে। ঝিরঝিরে আরামদায়ক বাতাসে গা জুড়িয়ে যায়। সামনের বাগানে দেবদারু আর ঝাউয়ের পাতা কাঁপছে। অনেক দূরে দিগন্তের তলা থেকে চাঁদটা উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছে।

অশোক বলল, 'আপনাদের এই জায়গাটা বেশ নিরিবিলি বৌদি। চিৎকার চেঁচামেচি, ভিড়টিড় নেই। আমার খুব ভাল লাগছে।'

বনানী বলল, 'ছোট মফঃস্বল শহর, কারখানা টারখানা নেই। নিরিবিলি তো হবেই। তবে—'

'কী?'

'আমাদের এই ম্যাড়মেড়ে রাজপুর আপনার মতো নিউইয়র্ক-লসএঞ্জেলেস-সানফ্রান্সিসকো ঘোরা মানুষের মনোহরণ করে বসবে, এতটা কিন্তু ভাবতে পারি নি।'

অশোক বলল, 'ব্যাপারটা কি জানেন বৌদি, ক'বছর আমেরিকায় ছিলাম। দেখতাম সমস্ত জাতটা সব সময় হই চই বাধিয়ে একটা ঘোরের মধ্যে ছুটছে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে সেখানে কোনো না কোনো হুজুগ, কোনো না কোনো উত্তেজনা। শান্ত হয়ে বসবার মতো সময় বা জায়গা ওখানে নেই। দেখতে দেখতে একদিন ওই লাইফে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। আমার নার্ভগুলো স্টিলের তারের মতো হয়ে গেল। তারপর কলকাতায় এসেও দেখলাম সেই ভিড়, সেই চিৎকার, সেই এক্সাইটমেন্ট। আজ দুপুরে আপনাদের রাজপুরে নামবার পর আমার স্নায়ুগুলো জুড়িয়ে গেল যেন। অনেকদিন পর এমন নির্জন, উত্তেজনাহীন জায়গা আমার চোখে পড়ল।'

নির্মল হঠাৎ বলে উঠল, 'বাব্বা, রাজপুরের যে এত গুণ, জানা ছিল না। আমার তো এক সেকেণ্ডও এখানে ভাল লাগে না।'

একটু নীরবতা।

তারপর বনানী বলল, 'আপনাদের আমেরিকার গল্প বলুন—'

অশোক বলল, 'আমেরিকার কী গল্প শুনবেন?'

'ওই দেশটা কেমন, লোকগুলো কিরকম, ওখানে কী কী দেখলেন—এই সব।'

ক'বছর আমেরিকা-বাসের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে গেল অশোক।

দেখতে দেখতে আকাশে চাঁদ উঠে এল, চন্দনের পাটার মতো গোল পূর্ণিমার চাঁদ। গাছপালা, আকাশ, চোরকাঁটায়-ভরা মাঠ—চরাচরের সব কিছু অমল জ্যোৎস্নায় ভরে যেতে লাগল।

হঠাৎ বনানী বলল, 'ওরা তো খুব ফাস্ট লাইফ লিড করে, না?'

অশোক বলল, 'খুব।'

'একটা কথা শুনেছি। তা কি সত্যি?'

'কী শুনেছেন?'

'ওখানে নাকি পথে ঘাটে প্রচুর বান্ধবী পাওয়া যায়?'

'প্রচুর না হলেও পাওয়া যায়। ফ্রি মিক্সিংয়ের দেশ তো।' অশোক হেসে ফেলল। ভুরু কুঁচকে বলল, 'এত কিছু জানবার বিষয় থাকতে বান্ধবী সম্বন্ধে খোঁজখবর যে?'

ঠোঁট টিপে বনানী বলল, 'কারণ আছে।'

'যথা?' অশোক মুখ তুলে সোজা বনানীর চোখের দিকে তাকাল।

'যথা—যথা—' এক পলক ভাবনার ভান করল বনানী। তারপর রগড়ের গলায় বলল, 'আমাদের শ্রীমান অশোক কুমার বসু কোনো বান্ধবী টান্ধবী জোটাতে পেরেছে কিনা—'

'সেই ইটারনাল ফেমিনিন কিউরিওসিটি!' অশোক ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে বলতে লাগল, 'বাঙালি মেয়েরা যতই লেখাপড়া শিখুক, প্রফেসরই হোক আর ব্যারিস্টারই হোক, ওই কৌতূহলটি যাবার নয়।'

'ও সব বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না, মশাই, বলুন বান্ধবী জুটেছিল কিনা—'

'উরে বাবা, এ যে দেখছি উকিলের জেরা—'

'হ্যাঁ তাই। বলুন—'

একটু চুপ করে থাকল অশোক। তারপর চোখেমুখে কপট নৈরাশ্য ফুটিয়ে বলল, 'একটাও জোটে নি।'

বনানী বলল, 'বলেন কী!'

অশোক কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই নির্মল বলে উঠল, 'তুমিও যেমন, সাত আট বছর আমেরিকায় কাটিয়েছে, একেবারে শুকদেব হয়ে ছিল ব্যাটা।'

দুলে দুলে হাসতে লাগল অশোক, 'যা বলেছিস ভাই। আমেরিকা এমন জায়গা, সাধু মহাত্মারা পর্যন্ত ওখানে দুদিন থাকলে ফ্ল্যাট হয়ে যাবে।'

চোখের মণি দুটো কোণের দিকে এনে বনানী বলল, 'আপনি কতখানি ফ্ল্যাট হয়েছেন?'

'নিজে তো বোঝা যায় না। কী করে বলব?' অশোকের চোখে কৌতুকের আভা মাখানো।

বনানী কী ভেবে বলল, 'হ্যাঁ মশাই, বান্ধবী নিয়ে তো অনেক কাণ্ডই করেছেন, বুঝতে পারছি। তা বিয়ে টিয়ে করেছেন?'

'না। ওটা হয়ে ওঠে নি।'

'সে কী! এখনও একটা কনেও জুটল না?'

'একেবারে জোটে নি, তা বলব না।'

'তবে?'

'মনের মতো নয়। সবই ভাগ্য।'

অশোক আঙুল দিয়ে এমনভাবে তার কপাল দেখাল যে বনানী হেসে ফেলল।

অশোক আবার বলল, 'সবার ভাগ্য তো আর নির্মলের মতো হয় না। না কি বলেন—'

হাসিটা থমকে গেল বনানীর। সে বলল, 'কী যে বলেন, তার মাথামুণ্ডু নেই।'

অশোক বলল, 'আমার কথা তো অনেক শুনলেন। এবার আপনাদের কথা বলুন।'

'আমাদের আবার কথা কী, আমরা তো আর আপনার মতো আমেরিকা টামেরিকা ঘুরে আসি নি।'

'আমেরিকা ঘুরে না এলে বুঝি বলবার মতো কিছুই থাকে না?'

'থাকে। তবে—'

'কী?'

'আপনার ভাল লাগবে না।'

'ভাল লাগবে কি খারাপ লাগবে, আপনি আগে থেকে কেমন করে বুঝলেন? হাত গুনতে জানেন নাকি?'

হাল ছেড়ে দেবার মতো করে বনানী বলল, 'আপনার যখন এত ইচ্ছে শুনুন—'

সে যা বলে গেল সংক্ষেপে এই রকম। বিয়ের কিছুদিন পরই ক্যানসারে ডান পা'টা কাটা গেছে নির্মলের; সঙ্গে সঙ্গে মার্চেন্ট অফিসের ভাল চাকরিটা হারাতে হয়েছিল। তারপর ভীষণ স্ট্রাগল করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত রাজপুর কলেজে বনানী একটা লেকচারশিপ পাবার পর ক'টা বছর খানিকটা

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা গেছে।

বিষাদের গলায় অশোক বলল, 'কলকাতায় ফিরেই মায়ের কাছে নির্মলের কথা শুনেছি। শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

বনানী উত্তর দিল না। নির্মল খানিক দূরে চোরকাঁটা-ভরা মাঠটার দিকে তাকিয়ে বসে ছিল; সেও কিছু বলল না।

অশোক আবার বলল, 'হঠাৎ নির্মলের এরকম একটা অসুখ হল—'

বনানী বলল, 'অসুখ তো হঠাৎই হয়।'

'সত্যি, এ আমি কল্পনাই করতে পারি নি। আচ্ছা—'

বনানী জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

অশোক বলতে লাগল, 'ওর পা'টা কি বাঁচানো যেত না?'

'না।'

'আগে থেকে কি কোনো সিমটম টিমটম বুঝতে পারেন নি?'

'অনেক আগে থেকে বোঝা যায় নি। যখন অসুখটা ধরা পড়ল, যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। পা'টা বাদ দেওয়া ছাড়া তখন আর কোনো উপায় ছিল না।'

সেই ঝিরঝিরে সুখদায়ক হাওয়াটা ঝপ করে বন্ধ হয়ে গেল যেন। অমন ধবধবে নির্মল জ্যোৎস্না কালচে হয়ে যাচ্ছে। চাপ চাপ বেদনার মতো চারদিকে কী যেন ঘন হতে লাগল।

অশোক বলল, 'ডাক্তার কী বলছে? নির্মল কমপ্লিট কিওরড তো?'

বনানী চমকে উঠল। মাসখানেক ধরেই শরীরটা ভাল যাচ্ছে না নির্মলের; তার কোমরের কাছে আবার একটা ব্যথা সন্দেহজনকভাবে দেখা দিয়েছে। একরকম জোর করেই ক'দিন আগে নির্মলকে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিল বনানী। মেডিক্যাল চেক-আপ হয়ে গেছে। রিপোর্ট অবশ্য এখনও আসে নি; যে কোনোদিন ডাকে চলে আসতে পারে।

একটু আগে প্রগলভ হয়ে উঠেছিল বনানী। ঠাট্টায়-পরিহাসে মে মাসের এই স্নিগ্ধ উজ্জ্বল সন্ধেয় আমোদের বান ডাকিয়েছিল। কিন্তু এখন আর কিছু বলতে ইচ্ছা করছে না। সে চুপ করে রইল।

নির্মল এতক্ষণ কথা বলে নি। হঠাৎ মাঠের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সে বলল, 'আমেরিকা থেকে তুই এক নম্বরের গাধা হয়ে ফিরেছিস অশোক—'

অশোক হকচকিয়ে গেল, 'কিরকম?'

'আরে বোকারাম, ক্যানসার কখনও সারে শুনেছিস?'

'নিশ্চয়ই সারে।'

'ওটা সান্ত্বনা। কেটেকুটে দিলে দু'চার বছর হয়তো চুপচাপ থাকে। তারপর ফের ছোবল মারে। তখন আবার কাটো। কাটতে কাটতে একদিন দেখা যায় শরীরের আর কিছু নেই; সব বাদ চলে গেছে। ক্যানসারের রুগীরা মানে আমরা যেন কসাইখানার গরু-ভেড়া।'

'কিন্তু তুই তো এখন বেশ ভালই আছিস।'

'ভাল আছি!' নির্মল কেমন করে যেন হাসল, 'তা হবে।'

আশঙ্কার গলায় অশোক বলল, 'কেন, পা'টা বাদ যাবার পর আর কোনো খারাপ সিমটম দেখা দিয়েছে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নির্মল বলল, 'মাসখানেক ধরে জ্বর চলছে। কোমরের কাছে আবার একটা জায়গা ফুলে উঠেছে। দিন সাতেক আগে বনানী আমাকে কলকাতায় ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল।'

অশোক চমকে উঠল। রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'তারপর?'

উদাসীন চোখে সামনের জ্যোৎস্না-ধোয়া দিগন্তের দিকে তাকিয়ে নির্মল বলল, 'তারপর আর কী—'

অশোক প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ডাক্তার কী বলল তাই বল—'

'এবার বোধ হয় কোমর পর্যন্ত কাটতে হবে।'

ওধার থেকে বনানী রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'কী যা-তা বলছ! এখনও রিপোর্ট পাওয়া গেল না। আগে

থেকেই ধরে নিলে, কাটতে হবে?'

নির্মল উত্তর দিল না।

অশোক নির্মলকে বলল, 'তুই খুব পেসিমিস্ট হয়ে গেছিস নির্মল। আগে তো এরকম ছিলি না—'

নির্মল বলল, 'কিরকম ছিলাম?'

'মনে নেই?'

'না।'

একটু চুপ করে থেকে নির্মল আবার বলল, 'বৌর রোজগার খেয়ে পেসিমিস্ট হয়েও যে বেঁচে আছি তা-ই যথেষ্ট। আমার জীবনীশক্তি কি সাঙ্ঘাতিক, একবার ভেবে দ্যাখ—'

অশোক বলল, 'তোর মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে।'

নির্মল চুপ করে রইল।

অশোক এবার বনানীকে জিজ্ঞেস করল, 'নির্মলের রিপোর্ট কবে পাওয়া যাবে?'

'এর মধ্যেই তো পাবার কথা ছিল। আশা করছি তাড়াতাড়িই পেয়ে যাব।'

'কলকাতায় গিয়ে নিয়ে আসতে হবে?'

'না। ওরা ডাকে পাঠিয়ে দেবে, বলেছে। এ সপ্তাহে না এলে একবার কলকাতায় যাব ভাবছি।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

মাঠের দিকে জোনাকি উড়ছিল। এবার সেখান থেকে ঝিঁঝিদের বিলাপ ভেসে আসছে। ঝিল্লিস্বর চারদিকের স্তব্ধতাকে হাজার গুণ বাড়িয়ে তুলেছে যেন। মাঝে মাঝে ব্যাঙও ডাকছিল। যদিও এখন বৃষ্টির দিন নয়, আসন্ন বর্ষার কথা ভেবেই হয়তো ওরা গলা সাধতে শুরু করেছে।

হঠাৎ অশোক ডাকল, 'বৌদি—'

বনানী তাকাল।

অশোক বলল, 'এখানে আপনি কী সাবজেক্ট পড়ান?'

'হিস্ট্রি—'

'শুনেছি, বিয়ের আগে আপনি এম.এ পাশ করেন নি—'

'না। বিয়ের অনেক পর, মানে আপনার ভাই যখন অসুখে পড়ল, সেই সময় এম.এ পরীক্ষাটা দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, দুর্দিন যখন এসেই পড়েছে তখন এম.এ ডিগ্রিটা হাতে থাকলে কাজে লাগবে।'

'লেগেছেও তো—'

'তা বলতে পারেন।'

একটু ভেবে অশোক বলল, 'রেগুলার ক্লাস করে অ্যাপিয়ার করেছিলেন?'

'না—' বনানী বলল, 'ক্লাস করবার সুযোগ ছিল না। প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়েছিলাম।'

'সত্যি বৌদি, আপনি নির্মলের জন্যে যা করেছেন, খবু কম মেয়েই তা করে—'

'কী আবোল তাবোল বলছেন!' বাধা দিয়ে বনানী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমাদের দেশে সব মেয়েই স্বামীর জন্য এটুকু করে থাকে। এর মধ্যে এমন কিছু বাহাদুরি নেই।'

'সে আপনি যা-ই বলুন, আপনার মতো মেয়ে আমি অন্তত খুব কমই দেখেছি। আপনাকে যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি, ততই আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে।'

বিব্রতভাবে বনানী বলল, 'থামুন তো মশাই—'

অশোক আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় হারুর মা এসে জানাল, 'রান্না হয়ে গেছে।'

বনানী বলল, 'এখনই খেয়ে নেবেন?'

অশোক বলল, 'ক'টা বাজে?'

বনানী আন্দাজে বলল, 'ন'টা হবে।'

'নাইট ইজ টু ইয়াং। এখনই খাব কী? আর একটু গল্প টল্প করি—'

'বেশ।'

আরো কিছুক্ষণ ওরা বসে রইল। এলোমেলো অসংলগ্ন নানারকম কথা বলল। তারপর আসর

ভেঙে খেতে গেল।

চার

বাড়িতে তিনখানা শোবার ঘর, ছোট্ট কিচেন, একটা স্টোর, দুটো ঢাকা বারান্দা।

খাওয়া দাওয়ার পর অশোককে নিয়ে দক্ষিণ দিকের ঘরটায় চলে এল বনানী। জানালার ধার ঘেঁষে একজনের মতো ছোট খাট। মাথার কাছে টেবিল, গদিমোড়া একখানা চেয়ার। দেওয়ালে আয়না ঝুলছে।

ক্ষিপ্র হাতে বিছানা পেতে দিল বনানী। তারপর মশারি খাটিয়ে গুঁজে দিতে লাগল।

অশোক বলল, 'মশারিটা না টাঙালে চলবে না? ওর ভেতর ঢুকলে আমার কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।'

বনানী বলল, 'মশারি ছাড়া ঘুমোতে পারবেন না। যা মশার উৎপাত!'

'কই, তেমন মশা তো লাগছে না।'

'একবার লাইট নেভান না, পিল পিল করে পল্টন বেরিয়ে পড়বে।'

মশারি গোঁজা হয়ে গেলে বনানী বলল, 'রাত্তিরে জল খান?'

অশোক বলল, 'না। ভোরের আগে আর উঠছি না।'

'তবু আমি এক গেলাস জল রেখে যাচ্ছি।'

'আপনার যখন এত ইচ্ছে, রেখে যান—রাখাই কিন্তু সার হবে।'

কাচের গেলাসে জল এনে রাখল বনানী। বলল, 'আপনার বাঁ পাশের ঘরটা আমাদের বেডরুম। রাত্তিরে যদি দরকার হয়, ডাকবেন।'

অশোক বলল, 'কিছু দরকার হবে না। কাল সকালের আগে আর ওঠা উঠি নেই।'

'আচ্ছা, গুড নাইট।'

'গুড নাইট—'

অশোকের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে এল বনানী। নির্মল জেগে ছিল। স্বচ্ছ নেটের মশারির ভেতর চিত হয়ে শুয়ে সিগারেট খাচ্ছিল, আর মুখের ভিতর থেকে গোল ধোঁয়ার রিং ছুঁড়ছিল।

বনানীর পায়ের শব্দে পাশ ফিরল নির্মল। বলল, 'অতিথি সৎকার হল?'

নির্মলের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চকিত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল বনানী। বলল, 'অতিথি আবার কে? তোমার ভাই না?'

'ওই হল।'

একটু চুপ।

কয়েক পলক নির্মলের দিকে তাকিয়ে থেকে খোঁপা থেকে ক্লিপ আর রুপোর কাঁটা খুলে চুলগুলোকে একটা আটপৌরে বেণীতে বেঁধে ফেলল বনানী। আয়নার কাছে গিয়ে মুখে একটু স্নো মেখে ঘাড়ে গলায় পাউডারের পাফ বুলিয়ে নিল। তারপর এক গেলাস জল খেল। রাত্তিরে শুতে যাবার আগে সামান্য প্রসাধন সেরে জল খাওয়া তার অনেক দিনের অভ্যাস।

জল খেয়ে বনানী সুইচটা নেভাতে যাবে, সেই সময় নির্মল আবার বলে উঠল, 'অশোক কী বললে?'

'কী বলবে?'

'কিছুই বলে নি?'

অল্পক্ষণ চোখ কুঁচকে থাকল বনানী। তারপর বলল, 'আমাকে জিজ্ঞেস না করে আড়ি পেতে শুনলেই পারতে।'

নির্মল উত্তর দিল না। লম্বা টানে খানিকটা ধোঁয়া গলার ভেতর পুরে আবার খানিকক্ষণ রিং ছাড়ল। একসময় খুব আস্তে করে বলল, 'সেই স্যানস্কৃট শ্লোকটা তুমি জানো?'

সন্দেহের গলায় বনানী জিজ্ঞেস করল, 'কোনটা?'

'সেই যে পঞ্চকন্যা স্মরে নিত্যং—সীতা সাবিত্রীদের ব্যাপার ট্যাপার। মনে আছে?'

'আছে। কেন?'

'তুমি সেই দলে চলে যাবে আলটিমেটলি—'

বনানীর চোখ মুখ কঠিন হল, 'কিরকম?'

নির্মল বলল, 'অশোককে তখন বললে না আমার জন্যে কেমন স্যাক্রিফাইস আর স্ট্রাগল করে চলেছ।'

'আমি বুঝি তা-ই বলেছি? বললাম স্বামীর জন্যে সব মেয়েই ওটুকু করে থাকে, আর তুমি সেটা কিভাবে মিন করছ।'

'আরে বাপু ওই একই কথা।' নির্মল বলতে লাগল, 'অশোক তোমার কিরকম প্রেজ করলে। তোমার মতো মেয়ে নাকি খুব কম দেখেছে।'

নীরস গলায় বনানী বলল, 'কেউ যদি প্রশংসা করে, আমি তার কী করতে পারি?'

'না, কিছু করার নেই।'

বনানী উত্তর দিল না। সুইচের গায়ে তার আঙুল স্থির হয়ে ছিল। চাপ দিয়ে ঘরের আলোটা নেভাতে যাবে, আবার বাধা পড়ল। নির্মল বলল, 'অশোকের কথা থাক। এখন সেই বোঝাপড়াটা হয়ে যাক।'

বনানী চমকে উঠল, 'কিসের বোঝাপড়া?'

'কলেজ ছুটির পর আজ ফিরতে এত দেরি হল কেন?'

বনানী অবাক হয়ে গেল। সেই ব্যাপারটা নির্মল মনের ভেতর পুষে বসে থাকবে, এতটা ভাবা যায় নি। একটু চুপ করে থেকে রুক্ষ, নীরস গলায় বনানী বলল, 'তখনই তো তোমাকে বললাম, একটা জরুরি কাজ ছিল।'

কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসল নির্মল, 'জরুরি কাজটা কী, তা-ই জানতে চাইছি।'

'সেক্রেটারির বাড়ি গিয়েছিলাম।'

'তা তো শুনেছি। সেক্রেটারি শালার বাড়ি রোজই দরকার থাকে নাকি?'

'রোজ কোথায় দেখলে?'

'রোজ নয়তো কী—' নির্মল চিৎকার করে উঠল, 'লাস্ট উইকে গিয়েছিলে, তার আগের উইকে গিয়েছিলে, তার আগের উইকেও গিয়েছিলে। এভরি উইকেই তো যাচ্ছ।'

বনানী বলল, 'হ্যাঁ, যাচ্ছি। ডেকে পাঠালে যেতে হবেই।'

'যেতে হবে মানে?'

'যেতে হবে মানে যেতে হবে।'

'কেন, দাসখত দেওয়া আছে নাকি?'

'আছে বৈকি?'

'কিরকম?' মশারি তুলে বাইরে বেরিয়ে এল নির্মল।

বনানী তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাসের শুরুতে যে টাকা দেয়, সে ডাকলে তো যেতেই হবে।'

মুহূর্তে নির্মলের মুখটা আগুনের হলকায় পুড়ে গেল যেন। কটু গলায় টেনে টেনে সে বলতে লাগল, 'যে টাকা দেবে, তার পেছনেই তা হলে তুমি ছুটতে পার—'

'প্রাণের দায়েই ছুটতে হবে। চাকরিটা চলে গেলে তখন খাবে কী? ট্রিটমেন্ট চলবে কোত্থেকে? সে হুঁশ আছে?'

বনানীর কথা শেষ হতে না হতেই অশ্লীল মুখভঙ্গি করে চেঁচাতে লাগল, 'চাকরি বাঁচাবার জন্যে তুমি সেক্রেটারির বাড়ি যাও! মনে করেছ আমি কিছু বুঝি না?' চেঁচাতে চেঁচাতে তার গলার শিরা ছিঁড়েই যাবে বুঝি।

চাপা তীব্র ধমকের গলায় বনানী বলল, 'অসভ্যের মতো রাতদুপুরে চেঁচিও না।'

হঠাৎ চুপ করে গেল নির্মল। স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'কলেজ ছুটির পর সেক্রেটারির বাড়িই যে গিয়েছিলে তার প্রমাণ কী?'

'প্রমাণপত্র দাখিল করতে পারব না। তবে—'

'কী?'

'এবার যেদিন যেদিন সেক্রেটারির বাড়ি যাব, তাঁকে দিয়ে একটা করে চিঠি লিখিয়ে আনব। আশা

করি, বিশ্বাস করবে।'

নির্মল উত্তর দিল না।

বনানী আবার বলল, 'আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। ভীষণ ঘুম পেয়েছে। তুমি মশারির ভেতর ঢোক, লাইট নিভিয়ে দেব।'

গজ গজ করতে করতে মশারির ভেতর ঢুকে পড়ল নির্মল। আলো নিভিয়ে একটু পর বনানী তার পাশে এসে শুল।

সমস্ত ঘর অন্ধকারে ডুবে গেছে। কিছুক্ষণ পর বনানীর চোখ যখন ঘুমে জুড়ে এসেছে সেই সময় নির্মল বলল, 'বড্ড বাড় হয়েছে তোমার—'

বনানীর ঘুমের ভাবটা চট করে কেটে গেল, দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে রইল সে।

নির্মল আবার বলল, 'কাল হারুর মাকে সেক্রেটারির বাড়ি পাঠাব। সত্যি সত্যিই গিয়েছিলে কিনা জানতে হবে।'

বনানীর বুকের ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোতের মতো কী খেলে গেল। সে বলল, 'পাঠিও।'

'যদি খবর পাই যাওনি, তখন দেখাব।'

'দেখিও। এখন দয়া করে চুপ কর। পাশের ঘরে একটা লোক শুয়ে আছে। সেই বিকেল থেকে তোমার ইতরামি দেখে দেখে ঝালাপালা হয়ে গেছে। এখন দয়া করে তাকে একটু ঘুমোতে দাও। আমাকেও।'

'অশোকের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'চমৎকার!'

'কিসের চমৎকার?'

'তোমার সম্বন্ধে তার সিমপ্যাথি আর তার সম্বন্ধে তোমার সিমপ্যাথি। রাত্রিবেলা পরপুরুষের ঘুমের ব্যাঘাত হবে বলে নিজের স্বামীকে চুপ করিয়ে রাখতে চাইছ!'

এতক্ষণে বনানীর ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা বিস্ফোরণের মুখে এসে গিয়েছিল। সে বলল, 'থাম বলছি। সব জিনিসের একটা সীমা আছে।'

পরের দিন ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেল বনানীর। নির্মল তখনও ঘুমোচ্ছে। তাকে না জাগিয়ে সন্তর্পণে বিছানা থেকে নামল সে। দরজা খুলে দেখল, এর মধ্যে রোদ উঠে গেছে। হারুর মা উনুনে আঁচ ধরিয়ে একধারে চুপচাপ বসে ছিল। বনানীরা দরজা না খুললে ঘরদোর পরিষ্কার করতে পারছিল না।

এক পলক হারুর মাকে দেখল বনানী। বলল, 'চট করে ঘর মুছে চা বসিয়ে দাও—'

হারুর মা মাথা নাড়ল, 'আচ্ছা। কিন্তু বৌদিমণি, ও-ঘরের দোর তো খোলে নি; পোষ্কার (পরিষ্কার) করবে কেমন করে?'

'কোন ঘরের?'

হারুর মা অশোকের ঘর দেখিয়ে দিল। অশোক এখনও ওঠে নি, ঘর ভেতর থেকে বন্ধ। বনানী বলল, 'ও-ঘরটা এখন থাক।' বলে আর দাঁড়াল না, সোজা বাথরুমের দিকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বনানী দেখল, শোবার ঘর আর বারান্দা টারান্দা মুছে উনুনে চায়ের কেটলি চাপিয়ে দিয়েছে হারুর মা। বলল, 'তুমি বাজারটা সেরে এস হারুর মা। বেশি দেরি করবে না।'

হারুর মা বলল, 'চায়ের কী হবে?'

'সে আমি করে নেব।'

হারুর মাকে বাজারে পাঠিয়ে চা করে ফেলল বনানী। তারপর কাপে কাপে ঢেলে একটা কাপ নিয়ে সোজা অশোকের ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা দিল। ভেতর থেকে জড়ানো ঘুমের গলায় অশোক বলল, 'কে?'

বনানীর কেন যেন ইচ্ছে হল, একটু রগড় করে। অশোকের সঙ্গে তার সম্পর্কটাও ঠাট্টার, পরিহাসের।

তরল কৌতুকের গলায় সে বলল, 'বাঁদী হাজির জাঁহাপনা।'

'বৌদি?'

'জি হুজুর—'

একটু পর দরজা খুলে অশোক মুখোমুখি দাঁড়াল। সহাস্যে বলল, 'সুপ্রভাত—'

বনানীও হাসল, 'সুপ্রভাত। এই নিন চা—'

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে অশোক বলল, 'আমার ভাগ্য আজ বেশ ভাল—'

'কিরকম?'

'সকালবেলা উঠে এমন সুন্দর মুখ দেখলাম—'

রহস্যের গলায় বনানী বলল, 'সকালবেলা সুন্দর মুখ এই প্রথম দেখলেন নাকি?'

'এগ্‌জাক্টলি—' অশোক উৎসাহের গলায় বলতে লাগল, 'আমেরিকায় থাকতে যে আমাকে ঘুম ভাঙিয়ে চা দিত সে একটা আধবুড়ো স্প্যানিশ চাকর, বেটাচ্ছেলের মুখ ঠিক বুলডগের মতো। সাত বছর ওই শ্রীমুখ দেখেছি। তারপর কলকাতায় এলাম তো সকালবেলা দুখিরাম এসে ঘুম ভাঙাতে লাগল।'

'দুখিরামটা আবার কে?'

'আমাদের পুরাতন ভৃত্য।'

ঠোঁট টিপে হাসল বনানী, 'ঘুম ভাঙলেই যাতে সুন্দর মুখ দেখতে পারেন তার জন্য একটা পার্মানেন্ট ব্যবস্থা করে ফেলুন।'

'আপনার পরামর্শ মনে রাখব।'

'মনে রাখলে চলবে না। কাজে করে দেখাতে হবে।'

'ওরে বাবা—'

বনানী বলল, 'আপনি চা খেয়ে মুখটুখ ধুয়ে নিন। আমি ব্রেকফাস্ট দিচ্ছি—' বলেই চলে যাচ্ছিল, অশোক ডাকল, 'শুনুন—'

ফিরে দাঁড়িয়ে বনানী বলল, 'কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ।'

'কী?'

'কাল রাত্তিরে কী হয়েছিল?'

বুঝতে না পেরে বনানী জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কিসের কথা বলছেন?'

অশোক বলল, 'নির্মলের কথা। কাল রাত্তিরে আমার ঘর থেকে যাবার পর আপনাদের ঘরে চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছিল।'

কিছুক্ষণ থতিয়ে রইল বনানী। একটু আগে আবহাওয়াটা আশ্চর্য লঘু আর পরিহাসতরল ছিল। তার গায়ে হঠাৎ মলিন ছায়া এসে লাগল। ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে সে বলল, 'ও কিছু না।'

'সত্যিই কিছু না?' সোজাসুজি বনানীর চোখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করল অশোক।

বনানীর মুখ আরো অনেকখানি নামল। খুব অস্পষ্ট গলায় সে বলল, 'না।'

'তা হলে নির্মল এত চিৎকার করছিল কেন?'

বিব্রতভাবে বনানী বলল, 'আমি এখন যাই। অনেক কাজ আছে, রান্নাবান্না চাপাতে হবে।'

বনানী রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। যেতে যেতে অনুভব করল, একজোড়া নিষ্পলক অবিশ্বাসী চোখ তার পিঠে যেন আটকে আছে।

রান্নাঘরে এসে হঠাৎ বনানীর খেয়াল হল, নির্মলকে এখনও বেড-টি দেওয়া হয় নি। চায়ের কাপ সারি সারি সাজানো ছিল। তাড়াতাড়ি একটা কাপ তুলে নিয়ে নিজেদের শোবার ঘরে এল বনানী।

নির্মলের ঘুম কখন ভেঙেছে, কে জানে। মশারির ভেতর শুয়ে শুয়ে সিগারেট খাচ্ছিল।

বনানী বলল, 'তোমার চা—'

নির্মল উত্তর দিল না।

বনানী আবার বলল, 'চা এনেছি—'

বনানীর দিকে না তাকিয়েই নির্মল বলল, 'আমার অসীম সৌভাগ্য।'

নির্মলের কথাগুলোর মধ্যে বাঁকা ভাব ছিল, বনানী গায়ে মাখল না। সকাল বেলাতেই মনমেজাজ কটু করে তুলবার ইচ্ছে নেই তার। নির্মলের মাথার দিকে একটা টেবল রয়েছে। চায়ের কাপটা তার ওপর রেখে বনানী বলল, 'এখানে চা রইল। উঠে খাও। আমি রান্না ঘরে যাচ্ছি—'

বনানী যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, নির্মল ডাকল, 'শোন—'

'কী?'

'তুমি তো জানো, ঘুম থেকে উঠে চা না পেলে আমার মাথা ধরে যায়—'

'জানি—'

'এক ঘন্টা আগে আমার ঘুম ভেঙেছে। তখন থেকে শুনছি অশোকের সঙ্গে গল্পই করে যাচ্ছ। আমি যে পঙ্গু মানুষ, এখানে পড়ে আছি, সে কথা খেয়ালই নেই। সে যাগ গে, এবার থেকে আমাকে চা দিয়ে যত পার অশোকের সঙ্গে গল্প করো। নিজে আসতে অসুবিধে হলে, হারুর মাকে দিয়েই পাঠিয়ে দিও—'

বনানীর মনে হল, মাথাটা অসহ্য গরম হয়ে উঠেছে। নাক মুখ দিয়ে গলগল করে তাপ বেরিয়ে আসছিল। তবু নিজেকে বিদীর্ণ হতে দিল না সে। প্রাণপণে সংযত থেকে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হারুর মা এখনও ফেরে নি। রান্নাঘরে খাবার করতে করতে বনানী দেখতে পেল, নির্মল চা খেয়ে মুখটুখ ধুয়ে ক্রাচে ভর দিয়ে দিয়ে রাস্তার দিকের বারান্দায় চলে গেল। ওখানে দিনরাত সেই ইজিচেয়ারটা পাতা থাকে। ইজিচেয়ারের গায়ে ক্রাচ রেখে নির্মল শুয়ে পড়ল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ওখানেই পড়ে থাকবে সে। তারপর স্নান-খাওয়া, কিছুক্ষণ ঘুম। ঘুম থেকে উঠেই আবার ওখানে চলে যাবে নির্মল। রাত্রি ন'টা দশটা পর্যন্ত একভাবেই শুয়ে থাকবে।

এদিকে অশোকও বাথরুম থেকে বেরিয়ে স্ট্রাইপড পাজামা আর পাতলা বুশ শার্ট পরে নিয়েছে। চুলটুল আঁচড়ে ফিটফাট হয়ে সেও নির্মলের কাছে গিয়ে বসল।

খাবার টাবার তৈরি হলে প্লেটে প্লেটে সাজিয়ে বাইরের বারান্দায় গেল বনানী। টিপয় টেবলে প্লেটগুলো রেখে বনানী অশোককে বলল, 'আপনারা খান—'

অশোক শুধোল, 'আপনারটা কোথায়?'

'সকালে এক কাপ চা ছাড়া আমি আর কিছু খাই না।'

'সে কী! হেলথের পক্ষে এ তো সাংঘাতিক ইনজুরিয়াস—'

'কিচ্ছু হবে না। এ আমার অনেক দিনের অভ্যাস।'

'ভেরি ব্যাড হ্যাবিট। পরে ঠ্যালা বুঝবেন।' অশোক হাসল, 'আপনার চা নিয়ে আসুন। গল্প করতে করতে খাওয়া যাক।'

বনানী বলল, 'আমি রান্নাঘরে বসেই খাব। এখন গল্প করবার সময় নেই।'

'আপনার কী এত কাজ?'

'রান্না আছে না?'

'কেন, আপনাদের হারুর না কার মা যেন আছে। সে-ই তো রান্নাবান্না করে।'

'হারুর মা বিকেলে রাঁধে, ওর সঙ্গে সেই রকম কথা। সকালের দিকটা আমি চালিয়ে নিই। অবশ্য—'

'কী?'

'হারুর মাকে বললে এ বেলাটা রেঁধে দেবে। তবে আমি এরকম অ্যাডভান্টেজ নেবার বিরোধী।'

'আপনি খুব ন্যায়নিষ্ঠ দেখছি।'

'ন্যায়নিষ্ঠ কিনা জানি না, তবে 'ভদ্রলোকের চুক্তি' আমি মেনে চলি। এটা সম্পূর্ণ নীতির ব্যাপার, অবশ্য—'

কিছু না বলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল অশোক।

বনানী বলল, 'অসুখ বিসুখ হলে অন্য কথা। তখন বাধ্য হয়েই হারুর মায়ের শরণাপন্ন হতে হয়। আচ্ছা যাই—'

রান্নাঘরে গিয়ে বনানী চায়ে চুমুক দিয়েছে, হারুর মা বাজার থেকে ফিরে এল। তাড়াতাড়ি চা'টা শেষ করে রান্না চাপিয়ে দিল বনানী।

ভাত-ভাজা-ডাল-টাল হবার পর মাছের ঝোলটা যখন ফুটে এসেছে সেই সময় বাইরের বারান্দা থেকে অশোক উঠে এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াল।

সহাস্য মুখে বনানী বলল, 'কী ব্যাপার মশাই? ফাঁকা জায়গা, ফ্রেশ এয়ার ছেড়ে রান্নাঘরের এই গরমে ঘামতে এলেন যে!'

রহস্য করে অশোক বলল, 'এই জায়গাটা অনেক বেশি লোভনীয়।'

'কিরকম?' বনানীর ভুরু কুঁচকে গেল।

গলা নামিয়ে অশোক বলল, 'আপনি এখানে রয়েছেন যে।'

'আমি থাকলে কী?'

'যেখানে আপনি সেখানেই দক্ষিণা বাতাস।'

'ফ্ল্যাটারি হচ্ছে?'

'মোটেও না, খাঁটি সত্যি।'

বনানী বলল, 'অত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবেন না মশাই। আপনার পূজ্যপাদ ভ্রাতাটি কিন্তু বিশেষ সুখী হবেন না।'

পেছন ফিরে এক পলক নির্মলকে দেখে নিল অশোক। বলল, 'ভ্রাতাটির সামনে তো আর করছি না।'

বনানী উত্তর দিল না। অশোক একটু পর বলল, 'কি ম্যাডাম, দাঁড়িয়েই থাকব নাকি? বসতে টসতে বলবেন না?'

মনে মনে অস্বস্তি বোধ করল বনানী। দ্বিধান্বিতের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সোজা শোবার ঘরে চলে গেল। একটা বেতের মোড়া জোগাড় করে এনে দরজার বাইরে পেতে দিল, 'বসুন—'

অশোক জাঁকিয়ে বসে বলল, 'সেই কখন রান্নাঘরে ঢুকেছেন। কী এত রাঁধছেন?'

'এত আর কোথায়? অতি সাধারণ বাঙালি মেনু। ভাত-ডাল-মাছ আর একটা চাটনি।'

'জানেন, আমেরিকায় থাকতে আমিও বছর দুই রান্না করে খেয়েছি।'

'বটে!' চোখ গোল করে তাকাল বনানী।

'বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'হচ্ছে।' এমনভাবে বনানী বলল যাতে অবিশ্বাসটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

অশোক বলল, 'আমার রান্না একবার খেলে জীবনে ভুলতে পারবেন না।'

'এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমি একমত।'

হাল ছেড়ে দেবার মতো করে অশোক বলল, 'আপনার সঙ্গে পারা যায় না।'

বনানী হাসল, বলল, 'সহজে আপনাকে ছাড়ছি না, পরীক্ষা দিতে হবে।'

'কিসের?'

'রান্নার।'

'প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা দিতে হবে নাকি?' অশোককে শঙ্কিত দেখাল।

বনানী বলল, 'না না, থিওরেটিক্যাল।'

অশোক আশ্বস্ত হল, 'প্রশ্ন করুন—'

'প্রথমে বলুন ওখানে কী রান্না করতেন?'

'ভাত—মাংস, কখনও-সখনও মাছ।'

'মাংসে কী মশলা দিতেন?'

'হলুদ আর কাঁচালঙ্কা।'

'মাছে?'

'ওই একই মশলা।'

'চমৎকার। আপনি একটা সরল রন্ধনপ্রণালী লিখে ফেলুন। বাংলা দেশের মেয়েরা চিরকৃতজ্ঞ হয়ে

থাকবে।'

অশোক হাসতে লাগল। বনানীও তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হেসে উঠল।

একটু পর হাসি থামিয়ে অশোক বলল, 'আপনাকে এবার একটা কথা জিজ্ঞেস করি। ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন কিন্তু।'

'কী কথা?'

'কাল রাত্তিরে কী হয়েছিল বলুন। তখন এড়িয়ে গেলেন। এখন কিন্তু ছাড়ছি না।'

'বা রে, তখনই তো বললাম কিছু হয় নি।'

অশোক বলল, 'আমার সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা বলুন তো?'

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বনানী বলল, 'তার আগে আমার একটা কথার উত্তর দিন—'

'কী?'

'আমাদের এই বাড়িতে আপনি কতদিন এসেছেন?'

'দিন বলছেন কী! ক'ঘন্টা বলুন—'

'বেশ, ক'ঘন্টা?'

মনে মনে হিসেব করে অশোক বলল, 'কুড়ি ঘন্টার মতো।'

চোখের তারা স্থির করে বনানী বলল, 'কুড়ি ঘন্টার ভেতর একটা মানুষ সম্বন্ধে কোনো ধারণা করা যায় কী?'

'পুরোপুরি না হলেও খানিকটা তো করা যায়।'

'খানিকটা করবার মতো শক্তিও আমার নেই।'

'এ আপনার অতিরিক্ত বিনয়।'

'বিনয় টিনয় কিছু না, যা সত্যি তাই বলছি।'

অশোক হেসে হেসে বলল, 'আপনি খুব চতুরা।'

বনানীর কপাল কুঁচকে গেল, 'কী দেখে তা মনে হল?'

'আজে বাজে কথার ধোঁয়া উড়িয়ে আসল কথাটা আড়াল করে রাখছেন। কিন্তু আমি খুব বোকা নই। নিজের প্রশংসা করলাম বলে মনে কিছু করবেন না, নিজ গুণে ক্ষমা করে নেবেন।'

বনানী চুপ।

অশোক আবার বলল, 'এবার বলুন কাল রাত্তিরে কী হয়েছিল—'

বিব্রতভাবে বনানী বলল, 'আপনার শুধু এক কথা। যতবার বলছি কিছু হয় নি, তবুও বিশ্বাস করছেন না।'

'না, বিশ্বাস করছি না। কারণ—'

জিজ্ঞাসু চোখে বনানী তাকাল।

অশোক বলতে লাগল, 'কাল বিকেল থেকে আমার চোখে কিছু কিছু পড়েছে। তাতে কী মনে হচ্ছিল জানেন?'

'কী?'

'লাভা গরম হচ্ছে। আমার ধারণা রাত্রিবেলা সেই সব ব্যাপারেই বিস্ফোরণ ঘটেছে। তাই না?'

'আরে না—না—'

'আপনি উড়িয়ে দিতে চাইলে কী হবে, বিষয়টা কিন্তু উড়িয়ে দেবার মতো এত হালকা নয়।'

বনানী কী বলতে যাচ্ছিল, ক্রাচে ভর দিয়ে খুট খুট করতে করতে হঠাৎ নির্মল রান্নাঘরে এসে হাজির। বলল, 'একটা দেশলাই দাও তো। সিগারেট ধরাতে গিয়ে ওখানে পেলাম না।'

বনানী বলল, 'সে কি, বাইরের টেবলে দেশলাই ছিল তো।'

নীরস সুরে নির্মল বলল, 'আমি কি মিথ্যে বলছি?'

স্বামীর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল বনানী। এক পলক তার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে উনুনের পাশ থেকে একটা দেশলাই তুলে নির্মলকে দিল। দেশলাইটা নিয়ে একবার বনানীকে দেখল নির্মল, একবার দেখল অশোককে। তার চোখের তারা স্থির হয়ে গেল; চোয়াল হয়ে উঠল কঠিন। তারপরেই ক্রাচ টেনে টেনে বারান্দার দিকে হাঁটতে লাগল।

হঠাৎ অশোক ডাকল, 'নির্মল—'

থমকে দাঁড়িয়ে মুখ ফেরাল নির্মল, 'কী বলছিস?'

'তোর বৌর সঙ্গে গল্প করছি।'

'কর না—' বলেই চুপ করল নির্মল। তারপরেই ঝকমকে হেসে বলল, 'পরের বৌর সঙ্গে গল্প করতে ভালই লাগে। নিজে তো বিয়ে করলি না। চালিয়ে যা, জোরসে চালা।'

আর দাঁড়াল না নির্মল। ক্রাচের শব্দ করে বাইরের বারান্দায় চলে গেল। একটু চুপ করে থেকে অশোক বলল, 'এটা কিরকম হল ম্যাডাম?'

'কোনটা?' বনানী তাকাল।

'আমি কিন্তু আসবার সময় বারান্দার টেবলে দেশলাই দেখেছি। অথচ নির্মল উলটো কথা বলল।'

'আপনি ভুল দেখেছেন। দেশলাই থাকলে কেউ আবার নিতে আসে নাকি?'

'আমার চোখ এর মধ্যে খারাপ হয়ে গেল! আশ্চর্য!'

অশোককে আর কিছু বলবার সুযোগ না নিয়ে বনানী তাড়াতাড়ি উনুন থেকে মাছের ঝোল নামিয়ে ফেলল। ব্যস্তভাবে বলল, 'ক'টা বাজল দেখুন তো—'

কবজি উলটে ঘড়ি দেখল অশোক। বলল, 'ন'টা পঁয়ত্রিশ।'

'সর্বনাশ!'

'কী হল?'

'এগারটায় ক্লাস আছে আমার। স্নান করে খেয়ে তৈরি হতে হতে এক ঘন্টার মতো লেগে যাবে।'

অশোক উঠে আবার বারান্দায় চলে গেল। বনানী তাড়াতাড়ি স্নান সেরে, পোশাক বদলে, নাকেমুখে গুঁজে খানিকটা পর বেরিয়ে পড়ল। যাবার আগে অশোককে বলল, 'আমি কিন্তু আগে ভাগেই খেয়ে নিলাম।'

অশোক বলল, 'বারে, আপনাকে কলেজে যেতে হবে। না খেলে কী করে চলবে?'

বনানী বলল, 'আমি চলি।' নির্মলকে বলল, 'হারুর মাকে বলে গেছি। বারটার সময় খেয়ে নিও।'

নির্মল উত্তর দিল না।

পাঁচ

অশোক আসার পর দু'দিন কেটে গেছে। এর ভেতর উল্লেখ করবার মতো বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটে নি। জলের ওপর দিকটা এমনিতে বেশ শান্ত, স্থির। কিন্তু অশোক-বনানী-নির্মল, এই ত্রিভুজের মধ্যে চোরাবানের মতো অদৃশ্য, গোপন কিছু একটা চলছিল। বাইরে থেকে ঠিক বোঝা যায় না। তবে লক্ষ করলে টের পাওয়া যায়, সারা বাড়ির আবহাওয়াটা থমথম করছে।

তৃতীয় দিন চমকপ্রদ একটা ঘটনা ঘটল। সাড়ে বারটা থেকে দুটো, তারপর পৌনে তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত একটানা ক্লাস ছিল বনানীর। পর পর দুটো ক্লাস করে সবে 'প্রফেসরস রুম'-এ পা দিয়েছে সে, বেয়ারা এসে বলল, 'এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

বনানী জানতে চাইল, 'কে?'

'নাম বলছেন না।'

'কোথায় তিনি?'

'ভিজিটরস রুম'-এ বসে আছেন।'

এ সময় কে তার কাছে আসতে পারে? আগন্তুক বেয়ারাকে নামও বলে নি। মনে খটকা নিয়ে 'ভিজিটরস রুম'-এ এল বনানী। সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভিত হয়ে গেল। অপ্রত্যাশিত চমকের মতো এক কোণে অশোক বসে আছে। বিস্ময়টা থিতিয়ে আসতে সময় লাগল। তারপর বড় বড় পা ফেলে অশোকের কাছে চলে গেল বনানী। বলল, 'কী ব্যাপার, আপনি!'

অশোক বলল, 'কেন, আসতে নেই?'

'তা বলছি না। তবে—'

বনানীর মনোভাবটা যেন বুঝতে পারল অশোক। বলল, 'আমি আসব ভাবতেই পারেন নি, কেমন?'

বনানী বলল, 'সত্যিই ভাবতে পারি নি। খুব অবাক হয়ে গেছি। আসবেন যে, আমাকে বলেন নি তো?'

'আগে থেকে বললে মজাটাই মাটি। আপনাকে সারপ্রাইজ দেব বলেই এভাবে এলাম।'

'হঠাৎ এলেন, কিছু দরকার আছে?

'আছে।'

'কী?'

'তার আগে বলুন, এখন আপনার ক্লাস আছে কিনা?'

'এক্ষুনি নেই। সেই পৌনে চারটে থেকে পর পর দুটো ক্লাস আছে।'

একটু ভেবে অশোক বলল, 'অসুবিধে না হলে লাস্ট ক্লাস দুটো আজ বাদ দিন না।'

বনানী বলল, 'স্পেশাল ক্লাস, বাদ দেওয়া ঠিক হবে না। তবে—'

'কী?'

'জরুরি ব্যাপার হলে অন্য কথা।'

'ব্যাপারটা জরুরিই।'

'কিরকম জরুরি শুনি।'

'ছুটি নিয়ে আসুন, তারপর বলব।'

দ্বিধান্বিতের মতো বনানী বলল, 'আপনি তা হলে একটু বসুন। আমি আসছি।'

অশোক মাথা নাড়ল। বনানী চলে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলল, 'আপনার জন্যে ক্লাসগুলো বাদ দিয়ে এলাম। খুব খারাপ লাগছে। যাক গে, এখন দরকারের কথাটা বলুন।'

'বলছি বলছি। হাতে এখন অনন্ত সময়। এক ফাঁকে বললেই হল। চলুন।'

একটু ইতস্তত করে বনানী অশোকের সঙ্গে কলেজ থেকে বেরিয়ে এল। রাস্তায় এসে বলল, 'এবার বলুন—'

'আপনার দেখছি তর সইছে না। একটু অপেক্ষা করুন, সব বলব। আচ্ছা এখানে নিরিবিলি জায়গা-টায়গা আছে? মানে কিছুক্ষণ বসা যায়—'

'আছে বৈকি—'

'কোথায়?'

'নদীর ধারে। বড় বড় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছ আছে। হাওয়া প্রচুর। গাছের ছায়ায় বসা যেতে পারে।'

'নদী কি অনেক দূর?'

'না, কাছেই। হেঁটে গেলে মিনিট পনের লাগতে পারে।'

অশোক বলল, 'মে মাসের এই রোদে এতটা রাস্তা হাঁটতে গেলে স্রেফ মরে যাব। রিকশা টিকশা পাওয়া যাবে?'

বনানী বলল, 'যাবে।'

'তা হলে চলুন, একটা রিকশা নিই।'

রিকশায় পাঁচ মিনিটও লাগল না, নদীর পারে পৌঁছে গেল বনানীরা। নদীটা ছোট। দু ধারে সবুজ গাছপালার ফ্রেম, মাঝখানে পালিশ-করা নীল আয়নার মতো জলের রেখা। নদীতে ঢেউ নেই, শান্ত স্বচ্ছ নিস্তরঙ্গ জল স্থির হয়ে আছে। কদাচিৎ দু একটা নৌকো বা মহাজনী ভড় চোখে পড়ে। অনেকটা দূরে বাঁকের মুখে লঞ্চঘাট। তার সোজাসুজি ঠিক ওপারে বড় মতো একটা গঞ্জ। গ্রীষ্মকালের এই দুপুরে নদীতীর একেবারে নির্জন। ঝকমকে আকাশের গায়ে ক'টা শঙ্খচিল উড়ছিল আর গাছের মাথায় মাথায় ঘুঘু ডাকছিল। একটা ঝাঁকড়া-মাথা সিশু গাছের তলায় বনানী আর অশোক পাশাপাশি বসল।

অশোক বলল, 'জায়গাটা চমৎকার।'

বনানী উত্তর দিল না।

নদীর ওধারে আঙুল বাড়িয়ে অশোক বলল, 'ওই জায়গাটার নাম কী?'

'সোনাড়ি—'

'সোনাড়ি—বেশ নাম তো। ওপারে যাওয়া যায় না?'

'যায়—' লঞ্চঘাটটা দেখিয়ে বনানী বলল, 'ওখান থেকে আধ ঘন্টা পর পর মোটর বোট ছাড়ে।'

'সোনাডি যাবেন নাকি?'

'না না, আজ নয়। আরেক দিন আপনাকে নিয়ে যাব।' বনানী বলতে লাগল, 'এখন বলুন কী জন্যে আমাকে কলেজ থেকে বার করে আনলেন—'

অশোক বলল, 'বলব বলব, একটু সবুর করুন না। এমন একটা সুন্দর জায়গায় এলাম। চারদিকের বিউটি দেখি, হাওয়া টাওয়া খাই। সেই কথাটা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।'

আরো কিছুক্ষণ এলোমেলো কথার পর হঠাৎ অশোক জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি বিবাহিত জীবনে আনহ্যাপি?'

বনানী বলল, 'আমাকে দেখলে তাই মনে হয় কি?'

সোজা বনানীর চোখের দিকে তাকিয়ে অশোক বলল, 'নিশ্চয়ই হয়। তা না হলে কি আর জিজ্ঞেস করছি?'

মুখ নামিয়ে বনানী চুপ করে থাকল। নখ দিয়ে আলতো করে মাটিতে আঁচড় কাটতে লাগল।

অশোক অনেকখানি ঝুঁকে বলল, 'নির্মল আপনাকে খুব সন্দেহ করে, না?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না বনানী। মাটিতে আঁচড় কাটতেই লাগল, কাটতেই লাগল। তার মুখ দেখে মনে হল, ভেতরে ভেতরে একটা যুদ্ধ চলছে। কিছুক্ষণ পর নিচু গলায় ধীরে ধীরে সে বলল, 'এ প্রশ্নটা না-ই বা করলেন। যে দরকারে ডেকে এনেছেন, সেটাই বলুন—'

অশোক বলল, 'আপনি সুখী কি অসুখী, নির্মল আপনাকে সন্দেহ করে কিনা, আপাতত এটুকুই আমার জানা দরকার।'

বনানী চুপ। অশোক তাড়া দেবার মতো করে বলে উঠল, 'কী হল, বলুন—'

নতমুখে বনানী কিছু বলতে চেষ্টা করল কিন্তু তার গলায় স্বর ফুটল না।

'আপনাকে বিব্রত করার ইচ্ছে নেই। আমি শুধু—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ চুপ করে গেল অশোক।

বনানী জানতে চাইল, 'আপনি শুধু কী?'

'একটা তথ্য জানতে চাইছি।'

'জেনে লাভ?'

'ধরুন কৌতূহল—মিয়ার কিউরিওসিটি—'

'এই কৌতূহলটা না হয় না-ই মেটালেন।'

খুব সহৃদয় সুরে অশোক বলল, 'আপনি বার বার এড়িয়ে যেতে চাইছেন কেন? মনের ভেতর যে কষ্ট বয়ে বেড়াচ্ছেন, আমাকে বলে হালকা হোন না।'

বনানী হাসতে চেষ্টা করল, 'আমি কষ্ট বয়ে বেড়াচ্ছি, এ কথা আপনাকে কে বলল?'

হতাশার ভান করে হাত উলটে দিল অশোক। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'খুবই হার্ড নাট, সহজে ওপরের খোলা ভাঙা যায় না।'

একটু নীরবতা। তারপর ভেতরে ভেতরে কী প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল, কে জানে। হঠাৎ বিষণ্ণ করুণ মুখ তুলে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে অবোধ বালিকার মতো বনানী বলতে লাগল, 'আমি আর পারছি না অশোকবাবু, আমি আর পারছি না।'

অশোক একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। কঠিন প্রতিজ্ঞায় এতক্ষণ প্রাণপণে নিজেকে ধরে রেখেছিল বনানী। আচমকা ধস নামার মতো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল সে, 'আমার জীবন একেবারে নষ্ট হয়ে গেল অশোকবাবু। আমার ভবিষ্যৎ নেই।'

আবছা গলায় অশোক কী বলল, বোঝা গেল না। বনানী বলে যাচ্ছে, 'নির্মলের জন্যে এত করছি, তবুও সন্তুষ্ট না। সব সময়ে শুধু সন্দেহ, সন্দেহ আর সন্দেহ।' স্রোতের মুখটা এতকাল যেন আটকে ছিল, বাধাটা হঠাৎ সরে গেছে। বনানীর ভেতরকার যত পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, দুঃখ আর যন্ত্রণা ঢলের মতো বেরিয়ে আসতে লাগল।

অশোক বলল, 'এ ক'দিনেই বুঝতে পেরেছি, সন্দেহটা নির্মলের মাথায় ফিক্সেশনের মতো আটকে গেছে।'

'ঠিকই বলেছেন।'

'তা ছাড়া আমার ধারণা—'

বনানী জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। অশোক বলতে লাগল, 'আমার ধারণা, নির্মল কতগুলো কমপ্লেক্সে ভুগছে।'

বনানী বলল, 'হ্যাঁ। ক্যানসারে পা কাটা যাবার পর ওর মধ্যে যে কতরকম জটিলতা দেখা দিয়েছে, বলে বোঝাতে পারব না। দিনের পর দিন মেন্টাল টরচার আর সহ্য করতে পারছি না। অথচ সব কিছু ঢেকে আমাকে হাসিমুখে থাকতে হচ্ছে। লোকের ধারণা আমি কত সুখী।'

অশোক সহানুভূতিসূচক মাথা নাড়াল।

বনানী আবার বলল, 'আমার বয়েস সবে আটাশ। সামনে সারা জীবন পড়ে আছে। কী করে যে দিন কাটবে কে জানে। আমি ক্লান্ত অশোকবাবু, আমি ক্লান্ত।' একটু থেমে আবার বলল, 'ক্লান্ত কি, আই এ্যাম ডেড অ্যাণ্ড ডান। আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না।'

'এত ভেঙে পড়বেন না।'

উত্তর না দিয়ে বনানী উদাস চোখে অনেক দূরে তাকিয়ে থাকল।

অশোক আবার বলল, 'একটা কাজ করলে পারতেন—'

দূরে চোখ রেখেই বনানী শুধলো, 'কী?'

'কাছাকাছি থাকলে যখন এত ঝঞ্ঝাট তখন নির্মলকে ওর মা-বাবার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারতেন।'

'তা হয় না।'

'কেন?'

'আপনি আপনার ভাইটিকে জানেন না। পাঠিয়ে দিলেও দূর থেকে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলত।'

'কিভাবে?'

'কিভাবে আর।' বনানী বলতে লাগল, 'চিঠি লিখে লিখে—'

অশোক বলল, 'চিঠি না খুললেই হত।'

মুখ ফিরিয়ে বনানী বলল, 'আমি না হয় চিঠি খুলতাম না। কিন্তু ও তো শুধু আমাকেই লিখত না। আমার নামে যা-তা রটিয়ে রাজপুরে সবার কাছে লিখত। বিশেষ করে আমার কলিগদের।'

'এ তো আপনার অনুমান।'

'না। আমি একবার ওকে ওদের বাড়ি চলে যেতে বলেছিলাম। বলেছিলাম, ওর যা খরচ টরচ লাগে, দেব। তার উত্তরে ওই সব কথা বলেছিল।'

অশোক বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইল।

বনানী আবার বলল, 'আমি মাঝে মাঝে এক্সট্রিম ব্যবস্থার কথাও ভেবেছি—'

'কী ব্যবস্থা?'

'ডিভোর্স। কিন্তু—'

'কী?'

'স্ক্যাণ্ডালের ভয়ে ওই ভাবনাটা দূর করে দিয়েছি।'

অশোক বলল, 'স্ক্যাণ্ডাল হবে কেন? আজকাল ডিভোর্স প্রচুর হচ্ছে। আমেরিকা ইওরোপের কথা ছেড়েই দিলাম। কলকাতায় এসে এরকম অনেকগুলো কেসের কথা শুনলাম।'

বনানী হাসল, 'কলকাতা আর রাজপুর এক না। মেট্রোপলিসে কে কার খবর রাখে। কিন্তু এই ছোট্ট জায়গায় জানাজানি হয়ে যাবেই। আমি যে লাইনে আছি, মানে এডুকেশনে, সেখানে একটুখানি স্ক্যাণ্ডালও ক্ষতিকর। চাকরি হয়তো যাবে না। কিন্তু কলিগরা, বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীরা এমনভাবে তাকাবে, ক্লাসে ঢুকে মুখ টিপে হাসাহাসি করবে যে নিজেই মুখ তুলতে পারব না। তখন নিজে থেকেই চাকরি ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

একটু নীরবতা। তারপর অশোক আবার বলল, 'আই ফিল ফর য়ু ম্যাডাম।'

বনানী উত্তর দিল না।

দেখতে দেখতে বিকেলের ছায়া ঘন হয়ে এল। পশ্চিম আকাশের গা বেয়ে বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি

নেমে গেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি নদীর ওপর দিয়ে ক্লান্ত ডানায় আকাশ মাপতে মাপতে দূর দূরান্তে চলে যাচ্ছে। নদীর পারটা একটু আগেও ছিল নির্জন। এখন বেশ লোকজন চোখে পড়ছে। ওরা বেড়াতে বেরিয়েছে।

হঠাৎ বনানী বলল, 'ক'টা বাজে?' বলেই নিজের হাতঘড়িটা উলটে দেখল। দেখেই চমকে ওঠার মতো করে বলল, 'সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। আমি উঠলাম।'

'এত তাড়াতাড়ি যাবেন কেন? এখনও তো সন্ধে হয় নি।'

'না না, আর বসতে পারব না। সোয়া পাঁচটায় ছুটি হবার কথা, এ খবর নির্মল জানে। আর দেরি করলে বাড়ি তোলপাড় করে ফেলবে।'

অশোক হাসল, 'নির্মলকে আপনি বেশ ভয় করেন দেখছি—'

'ভয় ওকে করি না।' বনানী বলতে লাগল, 'ভয় করি ওর ইতরামিকে, লোকে চেঁচামেচি চিৎকার শুনলে কী বলবে—'

বনানী উঠে পড়ল। অশোকও উঠল। দু'জনে পাশাপাশি রাস্তার দিকে হাঁটতে লাগল। যেতে যেতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে বনানী বলল, 'আমরা একসঙ্গে বাড়ি ফিরব না। আমি আগে যাচ্ছি, আপনি কিছুক্ষণ পরে যাবেন।'

উদ্দেশ্যটা বুঝতে না পেরে অশোক জিজ্ঞেস করল, 'আগে পরে কেন?'

'একে তো সন্দেহে বিষিয়ে আছে; তার ওপর আমাদের একসঙ্গে ফিরতে দেখলে রক্ষা রাখবে?'

'ঠিকই বলেছেন। আপনি আগে যান।'

বাড়ি ফিরে বনানী দেখতে পেল, যথারীতি বারান্দায় বসে আছে নির্মল। তীক্ষ্ণ চোখে কিছুক্ষণ তাকে দেখে নির্মল বলল, 'তোমার সঙ্গে অশোকের দেখা হয় নি?'

বনানী হকচকিয়ে গেল। তবে মনোভাবটা গোপন রেখে গম্ভীর মুখে বলল, 'আমার সঙ্গে দেখা হবে কেমন করে? কেন, উনি বাড়ি নেই?'

'না।'

'কোথায় গেছেন?'

'দুপুরবেলা বেরুল। বলে গেল, রাজপুর জায়গাটা ঘুরে দেখব। আমি ভাবলাম বুঝি ঘুরতে ঘুরতে তোমাদের কলেজে গিয়েই হাজির হয়েছে।'

জড়ানো গলায় বনানী বলল, 'তোমার যত উদ্ভট ভাবনা।' বলে আর দাঁড়াল না, সোজা বাড়ির ভেতর চলে গেল।

আরো কিছুক্ষণ পর অশোক ফিরে এল।

নির্মল বাইরের বারান্দায় তাকে থামিয়ে বলল, 'আমাদের রাজপুর শহর কেমন দেখলি?'

ভেতর-বাড়ি থেকে বনানী শুনতে পেল, অশোক বলছে, 'ওই এক রকম। বাংলাদেশের মফঃস্বল শহর যেমন হয়।'

'কোথায় কোথায় গিয়েছিলি?'

'সব জায়গার তো নাম জানি না। এলোমেলো ঘুরলাম। তবে নদীর ধারটা বেশ ভাল লাগল। ওপারেও যাওয়া যায় দেখলাম। লঞ্চঘাটা থেকে আধ ঘন্টা পর পর মোটর-বোট ছাড়ে।'

'হ্যাঁ। ওপারটার নাম সোনাডি।'

'নাম শুনেছি।'

'বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির দিন ওখানে বিরাট মেলা হয়।'

'তাই নাকি? এটা তো বৈশাখ মাস। সংক্রান্তি কবে রে?'

'দেরি নেই। সাত আট দিন পরেই।'

'তা হলে তো মেলাটা দেখে যেতে হয়।'

'যাস।'

একটু ভেবে নির্মল আবার বলল, 'শুধু নদীর পার দেখেই মুগ্ধ হলি? কলেজ বাড়িটা যদি দেখতিস—'

ভেতরে দম বন্ধ করে রয়েছে বনানী। কোন কুটিল অন্ধকার পথে নির্মল প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিতে

চাইছে, সে বুঝতে পারল।

অশোক বলল, 'কলেজ বিল্ডিংটা খুব সুন্দর বুঝি?'

'বিউটিফুল।'

'তবে তো বড্ড মিস করে ফেলেছি।'

'আশ্চর্য!'

'কী?'

অশোকের চোখের ভেতর তাকিয়ে নির্মল বলল, 'সারা রাজপুর চষে বেড়ালি অথচ কলেজটা তোর চোখে পড়ল না?'

সরল ভালমানুষের গলায় অশোক বলল, 'কলেজটা কোথায়?'

'শহরের ঠিক মধ্যিখানে।'

'কি জানি ভাই, আমি লক্ষ করি নি।'

নির্মল আর কিছু বলল না। বনানীর বুকের ভেতর থেকে আবদ্ধ বাতাস ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল।

ছয়

সেই শুরু।

তারপর থেকে রোজই দুপুরবেলা বনানীর কলেজে আসতে লাগল অশোক। সেখান থেকে বনানীকে বার করে নিয়ে কোনোদিন চলে যেত লঞ্চঘাটার দিকে, কোনো কোনো দিন ফুটবল খেলার মাঠে, কোনোদিন পরিত্যক্ত ক্যাথলিক গীর্জার শান্ত পরিবেশে।

প্রথম প্রথম অস্বস্তি বোধ করত বনানী। তারপর ধীরে ধীরে কবে থেকে যে কলেজে গিয়ে অশোকের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতে শুরু করেছিল, নিজেই জানে না। কবে থেকে তারা পরস্পরকে 'তুমি' বলতে আরম্ভ করেছিল, মনে নেই।

সহানুভূতির সুরে অশোক বলে, 'তোমার মতো ব্রাইট ইয়ং গার্ল এভাবে জীবন নষ্ট করে ফেলবে, আমি ভাবতেই পারি না।'

উদ্দেশ্যহীন হতাশ মানুষের সুরে বনানী বলে, 'এ ছাড়া আমি আর কী করতে পারি?'

'নতুন করে লাইফ স্টার্ট করতে পার।'

'বাট হাউ?'

'সেটাই বুঝতে পারছি না। আমাকে একটু ভাবতে দাও। দেখি কোনো উপায় বার করতে পারি কিনা। সমস্ত ব্যাপারটা এত জটিল!'

বনানী চুপ করে থাকে।

অশোক আবার বলে, 'নির্মল আমার মাসতুতো ভাই। না হলে কবেই একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত।'

'কী ব্যবস্থা?'

অশোক উত্তর দেয় না।

রোজই এক ধরনের কথা হয়। বনানীর গ্লানিকর দুঃসহ জীবন সম্পর্কে অশোকের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। দুপুরটা এক এক দিন এক এক জায়গায় কাটিয়ে কলেজ ছুটির সময় কিছু আগে পরে দু'জনে বাড়ি ফিরে আসে।

প্রথম প্রথম দু-একদিন ব্যাপারটা ধরতে পারেনি নির্মল। তার পরেই তার মন ধোঁয়াটে হয়ে উঠতে শুরু করেছে। রোজই দুপুরবেলা অশোক বলে, জায়গাটা ঘুরে দেখতে যাচ্ছে। বলেই বেরিয়ে যায়। রাজপুর কি লণ্ডন না নিউইয়র্ক, রোম না প্যারিস, যে তার রাস্তায় রাস্তায় এত এত দর্শনীয় জিনিস ছড়িয়ে আছে, দিনের পর দিন দেখেও ফুরোয় না? একটা পা খোয়া যাবার পর নির্মলের ইন্দ্রিয়গুলো ভয়ানক রকমের তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। তার জটিল মনের অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে কেউ যেন দিনরাত বলতে থাকে, অশোক আর বনানী বাইরে বাইরে দেখা করে। সে অনুভব করছিল, ভেতরে ভেতরে বারুদ জমে যেন বিস্ফোরণের মুখে এসে গেছে।

একদিন বনানী কলেজ থেকে ফিরে এলে নির্মল তাকে বারান্দায় দাঁড় করাল। বলল, 'কী ব্যাপার?'
বনানী জিজ্ঞেস করল, 'কিসের?'
'কিসের? কিছুই জানো না! নেকী—'
'আজেবাজে কথা বলবে না।'
'আজেবাজে! বল রোজ দুপুরবেলা অশোক কোথায় যায়?'
'কোথায় যায় আমি জানব কী করে?'
'তোমাদের কলেজে যায়।'
বনানী হকচকিয়ে গেল। ভীত সুরে বলল, 'মিথ্যে কথা, কে বলেছে?'
নির্মল বলল, 'অনেকে বলেছে।'
'অনেকে বলতে?'
'আমি তাদের নাম ঠিকানা মুখস্থ করে রেখেছি নাকি?'
বনানী বুঝতে পারল, নির্মলকে কেউ কিছু বলে নি। সে নিজে থেকেই টোকা দিয়ে বাজিয়ে দেখছে। মনে মনে সাহস পেল বনানী। বলল, 'তোমার মতো মানুষ আমি জীবনে কখনও দেখিনি।'
কর্কশ গলায় নির্মল বলল, 'কিরকম?'
'অকারণে মানুষকে নির্যাতন করে কী সুখ যে পাও!'
'অকারণে?'
'নয়তো কী?'
নির্মল আর কিছু বলল না। বনানীকে জব্দ করা গেল না দেখে মনে মনে গুম হয়ে রইল। তার চোখের মণিদুটো অনেকক্ষণ আগুনের ফুলকি হয়ে থাকল।
নির্মলের মনের ভেতর সেই যে সন্দেহের ছায়া পড়েছিল সেটা দ্রুত ফুলে ফেঁপে বিশাল বিপুল হয়ে চারদিক ছেয়ে ফেলল যেন। সন্দেহটা নিয়ে চুপচাপ বসে থাকল না সে। একদিন হারুর মাকে গোপনে অশোকের পেছনে লাগিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা জেনে ফেলল। তারপর বনানী ফিরে এলে উন্মাদের মত চেঁচিয়ে, নিজের চুল ছিঁড়ে, অশ্লীল গালাগাল দিয়ে বাড়ি তোলপাড় করে ফেলল।
বনানী প্রথমটা প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল। কিন্তু যখন দেখল, কলেজ ছুটি নিয়ে আজ অশোকের সঙ্গে কোথায় কোথায় ঘুরেছে সব ঠিকঠাক বলে দিচ্ছে নির্মল তখন বুঝল ধরা পড়ে গেছে। মাথা নিচু করে সমস্ত অপমান সহ্য করে গেল বনানী। আরো কিছুক্ষণ পর অশোক ফিরলে আড়ালে ডেকে নিয়ে তাকে বলল, 'আমি আর পারছি না অশোক—'
অশোক বলল, 'কী হয়েছে?'
সব ঘটনা জানিয়ে বনানী বলল, 'এখানে এক মুহূর্তেও আর থাকতে ইচ্ছা করছে না। আমাকে কোথাও নিয়ে যেতে পার?'

সাত

অশোক আর বনানীর সেই ব্যাপারটা ধরা পড়বার পর এ বাড়ির আবহাওয়া দুঃসহ হয়ে উঠেছে। কেউ কারো সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না। সকালের দিকটায় হয়ে ওঠে না; তখন একলাই খেয়ে কলেজে চলে যায় বনানী। রাত্রে তিনজন একসঙ্গে খেতে বসে বটে, কিন্তু সবাই চুপচাপ।
অদ্ভুত স্তব্ধতার মধ্যে মাঝে মাঝে নির্মলই ক্ষিপ্ত সুরে যা একটু আধটু চেঁচায়। তার রাগ, তার কাতরতা, তার যন্ত্রণা এবং ঈর্ষা-হিংসা সব একাকার হয়ে বুকের ভেতর এমনভাবে কুণ্ডলী পাকাতে থাকে যে চিৎকার না করে পারে না সে। মনের ফুটন্ত অসন্তোষ এভাবে খানিকটা বার করে দিয়ে নির্মল কিছুটা আরাম বোধ করে।
দিন তিনেক এইরকম কাটবার পর হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা একজন সহকর্মীর ফেয়ারওয়েল উপলক্ষে কলেজ ছুটি হয়ে গেল বনানীর। বাড়ি ফিরে সে অবাক। অন্য দিন এ সময়টা পড়ে পড়ে ঘুমোয় নির্মল, আজ বারান্দায় বসে আছে। অশোক তার ঘরে। সেদিনের পর থেকে অশোক দুপুরে বেরিয়ে আর বনানীর কলেজে যায় নি।
বাইরের বারান্দায় উঠে নিঃশব্দে ভেতরে চলে যাচ্ছিল বনানী। খুব কোমল গলায় নির্মল ডাকল,

'শোন, এদিকে এস—'

প্রথমটা যেন বিশ্বাস করতে পারল না বনানী। নির্মলের এমন মৃদু সহৃদয় কণ্ঠস্বর কতকাল শোনে নি সে। বিস্ময়ের ঘোরে পা ফেলে ফেলে সামনে এসে দাঁড়াল বনানী।

নির্মল বলল, 'দাড়িয়ে কেন, ওই মোড়াটায় বসো না—'

মোড়ায় বসে পড়ল বনানী। তারপর বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে নির্মলকে দেখতে লাগল।

নির্মল বলল, 'আজ এত তাড়াতাড়ি চলে এলে যে?'

'একজন কলিগ রিটায়ার করলেন, তাঁর ফেয়ারওয়েল হল। তাই—'

কে রিটায়ার করলেন, ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানে কী কী হল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিল নির্মল। তারপর বলল, 'আজ বাংলা মাসের ক'তারিখ বলতে পার?'

চট করে মনে পড়ল না। বনানী বলল, 'কি জানি—'

'যতই প্রফেসরি কর, বাংলা দেশের মেয়েই। ফরেনার নও। বাংলা সাল তারিখের খোঁজ রাখ না?'

বনানী চুপ।

নির্মল বলল, 'আজ বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি।'

তাই তো। বনানীর মনে পড়ে গেল। নির্মল আবার বলল, 'আজ নদীর ওপারে সোনাডিতে মেলা হচ্ছে। আমার পা কাটা যাবার পর কোথাও তো বেরুতে পার না। হয় কলেজ, না হয় বাড়ি। আজ এক কাজ কর না—'

'কী?'

'সোনাডির মেলা ঘুরে এস। অশোককে নিয়ে যাও। ও বেচারি ক'দিন ধরে বাড়িতে পড়ে আছে। মেলায় গেলে ওরও ভাল লাগবে।'

মেলায় পাঠাবার ব্যাপারটা যেমন বিস্ময়কর তেমনই রহস্যময়। বনানী কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই নির্মল গলা তুলে ডাকতে লাগল, 'অশোক—অশোক—'

অশোক ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'কী বলছিস?' বনানীকে এখানে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেল সে।

নির্মল বলল, 'বনানীর সঙ্গে সোনাডির মেলায় যা।'

'মেলায় যাব!'

'হ্যাঁ রে, হ্যাঁ—'

'হঠাৎ?'

'হঠাৎ ফঠাৎ না। তোর মতো আমেরিকা ফেরতকে কী আর দেখাব? এখানে আমাদের সোনাডির মেলাই এইটথ ওয়াণ্ডার। বছরের এই সময়টা যারা রাজপুরে আসে তাদের ওই মেলাটা দেখাই।'

বনানীর মতো অশোকও কম বিস্মিত হয়নি। সে বলল, 'আমাদের তো যেতে বলছিস। তুই যাবি না?'

'আমার মতো খোঁড়া মানুষ মেলায় গিয়ে কী করবে? এক পা ল্যাং ল্যাং করে কতটাই বা ঘুরতে পারব? মাঝখানে থেকে তোদের আনন্দটাই মাটি।'

একরকম জোর করেই বনানীদের সোনাডির মেলায় পাঠিয়ে দিল নির্মল।

মেলায় যেতে যেতে বনানী বলল, 'লোকটা হঠাৎ এত সদয় হয়ে গেল; আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না।' নির্মলের এই আকস্মিক পরিবর্তন তাকে সংশয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

অশোক বলল, 'হয়তো সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে।'

'কি জানি—'

তারপর নদী পেরিয়ে যেতে যেতে নির্মলের কথা আর মনে রইল না।

সোনাডির মেলা সত্যিই বিরাট।

আধ মাইলের মতো জায়গা জুড়ে কত রকমের দোকান যে বসেছে, লেখাজোখা নেই। মনিহারি দোকান, তেলে ভাজার দোকান, জামাকাপড়ের দোকান, মাটির পুতুল আলুর পুতুল কাঠের পুতুলের দোকান, প্ল্যাস্টিকের জিনিসপত্রের দোকান, কাচের চুড়ির দোকান। এছাড়া লোহা আর কাঠের রকমারি

দরকারি জিনিস নিয়ে এসে বসেছে আদিবাসীরা। যেদিকে যতদূর তাকানো যায়, শুধু দোকান আর দোকান। মানুষ আর মানুষ। ফাঁকে ফাঁকে বালাখেলার আসর বসেছে, দুটো সার্কাস পার্টি তাঁবু গেড়ে মাইকে অনবরত খদ্দের ডাকছে, নাগরদোলা ঘুরছে অসংখ্য। সমস্ত মেলাটা মানুষের চলাফেরায়, হাঁকে-ডাকে গমগম করছে।

মেলায় ঘুরতে ঘুরতে বয়স যেন কমে যেতে লাগল বনানীর। পদমর্যাদা ভুলে কখন সে চঞ্চলা কিশোরী হয়ে উঠেছে, কে জানে। এই শালপাতায় তেলেভাজা খাচ্ছে সে, এই ছুটছে, এই অশোককে নিয়ে নাগরদোলায় বনবন ঘুরছে, এই ছুটে গিয়ে সার্কাসের তাঁবুতে ঢুকছে, এই হয়তো গোছা গোছা রঙিন কাচের চুড়ি কিনে পরছে। তার বুকের ভেতর যে ইচ্ছগুলো এতকাল গুহায়িত হয়ে ছিল, হঠাৎ যেন একটা দমকা বাতাসে বেরিয়ে আসার পথ পেয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে গেল। দোকানে দোকানে গ্যাসের বাতি জ্বলে উঠল। সন্ধেটা যদি কালো জামদানি শাড়ি হয়, গ্যাসের আলোগুলো যেন তার গায়ে জরির চুমকি। সন্ধের কিছুক্ষণ পর দিগন্তের তলা থেকে রুপোর থালার মতো চাঁদ উঠে এল।

দুপুরের খানিক পর তারা মেলায় এসেছিল। তারপর থেকে শুধু ঘুরছে, ঘুরছে, ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে একসময় বনানীরা মেলার এক কোণে ফাঁকা জায়গায় এসে বসল। সোনাডির এই মেলাটার গা ঘেঁষে একটা রেল স্টেশন। স্টেশনটা দেখিয়ে অশোক বলল, 'ওখান থেকে কোথায় যাওয়া যায়?'

বনানী বলল, 'দক্ষিণে গেলে কলকাতা, উত্তরে ছোটনাগপুর।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর বনানী আবার বলল, 'আজকের এই দিনটার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে।'

আবছা গলায় অশোক কী বলল, বোঝা গেল না।

বনানী আবার বলল, 'কতকাল পর যে এত আনন্দ করলাম। মনে হচ্ছে, আমি যেন নতুন জীবন পেয়েছি। বাড়ি আর ফিরতে ইচ্ছে করছে না।'

অশোক আরো কাছে এগিয়ে এল। খানিক ঝুঁকে চকচকে চোখে তাকিয়ে গাঢ় গলায় ফিসফিস করল, 'না-ই বা আর ফিরলে—'

'কোথায় যাব তা হলে?'

'সেদিন বলেছিলে না, কোথাও চলে যাবে।'

'বলেছিলাম।'

'চল আমার সঙ্গে—'

'কিন্তু—'

'কোনো কিন্তু না। তোমার নতুন করে বাঁচা দরকার।'

বনানী আর বাধা দিতে পারল না। ক্লান্ত শরীর, রুপোর থালার মতো চাঁদ, উজ্জ্বল জ্যোৎস্না, অপার আনন্দ, চারপাশের মেলা এবং সব কিছুর ওপর অশোকের গাঢ় গভীর কণ্ঠস্বর—সব মিলেমিশে তার অস্তিত্বের ভেতর যেন ভাঙচুর শুরু হয়ে গেল। কখন অশোকের পিছু পিছু সে স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করল, নিজেই জানে না।

মেলার ভেতর দিয়েই তারা যাচ্ছিল। যেতে যেতে হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বনানী। একটা বুড়ো আদিবাসী চাকা-লাগানো বাক্সের ভেতর হাত-পা-কাটা এক বুড়িকে বসিয়ে সেটা ঠেলে ঠেলে মেলা দেখাচ্ছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখল বনানী। তারপর আচমকা বুড়ো আদিবাসীটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ বুড়ি কে?'

বুড়ো বলল, 'আমার জেননা—'

'হাত-পা কাটল কী করে?'

'শেরের সাথে লড়াই করেছিল। শেরও ওকে ছাড়েনি, জখম করে ফেলেছিল। ডাগদর সাব (ডাক্তার সাহেব) হাত-পা বাদ দিয়ে দিয়েছে। না হলে বাঁচত না।'

'কদ্দিন হল হাত-পা কাটা গেছে?'

'তিশ সাল।'

'তিরিশ বছর!'

'হ্যাঁ।' বুড়ো সরল মুখে হাসল, 'কোথায় ফেলব ওকে? ওই বাক্স গাড়িটা করে নিয়েছি। যেখানে যাই সেখানেই ওকে সঙ্গে নিই। যত দিন বেঁচে—'

বাকিটা আর শুনতে পেল না বনানী। বিদ্যুৎচমকের মতো নির্মলের মুখটা তার মনে পড়ে গেল। আর মনে হল, নির্মলের বদলে যদি তার একটা পা কাটা যেত? সে আর ভাবতে পারছিল না। হৃৎপিণ্ডে কী এক নিদারুণ প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল; হঠাৎ রুদ্ধশ্বাসে উন্মাদের মতো লঞ্চঘাটার দিকে ছুটতে লাগল বনানী।

পেছন থেকে অশোক ডাকল, 'বনানী—'

বনানী ফিরেও তাকাল না।

আট

বাড়ির কাছে এসে বনানী দেখল, সামনের রাস্তায় একটা সাইকেল রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। কেউ তাদের বাড়ি এসেছে কি?

বনানী এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। তারপর ছুটে বাড়িতে ঢুকল। ঢুকেই স্তম্ভিত। নির্মল শোবার ঘরে তালা দিচ্ছে। একটা ছোকরা, খুব সম্ভব রিকশাওয়ালাই হবে, মাথায় ছোট স্যুটকেস আর বিছানা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়াল নির্মল। বলল, 'এ কী, তুমি!' সে যেন অবাকই হয়ে গেছে।

বনানী বলল, 'হ্যাঁ, আমি—'

'অশোক কোথায়?'

'জানি না। কিন্তু তুমি—তুমি কোথায় চলেছ?'

'যেদিকে দু চোখ যায়।'

বনানীর বুকের ভেতরটা ভূকম্পনের মতো সাঙ্ঘাতিক কোনো বিপর্যয়ে দুলতে লাগল, 'তার মানে?'

জামার পকেট হাতড়ে একটা খাম বার করল নির্মল। বনানীর হাতে দিয়ে বলল, 'এটা পড়।'

খাম খুলতেই যা বেরিয়ে পড়ল তা দেখে মাথার ভেতরটা ঝিম ঝিম করতে থাকে বনানীর। ক'দিন আগে নির্মলকে কলকাতায় নিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে এসেছিল; ওটা তারই রিপোর্ট। লেখা আছে, ডান পায়ের বাকি অংশটা কোমর পর্যন্ত কেটে বাদ দিতে হবে।

শিথিল ভয়ার্ত সুরে বনানী বলল, 'এ রিপোর্ট কখন এল?'

'আজ দুপুরে।'

'কই, আমাকে দেখাও নি তো!'

উদাসীন গলায় নির্মল বলল, 'কী হবে দেখিয়ে?' একটু থেমে আবার বলল 'তুমি চলে এলে যে! আমি তো—আমি তো—'

'তুমি কী?' বনানী উৎকণ্ঠিতের মতো তাকাল।

'আমি তোমাকে মুক্তি দিতেই চেয়েছিলাম। কোমর পর্যন্ত আবার কাটতে চাইছে। হয়তো এবার আর বাঁচব না, বাঁচলেও সে বেঁচে থাকায় কী লাভ? হয়তো তোমার ওপর আরো নিষ্ঠুর হয়ে উঠব—' অসংলগ্নভাবে নির্মল বলে যেতে লাগল, 'অসুখ হবার পর থেকে কম নির্যাতন তো করিনি। কিন্তু কিন্তু তুমি ফিরে এলে কেন?'

বনানী আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। তার সমস্ত শরীরের জোড় যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ হুড়মুড় করে নির্মলের পায়ের কাছে ভেঙে পড়ল সে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলতে লাগল, 'ক্ষমা কর, ক্ষমা কর—'

অনেকক্ষণ পর তার মাথায় একটা হাত রেখে খুব আস্তে করে নির্মল বলল, 'কেঁদো না—ওঠ।'

নিজের সঙ্গে যুদ্ধ

আদিলপুর থেকে মণিমোহন যখন কলকাতার এই ট্রেনটায় উঠেছিলেন, কামরাগুলো মোটামুটি ফাঁকা ছিল। জানালার পাশে পছন্দমতো একটা সিটও পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর স্বভাবে অদ্ভুত একটা ছেলেমানুষি আছে। ট্রেনে উঠে জানালার ধারটি না পেলে সারাক্ষণ মনটা খুঁতখুঁত করতে থাকে।

আদিলপুরের পর চারটে স্টেশন পেরুতে না পেরুতেই ট্রেনের চেহারা পুরোপুরি পালটে গেছে। কোনো কমপার্টমেন্টে আর ছুঁচ গলাবার মতো ফাঁক নেই। আজ বুধবার, ব্যস্ত কাজের দিন। এক একটা স্টেশনে গাড়ি থামে আর ঝাঁকে ঝাঁকে প্যাসেঞ্জার হাতের সামনে যে কামরা পায়, হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে।

আদিলপুর থেকে কলকাতার দূরত্ব মাত্র বাহাত্তর কিলোমিটার। ট্রেন এক ঘন্টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে সেখানে পৌঁছে দেয়। ঘুরপথে বাসেও যাওয়া যায় কিন্তু সময় লাগে অনেক বেশি—প্রায় ঘন্টা তিনেকের মতো। তা ছাড়া এদিকের রাস্তাঘাট এক কথায় জঘন্য—ভাঙাচোরা, খানাখন্দে বোঝাই। একটানা তিনটি ঘন্টা উদ্দাম ঝাঁকুনি খাওয়ার পর মনে হয়, শরীরের হাড়মাংস তালগোল পাকিয়ে গেছে। তাই ট্রেনটাই সবার পছন্দ। নিরুপায় না হলে পারতপক্ষে কেউ বাস রাস্তার দিকে পা বাড়ায় না।

সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত এ লাইনের প্রতিটি আপ বা ডাউন ট্রেনে গাদাগাদি ভিড় লেগে থাকে। বেশির ভাগই ডেইলি প্যাসেঞ্জার—সরকারি বা কমর্শিয়াল ফার্মের কর্মচারি, কলেজ আর ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রী, ফড়ে, দালাল, ছোট ব্যবসাদার ইত্যাদি ছাড়াও থাকে দুনিয়ার তাবত হকার।

মণিমোহন আদিলপুর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। ক'বছর হল রিটায়ার করেছেন। আদিলপুরে চল্লিশ বছর আগে কলেজ ছিল না। শহরের মাঝখানে পৈতৃক দশ বিঘে জমি এজন্যে তো তিনি দিয়েছেনই, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী, সেক্রেটারি থেকে বড় বড় অফিসারদের ধরে সম্পূর্ণ একার চেষ্টায় কলেজটা গড়ে তুলেছেন। এই কারণে আদিলপুর থেকে কতবার যে তাঁকে কলকাতায় ছোটাছুটি করতে হয়েছে তার হিসেব নেই। শুরু থেকেই তিনি ওটার প্রিন্সিপ্যাল। পড়াশোনা এবং ছাত্রছাত্রী ছাড়া কিছু বোঝেন না। আদিলপুরের তিনি সবচেয়ে বিখ্যাত, সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় মানুষ।

দু মাস আগে মণিমোহন বাহাত্তর পেরিয়ে তিয়াত্তরে পা দিয়েছেন। বয়স সেভাবে তাঁর ওপর কামড় বসাতে পারেনি। মেরুদণ্ড এখনও টান টান, পিঠ নুয়ে পড়েনি। তিয়াত্তরে অনেকেরই চামড়া কুঁচকে, মাংস ঝরে একটা শীর্ণ কাঠামো দাঁড়িয়ে থাকে। সেদিক থেকে বলা যায়, তাঁর স্বাস্থ্য মোটামুটি অটুটই রয়েছে। দু পাটির মাত্র পাঁচটা দাঁত বাঁধানো, বাকিগুলো একেবারে নিজস্ব। বয়সের তুলনায় ত্বকের কুঞ্চন অনেক কম। লম্বাটে মুখ, গাল ভেঙে হনুর হাড় খানিকটা বেরিয়ে পড়েছে। চোখের নজর বেশ ভালই। দূরের জিনিস দেখতে অসুবিধে হয় না, বইটই পড়ার সময় অবশ্য চশমা লাগে। হাত-পায়ের মোটা মোটা হাড়ের দিকে তাকালে টের পাওয়া যায়, এই তিয়াত্তরেও তিনি যথেষ্ট শক্তির অধিকারী। চুল উঠে উঠে পাতলা হয়ে গেছে, অবশিষ্ট যা আছে কাঁচায়-পাকায় মেশানো।

মণিমোহনের পরনে মোটা সুতোর ধুতি এবং পাঞ্জাবি, তার ওপর শীতকাল বলে হাফ-হাতা উলের সোয়েটার আর পশমি চাদর। গলায় কমফোর্টার জড়ানো। যে সিটটায় বসে আছেন সেটার তলায় একটা মাঝারি চামড়ার স্যুটকেস।

মণিমোহন অন্যমনস্কর মতো কামরার ভেতরটা একবার দেখে নিলেন। ঠাসাঠাসি ভিড়ের চিরপরিচিত দৃশ্য। চারদিকে নানা বয়সের মানুষ, তবে তাদের মধ্যে তরুণ তরুণী আর মাঝবয়সীদের সংখ্যাই বেশি। সবার গায়েই গরম পোশাক।

হঠাৎ মণিমোহনের নজর গেল সেই মেয়েটির দিকে। তাঁর সামনের সিটটায় সে বসে আছে। সুশ্রী, ফর্সা। বয়স তেইশ চব্বিশের বেশি হবে না। পরনে সালোয়ার কামিজের ওপর মেরুন রঙের কার্ডিগান। অজস্র চুল এক বেণী করে পিঠের ওপর ফেলে রেখেছে। দুই ভুরুর মাঝখানে গোলাপি টিপ।

আদিলপুরে উঠেই মেয়েটিকে দেখতে পেয়েছিলেন মণিমোহন। সে আরো আগের কোনো স্টেশন থেকে উঠেছে।

ট্রেনে মাঝে মাঝেই কলকাতায় যান মণিমোহন। এ অঞ্চলের অনেকেই তাঁর মুখচেনা। এই মেয়েটিকে

আগে কখনও দেখেছেন কিনা, দেখলেও কবে কোথায়, মনে করতে পারেননি। প্রথমেই লক্ষ করেছিলেন মেয়েটার চোখেমুখে উৎকণ্ঠার ছাপ। এবার দেখলেন তার সঙ্গে মিশেছে ভয়। উদ্বেগের কারণটা কী হতে পারে, একবার ভাবলেন জিজ্ঞেস করবেন। পরক্ষণে খেয়াল হল, উপযাচক হয়ে জানতে চাইলে মেয়েটা যদি কিছু মনে করে? এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের অনেক সময় বুঝতে পারেন না তিনি।

ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে জানালার বাইরে তাকালেন মণিমোহন। সেই দিগন্ত পর্যন্ত যতদূর চোখ যায়, শুধুই চাষের জমি। অঘ্রানে ধান উঠে যাবার পর চারদিক এখন একেবারে ফাঁকা। মাঝে মধ্যে কোথাও তালগাছের জটলা, কোথাও বা লাইন দিয়ে খেজুর গাছ। আলের ওপর এক পা তুলে আরেক পায়ে ভর দিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে আছে অগুনতি বক।

ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে টেলিগ্রাফের তার। দিগন্ত পাড়ি দিয়ে উধাও হয়ে গেছে হাই-টেনশন ইলেকট্রিকের লাইন। খানিক আগেও আকাশের দূর প্রান্তে মিহি সিল্কের মতো হালকা কুয়াশা আটকে ছিল। এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। শীতের নরম মায়াবী রোদে ঝলমল করছে চারদিক। সব মিলিয়ে অলৌকিক এক ল্যাণ্ডস্কেপ।

অঘ্রানের গোড়া থেকে কনকনে উত্তুরে হাওয়া এই অঞ্চলে নিষ্ঠুর অভিযানকারীর মতো ঘোড়া ছোটাতে শুরু করেছিল। এখন, মাঘের এই মাঝামাঝি তার হানাদারি, তার দাপট আরো বেড়েছে। শরীরের খোলা জায়গাগুলোতে সেটা চাবুকের মতো আছড়ে পড়ছে।

জানালার বাইরের দৃশ্যাবলী মণিমোহনের বহুকালের চেনা। সেই জন্মের পর থেকে দেখে আসছেন। সেদিকে চোখ ছিল ঠিকই, কিন্তু শূন্য ঘরে পাখিদের উড়ে আসার মতো তাঁর মনে নানা ভাবনার আনাগোনা চলছে। দিন পনের পর আদিলপুরে তাঁদের পূর্বপুরুষের বাড়ি ছেড়ে তিনি বাঙ্গালোরে বড় ছেলে মৃন্ময়ের কাছে চলে যাবেন। এখানে আর কোনোদিনই ফেরা হবে না। সেজন্য মন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। ঠিক হয়েছে আদিলপুর কলেজের লেকচারার বিজন তাঁকে বাঙ্গালোরে পৌঁছে দিয়ে আসবে। এদিকে আদিলপুরের লোকজন ঠিক করেছে যাবার আগে তাঁকে বিশাল আকারে জনসংবর্ধনা দেবে। সেজন্য শহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে শুধু একটা কমিটিই তৈরি হয়নি, স্থানীয় 'বলাকা' সিনেমা হলটা একদিনের জন্য ভাড়াও নেওয়া হয়েছে। আমন্ত্রিতদের জন্য কার্ড ছাপতে চলে গেছে। সংবর্ধনা সভায় বিভিন্ন বক্তা কী ধরনের ভাষণ দেবে তিনি তা এখনই আন্দাজ করতে পারছেন। মুহুর্মুহু হাততালির মধ্যে সেদিন তাঁর গুণাবলী, মহত্ত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে বাছা বাছা বিশেষণের ফোয়ারা ছুটবে।

মণিমোহনের ক'জন প্রিয় বন্ধু আর ইংরেজ আমলের চার পাঁচ জন প্রাক্তন বিপ্লবী বেহালায় ওল্ড এজ হোম করে কয়েক বছর ধরে আছেন। ওই বৃদ্ধাবাসে প্রায়ই যান তিনি। আজও সেখানেই যাচ্ছেন। বাঙ্গালোরে গেলে বন্ধুদের সঙ্গে আর হয়তো এ জীবনে দেখা হবে না। মণিমোহনের ইচ্ছা ওঁদের কাছে দু'তিনটে দিন কাটিয়ে আসবেন। সেজন্য স্যুটকেসে দরকারমতো ধুতি পাঞ্জাবি ব্রাশ পেস্ট ইত্যাদি নিয়ে এসেছেন।

ট্রেনের স্পিড কমে আসছিল। কাছাকাছি একটা স্টেশন দেখা যাচ্ছে। প্ল্যাটফর্মে প্রচুর প্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়ে আছে।

তিরিশ সেকেন্ডও লাগল না, ট্রেন স্টেশনে এসে থামে। সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে হই চই আর ভয়ার্ত মানুষের উর্ধ্বশ্বাস ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। হঠাৎ কী এমন ঘটল, বোঝা যাচ্ছে না। রড-লাগানো জানালার ফাঁক দিয়ে যতটা সম্ভব মুখ বাড়িয়ে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকেন মণিমোহন।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। ট্রেন ড্রাইভারের কেবিনটা যেখানে, সেদিক থেকে পাঁচ-ছ'টা যুবক, পরনে জিনস, হাতে কারো রিভলবার, কারো লম্বা নলওলা বন্দুক, দু'জনের গালে ঘন দাড়ি, বাকিদের পরিষ্কার কামানো মুখ, প্রত্যেকের চোখের দৃষ্টি হিংস্র—চিতাবাঘের মতো ক্ষিপ্র গতিতে ট্রেনের সবগুলো কামরার জানালায় জানালায় উঁকি মারতে মারতে এগিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই কাউকে খুঁজছে। আর এই বন্দুকবাজদের দেখেই প্ল্যাটফর্মের প্যাসেঞ্জাররা সে যেদিকে পারছে পালিয়ে যাচ্ছে।

যুবকগুলোকে দেখামাত্র টের পাওয়া যায়, খুন করাটা ওদের কাছে জলভাতের মতো ব্যাপার। এটুকু আন্দাজ করা যাচ্ছে যাকে ওরা খুঁজে বার করবে তার মৃত্যু অবধারিত।

আচমকা কামরার ভেতর চাপা, সন্ত্রস্ত একটা চিৎকার শুনতে পেলেন মণিমোহন। চমকে মুখ

ফেরাতেই সেই মেয়েটাকে দেখা গেল। উল্টোদিকের সিট থেকে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার সমস্ত শরীর ভীষণ কাঁপছিল ; আতঙ্কে দুই চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

মেয়েটা বলল, 'স্যার, আপনি আমাকে বাঁচান।' সারা শরীরের মতো তার গলার স্বরও তীব্র ভয়ে কাঁপছে।

মণিমোহন বুঝতে পারলেন, মেয়েটা তাকে চেনে। কিন্তু তার প্রচণ্ড ভীতির কারণটা অনুমান করা যাচ্ছে না। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে তোমার? অত কাঁপছ কেন?'

প্ল্যাটফর্মে সেই বন্দুকবাজদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে মেয়েটা আগের স্বরেই বলল, 'ওই—ওরা আমাকে নবীগঞ্জ থেকে তাড়া করে আসছে। ধরতে পারলে সর্বনাশ করে ফেলবে।'

আদিলপুরের ওধারে দুটো স্টেশন পেরুলে নবীগঞ্জ। সেখান থেকে বাংলাদেশের বর্ডার মাত্র তিরিশ কিলোমিটার।

মণিমোহন জানেন সীমান্তের কাছাকাছি এই অঞ্চলটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। আইন-শৃঙ্খলা বলতে কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই।

খুনখারাপি, বোমাবাজি, ধর্ষণ, বন্দুকের লড়াই লেগেই আছে। তাই বলে বেলা ন'টা সাড়ে ন'টায় অগুনতি ট্রেনযাত্রীর সামনে সশস্ত্র ঘাতকের দল দাপিয়ে বেড়াবে, এটা ভাবা যায় না। একটি নিরীহ তরুণীকে এভাবে সেই নবীগঞ্জ থেকে ধাওয়া করে নিয়ে আসার সাহস তারা কিভাবে পায় কে জানে।

মণিমোহন কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই প্ল্যাটফর্ম থেকে এক বন্দুকবাজ মেয়েটিকে দেখতে পায়। খোঁজাখুঁজির ফল পাওয়া গেছে, এমন একটা ভঙ্গি করে সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আরে, মুরগিটা এই কামরায় লুকিয়ে আছে। উঠে পড়—'

মেয়েটা কিছু বলতে চেষ্টা করল কিন্তু তার গলায় স্বর ফুটল না ; ঠোঁট দুটো থর থর করতে লাগল।

ওদিকে বন্দুকবাজরা দুড়দাড় করে কামরায় উঠে উগ্র, মারমুখী চেহারায় হুকুমের সুরে প্যাসেঞ্জারদের বলতে লাগল, 'হঠ—হঠ—'

চাপ-বাঁধা ভিড়টা সরে সরে নিঃশব্দে পথ করে দিল। বন্দুকবাজরা লম্বা লম্বা পায়ে মেয়েটির দিকে এগিয়ে এল। ট্রেনটা যাতে ছেড়ে না দেয় সেজন্য ওদের একজন চেন টেনে দিয়েছে।

গ্যাংস্টারদের একেবারে সামনে যে রয়েছে, চোখ আর ঠোঁট কুঁচকে মেয়েটার দিকে সে তাকায়। তার মুখে নোংরা হাসি ফুটে ওঠে। বলে, 'অনেক ভুগিয়েছিস ছোকরি। ঝামেলা না করে আমাদের সঙ্গে চল—'

মেয়েটার মুখ থেকে সব রক্ত নিমেষে কেউ যেন শুষে নেয়। দম-আটকানো, ঝাপসা গলায় সে শুধু বলতে পারে, 'না না—'

'নখড়াবাজি ছাড়। আয় বলছি—' বলেই ছোকরা খপ করে মেয়েটার ডান হাতের কবজি চেপে ধরে।

মেয়েটা দিশেহারার মতো বলে, 'তোমাব পায়ে পড়ছি লেলোদা, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তো তোমাদের কোনো ক্ষতি করিনি।'

লেলো হুমকে ওঠে, 'চোপ। গলা দিয়ে একটা আওয়াজ বার করবি না। চলে আয়—' বলে মেয়েটাকে হেঁচকা টান দেয়। তরুণী সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়ে নিজেকে খানিকটা সামলে নেয়।

হতচকিত মণিমোহন লক্ষ করলেন, পুরো কামরাটা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। চারপাশের লোকজন কাঠপুতুলের মতো দাঁড়িয়ে। কারো চোখের পাতা পড়ছে না, মনে হয় তাদের শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে।

লেলো ফের মেয়েটাকে দরজার দিকে টানতে থাকে। চোয়াল শক্ত করে বলে, 'শালী—'

মেয়েটা প্রাণপণে বাধা দিতে চেষ্টা করে। কামরাসুদ্ধ প্যাসেঞ্জারদের দিকে তাকিয়ে কাতর গলায় বলে, 'আপনারা আমাকে এই শয়তানদের হাত থেকে রক্ষা করুন।' মণিমোহনকে বলে, 'স্যার, আপনিও কি চুপ করে থাকবেন?'

লেলো তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলে, 'এই শালা ভেড়ার পালের কারো হিম্মত নেই তোকে বাঁচায়।

কেউ এগিয়ে এলে লাশ ফেলে দেব।'

কেউ টুঁ শব্দটি করে না। বোবা, কালা এবং অন্ধের মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে।

একটি পাতলা চেহারার তরুণীর শক্তি আর কতটুকু! কতক্ষণ বুনো মোষের মতো এক বন্দুকবাজের সঙ্গে তার পক্ষে যোঝা সম্ভব? লেলো টেনে হেঁচড়ে তাকে দরজার দিকে নিয়ে যায়।

মণিমোহন টের পাচ্ছিলেন তাঁর কপালের দু পাশের রগগুলো দপ দপ করছে; মাথার ভেতর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে। আচমকা কেউ যেন একটানে তাঁকে দাঁড় করিয়ে দেয়। গলার শির ছিঁড়ে তিনি চিৎকার করে ওঠেন, 'খবরদার, ছেড়ে দাও মেয়েটাকে—'

একজন তিয়াত্তর বছরের বয়স্ক মানুষ এভাবে রুখে দাঁড়াতে পারে, কেউ ভাবতে পারেনি। কামরার ভেতর এই মুহূর্তে বাজ পড়লেও প্যাসেঞ্জাররা এতটা চমকে উঠত না। অসীম বিস্ময়ে হঠকারী বৃদ্ধটির ওপর একশ জোড়া চোখ এসে পড়ে।

ওদিকে হকচকিয়ে গিয়েছিল লেলোরা। এমন একটা অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে বাধাটা আসবে, কে জানত! তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কী বলবে যেন ভেবে পায় না।

কর্তৃত্বের সুরে মণিমোহন এবার বলে ওঠেন, 'কী হল, মেয়েটার হাত ছেড়ে দিতে বললাম না? শুনতে পাওনি? রাসকেল হুলিগানের দল—'

লেলোর দু চোখে হত্যা ঝিলিক দিয়ে ওঠে। মেয়েটার হাত ছেড়ে ক'পা এগিয়ে আসে সে। চিৎকার করে বলে, 'হারামী শুড্ডা, তোমার জান খেয়ে ফেলব।'

লেলোর ঠিক পেছনে যে বন্দুকবাজটা রয়েছে, এতক্ষণে সে মণিমোহনকে দেখতে পেয়েছে। লেলোর কাঁধটা সজোরে খামচে ধরে শ্বাসটানা গলায় সে বলে, 'এই—এই, কাকে কী বলছিস! উনি স্যার—'

লেলো থমকে যায়। পেছনের বন্দুকবাজটা তার পাশ দিয়ে মণিমোহনের কাছাকাছি চলে আসে। বলে, 'কিছু মনে করবেন না স্যার, ও আপনাকে চিনতে পারেনি।'

লেলো না চিনলেও এই বন্দুকবাজটা যে তাঁকে চেনে, সেটা বোঝা যাচ্ছে। হাতে মারণাস্ত্র থাকলেও সে ভদ্র এবং বিনয়ী। জিজ্ঞেস করলেন, 'এ সবের মানে কী?' আতঙ্কগ্রস্ত মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন, 'তোমরা একে জোর করে নামিয়ে নিতে চাইছ কেন? কী করেছে ও?'

ছোকরা আগের মতোই বিনীত সুরে বলল, 'তা শুনে আপনার দরকার নেই। দয়া করে আপনি এর ভেতর থাকবেন না স্যার।'

মণিমোহনের মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। তীব্র গলায় তিনি বলেন, ' তোমরা বন্দুক পিস্তল নিয়ে একটা মেয়ের ওপর হামলা করছ। আর নিজের চোখে দেখেও আমি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব?'

'এই কম্পার্টমেন্টে আরো অনেক প্যাসেঞ্জার আছে। কেউ কিন্তু কিছু বলছে না।'

'সবাই বোবা হয়ে গেছে বলে আমাকেও মুখ বুজে থাকতে হবে? তুমি যখন আমাকে চেনো, নিশ্চয়ই জানো, আমার শক্ত একটা মেরুদণ্ড আছে।'

ছোকরা হাতজোড় করে অনুনয়ের ভঙ্গিতে এবার বলে, 'স্যার, দু'বছর আমি আপনার কলেজে পড়েছি। তাই রিকোয়েস্ট করছি, আপনার মতো রেসপেক্টেড মানুষের ওই মেয়েটার ব্যাপারে না জড়ানোই ভাল।'

মণিমোহন হকচকিয়ে গেলেন। এমন একটা গ্যাংস্টার বন্দুকবাজ তাঁর কলেজের ছাত্র, ভাবতেই ভীষণ অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন। খানিকটা সামলে নিয়ে বললেন, 'সত্যিই যদি আমার কলেজে পড়ে থাক, যা বলছি তাই কর।'

মণিমোহন যা বললেন, তার মধ্যে একটা সংকেত রয়েছে। স্থির দৃষ্টিতে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে যুবকটা জিজ্ঞেস করল, 'কী করতে হবে?'

'চুপচাপ তোমার সঙ্গীদের নিয়ে এই কম্পার্টমেন্ট থেকে নেমে যাও।' মণিমোহনের কণ্ঠস্বরে প্রবল ব্যক্তিত্ব ফুটে বেরোয়।

যুবকটা তাঁর চোখ থেকে চোখ সরায়নি। খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'নিশ্চয়ই আমরা নেমে যাব স্যার। দীপাও আমাদের সঙ্গে যাবে।'

মণিমোহন জানতে চাইলেন, 'দীপা কে?'

ভয়ার্ত মেয়েটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে যুবকটা বলল, 'ও—'

দাঁতে দাঁত চেপে মণিমোহন বললেন, 'না, ও যাবে না।'

গলার স্বর একই জায়গায় রেখে যুবকটা বলল, 'ওকে যেতেই হবে।'

মণিমোহন দ্রুত দীপার দিকে তাকালেন। মেয়েটা এত কাঁপছিল যে এক মুহূর্তও যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। হয়তো সে ভেবেছিল, মণিমোহনের নির্দেশ ওই বন্দুকবাজটা অমান্য করবে না, তাকে রেহাই দিয়ে দলবল নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু এখন আর আশা নেই। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, পায়ের তলা থেকে শেষ জমিটুকু সরে যাচ্ছে।

মণিমোহন ফের সেই যুবকটার দিকে চোখ ফেরালেন। বললেন, 'তুমি না বললে আমার ছাত্র ছিলে! তোমার স্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। আবার বলছি চলে যাও—'

যুবকটি এবার উত্তর দিল না। মণিমোহনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে আচমকা দীপার একটা হাত ধরে টানতে লাগল। মেয়েটা কিছুক্ষণ আগেও লেলোকে প্রাণপণে বাধা দিয়েছে। কিন্তু এখন প্রতিরোধ করার মতো এতটুকু জোর তার মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই। আচ্ছন্নের মতো সে যুবকটির সঙ্গে দরজার দিকে এগিয়ে চলল। নিদারুণ ভাগ্যের হাতে দীপা নিজেকে বুঝিবা সঁপে দিয়েছে।

এক মুহূর্ত বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন মণিমোহন। পরক্ষণে টের পান, সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। অসহ্য রাগে মাথার ভেতর আগুনের চাকা ঘুরছে। সামনের দিকে ছুটে গিয়ে দীপার অন্য হাতটা ধরে চিৎকার করে ওঠেন, 'খবরদার। এর ফল কিন্তু সাঙ্ঘাতিক হবে।'

তাঁর কথা কানেও তোলে না বন্দুকবাজটা। তার সঙ্গে এখন হাত মিলিয়েছে লেলো। দু'জনে দীপাকে টানছে।

মণিমোহনের ওপর অলৌকিক কিছু যেন ভর করে। তিনি দীপার হাত ছেড়ে ওর কোমরটা জাপটে ধরেন। বন্দুকবাজরা মেয়েটাকে নামিয়ে নিয়ে যাবেই, তিনি তা হতে দেবেন না। শরীরের সবটুকু শক্তি জড়ো করে তিনি ওদের ঠেকিয়ে যাচ্ছেন।

টানাটানির মধ্যেই মণিমোহন কামরার যাত্রীদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'আপনারা এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন! যদি সামান্য মনুষ্যত্বও থাকে, আমাকে হেল্প করুন। স্কাউন্ড্রেলগুলোর হাত থেকে মেয়েটাকে বাঁচান।'

যাত্রীদের কোনোরকম প্রতিক্রিয়াই নেই। নির্জীব সারিবদ্ধ মূর্তির মতো যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তারা তেমনই দাঁড়িয়ে থাকে।

একজন তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ যতই সাহসী হন, একটি অসহায় মেয়েকে রক্ষা করার সদিচ্ছা যতই তাঁকে উদ্দীপ্ত করুক, বন্দুকবাজদের সঙ্গে তাঁর পক্ষে কতক্ষণ যোঝা সম্ভব?

টানতে টানতে লেলোরা দীপাকে দরজার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। মণিমোহনের কলেজের একদা ছাত্র সেই যুবকটা বলে, 'কেন ফালতু ঝঞ্ঝাট করছেন স্যার? দীপাকে ছেড়ে দিন।'

মণিমোহন বললেন, 'নো।'

'আপনার বয়েস হয়েছে। ওকে ধরে রাখতে পারবেন না। তা ছাড়া—'

'কী?'

'আমি আপনার কলেজে পড়েছি। তাই যথেষ্ট সম্মান দিয়ে কথা বলছি। আমার সঙ্গে যারা আছে তারা কেউ আপনাকে চেনে না। ওরা কাউকে রেসপেক্ট করতে শেখেনি। আমি এখানে না থাকলে এতক্ষণে আপনাকে—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় যুবকটি।

মণিমোহন গলার স্বর অনেকখানি চড়িয়ে বলেন, 'কী করত আমাকে? মেরে ফেলত?'

প্রশ্নটার জবাব দেয় না যুবকটা। সে আর লেলো এবার এত জোরে দীপাকে টানে যে মেয়েটা ছিটকে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে পড়ে। মণিমোহন তার কোমর ছাড়েননি, ফলে তিনিও হুড়মুড় করে তার ওপর গিয়ে পড়েন।

প্ল্যাটফর্মের এই অংশটা সুনসান। অনেক দূরে বন্দুক-পিস্তলের পাল্লার বাইরে প্রচুর প্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যেই তারা জেনে গেছে, এই ট্রেনের একটি কামরায় মারাত্মক কোনো ঘটনা

ঘটতে চলেছে। কাছাকাছি আসার কারো সাহস নেই, অথচ কৌতূহলটা রয়েছে। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে লোমহর্ষক পরিণতির জন্য যেন তারা অপেক্ষা করছে।

মণিমোহন আর দীপা আস্তে আস্তে লেলোদের দিকে চোখ রেখে উঠে দাঁড়িয়েছে। মণিমোহন আগের মতোই মেয়েটাকে দুহাত দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। যা ঘটার ঘটুক, তিনি যেন প্রতিজ্ঞাই করেছেন, দীপাকে ওই ঘাতকগুলোর হাতে কিছুতেই তুলে দেবেন না।

ট্রেনের কামরায় ওরা দু'জন ছিল। লেলো এবং তাঁর কলেজের সেই ছাত্র। বাকি বন্দুকবাজগুলো ছিল প্ল্যাটফর্মে। তারা এগিয়ে এসে মণিমোহনদের ঘিরে ধরে।

অন্য বন্দুকওলারা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। মণিমোহনের ছাত্রটি বলল, 'স্যার, আপনাকে এই শেষ বার বলছি, দীপার ব্যাপারটা আপনি মাথা থেকে বার করে দিন। এরকম একটা মেয়ের সঙ্গে আপনার কোনোদিন দেখা হয়েছিল সেটা ভুলে যাবেন। যান, কম্পার্টমেন্টে গিয়ে বসুন। আমরা নেমে এসেছি; ট্রেন কিন্তু এখনই ছেড়ে দেবে।'

শান্ত, নম্র ভঙ্গিতেই কথাগুলো বলছে ছোকরা। কিন্তু তার মধ্যে একটা স্পষ্ট হুমকি রয়েছে। তিনি কী উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, সে ফের বলে ওঠে, 'আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আপনাকে আমি ভীষণ রেসপেক্ট করি। প্লিজ যান—'

লেলো হঠাৎ বলে ওঠে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বহুত ড্রামাবাজি হয়েছে, এবার ফুটে যান। আপনার জন্যে ট্রেনটা বিশ মিনিট স্ট্যাচু হয়ে আছে। অফিসবালাদের কত অসুবিধে হচ্ছে। আমাদের পেছনে লাগলে আপনার বিপদ হয়ে যাবে, পষ্ট বলে দিচ্ছি।'

সারা শরীরের রক্ত যেন টগবগ করে ফুটতে থাকে। এমনিতে উঁচু গলায় তিনি কথা বলেন না। কিন্তু এখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এত সাহস তোমাদের যে আমাকে শাসাচ্ছ! আমি দেখব তোমরা কত বড় গ্যাংস্টার, কত বড় বজ্জাত—'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই সেই ছোকরা মাথা সামান্য কাত করে, চোখের কোণ দিয়ে কিছু এটা সংকেত দেয়। সঙ্গে সঙ্গে চার পাঁচটা বন্দুকবাজ দলবদ্ধভাবে টানতে টানতে মণিমোহনের হাত থেকে দীপাকে ছাড়িয়ে নেয়।

মণিমোহন তীব্র স্বরে চিৎকার করতে থাকেন, 'এই ছাড় ছাড়, শয়তান জন্তুর দল—'

তাঁর কথার কেউ উত্তর দেয় না।

অন্য তিন বন্দুকবাজের সঙ্গে লেলোও মণিমোহনকে জোর করে ধরে রেখেছিল। সে কলেজে-পড়া যুবকটাকে বলল, 'পল্টা, আমরা এই গুড্ডাকে আটকে রাখছি। তুই মালটাকে নিয়ে ঝটপট কেটে যা। আমরা দশ মিনিটের ভেতর চলে আসছি।'

তাঁর ছাত্রটির নাম তা হলে পল্টা। নিশ্চয়ই স্কুল-কলেজে ওর অন্য একটা ভাল নাম আছে। তা নিয়ে এখন অবশ্য ভাবার সময় নেই। মণিমোহন তাঁর বৃদ্ধ শরীরের শেষ ক্ষমতাটুকু দিয়ে বন্দুকবাজদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু চারটে পেটানো চেহারার যুবকের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করা প্রায় অসম্ভব।

প্ল্যাটফর্মের এক মাথায় আগের মতোই কয়েক শ লোক শ্বাসক্রিয়া বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের চোখের পাতা পড়ছে না। চিত্রার্পিত বলে একটা কথা আছে—ওদের দেখলে হুবহু তাই মনে হয়। প্ল্যাটফর্মের অন্য দিকটা একেবারে ফাঁকা। সেখান দিয়ে নেমে গেলে ডান পাশে পায়ে চলা মাটির রাস্তা। রাস্তার ওপাশে ধু ধু মাঠ। প্ল্যাটফর্মের যেদিকে লোকজন নেই, দীপাকে সেদিকে টেনে নিয়ে চলেছে পল্টা।

মণিমোহন দ্রুত ভেবে নিলেন, প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে একবার যদি ওরা মাঠে নেমে যায় আর কিছুই করার থাকবে না। যা করার কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর করে ফেলতে হবে। নইলে মেয়েটার চরম সর্বনাশ ঘটে যাবে।

পল্টারা যখন প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে সেই সময় লেলোরা হয়তো একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। চার বন্দুকবাজ আঁট হাতে যে ফাঁসটা তৈরি করে মণিমোহনকে আটকে রেখেছে সেটা সামান্য আলগা হয়ে যায়। সেই সুযোগটা মুহূর্তে কাজে লাগান তিনি। তাঁর সামনের দিকে ছিল লেলো

আর চাপ দাড়িওলা একটা বন্দুকবাজ। আচমকা সজোরে তিনি ধাক্কা মারতে দু'জনে দু পাশে ছিটকে পড়ে যায়। বুড়ো মানুষটা এমন প্রচণ্ড আঘাত হানতে পারেন, তার জন্য ওরা আদৌ প্রস্তুত ছিল না। থাকলে এভাবে পড়ে যেত না। বাকি দুই বন্দুকবাজও ভীষণ হকচকিয়ে গিয়েছিল।

সামনের বাধা সরে গেছে। এক মুহূর্তও আর দাঁড়ালেন না মণিমোহন। পল্টাদের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গেলেন।

যে দুই বন্দুকওলা প্ল্যাটফর্মে আছড়ে পড়েছিল তারা হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠে দাঁড়ায়। অন্য দুই সঙ্গীকে নিয়ে চিৎকার করতে করতে মণিমোহনের পেছনে ছুটতে থাকে, 'পল্টা, হারামী বুড়োটা আমাদের হাত ফসকে তোর দিকে তেড়ে যাচ্ছে। শালার বডিতে তিনটে বুলেট পুরে দে—'

পল্টা ঘুরে দাঁড়ায় কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন মণিমোহন। পল্টা হুমড়ি খেয়ে প্ল্যাটফর্মে পড়ে যায়। তার এক হাতে ছিল বন্দুক, আর এক হাত দিয়ে সাপটে দীপাকে ধরে রেখেছিল। বন্দুকটা দশ ফুট দূরে উড়ে যায় আর দীপাও তার হাতের ভেতর থেকে ডান দিকে ছিটকে গিয়ে পড়ে।

এমন অতর্কিতে ব্যাপারটা ঘটেছে যে সামলে নিতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে পল্টার। তারপরেই তার শরীরটা স্প্রিং-লাগানো কোনো যন্ত্রের মতো সটান উঠে দাঁড়ায়।

মণিমোহনও পড়ে গিয়েছিলেন। তিনিও উঠে দাঁড়িয়েছেন। পাথরের ব্লক-বসানো প্ল্যাটফর্মের ওপর পড়ার জন্য ডান পায়ের হাড়ে চোট লেগেছে, শরীরের নানা জায়গায় চামড়া উঠে জ্বালা জ্বালা করছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সেদিকে তাঁর লক্ষ নেই। মণিমোহন সোজা পল্টার দিকে তাকিয়ে তার প্রতিক্রিয়া বুঝতে চেষ্টা করলেন।

পল্টার গোটা মুখ হিংস্র হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো জ্বলছে, চোয়াল পাথরের মতো কঠিন। মণিমোহন আন্দাজ করে নিলেন, পল্টা এবার আর তাঁকে ছাড়বে না। কী করতে পারে সে? সেটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না।

পল্টা দু'তিন সেকেন্ড সোজা মণিমোহনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর গলার ভেতর চাপা আওয়াজ করে তার সেই বন্দুকটার দিকে মুখ ফেরায়। মুহূর্তে মণিমোহন পল্টার মতলবটা আঁচ করে নেন। তাঁর কলেজের প্রাক্তন এই ছাত্রটির ভেতর থেকে একটা ঘাতক বেরিয়ে আসছে যেন।

বন্দুকটা মণিমোহনের কাছাকাছি পড়ে আছে। চোখের পলক পড়তে না পড়তে হঠাৎ সেটার দিকে ঝাঁপ দিল পল্টা। মণিমোহন প্রস্তুত ছিলেন। তিনিও সেদিকে ছুটে গেলেন। ওই মারণাস্ত্রটা পল্টা পেয়ে গেলে তিনি দশ মিনিটও বেঁচে থাকবেন না। যথেষ্ট বয়স হয়েছে তাঁর। শরীর-স্বাস্থ্য বেশ ভাল থাকলেও অফুরন্ত আয়ু নিয়ে তো এই পৃথিবীতে আসেননি। আর কতদিনই বা তাঁর পক্ষে বাঁচা সম্ভব? পাঁচ বছর, সাত বছর কি বড় জোর দশ বছর। মরতে তিনি ভয় পান না। কিন্তু একটা নোংরা বন্দুকবাজের গুলিতে অসহায় মৃত্যুবরণ কোনোভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়। তা ছাড়া দীপাকে বাঁচানোর একটা নৈতিক দায়িত্ব তিনি নিজের হাতেই তুলে নিয়েছেন। শুধু নামটা ছাড়া ওর সম্পর্কে আর কিছুই তাঁর জানা নেই। দীপার মা-বাবা ভাই-বোন বা অন্য শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ থাকলেও তারা ওকে রক্ষা করতে পারবে কিনা, তাই বা কে বলবে? মেয়েটার জন্য তাঁর আপাতত বেঁচে থাকা দরকার। ওকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে পারলে তবে তিনি দায়মুক্ত হতে পারবেন।

পল্টা ছোঁ মেরে বন্দুকটা দখল নেবার আগেই মণিমোহন ক্ষিপ্র হাতে ওটা তুলে নেন। অস্ত্র চালাতে তিনি জানেন না। কোনোদিন তার প্রয়োজনও হয়নি। বন্দুকটা তুলে নেবার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, ওটা হাতে থাকলে পল্টা এবং তার বাহিনী অন্তত থমকে যাবে; তাঁর আর দীপার ক্ষতি করতে এই মুহূর্তে অন্তত দশ বার ভাববে।

বন্দুকটার নাগাল না পেয়ে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে পল্টা। কিন্তু যাঁর হাতে একটা মারাত্মক অস্ত্র আছে তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে সাহস পায় না। তা ছাড়া, সে টের পেয়েছে মণিমোহন যেভাবে মরিয়া হয়ে উঠেছেন, বন্দুকটা চালিয়েও দিতে পারেন।

পল্টা খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ায়। বলে, 'স্যার, বন্দুকটায় গুলি রয়েছে। ওটা আমাকে দিন।'

'নো।' প্রবল কর্তৃত্বের সুরে মণিমোহন বললেন, 'তুমি তোমার দলবল নিয়ে এক্ষুনি এখান থেকে

চলে যাও।' বলে হাতের বন্দুকটা উঁচিয়ে ধরেন।

পেছনে অন্য বন্দুকবাজগুলো দৌড়ে আসতে আসতে থেমে গিয়েছিল। কী করবে তারা ভেবে উঠতে পারছিল না। কোনো ভুল চাল চাললে মণিমোহন ট্রিগার টিপে দিতে পারেন, গুলি পল্টার বুক এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে বেরিয়ে যাবে।

পল্টা অত্যন্ত ধুরন্ধর। গলার স্বর নামিয়ে সে বলল, 'স্যার, আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি, রিস্ক নেবেন না। হয়তো টের পাননি, দুটো বন্দুক আর দুটো রিভলবার আপনাকে টার্গেট করে ওয়েট করছে। বিশ্বাস না হলে পেছনে দেখতে পারেন।'

মণিমোহন সারাক্ষণ পল্টার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এবার সাঙ্ঘাতিক ভুল করে বসলেন। মাথাটা সামান্য কাত করে যেই তিনি পেছন দিকে ফিরেছেন, পান্টা তাঁর দিকে শরীরটা ছুঁড়ে দিয়ে বন্দুকটা ধরে ফেলল। মতলব ছিল অস্ত্রটা ছিনিয়ে নেবে কিন্তু পারল না। ওটা হাতছাড়া হওয়ার অনিবার্য পরিণতি কী হতে পারে সেটা তাঁর স্পষ্ট জানা আছে; মণিমোহন দু হাতে বন্দুকটা আঁকড়ে ধরে থাকলেন।

একটা মারণাস্ত্রের দখল নিয়ে একজন তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধের সঙ্গে আটাশ উনত্রিশ বছরের এক গ্যাংস্টারের তুমুল টানাহ্যাঁচড়া চলছে। বার বার হেঁচকা টান মেরে বন্দুকটা ছাড়িয়ে নিতে চাইছে পল্টা কিন্তু মণিমোহন প্রতিজ্ঞা করেছেন, কিছুতেই ওটা ছাড়বেন না। প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তের দর্শকেরা, এমনকি পেছনের চার বন্দুকবাজ দমবন্ধ করে ওঁদের দিকে তাকিয়ে আছে।

টানাটানিতে আচমকা বন্দুকের ট্রিগারে মণিমোহনের আঙুলের চাপ পড়ে। তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড আওয়াজ করে সেটার মুখ থেকে গুলি বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কাতর একটা চিৎকার। দেখা গেল, পল্টা বেঁকেচুরে, দলা পাকানো মাংসপিণ্ডের মতো প্ল্যাটফর্মে আছড়ে পড়ল। তার সমস্ত শরীর ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা তাজা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। গুলিটা সোজা পল্টার বুকে লেগেছে।

এমন ভয়াবহ একটা ব্যাপার ঘটতে পারে, ভাবতে পারেননি মণিমোহন। বিহ্বলের মতো পল্টার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। অসহ্য যন্ত্রণায় তার রক্তাক্ত শরীরটা বারকয়েক কুঁকড়ে, কুণ্ডলী পাকিয়ে একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল।

দূরে ট্রেনের সেই প্যাসেঞ্জাররা এখন চেঁচাতে শুরু করেছে। কী তারা বলছে, তার একটি বর্ণও বোঝা যাচ্ছে না, সব কেমন যেন দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে। পুরো স্টেশনটা জুড়ে তীব্র উত্তেজনা।

পল্টার সঙ্গীরা হয়তো প্রতিহিংসা নেবার জন্য গুলিতে গুলিতে মণিমোহনকে ঝাঁঝরা করে ফেলত কিন্তু তার আগেই স্টেশনের অন্য দিক থেকে অসংখ্য ভারি বুটের আওয়াজ ভেসে এল।

চমকে মণিমোহন দেখতে পেলেন, পনের ষোল জন আর্মড কনস্টেবল আর একজন ইউনিফর্ম-পরা অফিসার দৌড়ুতে দৌড়ুতে তাঁদের দিকে আসছেন। স্টেশনে যে সাঙ্ঘাতিক ঘটনা ঘটতে চলেছে সেই খবরটা খুব সম্ভব কেউ থানায় দিয়ে এসেছিল।

পুলিশ দেখে পল্টার সেই চার সঙ্গী আর এক সেকেন্ডও দাঁড়ায় না, দুড়দাড় দৌড় লাগিয়ে প্ল্যাটফর্মের সীমানা ছাড়িয়ে ফাঁকা মাঠের দিকে পালিয়ে যায়।

অফিসার গলা চড়িয়ে কনস্টেবলদের হুকুম দেন, 'ওই বাস্টার্ডগুলো যেন ভাগতে না পারে। ক'জন ওদের পিছু নাও। দরকার হলে ফায়ার করবে।'

সাত আট জন কনস্টেবল প্ল্যাটফর্ম থেকে মাঠে নেমে লেলোদের পেছনে ধাওয়া করতে থাকে। বাকিদের সঙ্গে নিয়ে মণিমোহনের কাছে চলে আসেন অফিসার। চাপ চাপ রক্তের ভেতর পড়ে-থাকা পল্টার মৃতদেহ দ্রুত দেখে নিয়ে মণিমোহনের দিকে তাকান, 'এ কী, একে কে মারলে!' বলেই চমকে ওঠেন, 'স্যার, আপনি!'

মণিমোহনের হাতে বন্দুকটা ধরাই ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি আমাকে চেনেন?'

অফিসার বললেন, 'আমাকে আপনি করে বলবেন না। আমি পনের বছর আগে আপনার ছাত্র ছিলাম। আমার নাম সন্দীপন বিশ্বাস।'

মণিমোহন চিনতে পারলেন না। চল্লিশ বছরেরও বেশি তিনি আদিলপুর কো-এড কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর হাত দিয়ে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী বেরিয়েছে। এদের সবাইকে মনে করে রাখা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি করেই বলব। এখন আমাকে

নিয়ে কী করতে চাও বল—'

নাম-করা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, এ অঞ্চলের সবচেয়ে বিখ্যাত, সবচেয়ে শ্রদ্ধেয়, সবচেয়ে আদর্শবাদী মানুষটি বন্দুক হাতে একটা মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, নিজের চোখে দেখেও অবিশ্বাস্য মনে হয়। হতবুদ্ধি সন্দীপনের মাথার ভেতরটা গুলিয়ে যাচ্ছিল। বিভ্রান্তের মতো বললেন, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না স্যার।' পল্টাকে দেখিয়ে বললেন, 'এ একটা নোটোরিয়াস ক্রিমিনাল—মার্ডারার। ওকে মারল কে?'

মণিমোহন বললেন, 'বোধহয় আমি।'

এদিকে যে ভয়ার্ত জনতা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ছিল, পুলিশ দেখে তারা এখন এগিয়ে এসেছে। সবাই একসঙ্গে হই চই জুড়ে দিল, 'না না, স্যারের কোনো দোষ নেই। ওই পল্টা ওঁকে খুন করে ফেলত। নেহাত—' বোঝা যায়, এরা প্রায় সকলেই মণিমোহনকে চেনে।

কাছাকাছি শ্বাসরুদ্ধের মতো দাঁড়িয়ে ছিল দীপা। সে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, 'স্যার আমার জন্যে—আমার জন্যে—' কান্নায় তার গলা বুজে যায়। কথাটা শেষ করতে পারে না সে।

মণিমোহন হাতের বন্দুকটা সন্দীপনের দিকে বাড়িয়ে বলেন, 'এটা ধর। পল্টার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলাম।' একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'যে কারণেই হোক, এই ছেলেটার মৃত্যুর জন্যে আমি কিছুটা হলেও দায়ী। তুমি আমাকে অ্যারেস্ট করতে পার।'

জনতা আগের মতোই উত্তেজিতভাবে সমস্বরে চিৎকার করতে থাকে, 'স্যারকে কোনোভাবেই অ্যারেস্ট করা চলবে না। স্যার কোনো অপরাধ করেননি।' বন্দুকবাজদের একজন খুন হওয়ায় এবং বাকি সকলে পালিয়ে যাওয়ায় তারা মনোবল ফিরে পেয়েছে।

হাত তুলে ভিড়টাকে শান্ত করেন সন্দীপন। তারপর মণিমোহনকে বলেন, 'স্যার, দয়া করে আপনাকে আমার সঙ্গে একবার থানায় যেতে হবে। এটা একটা খুনের কেস। সমস্ত ঘটনা আমার জানা দরকার। বুঝতেই পারছেন, আমি এমন একটা চাকরি করি যাতে অনেক অপ্রিয় কাজ করতে হয়।' একটু থেমে চোখ নামিয়ে বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার—'

'কেন বল তো?'

'থানায় নিয়ে যেতে চাইছি বলে।'

মণিমোহন বললেন, 'কী আশ্চর্য, তোমার ডিউটি তো তোমাকে করতেই হবে। এর জন্যে বিব্রত হওয়ার কোনো কারণ নেই।' দীপাকে দেখিয়ে বললেন, 'যে আনপ্লেজান্ট ঘটনাটি এখানে ঘটেছে তার মূলে রয়েছে এই মেয়েটি। একেও আমার সঙ্গে নিয়ে চল।'

সন্দীপনের কাছে সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। পল্টার মতো দাগী ক্রিমিনালের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এমন একটা নিরীহ চেহারার ভীত, আতঙ্কগ্রস্ত তরুণী থাকতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। কয়েক পলক তাকে খুঁটিয়ে দেখার পর সন্দীপন বললেন, 'হ্যাঁ, ও যখন এর সঙ্গে জড়িত তখন অবশ্যই ওকে থানায় নিয়ে যাব।'

ট্রেনটা এখনও স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। মণিমোহন বললেন, 'আমি এই গাড়িতে কলকাতায় যাচ্ছিলাম। আমার একটা স্যুটকেস ওটার মধ্যে থেকে গেছে। স্যুটকেসটা নামিয়ে এনে তোমার সঙ্গে যাব।'

মণিমোহন ট্রেনের দিকে পা বাড়াতে যাবেন, সন্দীপন বললেন, 'আপনাকে কষ্ট করতে হবে না স্যার।' কোন কামরার ঠিক কোথায় স্যুটকেসটা রয়েছে জেনে নিয়ে একজন কনস্টেবলকে পাঠিয়ে দিলেন তিনি।

দু মিনিটও লাগল না, স্যুটকেস চলে এল। এর মধ্যেই কনস্টেবলের দলটা যারা ফাঁকা মাঠে বন্দুকবাজদের তাড়া করে গিয়েছিল, ফিরে এসেছে। একজনকেও তারা ধরতে পারেনি ; মাঠ পেরিয়ে লোলোরা উধাও হয়ে গেছে। দুই কনস্টেবল তিন চার রাউন্ড গুলিও ছুঁড়েছিল কিন্তু ওদের কারো গায়ে লাগেনি।

সন্দীপন চারজন কনস্টেবলকে বললেন, 'আমি স্যারদের নিয়ে থানায় চলে যাচ্ছি। তোমরা ডেডবডির কাছে থাক। থানায় গিয়ে সাব-ইনসপেক্টর দাশগুপ্ত আর একজন ফোটোগ্রাফারকে পাঠিয়ে

দিচ্ছি। পন্টার ছবিটবি তোলার পর সে বডি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে।' তিনি আরো নির্দেশ দিলেন, 'দাশগুপ্তরা যতক্ষণ না আসছে কেউ যেন মৃতদেহের কাছে ঘেঁষতে না পারে।'

কনস্টেবলরা জানাল—পারবে না।

সন্দীপন এবার চারপাশের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনারা সবাই ঘটনার আই-উইটনেস। একটু কষ্ট করে থানায় চলুন। এই ইনসিডেন্টটা সম্পর্কে আপনাদের স্টেটমেন্ট রেকর্ড করে নেব। পরে কোর্টে কেস উঠলে সাক্ষী হিসেবে আপনাদের ডাকা হবে।'

বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, পুলিশের পাল্লায় পড়লে সেটা দ্বিগুণ হয়ে ছত্রিশ—এই প্রবচনটি যেন সবার মনে পড়ে যায়। মণিমোহনের জন্য যে বিবেকবোধ চাড়া দিয়ে উঠেছিল সেটা মুহূর্তে চুপসে গেল। পায়ে পায়ে তারা প্রায় সকলে পিছু হটতে হটতে হঠাৎ গতি বাড়িয়ে এক দৌড়ে ট্রেনে উঠে পড়ে। মাত্র সাত আটজন দাঁড়িয়ে থাকে। বোঝা যায়, মণিমোহনের জন্য যে কোনো রকম ঝুঁকি নিতে তারা রাজি।

সন্দীপন আর দাঁড়ান না। মণিমোহন, দীপা, বেশির ভাগ কনস্টেবল আর প্রত্যক্ষদর্শীর দলটাকে নিয়ে স্টেশনের একতলা বিল্ডিংটার দিকে এগিয়ে যান।

দুই

স্টেশনের ঠিক বাইরে পুলিশের একটা জিপ আর দুটো বিরাট কালো ভ্যান দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিপের টানা ব্যাক সিটটায় উঠে বসলেন সন্দীপন, মণিমোহন আর দীপা। একটা ভ্যানে উঠল কনস্টেবল এবং ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা।

গাড়ি চলতে শুরু করলে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ দীপাকে দেখে নিলেন সন্দীপন। তারপর মণিমোহনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যার, তখন বলছিলেন এই মেয়েটির জন্যেই ইনসিডেন্টটা ঘটেছে।'

মণিমোহন বাইরের দিকে তাকিয়ে দূরমনস্কর মতো কিছু ভাবছিলেন। মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ।'

'আপনি কি ওকে চেনেন?'

'না। আজ ট্রেনেই ওকে প্রথম দেখেছি। দীপা—এই নামটা ছাড়া ওর সম্পর্কে আর কিছুই জানি না।'

'কিন্তু—'

সন্দীপনকে কথাটা শেষ করতে দিলেন না মণিমোহন। বললেন,'থানায় তো যাচ্ছিই। সেখানে বসে তোমার কৌতূহল মেটানো যাবে।'

সন্দীপন বললেন, 'ঠিক আছে স্যার।'

স্টেশন থেকে এ অঞ্চলের থানা খুব দূরে নয়। পাঁচ মিনিটের ভেতর সেখানে পৌছে গেলেন মণিমোহনরা।

সন্দীপন থানার অফিসার ইন-চার্জ। তিনি তাঁর নিজস্ব চেম্বারে এনে মণিমোহন, দীপা এবং ঘটনার সেই সাত আটজন প্রত্যক্ষদর্শীকে বসালেন। তারপর এস.আই দাশগুপ্ত আর একজন ফোটোগ্রাফারকে স্টেশনে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। পন্টার মৃতদেহ সম্পর্কে কী করতে হবে তার জরুরি নির্দেশও দেওয়া হল। অর্থাৎ পন্টার বাড়িতে খবর তো পাঠাতে হবেই, ডেডবডির পোস্টমর্টেমও করানো চাই।

দাশগুপ্তরা চলে গেলে আর একজন সাব ইন্সপেক্টরকে ডাকিয়ে আনলেন সন্দীপন। তাকে বললেন, 'মনোজ, এঁদের স্টেটমেন্টগুলো লিখে নাও।'

মনোজের বয়স বেশি নয়, তিরিশের নিচেই হবে। স্মার্ট, সুদর্শন যুবক। দেখে মনে হল, তার ভাল একটা ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে। আজকাল পুলিশের চাকরিতে অনেক শিক্ষিত, ভদ্র বংশের ছেলেরা আসছে।

মনোজ লম্বা খাতা আর পেন নিয়ে একটা চেয়ারে বসল।

সন্দীপন মণিমোহনকে বললেন, 'স্যার, আপনিই প্রথম শুরু করুন। ওই ট্রেনটায় কোথায় যাচ্ছিলেন, দীপা আর ওই পন্টাদের সঙ্গে আপনার কিভাবে দেখা হল, বন্দুকের গুলিতে পন্টার মৃত্যু কেমন করে ঘটল—সব ডিটেলে বলবেন। তুচ্ছ বা অনাবশ্যক মনে করে কিছু বাদ দেবেন না।'

মণিমোহন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। ট্রেনের কামরায় এবং স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যে সব ঘটনা

ঘটেছে সেগুলো মাথার ভেতর পর পর সাজিয়ে নিয়ে বলতে লাগলেন, 'বহুকাল আগে তুমি আমার ছাত্র ছিলে। স্বাভাবিকভাবেই কলেজ থেকে বেরুবার পর তোমার সঙ্গে আর যোগাযোগ নেই। তুমি হয়তো জানো না, আমি আদিলপুর থেকে চিরকালের মতো চলে যাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছি। ইচ্ছা, বাকি জীবনটা দুই ছেলের কাছে বাঙ্গালোর আর দিল্লিতে কাটিয়ে দেব।'

সন্দীপন বললেন, 'না স্যার, এটা আমার জানা ছিল না। কলেজ থেকে বেরিয়েই পুলিশের চাকরিটা পেয়ে যাই। তারপর ওয়েস্ট বেঙ্গলের নানা থানায় ঘুরে মাস চারেক আগে এখানকার থানায় পোস্টিং পেয়েছি।'

'তোমাদের বাড়ি কি আদিলপুরে?'

'না। তার আগের স্টেশন মুকুন্দপুরে। আপনি স্যার পল্টাদের ব্যাপারটা বলুন।'

আদিলপুরে ট্রেনে ওঠার পর থেকে পল্টার বুকে বন্দুকের গুলি লাগা পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে গেলেন মণিমোহন। মনোজ ঝড়ের গতিতে সব লিখে নিল।

সন্দীপন রুদ্ধশ্বাসে শুনে যাচ্ছিলেন, এবার তাঁর বুকের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে আবদ্ধ বাতাস বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা।

তারপর একে একে প্রত্যক্ষদর্শীদের সবার জবাববন্দি নেওয়া হল। মণিমোহন যা বলেছেন এরাও ঠিক তাই বলল। কোথাও এতটুকু গরমিল নেই। মনোজ তাদের স্টেটমেন্টগুলোও টুকে নিল। বাকি রইল শুধু দীপা।

সন্দীপন বললেন, 'দীপার জবানবন্দি পরে নেওয়া হবে। মনোজ, আই-উইটনেসরা যা বললেন সব তাঁদের শুনিয়ে নাম-ঠিকানা লিখে সই করিয়ে নাও। ওঁদের আর আটকে রাখব না। পরে দরকারমতো যোগাযোগ করব।'

সন্দীপন বললেন, 'দীপার স্টেটমেন্টটা আমি সবার শেষে নিতে চাইছি, কারণ স্যার ছাড়া অন্য কেউ সেটা শুনুক, কেসের স্বার্থে তা বাঞ্ছনীয় নয়।'

কেউ তাঁর কথার উত্তর দিল না।

সন্দীপন এবার দীপার দিকে তাকালেন। মেয়েটা ভয়ে, দুশ্চিন্তায় একেবারে কুঁকড়ে আছে। তার মুখ ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য। বিভীষিকার রেশ সে এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

সন্দীপন খুব নরম গলায় বললেন, 'পদবি সুদ্ধ তোমার পুরো নামটা বল।'

দীপা ঢোক গিলে বলল, 'দীপা চৌধুরী।'

'তোমরা কোথায় থাক?'

'নবীগঞ্জে।'

'বাবার নাম কী?'

'নরেশ চন্দ্র চৌধুরী।'

'তিনি আছেন?'

'না। চার বছর আগে ক্যানসারে মারা গেছেন।'

'কাজকর্ম কী করতেন?'

'ল্যাণ্ড রেভিনিউ অফিসে আপার ডিভিশন ক্লার্ক ছিলেন।'

ক্রমে জানা গেল, নবীগঞ্জে ঠাকুরদার আমলের পুরনো একতলা বাড়িতে দীপারা থাকে। মা জীবিত। তারা তিন ভাইবোন। পাঁচ বছরের বড় দাদা, যার নাম বীরেশ। তারপর দীপা। দীপার পর ছোট একটা ভাই—বরুণ।

বীরেশ আদিলপুর কলেজে বি. এস. সি. ফার্স্ট ইয়ারে থাকতেই পড়া ছেড়ে দেয়। দীপা এ বছর বি. এ পাশ করেছে। বরুণ ক্লাস ইলেভেনে পড়ে।

সন্দীপন জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু মনে করো না, তোমাদের সংসার কী করে চলে?'

দীপা জানালো, তার বাবা নরেশ চৌধুরির প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের প্রায় পুরো টাকাটা তুলে তাঁর চিকিৎসা করা হয়েছিল। বাকি যেটুকু ছিল ইউনিট ট্রাস্টে লাগিয়ে মাসে মাসে কিছু টাকা পাওয়া যায়। বাবা

সঞ্চয়ী ছিলেন। অফিসে মাইনে খুব একটা বেশি পেতেন না, তার ওপর সংসারে এতগুলো লোক। তবু তারই মধ্যে কিছু টাকা বাঁচিয়ে পোস্ট অফিসে ফিক্সড ডিপোজিটে রেখেছিলেন। সেই টাকা থেকে সামান্য ইন্টারেস্ট আসে। তা ছাড়া মা কয়েক শ টাকা পেনসন পান। দীপা দু'তিনটে টিউশনি করে। চাকরির চেষ্টা করছে কিন্তু পাশ কোর্সের একটি গ্র্যাজুয়েটের পক্ষে খুঁটির জোর ছাড়া এ বাজারে কিছু পাওয়া অসম্ভব। জোড়াতালি দিয়ে কোনোরকমে তারা টিকে আছে।

একটি অভাবগ্রস্ত পরিবারের ছবি ক্রমশ ফুটে উঠছিল। সন্দীপন বললেন, 'সবই তো শুনলাম। তোমার দাদার কথা তো কিছু বললে না? সংসারের দায়িত্ব তারই নেওয়া উচিত। সে কী করে?'

দীপা চমকে উঠল। পরক্ষণে মুখ নামিয়ে নিল, কোনো উত্তর দিল না।

সন্দীপন তীক্ষ্ণ চোখে তাকে লক্ষ করছিলেন। বললেন, 'কী হল, চুপ করে রইলে যে?'

দীপা কিছুক্ষণ নিজের সঙ্গে যুঝে একরকম মরিয়া হয়েই বলল, 'দাদা খুব খারাপ হয়ে গেছে।'

'মানে?'

দীপা জানায়, বীরেশ একজন কুখ্যাত অ্যান্টি-সোশাল। বর্ডারের ওধারে নানা ধরনের চোরাই চালানকারিদের সঙ্গে সে যুক্ত। খুনখারাপির কিছু চার্জও আছে তার নামে। নবীগঞ্জ, আর্দিলপুর এবং আরো দু'তিনটে থানায় সমাজবিরোধীদের যে লিস্ট রয়েছে তাতে বীরেশ চৌধুরির নামটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

মাঝে মাঝেই প্রচুর টাকা নিয়ে আসত বীরেশ। সে সব কোন অন্ধকার চোরা গলি দিয়ে আসছে সেটা আন্দাজ করতে অসুবিধা হত না। শত অভাব আর দুর্দশা সত্ত্বেও মা তা ছুঁত না। দীপা আর বরুণ দাদাকে বোঝাত, অঢেল অর্থের তাদের দরকার নেই। সৎভাবে রোজগার করে অল্প পয়সা আনলেও তারা খুশি। বীরেশ কিন্তু কোনো কথাই শুনতে চাইত না। তার মেজাজ ছিল ভয়ঙ্কর রকমের উগ্র। বাড়িতে বেশিক্ষণ সে থাকত না, যেটুকু সময়ই থাকুক শুধু তুমুল চিৎকার আর অশান্তি। গোলমালটা বেশি হত মায়ের সঙ্গেই। দীপা আর বরুণ তখন ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত।

খুব খারাপ সঙ্গে পড়ে গিয়েছিল বীরেশ। প্রায়ই ওর খোঁজে যারা বাড়ি পর্যন্ত আসত তারা ওই অঞ্চলের নাম-করা সব ক্রিমিনাল। তাদের নামে মানুষের কত যে অভিযোগ তার হিসেব নেই। কিন্তু মুখ ফুটে কারো কিছু বলার উপায় নেই। ভয়ে সবাই চুপ করে থাকে।

সন্দীপন বললেন, 'তোমার দাদার নামটা আমি শুনেছি। সে এখন কোথায়?'

দীপা বলল, 'জানি না। শুনেছি বর্ডার পেরিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে গেছে।'

'কারণটা কী?'

দীপা জানায়, যাদের সঙ্গে বীরেশ চোরাচালানের কাজ করত তাদের সঙ্গে ওর কোনো গোলমাল হয়েছে। প্রাণ বাঁচাতে পালানো ছাড়া অন্য রাস্তা ছিল না।

সন্দীপন জিজ্ঞেস করলেন, 'কতদিন আগে বাংলাদেশে গেছে তোমার দাদা?'

দীপা বলল, 'মাসখানেক।'

একটু চিন্তা করে সন্দীপন বললেন, 'স্যার যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন তাতে মনে হল, লেলো নামের গানম্যানটাকে তুমি চেনো।'

'শুধু লেলোকেই না, ওদের সবাইকেই চিনি। লেলো, পল্টা, রাজু—এই তিনজনের নাম জানি। বাকি দু'জন মুখচেনা।'

'এদের কিভাবে চিনলে?'

'ওদের সঙ্গেই তো বর্ডারের ওধারে মাল পাচার করত দাদা। দু'চার দিন পর পর আমাদের বাড়িতে আসত। তাই ওদের চিনি।'

সন্দীপন জিজ্ঞেস করলেন, 'এদের সঙ্গেই কি তোমার দাদার ঝগড়া হয়েছে?'

আস্তে মাথা নাড়ে দীপা, 'হ্যাঁ।'

'ঝগড়ার কারণটা জানো?'

'ঠিক বলতে পারব না। তবে মনে হয় টাকাপয়সার বখরা নিয়ে ঝঞ্ঝাট হয়েছে। অন্য কারণও অবশ্য থাকতে পারে। লেলোদের বড় একটা অভিযোগ, দাদা ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

সন্দীপন সামনের দিকে ঝুঁকে এবার প্রশ্ন করলেন, 'তোমার দাদার সঙ্গে লেলোদের ঝগড়া হতে পারে। কিন্তু ওরা তোমাকে জোর করে ট্রেন থেকে নামিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল কেন?'

দীপা এবার যা জানায় তা মোটামুটি এইরকম। বীরেশ পালিয়ে যাবার পর লেলোরা তার খোঁজে বার বার দীপাদের বাড়ি হানা দিয়েছে। ওদের ধারণা, বীরেশ বাংলাদেশে যায়নি। বাড়ির লোকেদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে, দীপারা জানে সে কোথায় রয়েছে। অস্বীকার করলেও লেলোরা বিশ্বাস করেনি।

বীরেশের সন্ধান না পেয়ে বন্দুকবাজরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। ওদের বাড়ির সবাইকে, বিশেষ করে দীপাকে তারা হুমকি দিয়েছে, বীরেশের ঠিকানা না জানালে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। ভাইয়ের বদলাটা লেলোরা বোনের ওপর নিতে চায়।

শাসানিতে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল দীপা। সহজে সে বাড়ি থেকে বেরুত না।

কিন্তু বাইরে তার অনেক কাজ থাকে। টাইপ-শর্টহ্যান্ড শেখে, কম্পিউটার আর হিন্দি ক্লাস করে। তাই না বেরুলে চলে না। তবু ক'দিন নিজেকে ঘরবন্দি করে রেখেছিল। কিন্তু আজ তাকে বেরুতেই হয়েছে। এক দূর সম্পর্কের সহৃদয় আত্মীয় কলকাতায় থাকেন। বিভিন্ন অফিসে তাঁর কিছু ভাল যোগাযোগ আছে। দীপার একটা চাকরির জন্য তিনি আন্তরিকভাবেই চেষ্টা করছেন। পরশু খবর পাঠিয়েছিলেন, আজ যেন অতি অবশ্য দীপা কলকাতায় চলে আসে। তাকে নিয়ে তিনি এক জায়গায় যাবেন। আশা আছে, কিছু একটা হলেও হতে পারে। অগত্যা বিপদের ঝুঁকি নিয়েই দীপা বেরিয়ে পড়েছিল। বাড়ি থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে সে লেলোদের চোখে পড়ে যায়। ওদের এড়াবার জন্য নানা গলিঘুঁজি দিয়ে ঘুরপথে স্টেশনে চলে আসে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনও এসে পড়ে। সে চট করে একটা কামরায় উঠে ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বন্দুকবাজগুলোর চোখে ধুলো দেওয়া সম্ভব হয়নি। শিকারি ডালকুত্তার মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে লেলোরা তাকে খুঁজে বার করে।

দীপা বলল, 'তারপর যা যা ঘটেছে, সবই স্যার আর আই-উইটনেসরা আপনাকে বলেছেন।'

সন্দীপন বললেন, 'তবু তোমার মুখেও শুনতে চাই।'

দীপা বুঝতে পারে, ঘটনার বিবরণ অন্যেরা যা দিয়েছে সেগুলোর সঙ্গে তার জবানবন্দির অমিল ধরা পড়ে কিনা, যাচাই করে নিতে চাইছেন সন্দীপন। অগত্যা তাকেও খুঁটিনাটি সব বলতে হল। মনোজ যথারীতি অন্যদের স্টেটমেন্টের মতো এটাও রেকর্ড করে নিল।

থানায় আসার পর তিন ঘন্টারও বেশি সময় কেটে গেছে। এখন একটা বেজে পঁচিশ।

মণিমোহন সন্দীপনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সবার জবানবন্দি নেওয়া হয়ে গেছে। এখন দীপা আর আমাকে নিয়ে তুমি কী করতে চাও?'

তক্ষুনি উত্তর দিলেন না সন্দীপন। মুখ নামিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'স্যার, আমি জানি খুন করার মতো একটা জঘন্য অপরাধ আপনার পক্ষে করা একেবারেই সম্ভব নয়। দীপা, আই-উইটনেসরা এবং আপনি নিজে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন তা শতকরা একশ ভাগ সত্যি। আত্মরক্ষার জন্য ধস্তাধস্তির সময় বন্দুক থেকে গুলি বেরুনোর ফলে ওই অ্যান্টি-সোশালটা মরেছে ; এটা আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার। নইলে আপনাকেই পল্টা খুন করে ফেলত। আত্মরক্ষা মানুষের একটা ফান্ডামেন্টাল রাইট।' একটু থেমে গলা নামিয়ে বললেন, 'তবু—'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন মণিমোহন, 'তবু কী?'

'মার্ডার তো একটা হয়ে গেছে।'

'তা তো হয়েছেই।'

'কেসটা কোর্টে উঠবে।'

'হয়তো উঠবে। কী নিয়ম, আমার ঠিক জানা নেই। আমি তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, যদি প্রয়োজন মনে কর, আমাকে অ্যারেস্ট করতে পার। তুমি আমার ছাত্র ছিলে বলে কোনোরকম দ্বিধার কারণ নেই।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন সন্দীপন। বললেন, 'স্যার, আপনারা একটু বসুন। আমি পাশের ঘর থেকে

ঘুরে আসছি।' বলে বেরিয়ে গেলেন।

মিনিট দশেক পেরিয়ে গেল। দীপা, মণিমোহন আর মনোজ চুপচাপ বসে আছেন। সবাই অবাক। কেন সন্দীপন পাশের কামরায় গেলেন, কিছুই আন্দাজ করা যাচ্ছে না।

একসময় দূর থেকে কিসের একটা আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। প্রথমটা ঠিক ধরা গেল না। ক্রমশ সেটা স্পষ্ট হল। মনে হচ্ছে, বহু মানুষ হই হই করতে করতে কিংবা স্লোগান দিতে দিতে থানার দিকে এগিয়ে আসছে।

মণিমোহন মনোজের দিকে তাকালেন, 'কী ব্যাপার?'

মনোজ বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার—' মণিমোহন কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল, তা ছাড়া তার সিনিয়র অফিসারের মাস্টারমশাই, সেই কারণে সে-ও তাঁকে স্যার বলছে।

মণিমোহনরা যেখানে বসে আছেন সেখান থেকে রাস্তার অনেকটা অংশ চোখে পড়ে। দেখা গেল, দু'আড়াই শ মানুষের এক জনতা থানার গেটের কাছাকাছি চলে এসেছে। বেশির ভাগই যুবক ; কিছু বয়স্ক লোক এবং মহিলাও রয়েছে। সকলেই ভয়ঙ্কর উত্তেজিত। মুঠি-পাকানো হাত আকাশের দিকে ছুঁড়তে ছুঁড়তে তারা চিৎকার করে একসঙ্গে কী যে বলছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

এদিকে থানার আর্মড কনস্টেবলরা গেটের সামনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এমন দুর্ভেদ্য দেওয়াল তৈরি করেছে যাতে জনতা ভেতরে ঢুকতে না পারে। মনোজও মণিমোহনদের বসতে বলে গেটের কাছে চলে গেল।

আজকাল পরিস্থিতি সর্বক্ষণ অগ্নিগর্ভ হয়ে থাকে। কারণে অকারণে, ছুতোনাতায় পথ অবরোধ, ট্রেন বন্ধ, থানা ঘেরাও লেগেই আছে। মণিমোহন সেরকমই কিছু একটা ভেবেছিলেন, সেজন্য তেমন মনোযোগ দেননি। আচমকা তাঁর নামটা কানে আসতে চমকে উঠলেন।

জনতা সমানে স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে।

'প্রিন্সিপ্যাল মণিমোহন সোম—'

'জিন্দাবাদ।'

'মণিমোহন সোমকে—'

'অ্যারেস্ট করে রাখা—'

'চলবে না, চলবে না—'

'মণিমোহন সোমের—'

'মুক্তি চাই, মুক্তি চাই—'

মণিমোহন ঘুরে বসে এবার ভাল করে লক্ষ করলেন। জনতার বেশির ভাগই তাঁর চেনা। একেবারে সামনের দিকে রয়েছে বিজন—আদিলপুর কলেজের ইকনমিকসের লেকচারার। বয়স আটাশ উনত্রিশ, মণিমোহনের খুবই অনুগত। বিজন ছাড়াও নানা বয়সের আরো কয়েকজন অধ্যাপককে দেখা যাচ্ছে। ইংরেজির সদাশিব হালদার, জিওগ্রাফির প্রাণকৃষ্ণ গুহ, ইতিহাসের মমতা মিত্র ইত্যাদি। এরা বাদে আছে আদিলপুরের নানা ধরনের মানুষ—ব্যবসাদার, স্কুল মাস্টার, ওই অঞ্চলের সরকারি কর্মচারি, এমনকি সিনিয়র উকিল পতিতপাবন মল্লিকও। অল্প বয়সের যে ছেলেমেয়েদের দেখা যাচ্ছে তারা নিশ্চয়ই কলেজের ছাত্রছাত্রী।

মণিমোহন আন্দাজ করে নিলেন, পল্টার খুন হওয়া এবং তাঁকে থানায় নিয়ে যাবার খবর আদিলপুরে পৌঁছে গেছে। ফলে সেখানে এমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে যে দলে দলে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা ছুটে এসেছে। এত লোক তাঁকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, নিজের চোখে দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন মণিমোহন।

ওদিকে বিশাল জনতার তুমুল হইচই শুনে পাশের কামরা থেকে দৌড়ে থানার গেটের কাছে চলে গিয়েছিলেন সন্দীপন। তাঁকে ভীষণ উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছে। দু হাত তুলে তিনি ভিড়টাকে শান্ত করতে চেষ্টা করছেন কিন্তু কেউ তাঁর কথা শুনছে না। বরং উত্তেজনা আরো তীব্র হয়ে উঠতে থাকে।

উন্মাদের মতো চিৎকার করছিল বিজন, 'আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না। স্যারকে এক্ষুনি ছেড়ে দিতে হবে।'

সন্দীপন বললেন, 'বিশ্বাস করুন, স্যারকে আমরা অ্যারেস্ট করিনি। রুটিন কিছু প্রশ্ন করার জন্যে

থানায় নিয়ে এসেছি।'

'পুলিশের কথা আমরা বিশ্বাস করি না।'

'আমি স্যারের ছাত্র। ওঁর কোনোরকম অমর্যাদা হয়, এমন কিছু করা কি আমার পক্ষে সম্ভব?'

বিজন ধমকে ওঠে, 'ওসব কথার প্যাঁচ কষে লাভ হবে না। স্যারের সঙ্গে আমরা দেখা করব। আপনারা কী উদ্দেশ্যে ওঁকে ধরে এনেছেন সেটা ওঁর মুখ থেকেই শুনতে চাই।'

সন্দীপন বললেন, 'নিশ্চয়ই। আসুন আমার সঙ্গে।' বিজনকে রাস্তা করে দেবার জন্য আর্মড কনস্টেবলদের সরে দাঁড়াতে নির্দেশ দিলেন।

'আমি একা যাব না।' জনতাকে দেখিয়ে বিজন বলল, 'এরাও আমার সঙ্গে থাকবে।'

সন্দীপনের মাথা খুব ঠাণ্ডা। তিনি জানেন, উত্তেজিত জনতা মারাত্মক দাহ্য পদার্থের মতো। একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে অগ্নিকাণ্ড ঘটে যেতে পারে। সবিনয়ে বললেন, 'থানার ভেতর এত লোকের জায়গা হবে না। আপনি একা আসতে না চান, কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আসুন। বাকিরা বাইরে থাকুন।'

সন্দীপনের কথায় যথেষ্ট যুক্তি আছে। কিন্তু বিজনের মস্তিষ্ক এখন এতই উত্তপ্ত যে কোনো কথাই শুনতে রাজি নয়। সে গোঁ ধরে রইল, তার সঙ্গীদের ভেতরে যেতে দিতে হবে।

এতক্ষণ ওসি'র চেম্বারে বসে বিজনদের কথাবার্তা শুনছিলেন মণিমোহন। একটা খুনের ব্যাপারে তাঁকে এই থানায় আসতে হয়েছে। তাঁর ছাত্র হলেও সন্দীপন একজন পুলিশ অফিসার। তিনি তাঁকে বসে থাকতে বলে গেছেন। কিন্তু বিজন যেরকম উত্তেজিত হয়ে আছে, তাতে তাকে এখনই থামানো দরকার।

মণিমোহনকে কিছুটা দ্বিধান্বিত দেখাল। সন্দীপন অপেক্ষা করতে বলার পরও উঠে গিয়ে ওঁদের কথার মধ্যে ঢুকে পড়াটা সমীচীন হবে কিনা, বুঝতে পারছিলেন না। হঠাৎ তিনি মনস্থির করে ফেলেন। ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন।

মণিমোহনকে দেখে হইচই কয়েক গুণ বেড়ে যায়। তিনি হাত তুলে, গলা চড়িয়ে বললেন, 'সবাই শান্ত হন, শান্ত হন। আপনাদের সব কথা আমি শুনেছি।' সন্দীপনকে দেখিয়ে বললেন, 'সত্যিই সন্দীপন আমার ছাত্র ছিল। আমাকে অ্যারেস্ট করেনি।'

মণিমোহনকে স্বচক্ষে দেখার পর উত্তেজনা কমে আসে।

বিজন বলে, 'স্যার, আদিলপুরে রটে গেছে, আপনাকে একটা খুনের কেসে জড়িয়ে দিয়ে থানায় এনে প্রচণ্ড মারধর করা হয়েছে। সারা শহর খেপে আছে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা যে ট্রেনটায় এলাম তার পরের ট্রেনগুলোয় আরো অনেক লোক থানা ঘেরাও করার জন্যে আসছে।'

মণিমোহন চমকে উঠলেন, 'কী আশ্চর্য, এসবের কোনো মানে হয়! আসল খবরটা তো আগে নেবে।'

তাঁর কথার উত্তর না দিয়ে বিজন সন্দীপনকে বলল, 'অ্যারেস্ট যখন করা হয়নি, স্যারকে ছেড়ে দিন।'

সন্দীপন বললেন, 'সামান্য একটা ফর্মালিটি আছে। মিনিট দশ পনের লাগবে। তারপর আমি নিজে গিয়ে ওঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

'তার দরকার নেই। আমরাই ওঁকে নিয়ে যাব।' বিজন বলতে লাগল, 'কিন্তু ফর্মালিটিটা কিসের?'

'ভেতরে আসুন।' সন্দীপন বললেন, 'নিজেই দেখতে পাবেন।'

মণিমোহন আদিলপুর কোর্টের সিনিয়র উকিল পতিতপাবন মল্লিককে দেখে আগেই অনুমান করেছিলেন, তাঁর জামিনের জন্য ওঁকে ধরে নিয়ে এসেছে বিজনরা। মল্লিককে জিজ্ঞেস করে জানা গেল তাঁর ধারণাটা সঠিক। বিজন খুবই বুদ্ধিমান, তার চোখ কান খোলা। শত উত্তেজনার মধ্যেও প্রয়োজনীয় কাজটি করতে তার ভুল হয় না।

বিজন ছাড়াও আদিলপুর কলেজের তিন অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং পতিতপাবনকে ডেকে মণিমোহনই ওসি'র চেম্বারে নিয়ে এলেন। অন্যেরা গেটের বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল।

বিজনদের বসিয়ে মুখোমুখি বসলেন সন্দীপন। দীপা চুপচাপ একধারে বসে আছে। মণিমোহন খানিক আগে যখন বেরিয়ে গিয়েছিলেন তখনও সে নড়েনি। আচমকা এত লোকজন এসে পড়ায় সে হতচকিত।

তা ছাড়া চোখেমুখে সেই আতঙ্কটা তো রয়েছেই।

সন্দীপন বিজনদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নানারকম গুজব শুনে আপনারা এক্সাইটেড হয়ে ছুটে এসেছিলেন। আমার মনে হয়, আসল ব্যাপারটা আপনাদের জানা দরকার।'

বিজন উত্তর দিল না।

সন্দীপন সমস্ত ঘটনাটা জানিয়ে বললেন, 'আশা করি, আমার আর আমাদের এই থানার ওপর আপনাদের আর রাগ বা ক্ষোভ নেই।'

বিব্রতভাবে বিজন একটু হাসল।

এবার মণিমোহনের দিকে তাকালেন সন্দীপন, 'স্যার, তখন আমি পাশের ঘরে উঠে গিয়েছিলাম এস. পি সাহেবের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে। উনি বললেন, আপনার মতো রেসপেক্টেড মানুষ, ঘটনাচক্রে যিনি একটা মার্ডারের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন, নিজেই নিজের জামিনদার হতে পারেন। নইলে—'

মণিমোহন জিজ্ঞেস করলেন, 'নইলে কী?'

'আদিলপুর থেকে একজন ল'ইয়ার মানে মিস্টার মল্লিক এসেছেন। তিনিও আপনার জামিনের ব্যবস্থা করতে পারেন।'

'আমিই আমার জামিনদার হব। পরে দরকার হলে পতিতপাবনের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।'

সন্দীপন একজন কনস্টেবলকে দিয়ে কয়েকটা ছাপানো কাগজ আনিয়ে মণিমোহনকে দিয়ে সই করিয়ে বললেন, 'স্যার, আপনাকে আর কষ্ট দেব না। আপনার এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে।'

মণিমোহন জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি এখন যেতে পারি?'

সন্দীপন কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'হ্যাঁ। তবে স্যার, আপাতত কিছুদিন আদিলপুরেই থাকবেন।'

'তা কী করে সম্ভব? তোমাকে তো বলেছি আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। বাঙ্গালোরের টিকেট কাটা হয়ে গেছে। নেক্সট উইকে আমার ট্রেন।'

'কিন্তু স্যার, এখন আপনার বাঙ্গালোর যাওয়া হতে পারে না। দয়া করে টিকেটটা ক্যানসেল করবেন।'

বিজন হঠাৎ ঝাঁঝাল গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'আপনি কি গায়ের জোরে স্যারকে আটকে রাখবেন?'

হাতজোড় করে বিনীতভাবে সন্দীপন বললেন, 'তাই কখনও পারি? মার্ডার কেসটায় আরো ইন্টারোগেশনের জন্যে স্যারকে দরকার হবে। বাঙ্গালোর চলে গেলে ওখান থেকে এতদূরে ওঁর ছোটাছুটি করা কি সম্ভব, বিশেষ করে এই বয়েসে? আমি যা বললাম সেটা ঠিক কিনা আপনাদের ল'ইয়ার মিস্টার মল্লিককে জিজ্ঞেস করে দেখুন না—'

পতিতপাবন মল্লিক জানালেন, সন্দীপন ঠিকই বলেছেন—জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মণিমোহনকে অনেক বার প্রয়োজন হতে পারে। খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়লে সহজে মুক্তি পাওয়া যায় না।

বিজন এবার আর কিছু বলল না। আদিলপুরে থেকে যাওয়াটা মণিমোহনের পক্ষে কেন জরুরি সেটা সে বুঝতে পেরেছে।

মণিমোহন বললেন, 'ঠিক আছে, বাঙ্গালোরের টিকেট আমি ক্যানসেল করে দেব। এখন চলি।' তিনি উঠে পড়লেন। আর তখনই দীপার দিকে তাঁর চোখ চলে গেল। মেয়েটা আগের মতোই জড়সড় হয়ে সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বসে আছে।

মণিমোহন ধীরে ধীরে ফের বসে পড়েন। সন্দীপনকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমাকে তো ছেড়ে দিলে। কিন্তু এই মেয়েটার কী হবে?'

সন্দীপন বললেন, 'দীপাকে আটকে রাখছি না। ও চলে যেতে পারে।'

মুখের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল দীপার। কণ্ঠস্বরটাকে কোনোরকমে বার করে এনে সে বলল, 'আমি বাড়ি ফিরতে পারব না।'

সবাই চমকে উঠল।

মণিমোহন জিজ্ঞেস করলেন, 'বাড়ি ফিরবে না কেন?'

দীপা জানায়, বীরেশের জন্য কিছুদিন ধরে তার ওপর হামলা চালাচ্ছিল বন্দুকবাজেরা। তাদেরই একজন পল্টা আজ খুন হয়ে গেছে। বাকি যারা আছে তাদের হাত থেকে আর রেহাই নেই। খুনের বদলা তারা নেবেই। মণিমোহন শ্রদ্ধেয় মানুষ, তাঁর অসংখ্য ছাত্রছাত্রী এবং অনুরাগী আছে। তাঁর গায়ে

হাত তুলতে হয়তো ওরা সাহস করবে না। কিন্তু দীপারা অসহায়, আত্মরক্ষার ক্ষমতা তাদের নেই। পল্টার সঙ্গীরা তার সর্বনাশ তো করবেই, তার ছোট ভাই এবং মাকেও শেষ করে ফেলবে।

পল্টার খুন হয়ে যাওয়ার কারণে মণিমোহন, বিশেষ করে দীপা যে ভয়ঙ্কর বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে, এদিকটা কেউ ভেবে দেখেনি। ওই গ্যাংস্টারগুলো যে ধরনের নিষ্ঠুর এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ তাতে ওদের পক্ষে সবই সম্ভব।

দীপার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর জমাট স্তব্ধতা নেমে আসে।

অনেকক্ষণ পর মণিমোহন বললেন, 'যারা দিনের বেলায় হাজার হাজার লোকের সামনে বন্দুক দেখিয়ে একটা মেয়েকে ট্রেন থেকে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তাদের অসাধ্য কিছু নেই। দীপাদের সিকিউরিটির কী ব্যবস্থা হবে?' বলে সন্দীপনের দিকে তাকালেন।

সন্দীপন বললেন, 'আদিলপুর আমার থানার ভেতর পড়ে। আপনার সিকিউরিটির অ্যারেঞ্জমেন্ট আমিই করব। আর দীপার জন্যে নবীগঞ্জ থানাকে ফোন করে জানিয়ে দেব।'

'তুমি আমার বাড়ির সামনে পুলিশ পোস্টিং করতে চাও নাকি?'

'হ্যাঁ। কয়েক দিন দু'জন আর্মড থাক। ওদের দেখলে গ্যাংস্টারগুলো বুঝতে পারবে এখানে ঝামেলা করতে এলে বিপদ আছে।'

মণিমোহন বললেন, 'বাড়ির সামনে পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকবে, এ আমি ভাবতে পারি না।'

বিজন বলল, 'স্যারের জন্যে চিন্তা করতে হবে না। আদিলপুরের মানুষ দিনরাত ওঁকে পাহারা দেবে।'

সন্দীপন মৃদু হেসে বললেন, 'সে ঠিক আছে। তবু ওঁর মতো একজন মানুষের প্রতি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের একটা কর্তব্য আছে। সেটা না করলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমাদের ছাড়বে না। তা ছাড়া আমি কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চাই না।'

মণিমোহনও হাসলেন, 'ঠিক আছে, যা উচিত মনে হয় করো। একজন এডুকেশনিস্টকে পুলিশ পাহারায় থাকতে হবে। কোন দেশে আমরা বাস করছি!' বলে দীপার দিকে তাকালেন, 'আমার ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়, সোজা আদিলপুরে চলে এস।' মেয়েটার প্রতি নৈতিক দায়িত্ব এক মুহূর্তের জন্য তিনি ভুলতে পারছেন না।

দীপা বলল, 'ঠিকানা লিখতে হবে না। আপনার বাড়ি আমি চিনি।'

মণিমোহন সন্দীপনকে বললেন, 'দীপাকে একা ছেড়ে দিও না। আর্মড পুলিশ দিয়ে ওকে বাড়ি পৌঁছে দিও।'

'নিশ্চয়ই স্যার।'

'আমাদের সিকিউরিটির চাইতেও তোমাদের অনেক বড় একটা ডিউটি রয়েছে।'

সন্দীপন জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

মণিমোহন বললেন, 'যে গ্যাংস্টারগুলো পালিয়ে গেছে তাদের ধরে চরম শাস্তির ব্যবস্থা করা।'

'আমাদের দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি হবে না স্যার।'

তিন

সন্দীপনের ইচ্ছা ছিল থানার গাড়িতে করে মণিমোহনকে নিজে আদিলপুরে পৌঁছে দেবেন। কিন্তু বিজনরা তাতে রাজি নয়। ট্রেনেই তাঁকে নিয়ে তারা ফিরে গেল।

আদিলপুরে নামতেই চোখে পড়ল, স্টেশনে প্রচণ্ড ভিড়। সবাই উত্তেজিত এবং মারমুখী। খবর নিয়ে জানা গেল, থানায় যাবার জন্য জনতা উলটোদিকের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে। আদিলপুর থেকে আরো অনেকে যে বিক্ষোভ জানাতে যাবে, বিজন সেটা আগেই জানিয়েছিল।

মণিমোহনকে দেখে জনতা উদ্বেল হয়ে ওঠে। হুড়মুড় করে তাঁর দিকে সবাই ছুটে আসে। একসঙ্গে চিৎকার করে তারা জানতে চায়, তাঁর ওপর থানায় কোনোরকম জুলুম করা হয়েছে কিনা, ইত্যাদি।

মণিমোহন জনতাকে শান্ত করে জানান, পুলিশ বিন্দুমাত্র দুর্ব্যবহার করেনি। এত মানুষ যে তাঁর জন্য ছুটে এসেছে সে কারণে তিনি কৃতজ্ঞ। সবাইকে তিনি ধীরে ধীরে শান্তভাবে ফিরে যেতে বলেন।

তারপর বিজনের সঙ্গে স্টেশনের বাইরে এসে সাইকেল রিকশায় ওঠেন। যে অন্য তিন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং পতিতপাবন মল্লিক থানায় গিয়েছিলেন তাঁরাও রিকশা নেন। এঁরা কেউ শহরের এক জায়গায় থাকেন না, আলাদা আলাদা দিকে তাঁদের রিকশাগুলো চলতে শুরু করে।

স্টেশনের গায়ে চাপ-বাঁধা দোকানের লাইন। তা ছাড়া রয়েছে বেশ ক'টা ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ, পোস্ট অফিস, হোটেল, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি। জায়গাটা সেই সকাল থেকে অনেক রাত পর্যন্ত গমগম করে।

এখন চারটের মতো বাজে। শীতের বিকেল ক্রমশ জুড়োতে শুরু করেছে। রোদ জেল্লা হারিয়ে ম্যাড়মেড়ে হয়ে যাচ্ছে।

আজও যথারীতি এখানে প্রচুর মানুষ। তবে বেশ কিছু দোকানপাট বন্ধ রয়েছে। থোকায় থোকায় দশ বার জনের এক একটা দল এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। আবহাওয়া একটু থমথমে ধরনের।

রিকশায় যেতে যেতে বিজন তালা লাগানো দোকানগুলো দেখিয়ে বলল, 'কলেজের ছেলেরা ওগুলো বন্ধ করে দিয়েছে।'

একটু মজা করে মণিমোহন বললেন, 'তুমি বোধহয় তার নেতৃত্ব দিয়েছিলে?'

'না স্যার, এটা একেবারে স্পনটেনিয়াস ব্যাপার। কেউ ওদের কিছু বলে দেয়নি।'

'এটা কিন্তু ঠিক হয়নি। একজনকে পুলিশ থানায় নিয়ে গেছে বলে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করে দিতে হবে, এর কোনো মানে হয় না।'

'ছেলেরা তাদের রাগটা এইভাবেই প্রকাশ করতে চেয়েছে। ইয়ং ছেলেরা একটু ইমোশনাল হয়ে থাকে। তা ছাড়া—'

'কী?'

'রাস্তা থেকে কোনো একটা হুলিগানকে তুলে নিয়ে যাওয়া আর আপনাকে ধরা তো এক নয়।'

এদিকে রাস্তার লোকজন মণিমোহনদের দেখতে পেয়েছিল, তারা রিকশার দিকে এগিয়ে এসে ব্যগ্রভাবে জানতে চায়, থানায় তাঁর কোনোরকম অসম্মান হয়েছে কিনা। সবাইকে আশ্বস্ত করে মণিমোহন বলেন, 'একেবারেই না। যাদের দোকান বন্ধ রয়েছে তাদের খুলতে বলুন—'

স্টেশনের পাশের জমজমাট অংশটা পেরিয়ে আধ কিলোমিটার গেলে রাস্তাটা হঠাৎ সোজা হয়ে সটান দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। আদিলপুর একেবারে আদ্যিকালের শহর না হলেও বেশ পুরনো। দু ধারে একশ বছর আগের শ্যাওলা-ধরা পলেস্তারা-খসা বাড়িঘর যেমন আছে, তেমনি আছে নতুন নতুন সব একতলা, দোতলা। অনেকগুলো হাই-রাইজও এদিকটায় উঠেছে। তবে কোনোটাই ছ'তলার বেশি উঁচু নয়।

পঞ্চাশ বাহান্ন বছর আগের সেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থীদের ঢল নেমেছিল আদিলপুরে। তারপর এই শতাব্দীর শেষ আধাআধি জুড়ে জন-বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য, শহরের অন্য অঞ্চলগুলো প্রচণ্ড ঘিঞ্জি হলেও এই দক্ষিণ দিকটা এখনও মোটামুটি ফাঁকা আর নিরিবিলি।

রাস্তাটা একটা ছোট নদীর ধারে গিয়ে থেমেছে। ওটার নাম ঝামুর, পাঁচশ ফুটের মতো চওড়া। বর্ষাকাল বাদ দিলে বছরের অন্য সময় নদীটা কচুরিপানার তলায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। তার জলে জোয়ার-ভাটা খেলে না। কিন্তু আষাঢ় শ্রাবণ, এই দুটো মাস ঝামুরের চেহারা একেবারে বদলে যায়, ফুলে ফেঁপে নদী তখন উত্তাল।

ঝামুরের পাড়ে একটা হলুদ রঙের পুরনো তেতলা বাড়ির সামনে এসে সাইকেল রিকশা থামল। বেশ বড় বাড়ি, চারপাশে অনেকটা করে জায়গা। নাম 'শান্তি নিবাস'। আশি পঁচাশি বছর আগে মণিমোহনের ঠাকুরদা প্রীতিমোহন এটা তৈরি করিয়েছিলেন। তখন আশেপাশে বাড়িঘর বিশেষ কিছুই ছিল না।

ঝামুরের ওপারেও শহরের বিরাট পুরনো একটা অংশ ছড়িয়ে আছে। ওখানকার রাস্তাগুলো সরু সরু, জিলিপির প্যাঁচের মতো। টিন আর খোলার চালের বাড়িঘরই বেশি। মাঝে মাঝে শ্যাওলা-ধরা, নোনা-লাগা একতলা কি দোতলা। প্রতিটি রাস্তার মোড়ে মোড়ে কালী, শিব কি শনিঠাকুরের মন্দির। চারদিকে মানুষ পোকার মতো থিকথিক করছে। ওই অঞ্চলটার ভেতর দিয়ে একটা রাস্তা বর্ডারের দিকে চলে গেছে। দিবারাত্রি শ'য়ে শ'য়ে মালবোঝাই ট্রাক পোড়া ডিজেলের বিষ বাষ্প বাতাসে ছড়াতে

ছড়াতে রাস্তাটা ধরে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই।

বিজন আর মণিমোহন রিকশা থেকে নামতেই হরিপদর স্ত্রী তরুবালা তার দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে দৌড়ে এল। মেয়েটি কিশোরী, নাম লতু। ছেলেটির নাম গোপাল; বয়স দশ। তাদের চোখেমুখে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা।

মণিমোহন এ বাড়িতে একেবারে একা। স্ত্রী বহুকাল আগেই মারা গেছেন। ছেলেমেয়েরা বাইরে থাকে। তাঁর কাছে আদিলপুরের প্রচুর লোকজন নানা দরকারে আসে। কিন্তু কতক্ষণের জন্য? কাজ চুকে গেলেই চলে যায়। নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য তাই একতলার কোণের দিকের দু'খানা ঘরে হরিপদদের থাকতে দিয়েছেন। এ জন্য ভাড়া-টাড়া নেন না। হরিপদরা খাঁটি মানুষ—খুব সরল, কোনোরকম ঘোরপ্যাঁচ নেই। ওরা তাঁকে বাবার মতো সেবাযত্ন করে, তরুবালা দু বেলা রান্না করে দেয়। ছেলেমেয়ে দুটোর ভারি শান্ত স্বভাব, আদুরে। ওদের তিনি খুব পছন্দ করেন।

তরুবালা জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, থানায় আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি তো? পুলিশের লোকেদের লঘুগুরু জ্ঞান নেই।'

মণিমোহন বুঝতে পারছিলেন, তাঁকে যে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই খবরটা এ বাড়িতেও পৌঁছে গেছে। হেসে বললেন, 'না না, কিচ্ছু করেনি। দারোগা একসময় আমার ছাত্র ছিল।'

মুখচোখ থেকে দুশ্চিন্তার ভাবটা কেটে যায় তরুবালার। সে বলে, 'ভগবানের দয়ায় যে ক্ষতি হয়নি, এই ঢের।' মানুষটি খুবই ঈশ্বরবিশ্বাসী। একটু ভেবে বলল, 'অনেকে এসে আপনার খোঁজখবর নিয়ে গেছে। কিচ্ছু বলতে পারিনি। কী ভয় যে করছিল! ওরা আবার সন্ধের পর আসবে, বলে গেছে।'

'আচ্ছা। তোমরা ঘরে যাও—' লতু আর গোপালের গালে আলতো হাত ছুঁইয়ে একটু আদর করে বিজনকে নিয়ে বাড়ির ভেতর পা বাড়ালেন মণিমোহন।

তরুবালা বলল, 'আমি এখুনি চা করে নিয়ে যাচ্ছি।'

গোটা বাড়ির বেশির ভাগটাই মেহগনি কাঠের সেকেলে ডিজাইনের ভারি ভারি আসবাব আর বইপত্রে ঠাসা। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে দু'জনে তেতলার দক্ষিণ দিকের সবচেয়ে বড় ঘরখানায় চলে এলেন। এটা মণিমোহনের বেডরুম।

দিনের আয়ু প্রায় শেষ। পশ্চিম দিকে উঁচু উঁচু গাছপালার যে লাইনটা রয়েছে, সূর্য তার ওধারে নেমে গেছে। এর মধ্যেই মিহি কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। আকাশের গায়ে খানিক আগেও যে ফিকে আলোটুকু ছিল, একেবারে মুছে গেছে। উত্তুরে হাওয়া সারাদিন বয়ে যাচ্ছিল ঠিকই কিন্তু এখন একেবারে বেপরোয়া ঘোড়া ছোটাতে শুরু করেছে।

ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। মণিমোহন আলো জ্বাললেন। মাঝখানে প্রকাণ্ড খাট, দেওয়াল জুড়ে অনেকগুলো আলমারি, তার বেশির ভাগ বইয়ের। এছাড়া পড়াশোনার জন্য টেবিল, ইজিচেয়ার, একটা ছোট টিভি সেটও রয়েছে। এ বাড়ির প্রতিটি ফ্লোরেই একটা করে ড্রইংরুম। কেউ এলে তাকে বাইরের ঘরে বসানো হয় না; সোজা তাকে বেডরুমে নিয়ে আসেন মণিমোহন। এ ঘরের দরজা সবার জন্য খোলা। দর্শনপ্রার্থীদের জন্য অনেকগুলো বেতের মোড়া আর চেয়ারও সাজানো রয়েছে।

মণিমোহন বললেন, 'বসো।'

তাঁর স্যুটকেসটা বিজনের হাতেই ছিল। সেটা এক ধারে নামিয়ে রেখে সে একটা চেয়ারে বসল। মণিমোহন আধশোয়ার মতো খাটে শরীর এলিয়ে দিলেন। সেই সকাল থেকে তাঁর ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা প্রায় অবিশ্বাস্য। ট্রেন থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে একটা মেয়েকে জোর করে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা, একটা খুন, প্ল্যাটফর্মে রক্তের স্রোত, থানা, পুলিশ—সারা জীবনে এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা আগে আর কখনও ঘটেনি।

বিজন মণিমোহনকে লক্ষ করছিল। জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, খুব টায়ার্ড লাগছে?'

পুরো আট, সাড়ে আট ঘন্টা স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজনায় টান টান হয়ে ছিল। এখন সেগুলো শিথিল হয়ে গেছে। ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছিলেন মণিমোহন। সামান্য হেসে বললেন, 'হ্যাঁ।'

'হবারই কথা। নার্ভের ওপর দিয়ে যা স্ট্রেন গেল!'

মণিমোহন উত্তর দিলেন না।

তরুবালা চা আর একটা বড় প্লেটে খানকয়েক নোনতা বিস্কুট দিয়ে গেল।

মণিমোহন চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, 'আমি একটা কথা ভাবছি বিজন।'

বিজন চিরদিনই তাঁর ভীষণ অনুগত। মণিমোহনের প্রতি তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তারা ছিল ভীষণ গরিব, ওর বাবা আদিলপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে ছোটখাট কাজ করত। অনেকগুলো ভাইবোন। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়—এমন অবস্থা। ছাত্র হিসেবে বিজন ছিল অসাধারণ। অভাব অনটনের মধ্যেও স্কুল ফাইনালে স্টার পেয়েছিল। তবু পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যেত যদি না মণিমোহন তার পাশে দাঁড়াতেন। নিজে ওদের বাড়ি গিয়ে ওকে নিজের কলেজে নিয়ে এসে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। মাইনে দিতে হত না। বই খাতা পত্রের ব্যবস্থা মণিমোহনই করেছিলেন। এমন কি ফি মাসে কিছু আর্থিক সাহায্যও করতেন। এম. এ পাশ করার পর কলেজে লেকচারশিপটাও তিনিই পাইয়ে দেন। আজ বিজনের জীবনটা যে আগাগোড়া পালটে গেছে, সেটা কোনোভাবেই সম্ভব হত না, যদি না মণিমোহন তাকে হাত ধরে টেনে তুলতেন। বিজন সেটা ভোলেনি, যতক্ষণ সম্ভব সে তাঁকে সঙ্গ দিয়ে থাকে, তাঁর বহু কাজ করে দেয়। নানা ব্যাপারে মণিমোহন এই সৎ, পরিশ্রমী, কৃতজ্ঞ যুবকটির ওপর নির্ভর করে থাকেন।

বিজন উৎসুক সুরে জিজ্ঞেস করে, 'কী স্যার?'

'আমার মনে হচ্ছে, বেশ কিছুদিন আদিলপুর ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

'কেন?'

কী বলতে যাচ্ছিলেন মণিমোহন, ফোন বেজে ওঠে। বিজন সেটা তুলে কার সঙ্গে যেন কথা বলে মণিমোহনকে জানাল, 'শুকদেববাবু এক্ষুনি আসছেন।'

মণিমোহন বললেন, 'কোন শুকদেব—মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, না কোল্ড স্টোরেজওলা?'

'মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শুকদেব চাকলাদার। আপনি থানা থেকে বাড়ি ফিরে এসেছেন, খবরটা পেয়ে গেছেন শুকদেববাবু। ভীষণ উদ্বিগ্ন। বলতে যাচ্ছিলাম আপনি খুব ক্লান্ত, আজ আসার দরকার নেই। তার আগেই লাইন কেটে দিলেন।'

'আসতে যখন চাইছে, আসুক। যারা ভালবাসে কষ্ট হলেও তাদের না বলতে নেই।'

এরপর ঘন ঘন ফোন আসতে লাগল। মণিমোহনের ফিরে আসার খবর শুকদেব চাকলাদারই শুধু না, সারা আদিলপুর জেনে গেছে। প্রত্যেকে জানাল, আজই তারা আসছে। মণিমোহনকে স্বচক্ষে দেখা এবং তাঁর সঙ্গে দু একটা কথা না বলা পর্যন্ত তাদের কেউ স্বস্তি পাচ্ছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যে একে একে অনেকেই চলে আসে। শুকদেব চাকলাদার, আদিলপুর কলেজের এখনকার প্রিন্সিপ্যাল মধুসূদন মিত্র, হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের হেডমাস্টার প্রবুদ্ধ মাইতি, বড় ব্যবসায়ী যজ্ঞনাথ কুণ্ডু, স্থানীয় সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার মৃন্ময় হালদার, এমনি অনেকে। বিজনের সঙ্গে যে অধ্যাপকরা থানায় ছুটে গিয়েছিলেন তাঁরা অবশ্য আসেননি। তবে অন্য পাঁচ ছ'জন অধ্যাপক এলেন। আদিলপুরে একটা মেয়েদের বেসিক ট্রেনিং কলেজ আছে ; সেই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মণিকণা সান্যালও এসেছেন। এঁদের বেশির ভাগই একসময় তাঁর ছাত্র ছিলেন।

থানায় নিয়ে মণিমোহনের ওপর কোনোরকম নিগ্রহ চালানো হয়নি, এটা তাঁর মুখে শোনার পর সবাই খুশি। তবে দুশ্চিন্তা পুরোপুরি কাটে না। লেলোরা যে ধরনের গ্যাংস্টার, দীপা আর মণিমোহনের ওপর হামলা চালাবেই। তাঁদের নিরাপত্তার কী হবে? মণিমোহন জানালেন, পুলিশ দীপার দায়িত্ব নিয়েছে, আর তাঁর নিজের সিকিউরিটির প্রয়োজন নেই। তাঁর গায়ে ওরা হাত তুলতে সাহস করবে না।

যজ্ঞনাথ কুণ্ডু বললেন, 'আপনি স্যার লেলোদের চেনেন না। ওরা যে কী ডেঞ্জারাস, বলে বোঝাতে পারব না।'

বিজন বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। পুলিশ স্যারকেও প্রোটেকশন দিতে চেয়েছিল কিন্তু উনি কিছুতেই নিলেন না। আজ থেকে আমি এ বাড়িতেই থাকছি। দু একদিন দেখি। তেমন বুঝলে আরো কয়েকজনকে নিয়ে আসব। স্যারের পক্ষে একা থাকা কোনোভাবেই সেফ নয়।'

সবাই তার কথায় সায় দিলেন।

মণিমোহন বললেন, 'একা কোথায়, নিচে হরিপদরা রয়েছে না?'

বিজন বলল, 'ওরা নিরীহ মানুষ। মার্ডারারদের ঠেকানো কি ওদের কাজ?'

হরিপদরা না হয় পারবে না কিন্তু নিরস্ত্র বিজন বা তার সঙ্গীদের পক্ষে হত্যাকারীদের ঠেকানো কী করে সম্ভব, এই প্রশ্নটা করতে গিয়েও করলেন না মণিমোহন। মৃদু হেসে বললেন, 'তোমরা আমাকে নিয়ে বড় বেশি ভাবছ।'

বিজন বলল, 'স্যার, আপনার লাইফের ব্যাপারে আমরা কোনোরকম রিস্ক নিতে চাই না।'

নিরুপায় ভঙ্গিতে মণিমোহন বললেন, 'তোমরা যখন কোনো কথা শুনবে না তখন কী আর করা যাবে। যা ভাল বোঝ, কর।'

একটু চুপচাপ।

তারপর মণিমোহন বললেন, 'একটা কথা যত ভাবছি ততই সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।'

এখনকার প্রিন্সিপ্যাল মধুসূদন মিত্র বললেন, 'কী কথা স্যার?'

'ল অ্যাণ্ড অর্ডার ভেঙে পড়েছে, এটা অনেকদিন ধরেই জানি। আমাদের এই বর্ডার টাউনে রোজই খুন টুন হয়, বোমার আওয়াজে রাতে ঘুম হয় না। কিন্তু কয়েকশ মানুষের সামনে বেলা ন'টা সাড়ে ন'টায় একটা মেয়েকে গানম্যানরা ট্রেন থেকে নামিয়ে নিয়ে যাবে, কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি। এরা এত সাহস পায় কোত্থেকে?'

যজ্ঞনাথ বললেন,'আপনি স্যার অন্য জগতের মানুষ; সারাদিন নিজের পড়াশোনা, ছাত্রছাত্রী নিয়ে থাকেন। তাই হয়তো জানেন না, পলিটিক্যাল পার্টির লিডারদের প্রশ্রয়ে এরা কতটা বেড়ে উঠেছে।'

মণিমোহন শুনেছেন, আজকাল রাজনীতি থেকে সততা, আদর্শবাদ, নৈতিকতা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। খবরের কাগজে ক্রিমিনালাইজেশন অফ পলিটিকস বা রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন বলে একটা কথা প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু তার চেহারাটা কতখানি ভয়ঙ্কর সে সম্বন্ধে তাঁর খুব স্পষ্ট ধারণা নেই। বললেন, 'যে গানম্যানরা আজ দীপার ওপর হামলা চালিয়েছিল, কোন পলিটিক্যাল লিডার তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে?'

যজ্ঞনাথের চোখেমুখে ভয়ের ছায়া পড়ে। বিব্রতভাবে তিনি বললেন,'তা স্যার বলতে পারব না। ওরা তো এক পার্টিতে বেশিদিন থাকে না। আজ এই দলে তো কাল ওই দলে। যেখানে বেশি প্রোটেকশন আর টাকা ওরা সেখানেই ভিড় করে।'

'টাকা না হয় বুঝলাম, কিন্তু প্রোটেকশনটা কিসের?'

'নিজের চোখে আজ মারাত্মক একটা ঘটনা দেখেছেন। একটা বন্দুকবাজ মরেছে। পুলিশ যদি বাকিগুলোকে সত্যিই ধরতে পারে কিংবা ধরে, দু'দিনও আটকে রাখতে পারবে না।'

মণিমোহন হতবাক। জিজ্ঞেস করলেন, 'মানে?'

যজ্ঞনাথ উত্তর দেবার আগেই একজন অধ্যাপক, সুনির্মল ভৌমিক, বললেন, 'যে পলিটিক্যাল লিডার ওদের প্রোটেকশন দেয়, সে-ই ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে।' একটু থেমে বললেন, 'আসলে রাজনৈতিক নেতাদের হয়ে এরা ভোটের সময় বুথ জ্যাম করে, অপোনেন্ট পার্টির ওপর বোমাবন্দুক চালায়। তার বদলে ওরা যা খুশি করার লাইসেন্স পেয়ে যায়। ওদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো অ্যাকশন নিতে গেলে নেতারা রক্ষা করে। যারা ইলেকশানে জিততে সাহায্য করে তাদের গায়ে একটুকু আঁচড় লাগুক কোনো লিডারই তা চায় না।'

মণিমোহন বললেন, 'কিন্তু ওসি সন্দীপন আমাকে বলেছে লেলোদের ধরে পানিশমেন্টের ব্যবস্থা করবে।'

একজন অধ্যাপিকা, রুচিরা সেন বললেন, 'ইচ্ছে থাকলেও পুলিশ কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। যদি পারে, বুঝব সেটা মিরাকল।'

বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। শীতকাল বলে চারপাশ দ্রুত নিঝুম হয়ে যাচ্ছে। যাঁরা দেখা করতে এসেছিলেন, আজকের মতো বিদায় নিয়ে সবে উঠে দাঁড়িয়েছেন, হাত নেড়ে তাঁদের বসতে বললেন মণিমোহন। খানিক আগে হঠাৎ শুকদেব চাকলাদারের ফোন আসায় যে কথাটা বিজনকে বলা হয়নি, ভাবলেন, সেটা এঁদের সকলকে বলা দরকার।

মধুসূদন মিত্র জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের কিছু বলবেন স্যার?'

আস্তে মাথা নাড়লেন মণিমোহন, 'হ্যাঁ।'

সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মণিমোহন বললেন, 'একটা খুনের মামলায় ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, জড়িয়ে পড়েছি। ওসি আমাকে আদিলপুর ছেড়ে যেতে বারণ করেছে। আমার পক্ষে এখন বাঙ্গালোর যাওয়া হচ্ছে না।'

কেউ কিছু বললেন না।

মণিমোহনের বক্তব্য শেষ হয়নি। তিনি বলতে লাগলেন, 'যাওয়াই যখন হচ্ছে না, আপাতত আমার বিদায় সংবর্ধনাটা বন্ধ থাক।'

শুকদেব চাকলাদার বললেন, 'কিন্তু স্যার, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এমনকি 'বলাকা' সিনেমা হল বুক করেছি। যাঁরা সভাপতি, প্রধান অতিথি, উদ্বোধক হবেন, তাঁদের কনসেন্ট নিয়ে কার্ড ছাপতে চলে গেছে। এই অবস্থায়—'

শুকদেবকে থামিয়ে দিয়ে মণিমোহন হাসলেন, 'বিদায় যখন এক্ষুনি নিচ্ছি না তখন সংবর্ধনার মানে হয় না। সব ক্যানসেল করে দাও—'

শুকদেব চুপ করে রইলেন।

মণিমোহন মজার গলায় বললেন, 'আমি এখন যাচ্ছি না বলে মন খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

শুকদেব ভীষণ লজ্জা পেয়ে জোরে জোরে হাত এবং মাথা নেড়ে বললেন, 'এ কী বলছেন স্যার! আপনি সারা জীবন যদি আদিলপুরে থাকেন, সেটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। কালই সব ক্যানসেল করে দিচ্ছি।'

কথা হয়ে গিয়েছিল। সবার সঙ্গে বিজনও উঠে পড়ল। বলল, 'স্যার, আমি যে এখানে থাকব, বাড়িতে তো জানে না। ওদের খবর দিয়ে ঘন্টাখানেকের ভেতর চলে আসছি।'

'ঠিক আছে।' মণিমোহন হাসলেন।

সবাই চলে গেল।

চার

এতক্ষণ সময় পাওয়া যায়নি। আদিলপুরে ট্রেন থেকে নামার পর কত লোকের সঙ্গে কত কথা যে বলতে হয়েছে তার হিসেব নেই।

এখন ঘর ফাঁকা। নিচে বাগান থেকে একটানা ঝিঁঝিদের বিলাপ উঠে আসছে। কাচের জানালার বাইরে দৃশ্যমান সমস্ত কিছু সাদা কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে। তার ভেতর রাস্তার বাতি এবং চারদিকের বাড়ির আলোগুলো কেমন যেন অলৌকিক মনে হয়।

নির্জন ঘরে দীপার চিন্তাটা মণিমোহনের মাথায় আবার ফিরে এসেছে। যদিও সন্দীপন আশ্বাস দিয়েছেন তবু মেয়েটার জন্য ভীষণ উৎকণ্ঠা হতে লাগল। সে নবীগঞ্জে থাকে, কিন্তু এটুকু ছাড়া ওদের সঠিক ঠিকানাটা জেনে নেওয়া হয়নি। জানলেও এত রাতে তার সঙ্গে যোগাযোগ করার উপায় নেই।

খাট থেকে নিচে নেমে এলোমেলো পায়ে ঘরময় পায়চারি করতে করতে হঠাৎ মণিমোহনের মনে হল, সন্দীপনের কাছ থেকেই তো সব জেনে নেওয়া যায়।

সন্দীপন যে থানার ওসি তার নাম ধামুরিয়া। টেলিফোন ডাইরেক্টরি ঘেঁটে সেখানকার ফোন নাম্বার বার করে ডায়াল করলেন মণিমোহন। সন্দীপনকে পাওয়া গেল।

মণিমোহন জিজ্ঞেস করলেন, 'দীপাকে ওদের বাড়ি পৌঁছে দিয়েছ?'

সন্দীপন বললেন, 'আমি নিজে যাইনি। আমাদের এস.আই দাশগুপ্তকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'ওদের ফ্যামিলির সিকিউরিটির ব্যাপারটা?'

'দাশগুপ্ত নিজে নবীগঞ্জ থানায় গিয়ে ওখানকার ওসি ননীগোপাল চট্টরাজের সঙ্গে কথা বলেছে। ওদের থানা খুব আণ্ডারস্টাফড। বর্ডার কাছে বলে নানারকম ক্রাইম লেগে আছে। অবশ্য—'

মণিমোহন উদ্বেগ বোধ করছিলেন। বললেন,'দীপাদের সিকিউরিটির কী হল সেটা বল—'

সন্দীপন বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না স্যার। সারাক্ষণের জন্যে সিকিউরিটি দিতে না পারলেও দীপাদের বাড়ির ওপর নবীগঞ্জ থানা ওয়াচ রাখবে।'

'ননীগোপাল চট্টরাজের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে কি?'

'খুব বেশি নয়। কেন বলুন তো?'

'তুমি যদি ফোন করে দীপাদের বিপদের কথাটা একটু ভাল করে ওকে বুঝিয়ে দাও—'

'দেব স্যার, নিশ্চয়ই দেব।'

'ঠিক আছে। পরে তোমাকে আবার ফোন করব।'

'আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আমিই কী হচ্ছে না হচ্ছে, টাইম টু টাইম জানিয়ে দেব।'

টেলিফোন নামিয়ে রেখে ফের বিছানায় গিয়ে বসলেন মণিমোহন। স্টাফ কম থাকার কারণে দীপাদের বাড়িতে পুলিশ পোস্টিং করা যাবে না, এই খবরটা তাঁর মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে লাগল। তারই মধ্যে হঠাৎ খেয়াল হল, তিনি যে এখন আদিলপুর ছেড়ে যেতে পারবেন না, সেটা ছেলেদের জানিয়ে দেওয়া দরকার। কালই বিজনকে দিয়ে আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করাতে হবে।

এখন শুক্লপক্ষ চলেছে। ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে যে ঘোলাটে আলোটুকু বেরিয়ে এসেছে তাতে আদিলপুর শহর আশ্চর্য রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

বিজন এখনও ফেরেনি। মণিমোহনের মাথায় যখন নানা ভাবনার আলোড়ন চলছে সেই সময় ফোন বেজে ওঠে। থানা থেকে ফেরার পর আজ কতবার যে ফোন এল তার ঠিক নেই। এখানকার মানুষ তাঁকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, সেটা তিনি জানতেন কিন্তু তাঁর জন্য সবাই যে এত উৎকণ্ঠিত, তা জানা ছিল না।

টেলিফোনটা তুলে হ্যালো বলতেই একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'স্যার, আমি ধনঞ্জয়—'

গলাটা খসখসে এবং ভাঙা ভাঙা। কতকাল ধরে মণিমোহন এটা শুনে আসছেন—কখনও ফোনে, কখনও বা সামনাসামনি। ধনঞ্জয় বিশ্বাস বছর কয়েক তাঁর কলেজে যাতায়াত করেছে। বি. এ ফাইনালটা দেবার আগেই আচমকা পড়া ছেড়ে দিয়ে সোজা রাজনীতিতে নেমে পড়ে। এখন সে স্থানীয় এম. এল. এ।

ধনঞ্জয়ের ঠাকুরদা দেশভাগের পর সর্বস্ব খুইয়ে সপরিবারে সীমান্তের ওপার থেকে আদিলপুর চলে এসেছিল। তারপর অন্য সব শরণার্থীর মতো অনেক কষ্টে সামান্য একটা কাজ জুটিয়ে কোনোরকমে সংসারটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ধনঞ্জয়ের বাবা হরিমোহন অবশ্য সরকারি দপ্তরে মোটামুটি একটা মাঝারি ধরনের চাকরি পেয়ে বাড়ির হাল অনেকটাই ফিরিয়ে দিয়েছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার বলতে যা বোঝা যায় তাই।

ধনঞ্জয়ের জন্ম এই বাংলায়। সে এম.এল.এ হবার পর ওদের অবস্থা বদলে গেছে। আদিলপুরে বিরাট বাড়ি ছাড়া, কলকাতায় দু হাজার স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটও নাকি কিনেছে। তা ছাড়া দুটো নতুন মডেলের গাড়িও আছে তাদের।

যুবা বয়সেই ধনঞ্জয় এই সার সত্যটা বুঝে গিয়েছিল, পাশ কোর্সে হাজার কয়েক ছেলেমেয়ের সঙ্গে এক ঝাঁকে গ্রাজুয়েশনের ডিগ্রি নিয়ে বেরুলে বাড়তি ল্যাজ গজাবে না। অকারণ পরিশ্রম আর সময়ের অপচয়। তার এই বোধোদয়ও হয়েছিল, ভারতবর্ষে রাজনীতিই হল সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা। কোনোরকমে একবার এম.এল.এ বা এম. পি হতে পারলে পাঁচ বছরে পাঁচ পুরুষের আখের গুছিয়ে নেওয়া যায়। আর মন্ত্রী হতে পারলে টাকার আমদানিটা কী পরিমাণ হতে পারে তা কল্পনাও করা যাবে না।

ধনঞ্জয় অতীব করিৎকর্মা। কয়েক বছর পার্টি অফিসে ঘোরাঘুরির পর একখানা টিকেট বাগিয়ে ইলেকশানে নেমেছিল। প্রথম দু'বার গোহারা হেরেছে। তৃতীয় বার নানা কৌশলে অল্প ভোটের মার্জিনে বেরিয়ে গেছে। ধনঞ্জয় এম. এল. এ হবার পর সাড়ে চার বছর পার হয়েছে। ছ'মাস পর নতুন নির্বাচন আসছে। সে যে ভোটে দাঁড়াবে সেটা শতকরা একশ ভাগ নিশ্চিত।

প্রতিটি নির্বাচনের ঠিক আগে আগে বেশ কয়েক বার করে মণিমোহনের বাড়িতে হানা দেয় ধনঞ্জয়। তার একটাই আর্জি, স্যার তাকে আশীর্বাদ করুন এবং তার নির্বাচনী সভায় গিয়ে জনগণকে বলুন, সবাই যেন তাকে ভোট দেয়। মণিমোহনের যে বিপুল জনপ্রিয়তা, লোকে তাঁকে যেরকম শ্রদ্ধা করে

তাতে তিনি একবার বললেই কাজ হয়ে যাবে, সবাই চোখ বুজে ধনঞ্জয়কে ভোট দেবে। প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে এটুকু দাবি সে করতেই পারে। ধনঞ্জয়ের মতো তার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী অবিনাশ পালধিও একই প্রার্থনা নিয়ে ভোটের আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে পায়ের ধুলো নেয়। অবিনাশ অবশ্য তাঁর ছাত্র নয়। ধনঞ্জয় তবু কলেজ পর্যন্ত পৌঁছেছিল, অবিনাশ স্কুলের বেড়াটাও পেরুতে পারেনি।

মণিমোহন ওদের আদৌ পছন্দ করেন না। স্থানীয় পাক্ষিক 'আদিলপুর দর্পণ'-এ মাঝে মাঝে দু'জনের নামে নানা কেলেঙ্কারির খবর বেরোয়। সে কারণে তো বটেই, তা ছাড়া এখনকার রাজনীতিটা মণিমোহনের কাছে অত্যন্ত নোংরা ব্যাপার। তিনি তার একশ মাইলের মধ্যে থাকতে চান না। ধনঞ্জয় আর অবিনাশকে তিনি প্রতি বারই ফিরিয়ে দেন। তাঁর পক্ষে নির্বাচনী জনসভায় গিয়ে এ জাতীয় লোকের পক্ষে প্রচার করা সম্ভব নয়।

ধনঞ্জয় ফোন ধরেই ছিল। জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, লাইনটা কি কেটে গেল?'

মণিমোহন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। বললেন,'না, বল কী বলবে—'

'আমি ক'দিন আগে কলকাতায় গিয়েছিলাম। এখন অ্যাসেম্বলি চলছে তো। কিছুক্ষণ আগে বাড়ি ফিরে ওই ঘটনাটা শুনলাম। থানাতেও ফোন করেছিলাম। স্যার, কোর্টে যাতে আপনাকে টানাটানি না করে সেদিকটা আমি দেখব।'

রাজনীতির লোকজন আজকের ঘটনাটার সঙ্গে জড়িয়ে যাক, এটা একেবারেই চান না মণিমোহন। বললেন,'আইনকে নিজের পথে চলতে দাও। তোমার অনেক কাজ, আমার বিষয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট করো না।'

ধনঞ্জয় নাছোড়বান্দা। বলল, 'কী বলছেন স্যার, চিন্তা না করে কি পারি! মামলা টামলা ভীষণ বাজে ব্যাপার। আপনার মতো রেসপেক্টেড মানুষের এর ভেতর না থাকাই ভাল। ল'ইয়াররা কাউকে রেয়াত করে না। একবার কোর্টে তুলতে পারলে কী ধরনের জেরা করবে কে জানে।'

মণিমোহন বললেন, 'যা-ই করুক, আমার কোনো ভয় নেই। যা সত্যি তাই বলব।'

ধনঞ্জয় অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, 'আপনাকে এখন আর ডিসটার্ব করছি না। বোধহয় এখনও খাওয়া-দাওয়া হয়নি?'

মণিমোহন বললেন, 'না।'

ধনঞ্জয় বলল, 'আপনার ওপর দিয়ে আজ প্রচণ্ড ধকল গেছে। খেয়ে শুয়ে পড়ুন। কাল কি পরশু আপনাদের বাড়ি যাচ্ছি। ওই ব্যাপারটা নিয়ে যা করার আমিই কিন্তু করব স্যার।'

লোকটা একেবারে নাছোড়বান্দা। মণিমোহন আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই লাইন কেটে দিল ধনঞ্জয়। ভীষণ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগলেন তিনি। ধনঞ্জয় জোর করে আজকের ঘটনাটার ভেতর ঢুকে পড়তে চাইছে। তাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে কিনা, কে জানে।

আরো কিছুক্ষণ পর বিজন ফিরে এল।

পাঁচ

খুব ভোরে ওঠা মণিমোহনের বহুকালের অভ্যাস। ঘুলঘুলিতে আলোর আভাস দেখা দিলে তিনি আর শুয়ে থাকতে পারেন না। ঘুম ভাঙার পর শীতগ্রীষ্ম বার মাস তাঁর দৈনন্দিন রুটিনটা এভাবে শুরু হয়। মুখ ধুয়ে তিনি চলে যান নদীর ধারে। ঝামুরের পাড় ধরে বাঁধানো রাস্তায় ঘন্টাখানেক হাঁটাহাঁটির পর বাড়ি ফিরে বিস্কুট দিয়ে এক কাপ চা খান। তারপর অন্য কাজ।

আজ কিন্তু ঘুম ভাঙতে বেশ দেরি হয়ে গেল। বিছানা থেকে নামতে গিয়ে চোখে পড়ল, ডান পাশের দেওয়ালের ধার ঘেঁষে একটা ক্যাম্প খাটে আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে কেউ শুয়ে আছে। একটু অবাক হলেন মণিমোহন। পরক্ষণে মনে পড়ল, কাল রাতে সর্বক্ষণ তাঁকে পাহারা দেবার মহান দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল বিজন। সে-ই শুয়ে আছে। মণিমোহন ওর ঘুম ভাঙালেন না। কাল সেই দুপুর থেকে ছেলেটা কম ছোটাছুটি করেনি। আর কিছুক্ষণ ওর ঘুম দরকার।

মণিমোহন প্রথমে ঘরের দরজা আর জানালা খুললেন। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া এবং শীতের সোনালি রোদ ঘরের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেশ বেলা হয়ে গেছে। মনে মনে ভেবে নিলেন, আজ আর নদীর ধারে প্রাতঃভ্রমণ নয়।

মুখ ধুয়ে অ্যাটাচড বাথ থেকে বেরিয়ে এসে মণিমোহন দেখলেন, বিজন উঠে পড়েছে। ওয়াল-ক্লকটা এবার দেখে নিয়ে বললেন, 'সাড়ে আটটা বাজে। যাও, তাড়াতাড়ি বাথরুমের কাজ সেরে তরুবালাকে চা দিতে বল—'

'ইস, এত বেলা হয়ে গেছে!' বলে এক দৌড়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল বিজন।

কিছুক্ষণ পর চা খেতে খেতে মণিমোহন বললেন, 'টেলিগ্রামের কথাটা মনে আছে তো?' কাল রাতেই তিনি বিজনকে বলেছিলেন, আপাতত তাঁর যে বাঙ্গালোর যাওয়া হচ্ছে না, বড় ছেলে মৃন্ময়কে তা জানিয়ে দিতে হবে। দিল্লিতে ছোট ছেলেকেও জানতে হবে। সেটাই এখন মনে করিয়ে দিলেন।

বিজন বলল, 'নিশ্চয়ই স্যার। দশটায় পোস্ট অফিস খুলবে। তখন টেলিগ্রাম করে আসব।'

'আর একটা কথা বলছিলাম—'

'কী কথা?'

মণিমোহন বললেন, সারাদিন তাঁর মতো একজন বুড়ো মানুষের কাছে বসে থাকার কোনো মানে হয় না। দুপুরে বরং কলেজে গিয়ে ক্লাসগুলো করে আসুক বিজন। বাকি সময়টা তো সে এ বাড়িতে থাকছেই।

বিজন রাজি হল না। বলল, 'কলেজে আমার অনেক ছুটি পাওনা আছে। ক'দিন না গেলেও চলবে।'

অর্থাৎ মণিমোহনকে এক মুহূর্তও একলা থাকতে দিতে চায় না বিজন। কেন যে ক'টা বন্দুকবাজকে তার এত ভয়! সন্দেহ নেই ওরা ভীষণ বেপরোয়া। তাই বলে সারাক্ষণ সঙ্গে পাহারাদার নিয়ে থাকতে হবে? তিনি কী বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তরুবালার ছেলে গোপাল এসে হাজির। বলল, 'দাদু, অবিনাশ পালধি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। নিচে দাঁড়িয়ে আছে। নিয়ে আসব?' ছেলেটা খুব চালাকচতুর। মণিমোহনের সঙ্গে যারা দেখা করতে আসে তাদের প্রায় সবাইকে সে চেনে।

বেশ অবাকই হলেন মণিমোহন। নির্বাচনের এখনও কয়েক মাস দেরি। এত তাড়াতাড়ি তো অবিনাশের আসার কথা নয়। একটু ভেবে গোপালকে বললেন, 'ঠিক আছে, নিয়ে আয়।'

গোপাল চলে গেল।

বিজন বলল, 'কাল বলেছিলেন ধনঞ্জয় বিশ্বাস ফোন করেছিল। আজ অবিনাশ পালধি বাড়ি পর্যন্ত চলে এসেছে। পল্টার ব্যাপারটা নিয়ে পলিটিক্যাল পার্টির লোকেদের নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে।'

মণিমোহন বললেন, 'কী জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ওঁদের কথাবার্তার মধ্যেই অবিনাশ এসে পড়ল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'স্যার, ভেতরে আসব?'

'এস—'

ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে খুব সন্তর্পণে বসল অবিনাশ। কালো, মোটা, ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা। মুখটা গোলাকার। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কাঁচাপাকা কোঁকড়া চুল তার। দামি চশমার আড়ালে একজোড়া ঠাণ্ডা, সতর্ক চোখ। দু হাতে হিরে পান্না গোমেদ ইত্যাদি পাথর-বসানো সাত-আটটা আংটি। পরনে ধুতি এবং পাঞ্জাবির ওপর কাশ্মিরি শাল।

অবিনাশ বশংবদ ভঙ্গিতে ভেজা বেড়ালের মতো বসে আছে ঠিকই, কিন্তু কুড়ি বছর আগে এখানকার যিনি এম. এল. এ ছিলেন সেই প্রাণগোপাল সাহার নির্বাচনী এজেন্ট ছিল সে। এজেন্ট না বলে অ্যাকশন স্কোয়াডের আসল মস্তিষ্ক বললেই ঠিক হয়। এই ডিস্ট্রিক্টে তার মতো বোমা বানাতে, ছুরি চালাতে বা বন্দুকবাজি করতে আর কেউ পারত না। দু দু'বার বুথ জ্যাম করে, ভোটারদের ভয় দেখিয়ে, দলবলকে দিয়ে প্রচুর ফলস ভোট দিইয়ে প্রাণগোপাল সাহাকে এম. এল. এ বানিয়ে দিয়েছিল। পরে তার জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়। সে জান বাজি রেখে ইলেকশান তরিয়ে দেবে আর প্রাণগোপাল বিধানসভায় গিয়ে লম্বাচওড়া

ভাষণ দেবে, মিটিংয়ে সভাপতি হয়ে বসবে, নানা কৌশলে লাখ লাখ টাকা বানাবে, নতুন নতুন মডেলের গাড়িতে চড়বে, তা তো আর চিরকাল চলতে পারে না। বোমাবাজি, বন্দুকবাজি যখন করতেই হবে তখন নিজের জন্য করাই ভাল। একদিন প্রাণগোপাল সাহার পায়ের কাছে লম্বা হয়ে পড়ে সে বলেছিল, 'দাদা, দু'বার তো এম. এল. এ হলেন। এবার আপনার এই চামচাকে চান্স দিন, একটু করে খাই।' নিজের জমি কেউ কি সহজে ছেড়ে দেয়? প্রাণগোপালও দিতে চায়নি। কিন্তু অবিনাশ জোর করে তাকে সরিয়ে ইলেকশানে নেমে গিয়েছিল এবং কী আশ্চর্য, তার পলিটিক্যাল গুরু প্রাণগোপালের মতো সে-ও দু'বার এম. এল. এ হয়েছে। তবে শেষ নির্বাচনটায় ধনঞ্জয়ের কাছে হেরে গেছে।

এম. এল. এ হবার পর থেকে অবিনাশের প্রচুর কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ বা গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখন সে বিনয়ী, ভদ্র, লোকের সঙ্গে হেসে, হাতজোড় করে কথা বলে। নেতাদের স্টাইলগুলো সে দারুণ রপ্ত করে নিয়েছে। তবে এ অঞ্চলের মানুষজনের ধারণা ওটা স্রেফ মায়া আবরণ। অবিনাশের ভেতরে কুড়ি বছর আগের সেই বন্দুকবাজ অ্যাক্টিভিস্ট থেকেই গেছে।

চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে আচমকা কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় ভীষণ ব্যস্তভাবে উঠে এসে মণিমোহনের দু'পা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকায় অবিনাশ।

মণিমোহন হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'কী হল? কী হল?'

অবিনাশ কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বলল, 'স্যার, ঘরে ঢুকে প্রণাম করতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

মণিমোহন বললেন, 'ও। তা হঠাৎ কী মনে করে? তুমি তো ইলেকশানের আগে ছাড়া কখনও এ বাড়িতে আসো না।'

অবিনাশ যেন এতটুকু হয়ে গেল। কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'স্যার, পার্টির কাজে এত সব ঝঞ্ঝাট থাকে যে আসতে পারি না। তবে সবসময় আপনার খোঁজখবর নিই।'

বোঝা গেল, লোকটা ডাহা মিথ্যে বলছে। কিন্তু সেটা তো ওর মুখের ওপর বলা যায় না, বিশেষ করে মণিমোহনের মতো একজন মানুষের পক্ষে। তিনি বললেন,'হঠাৎ আসার কারণটা কী, এবার বল।'

অন্য সবাই বাড়ি এসে বা ফোন করে যা বলেছে, অবিনাশও তা-ই বলল। কালকের ঘটনার বিবরণ সে বিশদভাবে শুনেছে। ব্যাপারটা এমনই সাঙ্ঘাতিক যে মণিমোহনের জন্য দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুমোতে পারেনি। কালই আসত কিন্তু রাত্তিরে এসে বিরক্ত করতে চায়নি, ইত্যাদি।

মণিমোহন কিছু বললেন না। অবিনাশ আরো কী বলে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অবিনাশ গলা খাঁকরে এবার বলল, 'ওই পন্টা লেলোরা, মানে যারা দীপা বলে মেয়েটার ওপর হামলা করেছে তারা খুব ডেঞ্জারাস। ওরা না পারে হেন কাজ নেই।'

এটা নতুন কোনো খবর নয়। লেলোরা কতটা বিপজ্জনক নিজের চোখেই তা কাল দেখেছেন মণিমোহন।

অবিনাশ বলতে লাগল, 'স্যার, এই বন্দুকবাজগুলোর এত সাহস হত না যদি না এদের পেছনে কোনো গডফাদার থাকত।'

এরকম কথা আগেও কার মুখে যেন শুনেছিলেন মণিমোহন, এই মুহূর্তে মনে করতে পারলেন না।

অবিনাশ থামেনি,'স্যার, শুনেছি থানার ওসি আপনার ছাত্র ছিলেন। তাঁকে বলুন ওই বন্দুকবাজগুলোর সঙ্গে তাদের গডফাদারকেও যেন ধরেন। নইলে এই এরিয়ার ঝঞ্ঝাট কমবে না।'

মণিমোহন বললেন, 'লেলোদের গডফাদার না কী বললে— সে কে? তাকে চেনো?'

অবিনাশের চোখেমুখে অস্বস্তি ফুটে বেরোয়। ঢোক গিলে সে বলে, 'তা ঠিক জানি না। তবে আন্দাজ করতে পারি, কেউ না কেউ আছে। তার মুখোশটা পিপলের সামনে খুলে দেওয়া দরকার।'

মণিমোহন স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, লোকটা পুরোপুরি মিথ্যে বলছে। লেলোদের পেছনে কে আছে, সেটা ভাল করেই সে জানে। কেন অস্বীকার করছে, ঠিক ধরা যাচ্ছে না।

মণিমোহন বললেন, 'তুমি পলিটিক্যাল পার্টির একজন নাম-করা লিডার, এক্স এম. এল. এ। তোমার

হাতে কত লোকজন। তুমি থানায় গিয়ে বলছ না কেন?'

একটু চুপ থেকে কী ভাবল অবিনাশ। তারপর বলল, 'স্যার, আপনি এখানকার সবচেয়ে অনারেবল পারসন। আপনার কথার হেভি ওয়েট। আপনি চাপ দিলে কুইক কাজ হবে।' স্কুলের গণ্ডি না পেরুলেও তার মুখে ইংরেজির খই ফোটে, যদিও তার বেশির ভাগটাই ভুল।

মণিমোহন বললেন, 'আমি ওসি'কে বলেছি। আবার বলব। তোমার মতো নেতাদের দায়িত্ব কিন্তু অনেক।'

'নিশ্চয়ই থানায় যাব স্যার। এরকম একটা ব্যাপার ঘটল, এটা খুব শেমফুল—'

'শুধু লজ্জার নয়, ভয়ের।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ভয়ের।'

মণিমোহন বললেন, 'এখানে মানুষের নিরাপত্তা নেই। মানুষ যাতে নির্ভয়ে থাকতে পারে, তোমাদের পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর তা দেখা দরকার।'

অবিনাশ বলল, 'সিওর স্যার।'

মণিমোহন একটু ভেবে বললেন, 'ওসি'কে বলে এসেছি। কাল রাতে ধনঞ্জয় ফোন করেছিল, তাকেও বলেছি। এখন তোমাকে বলছি, দীপা নামে যে মেয়েটির ওপর হামলা হয়েছিল তার যেন কোনোরকম ক্ষতি না হয়। এটা তোমাদের সবার দায়িত্ব।'

'তা তো বটেই। আপনার কথা অলওয়েজ আমার মাইন্ডে থাকবে স্যার। আজ উঠছি। দু'চার দিনের ভেতর আবার এসে দেখা করব।'

অবিনাশ সেই যে এসেছিল তারপর দিন তিনেক কেটে গেছে। এর মধ্যে চাঞ্চল্যকর কিছু ঘটেনি। মণিমোহনের বাড়িতে এখন লোকজনের যাতায়াত কমে গেছে। তবে বিজন অনড়, সে এখান থেকে যাবে না।

সেদিনের ঘটনার জের কিছুটা থিতিয়ে এলেও দীপার সম্পর্কে উৎকণ্ঠা কাটেনি মণিমোহনের। রোজই সন্দীপনের সঙ্গে ফোনে তাঁর কথা হয়েছে। সন্দীপন জানিয়েছেন, দীপারা নিরাপদেই আছে। নবীগঞ্জ থানা তাদের ওপর নজর রাখছে। আশা করা যায় ওদের কোনো বিপদ ঘটবে না।

এম. এল. এ এবং তাঁর ছাত্র ধনঞ্জয় বিশ্বাস ফোন করে বলেছিল, বাড়ি এসে দেখা করবে কিন্তু আসেনি। তবে টেলিফোনে যোগাযোগটা রেখে গেছে। সে জানিয়েছে, জরুরি কাজে রোজ ভোরে উঠে তাকে কলকাতায় যেতে হচ্ছে, ফিরছেও অনেক রাতে। তাই স্যারের সঙ্গে দেখা করতে পারছে না। তবে মণিমোহন যেন কোনোরকম দুশ্চিন্তা না করেন। বন্দুকবাজেরা যাতে ধরা পড়ে এবং তাঁর আর দীপাদের ক্ষতি যাতে না হয় তার ব্যবস্থা সে করছে। কাজের চাপটা একটু কমলে সে দেখা করতে আসবে।

এতজনের ভরসা সত্ত্বেও মণিমোহন পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। দীপা সম্পর্কে কেমন একটা নৈতিক দায়িত্ব যেন এসে পড়েছে তাঁর ওপর। বিজনকে বলেছেন, 'চল, নবীগঞ্জে গিয়ে মেয়েটাকে দেখে আসি।'

বিজন জিজ্ঞেস করেছে, 'আপনি কি ওদের ঠিকানা জানেন?'

মণিমোহন বলেছেন, 'সন্দীপনকে ফোন করে জেনে নেব।'

তাঁর অস্থিরতার কারণটা অনুমান করতে পারছিল বিজন। বলেছে, 'আপনি দীপাদের সম্পর্কে খুব বেশি চিন্তা করছেন। ওরা ভালই আছে। খারাপ কিছু হলে নিশ্চয়ই খবর আসত।'

মণিমোহন বলেছেন, 'তুমি যা বলছ সেটাই হয়তো ঠিক। কিন্তু ওই গানম্যানগুলোর যে চেহারা দেখেছি তাতে কিছুতেই ভয়টা কাটছে না। পুলিশ পোস্টিং হয়নি, মাঝে মাঝে থানা থেকে গিয়ে দেখে আসছে। কিন্তু কোন ফাঁকে বদমাশগুলো কী করে বসবে, কে বলতে পারে!'

বিজন বলেছে, 'আর দু'একটা দিন দেখুন। তারপর যাওয়া যাবে।'

ছয়

রোজ তিনখানা খবরের কাগজ রাখেন মণিমোহন। দুটো বাংলা, একটা ইংরেজি। কলকাতা থেকে ট্রেনে কাগজ আদিলপুরে এসে পৌঁছয় এগারটা নাগাদ। কাগজওলা বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায় আরো এক ঘন্টা পর।

আজ দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বিজন আর মণিমোহন ভাগাভাগি করে কাগজ পড়ছিলেন. বাঙ্গালোর থেকে মৃন্ময়ের ফোন এল, 'বাবা, তোমার টেলিগ্রাম পেলাম। জানিয়েছ, এখন আসতে পারছ না। হঠাৎ কী হল? শরীর খারাপ?' তার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ফুটে বেরোয়।

'না না, আমি ভাল আছি।'

'আমার মনে হচ্ছে ভাল নেই। আমরা চিন্তা করব বলে তুমি লুকোচ্ছ।'

'কী আশ্চর্য, লুকবো কেন?'

'তা হলে এলে না যে?'

খানিকক্ষণ ইতস্তত করে মণিমোহন বললেন, 'এমন একটা ঘটনা ঘটেছে যাতে আদিলপুর ছেড়ে এক্ষুনি যেতে পারছি না।'

মৃন্ময় শ্বাস টানার মতো শব্দ করে জিজ্ঞেস করল, 'কী ঘটেছে বাবা?'

মৃন্ময়কে দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছিল সে ভীষণ শঙ্কিত। ওকে অন্ধকারে রাখা ঠিক হবে না। মণিমোহন ধীরে ধীরে সেদিনের ঘটনাটা জানিয়ে দিলেন।

মৃন্ময় শ্বাসরুদ্ধের মতো এবার বলেছে, 'এ তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। আমি কালকের ফ্লাইট ধরে চলে আসছি।'

'এ জন্যে তোর আসার দরকার নেই। এত উতলা হোস না। তেমন বুঝলে তোকে ফোন করব।'

মৃন্ময় কোনো কথা শুনতে চাইছিল না। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তার আসাটা বন্ধ করলেন মণিমোহন।

মৃন্ময়ের সঙ্গে কথা বলার ঘন্টাখানেক পর মণিমোহনের দু চোখে যখন তন্দ্রার ভাব এসেছে, হঠাৎ জিপের জোরাল আওয়াজ কানে এল। সামান্য চমকে উঠে সোজা হয়ে বসলেন তিনি। তাঁর ঘরের দরজা দিয়ে সামনের দিকে তাকালে শহরের দিকের রাস্তাটা অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়।

মণিমোহনের চোখে পড়ল, একটা পুলিশের জিপ তাঁর বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে।

ওদিকে বিজনের চোখেও ঢুল এসেছিল। সেও ধড়মড় করে উঠে বসে। বলে, 'স্যার, মনে হচ্ছে জিপটা এ বাড়িতেই আসবে।'

'হঠাৎ পুলিশ আসার কারণটা কী?'

'আমি নিচে গিয়ে দেখছি।'

বিজন ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল। মিনিট পাঁচেক পর যখন ফিরে এল তার সঙ্গে সন্দীপন। পুরো ইউনিফর্ম পরেই এসেছেন তিনি।

এই মুহূর্তে সন্দীপনকে আশা করেননি মণিমোহন। কিছুক্ষণ হতবাক তাকিয়ে রইলেন। তারপর ব্যস্তভাবে বললেন, 'আরে এস এস—বসো—'

সন্দীপন তাঁকে প্রণাম করে একটা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'কলেজে পড়ার সময় দু'তিন বার এসেছিলাম। বাড়িটা একই রকম আছে।'

মণিমোহন সামান্য হাসলেন। বাড়ি দেখার জন্য আচমকা সন্দীপন এসে পড়েননি, সেটা বোঝা যাচ্ছিল। তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সন্দীপন বললেন, 'এ সময়ে এসে আপনাকে বোধহয় বিরক্ত করলাম।'

'না না। তোমার সঙ্কোচের কারণ নেই। আগে চা খাও। তারপর যে জন্যে ছুটে এসেছ সেটা বল।'

'আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না। আমি খুব বেশি চা খাই না। এই বেলা আড়াইটার সময় তো নয়ই।'

'ঠিক আছে। শুরু কর—'

সন্দীপন বললেন, 'ব্যাপারটা সিক্রেট।' বলে চোখের কোণ দিয়ে বিজনকে একবার দেখে নিলেন।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছিলেন মণিমোহন। বললেন, 'বিজনের সামনে বলতে পার। ওর মুখ থেকে কথা বেরুবে না।'

সন্দীপন একটু বিব্রত বোধ করলেন। তারপর বললেন, 'স্যার, সেদিন আপনাকে গানম্যানগুলোকে অ্যারেস্ট করার কথা বলেছিলাম।'

'হ্যাঁ। ওরা ধরা পড়েছে?'

'না।'

মণিমোহন জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা কি অ্যাবসকন্ড করেছে?'

সন্দীপন বললেন, 'না স্যার, ফেরার হয়নি। আমাদের সোর্স খবর দিয়েছে ওদের নবীগঞ্জে তো বটেই, তা ছাড়া আরো দু'একটা জায়গায় দেখা গেছে।'

'তা হলে ধরছ না কেন?'

'ওপর থেকে জানিয়ে দিয়েছে, পাবলিক প্রেসার খুব বেশি না হলে যেন ওদের ধরা না হয়। শেষ পর্যন্ত যদি ধরতেই হয়, কেস এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে ক্রিমিনালগুলোর খুব একটা পানিশমেন্ট না হয়।'

মেরুদণ্ড টান টান হয়ে গেল মণিমোহনের। বললেন, 'কী বলছ তুমি! কতগুলো বদমাশ বন্দুক নিয়ে ওপেনলি যা খুশি তাই করে বেড়াবে আর তাদের গায়ে আঁচড়টা কাটা যাবে না? ল অ্যান্ড অর্ডার বলে ব্যাপারটা কি ফার্স হয়ে দাঁড়িয়েছে?'

সন্দীপন উত্তর দিলেন না, তাঁর মুখে বিষণ্ণ একটু হাসি ফুটল।

সামনের দিকে ঝুঁকে মণিমোহন এবার বললেন, 'ওপর থেকে জানিয়েছে বলতে কী বোঝাতে চাইছ? কে জানিয়েছে?'

সন্দীপন চুপ করে রইলেন।

মণিমোহন বললেন, 'কী হল?'

সন্দীপন বললেন, 'সেটা বলা যাবে না স্যার।'

'কেন?'

'আমার অসুবিধা আছে। দয়া করে এ নিয়ে প্রশ্ন করবেন না।'

মণিমোহন কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার যখন ইচ্ছা নয় তখন জিজ্ঞেস করছি না। কিন্তু সাধারণ মানুষকে নিরাপদে রাখার জন্যে ক্রিমিনালদের ধরা তো পুলিশ ডিপার্টমেন্টের আসল কাজ। ওপর থেকে তোমার কাছে ওইরকম একটা অদ্ভুত নির্দেশ আসার কিছু তো একটা কারণ থাকবে। সেটা কী?'

সন্দীপন কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, 'আমার ওপরে যাঁরা আছেন তাঁদের হয়তো কেউ লেলোদের কেসটায় বেশি ইমপর্টান্স না দেবার জন্যে চাপ দিচ্ছে।'

'তোমার ওপরওলার নামটা না হয় বলতে পারছ না। কিন্তু যে বা যারা তাঁকে চাপ দিচ্ছে তার বা তাদের পরিচয় জানাতে নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না।'

'সেটা আমার জানা নেই স্যার। থাকলে নিশ্চয়ই বলতাম।'

একটু চুপচাপ।

তারপর মণিমোহন বললেন, 'তুমি কি এই কথাটা বলার জন্যে আমার কাছে এসেছ?'

সন্দীপন চিন্তিতভাবে বললেন, 'শুধু এটুকুই না, আরো কিছু বলার আছে।'

'কী?'

'এই অবস্থায় আমার কী করা উচিত, বুঝতে পারছি না। আপনি কি কিছু সাজেস্ট করতে পারেন স্যার?'

উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে দিলেন না মণিমোহন। চোখ বুজে অনেকক্ষণ নীরব বসে রইলেন। সন্দীপনের সততা বা কর্তব্যবোধ সম্পর্কে তাঁর সংশয় নেই। সৎ বলেই ছেলেটা তাঁর কাছে ছুটে এসেছে। সন্দীপনের ইচ্ছা, বন্দুকবাজগুলোর চরম শাস্তি হোক কিন্তু তাঁর হাত-পা বাঁধা।

সন্দীপনের অসহায়তা বুঝতে পারছিলেন মণিমোহন। একসময় বললেন, 'একটু আগে পাবলিক

প্রেসারের কথা কী বলছিলে যেন?'

আস্তে মাথা নাড়েন সন্দীপন, 'হ্যাঁ স্যার। আমার ওপরওলা জানিয়েছেন, পিপল জোরাল চাপ দিলে সামান্য কিছু স্টেপ যেন নেওয়া হয়।'

'পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর সংগঠনের ক্ষমতা আছে। তারাই পারে জনমত গড়ে তুলতে। ধনঞ্জয় বিশ্বাস আর অবিনাশ পালধি এখানকার সবচেয়ে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লিডার। তুমি তাদের সঙ্গে দেখা করে মুভমেন্ট শুরু করতে বল। এ এমন একটা ইস্যু, ওরা পিপলের সাপোর্ট খুব বড় আকারেই পেয়ে যাবে।' মণিমোহন বলতে লাগলেন, 'পপুলারিটি বাড়বে, এমন কোনো ব্যাপারই রাজনৈতিক দলগুলো ছাড়তে চায় না। ধনঞ্জয়রা এই প্রস্তাব পাওয়ামাত্র লুফে নেবে।'

সন্দীপন একটু চমকে উঠলেন। বিব্রত মুখে বললেন, 'না না, এ একেবারেই অসম্ভব।'

মণিমোহন জিজ্ঞেস করলেন, 'কী অসম্ভব?'

'আমি একজন পুলিশ অফিসার। আমার পক্ষে পলিটিক্যাল পার্টির নেতাদের মুভমেন্ট করতে বলা কোনোভাবেই উচিত নয়। এভাবে আমি ইনভলভড হতে পারি না।'

মণিমোহন বুঝতে পারছিলেন, একজন পুলিশ অফিসারের কাজকর্মের নির্দিষ্ট একটা পরিধি আছে। এর বাইরে তার পা বাড়ানো অনুচিত। আইনসঙ্গতভাবে যেটুকু করণীয় তার বেশি কিছু করা ঠিক নয়। রাজনৈতিক দলগুলোকে আন্দোলন করতে উসকে দিলে সন্দীপন এমনভাবে জড়িয়ে পড়বেন যাতে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, তাঁর এত উৎসাহ কেন?

সন্দীপন এবার বললেন, 'তা ছাড়া—'

'কী?'

'আমি যদি ধনঞ্জয় বিশ্বাস আর অবিনাশ পালধির কাছে যাই, মুহূর্তে খবরটা জানাজানি হয়ে যাবে। যিনি ওপর থেকে আমার হাতে পায়ে বেড়ি পরিয়েছেন, তিনিও জানতে পারবেন। আমি বিপদে পড়ে যাব।'

আচমকা বিদ্যুৎচমকের মতো একটা সংকেত মণিমোহনের মাথায় খেলে যায়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

সন্দীপন বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'তুমি কি চাইছ মুভমেন্টটা আমিই শুরু করি? এই জন্যেই বোধহয় এই দুপুরবেলা চলে এসেছ?' সোজা সন্দীপনের চোখের দিকে তাকালেন মণিমোহন।

সন্দীপন ধীরে ধীরে মুখ নামিয়ে নিলেন, 'ঠিক ধরেছেন স্যার। আপনি ছাড়া অন্য কারো কথা আমি ভাবতে পারছি না।'

মৃদু হেসে মণিমোহন বললেন, 'কিন্তু তুমি যে আমাকে ইনভলভ করাতে চাইছ, এই খবরটাও তো তোমার ওপরওলা জেনে যেতে পারে।'

সন্দীপন বললেন, 'আমি জানি, আপনি কাউকে বলবেন না।' বিজনকে দেখিয়ে বললেন, 'উনিও নিশ্চয়ই ব্যাপারটা গোপন রাখবেন।'

'তা রাখবে। কিন্তু—'

'কী?'

মণিমোহন বললেন, 'সারা জীবন আমি ছাত্রছাত্রী, কলেজ আর নিজের পড়াশোনা নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। কিভাবে আন্দোলন করতে হয়, আমার কোনো ধারণাই নেই।'

সন্দীপন বললেন, 'এ অঞ্চলে আপনার অসংখ্য ছাত্রছাত্রী। তা ছাড়া সাধারণ মানুষ আপনাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। একবার যদি ওদের ডাকেন, সবাই আপনার পেছনে এসে দাঁড়াবে।'

মণিমোহন হাসলেন, 'তুমি কি বাড়ি বাড়ি ঘুরে ওদের ডাকতে বলছ! আমার এই বয়েসে তা কি সম্ভব?'

একটা সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই জনমত গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন সন্দীপন। কিন্তু একজন বৃদ্ধ শিক্ষাব্রতী কোন পদ্ধতিতে সেটা করবেন? পলিটিক্যাল পার্টির লোকেদের মতো বাড়ি বাড়ি ঘোরা তো সত্যিই তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কী উত্তর দেবেন, ভেবে পেলেন না সন্দীপন।

মণিমোহন বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার কথাটা আমার মনে থাকবে। আমার কিছু বন্ধুবান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী আছে। তাদের সঙ্গে কথা বলি। তারা কী পরামর্শ দেয়, দেখি। যদি কিছু করা যায়, তোমাকে জানাব।'

'আচ্ছা স্যার, আজ চলি। আপনাকে পরে ফোন করব।'

সন্দীপন চলে যাবার পর বিজন বলল, 'আমার একটা খটকা লাগছে স্যার—'

মণিমোহন জিজ্ঞেস করলেন, 'কিসের খটকা?'

বিজন বলল, 'সন্দীপনবাবু অবশ্য বলেছেন, পলিটিক্যাল পার্টিগুলোকে আন্দোলন করার কথা বললে চাকরির দিক থেকে অসুবিধায় পড়ে যাবেন; সেজন্য আপনার কাছে এসেছেন। আমার মনে হয় সেটাই একমাত্র কারণ নয়।'

'অন্য কী কারণ থাকতে পারে?' মণিমোহন জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

বিজন বলতে লাগল, 'এত বড় একটা থানা যখন চালান তখন ধরে নিতেই হবে, সন্দীপনবাবু যথেষ্ট বুদ্ধিমান আর অভিজ্ঞ। সবার চোখের সামনে দিয়ে ধনঞ্জয় বিশ্বাস আর অবিনাশ পালধির সঙ্গে দেখা করার তো প্রয়োজন নেই। নিজেকে গোপন রেখে বিশ্বাসী লোকজন দিয়ে মুভমেন্টের ব্যাপারটা ওদের জানিয়ে দিতে পারতেন।'

মণিমোহন বললেন, 'ঠিক বলেছ। এটা তো আমি ভেবে দেখিনি।'

'আরো একটা দিক আছে স্যার—'

'কী?'

'এমন সাঙ্ঘাতিক একটা ঘটনা ঘটল, তারপর ক'টা দিন কেটেও গেছে। পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর তো ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু কেউ কি কিছু করছে?'

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন মণিমোহন, উত্তর দিলেন না।

বিজন বলতে লাগল, 'ধনঞ্জয় বিশ্বাস একবার আপনাকে ফোন করেছিল, হয়তো থানাতেও যোগাযোগ করেছে। অবিনাশ পালধি অবশ্য এ বাড়িতে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করে গেছে। ব্যস, এর বেশি কিছু নয়। যেখানে যাওয়া দরকার সেখানে কিন্তু যাচ্ছে না। এত বড় একটা ইস্যু, সারা অঞ্চল ওদের তোলপাড় করে ফেলা উচিত ছিল। কিন্তু সবাই হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে।'

মণিমোহন আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।

বিজন থামেনি, 'আমার কী মনে হয় জানেন স্যার?'

মণিমোহন বললেন, 'কী বল তো?'

'ধনঞ্জয় বিশ্বাস আর অবিনাশ পালধির ওপর আস্থা নেই সন্দীপনবাবুর। তাই এখানে এসেছিলেন।'

বিজনের কথায় যথেষ্ট যুক্তি আছে। ও যা বলল তা অসম্ভব নয়।

একটু চুপচাপ।

তারপর বিজন চিন্তিতভাবে বলে, 'আমি একটা কথা ভাবছিলাম স্যার।'

'কী?'

'যদি ক্রিমিনালগুলো নতুন কোনো ঝামেলা না করে, আপনার বা দীপাদের ওপর হামলা না চালায়, তাহলে আমাদের কি এ ব্যাপারে এগুনো উচিত হবে? চারপাশে কত অপরাধের ঘটনাই তো ঘটে চলেছে। আমরা ক'টার প্রতিকারই বা করতে পারি?'

বিজনের মনোভাবটা বুঝতে পারছিলেন মণিমোহন। রাজনৈতিক দলগুলোর দিক থেকে বন্দুকবাজদের বিরুদ্ধে হুলস্থুল বাধানোর কোনোরকম উদ্যোগ নেই, ধনঞ্জয় বিশ্বাস এবং অবিনাশ পালধির মতো আন্দোলনকারী যারা ছুতোনাতায় তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেয়, এখন হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। এই অবস্থায় গায়ে হাত না পড়লে মুভমেন্টে ঝাঁপিয়ে পড়ার কী প্রয়োজন মণিমোহনের? বিশেষ করে এই বয়সে?

মণিমোহন বললেন, 'তোমার কথার সারমর্ম বুঝতে পারছি। আর ক'টা দিন বরং লক্ষ করা যাক। তারপর ডিশিসান নেওয়া যাবে।'

সাত

সেদিনকার ঘটনাটা কলকাতার প্রতিটি কাগজের প্রথম পাতায় খুব বড় করে, যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছিল। 'বিখ্যাত শিক্ষাব্রতীর হাতে বন্দুকবাজ খুন', 'তরুণীকে রক্ষা করতে প্রাক্তন অধ্যক্ষের মরণপণ যুদ্ধ ঃ সমাজবিরোধী নিহত'—বড় বড় হরফে এ জাতীয় হেডলাইন দিয়ে যে অনুপুঙ্খ বিবরণ বেরিয়েছে তাতে প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

রিপোর্টটা পড়েই তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামী বন্ধুরা বেহালার বৃদ্ধাবাস থেকে ফোন করেছিলেন। সেদিন এঁদের কাছেই যাচ্ছিলেন মণিমোহন।

কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা গিয়েছিল, বন্ধুরা সবাই ভীষণ উৎকণ্ঠিত। খবরের কাগজের প্রতিবেদন তাঁরা পড়েছেন ঠিকই, তবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মণিমোহনের মুখ থেকে আবার সব জেনে নিয়েছিলেন। সব শোনার পর তাঁরা তক্ষুনি চলে আসতে চেয়েছেন। মণিমোহন তাঁদের শান্ত করে বলেছেন, আপাতত আসার দরকার নেই। তেমন বুঝলে তিনিই ওঁদের ফোন করবেন।

এই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে দু'জন আদিলপুরেরই মানুষ, মণিমোহনের একদা সহপাঠী। ওঁদের সূত্রেই বাকিদের সঙ্গে আলাপ এবং বন্ধুত্ব। ইংরেজ আমলে দেশের মুক্তির জন্য যখন ওঁরা লড়াই চালাচ্ছেন, নানাভাবে গোপনে তাঁদের সাহায্য করেছেন মণিমোহন।

এই পাঁচজনের ভেতর দু'জন চিরকুমার। বাকি তিনজন বিয়ে করেছেন, ছেলেমেয়েও আছে। কিন্তু নিজের সন্তানেরা তাঁদের কাছে কেমন যেন অপরিচিত। ওরা কেরিয়ারিস্ট, স্বার্থপর এবং আত্মকেন্দ্রিক। দেশ, দেশের মানুষ—এ নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। টাকা, এবং আরো টাকা, এছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না। মণিমোহনের এই বিবাহিত বন্ধুদের ধ্যানধারণার সঙ্গে তাঁদের ছেলেমেয়েদের লাইফস্টাইল বা জীবনযাপন পদ্ধতি একেবারেই মেলে না। তিক্ততা এবং অশান্তি এড়াবার জন্য তাঁরা একটা বৃদ্ধাবাস করেছেন, বাকি দুই অবিবাহিত বন্ধুকে সেখানে একরকম জোর করেই নিয়ে গেছেন। বাকি জীবনটা একসঙ্গে কাটিয়ে দেবার ইচ্ছা।

সেই ঘটনার পর থেকে রোজই বন্ধুরা মণিমোহনকে ফোন করে খবর নেন। তাঁর কোনো বিপদের আশঙ্কা আছে কিনা, মৃত বন্দুকবাজের সঙ্গীরা তাঁকে হুমকি দিচ্ছে কিনা, ইত্যাদি।

আগে থেকে কিছু না জানিয়ে দুই বন্ধু—পূর্ণানন্দ আর হরকুমার আজ সকালের ট্রেনে এসে হাজির।

মণিমোহন আর বিজন ওঁদের দেখে যতটা অবাক, তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি। দু'জনেই হই হই করে উঠলেন।

বিজন মণিমোহনের ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের সবাইকেই চেনে। সে বলে, 'আসুন আসুন, হোয়াট আ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ—'

পূর্ণানন্দ আর হরকুমার দুটো চেয়ারে বসলেন। মণিমোহন বললেন, 'আমি যে ঠিক আছি, নিজের চোখে না দেখে বুঝি বিশ্বাস করতে পারছিলে না?'

পূর্ণানন্দরা হাসলেন, 'তা যা বলেছ।'

'যজ্ঞেশ্বর, অনাথবন্ধু আর প্রিয়নাথ বাকি থাকল কেন? ওরা এলেও তো পারত।' মণিমোহন হেসে হেসে বললেন, 'আড্ডাটা খুব জমে যেত।'

পূর্ণানন্দ জানালেন, অন্য তিন বন্ধুরও আসার খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অনাথবন্ধুর কাল বিকেল থেকে জ্বর। দিনকয়েকের মধ্যে প্রিয়নাথের ছানি কাটানো হবে, খুব ঝাপসা দেখেন। কলকাতায় এখন এত গাড়ি বেড়েছে যে তাঁকে আনা মুশকিল, যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। যজ্ঞেশ্বরের ছোট মেয়ের ছেলে হয়েছে। জামাই জোর করে তাঁকে নাতি দেখাতে নিয়ে গেছে। তিন দিন পর ফিরবে।

মণিমোহন বললেন, 'এসেই যখন পড়েছ, ক'দিন থেকে যাও।'

পূর্ণানন্দ বললেন, 'না ভাই, কালই আমাদের ফিরে না গেলে নয়। পরশু চোখের ডাক্তারের কাছে প্রিয়নাথকে নিয়ে যেতে হবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে।'

ওঁদের কথাবার্তার ফাঁকে বিজন নিচে গিয়ে তরুবালাকে দিয়ে চা করিয়ে নিজেই নিয়ে এসেছে।

দু'জন অতিথি দুপুরে খাবেন, তার ব্যবস্থা করার কথাও জানিয়েছেন। তরুবালাই এ বাড়ির একরকম কর্ত্রী, তার কাছে মণিমোহন কিছু টাকা দিয়ে রেখেছেন। ক'জন খাবে, এটুকু বলে দিলেই আর কিছু ভাবতে হবে না। সুচারুভাবে সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।

চা খেতে খেতে সেদিনের ঘটনাটার কথা উঠল। পূর্ণানন্দ বললেন, 'এ কোন দেশে আমরা বাস করছি!'

হরকুমার বললেন, 'পনের কুড়ি বছর করে এক একজন যে ইংরেজের জেলে পচে মরলাম, সে কি এই ভারতবর্ষের জন্যে?'

বিজন বলে উঠল, 'একটা কথা বললে রাগ করবেন না তো?'

হরকুমার বললেন, 'না না, বল—'

'এর জন্যে কিন্তু আপনারা অনেকটাই দায়ী।'

'মানে?'

'একসময় কারা পলিটিকসে ছিলেন? গান্ধীজি, সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল, গোখেল, তিলক, সি. আর. দাশ, আজাদ—এমন কত নাম করব? এঁরা সবাই হাইলি-এডুকেটেড, কত স্যাক্রিফাইস এঁদের। দেশ আর দেশের মানুষই ছিল ওঁদের ধ্যানজ্ঞান। স্বাধীনতার পরও বেশ কয়েক বছর এক সময়ের আইডিয়ালিস্টরাই তো দেশটাকে চালিয়েছেন। হয়তো তাঁদের অনেক কাজ, অনেক সিদ্ধান্ত অনেকের পছন্দ হয়নি। তারপর এঁদের বেশির ভাগই মারা গেলেন।' বলতে বলতে একটু থামল বিজন।

হরকুমার এবার কিছু বললেন না। ঘরে বাকি তিনজনও চুপ করে রইলেন।

বিজন ফের শুরু করল, 'আর যাঁরা বেঁচে রইলেন, যেমন আপনারা তো রাজনীতিতেই এলেন না। আগে ভদ্র শিক্ষিত পরিবারের ছেলেমেয়েরা পলিটিকসে আসত। প্রফেসর, ডাক্তার, সিভিলিয়ান, ব্যারিস্টার—দেশসেবাকে এঁদের অনেকেই টপ প্রায়োরিটি দিয়েছেন। এখন এক লক্ষ ভাল ফ্যামিলি থেকে দু'তিন জনও আসে কিনা সন্দেহ। ফলে যা হবার হয়েছে। কোনো কিছুই তো ফাঁকা পড়ে থাকে না। শূন্য স্থান পূরণ করতে এখন এসেছে কারা? ফিফটি পার্সেন্টই অশিক্ষিত। এদের বেশির ভাগের নামেই জালিয়াতি, লুটপাট, মার্ডারের চার্জ, অনেকের বিরুদ্ধে বিশ্রী ক্রিমিনাল কেস চলছে। এরাই অ্যাসেম্বলি আর পার্লামেন্ট আলো করে বসে থাকে।'

পূর্ণানন্দ বললেন, 'ঠিকই বলেছ, এই সব লোকই এখন জননেতা। এরাই সব ক্ষমতা দখল করে বসেছে।'

বিজন বলল, 'আপনাদের মতো মানুষেরা দূরে সরে থাকার জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছে। ক্ষমতা হাতে রাখার জন্যে এরা ঝাঁকে ঝাঁকে ক্রিমিনাল তৈরি করছে। তারা বোমা মেরে, জোর করে বুথ দখল করে—'

দেশ নিয়ে এ জাতীয় ভারি তাত্ত্বিক আলোচনা কতক্ষণ চলত, ঠিক নেই। হঠাৎ দরজার বাইরে তরুবালার গলা শোনা গেল, 'বাবা, এই মেয়েটি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

সামনের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন মণিমোহন। দরজার বাইরে তরুবালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে দীপা। মেয়েটার চুল উস্কখুস্ক, লালচে চোখের তলায় কালো ছোপ, তার তাকানোর মধ্যে কেমন একটা ভয়াতুর, উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। সবচেয়ে উদ্বেগের কারণ, আগে না জানিয়ে হঠাৎ সে চলে এল কেন?

মণিমোহন উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, 'ভেতরে এস—'

দীপা যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না, ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে কোনোরকমে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'আমাদের ভীষণ বিপদ স্যার—' তার গলা কান্নায় বুজে গেল।

মণিমোহন তার কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সস্নেহে বললেন, 'কেঁদো না। এখন কিছু বলতে হবে না। আগে শান্ত হও। তারপর সব শুনছি।'

বিজন দীপাকে চেনে কিন্তু হরকুমার আর পূর্ণানন্দের কাছে সে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাঁরা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। মণিমোহন নিজের চেয়ারে এসে বসতে বসতে বন্ধুদের বললেন, 'এই মেয়েটিই দীপা। সেদিন ওকে নিয়েই ঘটনাটা ঘটেছিল।'

হরকুমাররা কৌতূহলী চোখে দীপাকে লক্ষ করতে লাগলেন। তবে যেভাবে দীপা চলে এসেছে

সেজন্য তাঁরা মণিমোহনের মতো যথেষ্ট উৎকণ্ঠিতও। অবশ্য কেউ কোনো প্রশ্ন করলেন না।

ঘরের ভেতর অদ্ভুত এক স্তব্ধতা নেমে এল।

বেশ কিছুক্ষণ কান্নার পর শান্ত হল দীপা। মুখ থেকে হাত সরিয়ে ফোলা ফোলা চোখে মণিমোহনের দিকে তাকাল।

আজ কী ঘটেছে, প্রথমেই তা জানতে চাইলেন না মণিমোহন। অধীরতা বা ভয় কাটিয়ে উঠতে খানিকটা সময় দিয়ে অন্য কথায় চলে গেলেন, 'আমাদের বাড়িটা চিনলে কী করে?'

'সেদিন থানায় আপনাকে বলেছিলাম, এই জায়গাটা আমার জানা আছে। রাস্তায় দু'একজনকে জিজ্ঞেস করতে দেখিয়ে দিল।'

'তুমি কিছু খাবে?'

'না না—'

একটু চুপচাপ।

তারপর মণিমোহন বললেন, 'কী হয়েছে এবার বল—'

পূর্ণানন্দ আর হরকুমারের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করতে লাগল দীপা। তার মনোভাব আন্দাজ করে নিয়ে মণিমোহন বললেন, 'এঁরা আমার বন্ধু। আমার মতোই এঁদের কাছেও তুমি সাহায্য পাবে।'

ভরসা পেয়ে দীপা বলল, 'আমার দাদার কথা বলেছিলাম, মনে আছে?'

'নিশ্চয়ই। তার নাম বীরেশ তো?'

'হ্যাঁ।'

'কী করেছে সে?'

দীপা জানালো, পল্টাদের সঙ্গে গোলমাল হবার পর প্রাণ বাঁচানোর জন্য বীরেশের পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। সে শুনেছে, বর্ডারের ওপারে চলে গেছে সে।

মণিমোহনের মনে পড়ে গেল। বললেন, 'এ কথা সেদিন তুমি থানাতেও বলেছিলে।'

দীপা এবার বলল, 'আমার ওপর ট্রেনে হামলা হবার খবরটা কিভাবে যেন দাদার কাছে পৌঁছে যায়। পরশু রাতে বদলা নেবার জন্যে সে এপারে এসেছিল কিন্তু কিছু করার আগে লেলোদের নজরে পড়ে যায়। ওদের তাড়া খেয়ে আবার সে পালায়।'

মণিমোহন শ্বাসরুদ্ধের মতো শুনে যাচ্ছিলেন। বললেন, 'সন্দীপনের মুখে শুনেছি, লেলোদের নাকি এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে। কথাটা তা হলে সত্যি।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'ওদের তো অ্যারেস্ট করার কথা।'

'সবাই ওদের দেখতে পায়, শুধু নবীগঞ্জের পুলিশ ছাড়া। অ্যারেস্ট করবে কী করে?'

একটু চুপ করে থেকে মণিমোহন বললেন, 'তারপর কী হয়েছে বল—'

দীপা বলল, 'ধামুরিয়া থেকে আপনার ছাত্র সন্দীপনবাবু লোক দিয়ে আমাকে নবীগঞ্জে পৌঁছে দেবার পর যদিও ভয়ে ভয়ে থাকতাম, কোনো ঝঞ্ঝাট হয়নি। কিন্তু পরশু সেই যে দাদা এল, তারপর ফের সমস্যা দেখা দিয়েছে।'

'কী সমস্যা?'

'দাদাকে তো লেলোরা হাতের কাছে পাচ্ছে না। তাই শোধ তোলার জন্যে আবার আমাদের টার্গেট করেছে। লেলো নিজে আসছে না, কিন্তু ওর দলের ছেলেরা মাঝে মাঝেই হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। যে কোনো মুহূর্তে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে, বিশেষ করে আমার।'

'পুলিশকে এ ব্যাপারটা জানিয়েছ?'

'রাস্তায় বেরুতে তো সাহস হয় না। আমাদের পাশের বাড়ির একজনের হাতে চিঠি লিখে থানায় পাঠিয়েছিলাম। অফিসার বলেছে, ব্যাপারটা সে দেখবে। আমার মনে হয়, কিছুই করবে না।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

কিছুক্ষণ ভেবে দীপা বলল, 'আমার দাদাকে তো চিনি। ভীষণ একরোখা। লেলোদের ও ছাড়বে না। যদি মারাত্মক কিছু ঘটিয়ে ফেলে আমাদের অবস্থা কী হবে ভেবে দেখুন!' একটু থেমে বলল,

মাকে আপনার কথা বলেছিলাম। মা বলল, যেভাবে হোক আজ আমি যেন আপনার সঙ্গে দেখা করে সব বলি। আমরা জানি আপনি ছাড়া কেউ আমাদের রক্ষা করতে পারবে না।'

দীপা আরো জানালো, লেলোদের চোখে যাতে না পড়ে, সেজন্য নানা অলিগলির ভেতর দিয়ে স্টেশনে এসে ট্রেন ধরে আদিলপুরে চলে এসেছে।

বিজন ওধার থেকে বলল, 'পরিস্থিতিটা খুব খারাপ দিকে চলে যাচ্ছে।'

তার কথা যেন শুনতে পায়নি দীপা। মণিমোহনকে বলল, 'অনেকখানি রিস্ক নিয়ে আপনার কাছে চলে এসেছি। কিভাবে ফিরব জানি না। ফেরার পথে হয়তো—' বলতে বলতে চুপ করে গেল সে।

দীপার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারছিলেন মণিমোহন। আসার সময় লেলোদের নজর এড়াতে পেরেছে বলে নিরাপদে যে সে ফিরতে পারবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। লেলো এবং তার দলবলের হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। তিনি বললেন, ' সেজন্যে তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

বিহ্বলের মতো দীপা বলল, 'আপনি যাবেন স্যার!'

'নিশ্চয়ই।' মণিমোহন বলতে লাগলেন, 'এত বড় একটা বিপদ মাথায় নিয়ে তুমি ফিরে যাবে, আর আমি এখানে বসে থাকব—তাই কখনও হয়?'

হরকুমার আর পূর্ণানন্দ এতক্ষণ চুপচাপ সব শুনছিলেন। তাঁরা এবার বলে উঠলেন, 'আমরাও যাব।'

একটু চুপচাপ।

তারপর দীপা বলল, 'আমার সৌভাগ্য, আপনারা কষ্ট করে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। কিন্তু ফিরেও তো আসবেন।'

মণিমোহন বললেন, 'হ্যাঁ, মানে—তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ?'

'আপনারা ফিরে আসার পর আমাদের কী হবে? এমন আতঙ্কের মধ্যে আর থাকতে পারছি না।'

হরকুমার, পূর্ণানন্দ আর মণিমোহন নিজেদের মধ্যে অনেকক্ষণ পরামর্শ করে নিলেন। দীপাদের জন্য যেটা সবচেয়ে আগে করা দরকার তা হল নিরাপত্তার ব্যবস্থা। দুই স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং একজন প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল স্থির করলেন, নবীগঞ্জে দীপাকে শুধু পৌঁছেই দেবেন না, ওখানকার থানায় গিয়ে এ বিষয়ে ওসি'র সঙ্গে কথাও বলবেন। প্রচণ্ড চাপ না দিলে এখানে কোনো কাজই হয় না। নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা দীপাকে জানিয়ে দিলেন তাঁরা।

বিজন দীপাকে লক্ষ করছিল। এই অবস্থায়, ভয়তাড়িত মেয়েটার জন্য প্রথম দিন থেকেই অপার সহানুভূতি বোধ করছে সে। অ্যান্টি-সোশাল ভাইয়ের জন্য নিরপরাধ এই মেয়েটার জীবন চরম বিপন্ন। পুলিশ তাকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে গড়িমসি করছে। ওকে রক্ষা করাটা খুবই জরুরি। কিন্তু কিভাবে, সেটাই ভেবে উঠতে পারছিল না সে। হঠাৎ একটা সম্ভাবনা তার মাথায় বিদ্যুৎচমকের মতো দেখা দিল।

মণিমোহন তাঁর দুই বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। বিজন আস্তে ডাকল, 'স্যার—'

মণিমোহন মুখ ফিরিয়ে তাকালেন, 'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ। দীপা সম্পর্কে আমি একটা কথা ভাবছিলাম।'

'কী?'

বিজন বলল, 'আমার ধারণা, নবীগঞ্জ থানা বিশেষ কিছু করবে না। লেলোরা দলবল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের গায়ে একটা আঙুলও ঠেকানো হচ্ছে না—এটাই পরিষ্কার ইনডিকেশন।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন মণিমোহন, 'ঠিকই বলেছ।'

'এই অবস্থায় ওদের নবীগঞ্জে থাকাটা একেবারেই সেফ নয়।'

'নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে ওরা যাবেই বা কোথায়?'

একটু ইতস্তত করে বিজন বলে, 'স্যার, আমি একটা টেম্পোরারি ব্যবস্থার কথা ভেবেছি।'

মণিমোহন জিজ্ঞেস করলেন, 'কী?'

বিজন বলল, 'আপনি যদি অনুমতি করেন, কিছুদিনের জন্যে যদি দীপারা এখানে এসে থাকে—

মানে, ওদের সমস্যাটার যতদিন না সলিউশন হচ্ছে—'

ভেতরে ভেতরে চকিত হয়ে উঠলেন মণিমোহন। দীপার জন্য ওইরকম মারাত্মক একটা ঘটনায় জড়িয়ে গিয়ে এর মধ্যেই লেলোদের বিষনজরে পড়ে গেছেন তিনি। এখন যদি ওদের বাড়িতে এনে তোলেন, লেলোদের আক্রোশটা কোন পর্যায়ে পৌঁছুবে, সেটা আন্দাজ করা যাচ্ছে। খানিকটা দূরত্বে থেকে কিছু করা আর সোজাসুজি বাড়িতে নিয়ে আসা এক নয়। বেশ দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লেন তিনি। ইতস্তত ভাবটা অবশ্য বাইরে বেরিয়ে আসতে দিলেন না। বললেন, 'নবীগঞ্জে তো দীপাকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিই। এক কাজ করা যাক, প্রথমে ওদের বাড়ি না গিয়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে সোজা ওখানকার থানায় যাব। ওসি'র কাছে জানতে চাইব, কেন দীপাদের ঠিকমতো প্রোটেকশন দেওয়া হচ্ছে না। দু'জন ফ্রিডম-ফাইটার, একজন এক্স-প্রিন্সিপ্যাল আর একজন এই জেনারেশনের তরুণ অধ্যাপক গিয়ে চাপ দিলে কাজ হবে না?'

পূর্ণানন্দ বললেন, 'হওয়া তো উচিত।'

বিকেলে দীপাকে নিয়ে চারজন নবীগঞ্জে গেলেন।

এই অঞ্চলের অন্য সব শহরের মতো নবীগঞ্জও ঘিঞ্জি আর নোংরা। বর্ডারের কাছাকাছি হওয়ায় দেশভাগের পর এখানেও প্রচুর মানুষ বেড়েছে। এখনও ওপার থেকে অনুপ্রবেশকারীরা অনবরত আসছে। তাদের অনেকেই গোপনে এ শহরে থেকে যাচ্ছে।

নবীগঞ্জ থানাটা শহরের ঠিক মাঝখানে। ওসি ননীগোপাল চট্টরাজকে সেখানে পাওয়া গেল।

পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স ননীগোপালের। মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি। কাঁচাপাকা কোঁকড়া চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। শুঁয়োপোকার মতো জোড়া ভুরু। চৌকো মুখ তাঁর, থ্যাবড়া থুতনি। গায়ের রং তামাটে। হাত-পায়ের হাড়গুলো মোটা মোটা। শরীরের কাঠামোটা রীতিমতো লম্বা-চওড়া, পেটানো স্বাস্থ্য। চোখ দুটোর দিকে তাকালে মুহূর্তে টের পাওয়া যায় লোকটা ভীষণ ধূর্ত।

মণিমোহনদের দেখে হকচকিয়ে গেলেন ননীগোপাল। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'স্যার আপনি!'

মণিমোহন বললেন, 'আমাকে চেনেন দেখছি।'

ননীগোপাল হাতজোড় করে বললেন, 'বিশ মাইলের মধ্যে যত শহর আর গ্রাম আছে, সেই সব জায়গার কোন লোকটা আপনাকে না চেনে? বসুন স্যার, আপনারা সবাই বসুন।' মণিমোহনরা বসলে অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'হঠাৎ আমাদের থানায়—' বলতে বলতে চুপ করে গেলেন।

এখানে আসার উদ্দেশ্যটা জানতে চাইছেন ননীগোপাল। মণিমোহন বললেন, 'সব বলব। তার আগে আমার সঙ্গীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' ননীগোপালের মুখে একটা হাসি হাসি ভাব ফুটে আছে ঠিকই, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তিনি যে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছেন সেটা মোটামুটি টের পাওয়া যাচ্ছে।

মণিমোহন স্বাধীনতা-সংগ্রামী হরকুমার আর পূর্ণানন্দের নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে ননীগোপালের হাসিটা ফিকে হয়ে গেল। মুখে অবশ্য বললেন, 'কী সৌভাগ্য, আপনাদের মতো মানুষের পায়ের ধুলো পড়ল এখানে! আমাদের এমন একটা চাকরি, গুণ্ডা মস্তান খুনী বদমাশ ঘেঁটে ঘেঁটে জীবন কেটে যায়। ভাল মানুষ, সৎ মানুষ, আদর্শবাদী মহান মানুষদের কাছে যাবার তো সুযোগ পাই না। আপনারা আসায় আনন্দ যেমন হচ্ছে তেমনি গৌরবও বোধ করছি। আমার জীবনে এই দিনটা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে স্যার।'

লোকটার বলার স্টাইল দারুণ নাটকীয়। গলার স্বরটাকে কখনও উঁচুতে তুলে, কখনও খাদে নামিয়ে যেভাবে যাত্রার সংলাপের মতো কথাগুলো বলে গেলেন, স্টেজে নামলে অনেক নটসূর্য বা নটসম্রাটের নাক কেটে দিতে পারতেন। কিংবা পলিটিক্স করলে বহু বক্তৃতাসর্বস্ব নেতার ঘুম ছুটে যেত।

মণিমোহন এরপর বিজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে দীপাকে দেখিয়ে বললেন, 'একে নিশ্চয়ই চেনেন?'

ননীগোপাল আগেই দীপাকে লক্ষ করেছিলেন কিন্তু যেন দেখতে পাননি, এমন একটা ভাব করে

তার দিকে বিশেষ তাকাননি। মণিমোহনের প্রশ্নে সামান্য থতিয়ে গিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, চিনি।'

মণিমোহন বললেন, 'এই মেয়েটির জন্যেই এখন আমাদের এখানে আসতে হয়েছে।'

ননীগোপাল বললেন, 'মানে, আমি ঠিক—'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি—' মণিমোহন বলতে লাগলেন, 'আমার ছাত্র ধামুরিয়ার ওসি সন্দীপন আপনাকে দীপাদের প্রোটেকশনের ওপর বিশেষভাবে জোর দিতে বলেছিলেন। কিন্তু আনফরচুনেটলি সেই কাজটা ঠিকভাবে হচ্ছে না।'

ননীগোপাল বললেন, 'কেন স্যার, আমরা তো দীপাদের বাড়িতে ওয়াচ রাখছি। যাতে ওদের ক্ষতি কেউ করতে না পারে সেজন্যে আমরা খুব সতর্ক আছি।'

বিজন বলে উঠল, 'ওদের অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্যরকম।'

ননীগোপাল বিজনের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন, কিছু বললেন না।

বিজন বলল, 'সেই বন্দুকবাজের দলবল রেগুলার ওদের হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। দীপারা বাড়ি থেকে বেরুতে পারছে না। আপনাদের জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। নিরুপায় হয়ে দীপা তাই স্যারের কাছে আজ ছুটে গিয়েছিল।'

ননীগোপাল রীতিমত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, 'না না, এমন তো হবার কথা নয়। ঠিক আছে, আমি খোঁজ নিয়ে সব ব্যবস্থা করছি। যাদের ওয়াচ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তাদের কারো গাফিলতি হলে তাকে ছাড়া হবে না। নিশ্চিন্ত থাকুন, আই মাস্ট টেক এ সিরিয়াস স্টেপ।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু—'

'কী?'

'এবার যা বলব সেটা কিন্তু আনপ্লেজান্ট—ভীষণ অপ্রিয়।'

ননীগোপাল কষ্ট করে একটু হাসলেন, 'হোক। আপনি বলুন—'

বিজন বলল, 'যে গ্যাংস্টাররা দীপার ওপর হামলা করেছিল তাদের কিন্তু এখনও অ্যারেস্ট করা হয়নি।'

ননীগোপাল উত্তর না দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

বিজন বলল, 'ওদের কিন্তু মাঝে মাঝেই নানা জায়গায় দেখা যাচ্ছে।'

ননীগোপাল ঢোক গিলে বললেন, 'জানি। খবর পাওয়ামাত্র থানা থেকে ফোর্স পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তারা পৌঁছুবার আগেই অ্যান্টি-সোশালগুলো পালিয়ে যাচ্ছে। ভাববেন না, ওরা আমার চোখে ধুলো দিয়ে বেশিদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে না।'

বিজন উত্তেজিতভাবে কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে পূর্ণানন্দ বললেন, 'অফিসার, আপনাকে একটা কথা পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি। গ্যাংস্টারগুলোকে আদৌ ধরবেন কিনা, ধরলে কবে ধরবেন সেটা সম্পূর্ণ পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্যাপার। কিন্তু দীপা বা ওদের ফ্যামিলির কারো যদি এতটুকু ক্ষতি হয় তার জন্য নবীগঞ্জ থানার ইনচার্জ হিসেবে সম্পূর্ণ দায়ী থাকবেন আপনি।'

ননীগোপাল অত্যন্ত ব্যস্তভাবে, শ্বাসটানা গলায় বললেন, 'স্যার, লেলোরা ধরা পড়ছে না বলে আপনারা ভাবতে পারেন ব্যাপারটায় আমরা তেমন গুরুত্ব দিচ্ছি না। সেটা কিন্তু ঠিক নয়। আমাদের দিক থেকে ত্রুটি নেই। মুশকিল হচ্ছে, বর্ডার এরিয়া তো। তাড়া খেলেই ওরা ওপারে পালিয়ে যায়।'

মণিমোহন এবার বললেন, 'আমরা এখন উঠছি। দীপাদের কথাটা মাথায় রাখবেন।'

হরকুমার এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন। এবার বলে উঠলেন, 'সাধারণ মানুষ যদি নিরাপদেই থাকতে না পারে, থানা পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন—এসব থাকার প্রয়োজন নেই।'

পূর্ণানন্দ বললেন, 'দীপাদের ওপর হামলা হলে আমাদের কিন্তু আপনার এই থানায় ফের আসতে হবে।'

চকিতের জন্য ননীগোপালের চোখে এক ঝলক আগুন দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। চোয়াল পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠেছিল। ফের সেটা নমনীয় হয়ে গেল। বশংবদ ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনাদের আর আসতে হবে না স্যার।'

'আচ্ছা চলি—'

মণিমোহনরা উঠে পড়লেন।

তৎক্ষণাৎ ননীগোপালও উঠে দাঁড়ান। বলেন, 'স্যার, প্রথম দিন এলেন। একটু চা না খেয়ে গেলে—' আপ্যায়নের জন্য হঠাৎ খুব ব্যাকুল হয়ে পড়লেন তিনি।

মণিমোহন বললেন, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

থানা থেকে বেরিয়ে বিজন বলল, 'ননী দারোগা বাইরে বিনয়ের অবতার। আমরা যা বললাম তাতেই রাজি হয়ে গেল। কিন্তু কিছুই করবে বলে মনে হচ্ছে না।'

পূর্ণানন্দ বললেন, 'আমি যখন ফের থানায় আসার কথা বললাম, লোকটার চোখ জ্বলে উঠেছিল। অবশ্য ফর এ মোমেন্ট।'

'আমিও সেটা লক্ষ করেছি।'

'আমার স্থির বিশ্বাস, লোকটার সঙ্গে গ্যাংস্টারগুলোর আনহোলি অ্যালায়েন্স আছে। ইচ্ছা থাকলে ক'টা বজ্জাতকে ধরতে ক'মিনিট লাগে! প্রত্যেকটা থানায় সেই এলাকার খুনী, মস্তানদের লিস্ট থাকে। তারা কোথায় কোথায় ঘোরে, কোন হাইড-আউটে লুকিয়ে থাকে, সব ওদের জানা। কিন্তু ননী দারোগা বন্দুকবাজদের বিরুদ্ধে একটা আঙুলও তুলবে না।'

মণিমোহন বললেন, 'আমার কিন্তু অতটা মনে হচ্ছে না।'

পূর্ণানন্দ জিজ্ঞেস করলেন, ' কেন?'

'ওর মনে যা-ই থাক, আমরা এতগুলো লোক এসেছি, আমাদের কিছু পরিচিতি আছে, মানুষজন আমাদের চেনে—এর একটা প্রেসার নিশ্চয়ই আছে। ওসি'র পক্ষে এখন আর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা সম্ভব হবে না।'

'কিন্তু—'

'দু'চারটে দিন দেখাই যাক না। যদি বোঝা যায় অবস্থা বদলায়নি তখন অন্য উপায় ভাবা যাবে।'

বিজন বলল, 'একটা কথা চিন্তা করে আমার খুব অবাক লাগছে স্যার।'

মণিমোহন জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কথা?'

'আপনার ছাত্র সন্দীপনবাবু আর এই ননীগোপাল চট্টরাজ, দু'জনেই দুটো থানার ওসি। অথচ ওদের মধ্যে কত তফাত!'

একসময় শহরের সবচেয়ে পুরানো এলাকার একতলায় যে বাড়িটার সামনে দীপা মণিমোহনদের নিয়ে এল সেটার বয়স কম করে ষাট সত্তর বছর তো হবেই। বাড়িটার গায়ে অনেক কাল রং পড়েনি। দেওয়ালগুলোতে শ্যাওলা জমে জমে চিরস্থায়ী কালো ছোপ। অনেক জায়গায় পলেস্তারা খসে ভেতরের ইট বেরিয়ে পড়েছে। ছাদের কার্নিস ফুঁড়ে মাথা তুলেছে বট-অশ্বত্থের চারা।

বাড়িটার চারপাশ ভাঙাচোরা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। রাস্তার দিকের সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দীপা কড়া নাড়াতেই কোনো মহিলার অতি সতর্ক. ভীরু কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কে?'

দীপা গলা উঁচুতে তুলে বলল, 'আমি দীপু—'

একটু পর দরজা খুলে আধময়লা থান-পরা যে বিধবা মহিলাটি মুখোমুখি দাঁড়াল তার বয়স পঞ্চাশের বেশি হবে না। একদা সে যে যথেষ্ট রূপসী ছিল, এক নজরেই তা আন্দাজ করা যায়। কিন্তু এখন চোখের কোণে কালি, ভাঙা গাল, খসখসে চামড়া, জ্বলে-যাওয়া গায়ের রং, চুল উঠে উঠে চওড়া হয়ে যাওয়া কপাল—সমস্ত শরীর জুড়ে শুধু ক্ষয়ের চিহ্ন। 'জীবন সংগ্রাম' বলে একটা খুব গুরুগম্ভীর কথা আছে। এই মহিলাকে দেখামাত্র তা টের পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশি করে যা চোখে পড়ে সেটা হল তার চোখ। সে দুটো সর্বক্ষণ যেন ভয়ে, আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে।

দীপা মণিমোহনকে দেখিয়ে মহিলাকে বলল, 'মা; ইনি সেই স্যার। আমাকে লেলোদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন।'

দীপার মায়ের নাম মনোরমা। তার চোখে অসীম কৃতজ্ঞতা ফুটে বেরোয়। মণিমোহনকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলে, 'সেদিন আপনি ট্রেনে না থাকলে মেয়েটার কী হত ভাবতে পারি না।'

মণিমোহন মৃদু হাসলেন, কিছু বললেন না।

দীপা এবার পূর্ণানন্দদের সঙ্গে মনোরমার পরিচয় করিয়ে দিল। বিজনের বয়স কম, তাই তাকে ছাড়া অন্য দু'জনকেও প্রণাম করল মনোরমা। এতজন বিশিষ্ট, শ্রদ্ধেয় মানুষ তাদের বাড়িতে এসেছেন। মহিলা একেবারে অভিভূত হয়ে যায়। বলে, 'আমাদের কী সৌভাগ্য! দয়া করে ভেতরে আসুন—'

মণিমোহন বললেন,'আজ থাক। দীপাকে পৌঁছে দিয়ে গেলাম। পরে একদিন আসব।'

মনোরমা কিন্তু ছাড়ল না। বাড়ির দরজা পর্যন্ত এসে মণিমোহনরা ফিরে যাবেন, তাই কখনও হয়? জোড়হাতে অনেক কাকুতি মিনতি করে তাঁদের বাড়ির ভেতরে বসার ঘরে নিয়ে এল।

এই ঘরটার একধারে নড়বড়ে চৌকির ওপর ময়লা চাদর পাতা, আর আছে হাতল-ভাঙা ক'টা চেয়ার। মণিমোহনদের বসিয়ে মনোরমা দীপাকে বলল, 'তুই এঁদের সঙ্গে কথা বল। আমি চা করে নিয়ে আসি।'

মণিমোহন বললেন, 'কিচ্ছু দরকার নেই। আপনি যদি চা করতে যান, আমরা কিন্তু এক্ষুনি উঠে পড়ব।'

অগত্যা মনোরমা কুণ্ঠিতভাবে একধারে বসে পড়ে।

মণিমোহন এবার বলেন, 'আপনি বাড়িতে একাই আছেন দেখছি। আপনার ছোট ছেলেটি?'

মনোরমা বুঝতে পারে, দীপার মুখে তাদের সব খবরই পেয়েছেন মণিমোহন। বলল,'স্কুল থেকে এখনও ফেরেনি।' একটু থেমে বলল, 'যতক্ষণ না ফেরে দুশ্চিন্তা কাটে না।'

কী উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন মণিমোহন, মনোরমা আবার বলে ওঠে 'বাবা, আপনার তো কিছুই অজানা নেই। আমার স্বামী মারা যাবার পর দুঃখ কষ্টের ভেতর দিয়ে একরকম কাটছিল। কিন্তু বড় ছেলেটা কুসঙ্গে পড়ে আমাদের একেবারে শেষ করে দিচ্ছে।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন মণিমোহন।

মনোরমা এবার বলে, 'সেদিনের ওই ঘটনাটার পর আমরা বাড়ি থেকে বেরুতে পারি না। বেরুলেই হুমকি। সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে কাটছে। বিশেষ করে দীপুটার জন্যে। নিরুপায় হয়ে আজ ওকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম বাবা।'

মণিমোহন বললেন, 'আমরা ওকে এখানকার থানায় নিয়ে গিয়েছিলাম। ওসি কথা দিয়েছে, আপনাদের যাতে কোনো বিপদ না হয়, সেটা ওরা দেখবে।'

মনোরমা আদৌ ভরসা পেয়েছে বলে মনে হল না। সে বলল, 'আমি ওদের জানি। মুখে বলবে কিন্তু কিচ্ছু করবে না। আপনারা ছাড়া নির্ভর করার মতো আমাদের আর কেউ নেই।'

মণিমোহন কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'তেমন বুঝলে আপনারা বাড়ি বন্ধ করে আমার কাছে চলে যাবেন। সেখানে কেউ আপনাদের এতটুকু ক্ষতি করতে পারবে না।'

মনোরমার চোখে আলোর একটা রেখা যেন ফুটে ওঠে। সে বলে, 'তাই যাব বাবা। এখানে সারাক্ষণ দমবন্ধ করে আর থাকতে পারছি না।'

মণিমোহনরা আর বসলেন না। ধীরে ধীরে উঠে পড়লেন।

আট

নবীগঞ্জ থেকে ফেরার পর তিন দিন কেটে গেছে। এর মধ্যে তেমন কিছুই ঘটেনি। সন্দীপন ফোনে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছেন। বিজন মণিমোহনের কাছেই আছে। তবে কাল থেকে আবার কলেজে যেতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে, বন্দুকবাজগুলোর দিক থেকে হামলার সম্ভাবনা আর নেই। কাজেই কামাই করাটা ঠিক নয়। পূর্ণানন্দ আর হরকুমারও কলকাতায় ফিরে গেছেন।

তিন দিন পর আজ অনেক রাতে সন্দীপনের ফোন এল। এমনিতে রোজ সকালে ফোন করে সে। আজও করেছিল। কিন্তু একই দিনে দু'বার কেন করল, বোঝা যাচ্ছে না। বিশেষ করে এত রাত্তিরে। অবাক হয়ে মণিমোহন জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার সন্দীপন? ওবেলাই তো তোমার সঙ্গে কথা হল!'

সন্দীপন ভারি গলায় বললেন, 'স্যার, খুব খারাপ খবর আছে।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে তীব্র উৎকণ্ঠা এবং দুশ্চিন্তা ফুটে বেরোয়। মণিমোহন চমকে ওঠেন, 'কী হয়েছে?'

'নবীগঞ্জ থেকে আপনাকে কেউ কিছু জানায়নি?'

'কই, না তো।'

দীপার দাদা বীরেশ বর্ডারের ওপার থেকে এসে বদলা নিয়ে গেছে।'

'বদলা! মানে?'

সন্দীপন বললেন, 'লেলোদের হাইড-আউটে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে দু'জনকে মার্ডার করেছে। লেলোও মারাত্মক জখম হয়েছে। তার কোমরে আর হাতে গুলি লেগেছে। পুলিশ পাহারায় তাকে নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। সেন্স নেই। বাঁচবে কিনা সন্দেহ।'

শুনতে শুনতে শ্বাস আটকে আসছিল মণিমোহনের। রুদ্ধস্বরে বললেন, 'কী বলছ তুমি!'

'হ্যাঁ স্যার, ব্যাপারটা খুব খারাপ দিকে টার্ন নিল।'

'সে তো বটেই। বীরেশ কি ধরা পড়েছে?'

'না। মার্ডার করেই উধাও হয়েছে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর সন্দীপন আবার বললেন, 'এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, ভাবতে পারেন স্যার?'

বুঝতে না পেরে মণিমোহন বললেন, 'না, ঠিক—'

'এবার লেলোদের গ্যাংটার সমস্ত আক্রোশ এসে পড়বে দীপাদের ওপর। মনে হচ্ছে ওদের, বিশেষ করে দীপার মারাত্মক বিপদ ঘটে যাবে।'

'ওদের যেভাবে হোক, বাঁচাবার চেষ্টা কর।'

সন্দীপন বললেন, 'নবীগঞ্জের ওসি'কে তিন চার বার ফোন করেছি কিন্তু ধরতে পারিনি। ওখানকার থানা থেকে জানিয়েছে, ওই মার্ডারগুলোর ব্যাপারে উনি চারদিকে ছোটাছুটি করছেন।'

মণিমোহন গভীর উদ্বেগের সুরে বললেন, 'বিজনকে নিয়ে আমি কি এখন নবীগঞ্জে চলে যাব।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'এত রাতে যাবেন কী করে? ওদিকের লাস্ট ট্রেন আর লাস্ট বাস এতক্ষণে চলে গেছে।'

মণিমোহন বললেন, 'দেখি যদি একটা গাড়ি টাড়ি জোগাড় করতে পারি। বুঝতেই পারছ, মেয়েটার জন্যে ভীষণ চিন্তা হচ্ছে।'

সন্দীপন বললেন, 'স্যার, কষ্ট করে আজ না গিয়ে বরং কাল গিয়ে দীপাদের নিয়ে আসুন। নবীগঞ্জের অনেককে আমি চিনি। তাদের ফোন করে দেখি যদি দীপাদের খবর নিয়ে আমাকে জানাতে পারে—'

'ঠিক আছে। কোনো খবর পেলে যত রাতই হোক আমাকে আজই ফোন করো। আমি কিন্তু জেগে থাকব।'

'আচ্ছা স্যার।'

বিজন কাছাকাছি বসে একদৃষ্টে মণিমোহনের দিকে তাকিয়ে ছিল। মণিমোহন সন্দীপনকে যা যা বলেছেন, সবই সে শুনেছে কিন্তু সন্দীপনের কথা কিছুই শুনতে পায়নি। তবে মোটামুটি আন্দাজ করে নিয়েছে। মণিমোহন টেলিফোন নামিয়ে রাখার পর সে জিজ্ঞেস করল, 'সন্দীপনবাবু বোধহয় আপনাকে আজ নবীগঞ্জ যেতে বারণ করলেন, তাই না?'

মণিমোহন আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ। কাল যেতে বলল, ওদিকের ফার্স্ট ট্রেন ক'টায় জানো?'

একটু ভেবে বিজন বলল, 'ছ'টা দশ কি পনেরতে।'

'কাল ওই ট্রেনটাই ধরব।'

নয়

পরদিন ভোরে উঠে দৈনন্দিন রুটিন অনুযায়ী নদীর ধারে আর বেড়াতে যাওয়া হল না। তরুবালা

চা আর বিস্কুট দিয়ে গিয়েছিল। মুখ ধুয়ে, রাতের বাসি জামাকাপড় পালটে, সোয়েটার পরে কানটান ঢেকে গরম চাদর জড়িয়ে নিলেন মণিমোহন। তারপর বিজনকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লেন।

রাস্তায় আসতেই একটা ফাঁকা রিকশা পাওয়া গেল। স্টেশনে এসে টিকেট কাটতে না কাটতেই কলকাতার দিক থেকে হুড়মুড় করে দিনের প্রথম ট্রেনটা এসে পড়ল। একটা কামরায় উঠলেন মণিমোহনরা।

শীতের এই সকালে ট্রেন একেবারে ফাঁকা। কোনো কামরাতেই দু'চারজনের বেশি প্যাসেঞ্জার নেই। মণিমোহনদের কম্পার্টমেন্টে একটি মাত্র লোক সারা শরীর কম্বলে মুড়ে শুধু নাক আর চোখ দুটো বার করে বসে আছে।

মণিমোহন আর বিজন দুটো জানালার পাশে মুখোমুখি বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ছেড়ে দিল। জানালার কাচের পাল্লা দুটো বন্ধ রয়েছে। বাইরে এই সকালবেলাতেও কুয়াশা এত ঘন যে মাঠঘাট গাছপালা কিছুই স্পষ্ট নয়। সূর্য হয়তো উঠেছে কিন্তু পুরু কুয়াশার স্তর ভেদ করে রোদ এখনও পৃথিবীর এই প্রান্তে পৌঁছুতে পারেনি। আলোর আবছা একটু আভা চরাচরের ওপর ছড়িয়ে আছে শুধু।

মণিমোহন বাইরে তাকিয়ে আছেন ঠিকই কিন্তু কিছুই লক্ষ করছিলেন না। কাল আচমকা হানা দিয়ে বোনের অপমানের জবাব হিসেবে বীরেশ বেপরোয়া গুলি চালিয়ে খুন জখম করে গেছে ঠিকই কিন্তু কালই যে বদলা নেবার জন্য লেলোর গ্যাংটা দীপাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, একটা নাও হতে পারে। তবু প্রচণ্ড উৎকণ্ঠায় গলা শুকিয়ে আসছিল মণিমোহনের। কাল সারারাত তিনি ভাল করে ঘুমোতে পারেননি। দীপার মুখটা বার বার তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠছিল।

কয়েক মিনিটের ভেতর ট্রেন নবীগঞ্জে পৌঁছে গেল। কুয়াশা এখনও একই রকম অনড় দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়ি থেকে নেমে স্টেশনের বাইরে এসে রিকশা নিলেন মণিমোহনরা। শহরটা মাঘের অসহ্য শীতে আড়ষ্ট হয়ে আছে। রাস্তায় লোকজন ক্বচিৎ চোখে পড়ে। দু'ধারের বাড়িগুলোর বেশির ভাগেরই দরজা জানালা বন্ধ। নবীগঞ্জের ঘুম ভাঙতে এখনও অনেক দেরি।

মণিমোহন এবং বিজন পাশাপাশি বসে থাকলেও কেউ কথা বলছিলেন না। রিকশা যত দীপাদের বাড়ির দিকে এগুচ্ছে, দু'জনের উদ্বেগ দ্রুত বেড়ে চলেছে।

বেশ ক'টা খোয়ার রাস্তা পেরিয়ে একটা মোড়ের মাথায় আসতেই হঠাৎ হইচই কানে এল। মনে হল, অনেক লোক একসঙ্গে কথা বলছে। সেই সঙ্গে বুকফাটা কান্নার আওয়াজ। কোনো মহিলা একটানা কেঁদে চলেছে।

মণিমোহন এবং বিজন চমকে উঠল। মণিমোহন জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার বল তো?'

বিজন বলল, 'বুঝতে পারছি না।'

যদিও একদিনই মাত্র এসেছে এবং চারপাশ কুয়াশায় আচ্ছন্ন, তবু দীপাদের বাড়ির রাস্তা ঠিক মনে করে রেখেছেন মণিমোহনরা। মোড় ঘুরে ডানদিকে খানিকটা যেতেই পুরানো একতলা বাড়িটা চোখে পড়ল। সেখানে প্রচুর লোক জমা হয়েছে। সদর দরজাটা হাট করে খোলা। ভেতরেও বেশ ভিড়।

দ্রুত রিকশা ভাড়া মিটিয়ে মণিমোহনরা নেমে পড়লেন। তারপর ভিড় সরিয়ে ঠেলে বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখা গেল, দীপার মা মনোরমা উন্মাদের মতো কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে কেঁদে চলেছে। প্রবল কান্নায় তার মুখটা কেমন যেন ভেঙেচুরে যাচ্ছে। চোখ বেয়ে অঝোরে জল ঝরছে। দু'চারজন মাঝবয়সী মহিলা, খুব সম্ভব প্রতিবেশিনীই হবে, তাকে সামলাতে চেষ্টা করছে কিন্তু কারো কথাই শুনছে না সে।

মণিমোহনদের দেখে মনোরমার কান্নাটা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। ভাঙা ভাঙা, বিকৃত গলায় সে বলে, 'বাবা, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

মণিমোহনের হৃৎপিণ্ড মুহূর্তের জন্য থমকে যায়। মনোরমার পাশে বসে তার মাথায় হাত রেখে বলেন, 'কাঁদবেন না, শান্ত হোন—'

মনোরমা একই সুরে বলতে লাগল, 'কী করে শান্ত হই বাবা? আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।'

হঠাৎ মণিমোহন লক্ষ করলেন, দীপা কোথাও নেই। বরুণকে তিনি আগে দেখেননি। এই ভিড়ের ভেতর সে আছে কিনা, বুঝতে পারলেন না।

মনোরমা সমানে বলে যাচ্ছে,'দীপা আপনার কাছে চলে যাবার কথা বলেছিল। গেলে আমাদের এত বড় ক্ষতিটা হত না।'

মণিমোহন কোনো প্রশ্ন করলেন না। অনুমান করলেন, মারাত্মক কিছু ঘটে গেছে। ধাক্কাটা খানিক কাটিয়ে উঠলে মনোরমা সব বলবে। তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কেঁদে কেঁদে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে মনোরমা। মুহ্যমানের মতো অনেকক্ষণ বসে থাকার পর সে যা বলে তা এইরকম। কাল লেলোদের ওপর বীরেশের আচমকা হানা দেবার খবরটা পাওয়ার পর তারা ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। আন্দাজ করেছিল, লেলোর দলবল প্রতিশোধ নিতে তাদের ওপর নিশ্চয়ই ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই দুই ছেলেমেয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে সে স্থির করেছিল, আজ সকালে উঠেই আদিলপুরে মণিমোহনের কাছে চলে যাবে।

এই পর্যন্ত বলে চুপ করে গেল মনোরমা। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'কিন্তু সেই সময় আর পাওয়া গেল না বাবা।' সে জানাল, কাল মাঝরাতে লেলোর দলের মস্তানরা তাদের বাড়িতে ঢুকে হানা দেয়। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে বন্দুক দেখিয়ে দীপাকে তুলে নিয়ে যায়। বরুণ আর মনোরমা প্রাণপণে বাধা দিয়েছিল কিন্তু বন্দুকবাজরা চুলের মুঠি ধরে একটা ঘরে তাকে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে দেয়। আর বরুণকে মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলে।

মনোরমা বন্ধ ঘর থেকে ছেলেমেয়েকে বাঁচাবার জন্য সমানে চিৎকার করে যাচ্ছিল কিন্তু খুন হয়ে যাবার ভয়ে প্রতিবেশীরা কেউ এগিয়ে আসেনি। বন্দুকবাজরা চলে যাবার পর তারা এসে মনোরমার ঘরের শেকল খুলে দেয় আর বরুণকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বরুণ সেখানেই আছে। বাঁচবে কিনা কে জানে।

মণিমোহন স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। তীব্র অপরাধ বোধে তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এই যে মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটল সেজন্য তাঁর দায়ও কম নয়। সেদিন যে এসেছিলেন, কেন দীপাদের নিজের কাছে নিয়ে গেলেন না? মনে পড়ল, ওদের সমস্যার সঙ্গে সেভাবে তিনি জড়াতে চাননি। দূর থেকে যতটা সম্ভব সহানুভূতি দেখাতে চেয়েছিলেন। তাঁর একটু দ্বিধার জন্য দীপাদের এত বড় সর্বনাশটা হয়ে গেল।

আত্মগ্লানির অতল স্তর থেকে একসময় নিজেকে টেনে তুললেন মণিমোহন। তাঁকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। ভাঙা, ঝাপসা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল?'

মনোরমা উত্তর দিল না, দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে সে কেঁদেই চলেছে।

ভিড়ের ভেতর থেকে কারা বলে উঠল, থানায় জানানো হয়েছে। শেষ রাত্তিরে ওসি নিজে এসেছিলেন।

'দীপার কোনো খবর পাওয়া গেছে?'

'না। পুলিশ চারদিকে খোঁজাখুঁজি করছে।'

মনোরমার কান্নাটা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। হতাশার শেষ প্রান্ত থেকে সে বলতে থাকে, 'ওকে আর পাওয়া যাবে না বাবা। পুলিশের খোঁজাই সার হবে। শয়তানেরা কোথায় যে নিয়ে গেল মেয়েটাকে!'

হঠাৎ মনস্থির করে ফেলেন মণিমোহন। দীপাকে যেভাবে হোক উদ্ধার করতেই হবে। উঠে দাঁড়িয়ে মনোরমাকে বলেন,'আমি থানায় যাচ্ছি। পুলিশকে প্রেসার না দিলে ঠিকমতো কাজ হবে না। ফিরে এসে আপনাকে আমার সঙ্গে আদিলপুরে নিয়ে যাব।'

মনোরমা বলল, 'সর্বনাশ যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন আর গিয়ে কী হবে? ছেলেটা হাসপাতালে, মেয়েটার খবর নেই। আমি এখানেই থাকব বাবা।'

মণিমোহন এবার ভিড়টার দিকে ফিরে মনোরমাকে দেখিয়ে বললেন, 'এর কাছে মেয়েরা থাকুন। বাকি সবাই আমার সঙ্গে থানায় চলুন। এত লোক দেখলে ওরা গুরুত্বটা বুঝবে। আজকাল কোনো ক্রাইমের ঘটনা ঘটলে প্রথমে পুলিশ খানিকটা হইচই করে, তারপর গা ছেড়ে দেয়। দীপার ব্যাপারে আমরা তা হতে দেব না। মেয়েটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেরত চাই। আর ক্রিমিনালগুলোকে

ধরতেই হবে।'

মনোরমার প্রতিবেশীদের দিক থেকে সাড়া পাওয়া গেল না। বোঝা যাচ্ছে, থানায় গিয়ে দীপাকে উদ্ধার করা এবং বন্দুকবাজগুলোকে ধরার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টির জন্য মণিমোহনের সঙ্গী হতে তাদের উৎসাহ নেই।

বিজনও উঠে পড়েছিল। সে তাড়া দেয়, 'কী হল, চলুন—'

লক্ষ করা গেল, ভিড়ের পেছনে দিকে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা অনেকেই নিঃশব্দে সরে পড়ছে। আর সামনে যারা আছে তাদের ভেতর থেকে একজন ভীরু গলায় বলল, 'আমরা থানায় গিয়ে ওদের ধরতে বলছি, লেলোর গ্যাংটা যদি জানতে পারে—' বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গেল।

বন্দুকবাজদের আক্রোশ তাদের ওপর এসে পড়ুক, এটা কেউ চাইছে না। নিরীহ, ছা-পোষা মানুষের যা স্বভাব, তারা সারাক্ষণ গা বাঁচিয়ে চলে। পারতপক্ষে কানো ঝামেলায় জড়াতে চায় না, বিশেষ করে যেখানে চরম বিপদের ঝুঁকি থাকে।

বিজন খুব সম্ভব 'অ্যান্টি-সোশালদের অ্যাক্টিভিটি চিরতরে বন্ধ করা দরকার, তাদের বিরুদ্ধে সকলের রুখে দাঁড়ানো উচিত' ইত্যাদি বলে জনতাকে উদ্দীপ্ত করতে যাচ্ছিল, কিন্তু মণিমোহন তার আগেই বলে উঠলেন,'ঠিক আছে, আপনাদের কাউকে যেতে হবে না। আমরা দু'জনে যাচ্ছি। চল বিজন—'

মণিমোহন বিজনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

এর মধ্যে কুয়াশা কেটে রোদ উঠে গিয়েছিল। তবে কনকনে উত্তুরে হাওয়া একটানা বয়ে যাচ্ছে।

রাস্তায় এখন প্রচুর লোকজন। এখানে ওখানে থোকায় থোকায় দাঁড়িয়ে তারা চাপা গলায় কথা বলছিল। আলোচনার বিষয়বস্তু যে দীপা, সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সবার চোখেমুখে ভয় এবং উত্তেজনার ছাপ। ঘটনাটা এ অঞ্চলে প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

খানিকটা হাঁটার পর একটা রিকশা পাওয়া গেল। মণিমোহনরা সেটায় উঠে থানায় এসে একজন কনস্টেবলের কাছে শুনলেন, ওসি ননীগোপাল চট্টরাজ দশটার আগে থানায় আসবেন না।

মণিমোহন হাতঘড়ি দেখলেন। এখন সবে সাড়ে আটটা। অর্থাৎ ননীগোপালের সঙ্গে দেখা করতে হলে পুরো দেড় ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। তিনি বললেন,'ওসি'র সঙ্গে আমাদের খুব জুরুরি কাজ আছে। ওঁকে কোথায় পাব?'

'ওঁর কোয়ার্টারে।'

'সেটা কোথায়?'

থানার ডান পাশে একটা মাঝারি আকারের বাউণ্ডারি ওয়াল দিয়ে ঘেরা একতলা লাল বাড়ি দেখিয়ে দিল কনস্টেবল।

মণিমোহনরা ওসি'র কোয়ার্টারের দিকে পা বাড়াতে যাবেন, কনস্টেবল হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'যাবেন না, যাবেন না। কোয়ার্টারে গেলে স্যার রাগ করবেন।'

মণিমোহন বললেন, 'সেটা আমরা বুঝব।'

লাল বাড়িটায় যেতে একটা কাজের লোক বলল, 'সাহেব এখন ঘুমোচ্ছেন। ডাকা যাবে না।'

'কোয়ার্টারে আর কে আছে?'

'বৌদি আর ছেলেমেয়েরা।'

'তারা জেগেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কাগজ পেন্সিল নিয়ে এস। লিখে দিচ্ছি। তোমার বৌদিকে দেবে।'

কাজের লোক কাগজ-টাগজ নিয়ে এলে মণিমোহনদের নিজের নাম তো লিখলেনই, তিনি যে আদিলপুর কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল এবং বিশেষ প্রয়োজনে এই সকালবেলায় ওসি'র সঙ্গে কথা বলতে ছুটে এসেছেন, সেটাও লিখে দিলেন।

কাজের লোক মণিমোহনদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে ঢুকে গেল। মিনিট দশেক পর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন ননীগোপাল। তাঁর চোখেমুখে এখনও ঘুম লেগে আছে। অবাক বিস্ময়ে

দু'পলক তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আসুন স্যার, ভেতরে আসুন—'

সাজানো গোছানো একটা ড্রইংরুমে মণিমোহনদের এনে বসাতে বসাতে ননীগোপাল বললেন, 'আমার স্ত্রী ঘুম ভাঙিয়ে আপনার চিরকুটটা যখন দিল, প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারিনি।' খানিকটা কৈফিয়ৎ দেবার সুরে বলতে লাগলেন, 'আমি স্যার খুব আর্লি রাইজার। কিন্তু কাল শুতে শুতে প্রায় ভোর হয়ে গিয়েছিল। তাই—'

মণিমোহন বললেন, 'ঘুমটা না ভাঙিয়ে আমার উপায় ছিল না। আমরা—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই ননীগোপাল বললেন, 'আপনারা কেন এসেছেন আমি বুঝতে পারছি।'

'ফার্স্ট ট্রেন ধরে নবীগঞ্জে এসে আমরা দীপাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। সেখানে যা শুনলাম—'

'হ্যাঁ স্যার, খুবই দুঃখজনক ঘটনা।'

'অফিসার, এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি।'

সেই কাজের লোকটা চা এবং মিষ্টি নিয়ে এল। ননীগোপাল বললেন, 'স্যার, একটু চা—'

মণিমোহন বললেন, 'আতিথেয়তার প্রয়োজন নেই। চা খাওয়ার মতো এখন আমাদের মানসিক অবস্থা নয়।'

ননীগোপাল আর অনুরোধ করলেন না।

মণিমোহন এবার কঠোর গলায় বললেন, 'সেদিন আপনাকে এত করে বলে গেলাম, দীপাদের বিপদ হতে পারে। আর সেটাই ঘটল। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, এ ব্যাপারে আপনারা তেমন গুরুত্বই দিলেন না।'

ননীগোপাল বিব্রতভাবে বললেন, 'না স্যার, আপনার ধারণাটা ঠিক নয়। আমরা দীপাদের বাড়ির ওপর নজর রেখেছিলাম। কিন্তু মাঝরাতে এমন একটা ঘটনা ঘটে যাবে, ভাবতে পারিনি।'

রূঢ় চোখে ননীগোপালকে লক্ষ করতে করতে মণিমোহন বললেন, 'আপনি যতই কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করুন, এর জন্যে আপনার দায়িত্ব কিছু কম নয়। মেয়েটাকে উদ্ধারের জন্যে কী ব্যবস্থা করেছেন?'

'স্যার, কাল খবরটা পাওয়ামাত্র আমি আর্মড ফোর্স নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। সারা নবীগঞ্জ তোলপাড় করে ভোরবেলা কোয়ার্টারে এসে শুয়েছি।'

'মেয়েটাকে বন্দুকবাজরা কোথায় নিয়ে যেতে পারে, তার কোনো হদিস পাওয়া গেল?'

মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন ননীগোপাল, 'না স্যার। তবে—'

মণিমোহন জিজ্ঞেস করলেন, 'কী?'

'কাল রাত থেকেই চারদিকে কোম্বিং অপারেশন শুরু হয়ে গেছে। থানার অফিসাররা নানা জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে। আমি নিজেও খানিকটা পর বেরিয়ে পড়ব।'

'অফিসার, আপনাকে চব্বিশ ঘন্টা সময় দিলাম। তার ভেতর যেমন করে হোক, খুঁজে বার করবেন। নইলে আমাকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

চোখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ননীগোপাল। তারপর বললেন, 'স্যার, আমার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি হবে না। আশা করি, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই কিছু একটা করে ফেলতে পারব।'

একটু চুপচাপ।

তারপর মণিমোহন বললেন, 'আপনাকে নিশ্চয়ই জানানো হয়েছে, লেলো নামের একটা অ্যান্টি-সোশালের দলবল দীপাকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। কালপ্রিট কারা, সেটা যখন জানেন, তাদের ধরছেন না কেন? ওদের ধরলেই তো মেয়েটার সন্ধান পাওয়া যায়।'

'ওদের যেখানে যেখানে পাওয়া সম্ভব, কাল রাতেই সেইসব জায়গায় গেছি কিন্তু কোথাও ওরা নেই। মনে হয় নবীগঞ্জ থেকে পালিয়ে গেছে।'

'এর আগেও এসে ওদের অ্যারেস্ট করার কথা বলেছিলাম। তখন ওরা নবীগঞ্জেই ছিল কিন্তু আপনি কিছুই করেননি। সেই সময় ওদের ধরলে কাল রাতের মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটত না।'

ননীগোপাল ম্রিয়মাণ সুরে বললেন, 'আমাদের ব্যাড লাক। অনেক চেষ্টা করেও ধরতে পারিনি।'

'এখন আমরা যাচ্ছি। আমার ফোন নাম্বারটা লিখে নিন। মেয়েটার খবর পেলে আমাকে তক্ষুনি জানাবেন।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন মণিমোহন।

ননীগোপাল বললেন, 'নিশ্চয়ই স্যার। আপনার ফোন নাম্বার টুকে নেবার দরকার নেই। আমি ওটা জানি।'

নবীগঞ্জে একটাই সরকারি হাসপাতাল। থানা থেকে বেরিয়ে সোজা সেখানে চলে গেলেন মণিমোহনরা। বরুণকে এখানেই ভর্তি করা হয়েছে। এখনও তার পুরোপুরি জ্ঞান ফেরেনি। রক্ত দেওয়া হচ্ছে। ডাক্তাররা জানালেন, বিপদ অনেকটা কেটে গেছে, বাঁচার আশা এখন শতকরা সত্তর ভাগ।

হাসপাতাল থেকে দীপাদের বাড়ি গেলেন মণিমোহনরা। এখন ভিড় নেই। মনোরমা একটা ঘরে মুহ্যমানের মতো শুয়ে ছিল। তাকে ঘিরে রয়েছে দশ বার জন প্রতিবেশিনী।

মণিমোহনদের দেখে হাতের ওপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসল মনোরমা। এখন আর কাঁদছে না সে। রক্তবর্ণ চোখ দুটো এত ফুলে আছে, যেন ঠেলে বেরিয়ে আসবে। গালে চোখের জলের শুকনো দাগ। চুল উষ্কখুষ্ক। শাড়ির আঁচল বিছানায় লুটোচ্ছে। আকস্মিক প্রচণ্ড আঘাতে একেবারে চুরমার হয়ে গেছে সে।

মনোরমা জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটার খোঁজ পাওয়া গেল বাবা?'

মুখ নামিয়ে আস্তে মাথা নাড়লেন মণিমোহন, 'না।'

'ওকে আর পাওয়া যাবে না।' মনোরমার কণ্ঠস্বর হতাশায় বুজে আসে।

'থানায় বলে এসেছি, চব্বিশ ঘন্টার ভেতর দীপার সন্ধান চাই।'

'ওদের বলে কিছু লাভ নেই বাবা। মেয়েটা আমার চিরকালের মতো হারিয়ে গেল।'

সারা ঘরটায় গভীর বিষাদ ছড়িয়ে যেতে থাকে।

অনেকক্ষণ পর মণিমোহন বললেন, 'এখানে একা একা থাকার দরকার নেই। আপনি আমার সঙ্গে চলুন—' সকালে এসেও এই কথাই বলেছিলেন তিনি।

মনোরমা তখনকার মতো এবারও রাজি হল না।

অগত্যা মনোরমার দেখাশোনার দায়িত্ব প্রতিবেশিনীদের দিয়ে বিজনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন মণিমোহন। বেরুবার আগে অবশ্য বললেন, কাল আবার আসবেন।

দশ

আদিলপুর যখন মণিমোহনরা ফিরলেন, সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছে।

আজ বিজনের ক্লাস দেড়টায়। তাড়াতাড়ি স্নান খাওয়া চুকিয়ে সে কলেজে চলে গেল।

মণিমোহন স্নান করেছেন ঠিকই, তবে কিছুই খাননি। তরুবালা আর বিজন অনেক বার করে বলেছে কিন্তু খাওয়ার ইচ্ছাটাই তাঁর নেই। ভেতরে ভেতরে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। তরুবালাকে বলেছেন, 'ভাত নিয়ে যাও।'

তরুবালা বলেছে, 'দুপুরে না খেলে পিত্তি পড়বে।'

'খিদে পেলে তোমাকে বলব।'

আর কিছু বলতে সাহস হয়নি তরুবালার। ভাতের থালা তুলে নিয়ে চলে গেছে সে।

ঘরের ভেতর মণিমোহন এখন সম্পূর্ণ একা। একবার ইজিচেয়ারে বসছেন, পরক্ষণে উঠে গিয়ে এলোমেলো পা ফেলে একটু পায়চারি করছেন; তারপরেই হয়তো খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। আসলে প্রচণ্ড অস্থিরতা তাঁকে যেন ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

খবরের কাগজগুলো এসে গিয়েছিল। তরুবালা সাইড টেবলে সেগুলো গুছিয়ে রেখে গেছে। এমনিতে মণিমোহনের কাগজ পড়ার দারুণ নেশা। কিন্তু আজ সেদিকে একবারও তাকাননি।

আসলে সেই পুরানো আত্মগ্লানিটা আবার মণিমোহনের মধ্যে ফিরে এসেছে। তাঁর সামান্য একটু দ্বিধার জন্য দীপাদের কী সর্বনাশটাই না ঘটে গেল! তিনি তো জানতেন, চরম বিপদ ওদের মাথার ওপর ঝুলছে। তবু কেন নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন না?

সারা দুপুর ছটফট করে কাটানোর পর ক্লান্ত, অনুতপ্ত মণিমোহন শুয়ে পড়েছিলেন। চোখ যখন জুড়ে এসেছে সেই সময় ফোন বেজে উঠল। ধড়মড় করে উঠে, হাত বাড়িয়ে টেলিফোনটা তুলে

'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে সন্দীপনের গলা ভেসে আসে, 'স্যার, খুব খারাপ একটা খবর আছে।'

সন্দীপনের কণ্ঠস্বরে এমন তীব্র আতঙ্কের ছাপ রয়েছে যাতে চমকে উঠলেন মণিমোহন, 'কী খবর?'

'নবীগঞ্জ থানা থেকে আপনাকে কিছু জানায়নি?'

'না তো।'

অনেকক্ষণ লাইনের ওধার থেকে কোনোরকম সাড়াশব্দ নেই। উদ্বিগ্ন সুরে মণিমোহন বললেন, 'কী হল? লাইনটা কি কেটে গেল?'

ভারি, বিমর্ষ গলায় এবার সন্দীপন বললেন, 'না স্যার। খবরটা আপনাকে কীভাবে দেব, ভাবতে পারছি না। শুনলে আপনাব ভীষণ কষ্ট হবে।'

'ঠিক আছে, তুমি বল।'

'দীপা বেঁচে নেই।'

'কী বলছ তুমি!'

'হ্যাঁ স্যার, নবীগঞ্জ থেকে খানিকটা দূরে রেল লাইনের পাশে ওর ডেডবডি পাওয়া গেছে। শি ইজ কিলড।'

মণিমোহন স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। কী বলবেন, ভেবে পেলেন না।

সন্দীপন এবার বললেন, 'স্যার, খুন করার আগে মেয়েটাকে গ্যাং রেপ করা হয়েছিল।'

কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত অস্তিত্ব যেন অসাড় হয়ে গেল মণিমোহনের। পরমুহূর্তে মনে হল, এই ঘর, বাইরের রাস্তা, শীতের নির্জীব রোদ, লোকজন, গাড়িটাড়ি— দৃশ্যমান সমস্ত কিছু উথল পাথল হয়ে যাচ্ছে। হাত থেকে ফোনটা পড়েই যেত, কোনোরকমে ধরে কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'এ সব খবর তোমাকে কে দিল?'

'স্যার, সেদিন আপনাকে বলেছিলাম, নবীগঞ্জে আমার জানাশোনা বেশ কিছু লোক আছে। পুলিশে কাজ করতে হলে খবরাখবরের জন্যে অনেক সোর্স রাখতে হয়। তারাই জানিয়েছে।'

কথা শেষ করে টেলিফোনটা যখন মণিমোহন নামিয়ে রাখছেন, বিজন কলেজ থেকে ফিরে এল। তাঁর চোখমুখের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন সুরে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে স্যার? আপনাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন?'

দীপার খবরটা দিয়ে মণিমোহন বললেন, 'আমাকে এখনই একবার নবীগঞ্জ যেতে হবে। দুঃসংবাদটা পাওয়ার পর মনোরমা কী করছে কে জানে। আসতে হয়তো চাইবে না, তবু ওকে এ বাড়িতে নিয়ে আসতে হবে। একবার ওখানকার থানাতেও যাব। ওসি'র সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া আছে।'

'আপনি কি একা যেতে চাইছেন?'

'না না, তুমিও সঙ্গে যাবে।'

এগার

মণিমোহনরা নবীগঞ্জে যখন পৌঁছুলেন, সন্ধে নামতে শুরু করেছে। এর মধ্যেই কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। মাটির লক্ষ কোটি ছিদ্র দিয়ে উঠে আসছে কনকনে হিম।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে প্রথমেই ওঁরা থানায় গেলেন। ওসি তাঁর অফিস ঘরেই ছিলেন। মণিমোহনকে দেখে চমকে উঠলেন, 'স্যার, আপনি!'

মণিমোহন নীরস, গম্ভীর গলায় বললেন, 'দীপার খবরটা আমি খানিকক্ষণ আগে পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে চলে এলাম।'

'খুব আনফরচুনেট ব্যাপার —'

'আপনি কিন্তু আমাকে জানাননি, অথচ কথা ছিল জানাবেন।'

'স্যার, ডেডবডি পাওয়ার পর একজন ওসি'কে কত দিকে ছোটাছুটি করতে হয়, তা বোধহয় আপনি জানেন। নানা কাজ সেরে এইমাত্র থানায় এসে বসেছি। ভাবছিলাম. আপনাকে ফোন করব, তার আগেই আপনি এলেন।'

লোকটা যে ডাহা মিথ্যে বলছে, তার মুখচোখ দেখেই তা বোঝা যায়। মণিমোহন কঠোর চোখে

তাকিয়ে রইলেন।

ননীগোপালও মণিমোহনকে লক্ষ করছিলেন। মুখ নামিয়ে নিয়ে ভারি গলায় বললেন,'স্যার, এমন একটা ঘটনা ঘটবে, আমি ভাবতে পারিনি।'

মণিমোহন বললেন, 'মেয়েটাকে গ্যাংস্টাররা জোর করে বাড়ি থেকে নিয়ে যাবার পরও তো বলেছিলেন, ভাবতে পারেননি। অথচ আগেই আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম।'

ননীগোপাল চুপ করে রইলেন।

মণিমোহন তীব্র গলায় বললেন, 'এই যে একটা নিষ্পাপ মেয়ের এমন ভয়ঙ্কর মৃত্যু ঘটল, এর কী কৈফিয়ৎ দেবেন? এর জন্যে আপনার দায় কতটা, ভেবে দেখেছেন?'

ননীগোপাল এবারও উত্তর দিলেন না।

মণিমোহন থামেননি, 'দীপার এই মৃত্যুটা আমি কিছুতেই মেনে নেব না। সে আর ফিরে আসবে না কিন্তু ক্রিমিনালগুলোর চরম শাস্তি আমি চাই। তারা পার পেয়ে যাবে, এটা আমি কিছুতেই হতে দেব না। কথাটা মনে রাখবেন।'

ননীগোপাল গলা সাফ করে বললেন, 'নিশ্চয়ই স্যার, গ্যাংটাকে ধরার জন্যে চারদিকে লোক লাগিয়ে রেখেছি। আশা করছি, খুব শীগ্গিরই ওদের অ্যারেস্ট করতে পারব।'

একটু নীরবতা।

তারপর মণিমোহন জিজ্ঞেস করলেন, 'ডেডবডি এখন কোথায়?'

ননীগোপাল বললেন, 'পোস্ট মর্টেমের জন্যে পাঠানো হয়েছে।'

'সৎকারের জন্যে কবে পাওয়া যাবে?'

'কাল বিকেলে।'

'আমি কাল আবার আসব।'

থানা থেকে বেরিয়ে হাসপাতালে এলেন মণিমোহনরা। বরুণের জ্ঞান ফিরেছে। প্রাণের ভয় আর নেই। ডাক্তাররা বললেন, তাকে দীপার খবরটা দেওয়া হয়নি। অসুস্থ শরীরে হঠাৎ মানসিক আঘাত পেলে তার ক্ষতি হবে। মণিমোহন বললেন, ডাক্তাররা ঠিক কাজই করেছেন।

হাসপাতাল থেকে এবার দীপাদের বাড়ি। সাইকেল রিকশায় বিজনের পাশে বসে যেতে যেতে এই শীতের সন্ধেতেও কপালে দানা দানা ঘাম জমতে শুরু করেছে মণিমোহনের। ভেতর ভেতরে ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছেন তিনি। দীপাদের বাড়ি গিয়ে মনোরমাকে কী অবস্থায় দেখবেন, তাকে কী বলবেন, ভেবে পাচ্ছেন না। জীবনে এমন মারাত্মক সংকটে আগে আর কখনও পড়েননি তিনি।

বিজনও ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেছে। একটা নিরপরাধ, ফুলের মতো মেয়ে এভাবে মরে যাবে, এটা তার কল্পনারও বাইরে। চারপাশের এই পৃথিবী কী বিষাক্ত, কী ভয়াবহই না হয়ে উঠেছে!

একসময় রিকশাটা দীপাদের বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে থেমে যায়। কালকের চেয়ে আজ এখানে ভিড় অনেক বেশি। সারা নবীগঞ্জ এই শীতের সন্ধেয় যেন ভেঙে পড়েছে। খুনখারাপি, বন্দুক কি বোমাবাজি সীমান্তের কাছাকাছি এই শহরে আখছারই ঘটে থাকে। কিন্তু এখানকারই একটি মেয়েকে গণধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে, এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি।

সমস্ত পরিবেশ দারুণ থমথমে। প্রতিটি মানুষের চোখেমুখে আতঙ্ক আর বিষাদের ছাপ। দীপার মৃত্যু শহরটাকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেছে।

এ শহরের অনেকেই মণিমোহনকে চেনে। কালও তাঁকে এখানে আসতে দেখেছে। সবাই সরে সরে তাঁকে এবং বিজনকে রাস্তা করে দিল।

কাল বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়েছিল মনোরমা। চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছিল। আজ স্তব্ধ হয়ে শূন্য চোখে তাকিয়ে বসে আছে। যেন পাথরের মূর্তি। চারপাশে এত মানুষজন, তাদের চাপা কথাবার্তা, শীতের কুয়াশা, কিছু সে যেন দেখতে পাচ্ছিল না, কোনো শব্দ তার কানে যাচ্ছে না। মনোরমার সমস্ত ইন্দ্রিয়, সকল শিরাস্নায়ু একেবারে বিকল হয়ে গেছে।

মণিমোহন বাড়িটার দায়িত্ব প্রতিবেশীদের দিয়ে, বিজনকে দিয়ে একটা ভাড়া গাড়ি ডাকিয়ে এনে মনোরমাকে বললেন, 'চল, আমার সঙ্গে আদিলপুর যাবে। এখন কিছুদিন আমার কাছেই থাকবে।'

বলে তার হাত ধরলেন।

মনোরমা বিহ্বলের মতো মণিমোহনের সঙ্গে গাড়িতে উঠল। একটা কথাও বলল না।

পরদিন সকালে সন্দীপনকে ফোন করে কাল নবীগঞ্জে গিয়ে কোথায় গেছেন সব জানিয়ে বললেন, 'মনোরমাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছি। হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে দিলে বরুণকেও নিয়ে আসব। ওদের ওখানে ফেলে রাখা ঠিক হবে না।'

সন্দীপন সায় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। নবীগঞ্জে থাকলে কে ওদের দেখবে?'

'তোমাকে মনোরমাদের নিয়ে আসার খবর দেওয়া ছাড়াও অন্য একটা কারণে ফোন করছি।'

'কী?'

'নবীগঞ্জ থানার ওসি'র সঙ্গে দু বার দেখা করেছি, লোকটা ক্রিমিন্যালগুলোকে ধরার ব্যাপারে তেমন কিছু করবে বলে মনে হয় না।'

সন্দীপন উত্তর দিলেন না।

মণিমোহন বলতে লাগলেন, 'দীপার খুনীদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আমার একেবারেই স্বস্তি হচ্ছে না। তুমি কি ওদের ধরার ব্যাপারে কোনোভাবে কিছু করতে পার?'

সন্দীপন বললেন, 'স্যার, ওই ঘটনাটা ঘটেছে নবীগঞ্জে। আমার এলাকার বাইরে। ডাইরেক্টলি তো আমি কিছু করতে পারি না। যা করার নবীগঞ্জ থানাকেই করতে হবে।' একটু থেমে বললেন, 'সেদিন আপনাকে একটা কথা বলেছিলাম, হয়তো খেয়াল নেই—'

একটু ভাবতেই মণিমোহনের মনে পড়ে গেল, 'তুমি বোধহয় মুভমেন্ট করার কথা বলেছিলে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তোমাকে বলেছিলাম, এসব পলিটিক্যাল পার্টির কাজ।'

বলতে বলতে আচমকা স্থানীয় এম. এল. এ ধনঞ্জয় বিশ্বাস আর প্রাক্তন এম.এল.এ. অবিনাশ পালধির মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেদিন ট্রেনের সেই ঘটনাটার পর ধনঞ্জয় বিশ্বাস দু-একবারই ফোন করেছিল আর অবিনাশ পালধি বাড়ি এসে দেখা করে গেছে। তারপর কেউ আর যোগাযোগ করেনি। ওদের দু'জনের পার্টিই বেশ বড় এবং পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। দুই রাজনৈতীক দলের পেছনে প্রচুর জনসমর্থন রয়েছে। ওরা আন্দোলনের ব্যাপারে প্রথম দিকে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছিল, কিন্তু এখন একেবারে চুপচাপ। আগামী নির্বাচনের খুব বেশি দেরি নেই। তবু এত বড় চাঞ্চল্যকর ঘটনাগুলো ঘটে যাবার পরও কেন তারা হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে, কে জানে।

মণিমোহন বললেন, 'আমি কি এ বিষয়ে ধনঞ্জয় বিশ্বাস আর অবিনাশ পালধির সঙ্গে কথা বলব?'

সন্দীপনকে খুব একটা উৎসাহিত মনে হল না। নিস্পৃহ সুরে বললেন, 'বলে দেখতে পারেন। তবে এতদিন যখন কিছু করেনি, এখন কি করবে?'

'তোমার এরকম একটা সন্দেহ হচ্ছে কেন?'

'এক্ষুনি নয়। দু'চারদিন দেখে আপনাকে বলব।'

'ঠিক আছে।'

বার

মনোরমাকে আদিলপুরে নিয়ে আসার পর আট দিন কেটে গেল। এর মধ্যে নবীগঞ্জে গিয়ে দীপার ক্ষতবিক্ষত দেহ পুলিশের কাছ থেকে নিয়ে সৎকার করে এসেছেন মণিমোহন। হাসপাতাল বরুণকে রিলিজ করে দিয়েছিল। তাকেও নিজের বাড়িতে এনেছেন।

বরুণ আর মনোরমাকে তেতলার কোণের দিকের বড় ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছে। বরুণের মাথায় আর হাতে বিরাট ব্যাণ্ডেজ, ডান পায়ে মোটা প্লাস্টার। পুরোপুরি সেরে উঠতে কম করে এক মাস লেগে যাবে। ছেলেটা জানালার ধারে সারাদিন শুয়ে শুয়ে নিঃশব্দে কাঁদে। দীপার মৃত্যু এবং ধর্ষণের খবরটা পাওয়ার পর থেকে সেই যে স্তব্ধ হয়ে গেছে, এখনও পর্যন্ত একটা কথা বলেনি।

কেউ ডাকলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে শুধু।

এই ক'দিনে কম করে আট দশ বার ধনঞ্জয় আর অবিনাশকে ফোন করেছেন মণিমোহন। প্রতিবারই তাঁর সঙ্গে দেখা করবে বলেও করেনি। এমনকি দু দিন বিজনকে সঙ্গে নিয়ে ওদের বাড়িতেও গিয়েছিলেন। দেখা হয়নি। মণিমোহনের ধারণা, ওরা বাড়িতেই ছিল। ইচ্ছা করেই দেখা করেনি।

একটা ব্যাপার তাঁকে ভীষণ অবাক করে দিয়েছে। এমনিতে ধনঞ্জয় যা করে তার উলটোটাই করে থাকে অবিনাশ। এ যদি ডাইনে যায়, ও বাঁয়ে। কিন্তু মণিমোহনকে এড়িয়ে যাবার ব্যাপারে দু'জনের আচরণে কোনো তফাত নেই। এই একটি ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে আশ্চর্য রকমের মিল।

এই নিয়ে বিজনের সঙ্গে আলোচনাও করেছেন মণিমোহন। কিন্তু কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাননি।

ওদিকে নবীগঞ্জ থানায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এখন পর্যন্ত খুনী আর ধর্ষণকারীদের ধরা যায়নি।

আজ বিকেলবেলায় হঠাৎ সন্দীপন এসে হাজির। কিছুক্ষণ আগে বিজন কলেজ থেকে ফিরে এসেছে। ঘরের ভেতর সে আর মণিমোহন ছাড়া অন্য কেউ নেই।

সন্দীপন বললেন, 'বেশ কয়েকদিন আমি আপনাকে ইচ্ছে করেই ফোন করিনি। আপনি কি ধনঞ্জয় বিশ্বাস আর অবিনাশ পালধির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছেন?'

'না। অনেক চেষ্টা করেছি। মনে হচ্ছে ওরা আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে না।'

'ঠিক তা-ই। ওরা দীপার কেসটা নিয়ে কোনোরকম মুভমেন্ট করবে না। ধনঞ্জয়রা চায় না দীপার মার্ডারাররা ধরা পড়ুক।'

'মানে!'

সন্দীপন এরপর চাঞ্চল্যকর খবর দিলেন। এ ক'দিন নানা সোর্স থেকে তিনি যে তথ্য জোগাড় করেছেন তা এইরকম। লেলোর দলবলেরা ধনঞ্জয় বিশ্বাসের অ্যাকশন স্কোয়াডের লোক। বীরেশ একসময় ওদের সঙ্গেই ছিল। পরে বর্ডারের ওধারে মাল স্মাগলিংয়ের ব্যাপারে লেলোদের সঙ্গে গণ্ডগোল বাধায় সে অবিনাশ পালধির ক্যাম্পে চলে যায়। যেহেতু ধনঞ্জয় এখন এম. এল. এ, তাই প্রশাসনের আর পুলিশের ওপর তার প্রভাব অবিনাশের তুলনায় অনেক বেশি। ফলে লেলোদের তাড়া খেয়ে মাঝে মাঝে ওপারে পালিয়ে যায় বীরেশ, সুযোগমতো ফিরে এসে শত্রুপক্ষকে আঘাত হানে। তারপর তো ভয়াবহ প্রতিহিংসার খেলায় দীপার শোচনীয় মৃত্যু ঘটল।

অন্য সময় হলে ধনঞ্জয়রা কী করত বলা যায় না। কিন্তু মাত্র কয়েক মাস পর নির্বাচন। এখন আশ্রিত বন্দুকবাজদের পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে কেউ চটাতে চাইবে না। ভোটের সময় ওদের দিয়েই তো বোমাবাজি, বন্দুকবাজি থেকে শুরু করে হাজার রকম দুষ্কর্ম করাতে হবে। নির্বাচনে জিততে হলে আজকাল এদের ছাড়া চলে না। মণিমোহন যদি ভেবে থাকেন, নিজেদের অ্যাকশন স্কোয়াডের বিরুদ্ধে ধনঞ্জয়রা আন্দোলনে নামবে, সেটা দুরাশা মাত্র।

মণিমোহন পলকহীন তাকিয়ে ছিলেন। রুদ্ধস্বরে বললেন, 'এ অবস্থায় কী করতে বল?'

সন্দীপন বললেন, 'হয় মুখ বুজে ব্যাপারটা মেনে নিতে হবে। আর যদি খুনীদের পানিশমেন্ট চান, মুভমেন্টটা আপনাকেই শুরু করতে হবে। আমার ধারণা আপনি ডাকলে ধামুরিয়া, আদিলপুর, নবীগঞ্জের অনেক মানুষ পাশে এসে দাঁড়াবে।'

'তুমি যা বলছ তার মানেটা বুঝতে পারছ?'

'পারছি স্যার, আপনাকে রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হবে।'

এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল বিজন। এবার বলে উঠল, 'সেদিন আপনাকে বলেছিলাম সৎ, পরিচ্ছন্ন। আইডিয়ালিস্টরা না এগিয়ে এলে দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

মণিমোহন কিছুক্ষণ ভেবে বললেন,'ঠিক আছে, তোমাদের কথা আমি ভেবে দেখব।'

এরপর পুরো একটা দিন আর একটা রাত নিজের সঙ্গে একটানা যুদ্ধ চলল মণিমোহনের। তিনি একজন এডুকেশানিস্ট—শিক্ষাব্রতী। পড়াশোনা, ছাত্রছাত্রী আর কলেজ— এসব ছাড়া অন্য কোনো দিকে এতদিন তাঁর তাকানোর প্রয়োজন হয়নি। রাজনৈতিক নেতাদের মতো আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া তাঁর কি উচিত? এই প্রশ্নটা মণিমোহনকে সারাক্ষণ তাড়া করতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত তিনি ঠিক করলেন, মুভমেন্ট শুরু করবেন। দীপার হত্যাকারীরা পার পেয়ে যাবে, এটা কিছুতেই তিনি হতে দেবেন না।

সিদ্ধান্ত নেবার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামী বন্ধুদের ফোন করে চলে আসতে বললেন। তাঁরা এলে পরামর্শ করে স্থির হল, আদিলপুরের কোর্ট পাড়ার মাঠে এক জনসভা করা হবে। তার আগে আদিলপুর, ধামুরিয়া এবং নবীগঞ্জের প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে এই সভায় আসার জন্য সবাইকে অনুরোধ করবেন মণিমোহন।

তিন দিন পর কোর্টপাড়ার মাঠে মানুষের ভিড় উপচে পড়ল। এই অঞ্চলের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় মানুষটি বাড়িতে গিয়ে অনুরোধ করেছেন। সবাই তাই ছুটে এসেছে।

একধারে উঁচু মঞ্চ। সেখানে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বিপুল জনারণ্যের দিকে তাকিয়ে মণিমোহন বললেন, 'একটা অত্যন্ত জরুরি উদ্দেশ্যে আজ আপনাদের এখানে ডেকেছি।' দীপার মৃত্যু ও ধর্ষণের ঘটনাটা বিশদভাবে জানিয়ে বলতে লাগলেন, 'ওর খুনীদের এখনও ধরা হয়নি। না ধরার কারণ, এদের পেছনে রয়েছে দু'জন খুব পাওয়ারফুল রাজনৈতিক নেতা। এরা কারা আপনারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন। দীপার ভয়ঙ্কর মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। অপরাধীদের ধরা এবং তাদের শাস্তির জন্যে কাল আমি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করব। সেখানে কাজ না হলে কলকাতায় হোম মিনিস্টারের কাছে যাব। আপনারা কি আমার সঙ্গে যাবেন?'

'যাব, যাব, যাব---' জনসভার নানা দিক থেকে সমুদ্রগর্জনের মতো আওয়াজ উঠতে থাকে।

জনতা একটু শান্ত হলে মণিমোহন বললেন, 'আমার আরেকটু বক্তব্য আছে। আপনারা যদি চান, আসছে নির্বাচনে আমি এখান থেকে দাঁড়াব।'

'আপনাকে চাই, চাই, চাই—' জনসভা ফের উত্তাল হয়ে ওঠে।

এত মানুষ তাঁর সঙ্গে আছে! অদ্ভুত এক আবেগ মণিমোহনকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি ভাবছিলেন, রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে না থাকলে কিছুই করা সম্ভব নয়। সেটা তাঁকে পেতেই হবে। খুনী, ধর্ষক আর তাদের আশ্রয়দাতাদের হাতে দেশটা চিরকালের মতো চলে যাক—এটা কোনোভাবেই হতে দেওয়া যায় না।

অচেনা মানুষ

বড় রাস্তায় বাস থেকে নেমে কয়েক পা এগিয়ে বাঁ দিকের পার্ক রোডে চলে এলেন শরদিন্দু— শরদিন্দু চৌধুরি। তাঁর বয়স ছিয়াত্তর। এখনও শরীর নুয়ে পড়েনি, শিরদাঁড়া টান টান। চুল বেশির ভাগটাই সাদা, চামড়াও কিছুটা কুঁচকে গেছে কিন্তু বয়স সেভাবে তাঁর ওপর দাঁত বসাতে পারেনি। ছ ফুটের মতো হাইট শরদিন্দুর, গায়ে এক ফোঁটা বাজে চর্বি নেই। লম্বাটে মুখে, দৃঢ় চিবুকে আর পুরু ফ্রেমের চশমার ওধারে দুই চোখের শান্ত দূরভেদী দৃষ্টিতে একটা প্রবল ব্যক্তিত্ব রয়েছে। তাঁর দিকে তাকানো মাত্র বোঝা যায়, এই মানুষটির সামনে কোনো বেচাল করলে পার পাওয়া যাবে না।

শরদিন্দুর পোশাক সাদামাঠা। মোটা খদ্দরের ঢোলা পাজামা আর পাঞ্জাবির ওপর তুষের চাদর। বাঁ হাতের কবজিতে ওয়েস্ট এণ্ড ওয়াচ কোম্পানির পুরনো মডেলের এমন একটা ঘড়ি যা আজকাল দুষ্প্রাপ্য কিউরিও হয়ে উঠেছে। পায়ে ভারি চপ্পল। ডান হাতে মান্ধাতার আমলের ঢাউস চামড়ার স্যুটকেস।

পার্ক রোড নামটা বেশ ছিমছাম। কিন্তু তার হাল দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। একসময় হয়তো রাস্তাটায় পিচ টিচ ছিল; এখন ছালচামড়া উপড়ে যুদ্ধের সময়কার ট্রেঞ্চের মতো লম্বা লম্বা টানা গর্ত খোঁড়া হয়েছে। নিশ্চয়ই কর্পোরেশন বা টেলিফোন ডিপার্টমেন্টের কাজ। কবে যে গর্ত বোজানো হবে, কে জানে!

সতর্কভাবে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চললেন শরদিন্দু। বাইশ নম্বর বাড়িটা তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে। পাড়াটা পাঁচমিশেলি। বেশ কিছু নতুন নতুন হাই-রাইজ যেমন আছে, তেমনি রয়েছে বাংলো ধরনের চোখ ধাঁধানো সব বাড়ি। আবার টালি বা টিনের চালের অগুনতি ঘর এবং চাপ-বাঁধা বস্তিও চোখে পড়ছে।

আজ রবিবার, ছুটির দিন। মাসটা জানুয়ারি।

সূর্য কিছুক্ষণ আগে পুবদিকের বাড়িঘর এবং গাছপালার মাথা ডিঙিয়ে উঠে এসেছে। কিন্তু রোদটা খুবই ম্যাড়মেড়ে আর নিস্তেজ। দূরে আকাশের গায়ে ফিনফিনে সিল্কের মতো হালকা কুয়াশা এখনও লেগে আছে। উত্তুরে হাওয়া এলোপাথাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে।

রাস্তায় লোকজন খুব কম। শীত আর ছুটির দিনের আলস্য তাঁর গায়ে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে।

এধারে ওধারে তাকাতে একটা চায়ের দোকান চোখে পড়ল শরদিন্দুর। সেটা সবে খুলেছে। একটা মাঝবয়সী, বেঁটেখাট লোক —গায়ে চাদর, মাথায় টাক— খুব সম্ভব দোকানের মালিক, কয়লার প্রকাণ্ড উনুন ধরানোর তোড়জোড় করছে। তার কাছ থেকে বাইশ নম্বর বাড়ির হদিস জেনে নিয়ে আরো মিনিট খানেক হাঁটার পর শরদিন্দু যেখানে এসে থামলেন সেটা ঝকঝকে চেহারার একটা দোতলা বাড়ি। বাড়িটার রং গোলাপি। সামনের দিকে কোমর সমান হাইটের ছোট লোহার গেট।

গেট খুলে পাঁচ ধাপ মোজাইক-করা সিঁড়ি ভেঙে চওড়া বারান্দায় উঠে এলেন শরদিন্দু। দেওয়ালের গায়ে কলিং বেল চোখে পড়ল। সেটা টিপে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। তারপর দরজা খুলে শক্তপোক্ত গোছের একটি মেয়েমানুষ, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, দেখেই বোঝা যায় এ বাড়ির কাজের লোক—জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চান?' এই সকালবেলায় অচেনা আগন্তুককে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেছে সে।

শরদিন্দু বললেন, 'এ বাড়িটা কি বিমল সরকারের?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি? আপনারে তো—'

'আমার কথা পরে হবে। বিমল বাড়ি আছে?'

'আচেন। ঘুমোচ্চেন।'

কবজি উলটে ঘড়ি দেখে শরদিন্দু বললেন, 'আটটা বেজে সতের। এখনও ঘুমোচ্ছেন মানে?'

মেয়েমানুষটি বলল, 'আজ ছুটির দিন। তাই উটতে দেরি হচ্চে।'

শরদিন্দু প্রায় ধমকে উঠলেন, 'তোমাকে আর বিমলের হয়ে সাফাই গাইতে হবে না। দেরি করে দাঁতে রোদ লাগিয়ে ওঠাটা বদভ্যাস। বুঝলে?'

মেয়েমানুষটা থতমত খেয়ে যায়। এমন খ্যাপাটে ধরনের বৃদ্ধ আগে আর কখনও দেখে নি সে। কী উত্তর দেবে, ঠিক করে উঠতে পারল না।

কড়া গলায় শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'সব ছুটির দিনেই এত দেরি করে ওঠে বিমল?'

ভয়ে ভয়ে মেয়েমানুষটি বলে, 'হ্যাঁ। আপিসে বেরুবার তাড়া থাকে না তো—'

শরদিন্দু আগের সুরেই বললেন, 'তার ঘুম ভাঙিয়ে আমার কাছে আসতে বল—'

মেয়েমানুষটি নিজের মধ্যে খানিকটা সাহস জড়ো করে বলল, 'সে আমি পারবনি। দাদাবাবু ভীষণ রেগে যাবে। তা আপনার আসার কথা ছিল?'

শরদিন্দু হুমকে ওঠেন, 'কথা না থাকলে কি আসতে নেই?'

'না। মানে—' মেয়েমানুষটি বলে, 'আপনি এক কাজ করুন, ঘন্টাখানিক বাদে ঘুরে আসুন। ত্যাখন দাদাবাবুর ঘুম ঠিক ভেঙে যাবে।'

'দেখ বাপু, আমি অনেকদূর থেকে আসছি। এদিককার আর এমন কাউকে চিনি না যার কাছে গিয়ে এক ঘন্টা বসতে পারি। সময় কাটাতে হলে টই টই করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হয়, সেটা পারব না।' নিজের মাথায় একটা আঙুল ঠেকিয়ে শরদিন্দু বললেন, 'তোমার দুশ্চিন্তার কারণটা আন্দাজ করতে পারছি। কিন্তু আমার চুল দেখ— দু' চারটে ছাড়া সমস্ত সাদা। এই বয়েসে খুন বা ডাকাতি করা সম্ভব না। তোমার যদি আপত্তি না থাকে, ভেতরে গিয়ে বসতে পারি?'

মেয়েমানুষটি মহা অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। কী উত্তর দিতে গিয়ে চুপ করে যায়।

চোখ কুঁচকে মাথাটা আস্তে নাড়তে নাড়তে শরদিন্দু বললেন, 'হুঁ। মনে হচ্ছে অচেনা লোককে বাড়িতে ঢুকতে দিতে বারণ আছে। তোমাকে ঝামেলায় ফেলব না। দরজা বন্ধ করে দাও। আমি আমার এই বারান্দায় স্যুটকেসটার ওপর বসে থাকছি। তোমার দাদাবাবু উঠলে খবর দিও।'

এবার মেয়েমানুষটি বোধ হয় লজ্জা পেয়ে যায়। মনে মনে হয়তো ভেবে নেয়, একটা বৃদ্ধকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলে প্রকাশ্য দিবালোকে কী আর এমন ক্ষতি করতে পারবে? সে বলল, 'না না, বাইরে বসতে হবে নি। আসুন আমার সনগে।'

চমৎকার সাজানো একটা ড্রইংরুমে মেয়েমানুষটা শরদিন্দুকে নিয়ে এসে বসায়। এই প্রথম তার মনে হয় যে বয়স্ক মানুষটি তার মনিবকে শুধু 'বিমল' বলেন, নামের পাশে একটা 'বাবু' পর্যন্ত বসান না, মনিবের দেরিতে ঘুম ভাঙাটাকে খারাপ অভ্যাস বলে মন্তব্য করেন, তিনি খুব সামান্য ব্যক্তি নন। তাঁকে একটু আপ্যায়ন করা উচিত।

মেয়েমানুষটা বলল, 'আপনাকে কি চা করে দেব?'

যে তাকে বাড়িতে ঢুকতে দিতে চাইছিল না, হঠাৎ সে চা খাওয়ার কথা বলছে। শরদিন্দু একটু অবাকও হন, আবার বেশ মজাও লাগে। বললেন, 'না, দরকার নেই। তুমি বোধহয় কাজ করছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'যাও।'

মেয়েমানুষটা দরজার দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল, কী ভেবে শরদিন্দু ডাকলেন, 'শোন—'

মেয়েমানুষটা ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কিছু কইবেন?'

'হ্যাঁ। তোমার নামটা কী?'

'আমার নাম দে কী হবে?'

'তোমার দাদাবাবু যদি ক'দিন আমাকে এখানে থাকতে দেয়, তোমার সঙ্গে দু'চারটে কথা তো বলতে হবে। নাম জানা থাকলে ডাকতে সুবিধা হয়।'

'আমার নাম ছায়া।' বলে মেয়েমানুষটি চলে গেল।

ছায়া যা বলেছিল তা-ই। এক ঘন্টারও কিছু বেশি চুপচাপ বসে থাকতে হল শরদিন্দুকে।

তারপর ড্রইংরুমের দরজার কাছে যিনি এসে দাঁড়ালেন তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। চেহারাটা ভারি ধরনের। চওড়া কপাল, ব্যাক ব্রাশ-করা কাঁচাপাকা চুল, বুদ্ধিদীপ্ত চোখে ফ্যাশনেবল চশমা। পুরু ঠোঁট তাঁর, ধারাল নাক, মোটা ভুরু। ঘাড়ে এবং গলায় বেশ চর্বি জমেছে। পরনে স্ট্রাইপ দেওয়া

ঢোলা পাজামা আর ফুল হাতা শার্টের ওপর কাশ্মিরি শাল, পায়ে বাড়িতে পরার হালকা চটি। কৃতী, সফল পুরুষদের চোখে মুখে আলাদা একটা দ্যুতি থাকে। সেটা এঁরও আছে।

কয়েক পলক স্থির চোখে লক্ষ করার পর শরদিন্দু হুঙ্কার ছাড়লেন, 'কি রে হারামজাদা, আমাকে চিনতে পারছিস না?'

দরজার কাছ থেকে প্রায় ছুটে ভেতরে চলে এলেন বিমল। অবাক বিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'স্যার আপনি! হারামজাদা না বললে সত্যিই চিনতে পারতাম না।' শরদিন্দুর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কাজের দিনগুলোয় পাঁচটার ভেতর উঠে পড়ি। ছুটির দিনে একটু বেশি ঘুমোই। বয়েস হচ্ছে তো।'

'তোর বয়েস কি আমার চাইতে বেশি? বাঁদর কোথাকার। সেভেনটি সিক্স পার করে আনলাম। এখনও সাড়ে চারটেয় উঠে পড়ি।'

'আপনার সঙ্গে কার তুলনা!'

একটু চুপচাপ।

তারপর বিমল বললেন, 'আপনি এসেছেন, কী ভাল যে লাগছে স্যার! কত কাল পর দেখা হল!'

শরদিন্দু বললেন, 'সেই ফিফটিতে, পার্টিশানের তিন বছর পর তোরা আমরা, বাজিতপুরের সবাই দেশ ছেড়ে কে কোথায় ছিটকে গেলাম। আর এটা হল নাইনটি। এবার হিসাব করে দ্যাখ।' বলে নিজেই মনে মনে অঙ্কটা কষে নিলেন, 'ফোর ডিকেডস—পুরো চল্লিশটা বছর পেরিয়ে গেছে।'

বিমল আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ, অনেকগুলো বছর। আমার ঠিকানা কোথায় পেলেন?'

'সব বলব। বৌমা আর ছেলেমেয়েদের ডেকে নিয়ে আয়।'

'হ্যাঁ স্যার, এক্ষুনি নিয়ে আসছি।'

এক মিনিটও লাগল না, বিমল ফিরে এলেন। সঙ্গে দারুণ মোটা আর দারুণ ফর্সা মাঝবয়সী এক মহিলা এবং ইস্পাতের ফলার মতো ঝকঝকে, মেদহীন অসম্ভব সুন্দর একটি তরুণী। মেয়েটার ডাই-করা বাদামি চুল কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা, ভুরু প্লাক করা, দু হাতের লম্বা লম্বা নখে মেরুন রঙের নেল পালিশ। দু'জনের পরনেই গরম হাউসকোট।

বিমল পরিচয় করিয়ে দিলেন। মধ্যবয়সিনীটি তাঁর স্ত্রী বনানী আর তরুণীটি হল ওঁদের মেয়ে—ঝিল্লি।

বনানী আর ঝিল্লি শরদিন্দুকে প্রণাম করে মুখোমুখি একটা লম্বা সোফায় বসল। বনানী বললেন, 'আপনার ছাত্রর মতো আমি আপনাকে স্যার বলতে পারব না। কাকা বললে আপত্তি নেই তো?'

অত্যন্ত খুশি হয়ে শরদিন্দু বললেন, 'মোটেও না। তুমি আমাকে কাকাই বলো।'

'আপনার কথা ওর মুখে কত যে শুনেছি তার হিসেব নেই। কোনোদিন যে আপনার সঙ্গে দেখা হবে, ভাবতে পারিনি।'

'আমার সম্বন্ধে কী বলেছে হারামজাদাটা?'

বনানী বললেন, 'দেশে থাকতে আপনার জন্যে ওদের ক্লাসের ছেলেদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ক্লাস টেনে ওঠার পরও অঙ্ক টঙ্ক না পারলে নাকি বেতের বাড়ি মেরে পিঠের ছাল তুলে ফেলতেন। স্কুলের বাইরে রাস্তাঘাটে দেখা হলে জিওমেট্রির থিওরেম আর অ্যালজেব্রার ফরমুলা জিজ্ঞেস করতেন। দূর থেকে আপনাকে দেখলেই ওরা পালাবার চেষ্টা করত। কিন্তু আপনার চোখে ধুলো দেওয়া নাকি অত সহজ ছিল না।'

শরদিন্দু হাসতে লাগলেন।

বনানী থামেন নি, 'আরো বলেছে রোজ রাত্তিরে সাইকেলে করে ছেলেদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখতেন কেউ পড়ায় ফাঁকি দিচ্ছে কিনা।' বিমলকে দেখিয়ে বললেন, 'আপনার এই ছাত্রটি যে স্কলারশিপ পেয়েছিল সেটা আপনি পেছনে লেগে না থাকলে কিছুতেই সম্ভব হত না।'

শরদিন্দু গভীর স্বরে বললেন, 'না না, ও ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিল। আমি সাহায্য করেছি মাত্র। সেটা তো একজন শিক্ষকের ডিউটি।'

বনানী মুখ টিপে একটু হেসে এবার বললেন, 'ও কিন্তু আপনার সম্বন্ধে দু'একটা খারাপ কথাও

বলেছে।'

বনানী যে রগড় করতে চাইছেন তা বুঝতে পারছিলেন শরদিন্দু। চোখ কুঁচকে, মজাদার একটা ভঙ্গি করে মোটা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরকম, কিরকম?'

বনানী বললেন, 'আপনি নাকি মুচড়ে মুচড়ে ওর কান দুটো অনেক লম্বা করে দিয়েছেন। শুয়োর, গাধা, হারামজাদা ছাড়া আর কিছু বলতেন না।'

শরদিন্দু হেসে হেসে বললেন, 'শুধু বিমলেরই না, আমাদের ঢাকা জেলার বাজিতপুর হাই স্কুলের সব ছেলেরই কান আমার হাতের মোচড়ে লম্বা হয়েছে। আর গাধা, হারামজাদা তো সকলকেই বলতাম—' বিমলের দিকে ফিরে বললেন, 'তাই না রে?'

বিমল হাসছিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, স্যার। কান দেখলেই বোঝা যায় কারা আপনার ছাত্র ছিল।'

দমকা হাসিতে শীতের এই সকালটা ভরে গেল। তার রেশ চলল অনেকক্ষণ।

হাসিটা থিতিয়ে এলে শরদিন্দু বনানীকে বললেন, 'বিমল তোমাকে বলেছে কিনা জানিনা, আমি লোকটা একেবারে ঠোঁটকাটা। যা মনে আসে, অপ্রিয় হলেও বলে ফেলি।'

বনানী বললেন, 'আপনার ছাত্র আমাকে বলেছে, আপনি খুব স্পষ্টবক্তা।'

শরদিন্দু বললেন, 'গুড। স্পষ্ট কথা শুনতে তোমার ভাল লাগে?'

একটু থতিয়ে গেলেন বনানী। দ্বিধান্বিতভাবে বললেন, 'হ্যাঁ, লাগে।'

শরদিন্দু একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে লাগে না। তবু একটা কথা জিজ্ঞেস করছি।'

'কী?'

'তোমার ওয়েট কত?'

প্রথম দিনের আলাপেই শরদিন্দু এরকম একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসবেন, ভাবতে পারেন নি বনানী। মুখ নামিয়ে বিব্রতভাবে বললেন, 'একশ কেজি।'

দুঃখিতভাবে শরদিন্দু বললেন, 'কত বয়েস হবে তোমার? ম্যাক্সিমাম সাতচল্লিশ কি আটচল্লিশ, তাই তো?'

'উনপঞ্চাশ।'

'এত কম বয়েসে এমন ওয়েট কিন্তু একেবারেই ভাল নয়। হার্ট ড্যামেজ করে দেবে।'

বিমল বললেন, 'হ্যাঁ স্যার, ওর হার্টে ট্রাবল দেখা দিয়েছে। ডাক্তার দেখিয়েছি। ইসিজি করানো হয়েছে। নানারকম ট্যাবলেট আর ক্যাপসুল খাচ্ছে।'

'তোরা ওই ক্যাপসুল আর ট্যাবলেটকেই জীবনের সার করেছিস। ওয়েটটা তো কমানো দরকার।'

'ডাক্তার তা-ই বলেছেন।'

'ডাক্তার নিশ্চয়ই ডায়েটের চার্ট তৈরি করে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, মানে—'

'মানে ডাক্তারের কথা কানে তুলছে না। ডিম, মাংস, পাকা তেলালো মাছ, মাখন, ঘি সমানে চালিয়ে যাচ্ছে—কি বলিস?'

মুখ নামিয়ে ঠোঁট টিপে একটু হাসলেন বিমল। উত্তর দিলেন না।

শরদিন্দু বললেন, 'ঠিক আছে, ওর সম্বন্ধে আমি একটু ভেবে দেখি—কী করা যায়।' বলতে বলতে ঝিল্লির দিকে তাকালেন শরদিন্দু, 'ওই দেখ, আমরাই শুধু সমানে বকর বকর করে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে তো ভাল করে আলাপই হল না। আমার কাছে এসে বসো।'

এতক্ষণ নিঃশব্দে সবার কথা শুনে যাচ্ছিল ঝিল্লি। বাবার প্রাক্তন মাস্টারমশাই এই গেঁয়ো টাইপের বকবকায়মান বৃদ্ধটিকে খুব একটা পছন্দ হচ্ছিল না তার। না গেলে মা-বাবা হয় রাগ করবেন, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও শরদিন্দুর পাশে গিয়ে বসল।

শরদিন্দু সস্নেহে বললেন, 'ঝিল্লি মানে ঝিঁঝি পোকা। ঝিঁঝিরা এত চুপচাপ থাকে না। কিছু বল—'

ঝিল্লি বুঝতে পারে, সে যে মুখ বুজে বসে ছিল, একটা কথাও বলেনি, বুড়ো সেটা লক্ষ করেছে। হাসির একটা ভঙ্গি করে সে বলল, 'কী বলব?'

'কী বলবে? ও হ্যাঁ, তোমার এত সুন্দর ঘন চুল, সেগুলো ছেঁটে বাদামি রং করেছ কেন? বাঙালি মেয়েদের কোমর সমান কুচকুচে কালো চুল থাকবে, তবেই না দেখতে সুন্দর লাগে।' শরদিন্দু বলতে লাগলেন 'আর চুল কেটো না, ওটা বাড়তে দাও—'

ঝিল্লি খুব রেগে গেল। এই গায়ে-পড়া বৃদ্ধটি তার ব্যক্তি-স্বাধীনতায় নাক গলাতে চাইছেন। এটা কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না। বলতে যাচ্ছিল, 'আমি কী করব, না করব সেটা টোটালি আমার ব্যাপার। আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।' কিন্তু বলা হল না। সব কথা সব সময় বলা যায় না। খুব ঠান্ডা গলায় ঝিল্লি শুধু বলল, 'বাঙালি মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার কনসেপ্টটা পঞ্চাশ বছরের পুরনো। সময় অনেক বদলে গেছে।' একটু থেমে বলল, 'রাস্তায় বাঙালি মেয়েদের নিশ্চয়ই দেখেন। তাদের ড্রেস, হেয়ারস্টাইল কি আর আগের মতো আছে?'

শান্তভবে বললেও কথাগুলোর ভেতর চাপা ঝাঁঝ আছে। সেটা গায়ে মাখলেন না শরদিন্দু। বললেন, 'এমন সুন্দর দেখতে তুমি কিন্তু এত রোগা কেন?' ঝিল্লির একটা হাত তুলে নিয়ে বললেন, 'গায়ের রং ফ্যাকাসে। পিগমেন্টেশনের ভীষণ অভাব। মনে হচ্ছে অ্যানিমিক। ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া কর না বুঝি?'

বনানী বললেন, 'একদম খেতে চায় না মেয়েটা। সকালে কয়েক টুকরো শসা, এক স্লাইস সেঁকা রুটি আর এক কাপ সরতোলা দুধ। দুপুরে এক কাপ ভাত, একটা রুটি, ডাল, ছোট মাছ আর টক দই। বিকেলে চা আর ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট। রাতে ডাল আর দু টুকরো মুরগির মাংস দিয়ে দু'খানা রুটি।'

শরদিন্দু বললেন, 'এই খাবারে কতটুকু আর ক্যালরি থাকে?' ঝিল্লিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্লিম হতে চাইছ বুঝি?'

ঝিল্লি বলল, 'আজকাল সব মেয়েই তা-ই চায়।'

'তুমি যেভাবে স্লিম হতে চাইছ তাতে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়বে। যেটুকু ক্যালরি দরকার তা তো নেওয়া চাই।'

ঝিল্লি উত্তর দিল না।

শরদিন্দু বললেন, 'স্বাস্থ্যটা সবার আগে—বুঝলে? তোমার যা বয়েস ভাল করে না খেলে চলে!'

ঝিল্লি এবারও চুপ।

শরদিন্দু মজার গলায় বললেন, 'মা খেয়ে খেয়ে হেভিওয়েট, মেয়ে প্রায় উপাস দিয়ে দিয়ে ফেদারওয়েট। কী কনট্রাস্ট!'

শরদিন্দুর মজাটাকে মজা হিসাবেই নিলেন বনানী। তিনি হাসতে লাগলেন।

ঝিল্লি গম্ভীর হয়ে বসে থাকে। শরদিন্দুর কথাগুলো তার পছন্দ হয় নি।

শরদিন্দু ঝিল্লির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার কথাটাও আমাকে ভাবতে হবে দেখছি।'

ঝিল্লির মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। সে বলে, 'আমার সম্বন্ধে ভাবতে হবে না।'

শরদিন্দু দুর্বিনীত, অশিষ্ট মেয়েটির দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আমার হাত দিয়ে হাজার হাজার ছেলে বেরিয়েছে। তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখ, তাদের কেউ আমার মুখের ওপর এ জাতীয় কথা বলতে সাহস পায় নি।'

বিমল হাতজোড় করে কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'স্যার, কিছু মনে করবেন না।' ঝিল্লিকে বলেন, 'এক্ষুনি পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নে। কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় এখনও শেখ নি!'

বিমলকে ধমক দিয়ে শরদিন্দু বললেন, 'আঃ, তুই চুপ কর তো। আমার কথা হচ্ছে ঝিল্লির সঙ্গে। তুই এর মধ্যে মাথা গলাচ্ছিস কেন?' একটু থেমে ঝিল্লির কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'বুঝলে দিদিভাই, আমি লোকটা বড় ঠেঁটা। তুমি যখন বলেছ ভাবতে হবে না তখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে ভাবতেই হবে।'

ঝিল্লি তীব্র দৃষ্টিতে এক পলক শরদিন্দুর দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি নিশ্চয়ই পড়াশোনা করছ?'

ঝিল্লি বলল,'হ্যাঁ। এম. এ পড়ছি—'

'কী সাবজেক্ট?'

'ইংলিশ।'

'এম. এ পাশ করার পর কী করবে ভাবছ? রিসার্চ?'

ঝিল্লি বলল, 'আমেরিকা কি কানাডায় চলে যাব।'

শরদিন্দু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন, 'যেখানেই যাই শুনি, সবাই বিদেশে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আছে।'

'এ দেশে কী আছে যে এখানে পড়ে থাকবে। একটা থার্ড ক্লাস, রটন কান্ট্রি।'

'কিন্তু ইণ্ডিয়া তোমার নিজের কান্ট্রি। লেখাপড়া শিখে ছেলেমেয়েরা যদি বাইরে চলে যায়, দেশের হাল তো আরো খারাপ হয়ে যাবে। আমাদের ভাল ভাল শিক্ষক চাই, সৎ পলিটিক্যাল লিডার চাই, বৈজ্ঞানিক চাই—'

অসহিষ্ণুভাবে শরদিন্দুকে থামিয়ে দিয়ে ঝিল্লি বলল, 'দেশ টেশ নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই।' আপনাদের সময় হয়তো পেট্রিয়টজম, আইডিয়ালিজম বলে কিছু কিছু ব্যাপার ছিল কিন্তু আজকাল ওসব নিয়ে কেউ ভাবে না।'

ঝিল্লির জন্য ঘরের আবহাওয়া অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গটা পালটানোর জন্য বিমল বললেন, 'আমাদের ঠিকানা কার কাছে পেয়েছেন সেটা কিন্তু শোনা হয় নি।'

শরদিন্দু ঝিল্লির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হেসে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমাদের দেশ নিয়ে পরে কথা হবে।' তারপর ধীরে ধীরে বিমলের দিকে ঘুরে বসলেন, 'দিনেশের কাছে তোদের ঠিকানা পেয়েছি।'

'কোন দিনেশ?'

'বাজিতপুরের কুণ্ডুবাড়ির দিনেশ রে? তোরা এক ক্লাসে পড়তিস। একই ইয়ারে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলি।'

বিমল উৎসুক সুরে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, মনে পড়ছে। ওর থুতনিতে একটা লাল জড়ুল ছিল। দিনেশ এখন থাকে কোথায়? কী করছে?'

শরদিন্দু জানালেন, দিনেশরা বেলঘরিয়ায় আছে, ওখানে বিরাট বাড়ি করেছে। সঙ্গে বাগান, পুকুর। ওদের ইলেকট্রনিক গুডসের মস্ত কারবার। চার ভাই একসঙ্গে আছে। জয়েন্ট ফ্যামিলি। তিনি বলতে লাগলেন, 'তোর সব খবর দিনেশ রাখে। ওর মুখেই শুনলাম, তুই নাকি কী একটা মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির তালেবর অফিসার হয়েছিস।'

লাজুক হেসে বিমল বললেন, 'তেমন কিছু না। কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট। সে যাক, দিনেশ আর আমি একই শহরে থাকি, আপনি না বললে জানাই হত না।'

শরদিন্দু বললেন, 'নিশ্চয়ই সবসময় নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকিস। জানার চেষ্টা করলে ছেলেবেলার বন্ধুকে ঠিকই খুঁজে বার করতিস।'

বিমল একটু বিব্রত হলেন, 'আসলে স্যার, অফিসের এত কাজ, এত প্রেসার যে সারাক্ষণ টেনসনে থাকতে হয়। কিন্তু দিনেশ যখন আমার ঠিকানা জানে, একদিন চলে এলেও তো পারত।'

'ওর ধারণা, তুই চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্সি আর বিজনেস ম্যানেজমেন্ট করে মস্ত অফিসার হয়েছিস। আর ম্যাট্রিকুলেশনের পর ওকে পড়া ছেড়ে দিতে হয়েছে। যদি পাত্তা না দিস, সেই ভয়ে—'

'এর কোনো মানে হয় স্যার?' আফটার অল দিনেশ আমার ছেলেবেলার বন্ধু।'

শরদিন্দু বললেন, 'দিনেশের ফোন নাম্বার আমার কাছে আছে। ফোনে ওর সঙ্গে কথা *বলিস।'*

বিমলের ওপর নস্টালজিয়ার ভর করে যেন। খানিকটা আবেগতাড়িত মনে হল তাঁকে। বললেন, *'ফোন টোন নয়, এক ছুটির দিনে সোজা ওদের বাড়ি গিয়ে চমকে দেব।'*

শরদিন্দু খুশি হলেন, 'ভেরি গুড। মনে রাখবি, বড় চাকরি করছিস, অনেক লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। এদের বেশির ভাগই স্বার্থের খাতিরে তোর কাছে আসে। কিন্তু ছেলেবেলার বন্ধুরা সব সময়ই আন্তরিক। তাদের রিলেশানটা অন্যরকম।'

একটু চুপচাপ।

তারপর বিমল বললেন, 'স্যার, পার্টিশান হবার পর আপনারা কোথায় গিয়ে উঠলেন, এতদিন

কী করেছেন, কিছুই জানি না।'

শরদিন্দু বললেন, 'সে সব পরে বলছি। এখন একটা কাজের কথা শোন—'

বিমল কিছু বললেন না, উন্মুখ হয়ে রইলেন।

শরদিন্দু কৌতুকের সুরে এবার বললেন, 'আমি ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছি। হোল ইণ্ডিয়ার চোদ্দটা জায়গায় আমার যাবার ইচ্ছা। প্রথম ডেস্টিনেশনটা ছিল দিনেশের বাড়ি। সেখান থেকে তোদের কাছে এসেছি। এখান থেকে কলকাতা আর চারপাশের আরো ক'টা জায়গায় যাব। তারপর ইণ্ডিয়ার অন্য কয়েকটা শহরে।'

মুখ দেখে মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা আদৌ বোধগম্য হয়নি বিমলের। তাঁকে লক্ষ করতে করতে হাসিমুখে শরদিন্দু বললেন, 'মাথায় কিছু ঢুকছে না তো?'

বিমল উত্তর দিলেন না, বিব্রতভাবে সামান্য হাসলেন।

শরদিন্দু পরিষ্কার করে এবার বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর ছিয়াত্তর চলছে। বয়সের তুলনায় শরীর স্বাস্থ্য বেশ ভাল। অসুখ বিসুখ খুব কমই হয়। দু পাটিতে বাঁধানো নকল দাঁত মাত্র চারটি। বাকিগুলো তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। এখনও তাঁর হার্ট বেশ সতেজ। দু মাস আগে ভাইপোরা জোর করে ইসিজি করিয়েছিল. কোনোরকম গোলমাল নেই। আড়াই মাইল একটানা হাটলেও হাঁফ ধরে না। বছর পাঁচেক আগে ছানি কাটিয়ে ডাক্তাররা নতুন করে তাঁর দৃষ্টিদান করেছেন। চোখ নিয়ে তাঁর আদৌ কোনো সমস্যা নেই। শরীরের যা অবস্থা তাতে হেসে খেলে আরো সাত আটটা বছর তাঁর বেঁচে থাকার কথা। কিন্তু আয়ু একটা পরমাশ্চর্য ব্যাপার। কখন যে কার শেষের ঘন্টা বেজে যায় কে বলতে পারে। তিরিশ বছরের তাজা টগবগে যুবক হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে মরে গেল কিংবা কোনোরকম অসুস্থতা নেই এমন একজনের আচমকা লিভারে ক্যানসার ধরা পড়ল—এরকম তো আকছার ঘটেই চলেছে। তাই সুস্থ থাকতে থাকতে শরদিন্দু তাঁর বাজিতপুর হাই স্কুলের পুরনো, প্রিয় ছাত্রদের কাছে জীবনের অন্তিম ক'টা দিন কাটাতে চান।

মোট চোদ্দ জনের ঠিকানা জোগাড় করতে পেরেছেন তিনি। এদের মধ্যে বিমল আর দিনেশ থাকে কলকাতায়। সুরজিৎ, মধুময়, প্রভাকর, সমীরেশ থাকে এই শহরেরই আশেপাশে। প্রমোদ বাঙ্গালোরে, সুধাময় দিল্লিতে। বাদ বাকিরা ভারতবর্ষের অন্য সব শহুরে ছড়িয়ে আছে। এরা সকলেই কৃতী। কেউ ব্যবসাবাণিজ্যে, কেউ অধ্যাপনায়, কেউ বা প্রশাসনিক দায়িত্বে রয়েছে। কেউ মেডিক্যাল প্রফেশনে।

এই চোদ্দ জন ছাড়া আরো অসংখ্য ছাত্র আছে শরদিন্দুর। কিন্তু দেশভাগের পর তারা কে কোথায় চলে গেছে, চেষ্টা করেও তাদের খোঁজ পাননি।

শরদিন্দু বললেন, 'আসার কারণটা বুঝতে পারলি তো? ক'টা দিন তোদের কাছে থাকতে দিবি?'

বিমল হকচকিয়ে গেলেন, 'কী বলছেন স্যার! আপনি থাকবেন, এ তো আমাদের পরম সৌভাগ্য। যে ক'দিন ইচ্ছা থাকুন।'

কতকাল আগে তাঁর ছাত্র ছিল বিমল? বিশাল বহুজাতিক কোম্পানির টপ একজিকিউটিভ, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, পার্থিব সাফল্য বলতে যা বোঝায় সবই তাঁর মুঠোর ভেতর, তবু এতটুকু অহমিকা নেই। চল্লিশ বছর আগের মতোই পুরনো মাস্টার মশাইকে সে এখনও সমান শ্রদ্ধাভক্তি করে—এটা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন শরদিন্দু। এবার একেবারে আপ্লুত হয়ে গেলেন। কী বলতে যাচ্ছিলেন, বলা হল না। কাঠের মতো মুখ করে চুপচাপ বসে ছিল ঝিল্লি। বাবার চল্লিশ বছর আগের মাস্টার মশাই দুম করে এই ছুটির দিনের সকালে তাদের বাড়ি এসে উলটোপালটা কিছু বলায় সে যে খুশি হয়নি সেটা তাকে দেখে আন্দাজ করা যায়। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে শরদিন্দুকে বলল, 'এক্সকিউজ মি, আমাকে একটু বেরুতে হবে। যাচ্ছি—'

শরদিন্দু লক্ষ করলেন, বনানী এবং বিমলের মুখ শক্ত হয়ে উঠল। ঝিল্লিকে বললেন, 'আমি এলাম। আজ না হয় না-ই বেরুলে।'

ঝিল্লি বলল, 'না। আমার খুব ইমপর্টান্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

বনানী রেগে গেলেন, 'তোমার কিসোর ইমপর্টান্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট, আমার জানা আছে।'

ঝিল্লি জবাব দেয় না।

বিমল বললেন, 'স্যার আমাদের বাড়ি প্রথম এলেন। আজ না বেরুলেই কি চলছে না?'

ঝিল্লি বলল, 'তোমরাই আছ। ওঁকে ভাল করে এন্টারটেন কর। আমার থাকাটা খুব আর্জেন্ট নয়।'

বিমল খেপে উঠতে গিয়েও অনেক কষ্টে নিজেকে সমালে নিলেন। কিছু বললেন না।

বনানী মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাবি?'

ঝিল্লি বলল, 'আমি যথেষ্ট অ্যাডাল্ট। কোথায় যাব, না যাব, সব সময় জানিয়ে যেতে হবে নাকি?'

শরদিন্দু অনুমান করতে পারছিলেন, এই দুর্বিনীত একরোখা মেয়েটাকে নিয়ে বিমলরা সমস্যায় রয়েছেন। খুব নরম গলায় ঝিল্লিকে বললেন, 'মা-বাবাকে জানিয়ে যাওয়াই তো উচিত।'

চোখ কুঁচকে গায়ে-পড়া বৃদ্ধটির দিকে এক পলক তাকিয়ে ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে যায় ঝিল্লি।

কঠোর সুরে বনানী বললেন, 'ব্যক্তি স্বাধীনতায় হাত পড়বে বলে কোথায় যাচ্ছ সেটা না হয় বলবে না। কখন ফিরবে সেটা কি জানতে পারি?'

দোতলার সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে ঝিল্লি বলল, 'যদি দেরি হয় ফোন করে জানিয়ে দেব।'

রাগে, উত্তেজনায় মুখ লাল হয়ে উঠেছিল বনানীর। বললেন, 'কাকা, এই মেয়েটার জন্য আমরা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। সারাক্ষণ আমাদের টেনসনে রাখে। যখন যেখানে খুশি বেরিয়ে যাচ্ছে, যখন খুশি আসছে। কোথায় কাদের সঙ্গে মিশছে, কিছুই বুঝতে পারি না। কোনদিন যে কী ঘটিয়ে বসবে, কে জানে।'

শরদিন্দু চমকে উঠলেন। ক'টা দিন প্রাক্তন ছাত্রের কাছে আনন্দে কাটিয়ে যাবেন, ভেবেছিলেন। এ বাড়িতে অঢেল টাকা, আরামের অজস্র উপকরণ। কিন্তু যা নেই তা হল মানসিক সুখ। মনটা খারাপ হয়ে গেল তাঁর। বললেন, 'ঝিল্লি বড় হয়েছে, নিজের ভালমন্দ বুঝতে শিখেছে। অত দুশ্চিন্তা করো না বৌমা। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বনানী বলতে যাচ্ছিলেন, 'কিছুই ঠিক হবে না।' বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন। বৃদ্ধ মানুষটি এই প্রথম তাঁদের বাড়ি এসেছেন। এখনও দু ঘন্টা পেরোয় নি। এর মধ্যে এতখানি উত্তেজিত না হলেই ভাল হত।

শরদিন্দুর হঠাৎ মনে পড়ে যায়। বলে ওঠেন, 'ওই দেখ, দিনেশ তোমাদের জন্যে ক'টা জিনিস পাঠিয়েছে। সেগুলো স্যুটকেস থেকে বারই করা হয় নি।'

বিমল ব্যস্তভাবে বললেন, 'পরে বার করবেন স্যার। এখন ওপরে চলুন। এতটা রাস্তা এসেছেন। এতক্ষণ বকিয়েছি। নিশ্চয়ই টায়ার্ড হয়ে গেছেন। হাত-পা ধুয়ে, ড্রেস চেঞ্জ করে, চা'টা খেয়ে রেস্ট নিন।'

'এমন কিছু ক্লান্ত হই নি যে রেস্ট নিতে হবে। তবে এক কাপ গরম চা খুব দরকার।' শরদিন্দু উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর স্যুটকেসটার দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই সেটা তুলে নিলেন বিমল। দরজার দিকে যেতে যেতে বললেন, 'আসুন স্যার—'

রগড়ের গলায় শরদিন্দু বললেন, 'মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির এত বড় অফিসার তার স্কুল টিচারের স্যুটকেস বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, লোকে দেখলে কী বলবে!'

বিমল কিছু না বলে একটু হাসলেন।

সবার আগে বিমল, মাঝখানে শরদিন্দু, পেছনে বনানী, এইভাবে তিনজনে বাইরে চলে এলেন। ড্রইংরুম থেকে ক'পা ডান দিকে গেলেই দোতলার সিঁড়ি। ওরা যখন ওপরে উঠছেন, ঝিল্লি তখন নামছে। তার পরনে এখন জিনস, শার্ট এবং দামি কার্ডিগান। পায়ে ফ্যাশনেবল লেডিজ চপ্পল। কাঁধ থেকে ব্যাগ ঝুলছে।

ঝিল্লি কখন ফিরবে তার ঠিক নেই, একটু আগে জানিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও শরদিন্দু তাকে বললেন, 'একটু তাড়াতাড়িই চলে আসতে চেষ্টা করো দিদিভাই। তুমি এলে একসঙ্গে দুপুরে খাব।'

'প্লিজ, আমার জন্যে ওয়েট করবেন না।' বলে, নিচে নেমে গেল ঝিল্লি।

দোতলায় উঠে বিমল আর বনানী শরদিন্দুকে একখানা বেশ বড় মাপের ঘরে নিয়ে এলেন। মেঝেতে কার্পেট, একপাশে ডবল-বেড খাটে ধবধবে বিছানা, দেওয়ালে গরম কালের জন্য এয়ারকুলার, ওয়ার্ডরোব, টেলিফোন, পড়াশুনোর জন্য চেয়ারটেবল, জানালায় মেরুন রঙের দামি পর্দা। বসার

জন্য এক সেট সোফা আর বেতের মোড়াও রয়েছে। সব ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন।

স্যুটকেস একধারে নামিয়ে রেখে বিমল বললেন, 'বসুন স্যার। এটা আপনার ঘর—' বলে ডাইনে বাঁয়ে এবং সামনের দিকে যে জানালাগুলো ছিল তার পর্দা টেনে সরিয়ে কাচের পাল্লাগুলো খুলে দিলেন। বাইরে থেকে শীতের নরম সোনালি রোদ এসে ঘরের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল। একটা সোফায় বসতে বসতে শরদিন্দু লক্ষ করলেন, বনানী কেমন যেন অন্যমনস্ক, তাঁর মুখটা ম্লান দেখাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ভাবছ বৌমা?'

বনানী বিষণ্ণ বললেন, 'মেয়েটা আপনার সঙ্গে বিশ্রী ব্যবহার করল। আমার কী খারাপ যে লাগছে! ছাত্রের বাড়ি এসে আপনার ভালই অভিজ্ঞতা হল।'

হেসে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে শরদিন্দু বললেন, 'দূর, এ সব নিয়ে ভেব না তো। আমি ঝিল্লির সঙ্গে কথা বলে জানতে চেষ্টা করব, ও কাদের সঙ্গে মেশে, এগ্‌জাক্টলি কী চায়, কথায় কথায় কেন এত মেজাজ খারাপ করে।'

বনানী বললেন, 'কেন ফের অসম্মানিত হতে যাবেন? ওর সঙ্গে কথা বলারই দরকার নেই।'

শরদিন্দু বললেন, 'দেখ মা, সারা জীবন আমি কম বয়েসের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাটিয়েছি। ওদের ধাত তোমার চেয়ে আমার অনেক বেশি জানা আছে। বিমল আমার হাতে মানুষ হয়েছে। এখানে যখন এসেই পড়েছি, দেখি তার মেয়ের জন্য কিছু করতে পারি কিনা।'

বনানী বললেন, 'আপনার কথা কী ও শুনবে! যা বেয়াড়া, অসভ্য মেয়ে!'

শরদিন্দু বললেন, 'আমি ওরকম মেয়ে সারা জীবনে অনেক দেখেছি।'

'কাকা, ওকে নিয়ে আমাদের যে কী চিন্তা বলে বোঝাতে পারব না।'

'তোমাদের চিন্তাটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। দেখি, কী করতে পারি—'

'দেখুন।'

'আমি বাথরুমে যাচ্ছি, তুমি চায়ের ব্যবস্থা কর। চা খেয়ে তোমাদের বাড়িটা দেখব।

'নিশ্চয়ই দেখবেন। চায়ের সঙ্গে আর কী দেব?'

'বেলঘরিয়া থেকে ফার্স্ট বাসটা ধরেছিলাম। দিনেশ খেয়ে আসার জন্যে খুব জোর করেছিল কিন্তু অত ভোরে ব্রেকফাস্ট করার অভ্যাস নেই। তুমি মুড়ি বা দু স্লাইস সেঁকা রুটি দিও। শসা কিংবা কলা থাকলে দিতে পার। আমার ব্লাড সুগার নেই। চায়ে পুরো এক চামচ চিনি দেবে।'

বনানী চলে গেলেন।

বিমল দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে বসতে বলে স্যুটকেস খুলে লুঙ্গি, গামছা, হাফহাতা পাঞ্জাবি ছাড়াও গোটা চারেক নারকেল, বড় দু প্যাকেট মিষ্টি আর একটা মানকচু বার করলেন শরদিন্দু। জানালেন, মানকচু আর নারকেল দিনেশদের বাগানে হয়েছে। ওরা ওগুলো তাঁর সঙ্গে পাঠিয়েছে। মিষ্টির একটা প্যাকেটও ওরা দিয়েছে। দ্বিতীয় প্যাকেটটা শরদিন্দু এনেছেন।

বাল্যবন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেয়ে বিমল খুব খুশি। সেগুলো তুলে নিয়ে বললেন, 'আপনার বৌমাকে দিয়ে আসি।'

'যা। আমি বাথরুমে ঢুকি।' গামছা লুঙ্গি টুঙ্গি হাতে নিয়ে শরদিন্দু উঠে পড়লেন।

বাথরুমে গিজার আছে। সেটা চালিয়ে গরম জলে হাতমুখ ধুয়ে পরনের পাজামা পাঞ্জাবি পালটে লুঙ্গিটুঙ্গি পরে বাইরে বেরিয়ে শরদিন্দু দেখলেন, বনানী আর বিমল ফিরে এসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। সোফা সেটের মাঝখানে যে সেন্টার টেবলটা রয়েছে সেটার ওপর একটা মস্ত ট্রেতে মাখন ছাড়া টোস্ট, কলা, শসা, আপেল, আঙুর, সন্দেশ এবং চায়ের সরঞ্জাম চোখে পড়ল। অর্থাৎ বনানী তাঁর কথা পুরোটা শোনেন নি, অনেক বেশি খাবার নিয়ে এসেছেন।

বনানী বললেন, 'আজ ব্রেকফাস্টটা ঘরেই করুন। দুপুর থেকে আমরা সবাই ডাইনিং টেবলে বসে খাব।'

শরদিন্দু সোফায় বসতে বসতে বনানীকে বললেন, 'তোমার বোধ হয় শুকনো রুটি আর চা দিতে লজ্জা করছিল। আমি কিন্তু সত্যিই তার বেশি খাই না। কাল থেকে এত খাবার দিও না। আরেকটা কথা, আমি ডিম মাংস বহুদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছি। দুপুর বা রাতে ডাল, ভাত, মাছের ঝোল

আর একটু টক দই হলেই চলবে। বাড়াবাড়ি মোটেও করবে না।'

স্বামীর মাস্টারমশাইকে ভালমন্দ কিছু না খাওয়াতে পারলে ভাল লাগছিল না বনানীর। তিনি বললেন, 'আমি এমন কিছু দিই নি কাকা।'

হেসে হেসে শরদিন্দু বললেন, 'কী দিয়েছ, আমি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। আমার বয়েসটা যে ছিয়াত্তর, সেটা অস্বীকার করার তো উপায় নেই।'

'আপনাকে কিন্তু অতটা দেখায় না।'

'আমার চেহারাটা খুবই ডিসেপটিভ, কী বল?'

বনানী হাসতে লাগলেন।

অনেক বলা সত্ত্বেও দু টুকরো রুটি, একটা কলা আর চা ছাড়া অন্য কিছুই শরদিন্দুকে খাওয়ানো গেল না।

খাওয়া দাওয়ার পর বনানী আর বিমল তাঁদের বাড়িটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। ওপরে চারখানা বেডরুম এবং একটা লম্বা হল। একতলায় তিনখানা শোবার ঘর ছাড়া রয়েছে কিচেন, ডাইনিং রুম, ড্রইংরুম ইত্যাদি। পেছন দিকে বাগান, সার্ভেন্টস কোয়ার্টার্স এবং গ্যারেজ।

গোটা বাড়িটা মোজেক-করা। প্রতিটি শোবার ঘরের সঙ্গে টাইলস বসানো বাথরুম।

এ বাড়িতে কাজের লোক সবসুদ্ধ চারজন। একজন ড্রাইভার, একজন কুক, আর একজন বাসন মাজে এবং ঘর সাফ করে। এই তিনজন পুরুষ। সবার ওপরে রয়েছে ছায়া। তার ডিউটি হল অন্যদের কাজের তদারক করা, খেতে দেওয়া, বাজার করা এবং বিমলদের নানারকম ফরমাশ খাটা।

পুরুষ কাজের লোকেরা থাকে পেছনের সার্ভেন্টস কোয়ার্টার্সে। ছায়াই শুধু রাত্তিরে বাড়ির ভেতরে থাকে, সে একতলার ড্রইংরুমে শোয়। দোতলার একটা বেডরুম বিমল আর বনানীর, একটা ঝিল্লির। বাকিগুলো খালিই পড়ে থাকে। আজ শরদিন্দু আসায় গেস্ট রুমের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।

সব দেখানোর পর বিমলরা শরদিন্দুকে আবার তাঁর ঘরে নিয়ে এলেন।

বিমল বললেন, 'আমি যাচ্ছি স্যার। অফিসের ক'টা ইমপর্টান্ট ফাইল দেখতে হবে, কয়েকজনকে ফোন করতে হবে। খবরের কাগজ পাঠিয়ে দিচ্ছি। পড়তে পড়তে আপনি রেস্ট নিন।'

বানানীও বসলেন না, নিচে চলে গেলেন। রান্নাবান্নার কী ব্যবস্থা হচ্ছে সেটা দেখা দরকার।

শরদিন্দু ধীরে ধীরে বিছানায় বসে পড়লেন। অন্যমনস্কর মতো সামনের জোড়া জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। ওধারে বেশ কিছু হাই-রাইজ আকাশের দিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেও এখনও প্রচুর গাছপালা চোখে পড়ে। শীতের সোনালি রোদ ডানায় মেখে অজস্র পাখি উড়ছে।

শরদিন্দু কিছুই দেখছিলেন না। বিমল আর বনানীর কথাই ভাবছিলেন। আপাত দৃষ্টিতে ওদের সুখী স্বামী-স্ত্রী বলেই মনে হয় কিন্তু একটাই সমস্যা—ঝিল্লি।

দুই

শরদিন্দু মানুষটিকে অদ্ভুত মনে হতে পারে। আজকের পৃথিবীর চোখে তিনি একেবারেই খাপছাড়া। তাঁর মাথায় ফিক্সেশনের মতো যা আটকে আছে তার নাম আদর্শবাদ।

ঢাকা জেলার বাজিতপুরে একান্নবর্তী পরিবার ছিল তাঁদের। তাঁরা চার ভাই। শরদিন্দুই সবার বড়। তাঁর বয়স যখন পনের, ওঁদের বাবা মারা যান। সে জন্য আর্থিক দিক থেকে বিপন্ন হতে হয় নি। বাজিতপুরের দক্ষিণ দিকে আড়াই শ বিঘে দোফসলা জমি ছিল তাঁদের। প্রচুর ধান হত। তা ছাড়া ফলত নানা ধরনের রবিশস্য— মুগ মুসুর সরষে তিল ইত্যাদি।

নিজেদের সারা বছরের খোরাকি রেখে বাদ বাকি ধান সরষে মুগ মুসুর বেচে অজস্র টাকা হাতে আসত। ভাত ডাল এবং তেলের ব্যবস্থা জমি থেকেই হত। কিন্তু জামাকাপড়, চারটি ছেলের লেখাপড়া, ইত্যাদি বাবদে খরচখরচা করেও বছরে কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকা জমত। অসাধারণ ছাত্র ছিলেন শরদিন্দু। তখনও দেশভাগ হয়নি। ঢাকা ডিস্ট্রিক্টের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা রেজাল্ট করে স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। কলেজ আর ইউনিভার্সিটির পড়াশোনা তাঁর ঢাকা শহরে। হোস্টেলে থেকে পড়তেন। অঙ্ক এবং ইংরেজিতে এম. এ করার পর বাজিতপুরে ফিরে এসেছিলেন। দুটো সাবজেক্টেই তাঁর রেজাল্ট

চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো। অঙ্কে তিনি ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড, ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস থার্ড। তাঁর মতো মেধাবী ছাত্র ইচ্ছে করলে আই. সি. এস হতে পারতেন কিংবা সরকারি বড় কোনো চাকরি জোগাড় করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু শরদিন্দু চমকে দেবার মতো কেরিয়ার তৈরি করার কথা আদৌ ভাবেননি। অঢেল টাকা, বিরাট পদমর্যাদা, প্রভূত ক্ষমতা, আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য— এসবের দিকে তাঁর আদৌ লক্ষ ছিল না।

তখন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে জাতীয়তা বোধের জোয়ার এসেছে। পরাধীন দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে হবে। স্বাধীন মাতৃভূমির জন্য সত্যিকারের মানুষ গড়ে তুলতে হবে। তাঁর রোল মডেল তখন বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ গান্ধিজি জওহরলাল সি. আর. দাস কি সুভাষচন্দ্র।

দেশজোড়া প্রবল উন্মাদনার স্রোতে ভেসে গিয়েছিলেন শরদিন্দু। তবে রাজনীতি নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। এই একটা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে জড়িয়ে পড়ার মতো মানসিক গঠন ছিল না। তিনি কর্মক্ষেত্র হিসেবে শিক্ষাকেই বেছে নিয়েছেন। এম.এ'র রেজাল্ট বেরুবার পরই দুটো কলেজ থেকে অধ্যাপনার চাকরি নেবার জন্য ডাক এসেছিল কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দিয়েছেন।

সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, গ্রামাঞ্চলে যেখানে পড়াশোনার তেমন সুযোগ নেই সেই তৃণমূল স্তর থেকেই কাজ শুরু করবেন।

বিয়ে করেননি শরদিন্দু। এম. এ পাশ করার পর বাজিতপুরে ফিরে সেখানকার হাইস্কুলে চাকরি নিয়েছিলেন। স্কুল আর ছাত্রদের নিয়েই ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব পৃথিবী। ছেলেরা ঠিকমতো পড়াশোনা করছে কিনা সেদিকে তাঁর কড়া নজর। স্কুলে সবাই তটস্থ হয়ে থাকত। ফাঁকি দেবার কোনো উপায় ছিল না। এমনকি রোজ সন্ধেয় সাইকেলে করে বাড়ি বাড়ি টহল দিয়ে বেড়াতেন। কেউ অঙ্ক টঙ্ক না পারলে বুঝিয়ে দিতেন। যতক্ষণ না ছেলেটির মাথায় সেটি ঠিকমতো ঢুকছে, ছাড়াছাড়ি নেই।

যারা টাকা পয়সার হিসেব ছাড়া কোনো কিছুই বোঝে না তারা বলবে স্রেফ পাগলামি; নিজের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে একটু একটু করে খুন করছেন শরদিন্দু। কিন্তু পৃথিবীতে একরোখা, বিশুদ্ধ কিছু পাগল চিরকালই থাকে। নিজেদের নির্দিষ্ট লক্ষ ছাড়া অন্য কোনোদিকে তারা তাকায় না।

এদিকে ছোট ভাইরা বড় হচ্ছিল। শরদিন্দুর মতো না হলেও তারা পড়াশোনায় বেশ ভাল। ভাইরা তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত কিন্তু রোল মডেল হিসেবে তাঁর কথা কখনও ভাবেনি। তারা পুরোপুরি কেরিয়ারিস্ট। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে বেরুবার পর মেজ এবং সেজ ভাই ঢাকাতেই চাকরি নিয়েছিল। ছোটটি তখন পড়ছে।

চাকরি পাওয়ার পর দুই ভাইয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। ভাইয়ের স্ত্রীরা বাজিতপুরেই থাকত। ভাইরা ছুটিছাটায় বাড়ি এসে দু'চারদিন কাটিয়ে যেত।

এইভাবেই চলছিল। শরদিন্দু ভেবেছিলেন, তাঁদের জীবনটা এরকমই কেটে যাবে। কিন্তু কাটল না।

উনচল্লিশে পৃথিবীজোড়া যুদ্ধ শুরু হল। সেটা শেষ হতে না হতেই দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, তারপর স্বাধীনতা এবং পার্টিশান। দেশভাগের পরও বছর তিনেক গভীর এক আতঙ্কের মধ্যে কাটিয়েছেন শরদিন্দুরা। আজন্মের চেনা বাজিতপুর আর তেমনটা ছিল না। রাতারাতি সেখানকার মানুষজন আগাগোড়া বদলে গিয়েছিল। তাদের চোখেমুখে অবিশ্বাস, ঘৃণা এবং ক্রোধ। বাজিতপুরের জন্য এত করেছেন তবু শরদিন্দুর মনে হত, তাঁরা ওখানে অবাঞ্ছিত।

সাতচল্লিশের আগস্টের পর থেকেই বাজিতপুরে ভাঙন ধরেছিল। কুমোররা, বারুইরা, তেলি এবং গোঁসাইরা একে একে সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে কেউ চলে গেল আগরতলায়, কেউ আসামে, কেউ কলকাতার দিকে। চোখের সামনে শুধু বাজিতপুরেরই নয়, চারপাশের গ্রামগুলো ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল। যেদিকেই তাকানো যাক, শ্মশানের স্তব্ধতা।

শরদিন্দুদেরও শেষ পর্যন্ত থাকা সম্ভব হল না। আবহমান কালের বাসভূমি ছেড়ে তাঁরা ভেসে পড়লেন।

পরের দুই ভাই মৃন্ময় আর চিন্ময় রেলে চাকরি করত। তারা অপশান দিয়ে আগেই পাটনায় চলে গিয়েছিল। এবার পরিবারের সবাইকে নিয়ে শরদিন্দুও চলে এলেন। সেখানে একটা মেয়েদের হাইস্কুলে হেডমাস্টারের কাজও পেয়ে গেলেন। বাজিতপুরের মতোই পাটনার মেয়েদেরও তিনি গড়ে

তুলতে লাগলেন। স্কুলে তো পড়াতেনই, সন্ধের পর ছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে দেখতেন, কেউ ফাঁকি দিচ্ছে কিনা। অঙ্কে এবং ইংরাজিতে যারা কাঁচা, তাদের যত্ন করে সব বুঝিয়ে দিতেন।

পাটনার যে মহল্লায় থাকতেন সেখানে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন শরদিন্দু। শুধু বাঙালিরাই না, বিহারীরাও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। তখন রিটায়ারমেন্টের তত কড়াকড়ি ছিল না। ষাট পেরুবার পর আরো সাত আট বছর তিনি স্কুলে থেকে গেছেন। আসলে ছাত্রীরা, তাদের অভিভাবকরা এবং স্কুলের গভর্নিং বডি, কেউ তাঁকে ছাড়ছিল না। তাঁর জায়গায় আর কেউ আসবেন, এটা কারো পক্ষেই যেন মেন নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

আটষট্টি বছর যখন তাঁর বয়স, সেই সময় শরদিন্দুর মনে হল, ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তিনি হেডমাস্টার থাকায় অন্যদের প্রোমোশন হচ্ছে না। এই বয়সে স্কুলের সব চেয়ে উঁচু জায়গাটা বছরের পর বছর আঁকড়ে থাকাটা খুবই অনৈতিক কাজ। ছাত্রীদের কাকুতি মিনতি, বাড়িতে এসে ধরনা এবং গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট আর মেম্বারদের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি স্কুল ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষ তৈরির দায়িত্ব প্রথম যৌবনে যিনি স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, জীবনে সেটাই যাঁর একমাত্র লক্ষ্য তিনি তো আর হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন না। পাটনার কাছাকাছি একটা অনাথ আশ্রমে গিয়ে নিঃস্বার্থভাবে সপ্তাহে তিন দিন পড়াতে লাগলেন। বাকি চারদিন রাস্তার নিরাশ্রয় ছেলেদের জড়ো করে কোনো ফাঁকা জায়গায় ক্লাস করতেন। সারা জীবনে যা জমিয়েছিলেন তার বেশির ভাগটাই এদের বইখাতা টিফিন কিনে দিয়ে খরচ করে ফেলেছেন।

ন্যাশনাল টিচার অফ দ্য ইয়ার হয়ে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে তিনবার সার্টিফিকেট পেয়েছেন শরদিন্দু। পেয়েছেন সাধারণ মানুষের অজস্র সম্মান, শ্রদ্ধা আর ভালবাসা।

জীবনের লম্বা ম্যারাথন দৌড় শেষ করার মুখে এসে এই ছিয়াত্তর বছর বয়সে হঠাৎ শরদিন্দুর ইচ্ছা হল, বাজিতপুরের তাঁর পুরনো ছাত্রদের কাছে যাবেন। দেশভাগের পর কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, কে কী করছে, কেমন আছে, নিজের চোখে তা দেখতে চান। চারদিকে চিঠি লিখে লিখে চোদ্দজনের ঠিকানা তিনি জোগাড় করতে পেরেছিলেন। একদিন সেই ঠিকানাগুলো ডায়েরিতে টুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। অবশ্য ভাইরা, ভাইয়ের স্ত্রী এবং তাদের ছেলেমেয়েরা কেউ তাঁকে একা একা এই বয়সে ছাড়তে চায় নি। কিন্তু বরাবর তিনি একগুঁয়ে। কিছু একটা মাথায় চাপলে করে ছাড়বেনই। ফলে তাঁকে আটকানো যায় নি। প্রথমে কলকাতায় এসে বেলঘরিয়ায় দিনেশদের বাড়ি উঠলেন, তারপর আজ এসেছেন বিমলদের কাছে।

ব্রেকফাস্টের পর বিমলদের বাড়ি দেখে গেস্ট রুমের বিছানায় বসে থাকতে থাকতে কখন শুয়ে পড়েছেন আর কখন দু চোখ জুড়ে গভীর ঘুম নেমে এসেছে, শরদিন্দু টের পাননি।

'স্যার, স্যার—' ঘুমটা ভেঙে গেল বিমলের ডাকে। ধীরে ধীরে উঠে বসলেন শরদিন্দু।

বিমল বললেন, 'অনেক বেলা হয়ে গেছে। সাড়ে বারটা বাজে। রান্না হয়ে গেছে, স্নান করে নিন।'

একটু অপ্রস্তুত হাসলেন শরদিন্দু। বললেন, 'আরে বাবা, এতক্ষণ ঘুমিয়েছি!'

বিমল বললেন, 'এখানে আসার জন্যে খুব ভোরে উঠেছিলেন তো। কাল রাতে ঘুমটা ভাল হয় নি। তাই—'

'তাই হবে। তুই যা। আমি স্নান করে দশ মিনিটের ভেতর নিচে আসছি।'

বিমল চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর একতলার ডাইনিং রুমে এসে শরদিন্দু দেখলেন, টেবল সাজিয়ে অপেক্ষা করছেন বিমল আর বনানী। একধারে দাঁড়িয়ে আছে ছায়া।

এবার আর খুব বাড়াবাড়ি করেন নি বনানী। ভাত, মুগের ডাল, বেগুনভাজা, বড়িভাজা, দু'রকমের মাছ, নিরামিষ তরকারি— মোট এই ক'টি পদ। এছাড়া ঘরে-পাতা দই এবং স্যালাড।

বনানী বললেন, 'আপনার ধমক খেয়ে বেশি কিছু কিন্তু করি নি কাকা।'

একটু হেসে চেয়ারে বসতে বসতে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'ঝিল্লিকে দেখছি না। ও এখনও ফেরে নি?'

'না। বলেই তো গেল কখন ফিরবে ঠিক নেই।'

শরদিন্দু আর কোনো প্রশ্ন না করে খাওয়া শুরু করলেন।

একটু চুপ।

তারপর শরদিন্দু বললেন, 'বন্ধুবান্ধবের বাড়ি গিয়ে সময় মতো খাওদাওয়া করলে ঠিক আছে। নইলে শরীর খারাপ হবে।'

বনানী কী বললেন, বোঝা গেল না।

খেতে খেতে বিমল বললেন, 'স্যার, সন্ধেবেলায় বনানী আর আমি একবার বেরুব। আগে থেকে ঠিক করা আছে। আপনার হয়তো একটু অসুবিধে হবে।' তাঁকে বেশ কুণ্ঠিত দেখাল।

শরদিন্দু বললেন, 'বেরুতে হলে বেরুবি। এতে সঙ্কোচের কী আছে?'

'না। মানে আপনি প্রথম দিন এলেন, আপনাকে কোম্পানি দিতে পারব না। তাই—'

'এ নিয়ে ভাবার কারণ নেই। আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হবে না। এর ভেতর নিশ্চয়ই ঝিল্লি চলে আসবে। তার সঙ্গে গল্প করে করে সময় কাটিয়ে দেব।'

'ঝিল্লি কখন ফিরবে কে জানে। ততক্ষণ—'

'বললাম তো, এ নিয়ে চিন্তা করিস না। তা তোরা কোথায় যাবি?'

'চেম্বার অফ কমার্স থেকে একটা পার্টি দিয়েছে। আমাদের কোম্পানির তরফ থেকে আপনার বৌমাকে নিয়ে আমাকে অ্যাটেণ্ড করতে হবে।'

'এরকম পার্টিতে সস্ত্রীক যেতে হয় বুঝি?'

'হ্যাঁ। ইনভিটেশনটা সেভাবেই করা হয়। মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস অমুক, কাইণ্ডলি অ্যাটেণ্ড—এইরকম আর কি। স্যার, চাকরি করি তো। না গেলে—'

'এই সব পার্টিতে যাওয়া যখন চাকরির অঙ্গ তখন যেতে তো হবেই। ফিরবি কখন?'

'মনে হচ্ছে, রাত হবে। ওখানেই ডিনারের ব্যবস্থা আছে। না খেয়ে চলে এলে ভীষণ খারাপ দেখাবে। ছায়া আছে। রাতে কখন খাবেন, ওকে বললেই ব্যবস্থা করে দেবে। তা ছাড়া যখন যা দরকার হয় ওকে বলবেন। আপনার কোনোরকম অসুবিধা হবে না।'

'ততক্ষণে ঝিল্লি নিশ্চয়ই চলে আসবে। ও এলে একসঙ্গে খাওয়া যাবে।'

কী উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেলেন বনানী। ছায়ার দিকে ফিরে বললেন, 'আমরা যখন থাকব না, কাকার সব দায়িত্ব তোমার।'

আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয় ছায়া।

খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে এক সময় দোতলায় নিজের ঘরে ফিরে এলেন শরদিন্দু। শরীর খুব ক্লান্ত না হলে কিংবা অসুস্থ না হয়ে পড়লে কোনোদিনই দুপুরে তিনি শোন না। দিনের বেলায় স্কুল করে করে দিবানিদ্রার অভ্যাসটাই তাঁর তৈরি হয় নি।

পাটনা থেকে বেরুবার সময় স্যুটকেসে জামাকাপড়ের সঙ্গে ক'খানা বইও ভরে নিয়েছিলেন। গান্ধিজির 'কমিউনাল ইউনিটি', রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতান', নীহার রায়ের 'বাঙালির ইতিহাস', দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ওপর লেখা 'রাইজ অ্যাণ্ড ফল অফ দা থার্ড রাইখ' ছাড়া পরশুরামের 'গড্ডালিকা' আর সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল'। নানা ধরনের বই পড়তে তিনি ভালবাসেন। রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, দেশের ইতিহাস থেকে শুরু করে ছোটদের গল্প কবিতা পর্যন্ত।

খবরের কাগজ আর বই টই পড়ে দুপুর এবং বিকেলটা কাটিয়ে দিলেন শরদিন্দু।

সন্ধেবেলায় তাঁর সঙ্গে দেখা করে পার্টিতে চলে গেলেন বিমল আর বনানী।

তার কিছুক্ষণ পর ছায়া এল। জিজ্ঞেস করল, 'কিছু করে আনব কাকা? চা, কফি?' বনানীর দেখাদেখি সেও শরদিন্দুকে কাকা বলতে শুরু করেছে।

ছায়ার কর্তব্যবোধ প্রখর। সেই যে দুপুর বেলা খাওয়ার সময় বনানী তাকে শরদিন্দুর দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তারপর পাঁচ ছ'বার ওপরে এসে জেনে গেছে তার কিছু চাই কিনা।

সারাদিনে একবারই চা খান শরদিন্দু, তাও সেই সকালে। বিকেলে তিনি চা কেন, অন্য কিছুই খান

না। কিন্তু ছায়া একেবারে নাছোড়বান্দা। বার বার বলা সত্ত্বেও সে মাঝে মাঝেই হানা দিয়ে যাচ্ছে।

শরদিন্দু বললেন, 'তোমাকে তো বলেছি, আমার কিছু দরকার নেই।'

ছায়া বলল, 'চা না খান, সন্দেশ শোনপাপড়ি কি কেক নিয়ে আসি?'

শরদিন্দু হেসে ফেললেন, 'আরে বাবা, বুড়ো মানুষদের অত খেতে নেই। শরীর খারাপ হয়ে যাবে। তখন আমাকে নিয়ে তোমাদেরই ভোগান্তি।'

'দুটো সন্দেশ কি একটুকরো কেক খেলে কিছু হবে না।'

'না রে বাবা, না। বুড়ো মানুষদের অত লোভ দেখাতে নেই।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে! ছায়া বলল, 'আপনি কিছু না খেলে বৌদি আমার ওপর ভীষণ রাগ করবে।'

এতক্ষণে খাওয়ার ব্যাপারে ছায়ার জোর করার কারণটা বোঝা গেল।

শরদিন্দু মৃদু হেসে বললেন, 'বনানী যাতে রাগ না করে, ওকে বুঝিয়ে বলব। তোমার ভয় নেই। তুমি গিয়ে তোমার কাজ টাজ কর।'

অগত্যা কী আর করা। ছায়া চলে যাচ্ছিল, কী ভেবে শরদিন্দু তাকে বললেন, 'যেয়ো না—'

ছায়া ঘুরে দাঁড়িয়ে উৎসুক চোখে তাকায়।

শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'ঝিল্লি ফিরেছে?' আসলে তিনি ওপরে আছেন। বাড়ির গেটটা এখান থেকে দেখা যায় না। ঝিল্লি ফিরলেও তিনি জানতে পারেন নি।

ছায়া বলল, 'না।'

শরদিন্দুকে চিন্তিত দেখায়। তিনি বললেন, 'সকাল সেই ন'টা সাড়ে ন'টায় বেরিয়েছে। এখনও ফিরল না!'

'দিদিমণির জন্যে ভাববেন না কাকা। একবার বেরুলে তাড়াতাড়ি কি আর বাড়ি ফেরে?'

'কী বলছ তুমি!'

'হ্যাঁ গো কাকা বেরুলে দিদিমণির ফেরার ঠিক থাকে না।'

'তাই বলে অত বড় মেয়ে, এতক্ষণ বাইরে থাকবে!'

'এখনও তো ছ'টা বাজেনি। আটটা, ন'টা, দশটা বাজুক। তারপর তো বাড়ির কথা মনে পড়বে।'

হতবাক শরদিন্দু কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন, 'ফিরতে এত দেরি করে?'

ছায়া বলে, 'একদিন তো রাত বারটা হয়ে গিয়েছিল।'

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন শরদিন্দু। পারিবারিক জীবন সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণা সেকেলে ধরনের। নিয়ম, শৃঙ্খলা এবং শোভনতায় তিনি বিশ্বাসী। একটা বাইশ তেইশ বছরের তরুণী যখন ইচ্ছা বাড়ি থেকে বেরুবে, যখন ইচ্ছা ফিরবে, এটা কোনোমতেই মেনে নেওয়া যায় না। স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে একটা ব্যাপার আছে। সেটা তিনি খুবই পছন্দ করেন। পৃথিবী বদলে গেছে। মেয়েরা ঘরের কোণে পড়ে থাকবে, তা তো আর হয় না। তারা বাইরের খোলামেলা জগতে পুরুষদের পাশাপাশি পা ফেলে এগিয়ে যাবে, স্বনির্ভর হবে, তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে, এটা একান্তভাবেই কাম্য। পৃথিবীর সব দেশের মেয়েরা কত কাল ধরে কত দিকে এগিয়ে গেছে। ভারতবর্ষের মেয়েরাও আজকাল খুব একটা পিছিয়ে নেই। জীবনের নানা ক্ষেত্রে—রাজনীতি, অর্থনীতি, খেলাধুলায় যথেষ্ট এগিয়ে গেছে। কাজের জন্য কোথায় না কোথায় চলে যাচ্ছে তারা। তাই বলে একটা মেয়ে টো টো করে অকারণে, হয়তো উদ্দেশ্যহীনভাবে বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াবে, সেটা উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রতিটি পরিবারেই কিছু কোড অফ কনডাক্ট বা আচরণবিধি থাকা দরকার। ছেলেমেয়েরা খেয়াল খুশিমতো চললে পরিবারটা আর পরিবার থাকে না, হোটেলের মতো হয়ে দাঁড়ায়।

বিমল এবং বনানীর ব্যাপারটাও অদ্ভুত লাগছে শরদিন্দুর। ওদের কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছিল, মেয়ে সম্পর্কে তারা ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত। কিন্তু ঝিল্লির কোনো খোঁজখবর না নিয়েই ওরা পার্টিতে চলে গেল। কী ধরনের বাপ-মা এরা!

শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় কোথায় যায় ঝিল্লি, তুমি কি জান?'

ঝোঁকের মাথায় অনেকখানি বলে ফেলেছিল ছায়া। হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে যায় সে। বলে, 'তা

আমি জানি না কাকা। আচ্ছা, এখন যাচ্ছি।' বলে আর দাঁড়ায় না।

শরদিন্দুর মনে হল, অনেক কিছুই জানে ছায়া কিন্তু আর কোনো প্রশ্ন করার আগেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। অর্থাৎ তাকে ডেকে ঝিল্লি সম্পর্কে হাজার প্রশ্ন করলেও তার মুখ থেকে আর একটি শব্দও বার করা যাবে না। ঝিল্লিকে ঘিরে এমন কিছু আছে যা নিশ্চয়ই খুব অস্বস্তিকর।

মাত্র কয়েক দিনের জন্য শরদিন্দু এখানে এসেছেন। ভেবেছিলেন হই চই করে আনন্দে কাটিয়ে যাবেন। কিন্তু ঝিল্লির জন্য দুশ্চিন্তাটা তাঁর মাথায় ক্রমশ চেপে বসছে। কিছু একটা না করলেই নয়। মেয়েটা কোথায় যেতে পারে, তার বন্ধুবান্ধবদের ঠিকানা কী, কিছুই তাঁর জানা নেই। থাকলে সোজা সেখানে চলে যেতেন।

আটটা পর্যন্ত অদ্ভুত এক অস্থিরতার মধ্যে কেটে গেল শরদিন্দুর। তারপর আর ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। লুঙ্গি টুঙ্গি ছেড়ে পাজামা পাঞ্জাবির ওপর চাদর জড়িয়ে নিচে নেমে এলেন।

ছায়া কিচেনের কাছে দাঁড়িয়ে রান্নার লোকের সঙ্গে কথা বলছিল। শরদিন্দুকে দেখে একটু অবাক হয়েই ছুটে এল, 'আপনি কোথাও যাচ্ছেন কাকা?'

শরদিন্দু বললেন, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এই ঠাণ্ডার ভেতর—'

ছায়ার কথা শেষ হবার আগেই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেলেন শরদিন্দু।

একে শীতের রাত, তার ওপর ছুটির দিন। টিভির বেশির ভাগ চ্যানেলেই এখন সিনেমা চলছে। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই হয়। দু'চারটে বিড়ি সিগারেট আর চায়ের দোকান ছাড়া অন্য দোকানগুলোর কোনোটাই খোলা নেই। প্রতিটি বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ। রাস্তায় কর্পোরেশনের যে আলোগুলো জ্বলছে তার প্রতিটির তলায় কুয়াশার বৃত্ত। হিমে চারদিক আড়ষ্ট হয়ে আছে। প্যাসেঞ্জারদের জন্য অনন্ত আশা নিয়ে মোড়ের মাথায় যে সাইকেল রিকশাওলারা বসে থাকে তারাও উধাও হয়ে গেছে। চারপাশ আশ্চর্য রকমের সুনসান। ক্বচিৎ কখনও বড় রাস্তা দিয়ে দু'একটা অটো, বাস বা মিনিবাস দারুণ স্পিড তুলে সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তার মুখে চলে এলেন শরদিন্দু। শীতের নির্জন, কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্তিরে এলোমেলো ঘোরাঘুরি করলে ঝিল্লিকে পেয়ে যাবেন তেমন দুরাশা তাঁর নেই। তা হলে যে বেরিয়ে পড়েছেন তার কারণ প্রচণ্ড স্নায়বিক চাপ। আসল এমন এক অস্থিরতা তার ওপর ভর করেছে যে ঘরের ভেতর একেবারেই বসে থাকতে পারছিলেন না।

শরদিন্দু রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্যাসেঞ্জার নামতে বা উঠতে চাইলে বাস-টাসগুলো এখানে এসে থামে। কিন্তু কোনোটাই থামছে না।

কিভাবে, কোন ধরনের গাড়িতে ঝিল্লি ফিরে আসবে, শরদিন্দুর জানা নেই। এ ধার দিয়েই যে ফিরবে, নাকি বাড়িতে যাতায়াতের অন্য কোনো রাস্তা আছে, তাই বা কে জানে! শীতের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া চাবুকের মতো শরদিন্দুর নাকে মুখে এবং শরীরের অন্য খোলা জায়গাগুলোতে আছড়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে, চামড়া ফেটে ফেটে রক্তাক্ত হয়ে যাবে। চারপাশে হিম আরো ঘন হচ্ছে।

শরদিন্দু একবার ভাবলেন, ফিরে যাবেন। পরক্ষণে প্রচণ্ড একগুঁয়েমি তাঁর ওপর ভর করল যেন। যতক্ষণ না ঝিল্লি ফিরে আসে, এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন।

প্রায় ঘন্টাখানেক কেটে গেল। বাস এবং অন্যান্য গাড়ির চলাচল এখন আরো অনেক কমে গেছে। শুধুমাত্র একটা চাদরে ঠাণ্ডাকে বাগ মানানো যাচ্ছে না। শরীর একেবারে জমে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তাঁর মাথায় অন্য রকমের দুশ্চিন্তা দেখা দিল। মেয়েটার কি কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, নাকি অন্য কোনো বিপদ? এমনও হতে পারে, অন্য রাস্তা দিয়ে এর মধ্যে সে ফিরে এসেছে। বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেবেন কিনা শরদিন্দু যখন ভাবছেন, একটা লাল রঙের টাটা সুমো রাস্তার মুখে এসে থামল। গাড়িটার দরজা খুলে নামল ঝিল্লি। গাড়ির ভেতর আরো তিন চারজন রয়েছে। সবাই যুবক যুবতী।

ঝিল্লি নামার পর একটি যুবকও নেমেছে। ঝিল্লির চেয়ে দু'তিন বছরের বড়ই হবে সে। বেশ ধারাল চেহারা। হাইটও ভাল। পরনে জিনসের ওপর জ্যাকেট। গালে অল্প দাড়ি, গায়ের রং বাদামি।

চুল এলোমেলো। যুবকটি ঠিকমতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না, সামান্য টলছিল। ঝিল্লিও তাই।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন শরদিন্দু। রাস্তার ঘোলাটে আলোয় স্পষ্ট না হলেও তাঁর মনে হচ্ছিল, ওরা যেন কিছু একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। নেশাটেশা করেছে কি? শরদিন্দুর শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো কিছু খেলে গেল।

যুবকটি বলল, 'পরশু আমরা অনীশদের বাড়িতে মিট করছি। বিকেলে স্ট্রেট ওখানে চলে যেয়ো। টুয়েলভ বাই সেভেনটিন কেয়াতলা অ্যাভেনিউ।'

ঝিল্লি বলল, 'না না, ওদের বাড়ির লোকজনেরা থাকবে।'

'কেউ নেই। অনীশ ছাড়া সবাই দিল্লিতে ওর কাকার কাছে গেছে। পনের দিন সেখানে থাকবে।' এই ফিফটিন ডেজের জন্যে ফ্ল্যাটের চাবি আমাকে দিয়ে গেছে। সো দেয়ার ইজ নো প্রবলেম।'

'কিন্তু এভাবে চলতে পারে না।'

'কী চলতে পারে না?'

'উইকে দু'তিনদিন রাত করে বাড়ি ফিরছি। মা-বাবা ভীষণ রাগ করে।'

'ড্যাম ইয়োর মা-বাবা। তারা পার্টি করে কত রাতে বাড়ি ফেরে? আমি সব জানি।'

'পাড়ার লোকেরা অত রাতে ফিরতে দেখে। তাদের ইমপ্রেশনটা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

'কার কী ইমপ্রেশন হল তাতে কিছু আসে যায় না। ব্লাডি বাস্টার্ডের দল। ডোন্ট কেয়ার আ ফিগ—'

ঝিল্লি বলল, 'সুজয় শোন—'

তাকে কোনো কথা বলতেই দিল না সুজয়, 'পরশু বিকেলে অনীশদের কেয়াতলার বাড়িতে আমাদের দেখা হচ্ছে। দ্যাটস ফাইনাল। ও.কে?'

ঝিল্লি এবার আর আপত্তি করল না। বলল, 'ও.কে।'

আচমকা সুজয় ঝিল্লির গালে চুমু খেয়ে বলল, 'বাই—' তারপর গাড়িটায় উঠে পড়ল।

'বাই—' বলে হাত নাড়তে নাড়তে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল ঝিল্লি।

পা সামান্য টললেও ওরা যে নেশাগ্রস্ত, সে ব্যাপারে শতকরা একশ ভাগ নিশ্চিত মন শরদিন্দু। তবে শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তা নির্জন হলেও প্রকাশ্যে একটি যুবক ঝিল্লিকে চুমু খেতে পারে, এ তিনি কল্পনা করতে পারেন না। ইওরোপ আমেরিকার মতো এ দেশেও কি এতকালের যাবতীয় নিয়মশৃঙ্খলা এবং শোভনতা ভেঙে চুরমার হয়ে পারমিসিভ সোসাইটি চালু হয়ে গেছে? স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন শরদিন্দু।

খোলা রাস্তায় এমন দৃশ্য আগে কখনও দেখেন নি তিনি। বিশেষ করে তাঁরই একজন প্রাক্তন ছাত্রের মেয়ে এমন একটা কান্ড করে বসতে পারে, এ সম্পূর্ণ অভাবনীয়।

এ সময় টাটা সুমোটা সামনের দিকে গাঢ় কুয়াশা এবং অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। চকিতের জন্য গাড়িটার নম্বর শরদিন্দুর চোখে পড়ে। তিনি সেটা মনে করে রাখেন।

বাড়ির দিকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল ঝিল্লি। শরদিন্দু আর দাঁড়ালেন না, পায়ে পায়ে ফিরে আসতে থাকেন।

বাড়িতে ঢুকে ঝিল্লি দোতলার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ছায়ার সঙ্গে কথা বলছিল, 'ছায়াদি আমি খেয়ে এসেছি। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। শুতে যাচ্ছি।'

শরদিন্দু এইসময় বাড়ির ভেতর চলে এসেছিলেন। পেছন থেকে বলে উঠলেন, 'এটা কিরকম হল দিদিভাই?'

চমকে ঘুরে দাঁড়ায় ঝিল্লি। শরদিন্দুকে দেখে বলে, 'ও আপনি!'

এতক্ষণ তারই জন্য যে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং যে অস্বস্তিকর দৃশ্যটি তাঁর চোখে পড়েছে, সে সম্পর্কে কোনো আভাসই দিলেন না শরদিন্দু। হেসে হেসে বললেন, 'ও বেলা তোমার সঙ্গে বসে খাওয়া হল না। ভেবেছিলাম গল্প করতে করতে তুমি আর আমি একসঙ্গে খাব।' কথা বলছিলেন ঠিকই, সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ চোখে ঝিল্লিকে লক্ষ করছিলেন শরদিন্দু। মেয়েটার চোখ দুটো লালচে, ফোলা ফোলা। সমস্ত চেহারায় কেমন একটা ঝিম ধরা, আচ্ছন্ন ভাব। বাড়ির ভেতরের উজ্জ্বল আলোয়

মনে হল, ঝিল্লি কেমন যেন নেশাগ্রস্ত। মদ নয়, ড্রাগের কথা তিনি শুনেছেন। শরীরে সেই বিষ ঢুকলে তার কী কী লক্ষণ ফুটে বেরোয় সে সম্পর্কে খবরের কাগজের একটা লেখায় কিছুদিন আগে তা পড়েছেন।

নিজের চোখে আগে কখনও ড্রাগ-অ্যাডিক্ট দেখেননি শরদিন্দু। এই মুহূর্তে ঝিল্লিকে দেখে কাগজের সেই লেখাটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। মেয়েটা একেবারে গোল্লায় গেছে।

ঝিল্লি বলল, 'আই অ্যাম সরি। আপনাকে কোম্পানি দিতে পারছি না।' এক সেকেণ্ডও আর দাঁড়াল না সে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় চলে গেল।

রাতে একতলার ডাইনিং রুমে বসে একাই খাওয়া চুকিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন শরদিন্দু। এখনও বিমলরা ফেরেন নি। সারা গা লেপে ঢেকে আধ-শোওয়া হয়ে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। দরজাটা খোলাই রয়েছে, সেখান দিয়ে শীতের বাতাস ঘরে ঢুকছে, তবু সেটা বন্ধ করলেন না। পাল্লা আটকে দিলে বিমলরা ফিরে এলে দেখতে পাবেন না। ঝিল্লির ব্যাপারে ওদের সঙ্গে কথা বলা দরকার। আজ শরদিন্দু যা দেখলেন, তাতে মেয়েটাকে সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য যা যা করা দরকার, করতেই হবে।

কিন্তু সাড়ে এগারটা পর্যন্ত জেগে থেকেও বিমলদের সঙ্গে আজ দেখা হল না। এদিকে ঘুমে চোখ জুড়ে আসছিল শরদিন্দুর। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসও এত অসহ্য হয়ে উঠেছে যে দরজা খুলে রাখা যাচ্ছে না। শরদিন্দু খাট থেকে নেমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। বিমলদের পার্টি ক'টা পর্যন্ত চলবে কে জানে।

তিন

ছেলেবেলা থেকে ভোরে ওঠা অভ্যাস শরদিন্দুর। গরমের সময় পাঁচটায় ঘুম ভেঙে যায়। শীতকালে ঘন্টাখানেক দেরি হয়। ঘুলঘুলির ফাঁকে আলোর আভাস দেখলে এক সেকেণ্ডও শুয়ে থাকতে পারেন না তিনি। অদৃশ্য কেউ যেন ধাক্কা মারতে মারতে তাঁকে বিছানা থেকে তুলে বাথরুমের দিকে ঠেলে দেয়।

আজ যখন উঠলেন প্রায় সাড়ে ছ'টা বাজে তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে পোশাক পালটে বিমলদের বেডরুমের সামনে গিয়ে দরজায় টোকা দিলেন।

দরজা খুলে বিমল ঘুম চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে স্যার?'

শরদিন্দু বললেন, 'এখনও ঘুমোচ্ছিস? চল, মর্নিং ওয়াক সেরে আসি। বৌমাকে ডেকে তোল।'

বিমল কাতর গলায় বললেন, 'কাল ফিরতে ফিরতে সাড়ে বারটা হয়ে গিয়েছিল। ভাল ঘুম হয়নি। ন'টার সময় অফিসে বেরুতে হবে। কাল থেকে আপনার সঙ্গে মর্নিং ওয়াকে যাব।'

'আচ্ছা, আরেকটু ঘুমিয়ে নে। আমি ঘুরে আসি, তোদের সঙ্গে খুব আর্জেন্টি কিছু আলোচনা আছে।'

বিমলের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। শরদিন্দু সোজা ডান পাশে এগিয়ে ঝিল্লির ঘরের দরজায় বেশ কয়েক বার টোকা দিলেন। কিন্তু তার সাড়া পাওয়া গেল না। মা-বাবার মতোই খুব সম্ভব অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় মেয়েটা ; অগত্যা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগলেন।

বাড়ির বাইরে এসে একবার শরদিন্দু ভাবলেন বড় রাস্তার দিকে যাবেন। পরক্ষণে কী ভেবে উলটো দিকে হাঁটতে লাগলেন। এ ধারেও রাস্তা খানাখন্দে ভরা। কাল যা দেখেছিলেন সেই ট্রেঞ্চের মতো টানা গর্ত এদিকেও রাস্তার এক ধার দিয়ে চলে গেছে।

আজ সোমবার, কাজের দিন। জানুয়ারি মাস হলেও বেশ কিছু লোকজন বেরিয়ে পড়েছে। কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদ উঠতে শুরু করেছে।

হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার শেষ মাথায় এসে একটা জলা জায়গা পাওয়া গেল—অনেকটা ঝিলের মতো। সেটার পাশ দিয়ে বাঁধানো রাস্তা। তবে এই রাস্তারও ছালচামড়া উঠে গেছে। বোঝাই যায়, বহুকাল সারানো হয় নি।

এ অঞ্চলেও কিছু ভ্রমণকারী রয়েছে। গলায় এবং মাথায় মাফলার বেঁধে, গায়ে চাদর জড়িয়ে তারা ঝিলের চারপাশে পাক খাচ্ছে। এরা সবাই বেশ বয়স্ক মানুষ। কম বয়সের ছেলেমেয়েদের কাউকেই দেখা গেল না। ঘন্টাখানেক হাঁটাহাঁটির পর শরীর বেশ চনমনে লাগছে। পূবদিকের গাছপালা এবং উঁচু উঁচু বাড়ির মাথা ছাপিয়ে সূর্য অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। শীতের রোদ যদিও নিস্তেজ, তবু বেশ আরামদায়ক।

ফেরার সময় শরদিন্দুর চোখে পড়ল, চওড়া লাল সালুর দু মাথায় দড়ি লাগিয়ে রাস্তার দু পাশের দুই বাড়িতে টান টান করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সেটায় বড় বড় হরফে লেখা ঃ সরস্‌সতী পূজা, তার নিচে 'সেভেনস বুলেটস'।

ঝিলের দিকে যাবার সময় খেয়াল করেননি শরদিন্দু। 'সরস্‌সতী' এবং 'সেভেনস' বানানটা দেখে মাথা গরম হয়ে গেল তাঁর। 'সেভেন বুলেটস' যে একটা ক্লাব এবং তাদের উদ্যোগেই যে সরস্বতী পূজা হতে চলেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে।

রাস্তার ধারে ক'টা ছোকরা জটলা করছিল। চোয়াড়ে চেহারা, পরনে সরু ফুলপ্যান্ট আর জামার ওপর রোঁয়াওলা সোয়েটার। তাদের কাছে গিয়ে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'এই তোমরা জান— এই সেভেন বুলেটস কারা?'

ছেলেগুলো বেশ হকচকিয়ে গেল। তাদের ভেতর থেকে একজন বলল, 'আমরা। কেন, কী হয়েছে?'

'সরস্বতী বানান কী লিখেছ? লেখাপড়ার সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক আছে তোমাদের?' বলে মাথার ওপর লাল সালুটা দেখিয়ে দিলেন শরদিন্দু।

খ্যাপাটে ধরনের অচেনা একটা বৃদ্ধকে দেখে ছোকরারা বেশ মজা পেল যেন। অন্য একজন বলল, 'গভরমেন্ট শালা অ্যায়সা হারামী যে বানানগুলোন অ্যাত খটমট করে দিয়েছে যে কী বলব! আপনি বুঝি এ পাড়ায় লতুন আমদানি!'

শরদিন্দু রাগারাগি করলেন না। বললেন, 'হ্যাঁ।'

ছেলেটা বলল, 'দেখুন দাদু, চাঁদা তুলে পুজোর নামে এট্টু আধটু হইহল্লা করব। দু'চারটে বানান ভুল হলে শ্লা মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।'

ছোকরাগুলো কোন শ্রেণীর জীব সেটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না শরদিন্দুর। পাটনাতেও এ রকম অনেক দেখেছেন। লস্ট জেনারেশন বলতে যা বোঝা যায়, এরা তাই। তাঁর পকেটে সবসময় একটা ডটপেন আর দু চার টুকরো কাগজ থাকে। কাগজ কলম বার করে সরস্বতীর শুদ্ধ বানান লিখে কাগজটা এবং সেই সঙ্গে পঞ্চাশটা টাকা ছোকরাগুলোকে দিয়ে বললেন, 'সালুটা পালটে নতুন সালুতে বানানটা ঠিক করে লিখিয়ে নেবে। সরস্বতী হলেন বিদ্যার দেবী। তাঁকে নিয়ে এ ধরনের বাঁদরামো উচিত নয়। কাল যেন দেখি, শুদ্ধ বানানওলা সালু টাঙানো হয়েছে।'

জটলার ভেতর থেকে গালভাঙা একটা ছোকরা বলে উঠল, 'ঘ্যাম লোক! একটা বানানের জন্য পঞ্চাশ টাকার পাত্তি বার করে দিলে!'

আর একটা ছোকরা বলল, 'ঠিক আছে দাদু, আপনি যখন ক্যাশ বার করে দিলেন তখন শুদ্ধু বানানই লাগিয়ে দেব।'

শরদিন্দু আর দাঁড়ালেন না। বাড়ি ফিরে দেখলেন বিমলদের ঘুম ভেঙে গেছে। মা বাবা এবং মেয়ে ডাইনিং টেবলে বসে আছে।

বিমল একটু অপ্রস্তুতভাবে বললেন, 'আমরা স্যার আপনার জন্যে ওয়েট করে করে এক কাপ করে চা খেয়ে ফেলেছি। ভীষণ ঠাণ্ডা তো।'

'বেশ করেছিস।' বলে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন শরদিন্দু। ছায়াকে ডেকে বিমল বললেন, 'স্যার এসে গেছেন। গিরিধারীকে আর এক বার চা করতে বল। স্যার একাই নন, আমরাও আরো এক কাপ করে খাব।' গিরিধারী ওঁদের রান্নার লোক।

ছায়া চলে গেল।

বিমল শরদিন্দুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন দিকে বেড়াতে গিয়েছিলেন?'

ঝিলের কথা বললেন শরদিন্দু।

বিমল বললেন, 'হ্যাঁ, ওদিকটা বেড়াবার পক্ষে বেশ ভাল।'

'জানিস, বেরিয়ে ফেরার পথে একটা ব্যাপার হয়েছে।'

'কী স্যার?'

সরস্বতীর বানান নিয়ে যা ঘটেছিল, বললেন শরদিন্দু। শুনে বিমল আর বনানী হাসতে লাগলেন। ঝিল্লি চুপচাপ বসে ছিল। তার মুখেও হাসি ফুটল।

বিমল বললেন, 'সেভেন বুলেটস'-এর ওই ছোকরাগুলো ভীষণ নোটোরিয়াস। এমন খারাপ কাজ নেই যা ওরা পারে না।'

'যত বাজেই টাইপের হোক্ ওরা কিন্তু আমার সঙ্গে মোটেই খারাপ ব্যবহার করে নি।'

'তাই নাকি?'

'বরং খানিকটা মজাই করেছে।'

চা এসে গেল। খেতে খেতে শরদিন্দু বললেন, 'হ্যাঁ রে বিমল, এখানকার রাস্তাগুলো তো জঘন্য, পটহোলে বোঝাই। পাশ দিয়ে চার পাঁচ ফিট ডিপ গর্ত চলে গেছে। অসাবধান হলে তো মহা বিপদ। বিশেষ করে রাত্রিবেলায়।'

বনানী বললেন, 'লোড শেডিংয়ের সময় গর্তে পড়ে অনেকের হাত-পা ভেঙেছে।'

শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'কতদিন এই অবস্থা চলছে?'

বনানী বললেন, 'সাত আট মাস হবে।'

'তোমরা কর্পোরেশন অফিসে জানাও নি?'

'আমরা ডাইরেক্টলি জানাই নি। তবে এই এলাকার লোকেরা অনেক বার গিয়ে বলে এসেছে।'

বিমল বললেন, 'যত বারই গেছে, তাদের বলা হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি রাস্তা সারানো হবে। ওনলি প্রমিস। কাজের কাজ কিছু হয় নি।'

শরদিন্দু বললেন, 'একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিস?'

বিমল জিজ্ঞেস করেন, 'কী স্যার?'

স্বাধীনতার পর মিনিস্টার থেকে শুরু করে সরকারি আমলা সাবই শুধু প্রমিসই করে যায়। অল এম্পটি ওয়ার্ডস। কাজের কাজ কিছু হয় না।'

বিমল বলেন, 'ঠিকই স্যার।'

চায়ে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে কী ভেবে শরদিন্দু বললেন, 'তোদের এখানকার কাউন্সিলর কে?'

'নিশাপতি চাকলাদার।'

'তোর সঙ্গে পরিচয় আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'আসছে রবিবার তাকে বিকেলে চায়ের নেমন্তন্ন কর।'

বিমল তাঁর প্রাক্তন মাস্টারমশাইকে ভাল করেই চেনেন। চিন্তিতভাবে বললেন, 'কেন স্যার?'

'আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করব।'

'লোকটা খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। কোনোরকম গোলমাল টোলমাল হবে না তো?'

অর্থাৎ বিমল ঘুরিয়ে জানতে চাইছেন, নিশাপতি চাকলাদার চা খেতে এলে শরদিন্দু কোনো অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন কিনা। শরদিন্দু পুরনো ছাত্রের মনোভাব আন্দাজ করে নিয়ে বললেন, 'তোর অসুবিধা হয়, এমন কিছুই করব না। নিশ্চিন্ত থাক।'

ভরসা দেওয়া সত্ত্বেও দুর্ভাবনা কিন্তু পুরোটা কাটল না বিমলের। বললেন, 'লোকটা শুধু ইনফ্লুয়েন্সিয়ালই নয়, খানিকটা নোটোরিয়াস টাইপের।'

শরদিন্দু বললেন, 'আমি ক'দিন বাদে চলে যাব। কিন্তু তোকে এ পাড়ায় থাকতে হবে। নিশ্চয়ই ভাবছিস, তোর ওপর ঝামেলা করতে পারে। কিন্তু তোদের যাতে এতটুকু ক্ষতি না হয় সেটা আমি দেখব।'

দ্বিধান্বিতভাবে বিমল বললেন, 'ঠিক আছে। রবিবার বিকেলে ওঁকে চা খেতে ডাকব।'

শরদিন্দু কথা বলছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর চোখ প্রথম থেকেই বার বার ঝিল্লির দিকে চলে যাচ্ছিল।

এখন তাকে বেশ স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। কালকের সেই আচ্ছন্ন, ঝিম-ধরা ভাবটা আর নেই। নেশার প্রতিক্রিয়া কেটে গেছে তার।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। শরদিন্দু বনানী আর বিমলকে বললেন, 'ভোরে বেড়াতে বেরুবার সময় বলেছিলাম, তোদের সঙ্গে একটা খুব দরকারি কথা আছে। আমার সঙ্গে ওপরে চল।'

ডাইনিং হলের ওয়াল-ক্লকে এখন আটটা বেজে সাত। এক নজর সেদিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে বিমল বললেন, 'স্যার, এখনই আমি স্নান করতে বাথরুমে ঢুকব। সাড়ে ন'টায় অফিসে না পৌঁছলেই নয়।'

'অফিসে একদিন আধঘন্টা দেরি করে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। আমি তোকে যা বলব সেটা তার চেয়ে অনেক বেশি আর্জেন্ট।' শরদিন্দুর চোখ ঝিল্লির দিকেই ছিল। তাকে বাদ দিয়ে তিনি বিমলদের ওপরে ডেকেছেন। সে জন্য তার ভুরুদুটো সামান্য কুঁচকে গেল। মেয়েটা কি কিছু সন্দেহ করছে?

শরদিন্দু আর বসলেন না। ধীরে ধীরে উঠে নিজের ঘরে চলে গেলেন। বাইরের পোশাক পালটে লুঙ্গি পরে তিনি যখন ইজিচেয়ারে বসেছেন, বিমল আর বনানী এলেন। তাঁরাও বসলেন। ওঁদের চোখেমুখে চিন্তার ছাপ। শরদিন্দু কী জরুরি কথা বলবেন, সেটা ওঁরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না।

বিমলরা বসার পর শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'পার্টি থাকলে তোদের বাড়ি ফিরতে কি কালকের মতো রাত বারটা একটা হয়ে যায়?'

বিমল ঢোক গিলে বললেন, 'হ্যাঁ। মানে—'

'ড্রিংক করতে হয় কিনা সেটা জিজ্ঞেস করে লজ্জা দেব না।' শরদিন্দু বলতে লাগলেন, 'আজকাল মদ্যপানটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে যারা উঁচু পোস্টে কাজ করে তাদের একটু আধটু খেতেই হয়। এ নিয়ে আমার কোনো প্রেজুডিস নেই। শুধু বেহেড মাতাল হয়ে স্যাণ্ডাল ট্যাণ্ডাল না করলেই হল। আমি কী বলতে চাইছি, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস। যাই করিস না কেন, ডিসেন্সিটা থাকা খুব দরকার।'

শরদিন্দুর দরকারি কথাটা ড্রিংকের ব্যাপারেই কিনা, বোঝা যাচ্ছে না।

বিমল মাথা নিচু করে বসে রইলেন।

শরদিন্দু এবার বললেন, 'ঝিল্লির বয়স কত? খুব সম্ভব বাইশ তেইশ—তাই তো?'

এই প্রশ্নটার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না বনানী। কিছুক্ষণ হতবাক তাকিয়ে থেকে বললেন, 'চব্বিশ চলছে।'

বনানীর দিকে ঝুঁকে শরদিন্দু বললেন, 'শি ইজ এ ইয়াং গার্ল—রাইট?'

বিরুদ্ধ পক্ষের ঝানু উকিলের মতো উলটোপালটা জেরা করে শরদিন্দু কোথায় কোন গভীর খাদের দিকে তাঁদের টেনে নিয়ে যাচ্ছেন; বনানী কিছুই অনুমান করতে পারছেন না। শুধু বললেন, 'হ্যাঁ।'

'এই বয়সের একটা মেয়ে কোথায় যায়, কার সঙ্গে মেশে, এ সব তার মা-বাবা, বিশেষ করে মায়ের জানা দরকার। ঝিল্লির মুভমেন্ট, তার বন্ধুবান্ধব, বন্ধুদের চালচলনের খবর তোমরা রাখ?'

'এ কথা বলছেন কেন কাকা?'

বনানীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শরদিন্দু বললেন, 'আমি তোমাদের শুভাকাঙ্খী, এটা আশা করি তুমি স্বীকার করবে।'

শশব্যস্তে বনানী বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'তা হলে আমার বিশেষ অনুরোধ, ঝিল্লির ওপর তুমি নজর রাখ, ওকে বেশি করে সঙ্গ দাও। বিমলকে অফিসের কাজে অনেকক্ষণ বাইরে থাকতে হয়, পার্টিতে যেতে হয়। তুমি পার্টিতে যাওয়া বন্ধ কর।' শরদিন্দু বলতে লাগলেন, 'স্বামীর চাকরি রক্ষার জন্যে পার্টিতে যাওয়ার চেয়ে মেয়েকে বাঁচানো অনেক বেশি ইমপর্টান্ট।'

বনানীকে বিচলিত দেখাল, 'স্যার, আমি তো ঝিল্লির চালচলনের ব্যাপারে সবসময় ওকে বকাবকি করি। আপনি ওবেলা নিজের চোখেও দেখেছেন।'

শরদিন্দু ধমকের সুরে বললেন, 'দ্যাটস নট এনাফ। অনেক সময়, অনেক কেয়ার নেওয়া উচিত। মেয়ে কী চায়, কেন সে যখন তখন বাইরে বেরোয়, এসব তোমাকে জানতে হবে। আফটার অল

মেয়েরা যখন বড় হয়, মায়েরাই তাদের সব চেয়ে বড় বন্ধু। এটা সবসময় মনে রাখবে বৌমা।'

আস্তে মাথা নাড়েন বনানী

উদ্বিগ্ন মুখে শুনে যাচ্ছিলেন বিমল। রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যার, আপনি কি ঝিল্লি সম্পর্কে খারাপ কিছু জেনেছেন?'

'জেনেছি। মা-বাবা হিসেবে তোমাদেরও তা জানা উচিত। অ্যান্ড আই থিংক ইউ নো ইট।'

'আমি ঠিক—'

শরদিন্দু বিমলকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ও সব এখন থাক। আমি তোকে একটা গাড়ির নম্বর দিচ্ছি। এটার মালিক কে, জেনে দিতে পারবি?'

'পারব স্যার। মোটর ভেহিক্যালসে আমার এক বন্ধু বড় অফিসার। তাকে গাড়ির নাম্বারটা দিলে জানিয়ে দেবে। রেকর্ড দেখে বার করতে হয়তো দু'তিন দিন সময় লাগবে।' বলে একটু থেমে বিমল জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই গাড়িটার মালিকের নাম জেনে কী হবে স্যার?'

'নিশ্চয়ই কোনো দরকার আছে।'

বিমল আর কোনো প্রশ্ন করলেন না।

চার

মাঝখানে দুটো দিন মোটামুটি কেটে গেল।

এর মধ্যে চাঞ্চল্যকর কিছু ঘটেনি। তবে একটা অদ্ভুত ধরনের আধপাগলা বৃদ্ধ যে এ পাড়ায় এসেছেন, সেটা এখানকার ছেলে ছোকরারা মোটামুটি জেনে গেছে।

দৈনন্দিন রুটিন অনুযায়ী রোজ ভোরে প্রাতঃভ্রমণে ঝিলের ধারে বেড়াতে যান শরদিন্দু। ফিরে এসে প্রথমে বিমলদের সঙ্গে চা খাওয়ার এক ঘন্টা পর ব্রেকফাস্ট সেরে এগারটা পর্যন্ত খবরের কাগজ পড়েন। তারপর স্নান এবং দুপুরের খাওয়া চুকিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম। বিকেলে তিনি আবার বেড়াতে বেরোন। তবে ঝিলের দিকে নয়, সামনের বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকেন। ঘন্টা দেড়েক হাঁটাহাঁটি করে ফিরতে ফিরতে সন্ধে। বেড়াতে বেরিয়ে রাস্তার মোড়ে কিংবা সস্তা চায়ের দোকানের সামনে ছোকরাদের জটলা দেখলে মাথা গরম হয়ে যায় শরদিন্দুর। তাঁর ভেতর থেকে কড়া, একগুঁয়ে হেডমাস্টারটি বেরিয়ে আসে। তিনি তাদের কাছে গিয়ে ধমকের সুরে বলেন, 'যখনই বেরুই দেখি আড্ডা দিচ্ছ। কোনো কাজকর্ম নেই তোমাদের?'

ছোকরারা প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। তেরছা চোখে তাকিয়ে একজন জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কে গুরু?'

আর একটা ছোকরা বলে, 'মালটা নিউ। ক'দিন এ পাড়ায় দেখছি।'

ওদের কথা বলার ধরনে ভেতরে ভেতরে খেপে যান শরদিন্দু। চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। বলেন, 'আমি একজন রিটায়ার্ড হেডমাস্টার। তোমাদের জেঠার কি ঠাকুরদার বয়সী হব। বয়স্ক লোকেদের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় জানো না?'

একটি ছোকরা রুখে উঠে, 'হেডমাস্টারি অন্য জায়গায় ফলান গিয়ে দাদু। এখান থেকে হড়কে যান।'

অন্য একটা ছোকরা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, 'এই ফুটপাথটা আপনার স্কুলের ক্লাস নয় দাদু।'

অন্য একজন বলে, 'জননী সরস্বতীর সঙ্গে আমাদের রিলেশান অনেক আগেই ফিনিশ হয়ে গেছে।' বলে হাওয়ায় দা বা ছুরি চালানোর ভঙ্গি করে বলতে থাকে, 'বিলকুল কাট—'

এদের ভেতর একটি যুবক বেশ ভদ্র গোছের। সে সঙ্গীদের ধমকে ধামকে থামিয়ে দিয়ে শরদিন্দুকে বলে, 'স্যার, ওদের কথায় কিছু মনে করবেন না। চাকরি ফাকরি নেই, নো ইনকাম, মেজাজ সব সময় খিঁচড়ে থাকে। বাড়িতে থাকলে মা-বাবার খিচির মিচির। রাস্তায় এসে আড্ডা না মেরে কী করব?'

অন্য একটি ছেলে বলে, 'ফুটপাথ ছাড়া আমাদের জন্যে আর কোনো স্পেস নেই স্যার। যেখানেই যাই সেখান থেকে ফুটিয়ে দেয়।'

'চাকরির চেষ্টা কর না কেন?'

'আমাদের কি মিনিস্টার মামা কি ভগ্নীপতি আছে যে চাকরি হয়ে যাবে? এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে চার পাঁচ বছরে একটা ইন্টারভিউ পর্যন্ত পাই নি। ঘুরে ঘুরে পায়ের তলা ক্ষইয়ে ফেলেছি। বাবার হোটেল যেদিন বন্ধ হয়ে যাবে সেদিন হয় গলায় দড়ি দিয়ে সিলিং থেকে ঝুলে পড়তে হবে। নইলে বন্দুক ফন্দুক জোগাড় করে ব্যাঙ্ক লুট করতে বেরুব। অবশ্য—

'অবশ্য কী?'

'যদি লোকের হাতে ধরা পড়ে যাই, গণপিটুনিতে স্রেফ খতম হয়ে যাব।'

ছেলেগুলোর প্রতি হঠাৎ অপার সহানুভূতি বোধ করেছেন শরদিন্দু। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে জানতে পারেন, ওরা কেউ একেবারে আকাট অশিক্ষিত নয়। কেউ মাধ্যমিক, কেউ হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছে। যে যুবকটিকে ভদ্র মনে হয়েছে সে বি.এ.'তে ডিস্টিংশান পেয়েছে। সবাই লোয়ার মিডল ক্লাস ফ্যামিলির ছেলে। অভাব, হতাশা, ফ্রাসট্রেশন এবং সামনে অনন্ত অন্ধকার— এছাড়া ওদের জীবনে আর কিছুই নেই।

শরদিন্দু বলেছেন, 'সবাইকে দেওয়া যায়, এত চাকরি আমাদের দেশে নেই। আর চাকরিই বা করতে হবে কেন? নন-বেঙ্গলিদের দেখ — ক'টা ছেলে চাকরি করে?'

যুবকটির নাম সমীর। সে বলেছে, 'স্যার, নন-বেঙ্গলিদের সঙ্গে আমাদের তুলনা! মারোয়াড়ি বলুন, পাঞ্জাবি বলুন বা সিন্ধিই বলুন, ওরা নিজেদের কমিউনিটির লোককে দেখে। নানাভাবে সাহায্য করে। আর আমরা? কোনো বাঙালি অন্য বাঙালিকে হেল্প করে শুনেছেন কখনও? একদল আছে, হাই-ব্রাও। আপনার দিকে ফিরেও তাকাবে না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সেল্ফসেন্ট্রিক। আর একদল রয়েছে, কিভাবে অন্যদের ল্যাং মেরে প্যাঁচ কষে ফেলে দেবে, সারাক্ষণ এই চিন্তাই তাদের মাথায় চক্কর দিচ্ছে।'

কথাগুলো শতকরা একশ ভাগ খাঁটি। আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন শরদিন্দু, 'ঠিকই বলছ। তবু কিছু একটা করতে তো হবে।'

'করব যে, ক্যাপিটাল পাব কোথায়? কে দেবে?'

'বিরাট করে শুরু করতে হবে তার কোনো মানে নেই। ছোট আকারেও তো আরম্ভটা করতে পার।'

'স্যার, আমি ভেবেছিলাম, বাড়ি বাড়ি চা সাপ্লাই করব। কিন্তু তার জন্যেও মিনিমাম শ'পাঁচেক টাকা দরকার। সেটাই আমার নেই।'

দেখা গেল, শুধু সমীরই নয়, তার সঙ্গীদেরও কেউ কেউ চারপাশের নতুন নতুন ফ্ল্যাট বাড়িতে নানা জিনিস সাপ্লাই করতে চায়। যেমন মশলাপাতি, ধূপকাঠি ইত্যাদি। কিন্তু তাদেরও ক্যাপিট্যাল নেই।

একটা ছোকরা বলেছে, 'নেতা ফেতাদের মুখে আপনার মতো ব্যবসা করার লেকচার আমরা অনেক শুনেছি। শুকনো জ্ঞান না ঝেড়ে, পাঁচ শ করে টাকা ছাড়তে পারবেন?'

পাটনা থেকে বেরুবার সময় ব্যাঙ্ক থেকে আট হাজার টাকা তুলে নিয়ে এসেছিলেন শরদিন্দু। গাড়ি ভাড়া এবং অন্যান্য কারণে শ চারেক টাকার মতো খরচ হয়ে গেছে। বাকিটা স্যুটকেসে রয়েই গেছে।

শরদিন্দু গুনে গুনে দেখেছেন, ছ'টি যুবক ব্যবসায় নামতে চায়। মাথা পিছু পাঁচশ করে মোট তিন হাজার টাকা দিতে হবে। তিনি বলেছেন, 'তোমরা একটু দাঁড়াও। আমি দশ মিনিটের ভেতর ফিরে আসছি।'

বিমলদের বাড়ি গিয়ে টাকাটা এনে ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন শরদিন্দু।

ছেলেরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকেছে। এমন অদ্ভুত বৃদ্ধ আগে তারা কখনও দেখেনি।

একসময় সমীর বলেছে, 'স্যার, আপনি আমাদের চেনেন না, আগে কখনও দেখেননি, তবু এতগুলো টাকা দিয়ে দিলেন।'

শরদিন্দু হেসে বলেছেন, 'হ্যাঁ, দিলাম।'

'ধরুন, আমরা কিছুই করলাম না। টাকাটা অন্যভাবে খরচা করে উড়িয়ে দিলাম?'

'তা তোমরা করবে না।'

সমীর চুপ করে রইল।

শরদিন্দু বলেছেন, 'মানুষকে আমি বিশ্বাস করি। আশা করি, তোমরা তার মর্যাদা রাখবে। দু-চারদিনের মধ্যে কাজ শুরু করে দাও। মনে রেখ, সততা আর পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই।'

সমীররা উত্তর না দিয়ে শরদিন্দুর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছে। আর এই খবরটা সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে।

এদিকে অনেক চেষ্টা করেও বিমলদের অভ্যাসটা পালটাতে পারেননি শরদিন্দু। রোজ ভোরে প্রাতঃভ্রমণের জন্য তিনি বিমল এবং বনানীর ঘরের দরজায় টোকা দেন। দু'জনেই ঘুমকাতুরে। কাঁচুমাচু মুখে ওঁরা বলেন, শীতের ভোরে ঝিলের ধারে বেড়াতে যাওয়া ছাড়া শরদিন্দু আর যা বলবেন, তাই করবেন। ঝিল্লির দরজায় টোকা দিয়ে লাভ নেই, সে সাড়াই দেয় না।

শরদিন্দু মনে মনে স্থিরই করেছেন, কয়েক দিন তো বিমলদের কাছে থাকছেনই। রোজই ভোরে ওদের দরজায় টোকা দেবেন। এইভাবে একদিন না একদিন তিনজনকে প্রাতঃভ্রমণের জন্য বাড়ি থেকে বার করতে পারবেন। রোজ ডাকাডাকি করলে ক'দিন আর পুরনো, শ্রদ্ধেয় মাস্টার মশাইকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন তাঁরা?

তিন দিন কেটে গেল। এর মধ্যে বিমলদের বাড়িতেও তেমন কিছু ঘটেনি। যথারীতি ন'টায় বিমল অফিসে বেরিয়ে গেছেন, ফিরেছেন সাতটায়। ঝিল্লি এগারটায় ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে সাড়ে পাঁচটা ছ'টার ভেতর ফিরে এসেছে। আর বনানী বাড়ি থেকে বেরোনই নি। বিমলদের এর ভেতর আর কোনো পার্টি ছিল না।

মোটামুটি মসৃণভাবে সোম আর মঙ্গলবার কেটে গেলেও একটা খবর বেশ একটু বিচলিত করেছে শরদিন্দুকে।

মঙ্গলবার অফিস থেকে ফিরে বিমল বলেছেন, 'স্যার, আপনি যে টাটা সুমোটার নাম্বার দিয়েছিলেন তার মালিকের নাম মোটর ভেহিক্যালস থেকে জানতে পেরেছি।'

শরদিন্দু লক্ষ করেছেন, বিমল কথা বলছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁকে কেমন যেন চিন্তিত দেখাচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, 'লোকটা কে?'

'খুব পাওয়ারফুল পারসন।'

'তুই নিশ্চয়ই ফেমাস পলিটিক্যাল লিডার মণিময় দত্তরায়ের কথা বলছিস?'

'হ্যাঁ। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

বিমলের কপালে দুশ্চিন্তার রেখাগুলো এবার স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, 'আপনি জানলেন কী করে?'

শরদিন্দু নিজেও এর মধ্যে একদিন মোটর ভেইক্যালসে গিয়ে টাটা সুমোর মালিকের নামটা যে জেনে এসেছেন সেটা আর জানালেন না। বললেন, 'জেনেছি কোনোভাবে।'

কী ভেবে বিমল বলেছেন, 'কোনো কারণ ছাড়া আপনি টাটা সুমোর মালিকের কথা বলতেন না। ব্যাপারটা আমাকে—' বলতে বলতে থেমে গেছেন।

শরদিন্দু বলেছেন, 'কারণটা বোধ হয় তুই জানতে চাস?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা এখন তোকে বলতে পারছি না। সময়মতো ঠিক জানতে পারবি।'

বিমল আবার প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে শরদিন্দু বলেছেন, 'এ বিষয়ে এখন আর কোনো কথা নয়।'

পাঁচ

শেষ পর্যন্ত সেই দিনটা এসে গেল।

আজ বিকেলে কেয়াতলা অ্যাভেনিউতে অনীশ নামে কোনো যুবকের ফাঁকা বাড়িতে ঝিল্লির যাবার কথা।

ভোরবেলায় প্রচণ্ড মানসিক চাপ নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরুলেন শরদিন্দু। এই ক'দিনেই এলাকার অনেকের সঙ্গেই তাঁর আলাপ হয়ে গেছে। সরস্বতীর বানান এবং বেকার ছেলেদের টাকা দেবার কথাটা জানাজানি হবার পর এই অদ্ভুত বৃদ্ধটি সম্পর্কে সকলেরই দারুণ আগ্রহ।

ঝিলের ধারে পাক খেতে খেতে অনেকেই যেচে শরদিন্দুর সঙ্গে আলাপ করে নিয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ শরদিন্দুকে নানা প্রশ্ন করছিলেন। তাঁর দেশ কোথায়, কী করতেন, বাড়িতে কে কে আছে, ইত্যাদি। তিনি সংক্ষেপে অন্যমনস্কর মতো উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন।

বেড়িয়ে ফেরার পর যথারীতি দেখা গেল ডাইনিং রুমে বিমলরা অপেক্ষা করছেন। শরদিন্দু কখন ফিরবেন সেটা এ বাড়ির সবার জানা হয়ে গেছে। ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বাজামাত্র তিনি ডাইনিং রুমের দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢোকেন। সময়ের এতটুকু হেরফের হয় না।

চা খেতে খেতে বার বার শরদিন্দুর চোখ ঝিল্লির দিকে চলে যাচ্ছিল। বিমলদের সঙ্গে এলোমেলো কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি ওকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি আজ ক্লাস আছে?'

ঝিল্লি সামান্য অবাক হয়, 'বা, আজ কি রবিবার না অন্য কোনো ছুটির দিন, যে ক্লাস থাকবে না?'

'উইকে দু'একদিন অফ-ডে থাকে না?'

'না। আমাদের রোজই ক্লাস।'

একটু চুপচাপ।

তারপর শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি রোজই ইউনিভার্সিটিতে যাও? মাঝে মধ্যে দু'একদিন কামাই কর না?'

ঝিল্লি অবাক হচ্ছিল। এমনিতে এই সৃষ্টিছাড়া বৃদ্ধটির সঙ্গে তার কথাবার্তা খুব কমই হয়। লোকটা জীবন সম্পর্কে আদ্যিকালের ধ্যানধারণা আঁকড়ে পড়ে আছে, আর সেসব চারপাশের সবার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। সেটা তার ভীষণ অপছন্দ।

ঝিল্লি জিজ্ঞেস করে, 'ফর নাথিং আমি ক্লাস কামাই করব কেন?'

'অসুখ বিসুখ করলে কি অন্য কোনো আর্জেন্ট কাজ থাকলে?'

'সেটা আলাদা ব্যাপার। তখন আর কী করে যাব?'

'ধর, আজ তোমার জ্বর হয়েছে। তাই বাড়িতেই থাকবে।'

হতবাক ঝিল্লি কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে। বিরক্ত মুখে বলে, 'আপনি কী বলছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

বিমলরাও কম অবাক হন নি। বিমল বললেন, 'স্যার, যদি রাগ না করেন একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

শরদিন্দু বললেন, 'হ্যাঁ, কর না—'

'স্যার, আমরা যখন স্কুলে পড়তাম, ক্লাস কামাই করলে আপনি—' বলতে বলতে চুপ করে গেলেন বিমল।

শরদিন্দু বললেন, 'আমি খুব রেগে যেতাম। পরদিন স্কুলে এসে বেতের বাড়ি খেতিস—এই তো?'

আস্তে মাথা নাড়লেন বিমল, 'হ্যাঁ।'

শরদিন্দু বললেন, 'সেই আমি একজন কড়া মাস্টার হয়ে কেন ঝিল্লিকে ইউনিভার্সিটিতে যেতে বারণ করছি—এটাই জানতে চাস তো? আজ ওর সঙ্গে সারাদিন আমার গল্প করার ইচ্ছে।' হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঝিল্লিকে বললেন, 'দিদিভাই, আমার ঘরে চল।'

কী ভেবে ঝিল্লি বলল, 'ঠিক আছে, চলুন।' সে মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছিল, নিছক গল্প করার জন্যই শরদিন্দু তাকে ইউনিভার্সিটিতে যেতে বারণ করছেন না। এই উদ্ভট ধরনের বৃদ্ধের আসল উদ্দেশ্য জানার তার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল।

বিমল ব্যস্তভাবে বললেন, 'স্যার, এখুনি ব্রেকফাস্ট দেবে—'

শরদিন্দু বললেন, 'পরে খাব।'

দোতলায় শরদিন্দুর সঙ্গে তাঁর ঘরে এসে ঝিল্লি বলল, 'সত্যিই আমার সঙ্গে গল্প করতে চান?'

হেসে হেসে শরদিন্দু বললেন, 'অত তাড়া কিসের দিদিভাই? বসো। আমি ধড়াচূড়াটা পালটে নিই।'

বাথরুম থেকে পোশাক বদলে কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে খাটে আরাম করে বসলেন শরদিন্দু। লক্ষ করলেন, ঝিল্লির চোখেমুখে কৌতূহল রয়েছে ঠিকই, সেই সঙ্গে রাজ্যের অসন্তোষ। মেয়েটা যে প্রথম দিন থেকেই তাঁকে পছন্দ করছে না, সেটা তিনি ভালই জানেন। বললেন, 'তোমাদের বাড়িতে ক'দিন হল এসেছি। অথচ সব মিলিয়ে দশ মিনিটও তোমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাইনি। আমার প্রতি তুমি এত নির্দয় কেন?'

ঝিল্লি উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

ছায়া দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। জানায়, নিচে ডাইনিং টেবলে ব্রেকফাস্ট দেওয়া হয়েছে।

শরদিন্দু বললেন, 'আমাদের খাবারটা একটু কষ্ট করে এখানে দিয়ে যাও।'

ছায়া খাবার নিয়ে এল।

কিছুক্ষণ পর নিঃশব্দে খেতে খেতে আড়চোখে ঝিল্লিকে দেখছিলেন শরদিন্দু। হঠাৎ বললেন, 'তুমি ঠিকই অনুমান করেছ দিদিভাই। আমি শুধু গল্প করার জন্যে তোমাকে আটকাই নি।'

মুখ তুলে স্থির চোখে শরদিন্দুর দিকে তাকাল ঝিল্লি।

শরদিন্দু বললেন, 'হঠাৎ একটা কথা আমার কানে এসেছে।'

ঝিল্লি জিজ্ঞেস করল, 'কী কথা?'

শরদিন্দু বললেন, 'তোমার শুনতে ভাল লাগবে না, তবু শোনা দরকার। বলি?'

ভেতরে ভেতরে একটু থমকে গেল ঝিল্লি, তারপর বলল, 'বলার জন্যেই ডেকে এনেছেন। আমি শোনার জন্যে প্রস্তুত।'

শরদিন্দু বলতে লাগলেন, 'আজ বিকেলে তোমার একটা জায়গায় যাবার কথা আছে। খুব সম্ভব ক্লাস ছুটির পর সেখানে যাবে বলে ঠিক করে রেখেছ। তাই তো?'

ঝিল্লি এবারও উত্তর দিল না।

শরদিন্দু থামেননি, 'আমি চাই না তুমি ওখানে যাও। তাই আটকে রাখতে চাইছি।'

ঝিল্লির মুখ শক্ত হয়ে উঠল, 'আমি কোথায় যেতে চাইছি, আপনি জানেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'কোথায়?'

শরদিন্দু হাসলেন, 'তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করতে চাইছ?'

ঝিল্লি রুক্ষ স্বরে বলল, 'ধরুন তা-ই।'

'ঠিক আছে। অ্যাড্রেসটা হল টুয়েলভ বাই সেভেনটিন কেয়াতলা অ্যাভেনিউ। ওটা অনীশদের বাড়ি। অ্যাম আই রাইট?'

ঝিল্লি হকচকিয়ে গেল। বলল, 'আপনি জানলেন কী করে?'

শরদিন্দু বললেন, 'যেভাবে হোক জানতে পেরেছি। সেটা আমি বলব না। তুমি তো এই ক'দিনে জেনে গেছ, অন্যের ব্যাপারে আমার নাক গলানোর স্বভাব আছে। তোমার সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর নিতে গিয়ে ঠিকানাটা পেয়ে গেলাম।'

ঝিল্লি দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি আমার ওপর স্পায়িং করছেন?'

শরদিন্দু নিরুত্তেজ, শান্ত মুখে বললেন, 'তুমি যদি স্পায়িং মনে কর, তা হলে তা-ই।'

ঝিল্লি চুপ। তার চোখে পলক পড়ছে না।

শরদিন্দু বললেন, 'ঝিল্লি, তুমি যাদের সঙ্গে মেশো তারা এক একটা স্কাউড্রেল।'

ঝিল্লি নিরুত্তর।

শরদিন্দু বলতে লাগলেন, 'আমার ধারণা, ওদের সঙ্গে মিশে তুমি ড্রাগ অ্যাডিক্ট হতে শুরু করেছ।'

ঝিল্লির চোখেমুখে ভয়ের ছাপ ফুটে ওঠে। পুরু লেন্সের চশমার ওধারে শরদিন্দুর দুটো জ্বলজ্বলে চোখের দিকে সে তাকিয়ে থাকতে পারছিল না। মুখ নামিয়ে নিল।

শরদিন্দু এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কাদের সঙ্গে মেশো, বিমল আর বনানী কি তা জানে?'

জোরে শ্বাস টানস ঝিল্লি। বুঝেতে পারছে, এই বৃদ্ধিটিকে এড়িয়ে যাওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। লোকটা তাকে ঠেলতে ঠেলতে যেন একটা খাদের দিকে নিয়ে চলেছে। মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে ঝিল্লি বলল, 'মনে হয় আন্দাজ করতে পারে।'

'আই সি! তোমাকে বাধা দেয় না?'

'বারণ করে। তবে আপনার মতো এভাবে নয়।'

'মানে?'

ঝিল্লি জবাব দেয় না।

শরদিন্দু ধমকে ওঠেন, 'কেন বাধা দেয় না?'

ঝিল্লি মুখ তোলে, 'বোধহয় চাকরির ভয়ে।'

'কী বলছ তুমি!'

ঝিল্লি এবার যা উত্তর দেয় তা এরকম। যে মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে বিমল চাকরি করেন সেটার একজিকিউটিভ ডিরেক্টর হলেন জননেতা মণিময় দত্তরায়ের ভাই স্বপ্নময় দত্তরায়। মণিময়ই রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ছোট ভাইকে ওইরকম একটা জায়গায় বসিয়েছেন। মণিময় মানুষ হিসেবে ভাল নন। তাঁর পার্টির নানা দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন স্কোয়াডটাও তাঁকে দেখতে হয়। এই স্কোয়াডে আছে মার্কামারা ক্রিমিনালরা—সোজা বাংলায় সমাজবিরোধীর দল। এদের দিয়ে মণিময় বোমাবাজি, বন্দুকবাজি, নির্বাচনের সময় বুথ জ্যাম করা, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর হামলা, খুনজখম—এ সব করে থাকেন। আজকালকার বেশির ভাগ রাজনৈতিক নেতাই ক্ষমতাদখল বা ক্ষমতা হাতে রাখার জন্য এসব করে থাকে। কিন্তু মণিময়ের নাম এদের তালিকায় অনেক উঁচুতে রয়েছে। রাজনীতি সম্পর্কে সামান্য খবরও যারা রাখে তারা এই কুখ্যাত নেতাকে ভাল করেই চেনে।

বিমল একসময় ছিলেন মাঝারি ধরনের একটা ভারতীয় ফার্মে। মণিময়কে নানাভাবে ধরে, প্রচুর তোষামুদি করে মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির চাকরিটা জোগাড় করেছেন। দু'একবার ঝিল্লিকে সঙ্গে করে তাঁদের বাড়িও গেছেন। সেখানে ঝিল্লির সঙ্গে সুজয়ের আলাপ হয়েছে। সুজয় মণিময়ের একমাত্র ছেলে।

শরদিন্দু কথার মাঝখানে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এই ছোকরাটাই সেদিন রাতে তোমাকে বড় রাস্তায় গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল না?'

ঝিল্লি চকিত হয়ে ওঠে, 'আপনি দেখেছেন!'

শরদিন্দু বলেন, 'ও সব কথা পরে হবে। যা বলছিলে বল—'

ঝিল্লি সন্দিগ্ধভাবে শরদিন্দুকে লক্ষ করতে করতে ফের শুরু করে। প্রথম দিন তাকে নিজেদের বাড়িতে দেখেই ভাল লেগে যায় সুজয়ের। বেশ কিছুক্ষণ সেদিন সে তার সঙ্গে গল্প করেছিল। ঝিল্লিরও তাকে ভাল লেগেছে। ঝকঝকে, স্মার্ট, কথাবার্তায় রীতিমত চৌকস সুজয়।

সেই যে আলাপ হয়েছিল, তারপর মাঝে মাঝেই ঝিল্লিদের বাড়ি আসতে লাগল সুজয়। যার বাবার অনুগ্রহে এতবড় চাকরিটা পেয়েছে তার ছেলে বাড়িতে আসছে, বিমল একেবারে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া ওর কাকা স্বপ্নময় দত্তরায় তাঁদের কোম্পানির দণ্ডমুণ্ডের একজন কর্তা, সেই কারণে সুজয়ের খাতিরযত্নটা ঝিল্লিদের বাড়িতে অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

ছাত্র হিসেবে সুজয় বেশ ভালই। কেমিস্ট্রি অনার্সে সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ড হয়েছিল। কিন্তু এম. এসসি'তে একটা বছর ক্লাস করেই লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলে। ক্রমে জানা গেল, সে ড্রাগের নেশা ধরেছে। পয়সাওলা ঘরের বাঙালি-অবাঙালি অনেকগুলো ড্রাগ-অ্যাডিক্ট ছেলে এবং মেয়ে বন্ধু তার। এদের সঙ্গে ঝিল্লি এমনভাবে জড়িয়ে পড়ল, বলা ভাল তাকে জড়ানো হল যে আর বেরিয়ে আসার রাস্তা নেই। প্রায়ই ইউনিভার্সিটি থেকে তাকে তুলে নিয়ে যায় সুজয়রা। কখনও বাড়িতে ফোন করে নির্দিষ্ট জায়গায় চলে যেতে বলে। বেশ কিছুক্ষণ হুল্লোড়বাজির পর ড্রাগ নিয়ে ঢুলু ঢুলু চোখে, টলমলে পায়ে যে যার বাড়ি ফেরে। অবশ্য সুজয় নিজে ঝিল্লিকে তাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায়।

বিমল এবং বনানী, বিশেষ করে বিমল সব জেনে বুঝেও একরকম মুখ বুজে থাকে। এতবড় জবরদস্ত নেতার ছেলে, তার ওপর তার বাবার করুণায় বিশাল চাকরিটা হয়েছে—বিমল সুজয়দের কবজা

থেকে মেয়েকে বার করে আনে কী করে?

মাথার ভেতর আগুন ধরে গিয়েছিল শরদিন্দুর। চিৎকার করে বললেন, 'বিমলটা এমন রাসকেল, আমার ধারণা ছিল না! মেয়ের সর্বনাশ হচ্ছে জেনেও বাধা দিচ্ছে না? আমি হলে জুতিয়ে ওই সুজয়ের ছাল তুলে নিতাম।'

ঝিল্লি হাসে, 'বাবা কত স্যালারি পায় জানেন? থার্টি টু থাউজেন্ড, তাছাড়া গাড়ি, আর প্রচুর পার্কস। মেডিকেল এক্সপেন্সেস, ইলেকট্রিসিটি আর টেলিফোন বিল, আমার পড়ার খরচ, দু'বছর পর পর বিদেশ ভ্রমণের খরচ—সমস্ত কোম্পানির। বাধা দেবে কী করে?'

'চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারে না বিমল? কী এত টাকার দরকার?'

'আমার জন্যে চাকরি ছাড়বে!' হঠাৎ জোরে জোরে শব্দ করে হেসে ওঠে ঝিল্লি।

শরদিন্দু অবাক হয়ে বলেন, 'হাসছ কেন?'

হাসতে হাসতেই ঝিল্লি বলে, 'স্যার, আপনাদের দিন আর নেই। লাইফের কনসেপ্টটাই পুরোপুরি পালটে গেছে। এখন মানি ইজ এভরিথিং। টাকাই সব। ছেলেমেয়ে ফ্যামিলি, কোনো কিছুরই তেমন ইমপর্টান্স নেই। টাকাই একমাত্র গোল।'

খানিকক্ষণ নীরবতা।

তারপর শরদিন্দু বলেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। ঠিক ঠিক উত্তর দাও।'

ঝিল্লি বলল, 'আপনার প্রশ্নটা কী?'

'তুমি যেভাবে চলছ, কোনো বাঙালি মেয়ের জীবন এরকম হতে পারে না।'

'নতুন মিলেনিয়াম এসে গেল। সেদিনই আপনাকে বলেছি, বাঙালি মেয়েদের সম্বন্ধে মান্ধাতার আমলের ধ্যানধারণাগুলো মাথায় নিয়ে এখনও পড়ে আছেন। আমরা আর সেকালের মতো নেই। বাড়ির চার দেওয়ালের ভেতর এখন আর মেয়েরা আটকে থাকে না। তাদের এক্সপোজার আজকাল অনেক বেশি।'

'একটা কথা স্পষ্ট করে বল তো—'

'কী?'

'যা তুমি করে বেড়াচ্ছ সেই উচ্ছৃঙ্খল জীবন সত্যিই কি তোমার ভাল লাগে?'

কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল ঝিল্লি। জানালার বাইরে উঁচুনিচু স্কাইলাইনের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'নট ব্যাড। এটাও তো এক রকমের লাইফই।'

ঝিল্লি বলল বটে কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে তেমন যেন জোর নেই।

সুজয় যে তাকে একটা অস্বাভাবিক পৃথিবীতে টেনে নিয়ে গেছে, অথচ বিমলের দিক থেকে কোনোরকম বাধা নেই—সে কারণে ঝিল্লির মনে কি সূক্ষ্ম কোনো অভিমান আছে? বাবার দায়িত্ব সেভাবে পালন করছে না, যে জন্য কোনো বিরূপতা? কিন্তু ঝিল্লি এই সময়ের মেয়ে। দ্বিধাহীন, স্পষ্ট ভাষায় নিজের মতামত সে জানাতে পারে। খারাপ লাগলে তো সহজেই সুজয়দের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসতে পারত। নাকি সে বন্দুকবাজ ক্রিমিনালদের নিয়ে যাঁর ওঠাবসা সেই জননেতার ছেলের কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সাহস পাচ্ছে না?

শরদিন্দু বললেন, 'আপাতত আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।' একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আমি যখন এসেই পড়েছি, তোমাকে নর্মাল লাইফে ফিরিয়ে আনবই।'

ঝিল্লি বলল, 'দেখুন চেষ্টা করে।'

শরদিন্দু ঝিল্লির দিকে সামান্য ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি আমাকে চ্যালেঞ্জ নিতে বলছ?'

ঝিল্লি বলল, 'ধরুন তা-ই।'

শরদিন্দু কিছু বললেন না।

ঝিল্লি একটু ভেবে এবার বলল, 'আমাকে তো আজ সারাদিন আটকে রাখতে চাইছেন। আমি যদি বিকেলে কেয়াতলায় না যাই, ওরা ফোন করবে, এমন কি চলেও আসতে পারে। তখন কী হবে?'

শরদিন্দু বললেন, 'তার আগেই তুমি সুজয়কে ফোন করে জানিয়ে দাও তোমার শরীর খারাপ। আজ বাড়ি থেকে বেরুতে পারছ না।'

ঝিল্লি যেন কিছুটা মজাই পেয়ে যায়। বাবার প্রাক্তন, একবগ্‌গা মাস্টারটির দৌড় কতদূর সেটাই যেন সে দেখতে চায়। বলল, 'ঠিক আছে, ফোন করব। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'আজ না হয় অসুখের কথা বলে পার পেয়ে গেলাম। কিন্তু কাল পরশু তরশু—আই মিন দিনের পর দিন তো বাড়িতে বসে থাকতে পারব না। কতদিন ক্লাসে অ্যাবসেন্ট থাকব?'

এ দিকটা যে শরদিন্দু ভাবেন নি তা নয়। কিন্তু কিভাবে সমস্যার সমাধান হবে সেটা ভেবে বার করতে পারেন নি। বললেন, 'আজকের দিনটা তো কাটুক। তারপর দেখা যাক—'

এবার একটু মজার গলায় ঝিল্লি জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এখানে কত দিন থাকবেন, ভাবছেন?' প্রশ্নটা করেই পরক্ষণে তার মনে হল, বাবার শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন মাস্টারমশাইকে এভাবে বলা ঠিক হয় নি। ব্যস্তভাবে এবার সে বলল, 'মানে, আপনি তো পুরনো ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছেন। আমাদের এখানে কতদিন থাকা সম্ভব হবে?'

প্রশ্নটার উদ্দেশ্য কী, ঠিক বুঝতে পারছিলেন না শরদিন্দু। অনিশ্চিতভাবে বললেন, 'ধর, আরো পনের কুড়ি দিন।'

ঝিল্লি বলল, 'এর মধ্যে সুজয়দের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন?'

শরদিন্দু হেসে হেসে বললেন, 'একটা চেষ্টা অন্তত করে দেখি।'

কয়েক পলক শরদিন্দুর দিকে তাকিয়ে থেকে টেলিফোন তুলে নিয়ে ঝিল্লি ফোন করে তাঁর শেখানো কথাগুলো সুজয়কে জানিয়ে দিল। অর্থাৎ অসুস্থতার কারণে সে আজ বাড়ি থেকে বেরুতে পারছে না। ওধার থেকে সুজয় কী বলল তা অবশ্য জানতে পারলেন না শরদিন্দু। ফোনটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে ঝিল্লি বলল, 'আই থিংক ইউ আর হ্যাপি নাউ।'

শরদিন্দু বললেন, 'ইয়েস, ভেরি মাচ। এখন তুমি নিজের ঘরে যাও। আমি তোমার বাবার কাছে যাব।'

'আপনি কি বাবাকে আমার সম্বন্ধে কিছু বলবেন?'

'তাকে আমার কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে।'

ঝিল্লি চলে গেল। শরদিন্দুও উঠে পড়লেন।

বিমল আর বনানী ব্রেকফাস্ট করে দোতলায় উঠে এসেছিলেন। বিমলের অফিসে যাবার সময় হয়ে এসেছে। তিনি বাথরুমে ঢুকতে যাবেন, শরদিন্দু তাঁদের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। এ সময় বিমল তাঁকে আশা করেন নি। রীতিমত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যার, আপনি!'

শরদিন্দু বললেন, 'তোর এখন অফিসের তাড়া। অসময়ে এসে বোধ হয় ঝামেলায় ফেলে দিলাম।'

'না না, ঝামেলা কিসের? আপনি কি কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ। তোর সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আছে।'

দ্রুত ঘড়ি দেখে বিমল বললেন, 'সেটা রাত্তিরে বললে হয় না?'

শরদিন্দু বললেন, 'তা হলে এখন এলাম কেন? দশ মিনিটের বেশি সময় আমি নেব না।'

'ঠিক আছে। ভেতরে আসুন স্যার।'

ঘরে ঢুকে একটা গদি-মোড়া ইজিচেয়ারে বসলেন শরদিন্দু। বনানী একধারে দাঁড়িয়ে আছেন। শরদিন্দুকে দেখে তিনিও কম অবাক হন নি।

শরদিন্দু বিন্দুমাত্র ধানাই পানাই না করে সোজা কাজের কথায় চলে এলেন, 'ক'টা দিন আনন্দে কাটিয়ে যাব বলে তোদের কাছে এসেছিলাম। কিন্তু মনে হচ্ছে, না এলেই ভাল হত।'

হতবুদ্ধি বিমল বলেন, 'কেন স্যার, আমাদের ব্যবহারে আপনি কি কষ্ট পেয়েছেন? সজ্ঞানে তো—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে শরদিন্দু বললেন, 'একেবারেই না। বরং যা আদর-যত্ন করছিস তা আশাতীত। এ আমি ভাবতেই পারিনি।'

'তা হলে?'

প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে শরদিন্দু বিমলের চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিটায় কতদিন কাজ করছিস?'

হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে আসায় হকচকিয়ে গেলেন বিমল। বললেন, 'বছর পাঁচেক। কেন স্যার?'

'বাড়ি করেছিস। মনে হয়, ব্যাঙ্কেও মোটা টাকা জমেছে। ফিক্সড ডিপোজিট, ইউনিট ট্রাস্ট, এন. এস. সি,তেও আশা করি যথেষ্ট টাকা রয়েছে।'

'হ্যাঁ। মানে ভবিষ্যতের জন্যে কিছু কিছু সেভিংস তো করতেই হয়।'

'একশ বার। যা টাকা জমিয়েছিস, এই চাকরিটা যদি তোর না থাকে, আমার ধারণা তাতে বিশেষ ক্ষতি হবে না। ডিভিডেন্ট, ইন্টারেস্ট থেকে যা পাবি তার সঙ্গে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা মিলিয়ে বেশ ভালভাবেই কেটে যাবে—কি বলিস?'

অস্পষ্টভাবে বিমলের মনে হল, শরদিন্দু যেন ধাক্কা দিতে দিতে তাঁকে একটা বিপজ্জনক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন। আঁতকে ওঠার মতো করে বললেন, 'আপনি কি আমাকে চাকরিটা ছেড়ে দেবার কথা বলছেন স্যার?'

খুব জোর দিয়ে শরদিন্দু বললেন, 'এগ্‌জাক্টলি তাই—'

মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল বিমলের। বললেন, 'কিন্তু স্যার—'

'কী?'

বিমল জানালেন, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিটার চাকরিটা পাওয়ার পর তাঁর সামাজিক মর্যাদা, আর্থিক অবস্থা, প্রতিপত্তি, স্টেটাস অনেক বেড়ে গেছে। এটা দুম করে ছেড়ে দিলে সব দিক থেকে ধস নামবে।

শরদিন্দু একদৃষ্টে তাকিয়ে খুব মন দিয়ে শুনছিলেন। বললেন, 'স্টেটাস ফেটাসের চেয়ে ঝিল্লির ফিউচার কিন্তু বেশি ইমপর্টান্ট। এই কথাটা বোধহয় আরো একবার বলেছিলাম।'

বিমল উত্তর দিলেন না।

শরদিন্দু বলতে লাগলেন, 'আমি যে ক'দিন আছি ঝিল্লিকে বাঁচাবার চেষ্টা করব। তুই ওর বাবা, তোর দায়িত্ব কিন্তু আমার চেয়েও অনেক বেশি, এটা মনে রাখিস।'

মুখ নিচু করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন বিমল।

শরদিন্দু এবার বললেন, 'চাকরিটা কেন ছাড়তে বলছি, সেটা কি তোর মাথায় ঢুকেছে?'

বিমল এবারও চুপ।

শরদিন্দু বললেন, 'মণিময় দস্তরায় তোর কাজটা করে দিয়েছেন বলে তাঁর প্রতি তোর একটা অবলিগেশন রয়েছে। সে জন্য ওঁর ছেলের ব্যাপারে কড়া হতে পারছিস না।'

বিমল ভয়ে ভয়ে বললেন, 'চাকরি ছেড়ে দিলেও সুজয়ের হাত থেকে কি রেহাই পাওয়া যাবে? ওরা এত পাওয়ারফুল, এত ইনফ্লুয়েন্সিয়াল—'

শরদিন্দু বললেন, 'মেরুদণ্ড বলে তোর কি কিছুই নেই? যে বাপ তার মেয়েকে রক্ষা করতে পারে না সে কেঁচোর মতো ইনভার্টিব্রেট।'

বিমলের মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করলেন তিনি, গলায় স্বর ফুটল না।

'ঠিক আছে, যা করার আমিই করব।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন শরদিন্দু।

ছয়

একটা দিন শরদিন্দু ঝিল্লিকে বাড়িতে আটকে রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু পরের দিন সে আবার ইউনিভার্সিটিতে গেল। কত দিন ঘরে থাকা সম্ভব? ক্লাস না করলে পিছিয়ে পড়তে হবে। তাতে রেজাল্ট ভাল হওয়া অসম্ভব।

আজ ছুটির পর বাইরে এসে ঝিল্লি দেখল, গেটের সামনে শরদিন্দু দাঁড়িয়ে আছেন। অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। তারপর বলল, 'আপনি এখানে!'

শরদিন্দু বললেন, 'তোমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি।'

'তার মানে আমি যাতে সুজয়দের পাল্লায় না পড়ি সে জন্যে গার্ড দিয়ে দিয়ে বাড়ি নিয়ে যাবেন—

এটাই বোধ হয় আপনার প্ল্যান?'

'রাইট।'

'দেখুন কতদিন পারেন।'

এইভাবে ক'দিন চলল।

তারপর সেই রবিবারটা এসে গেল।

কর্পোরেশনের স্থানীয় কাউন্সিলর নিশাপতি চাকলাদারকে শরদিন্দুর কথামতো আগেই চা খেতে নেমন্তন্ন করেছিলেন বিমল। আজ বিকেল পাঁচটায় তাঁর আসার কথা।

পাঁচটা বাজার মিনিট পনের আগে বাড়ির গেটের সামনে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালেন শরদিন্দু। বিমলও তাঁর সঙ্গে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন স্যার?'

শরদিন্দু বললেন, 'যতক্ষণ না উনি আসছেন। একজন মাননীয় কাউন্সিলরকে তো রাস্তা থেকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে হয়।'

অভ্যর্থনার কথা শরদিন্দু বললেন বটে, তবু বিমলের মনে একটা খটকা দেখা দিয়েছে। প্রাক্তন মাস্টারমশাইটিকে তিনি ভাল করেই জানেন। তাঁর অন্য কোনো গুরুতর উদ্দেশ্যে যে নেই, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। রীতিমত উৎকণ্ঠা নিয়ে তিনি শরদিন্দুর পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শরদিন্দুর সঙ্গে এ পাড়ার অনেকের সঙ্গেই এর মধ্যে আলাপ-পরিচয় হয়েছে। একজন দু'জন করে তাঁদের কাছে লোক জমতে লাগল। সবাই জানতে চায়, কেন তিনি এবং বিমল রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন।

শরদিন্দু নিশাপতি চাকলাদারের কথা বললেন।

বিমল সরকার এ পাড়ায় কারো সঙ্গে মেলামেশা করেন না। অন্য সবার থেকে তিনি যে আলাদা সেটা বোঝাবার জন্য বেশ একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলেন। সেই মানুষটি হঠাৎ কাউন্সিলরকে নেমন্তন্ন করে চা খাওয়াবেন, এটা খুবই অভাবনীয়। জমায়েতটা উৎসুকভাবে অপেক্ষা করতে লাগল। চারদিকে থোকায় থোকায় দাঁড়িয়ে চাপা, নিচু গলায় অনেকে এই ব্যাপারটা নিয়ে কথাও বলছে। সব মিলিয়ে গুঞ্জনের মতো শোনাচ্ছে।

ঠিক পাঁচটাতেই এলেন নিশাপতি। সঙ্গে আরো চার পাঁচজন। দেখামাত্রই টের পাওয়া যায় এরা নিশাপতির সর্বক্ষণের সঙ্গী এবং তোষামোদকারীর দল। এখনকার গোদা বাংলায় যাদের বলা হয় চামচা।

কালো, মোটা, গোলাকার মুখ, মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, বয়স বাহান্ন চুয়ান্ন, পরনে দামি প্যান্ট শার্ট—এই হলেন নিশাপতি চাকলাদার। এ অঞ্চলের বিশিষ্ট জনসেবক। ওঁরা পায়ে হেঁটেই এসেছেন।

নিশাপতি হাসিমুখে বিমলকে বললেন, 'চা খেতে ইনভাইট করলেন! কী ব্যাপার? বিশেষ কোনো অকেসান আছে নাকি?'

বিমল উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই শরদিন্দু বলে উঠলেন, 'আছে। আমিই বিমলকে বলেছিলাম আপনাকে ইনভাইট করতে।'

নিশাপতি একটু অবাক হয়ে বললেন, 'আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।'

বিমল এবার বললেন, 'উনি আমার মাস্টারমশাই শরদিন্দু চৌধুরি। ইস্টবেঙ্গলে থাকতে ওঁর কাছে পড়েছি। ক'দিন হল আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসেছেন।'

অনেকখানি ঝুঁকে খুব বিনীতভাবে নিশাপতি বললেন, 'নমস্কার স্যার। আপনার কথা আমি অনেকের মুখে শুনেছি! তা আমাকে হঠাৎ—'

'কেন ইনভাইট করলাম, এই তো? সেটা এক্ষুনি জানতে পারবেন।'

বিমল আর শরদিন্দু যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, তারপর গভীর ট্রেঞ্চের মতো টানা গর্ত। তার ওধারে রয়েছেন নিশাপতি, তাঁর সহচরেরা এবং পাড়ার লোকজন।

আচমকা শরদিন্দু নিশাপতির দুটো কাঁধ আঁকড়ে ধরে খাদের কিনারায় টেনে এনে বললেন, 'দিই এর ভেতরে ফেলে? দিই?'

নিশাপতি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, 'এর মানে কী? অ্যাঁ?'

শরদিন্দু সমানে নিশাপতিকে ঝাঁকিয়ে চলেছেন। আর বলছেন, 'দিই—দিই ফেলে?'

একজন বৃদ্ধের এমন অদ্ভুত আচরণ দেখে চারপাশের লোকজন একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তারা কী করবে, কী বলবে, বুঝে উঠতে পারছিল না।

ঝাঁকুনিটা থামিয়ে শরদিন্দু একসময় বললেন, 'আপনি ভাবছেন আমার মাথা খারাপ। যা খুশি ভাবুন, আমার কিছু যায় আসে না। এই যে খুঁড়ে খুঁড়ে মাসের পর মাস রাস্তাটাকে ক্ষতবিক্ষত করে রেখেছেন তার ফল কী হয়েছে জানেন? অন্ধকারে গর্তে পড়ে এ অঞ্চলের দশজনের হাত পা ভেঙেছে। ভবিষ্যতে আরো ভাঙবে।'

চারপাশের জনতা তাঁর কথায় সায় দিয়ে বলে ওঠে, 'আমাদের দুর্ভাগ্যের আর শেষ নেই। কর্পোরেশন অফিসে গিয়ে বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি।'

শরদিন্দু বললেন, 'কত লোকের অভিযোগ আপনাদের বিরুদ্ধে রয়েছে, একবার চিন্তা করে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ স্যার, আমাদের ত্রুটি হয়ে গেছে।' বিব্রতভাবে বললেন নিশাপতি।

'রাস্তাগুলো কবে রিপেয়ার করার ব্যবস্থা করছেন?'

'খুব শীগ্‌গিরই স্যার।'

'ওরকম ভাসা ভাসা ভাবে বললে চলবে না। কবে কাজ শুরু হবে তার এগ্‌জাক্ট ডেটটা দিন।'

একটু চিন্তা করে নিশাপতি বললেন, 'নেক্সট উইক থেকে নিশ্চয়ই।'

শরদিন্দু বললেন, 'প্রমিস করলেন কিন্তু।' চারদিকের জমায়েতটাকে দেখিয়ে বললেন, 'এঁরা সাক্ষী হয়ে রইলেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'কথার খেলাপ হবে না?'

'কক্ষনো না।'

ভিড়টার দিকে আঙুল বাড়িয়ে শরদিন্দু বললেন, 'আপনার প্রমিসের কথাটা এঁদের ভাল করে শুনিয়ে দেন। কারণ, আমি তো এখানে বেশিদিন থাকছি না। ফের কাউন্সিলর হতে হলে এঁদের ভোটটা কিন্তু আপনার পক্ষে ভীষণ জরুরি।'

শরদিন্দু যা বললেন তা-ই করলেন নিশাপতি। হাতজোড় করে জনতার উদ্দেশে বললেন, 'আপনাদের অনেক কষ্ট হয়েছে। সে জন্যে ক্ষমা চাইছি।'

শরদিন্দু এবার নিশাপতিকে বললেন, 'আমার ব্যবহারের জন্যে কিছু মনে করবেন না। আসুন, একসঙ্গে বসে চা খেতে খেতে গল্প করা যাক।'

সাত

সেই যে নিশাপতি চাকলাদাররা এসেছিলেন তারপর তিন চার দিন কেটে গেছে। ইউনিভার্সিটি থেকে আগের মতোই ছুটির পর ঝিল্লিকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে আসছেন শরদিন্দু। তাকে বোঝাচ্ছেন, জীবন খুবই মূল্যবান, কতগুলো বাজে ইতর ছেলের সঙ্গে মিশে, নেশা করে সেটা নষ্ট করার মানে হয় না।

ঝিল্লির ক্রমশ মনে হচ্ছে, শরদিন্দু চৌধুরি নামে এই মানুষটা অন্য সবার থেকে আলাদা। নিজের মা-বাবাও তাকে এভাবে কখনও বোঝান নি। প্রাক্তন ছাত্রের মেয়ে জাহান্নামে গেল কিনা, এ নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাত না। কিন্তু শরদিন্দু সত্যিই তার ভাল চান ; তাকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য নিঃস্বার্থভাবে চেষ্টা করে চলেছেন। মানুষটির প্রতি তার শ্রদ্ধা বাড়তে থাকে।

এদিকে সুজয় জেনে গিয়েছিল, শরদিন্দুর জন্য ঝিল্লিকে তারা তাদের নেশার আড্ডায় পাচ্ছে না। সে নিয়মিত ফোন করে তাঁকে শাসাতে থাকে। ঝিল্লিকে এভাবে আগলে রাখলে পরিণাম ভাল হবে না। শরদিন্দু তার হুমকি গ্রাহ্য করেন না। এসব তাঁর এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।

তবে দু দিন শরদিন্দু বলেছেন, 'তোমার মতো ছেলেকে কী করে টিট করতে হয়, আমি জানি।'
দাঁতে দাঁতে ঘষে সুজয় বলছে, 'ব্লাডি গুড়ডা তোমার এমন ব্যবস্থা করব, লাইফে ভুলবে না।'

আজ কিন্তু ব্যাপারটা শাসানির মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে ঝিল্লি যখন শরদিন্দুকে ফুটপাথে দাঁড় করিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য ট্যাক্সি খুঁজছে সেই সময় একটা নীল অ্যামবাসাডর হঠাৎ তার পাশে এসে দাঁড়ায়। দরজা খুলে সুজয় এবং আরো দু'তিনটি যুবক গাড়িতে তুলে নেবার জন্য ঝিল্লিকে টানাটানি করতে থাকে।

শরদিন্দু চিৎকার করে সেদিকে ছুটে যান এবং প্রাণপণে সুজয়দের বাধা দিতে থাকেন। চারদিকে এখন প্রচুর লোকজন ; ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা তো রয়েছেই। চেঁচামেচি শুনে সবাই দৌড়ে আসে। বেগতিক বুঝে সুজয়রা গাড়িতে উঠে পালিয়ে যায়।

এরপর ঝিল্লিকে সঙ্গে করে শরদিন্দু বাড়িতে ফিরে আসেন ঠিকই কিন্তু মারাত্মক দুশ্চিন্তা তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরতে থাকে। পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, রাজনৈতিক নেতার ওই ছেলেটা ঝিল্লিকে সহজে ছাড়বে না। তিনি তো চিরকাল এখানে থেকে মেয়েটাকে আগলে রাখতে পারবেন না। যাবার আগে ঝিল্লির নিরাপত্তার জন্য কিছু একটা তাঁকে করতেই হবে। ঝিল্লিকে ইউনিভার্সিটি থেকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে রোজ তিনি বেড়াতে বেরোন। আজ কিন্তু বেরুলেন না। নিজের ঘরে চোখের ওপর আড়াআড়ি দুটো হাত রেখে চুপচাপ বসে রইলেন। রাতে সামান্য একটু খেয়ে শুলেন বটে, কিন্তু ঘুম এল না।

পরদিন খুব সকালে একটা প্ল্যাকার্ডে বড় বড় হরফে শরদিন্দু লিখলেন : 'মণিময় দত্তরায়ের নিকট আবেদন। আপনার ড্রাগ-অ্যাডিক্ট ছেলের হাত থেকে নিষ্পাপ তরুণীদের রক্ষা করুন।' লেখার পর প্ল্যাকার্ড এবং একটা বড় তোয়ালে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এত ভোরে বিমলদের বাড়ির কারো ঘুম ভাঙে নি।

মণিময় দত্তরায়ের ঠিকানা কাল রাতে কথায় কথায় বিমলদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলেন শরদিন্দু। সোজা সেখানে এসে বাড়ির সামনের ফুটপাথে প্ল্যাকার্ডটা দাঁড় করিয়ে রেখে তোয়ালে পেতে বসে পড়লেন তিনি।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলী মানুষজন অদ্ভুত এক বৃদ্ধকে এভাবে বসে থাকতে দেখে রীতিমত অবাক হয়ে যায়। কিন্তু মণিময় দত্তরায়ের এমনই দাপট যে শরদিন্দুর কাছে যেতে তাদের সাহস হায় না।

দুপুরবেলা মণিময়ের বিরোধী রাজনৈতিক দলের দুটো লোক এসে শরদিন্দুর কানে কানে বলল, তারা তাঁকে মদত দিতে প্রস্তুত। তিনি রাজি হলে প্রচুর লোক এনে তাঁর পাশে বসিয়ে দেবে। মণিময়কে বিপাকে ফেলার এমন একটা সুবর্ণ সুযোগ তারা হাতছাড়া করতে চায় না। শরদিন্দু তাদের তক্ষুনি বিদায় করে দেন। বলেন, কোনো রাজনৈতিক কারণে এখানে তিনি ধরনায় বসেন নি। যা করার একাই করবেন। অন্যের সাহায্যের দরকার নেই।

সেদিনই বিকেলের দিকে মণিময় দত্তরায় লোক পাঠিয়ে শরদিন্দুকে বাড়ির ভেতর ডেকে পাঠালেন। বিশাল হল-ঘরে দলবল নিয়ে তিনি বসে ছিলেন। ষাটের কাছাকাছি বয়স। ছ'ফুটের মতো হাইট। পাতলা, মেদহীন চেহারা। পরনে পাজামা পাঞ্জাবির ওপর দামি শাল, চোখে পুরু লেন্সের চশমা। মণিময় শরদিন্দুকে বসিয়ে বললেন, 'আপনি তো বিমল সরকারের মাস্টারমশাই। দিন কয়েকের জন্যে পুরনো ছাত্রের বাড়ি বেড়াতে এসেছেন—'

শরদিন্দু বুঝতে পারলেন, এর মধ্যেই তাঁর সম্বন্ধে সব খবর জোগাড় করেছেন মণিময়। লক্ষ করলেন, লোকটার মুখ ভীষণ থমথমে, চোখের দৃষ্টি হিংস্র ধরনের।

শরদিন্দু বললেন, 'হ্যাঁ। আপনি জানেন দেখছি।'

'আমার বাড়ির সামনে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বসেছেন কেন?'

'সে তো আমার প্ল্যাকার্ডেই লেখা আছে। আশা করি, আপনার লোক আপনাকে তা জানিয়েছে।'

'আমার ছেলের সম্বন্ধে আপনার অভিযোগ আছে শুনলাম। ডিটেলে সব বলুন।'

শরদিন্দু বললেন।

সব শোনার পর মণিময় বললেন, 'আপনার কথা ভেবে দেখব। বৃদ্ধ মানুষ, সারাদিন বসে থেকে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে। এখন বাড়ি যান।'

শরদিন্দু উঠে দাঁড়ালেন, 'কিছু একটা স্টেপ আপনাকে নিতেই হবে। দু'চারদিন দেখব, তারপরও যদি সুজয় ঝিল্লিকে উত্যক্ত করে, ফের আমাকে ধরনায় বসতে হবে।'

চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে মণিময়ের। চাপা, তীব্র গলায় তিনি বলেন, 'কথাটা আমার মনে থাকবে।'

দিন তিনেক পর বিকেলে ঝিল্লিকে ইউনিভার্সিটি থেকে বাড়ি নিয়ে আসার পর বেড়াতে বেরুলেন শরদিন্দু। বড় রাস্তায় এসে ডান দিকে হাঁটতে হাঁটতে একসময় ঝপ করে সন্ধে নেমে গেল। আগেই কুয়াশা পড়তে শুরু করেছিল। রাস্তায় এবং দুধারের বাড়িতে আলো জ্বলে উঠেছে। শীতের হিমের জন্য সেগুলো তেমন উজ্জ্বল নয়।

অনেকটা হাঁটাহাঁটির পর শরদিন্দু যখন ফিরে আসছেন, আচমকা চার পাঁচটা যুবক মাটি ফুঁড়ে উঠে তাঁকে ঘিরে ফেলল। তিনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই এলোপাথাড়ি কিল, ঘুষি এবং লোহার চেন চালাতে লাগল।

রাস্তায় লুটিয়ে পড়লেন শরদিন্দু। তাঁর চোখের সামনের সমস্ত কিছু মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল।

এ অঞ্চলের দুটি লোক শরদিন্দুকে চিনতে পেরে একটা নার্সিং হোমে ভর্তি করে বিমলদের বাড়িতে খবর দেয়। বিমল অফিস থেকে ফিরে এসেছিলেন। তক্ষুনি তিনি ঝিল্লি এবং বনানীকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়েন। নার্সিং হোমে এসে দেখা গেল, শরদিন্দুর জ্ঞান ফেরেনি, সারা গায়ে এবং মাথায় ব্যান্ডেজ। নাকে অক্সিজেনের নল। ডাক্তাররা জানালেন, প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। আটচল্লিশ ঘন্টা না কাটলে তিনি বাঁচবেন কিনা, নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।

এক ধারে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে শরদিন্দুর দিকে তাকিয়ে আছে ঝিল্লি। তাঁর এই ভয়াবহ পরিণতির জন্য কে বা কারা দায়ী সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারছিল সে। তারই জন্য এমন মারাত্মক ঘটনাটা ঘটে গেল। এই একগুঁয়ে, দুঃসাহসী, সৃষ্টিছাড়া মানুষটি অন্য কোনো অচেনা গ্রহ থেকে ক'দিনের জন্য তাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন কিনা, কেউ জানে না।

একটা অসহ্য কষ্টে ঝিল্লির বুকের ভেতরটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল যেন।

আলোকপাত

স্পেশাল বাসের কন্ডাক্টরকে টিকেট কাটার সময় সুজাতা বলে রেখেছিল, গ্রে স্ট্রিট পেরুবার পর প্রথম যে স্টপেজটা পড়বে, তাকে যেন সেখানে নামিয়ে দেওয়া হয়। গোটা উত্তর কলকাতা তার কাছে প্রায় অচেনা। যা দু'চার বার এদিকে এসেছে, মনে হয়েছে, একটা গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছে।

মাঝবয়সী কন্ডাক্টরটির দায়িত্ববোধ আছে। সুজাতার অনুরোধ এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে তৎক্ষণাৎ আর এক কান দিয়ে সে বার করে দেয় নি, নির্দিষ্ট স্টপেজেই তাকে নামিয়ে দিয়েছে।

সুজাতার বয়স সাতাশ আটাশ। শ্যামবর্ণ হলেও বেশ সুশ্রী। সাজটাজের কোনোরকম বাহুল্য নেই। ঘন লম্বা চুল একবেণী করে পিঠের ওপর ফেলে রেখেছে। পরনে হলুদ জমির ওপর নীল বুটিদার প্রিন্টেড শাড়ি। পায়ে আধ পুরনো স্লিপার। মুখে খুব হালকা করে পাউডার বুলনো, চোখে সরু কাজলের টান। বাঁ হাতে পাতলা চামড়ার ব্যান্ডে চৌকো ঘড়ি, ডান হাতে রুপোর মোটা রুলি, গলায় ছোট লকেটওলা ফিনফিনে সোনার চেন। এ ছাড়া সারা গায়ে ধাতুর আর কোনো চিহ্ন নেই।

রাস্তায় নেমে প্রথমেই বাঁ হাতের কবজি উলটে ঘড়ি দেখে নিল সুজাতা। আটটা বেজে চুয়াল্লিশ। রণধীর মল্লিক ঠিক ন'টায় তাকে দেখা করতে লিখেছেন। পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন, ন'টার পর এক মিনিটও দেরি করলে দেখা হবে না। লোকটিকে আগে কখনও দেখেনি সুজাতা। চিঠিতেই তাঁর সঙ্গে যা যোগাযোগ। সংক্ষিপ্ত যে পাঁচটি লাইন রণধীর লিখেছেন তাতে এটুকু স্পষ্ট, সময় সম্পর্কে তিনি ভীষণ খুঁতখুঁতে। খুব সম্ভব ঘড়ির কাঁটা ধরে তাঁর সারা দিনের রুটিন ঠিক করা হয়।

সুজাতারা থাকে আদর্শনগরে। শিয়ালদা মেইন স্টেশন থেকে বনগাঁ লাইনে ট্রেনে এক ঘন্টা পনের মিনিটের পথ। দিন কয়েক আগে রণধীর মল্লিকের চিঠিটা যখন সে পায় সেই মুহূর্ত থেকে একটা চিন্তাই তার মস্তিষ্কে ভর করেছিল, যেমন করে হোক আজ ন'টার মধ্যে তাকে রণধীরদের 'মল্লিক ভবন'-এ হাজির হতে হবে।

কাল সারা রাত ভাল করে ঘুমোতে পারে নি সুজাতা। আকাশে আলো ফুটতে না ফুটতেই আজ সে উঠে পড়েছে। তারপর স্নান টান সেরে চা খেয়ে সোজা স্টেশনে। শিয়ালদার ফার্স্ট আপ ট্রেনটা যাতে মিস না করে সে জন্য অনেক আগে আগেই স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিল। কেননা পরের ট্রেন পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে। সেকেণ্ড ট্রেন ধরলে কোনোভাবেই ন'টায় রণধীরের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়।

বনগাঁ লাইনের ট্রেনগুলো টাইম টেবলের ধার ধারে না। মর্জিমাফিক যখন খুশি আসে, যখন খুশি যায়। কিন্তু অলৌকিক কোনো কারণে ফার্স্ট ট্রেনটা সঠিক সময়েই সুজাতাকে শিয়ালদায় পৌঁছে দিয়েছিল। এক মিনিটও লেট করে নি। শিয়ালদা থেকে নর্থ ক্যালকাটার স্পেশাল বাস ধরেছে সে।

হাতে এখনও ষোল মিনিট সময় রয়েছে। রণধীর মল্লিকের লেটারহেডে তাঁদের বাড়ির ঠিকানা ছাপা আছে। আঠার নম্বর পীতাম্বর লাহা রোড। সেখানে পৌঁছুতে হলে, গ্রে স্ট্রিটের পরের স্টপেজে নামতে হবে, চিঠিতে এই হদিসটুকুই শুধু দিয়েছেন রণধীর। ষোল মিনিটের ভেতর তাঁদের বাড়িটা খুঁজে বার করতে হবে সুজাতাকে।

রণধীর মল্লিকের সঙ্গে দেখা হওয়া যে কতটা জরুরি, সুজাতার চেয়ে সেটা বেশি করে আর কেউ জানে না। এর ওপর তার নিজের তো বটেই, তাদের পরিবারের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে।

মার্চ মাস শেষ হয়ে এল। এর মধ্যেই কলকাতায় গরম পড়তে শুরু করেছে। তবে উলটোপালটা জোরাল হাওয়া থাকায় রোদের তাত ততটা গায়ে লাগছে না।

আজ রবিবার। ছুটির দিনের এই সকালে রাস্তায় গাড়িটাড়ি বা মানুষজন বেশ কম। দু'চারটে বাস মিনি বা প্রাইভেট কার যা দেখা যাচ্ছে তাদের যেন কোথাও যাবার তাড়া নেই, গড়িমসি চালে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। লোকজনেরও একই হাল, তাদের চলাফেরায় অসীম আলস্য মাখানো। ছুটিটা তাড়াহুড়ো না করে সবাই ফুরফুরে মেজাজে উপভোগ করতে চায়।

যে রাস্তায় রণধীর থাকেন সেটা ঠিক কোথায়, বিস্তৃতভাবে তিনি তা জানাননি। একটা লোককে

জিজ্ঞেস করতে সে বলল, উলটোদিকের ফুটপাথ ধরে সোজা খানিকটা এগিয়ে গেলে কোনাকুনি তিন নম্বর রাস্তাটাই হল পীতাম্বর লাহা রোড।

সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ পেরিয়ে ওপারে চলে এল সুজাতা। তারপর পাঁচ মিনিটের ভেতর পীতাম্বর লাহা রোডে পৌঁছে গেল।

এই রাস্তাটায় এসে উত্তর কলকাতা সম্পর্কে সুজাতার ধারণা কিছুটা পালটে যায়। এতকাল সে জানত, নর্থ ক্যালকাটা মানেই একশ বছরের পুরনো ভাঙাচোরা নোনা-ধরা ঘিঞ্জি বাড়ি, থিকথিকে ভিড়, জীবাণুর মতো কয়েক লাখ মানুষ, আবর্জনার পাহাড়, জিলিপির প্যাঁচের মতো সরু সরু গলি, ঠেলা রিকশা মিনি অটো ট্রাম বাসের চিরস্থায়ী যানজট—সব মিলিয়ে একটা দমবন্ধ-করা আবহাওয়া।

পীতাম্বর লাহা রোডটা সুজাতার পুরনো ধারণার সঙ্গে আদৌ মিলছে না। রাস্তাটা বেশ চওড়া। খানাখন্দ চোখে পড়ছে না। টেলিফোন বা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের লোকেরা ফুটপাথ খুঁড়ে রাখেনি। চারদিকে প্রচুর গাছপালা। রেনট্রি কৃষ্ণচূড়াই বেশি। কৃষ্ণচূড়ার মাথাগুলো আগুনের থোকার মতো অজস্র লাল ফুলে ছেয়ে আছে।

উত্তর কলকাতার জন বিস্ফোরণের ছাপ এখানে পড়েনি। রাস্তাটা নিরিবিলি। বাড়িগুলো গায়ে গায়ে লাগানো ঘিঞ্জি নয়। বিরাট বিরাট খোলামেলা কমপাউন্ডের মাঝখানে সেকেলে ধাঁচের ম্যানসনের মতো থামওলা এই সব বাড়ি বুঝিয়ে দেয় এটা বনেদি বড়লোকদের পাড়া। তবে বেশ কিছু বাড়ি ভেঙে উঁচু উঁচু হাই-রাইজ তোলা হয়েছে।

চারদিক ভাল করে খুঁটিয়ে দেখার মতো সময় নেই সুজাতার। নম্বর মিলিয়ে মিলিয়ে 'মল্লিক ভবন'-এর সামনে যখন সে এসে দাঁড়াল ঘড়িতে ন'টা বাজতে ছ মিনিট বাকি।

উঁচু কমপাউণ্ড ওয়াল দিয়ে ঘেরা বাড়িটার সামনের দিকে বিরাট লোহার গেট। গেটটা ভেতর থেকে বন্ধ। একটা পাল্লায় এক ফুট লম্বা এবং ইঞ্চি দেড়েক চওড়া একটা ফোকর। তার ওপরে ইংরেজিতে লেখা আছে 'লেটার'। বোঝা যায়, চিঠিপত্র এলে পোস্ট অফিসের পিওন ওই ফাঁক গলিয়ে ফেলে দেয়। চিঠির বাক্সটা নিশ্চয়ই পাল্লার ভিতর দিকে রয়েছে।

গেটের পাশে কমপাউণ্ড ওয়ালের গায়ে শ্বেত পাথরের চৌকো ফলকে বাড়িটার নাম কালো হরফে লেখা আছে। তার নিচে রয়েছে 'স্থাপিত ঃ ইং ১৯২০'। এখন দু হাজার সাল চলছে। অর্থাৎ 'মল্লিক ভবন'-এর বয়স আশি বছর।

গেটের ওধারে দারোয়ান টারোয়ান কেউ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। সুজাতা বাস থেকে নামার পর ঘড়ি দেখেছিল। এখন আর একবার দেখে নিল। ন'টা বাজতে ছ মিনিট বাকি।

গেটের পাল্লায় বিরাট আকারের দুটো লোহার কড়া চোখে পড়ল সুজাতার। খুব সম্ভব বাড়ির লোকজন বাইরে কোথাও গেলে তালা লাগানোর জন্য এই ব্যবস্থা। সে কড়া নাড়তে নাড়তে উঁচু গলায় ডাকতে লাগল, 'কে আছেন, গেট খুলুন।'

কোনো সাড়াশব্দ নেই।

কিছুক্ষণ ডাকাডাকি এবং কড়া নাড়ার পর হঠাৎ সে দেখতে পায়, বাড়ির নাম যেখানে লেখা আছে সেই শ্বেত পাথরের ফলকটার মাথায় একটা কলিং বেলের সুইচ। সেটা টিপতেই ভেতর থেকে একটানা চড়া সুরেলা আওয়াজ ভেসে এল।

মিনিট দুই পর গেটের একটা পাল্লা খুলে যে মুখোমুখি দাঁড়াল সে একজন মাঝবয়সী বিধবা। তার হাতে প্রকাণ্ড পেতলের তালা আর চাবির থোকা। চেহারা এবং পরনের আধময়লা কালোপাড় সস্তা দামের ধুতি দেখে আন্দাজ করা যায়, মেয়েমানুষটি এ বাড়ির কাজের লোক। সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি সুজাতা দিদিমণি?'

প্রথমটা বেশ অবাক হল সুজাতা। এই মেয়েমানুষটি তার নাম জানলো কী করে? পরক্ষণে ভাবল, রণধীর মল্লিক তার আসার কথা মেয়েমানুষটিকে নিশ্চয়ই জানিয়ে রেখেছেন।

সুজাতা আস্তে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'আসুন। বাবু আপনার জন্যি অপিক্ষে করচেন।'

মেয়েমানুষটির কথায় গেঁয়ো টান আছে। খুব সম্ভব, তার বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কোনো

অঞ্চলে।

গেট পেরিয়ে ওধারে চলে গেল সুজাতা। বাইরের মতো গেটের ভেতর দিকেও দুটো কড়া লাগানো রয়েছে। সে ঢোকামাত্র পাল্লাটা টেনে তালা লাগিয়ে দিল মেয়েমানুষটি।

সুজাতার কেন যেন মনে হল, বাড়িটা সারাদিনই ভেতর থেকে তালাবন্ধ থাকে।

গেটের পর থেকে নুড়ি বিছানো ড্রাইভওয়ে। সেটা ধরে খানিকটা গেলে গোলাপি রঙের বড় বড় থামওলা তেতলা বাড়ি। ব্রিটিশ আমলে তৈরি বাড়িটার স্থাপত্য সেকেলে ধাঁচের। বহুকাল নতুন করে রং করানো হয় নি বলে পুরনো রং বছরের পর বছর রোদে আর বৃষ্টিতে ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে।

ড্রাইভওয়ের ডানপাশে একসময় চমৎকার একখানা বাগান ছিল। পুরনো দিনের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে দু'চারটে শুকনো গোলাপ গাছ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তবে এধারে ওধারে প্রচুর আগাছা গজিয়েছে। সেগুলো সাফ করার কথা বোধহয় কেউ ভাবে না।

বাগানের ওধারে কমপাউণ্ড ওয়ালের গা ঘেঁষে একটা অ্যামবাসাডর দেখা যাচ্ছে। মনে হয় বহুদিন ওটা ওভাবেই পড়ে আছে। কত বছর যে গাড়িটায় কেউ চড়ে নি কে জানে!

সমস্ত বাড়িটা আশ্চর্য রকমের নিঝুম। রণধীর মল্লিক যে আছেন সেটা আগেই জানা গেছে। এ ছাড়া অন্য কোনো জনপ্রাণীর অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে না।

মেয়েমানুষটি চুপচাপ ধরনের। নিঃশব্দে নিপুণ গাইডের মতো সুজাতাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে।

ড্রাইভওয়ে ধরে গাড়ি-বারান্দার তলায় এসে শ্বেত পাথরের দশটা সিঁড়ি ভেঙে মেয়েমানুষটির সঙ্গে উঁচু চাতালে উঠে এল সুজাতা। সেটার সামনের দিকে কারুকাজ-করা পুরু কাঠের বিশাল দরজা। দরজা পার হয়ে খানিকটা গেলে বিশাল হল-ঘর। সেখানে সিলিং থেকে ঝাড়লণ্ঠন আর বিরাট বিরাট চার ব্লেডওলা পাখা ঝুলছে। এধারে ওধারে পাঁচ ছ'সেট সোফা, যেগুলোর বেশির ভাগেরই গদি ছেঁড়া। এ ধরনের সেকেলে বনেদি বাড়িতে যেমন দেখা যায়, বর্মা টিকের বেশ কিছু আলমারি আর চেয়ার টেবলও রয়েছে। অনেক দিন ওগুলোর গায়ে বার্নিশ পড়ে নি। ডিসটেম্পার-করা দেওয়াল আর সিলিং। বহু জায়গায় পলেস্তারা খসে গিয়ে দগদগে ঘায়ের মতো দেখাচ্ছে। মল্লিক বংশের পূর্বপুরুষদের বেশ কিছু অয়েল পেন্টিং পেতলের ফ্রেমে বাঁধিয়ে চারদিকের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। ছবি, আসবাব, ঝাড়লণ্ঠন হল-ঘরের মেঝে—সর্বত্র পুরু হয়ে ধুলো জমেছে। অনেক দিন ওগুলো ঝাড়পোঁছ বা ঘষামাজা করা হয় নি।

হল-ঘরের মাঝখান থেকে ঘোরানো, চওড়া কাঠের সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। সেগুলোর দুধারে রেলিংয়ের ওপর পেতলের পাত বসানো। একসময় সিঁড়িতে জুটের কার্পেট পাতা ছিল। বেশির ভাগটাই নেই। একটু আধটু ছেঁড়াখোঁড়া অংশ এধারে ওধারে ঝুলছে।

একতলাটা ভাল করে দেখা গেল না। মেয়েমানুষটি সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে শুরু করেছে। অগত্যা সুজাতাকেও উঠতে হচ্ছে। বাইরেটা নির্জন হলেও আকাশ দেখা যাচ্ছিল, চারপাশ ছিল খোলামেলা, আর ছিল পর্যাপ্ত আলো। কিন্তু বাড়ির এই ভেতরের দিকটা অনেক বেশি নিঝুম, ছায়া ছায়া, স্যাঁতসেঁতে, শ্বাস যেন আটকে আসে। অপার নৈঃশব্দ্য চতুর্দিক থেকে সুজাতাকে ঘিরে ধরছে। মনে হচ্ছে, পরিচিত পৃথিবী থেকে বহুদূরের অজানা, জনমানবহীন ভুতুড়ে কোনো পরিবেশে সে চলে এসেছে। তার গা ছম ছম করতে লাগল।

সপ্তাহ দুই আগে খবরের কাগজে অদ্ভুত একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছিল সুজাতার। উত্তর কলকাতার বনেদি বংশের এক ব্যক্তিকে রোজ সকাল ন'টা থেকে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত সঙ্গদান করতে হবে। এই নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত কিছু কাজও করে দিতে হবে। যে মহিলাদের বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে, তাঁরা যদি অবিবাহিত বা নিঃসন্তান বিধবা হন, বেশি পিছুটান না থাকে, পোস্ট কার্ড সাইজের সাম্প্রতিক ফটো সমেত আবেদন করতে পারেন। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে আবেদনকারিণীকে অবশ্যই স্নাতক এবং মনোরম ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হতে হবে। প্রাথমিক ভাবে মাসিক মাইনে চার হাজার টাকা, সেই সঙ্গে দুপুরের আহার এবং বিকেলের টিফিন ফ্রি। সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। যোগ্যতম প্রার্থীকে আরো কী আর্থিক বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া

যায় তা পরে স্থির করা হবে।

সুজাতার একটা ভদ্র রকমের চাকরির ভীষণ দরকার। বছর তিনেক আগে বাংলা নিয়ে এম. এ পাশ করেছে। হাই সেকেন্ড ক্লাসও পেয়েছে। গ্র্যাজুয়েশনের পর এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়েছিল। বছরের পর বছর সেখানে ঘোরাঘুরি করে কয়েক জোড়া চটি ক্ষইয়ে ফেলেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত ইন্টারভিউর জন্য একটা ডাকও পায়নি। এতদিনে সার সত্যটা সে বুঝে গেছে, যোগ্যতা কোয়ালিফিকেশন ভাল রেজাল্ট—চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে এসব ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। তার জন্য যা সব চাইতে জরুরি তা হল একজন এম. এল. এ মামা, এম. পি জামাইবাবু কিংবা মিনিস্টার মেসোমশাই। কিন্তু তেমন কোনো জোরাল মুরুব্বি তার নেই।

আজকাল যেখানে সেখানে ব্যাঙের ছাতার মতো ইংলিশ মিডিয়াম প্রিপারেটরি স্কুল গজিয়ে উঠেছে। তেমন একটা জায়গায় বার শ টাকা মাইনেয় বাচ্চাদের গড়ে পিটে নাম-করা বড় স্কুলে পাঠাবার কাজ নিয়েছে সুজাতা। তা ছাড়া তিন চারটে টিউশনি আছে। সব মিলিয়ে হাজার দুই টাকা রোজগার। এই টাকায় মা, একটা ভাই, একটা বোন আর সে, মোট চারজনের সংসার কিভাবে যে চলছে সেটা তার চেয়ে ভাল কেউ জানে না।

এইভাবেই ধিকিয়ে ধিকিয়ে দিন কাটছিল। হঠাৎ দারুণ কিছু হবে, আচমকা ভাগ্যের শিকে ছিঁড়ে পড়বে—এমন একটা আশা যখন বিলীন হয়ে যাচ্ছে, আত্মবিশ্বাস যখন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে, সেই সময় বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়েছিল সুজাতার। চাকরির এই বাজারে মিনিমাম চার হাজার টাকার গ্যারান্টি, দুপুরের খাওয়া এবং বিকেলের টিফিন ফ্রি। এ একেবারে অকল্পনীয়। নিজের চোখে দেখেও সে প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারেনি। চমকটা কেটে যাবার পর এক মুহূর্ত দেরি করেনি। পঁচিশ টাকা খরচ করে নিজের ছবি তুলিয়ে তার একটা কপি, চাকরির দরখাস্ত, সেই সঙ্গে এম. এ ডিগ্রির মার্কশিটের জেরক্স পরদিনই পুরু ব্রাউন পেপারের খামে ভরে রেজিস্ট্রি করে পাঠিয়ে দিয়েছিল। বিজ্ঞাপনে ডিগ্রি বা মার্কশিটের জেরক্স কপি চাওয়া হয় নি। তবু তার শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনদাতার ধারণা যাতে ভাল হয়, এই চিন্তাটাই সেই মুহূর্তে তার মাথায় প্রবলভাবে কাজ করছিল।

দরখাস্ত পাঠানোর পর থেকে রোজ উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত সুজাতা, কখন ইন্টারভিউর জন্য ডাক আসে। কিন্তু বেশ ক'দিন কেটে যাবার পরও ওদিক থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। নতুন যে আশার অঙ্কুরটি একটু একটু করে মাথা তুলতে শুরু করেছিল সেটা একেবারে মুষড়ে পড়ে। পুরনো নৈরাশ্য ফের তাকে পেয়ে বসে। নাঃ, কিছুই হবার নয়।

কিন্তু হঠাৎ মিরাকলটি ঘটে যায়। ইন্টারভিউর চিঠি আসে। সাধারণ পোস্ট কার্ডে মাত্র পাঁচটি লাইন। নিচের স্বাক্ষরকারী রণধীর মল্লিক। বিজ্ঞাপনে অবশ্য এই নামটা ছিল না। পোস্ট বক্সের নম্বর দিয়ে সেখানে দরখাস্ত করতে বলা হয়েছিল। যাই হোক, রণধীর আজ রবিবার তাকে দেখা করতে লিখেছেন।

রণধীর মল্লিকের চিঠিটা পাওয়ার পর সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গিয়েছিল সুজাতার। মুহ্যমান আশা আবার চাঙ্গা হয়ে তাকে নতুনভাবে চনমনে করে তুলেছে। চাকরিটা যেমন করে হোক, পেতেই হবে।

গাইড মেয়েমানুষটি ক্রমাগত সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছে। আর অদৃশ্য একটা বঁড়শিতে আটকে সুজাতা পিছু পিছু চলেছে। এ ক'দিন মাসের শেষে চার হাজার টাকার ব্যাপারটা তার মধ্যে এমন উদ্দীপনা চারিয়ে দিয়েছিল যে অন্য কোনো দিকেই নজর ছিল না। কিন্তু এরকম একটা গায়ে কাঁটা দেওয়া আবহাওয়ার ভেতর এসে পড়তে হবে, সে ভাবতেও পারেনি। তার মস্তিষ্কে এলোপাথাড়ি কিছু চিন্তা পর পর ঝিলিক দিয়ে গেল। রণধীর মল্লিকের সঙ্গে আর দেখা করার দরকার নেই। দু হাজার টাকায় ক'বছর ধরে যখন তারা টিকে আছে তখন আপাতত এভাবেই চলুক। তারপর ভাল কোনো সুযোগ যদি আসে, দেখা যাবে। পরক্ষণেই মনে পড়ল, মেয়েমানুষটা গেটে তালা দিয়ে এসেছে। সে তালাটা না খুললে বেরোবার উপায় নেই। সুজাতা টের পেল, অজানা ভয়ে আর টেনসনে তার প্রতিটি রোমকূপ থেকে বিন বিন করে ঘাম বেরিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে, চাকরির লোভ দেখিয়ে তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। একটা মারাত্মক গোলমাল করে ফেলেছে সে। বিজন কিংবা নান্টুকে যদি সঙ্গে করে আনত! নান্টু তার ছোট ভাই আর বিজন তার ছেলেবেলার বন্ধু। বন্ধু বললে ঠিক বলা

হয় না, তার চেয়েও অনেক বেশি। দু'জনেই জানে তারা কী চায়, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কাউকে কোনোদিন বলেনি। সুজাতার দুবছর আগে বিজন এম. এ পাশ করেছে। কিন্তু তারও শাঁসাল মামা পিসে বা জামাইবাবু নেই যে চাকরি পাবে। কম্পিউটারে বছর তিনেকের একটা কোর্স করেছে। এখন কলকাতার একটা মাঝারি ধরনের ট্রেনিং সেন্টারে ছেলেমেয়েদের কম্পিউটার শেখায়। হাতখরচের মতো সামান্য কিছু পায়।

বিজন বা নান্টুকে সঙ্গে না আনার ভুলটা এখন আর শোধরানো যাবে না। সুজাতা টের পাচ্ছে, ঘামে তার সারা শরীর ভিজে গেছে।

একসময় দোতলায় উঠে এল তারা। এখানেও একটা হল-ঘর রয়েছে, হুবহু একতলার মতোই। তবে নিচের তলার মতো ধুলোবালি ঝুলকালি কম। মনে হয়, নিয়মিত সাফসুতরো করা হয়।

হঠাৎ মাথা থেকে যাবতীয় দুশ্চিন্তার চাপ ঠেলে সরিয়ে দিয়ে একেবারে মরিয়া হয়ে ওঠে সুজাতা। এসে যখন পড়েছে, শেষটা না দেখে যাবে না।

মেয়েমানুষটা দোতলা পার হয়ে এবার তেতলার সিঁড়ি বাইছে। কোথায় গিয়ে যে সে থামবে কে জানে!

ব্রিটিশ আমলের এই সব বাড়ির এক একটা ফ্লোরের উচ্চতা পঁচিশ তিরিশ ফুট। এরকম তিন চারটে ফ্লোরের সিঁড়ি যদি ভাঙতে হয়, কোমর বেঁকে যাবে।

সুজাতা অবাক হয়ে দেখছে মেয়েমানুষটি তার সামনে তর তর করে সিঁড়ি ভাঙছে। বয়সে তার চেয়ে কম করে কুড়ি বাইশ বছরের বড়ই হবে কিন্তু এতটুকু হাঁফাচ্ছে না, কোনোরকম ক্লান্তির লক্ষণ নেই। কিন্তু এর মধ্যেই সুজাতার পা ধরে আসছে। তার মনে হল, মেয়েমানুষটা বোধ হয় দিনে বেশ কয়েকবার ওপর-নিচ করে। সবই অভ্যাসের ব্যাপার। তারা নিঃশব্দে উঠতে লাগল।

তেতলাতেও নীচের দুটো ফ্লোরের মতো একই মাপের একই চেহারার হল-ঘর। এক নজরে মনে হল, এটা অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন, যথেষ্ট সাজানো গোছানো।

তেতলা থেকে ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি আরো উঁচুতে চলে গেছে। মেয়েমানুষটা সেদিকে গেল না, বাঁ পাশে ঘুরে সুজাতাকে নিয়ে হল-ঘরের মাঝখানে চলে এল।

ঠিক মাঝখানে প্রকান্ড একটা কার্পেট পাতা। যদিও অনেক কালের পুরনো, রং ফিকে হয়ে গেছে, ধারের দিকে কিছু জায়গায় ছেঁড়া, তবু বোঝা যায় বেশ দামি। কয়েক সেট সোফা আর সেন্টার টেবল কার্পেটের ওপর যত্ন করে বসানো। একধারে একটা রঙিন টিভি, তার পাশে একটা ডিভানে প্রচুর ক্যাসেট, রেকর্ড প্লেয়ার এবং একটা ভি সি আর। দুধারে বেশ ক'টা বেডরুম চোখে পড়ে। একদিকে মেহগনি কাঠের ড্রয়ারওলা টেবিল চেয়ার, টেবলে লেখাপড়ার জন্য ল্যাম্প, পেন হোল্ডার, কিছু কাগজপত্র এবং ফাইল। আরেক দেওয়াল ঘেঁষে কাচের পাল্লা লাগানো বেশ ক'টা আলমারিতে প্রচুর বই।

সোফাগুলোর পাশে চামড়া দিয়ে মোড়া লম্বা ইজি চেয়ারে শুয়ে কেউ একজন খবরের কাগজ পড়ছিলেন। কাগজের আড়াল থাকায় তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না। ইজি চেয়ারের পাশে একটা নিচু টেবলে ইংরেজি বাংলা আরো ক'টি কাগজ গুছিয়ে রাখা আছে। আর আছে রুপো-বাঁধানো আলবোলা, যার নল অন্তত তিন ফুট দীর্ঘ। বোঝা যাচ্ছে, সিগারেট বা চুরুট নয়, নেশার ব্যাপারে সাবেক গড়গড়াই ভদ্রলোকের পছন্দ। টেবলটার একধারে দুটো টেলিফোনও রয়েছে।

মেয়েমানুষটা খুব আস্তে, ভয়ে ভয়ে ডাকল, 'বাবা, উনি এয়েচেন—'

খবরের কাগজটা সরিয়ে ধীরে ধীরে যিনি ইজি চেয়ারে উঠে বসলেন তাঁর বয়স পঁচাত্তর ছিয়াত্তর কিংবা দু-এক বছর এদিক ওদিক হতে পারে। গাল ভেঙে অনেকটা ঢুকে গেছে, ফলে চোয়ালের হাড় বেঢপ বড় দেখায়। শিরা বার-হওয়া হাত। এক সময় টকটকে রং ছিল। এখন চামড়া কুঁচকে কালচে ছোপ ধরেছে।

ইনিই যে রণধীর মল্লিক, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না সুজাতার। কপালে অসংখ্য ভাঁজ তাঁর। রোমশ কাঁচাপাকা ভুরুর তলায় বাইফোকাল চশমার ওধারে একজোড়া তীব্র চোখ। সারা মুখে অসীম বিরক্তির চিরস্থায়ী ছাপ। পৃথিবীর যাবতীয় তিক্ততা আর অসন্তোষ জড়ো করে লোকটা তার জন্য অপেক্ষা করছে।

রণধীর মল্লিক সুজাতার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিলেন। তারপর ঈষৎ ভাঙা ভাঙা কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমিই তা হলে সুজাতা ধরচৌধুরি?'

চেহারার মতোই লোকটার কণ্ঠস্বরে এতটুকু মিষ্টতা বা মাধুর্য নেই। একে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সঙ্গদান করতে হবে, ভাবতেই ভেতরে ভেতরে গুটিয়ে গেল সুজাতা। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে সে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ঠিক এই সময় বাঁ ধারের দেওয়ালের পাশের কোনো মিউজিক্যাল ঘড়িতে ন'টা বাজল। আগে লক্ষ করেনি, ঘাড় ফিরিয়ে সুজাতা দেখল, একটা মানুষ-সমান হাইটের পুরনো গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক ওখানে দাঁড় করানো রয়েছে।

রণধীর মল্লিক বললেন, 'যাক, সময়জ্ঞান আছে দেখছি। বসো—' বলে কাছাকাছি একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে আসায় লোকটা কতটা সন্তুষ্ট, কণ্ঠস্বরে তা বোঝা গেল না। নিঃশব্দে বসে পড়ল সুজাতা। ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছে সে। টের পাচ্ছে, কপালে দানা দানা ঘাম জমে উঠেছে। কারণটা স্নায়বিক চাপ। একটা বড় লেডিজ ব্যাগ সঙ্গে রয়েছে, তার ভেতর থেকে রুমাল বার করে ঘাড় গলা টলা মুছে ভীরু দৃষ্টিতে একবার রণধীরের দিকে তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিল।

সুজাতাকে দেখার পর এক মুহূর্তের জন্য তার ওপর থেকে চোখ সরাননি রণধীর। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বেশ কয়েক বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে লক্ষ করে বললেন, 'গোড়াতেই একটা কথা বলে রাখছি, তোমার আগে আরো সাতটা মেয়ে ইন্টারভিউ দিয়ে গেছে। একজনকে আমার মোটামুটি পছন্দ হয়েছে। তোমাকে যদি তার চেয়ে বেটার মনে হয়, তবেই কাজটা পাবে।'

এ কথার উত্তর হয় না। সুজাতা চুপ করে রইল।

রণধীর জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠিকানা দিয়েছ—আদর্শনগর। সেটা কোন ভাগাড়ে?'

সুজাতা মুখ না তুলেই জানিয়ে দিল।

ভুরু দুটো আরো কুঁচকে গেল রণধীরের। বললেন, 'রোজ অত দূর থেকে ন'টার ভেতর এখানে আসবে কী করে?'

সুজাতা নিচু গলায় বলল, 'আজ যেভাবে এসেছি—শিয়ালদার ফার্স্ট ট্রেন ধরে।'

'বনগাঁ লাইনের ট্রেনগুলোর তো মা-বাপ নেই। কাগজে প্রায়ই দেখি অবরোধ, বন্‌ধ, আর স্টেশন মাস্টারের ওপর হামলা লেগেই আছে। এই সব ঝামেলা হলে ঠিক সময়ে পৌঁছবে কী করে?'

'বাস রুট আছে। ট্রেন না পেলে বাস ধরব।'

'বাড়িতে কে কে আছে?'

সুজাতা জানালো।

রণধীর বললেন, 'মা, এক ভাই, এক বোন। দেখ বাপু, চাকরিটা হয়ে যাবার পর বলবে—মায়ের বাতের ব্যথা, কি ভাই আর বোনকে নিয়ে ঝঞ্ঝাট, এ জন্যে আসতে পারি নি কিংবা আসতে দেরি হল— এই সব বাহানা কিন্তু শুনব না। তক্ষুনি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বিদেয় করে দেব।'

এমন জঘন্য, ইতর লোক আগে কখনও দেখে নি সুজাতা। এর কাছে কাজ নিলে কোনোরকম মায়া দয়া সহানুভূতির আশা নেই। পয়সা যেমন দেবে, নিঙড়ে মুচড়ে চুলচেরা হিসেব করে তেমনি কাজও আদায় করে নেবে। কে মরল, কে বাঁচল, সেদিকে ফিরেও তাকাবে না।

সুজাতা বলল, তার ভাইবোনেরা বেয়াড়া বেয়াদব নয়, তাদের নিয়ে কখনও কোনো সমস্যা হয়নি, হবার সম্ভবনা নেই। মায়ের শরীর স্বাস্থ্য বেশ ভাল, তাঁর অসুখবিসুখ নিয়ে এখন পর্যন্ত তেমন দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেনি।

রণধীর জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ওরিজিনাল সার্টিফিকেট আর ডিগ্রিগুলো নিয়ে এসেছ?'

'এনেছি। এই যে—' ব্যাগ খুলে মাধ্যমিক থেকে এম. এ পর্যন্ত সমস্ত সার্টিফিকেট-টিকেট বার করে রণধীরকে দিল সুজাতা। এখানে আসার আগেই সে আন্দাজ করেছিল, রণধীর হয়তো দেখতে চাইবেন। কাল রাতেই তাই সেগুলো ব্যাগের ভেতর রেখে দিয়েছিল।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবগুলো দেখে ফেরত দিতে দিতে রণধীর বললেন, 'সব পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট

হয়েছে দেখছি। টোকাটুকি করনি তো?'

এতক্ষণ স্নায়বিক চাপে আড়ষ্ট হয়ে ছিল সুজাতা। হঠাৎ মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। তবে ভেতরকার উত্তাপ বেরিয়ে আসতে দিল না। সে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, হঠকারিতার মানে তার জানা আছে। শান্ত গলায় বলল, 'তার প্রয়োজন হয়নি।'

'অ—'

সুজাতা চুপ করে থাকে।

রণধীর জিজ্ঞেস করলেন, 'আগে কখনও চাকরি বাকরি করেছ? এক্সপিরিয়েন্স কিছু আছে?'

সুজাতা বলল, 'আমি বাচ্চাদের একটা প্রিপারেটরি স্কুলে পড়াচ্ছি। মাইনে খুব কম। দু'তিনটে টুইশনিও করি।'

এক ধরনের সরীসৃপ আছে যাদের চোখে পাতা পড়ে না। রণধীরেরও অনেকটা সেইরকম। হঠাৎ গলা চড়িয়ে তিনি বললেন, 'তোমার মতলবটা কী?'

সুজাতা হকচকিয়ে গেল, 'মতলব! মানে?'

রণধীর আগের মতোই কর্কশ গলায় বললেন, 'এম. এ'তে অত ভাল রেজাল্ট করে আমার মতো একটা রগচটা, খচ্চর, স্কাউন্ড্রেল বুড়োকে সঙ্গ দিতে চাইছ কেন?'

নিজের সম্বন্ধে এমন বাছা বাছা বিশেষণ প্রয়োগ করতে আগে আর কাউকে কখনও দেখেনি সুজাতা। হতভম্বের মতো খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে সে। তারপর বলে, 'টাকার জন্যে। আপনি যা স্যালারি দিতে চাইছেন আমার এখনকার ইনকামের তা ডাবল। তাই—'

রণধীর বললেন, 'এর চেয়ে ভাল কিছু জোটাবার কথা ভাবতে পারলে না?'

সুজাতা বলল, 'ভেবেছিলাম তো অনেক কিছুই। কলেজে পড়াব কি কোনো বড় কোম্পানির অফিসার হব। কিন্তু আমার ব্যাকিং কোথায়? কে আমাকে রেকমেন্ড করবে? চাকরির বাজার আপনি হয়তো জানেন না।'

রণধীর চটে উঠলেন, 'তোমার কি ধারণা, আমি এই বাড়িতে বসে থাকি বলে কোনো খবর রাখি না?' দুই হাতের বুড়ো আঙুল নাচাতে নাচাতে বললেন, 'পলিটিক্যাল পার্টির মাফিয়ারা পেছনে না থাকলে আজকাল কিস্সু হয় না। তেমন কাউকে জোটাতে পারলে না?'

সুজাতা বলল, 'পারলাম আর কোথায়?'

একটু চুপচাপ।

তারপর বণধীর বললেন, 'এবার তোমাকে ক'টা ভাইটাল প্রশ্ন করব। ঠিক ঠিক জবাব দেবে।'

তটস্থ সুজাতা রুদ্ধশ্বাসে রণধীরের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই সৃষ্টিছাড়া, খ্যাপাটে বুড়োটা কী জানতে চাইবে কে জানে।

রণধীর জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি উইডো, না ডিভোর্সি?'

সুজাতা বলল, 'কোনোটাই না।'

'তোমাকে কি আনম্যারেড বলে ধরে নিতে হবে?'

'অবশ্যই আমি অ্যানম্যারেড। বিয়ে হলে সিঁদুর থাকত না?'

রণধীর প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন, 'সিঁদুর না পরাটা এখনকার ছুঁড়িদের ফ্যাশন। তা ছাড়া চাকরিটা বাগাবার জন্যে সিঁদুর মুছে যে তুমি হাজির হওনি, সেটা বুঝব কী করে?'

মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে সুজাতার। দাঁতে দাঁতে চেপে সে বলে, 'মিথ্যে আমি বলি না।'

সুজাতার কণ্ঠস্বরে এমন এক দৃঢ়তা রয়েছে যাতে সামান্য থতিয়ে গেলেন রণধীর। বললেন, 'ঠিক আছে, তোমাকে কুমারী বলে আপাতত মেনে নিচ্ছি।'

সুজাতা উত্তর দিল না।

রণধীর বললেন,'বিয়ে তো করনি। বয়-ফ্রেন্ড জুটেছে?'

মুখ লাল হয়ে ওঠে সুজাতার। নিচু গলায় সে বলে, 'চাকরির সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?'

'তার মানে কেউ আছে।'

'ধরুন আছে।'

'তোমার ডিউটি পিরিয়ডে দশ বার করে সে তোমাকে ফোন করবে, পালটা তুমি তাকে করবে— ফোনে ফোনে প্রেম চালাবে, আই মাস্ট নট টলারেট ইট।'

সুজাতা আবছাভাবে বলল, 'আমরা কেউ ফোন করব না।'

রণধীর এক মুহূর্তের জন্য সুজাতার মুখ থেকে নজর সরান নি। বললেন, 'কী নাম ছোকরার?'

'বিজন—বিজন সেনগুপ্ত।'

'কী করে সে?'

বিজন যা করে, জানিয়ে দিল। রণধীর মল্লিক যেরকম নাছোড়বান্দা টাইপের, জেরা করে করে জিভ বার করে ছাড়বে। তার চেয়ে প্রশ্ন করামাত্র জানিয়ে দেওয়া ভাল। সময়ও বাঁচবে, হয়রানির হাত থেকে রেহাইও পাওয়া যাবে।

রণধীর বললেন, 'ছোকরা এম. এ পাশ, ঠিক আছে। পয়সাকড়ির দিক থেকে সাউন্ড আর কেউ জুটল না?'

সুজাতা চুপ করে থাকে।

রণধীর বললেন, 'যাক গে, ইটস নট মাই হেড-এক। যার প্রতি যার মজে মন। একটা কথা তোমার প্রেমিকটিকে মনে রাখতে বলবে। আমার এই 'মল্লিক ভবন'টা প্রেমের কুঞ্জবন নয়। ফোন তো করবেই না, এখানে ঢুকবার চেষ্টাও যেন সে না করে। করলে পুলিশ ডেকে লক-আপে পুরে দেব।'

মুখ শক্ত হয়ে ওঠে সুজাতার। সে বলে, 'ইনভাইট না করলে সে কোথাও যায় না। তার আত্মসম্মান বোধ আছে।'

বিজন সম্পর্কে তাঁর নিষেধাজ্ঞা সুজাতার মনে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে সেটা হয়তো সেভাবে লক্ষ করেন নি রণধীর। বললেন, 'গুড। সেলফ-রেসপেক্ট মানুষের একটা ভাল কোয়ালিটি।'

গলার ভেতর থেকে শব্দ করল সুজাতা, কী বলল বোঝা গেল না।

রণধীর বললেন, 'এবার আমার লাস্ট প্রশ্ন। বুঝতে পারছ কিনা জানিনা, আমরা ট্রাডিশনাল বড়লোক। পয়সাকড়ি আছে। আমার স্বভাবটা একেবারেই গোছানো নয়। যেখানে সেখানে টাকা ফেলে রাখি। তা ছাড়া, যে এখানে কাজ করবে তাকে মাঝে মাঝে অনেক টাকা নড়াচাড়ার দায়িত্ব দেওয়া হবে। তোমাকে এ ব্যাপারে কতটা বিশ্বাস করা যায়?'

লোকটার ইতরামোর মাত্রা অনেক আগেই ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন যা বলল তা কোনোভাবেই সহ্য করা যায় না। সহনশীলতার একটা সীমা থাকে। শরীরের সব রক্ত মুখেচোখে উঠে এসেছিল সুজাতার। লাফ দিয়ে উঠে, দাঁড়াল সে। বেপরোয়া, ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, 'বাড়িতে ডেকে এনে এভাবে অপমান না করলেই পারতেন। উই আর নো ডাউট পুওর, বাট নট থিভস।'

রণধীর কিঞ্চিৎ হতচকিত। হাত নেড়ে নেড়ে বললেন, 'কুল ডাউন, কুল ডাউন।'

মস্তিষ্কের উত্তাপ ঠাণ্ডা হয় নি সুজাতার। হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো সে বলল, 'আপনার চাকরির আমার দরকার নেই। শুরু থেকেই আপনি আমাকে যা-তা বলে আসছেন। কিন্তু তার একটা লিমিট আছে। আপনি মানুষকে সম্মান দিতে জানেন না।'

রণধীর সমানে হাত নাড়ছিলেন। বললেন, 'আগে বসো। কেন তোমাকে এভাবে উত্যক্ত করেছি তার রিজন নিশ্চয়ই আছে। যাকে নেব, তাকে বাজিয়ে দেখব না? তুমিও তোমার উড-বি এমপ্লয়ারকে, মানে আমাকে পরখ করে নিতে পার। আমি কতটা হাড়ে হারামজাদা, কত বড় রাসকেল তোমার জানা উচিত।'

সুজাতার কানে কিছুই ঢুকছিল না। সে হিস্টিরিয়ার ঘোরে বলে যাচ্ছে, 'কী করে নিজের অনেস্টি প্রমাণ করব? যদি বলেন, আমাদের ওখানকার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের হাতে পায়ে ধরে একটা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে পারি। লোকটা দু'বার স্কুল ফাইনাল ফেল করেছে। দুটো মার্ডার আর কয়েক গণ্ডা ডাকাতির কেস আছে তার নামে। আর আমি এম. এ'তে হাই সেকেণ্ড ক্লাস, আমাদের ফ্যামিলি চিরকাল সৎভাবে জীবন কাটিয়ে এসেছে। একেবারে স্পটলেস লাইফ। আমি সজ্ঞানে

এখন পর্যন্ত কোনো অন্যায় করিনি, তবু ওই লোকটার সার্টিফিকেট যদি আপনার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়—'

তাকে শেষ করতে দিলেন না রণধীর। বললেন,'তোমাকে বসতে বলেছি সুজাতা। বসবে কী?' তাঁর কণ্ঠস্বর আগের থেকে একটু নরম শোনালো।

কী ভেবে আস্তে আস্তে বসে পড়ল সুজাতা। উত্তেজনায় এবং একটানা কথা বলার ধকলে সে হাঁফাচ্ছিল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে তার।

সেই মেয়েমানুষটি একটা বড় ট্রেতে করে দু'জনের মতো লুচি, তরকারি, বেগুনভাজা, ঘরে তৈরি সন্দেশ আর চা রণধীরদের সামনে একটা নিচু টেবলে রেখে চলে গেল।

রণধীর হল-ঘরের ডান পাশের দেওয়ালে একটা দরজা দেখিয়ে বললেন, 'ওই ঘরটার ভেতর অ্যাটাচড বাথরুম আছে। হাত মুখ ধুয়ে এসে খেয়ে নাও।'

সুজাতা বিব্রত হয়ে পড়ে। বলে, 'না না, আমি খেয়ে এসেছি।'

রণধীর ধমকের সুরে বলেন, 'খেয়ে এসেছ, বেশ করেছ। আর এক বার খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। আমি খাব, আর তুমি সামনে মুখ বুজে বসে থাকবে, সেটা কেমন দেখাবে? যাও বাথরুমে—'

সুজাতা তবু উঠল না, মুখ নামিয়ে বসে রইল।

রণধীর বললেন, 'আমার কথায় খেপে গেছ, বুঝতে পারছি। তার ঝালটা আমার ওপর ঝাড়তে পার। খাবারের ওপর রাগ করতে নেই। লুচি ঠাণ্ডা হলে জুতোর সুখতলা হয়ে যায়। ওঠ ওঠ, বাথরুমে যাও।'

অগত্যা উঠতেই হল সুজাতাকে।

কিছুক্ষণ পর খেতে খেতে রণধীর বললেন, 'তোমাকে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট জোগাড় করতে হবে না। কার কাছেই বা সার্টিফিকেটের জন্যে যাবে! বেশির ভাগ হারামজাদার পেছনে দশ বিশটা করে ছেঁদা। অথচ এরা সোসাইটির মাথায় চড়ে বসে আছে।'

লোকটাকে এখন আর ততটা উগ্র, খেঁকুরে মনে হচ্ছে না।

উত্তর না দিয়ে চুপচাপ খেতে লাগল সুজাতা।

খাওয়া শেষ করে চায়ের কাপ তুলে নিলেন রণধীর। সশব্দে চুমুক দিয়ে বললেন, 'ওই যে টেবলটা দেখছ, ওটার ড্রয়ারে রাইটিং প্যাড আর পেন আছে। নিয়ে এস।'

সুজাতারও খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। এখন তারও হাতে চায়ের কাপ। অবাক হয়ে সে রণধীরের মুখের দিকে তাকাল। এই মুহূর্তে প্যাড আর কলম আনানোর উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারছে না।

রণধীর মাঝখানে সামান্য নরম হয়েছিলেন। আবার পুরনো মেজাজে ফিরে গেলেন। তেরিয়া হয়ে বললেন, 'তোমাকে যদি চাকরিটা দিই, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কি বসিয়ে বসিয়ে তোমার চাঁদ বদন দেখব? কাজ করতে হবে না? তোমার ডিউটিতে কী কী পড়বে, সব টুকে নাও।'

বাকি চা এক চুমুকে শেষ করে প্যাড আর কলম নিয়ে এল সুজাতা।

রণধীর বললেন, ' আগে আমার সম্বন্ধে তোমাকে কিছু ইনফরমেশন দিতে চাই। তা হলে রণধীর মল্লিক লোকটা কী টাইপের তা খানিকটা অন্তত বুঝতে পারবে। আমার ব্যাপারে ক্লিয়ার একটা আইডিয়া করে নিতে পারলে কাজ করতে সুবিধে হবে।'

খানিকটা উদ্বেগ, খানিকটা আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকে সুজাতা। রণধীর শুরু করেন, 'আমি একজন উইডোয়ার। তিরিশ বছর হল আমার স্ত্রী মারা গেছে। ওই যে তার ছবি।'

সামনের দেওয়ালে সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো প্রচুর দামি দামি গয়না এবং বেনারসি-পরা এক পরম রূপসী মহিলার অয়েল পেন্টিং দেখালেন রণধীর। তারপর বলতে লাগলেন, 'আমার তিন ছেলে, এক মেয়ে। চারটেই শুয়োরের বাচ্চা—হাড়ে হারামজাদা—'

সুজাতা চমকে উঠল। কোনো বাবাকেই তার ছেলেমেয়ে সম্পর্কে এমন বাছা বাছা শব্দ প্রয়োগ করতে কখনও শোনেনি সে।

রণধীর বললেন, 'বড় ছেলেটা থাকে আমেরিকায়, মেজটা জার্মানিতে, ছোট ছেলেটা আর মেয়েটা

কলকাতাতেই থাকে। তাদের আমি বাড়িতে ঢুকতে দিই না।'

মনুষ্যসন্তান হয়েও কেন তাঁর ছেলেমেয়েরা শুয়োরের বাচ্চা, এই প্রশ্নটা করতে সাহস হল না সুজাতার।

নিজের সন্তানদের সঙ্গে রণধীর মল্লিকের সম্পর্ক কতটা সুমধুর তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তিনি তাদের ব্যাপারে আর কিছু বললেন না, একেবারে আলাদা প্রসঙ্গে চলে গেলেন।

এই বিশাল বাড়িতে রণধীর একাই থাকেন। কাজের লোক মোট তিনজন। যে মেয়েমানুষটি গেট খুলে সুজাতাকে তেতলায় নিয়ে এসেছে তার নাম মঙ্গলা। তার ওপর এ বাড়ির কিচেনের ভার। মঙ্গলা আসে সকাল সাড়ে আটটায়। চা-জলখাবার থেকে দুপুরের রান্না এবং রাতের রুটি বা লুচি-মাংস করে সন্ধে ছ'টায় চলে যায়। এ ছাড়া আছে আরো দু'জন—মহেশ আর দুলাল। মহেশের ডিউটি সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সন্ধে সাড়ে সাতটা। তার ডিউটির মধ্যে পড়ে বাজার করা, বাসন মাজা, ঘরদোর সাফ করা, কাপড় কাচা ইত্যাদি মোটা দাগের কাজ। দুলাল আসে দশটায়। তার ডিউটি বাড়ির বাইরে। রণধীর তাকে নানা জায়গায় পাঠান—ব্যাঙ্কে , পোস্ট অফিসে, ওষুধের দোকানে। টেলিফোন বিল, ইলেকট্রিসিটির বিল, কর্পোরেশনের ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স, ওয়েলথ ট্যাক্স—সব দুলালকেই জমা দিতে হয়। সে 'মল্লিক ভবন'-এ আসে এগারটায়, বাইরের কাজ টাজ সেরে বিকেল পাঁচটায় রণধীরের সঙ্গে দেখা করে সারাদিনে কী কী করল তার পুরো রিপোর্ট দেবার পর তার ছুটি।

পারতপক্ষে বাড়ির বাইরে বেরোন না রণধীর। দিনে দু'বার মাত্র তেতলা থেকে নিচে নামেন। কাজের লোকেদের ভেতর 'মল্লিক ভবন'-এ প্রথম আসে মহেশ। তখন গেটের তালা খুলে দিতে হয় রণধীরকে। সবার শেষে মহেশই যায়। তখনও তালা লাগিয়ে আসেন তিনি। পরে যারা কাজ করতে আসে তাদের জন্য তালা খোলার দায়িত্বটা মঙ্গলা এবং মহেশকে দেওয়া আছে।

রণধীর বললেন, 'আমার লাইফ এই সিস্টেমে চলছে।'

হতবাক সুজাতা ভাবছিল, একটা লোক যার বয়স সত্তরের ওপর, এই প্রকাণ্ড বাড়িতে কী করে একা রাত কাটায় কে জানে। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। কলকাতা শহরে চোর ডাকাতের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। অরক্ষিত একজন বৃদ্ধের পক্ষে এভাবে রাত কাটানো অত্যন্ত বিপজ্জনক। যে কোনো সময় চরম অঘটন ঘটে যেতে পারে।

রণধীর থামেন নি, 'আমার সম্বন্ধে আর একটা ইনফরমেশন দিচ্ছি। বছর চারেক আগে একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। ডাক্তাররা বলেছে, সেকেণ্ডটা হলে বাঁচার আশা কম। আমার সেভেন্টি ফোর চলছে। অ্যাভারেজ ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে অনেক দিন বেশি বেঁচে আছি। হুট করে যদি মরে যাই, কী আর করা যাবে। সে যাক, চাকরিটা যদি শেষ পর্যন্ত তুমি পেয়ে যাও, কী কী করতে হবে লিখে নাও—'

সুজাতা কলমের খাপ খুলে অপেক্ষা করতে লাগল।

রণধীর বলতে লাগলেন, 'এক নম্বর, আমাকে রোজ দু'খানা খবরের কাগজ আর বই পড়ে শোনাবে। দু নম্বর, আমি ডায়েরি লিখি। কিন্তু আঙুলের গাঁটে কিছুদিন ধরে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে, বোধ হয় বাত টাত। আমি ডিকটেশন দেব, তুমি লিখবে। তিন নম্বর, বহু খচ্চর লোক টেলিফোনে আমাকে জ্বালিয়ে মারছে। প্রত্যেকটা ফোন-কল অ্যাটেণ্ড করবে। তাদের নাম ধাম পারপাস জেনে আমাকে বলবে। যদি তেমন বুঝি আমি ওদের সঙ্গে কথা বলব।' ভুরু কুঁচকে খানিক চিন্তা করে আবার শুরু করলেন,'না, এখন আর কিছু মনে পড়ছে না। যদি কাজটা পাও, ভেবে দেখব তোমার ডিউটির মধ্যে আর কিছু পুরে দেওয়া যায় কিনা।'

প্যাড থেকে শিটটা খুলে ভাঁজ করে ব্যাগে পুরল সুজাতা।

রণধীর জিজ্ঞেস করলেন, 'বাড়িতে ফোন আছে কি?'

সুজাতা বলল, 'কী করে থাকবে। আমাদের আর্থিক অবস্থা কেমন, আগেই আপনাকে জানিয়েছি।'

'কনট্যাক্ট নাম্বার কিছু আছে?'

'আমাদের বাড়ির কাছাকাছি একটা ওষুধের দোকান আছে। ওখানে ফোন করলে আমাকে খবর দেয়।'

রণধীর বললেন, 'ওষুধের দোকানের নাম আর ফোন নাম্বার প্যাডের শিটে লেখ। তোমার আগে

যারা ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল তাদেরও ফোন বা কনট্যাক্ট নাম্বার লিখিয়ে নিয়েছি।'

সুজাতা লিখল।

রণধীর পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বার করে সুজাতার দিকে বাড়িয়ে বললেন, 'এটা নিয়ে একটা রসিদ লিখে দাও।'

কয়েক পলক বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে সুজাতা। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'কিসের টাকা?'

'যাতায়াত ভাড়া। অতদূর থেকে এসেছ, ফিরেও যেতে হবে। তার একটা খরচ আছে না?'

'আমি তো নিজের প্রয়োজনে এসেছি।'

'প্রয়োজনটা আমারও। তোমার যেমন চাকরি চাই, আমারও একজন এমপ্লয়ি দরকার। নিজের গাঁটের পয়সা খরচা করে কেউ ইন্টারভিউ দিতে আসুক, এটা আমি চাই না। তোমার আগে যাদের ডেকেছি তাদেরও গাড়িভাড়া দিয়েছি।'

তবু ইতস্তত করতে থাকে সুজাতা।

রণধীর খেঁকিয়ে ওঠেন, 'অত লজ্জা কিসের? প্রিপারেটরি স্কুলে পড়িয়ে আর টুইশনি করে ক'টা টাকা পাও—অ্যাঁ? তার থেকে বাজে খরচ করে ফুটানি দেখাতে চাইছ?'

সুজাতা ভয়ে ভয়ে বলে, 'আমার যাওয়া-আসার খরচ অত নয়।'

'না হোক।'

অগত্যা পঞ্চাশ টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করে রসিদ লিখে দিতে হল সুজাতাকে। সে বলল, 'এবার আমি যেতে পারি?' বলে সে উঠতে যাবে, রণধীর বললেন, 'একটা জিনিস দেখে যাও।'

উৎসুক সুরে সুজাতা জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

আগে সে লক্ষ করে নি, এবার দেখল, রণধীরের ইজিচেয়ারের পাশে ছোট ছোট, নিচু বেশ ক'টা সাইড টেবল রয়েছে। তার একটার ওপর পড়ে আছে একটা টেপ রেকর্ডার। সেটা তুলে নিয়ে রণধীর বললেন,'তুমি আর আমি এতক্ষণ যা কথাবার্তা বললাম, সব এতে রেকর্ড হয়ে গেছে। পরে দু'তিন বার মন দিয়ে শুনে তোমার সম্বন্ধে ডিশিসান নেব।'

সুজাতা একেবারে থ। কেউ যে এভাবে ইন্টারভিউ রেকর্ড করে রাখতে পারে, ভাবা যায় না। লোকটা যে কত বড় ধুরন্ধর তা রীতিমত টের পাওয়া যাচ্ছে। মনে করতে চেষ্টা করল, বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছে কিনা।

রণধীর মল্লিক বললেন, 'কথা হয়ে গেল। এবার যাও।'

দুই

সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে নিচে নেমে এল সুজাতা। চাবির গোছা নিয়ে মঙ্গলাও সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। সে গেটের তালা খুলে দিতেই বাইরে বেরিয়ে আসে সুজাতা। গেটটা ফের বন্ধ হয়ে যায়।

ন'টা বাজার কয়েক মিনিট আগে 'মল্লিক ভবন'-এ ঢুকেছিল। দূরে একটা উঁচু টাওয়ারের মাথায় বিশাল ঘড়িতে এখন এগারটা বেজে বত্রিশ। সূর্য প্রায় মাথার ওপর উঠে এসেছে। মার্চ মাসের রোদে ঝাঁঝ থাকলেও রাস্তার পিচ গলাবার মতো তীব্র নয়। তা ছাড়া সকাল বেলার সেই ঝড়ো হাওয়াটা এখনও বয়ে যাচ্ছে। তাই গরমটা তেমন অসহ্য লাগছে না।

দূরমনস্কর মতো বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে হাঁটতে সুজাতা ভাবছিল, 'মল্লিক ভবন'-এ আজ দারুণ একটা অভিজ্ঞতা হল। পুরো আড়াইটি ঘন্টা একটা অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া, রগচটা, তেরিয়া মেজাজের লোকের সঙ্গে কাটিয়ে এসেছে। এ ধরনের চরিত্র কোনো একটা বাংলা ফিল্মে দেখেছিল, কিংবা কোনো বিখ্যাত লেখকের গল্পে পড়েছে। লেখকের বা ফিল্মটার নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। নিজের চোখে অবশ্য এই প্রথম ওরকম একটা মানুষ দেখল। যে লোক নিজের ছেলেমেয়েদের শুয়োরের বাচ্চা বলে, মুখে যার কিছু আটকায় না, কথায় কথায় খেপে উঠে যে প্রায় কামড়াতে আসে, ভাগ্যের শিকে ছিঁড়ে চাকরিটা শেষ পর্যন্ত যদি হয়েই যায় —তার সঙ্গে দিনে দশ ঘন্টা কাটাতে হবে। সেটা প্রায় নরক যন্ত্রণার কাছাকাছি। এ সব মনে পড়তেই ভীষণ অস্বস্তি হতে থাকে সুজাতার। পরক্ষণে ভাবে, কাজটা যে হবে তার গ্যারান্টি কোথায়? আগে হোক, তারপর দেখা যাবে।

কাল সন্ধেবেলায় এই চাকরিটার ব্যাপারে সুজাতাদের বাড়িতে পারিবারিক সভা বসেছিল। মা, দুই ভাইবোন নান্টু আর ঝুনু তো ছিলই, বিজনকেও ডাকা হয়েছিল। বিজনের সঙ্গে আইনসঙ্গত সম্পর্ক এখনও গড়ে ওঠে নি, তবে সবাই তাকে এ বাড়ির একজন মনে করে।

সরকারি বা প্রাইভেট অর্গানাইজেশনের চাকরি নয়, একটা নিঃসঙ্গ বয়স্ক লোককে সঙ্গদান করতে হবে। লোকটা কেমন হবে—বদমাশ, লম্পট না সচ্চরিত্র, কিছুই আগেভাগে আঁচ করা সম্ভব নয়। সকলেরই আপত্তি ছিল। কেউ চায় নি, সুজাতা 'মল্লিক ভবন'-এ ইন্টারভিউ দিতে যাক। কলকাতা শহরে যুবতী মেয়েদের জন্য কত রকমের ফাঁদ পাতা রয়েছে। এটাও তেমন কিছু কিনা কে জানে। সবচেয়ে বেশি চেঁচামেচি করেছিল বিজন। নানা যুক্তি খাড়া করে বাধা দিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু কারো আপত্তি কানে তোলেনি সুজাতা। সে বুঝিয়েছে, রণধীর মল্লিক যখন চিঠি লিখে ডেকে পাঠিয়েছেন, একবার তাঁর সঙ্গে দেখাটা করাই যাক না। দিনকাল খুবই খারাপ, বিশ্বাস করার মতো মানুষের সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে, তাই বলে পৃথিবীর সব পুরুষই লম্পট, মেয়ে দেখলেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, এমনটা ভাবার কারণ নেই। কিছুক্ষণ কথা বললেই টের পাবে, লোকটার কোনো অভিসন্ধি আছে কিনা। মেয়েরা পুরুষদের চোখ দেখলেই তাদের ভেতরটা দেখতে পায়। এটা ওদের সহজাত ক্ষমতা। যদি রণধীর মল্লিককে ভাল মনে না হয়, কাজটা নেবে না। চার হাজার টাকার চাকরি তাকে দিচ্ছে কে? সুযোগ যখন এসেছে, একটা ঝুঁকি নিয়ে দেখাই যাক না। এত সব বোঝানোর পরেও খুঁতখুঁতুনি কাটে নি বিজনের।

বিজন যে কম্পিউটার সেন্টারে ট্রেনিং দেয় সেটা মৌলালির কাছাকাছি। আজ প্রিপারেটরি স্কুলে ছুটি। টুইশনেও যাবে না সুজাতা। হাতে অঢেল সময়। তা ছাড়া রণধীর মল্লিকের বাড়িতে প্রচুর লুচিটুচি খেয়েছে। এখন দু-তিন ঘন্টা পেটে কিছু না পড়লেও স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।

সুজাতা জানে, রণধীর সম্পর্কে বিজন মা নান্টু ঝুনু—সবাই খুব টেনশনে আছে। শিয়ালদায় গিয়ে আদর্শনগরের ট্রেন তো তাকে ধরতেই হবে। সেখান থেকে মৌলালি আর ক'পা। সে ঠিক করে ফেলল, বিজনের সঙ্গে আগে দেখা করবে, তারপর বাড়ি ফেরা।

রবিবার বিজনদের ট্রেনিং সেন্টার বন্ধ থাকে। কিন্তু কী একটা কারণে যেন আজ সেটা খোলা আছে—বিজনই তাকে তা জানিয়েছিল। তবে কারণটা মনে নেই।

একবার বাস পালটে মিনিট চল্লিশেকের ভেতর মৌলালি পৌঁছে গেল সুজাতা।

বিজনের কম্পিউটার সেন্টারটার নাম 'ফিউচার'। একটা হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ের পুরো ফার্স্ট ফ্লোর জুড়ে অফিস এবং কাচের পার্টিশন তুলে ছোট ছোট খোপের ভেতর ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা।

সুজাতা অফিসে ঢুকতেই রিসেপশনের স্মার্ট তরুণীটি একটু হেসে বলল, 'বসুন। বিজনদাকে খবর দিচ্ছি।' সুজাতাকে সে চেনে। আগেও বেশ কয়েক বার সে এখানে এসেছে।

গোটা ফ্লোরটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। সুজাতা একটা সোফায় বসে পড়ে। আরামদায়ক শীতলতায় তার গা জুড়িয়ে যায়।

রিসেপশনিস্ট মেয়েটি একজন বেয়ারাকে দিয়ে বিজনকে ডাকিয়ে আনে।

সুজাতা বলল, ' গ্রে স্ট্রিটের ব্যাপারটা মিটে গেল। ভাবলাম তোমার সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরব। চলে এলাম।' একটু থেমে মজার গলায় এভাবে শুরু করল, 'বুঝতে পারছি ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছ। ওখানকার রিপোর্টটা না পাওয়া পর্যন্ত টেনসন কাটবে না।'

বিজন বলল,'চল, বাইরে কোথাও গিয়ে বসা যাক—'

'কিন্তু তোমার এখানকার কাজকর্ম?'

'এক্ষুনি তেমন কিছু নেই। দেড়টায় তিন চারটে ট্রেইনি আসবে। তার আগে ফিরে এলেই হবে।'

অফিস থেকে বেরিয়ে ডান দিকে খানিকটা গেলে মোটামুটি ভদ্র রকমের একটা রেস্তোরাঁ। আলাদা বসার জন্য লাইন দিয়ে পর্দা-ফেলা ক'টা কেবিন। এই দুপুরবেলাতেও যথেষ্ট ভিড় রয়েছে। তবু একটা ফাঁকা কেবিন পাওয়া গেল।

ভেতরে ঢুকে বসামাত্র পর্দা সরিয়ে ছোকরা বয়ের আবির্ভাব।

বিজন জিজ্ঞেস করল, 'কী খাবে বল?'

সুজাতা বলল, 'আমি কিছুক্ষণ আগে খেয়েছি। এখন খিদে নেই। ওনলি টি।'

বিজন বলল, 'শুধু চায়ের অর্ডার দিলে দশ মিনিটের বেশি বসতে দেবে না।' বয়টাকে বলল, 'তাই না রে?'

বয়টা দাঁত বার করে হাসল। এরকম জোড়ায় জোড়ায় যুবক যুবতী প্রায়ই এখানে আসে। সে জানে, পর্দার আড়ালটা বেশ কিছুক্ষণের জন্য তাদের খুব দরকার।

বিজন বলল, 'দু প্লেট ফাউল কাটলেট, দু প্লেট ভেজিটেবল চপ আর চা। খাবার দেবার পর এক ঘন্টার ভেতর আর এদিকে ঘেঁষবি না।'

অর্ডার নিয়ে বয়টা চলে গেল।

সুজাতা জানে, খাব না বললেও শুনবে না বিজন। আপত্তি করে লাভ নেই। বলল, 'হঠাৎ এত নবাবী?'

বিজন বলল, 'অনেক দিন পর আমাদের অফিসে এলে। ভাল করে আপ্যায়ন না করলে চলে? সে যাক, এবার গ্রে স্ট্রিটের রিপোর্টটা দাও। ডিটেলে বলবে, কিচ্ছু বাদ দেবে না।'

ধীরে ধীরে খুঁটিনাটি সমস্ত বিবরণ দিয়ে গেল সুজাতা।

শোনার পর অনেকক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে বিজন। তারপর জিজ্ঞেস করে, ' লোকটাকে তোমার কেমন মনে হল?'

'আমি তোমাকে ফুল ডিটেল দিয়েছি। তার থেকে নিজেই ডিডিউস করতে চেষ্টা কর।'

'আমার তো মনে হচ্ছে, ভীষণ একসেনট্রিক, বদমেজাজি, সাম এক্সটেন্ট অ্যাবনরমাল।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে সুজাতা, 'অ্যাপারেন্টলি তাই মনে হয়। তবে মাত্র দু'ঘন্টায় একটা লোককে কতটুকু আর চেনা যায়?'

বিজন ভালমানুষের মতো মুখ করে বলল,'আসল কথাটা কিন্তু এখনও বল নি—'

বিজনের কিছু একটা মতলব আছে, সেটা আন্দাজ করে সুজাতা সতর্কভাবে বলল, 'কিসের আসল কথা?'

'যুবতী কম্পেনিয়ন চাইছে, তার ফিগারটা কেমন বোঝার জন্য থাবা বাড়ায় নি? কিংবা ধর, সেক্স টেক্স নিয়ে ইন্টিমেট একটু ডিসকাসন?'

মুখ লাল হয়ে ওঠে সুজাতার। সোজা উঠে দাঁড়ায় সে, 'মিচকে শয়তান কোথাকার!'

সুজাতার হাত ধরে বসিয়ে দিতে দিতে বিজন বলে, 'আরে বাবা, অত রাগ করছ কেন? ব্লাড প্রেসার চড়ে যাবে যে।'

সুজাতা ঝাঁঝাল গলায় বলে, 'ফের অসভ্যতা করলে আমি কিন্তু চলে যাব।'

বিজন বলে, 'অত মাথা গরম করলে চলে! ঠাট্টা টাট্টাও বোঝো না?'

সুজাতার মেজাজ এখনও উত্তপ্ত হয়ে আছে। সে বলল, 'এর নাম ঠাট্টা। জানো লোকটার বয়েস সেভেনটি প্লাস—'

'সেভেনটি প্লাস হলেই বুঝি পুরুষমানুষ ব্রহ্মচারী হয়ে যায়? ওই বয়সের লম্পটদের কথা কখনও শোন নি?'

'শুনব না কেন? তবে রণধীর মল্লিক আর যেমনই হোক এই ধরনের বদমাশ নয়।'

বিজন বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধরেই নিচ্ছি লোকটা মডার্ন শুকদেব। খুশি তো?'

সুজাতার রাগ পড়ে এসেছিল। সে বলল, 'একদম ইয়ার্কি করবে না।'

বয় ফাউল কাটলেট আর চপ দিয়ে গেল। জানাল, পরে চা নিয়ে আসবে।

খেতে খেতে বিজন বলল, 'নাউ আই অ্যাম ভেরি সিরিয়াস। কী ঠিক করলে বল?'

বুঝতে না পেরে সুজাতা জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যাপারে?'

'অমন একটা ভুতুড়ে বাড়িতে ওইরকম একটা বিদঘুটে বুড়োকে সঙ্গদানের চাকরিটা কি নেবে?'

'তুমি কি ধরে নিয়েছ, আমার চাকরিটা হয়েই গেছে? সবে তো কথাবার্তা বলে এলাম। মা নান্টু আর ঝুনু কী বলে শুনি। তুমি কী পরামর্শ দাও, দেখি। তা ছাড়া, সব চেয়ে যেটা বড় ব্যাপার সেদিকেই কিন্তু তোমার নজর নেই।'

'কী বল তো?'

সুজাতা বলল, 'রণধীর মল্লিক আগে আমাকে সিলেক্ট করুক, চাকরির অফার দিক। তারপর তো নেব কি নেব না সেই প্রশ্ন উঠবে।'

আস্তে মাথা নাড়ে বিজন, 'তা অবশ্য ঠিক।'

সুজাতা আর কিছু বলে না।

খাওয়া শেষ হলে বিল মিটিয়ে সুজাতাকে সঙ্গে করে বাইরে বেরিয়ে আসে বিজন। বলে, 'আজ তো তোমার অন্য কোনো কাজ নেই। ঘন্টাতিনেক আমাদের অফিসের রিসেপশনে ওয়েট করতে পারবে?'

সুজাতা বলল, 'কেন বল তো?'

'আমার কাজটা শেষ করে একসঙ্গে বাড়ি ফিরতাম।'

'না না, অতক্ষণ থাকতে পারব না। মায়ের এমনিতেই এই চাকরিটার ব্যাপারে আপত্তি ছিল। ফিরতে দেরি হলে ভীষণ চিন্তা করবে।'

'তা হলে আর আটকাব না। তুমি চলে যাও। সন্ধেবেলায় আমি তোমাদের বাড়ি যাব।'

ফুটপাথ ধরে খানিকটা এগিয়ে বিজন তার অফিসে ঢুকে পড়ল। আর সুজাতা শিয়ালদা স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগল।

আদর্শনগর স্টেশনে সে যখন এসে নামল, আড়াইটা বেজে গেছে। এখান থেকে তাদের বাড়ি বেশি দূরে নয়। হেঁটেই যাওয়া যায়।

কিন্তু চড়া রোদে আজ আর হাঁটতে ইচ্ছা করছে না। তা ছাড়া যাতায়াত ভাড়া বাবদ রণধীর মল্লিকের কাছ থেকে নগদ পঞ্চাশটা টাকা পাওয়া গেছে। যাওয়া আসায় তার খরচ যোল টাকা। এক্সট্রা চৌত্রিশ টাকা তার লাভ। কাজেই সাইকেল রিকশায় চড়ার বিলাসিতাটা আজ করা যেতেই পারে।

সুজাতাদেব বাড়ির খুব কাছে একটা চৌরাস্তার মোড়। সেখানে এসে ভাড়া মিটিয়ে রিকশা থেকে নেমে পড়ল সে। এখানেই আদর্শনগরের সবচেয়ে বড় ওষুধের দোকান 'লীলাবতী ফার্মেসি'। ওখানে যেতেই দোকানের মালিক যজ্ঞনাথ চাকলাদারকে দেখা গেল। ক্যাশ কাউন্টারের সামনে গদি-আঁটা চেয়ারে বসে আছেন। বয়স ষাটের কাছাকাছি। নাড়ুগোপাল মার্কা চেহারা। টকটকে ফর্সা রং। মাথা জোড়া বিশাল টাক ঘিরে কাঁচাপাকা চুলের রেলিং। চোখে গোল বাইফোকাল চশমা। দুহাতে পলা মুক্তো পোখরাজ এবং গোমেদ বসানো চার চারটে আংটি। পরনে সাদা ধবধবে ধুতির ওপর হাফ-হাতা সাদা পাঞ্জাবি। সকাল ন'টা থেকে একটা, তারপর দুটো থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত তাঁকে এই পোশাকে ওই চেয়ারটায় বসে থাকতে দেখা যায়।

যজ্ঞনাথ ছাড়া মাঝবয়সী কর্মচারি আছে দু'জন—কার্তিক নস্কর এবং নবগোপাল সামন্ত। তারা কাস্টমারদের ওষুধ বার করে দেওয়া, ক্যাশমেমো লেখা—এই সব করে থাকে। ক্যাশমেমো মিলিয়ে টাকা গুনে নেওয়াটা যজ্ঞনাথের একমাত্র কাজ।

যজ্ঞনাথ সুজাতার বাবা পরলোকগত যদুপতি ধরচৌধুরির বন্ধু। মানুষটা ভাল, স্নেহপ্রবণ। নিয়মিত সুজাতাদের খোঁজখবর নেন। অনেক বার টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্যের কথা বলেছেন। কিন্তু সুজাতার মা হাতজোড় করে সবিনয়ে বলেছেন, 'দাদা, এখন থাক। আপনি তো মাথার ওপর রইলেনই। যখন দরকার হবে, আপনার কাছে ছাড়া আর কারো কাছে তো হাত পাতার জায়গা নেই।' আসলে মহিলার আত্মসম্মান বোধটা খুবই প্রখর। পারতপক্ষে অন্যের সাহায্য নিতে চান না।

'লীলাবতী ফার্মেসি'তে এই দুপুর আড়াইটাতেও মোটামুটি ভিড় রয়েছে। ওষুধের দাম হিসেব করে নিতে নিতে সুজাতাকে দেখতে পেয়েছিলেন যজ্ঞনাথ। হাত তুলে তাকে অপেক্ষা করতে বললেন।

মিনিট পাঁচ সাতের ভেতর ভিড় ফাঁকা হয়ে গেলে কাছে ডেকে যজ্ঞনাথ সুজাতাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে, আজ ছুটির দিনে কোথায় গিয়েছিলি?' সুজাতাদের নাড়িনক্ষত্রের সব খবর তাঁর জানা। তিনি ভাল করেই লক্ষ করেছেন, সোম থেকে শনি, সপ্তাহের এই ছ'দিন প্রিপারেটরি স্কুলে পড়ায় সুজাতা, প্রাইভেট টুইশনি করে। কিন্তু রবিবার পারতপক্ষে বাড়ি থেকে বেরোয় না। ছুটির দিনটা

মা আর ভাইবোনদের সঙ্গে কাটায়। আজ তাকে রাস্তায় দেখে একটু অবাকই হয়েছেন যজ্ঞনাথ।

সুজাতা জানাল, একটা ইন্টারভিউ দিয়ে আসছে।

যজ্ঞনাথ বললেন, 'বা, চাকরিটা হয়ে গেলে খুব ভাল হয়। তা আমার কাছে কিছু দরকার আছে?'

'হ্যাঁ। যিনি ইন্টারভিউ নিয়েছেন তিনি একটা কনট্যাক্ট ফোন নাম্বার চেয়েছিলেন। আমি এখানকার নাম্বারটা দিয়েছি। যদি আমাকে ফোনে ডেকে দিতে বলেন, বাড়িতে খবরটা দেবেন।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'আমি তাহলে যাই।'

'আচ্ছা—'

সুজাতা ওষুধের দোকান থেকে বেরিয়ে নিজেদের বাড়ি চলে এল। ঠাকুরদার আমলে তৈরি পুরনো আমলের ছিরিছাঁদহীন দোতলা। একতলায় খানতিনেক ঘর, দোতলায় দুটো। বাবা বেঁচে থাকতে শেষ রং করা হয়েছিল। তারপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। দেওয়ালে এখন কালচে ছোপ, অনেক জায়গায় পলেস্তারা খসে পড়েছে। রেন-ওয়াটার পাইপ ভাঙাচোরা, বর্ষায় হুড় হুড় করে জল পড়ে চারপাশ ভাসিয়ে দেয়। রিপেয়ার করার পয়সা কোথায়?

কড়া নাড়তে দরজা খুলে দিল তার মা নিরুপমা। বয়স পঞ্চান্ন। একসময় বেশ সুন্দরীই ছিলেন। স্বামীর অকালমৃত্যু, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, অভাব অনটন—সব মিলিয়ে শরীর ভেঙে গেছে। পরনে আধময়লা সরু কালো-পাড় শাড়ি আর কনুই পর্যন্ত ব্লাউজ।

সদর দরজার পর ইট-পাতা উঠোন। তারপর মূল বাড়িটা। উঠোন যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দু ধাপ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলে টানা চওড়া বারান্দা ঘেঁষে সারি সারি ঘর। বারান্দায় নান্টু আর ঝুনুকে দেখা গেল। নান্টু আদর্শনগর হাই স্কুলে ক্লাস ইলেভেনে পড়ে, ঝুনু পড়ে এখানকারই কলেজে, বি. এ ফার্স্ট ইয়ারে।

নিরুপমা বললেন, 'আয়। তোর জন্যে খুব চিন্তা হচ্ছিল। নান্টু আর ঝুনু সমানে ঘর-বার করছে। নান্টু তো দু বার স্টেশনেও গিয়েছিল।'

তার জন্য ভাইবোনের উদ্বেগটুকু ভাল লাগল সুজাতার। একটু হেসে সে বাড়ির ভেতর ঢুকল। নিরুপমা দরজা বন্ধ করে মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় উঠে একতলার বসার ঘরে চলে এলেন। এখানে রয়েছে খান চারেক সস্তা চেয়ার, টেবল আর একধারে সুজনি-পাতা একটা তক্তপোষ। ঝুনু আর নান্টুও পেছন পেছন এসেছে।

সুজাতা একটা চেয়ারে বসে পড়ল। দুই ভাইবোনের উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার জন্যে খুব টেনসন হচ্ছিল বুঝি? কী ভেবেছিলি, দিদি আর ফিরবে না? বুড়ো লোকটা আমাকে গিলে খেয়ে ফেলবে?'

ঝুনু বলল, 'লোকটা কিরকম কে জানে। আমাদের ভাবনা হবে না? ওখানে কী হল বল—'

নিরুপমা বললেন, 'পরে শুনিস। রুনু সেই সকালে বেরিয়ে এই এল। ক্লান্ত হয়ে আছে।' সুজাতাকে বললেন, 'একটু জিরিয়ে স্নান করে নে। সবাই একসঙ্গে খেতে খেতে শোনা যাবে।'

সুজাতা বলল, 'সে কী, তোমরা এখনও খাও নি!'

'না। তোকে ফেলে কী করে খাই?'

'যাও যাও, খেয়ে নাও। আমি এখন কিছু খাব না। পেট ভরা আছে।'

নিরুপমা জিজ্ঞেস করলেন, 'পেটটা ভরল কী করে? কোথায় খেলি?'

সুজাতা জানায়, রণধীর মল্লিক তাকে প্রচুর লুচিটুচি খাইয়েছেন। আসার পথে বিজনের সঙ্গে দেখা করেছে। সেও রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে খাইয়েছে।

নিরুপমা বললেন, 'যাই খাও, দুপুরবেলা পেটে দুটো ভাত না পড়লে কি চলে?'

সুজাতা বুঝতে পারছিল, না খেলে নিরুপমারা ছাড়বেন না। তার আর ভাল করে জিরানো হল না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। সকালে স্নান করে বেরিয়েছিল। কিন্তু ট্রেনে বাসে এতটা রাস্তা যাতায়াতের কারণে ঘামে ধুলোয় ধোঁয়ায় সারা গা চটচট করছে। আর একবার স্নান না করলেই নয়।

সুজাতাদের রান্নাঘর এবং খাবার ব্যবস্থা একতলায়। স্নান টান সেরে শাড়ি জামা-টামা পালটে ভাইবোন এবং মায়ের সঙ্গে খেতে বসে গেল সুজাতা। খেতে খেতে রণধীর মল্লিকের সঙ্গে তার যা যা কথা হয়েছে সব বলল। বিজনকেও তা-ই বলে এসেছে সে।

সমস্ত শোনার পর বিজনের মতো তিনজনেরই প্রশ্ন, অমন একটা লোককে সারাদিন সঙ্গদানের কাজটা নেওয়া উচিত হবে কিনা।

বিজনের মতো নিরুপমারাও প্রায় ধরেই নিয়েছেন, চাকরিটা বুঝি তার হয়েই গেছে। এই নিয়ে বিজনের সঙ্গে তার অনেক কথা হয়েছে। নতুন করে সে সব আর বলতে ইচ্ছা করছে না। সুজাতা বলল, 'বিজন কম্পিউটার সেন্টারের ক্লাস নেবার পর সন্ধেবেলা আমাদের বাড়ি আসবে। তখন একসঙ্গে বসে ব্যাপারটা ঠিক করা যাবে।'

খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে দোতলায় তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল সুজাতা। সারা শরীরে অসীম ক্লান্তি জড়িয়ে ছিল। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু চোখ জুড়ে এল।

ঘুম ভাঙল সন্ধের আগে আগে। বাথরুম থেকে মুখ টুখ ধুয়ে সুজাতা সবে বেরিয়েছে, বিজন এল।

রণধীর মল্লিকের বাড়িতে ইন্টারভিউ দিতে যাবে কি যাবে না সেটা স্থির করতে আগে একবার নিরুপমার ঘরে সভা বসেছিল। আজও সেখানেই বসল।

চা খেতে খেতে নানা দিক খুঁটিয়ে দেখার পর স্থির হল, চাকরিটা শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেলে নেওয়াই উচিত। সুযোগটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে এত বছর তো কত ছোটাছুটি করেছে কিন্তু কিছু কি জুটল?

বিজন বলল, 'তোমার স্কুলের কী হবে?'

অত্যন্ত দুঃসময়ে প্রিপারেটরি স্কুলের হেড মিস্ট্রেস অমিতাদি কাজটা সুজাতাকে দিয়েছিলেন। সে জন্য তাঁর কাছে সে কৃতজ্ঞ। কিছুদিন হল, নতুন বছরের ক্লাস শুরু হয়েছে। এই সময় কাজটা ছেড়ে দিলে অমিতাদি ভীষণ অসুবিধায় পড়ে যাবেন। শিক্ষিকা হিসেবে সুজাতা খুবই জনপ্রিয়, যত্ন করে বাচ্চাদের পড়ায়। তার জায়গায় একজন ভাল কাউকে চট করে পাওয়াও মুশকিল। সুজাতাকে চিন্তিত দেখায়। বলে, 'এই ব্যাপারটা খেয়াল করি নি। কী করা যায় বল তো?'

খানিকক্ষণ ভেবে বিজন বলল, 'লুকোবার দরকার নেই। হেড মিস্ট্রেসকে কাল স্কুলে গিয়ে বলল একটা চাল পেতে যাচ্ছ। কাজটা হলে আপাতত মাসখানেকের ছুটি চাইবে। যদি বোঝ, রণধীর মল্লিকের চাকরিটা ভাল লাগছে তখন স্কুলের কাজটা ছেড়ে দেবে। অমিতাদিকে তো ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছ। ভীষণ ভাল মানুষ, সিমপ্যাথেটিক। আমার মনে হয় না, উনি আপত্তি করবেন।'

সুজাতা বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ। রণধীর মল্লিকের চাকরিটা পাওয়ামাত্র স্কুলের কাজ ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। অমিতাদি আশা করি আমাকে ছুটি দেবেন।'

ঝুনু বলল, 'অমিতাদি না হয় ছুটি দেবেন, তোর টুইশনিগুলোর কী হবে?'

সেই বিকেল থেকে রাত আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত তিনটে টুইশনি করে সুজাতা। রণধীর মল্লিকের কাজটা নিলে সন্ধে সাতটায় ছুটি। আদর্শনগরে ফিরতে ফিরতে ন'টা। তখন কি আর ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পড়ানো সম্ভব?

সুজাতা বলে, 'এই আর এক সমস্যা। টুইশনিগুলো ছেড়ে দিতে হবে। ওদের গার্জেনরা অমিতাদির মতো ছুটি দেবে না।'

ঝুনু বলল, 'সবগুলো ছাড়তে হবে না।'

বুঝতে না পেরে সুজাতা জিজ্ঞেস করে, 'মানে?'

'তুই তো ক্লাস ফোর আর সিক্সের দুটো মেয়েকে, আর ক্লাস টেনের একটা ছেলেকে পড়াস।'

'হ্যাঁ। তাতে কী হল?'

ঝুনু বলল, 'ফোর আর সিক্সের মেয়েদু'টোকে আমি পড়িয়ে দিতে পারব। ওদের মা-বাবার কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে কথা বলিয়ে দিস। তবে টেনের স্টুডেন্টকে পড়ানোর মতো বিদ্যে আমার নেই।

ওটা তোকে ছাড়তে হবে।'

ঝুনু সকালে বিকেলে দুটো টুইশনি করে। নিজের কলেজের মাইনে, জামা কাপড়ের খরচ, সবই সেই টাকায় চলে। তার থেকে বাঁচিয়ে সংসার খরচের জন্য মাকেও কিছু দেয়। সুজাতা বলল, 'তোর নিজেরও তো দুটো স্টুডেন্ট আছে। তা ছাড়া কলেজে রেগুলার ক্লাস করতে হয়। এর ওপর যদি আমার টুইশনি দুটো নিস, পড়াশোনার সময় পাবি কী করে?'

ঝুনু বলল, 'তুমি চিন্তা করো না দিদি। আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব।'

তিন

রণধীর মল্লিকের সঙ্গে দেখা করে আসার পরদিন স্কুল গিয়ে অমিতাদি অর্থাৎ অমিতা বসুরায়ের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছে সুজাতা। তিনি আপত্তি করেন নি, বরং খুশি হয়েই বলেছেন, 'আমি তো তোমাকে তেমন কিছু দিতে পারি না। বেটার অফার যখন এসেছে, আটকে রাখব না। এক মাসের ছুটি তুমি পেয়ে যাবে। ওখানে না পোষালে আমার দরজা সবসময় তোমার জন্যে খোলা থাকবে।'

ফোর আর সিক্সের ছাত্রী দুটির বাড়িতেও ঝুনুকে নিয়ে গিয়েছিল সুজাতা। তার জায়গায় ঝুনু পড়ালে ওদের অভিভাবকদের আপত্তি নেই। তবে ক্লাস টেনের ছাত্রটির বাড়ি এখনও কিছু জানায় নি। চাকরিটা পেয়ে গেলে ছেড়ে দেবার কথা বলবে।

বেশ কয়েক দিন কেটে গেল।

এর মধ্যে রণধীর মল্লিকের দিক থেকে কোনোরকম সাড়াশব্দ নেই। লোকটা সম্পর্কে সংশয় এবং ভীতি থাকলেও চাকরির ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্দীপনা কাজ করছিল সুজাতার মধ্যে। রোজ দু বেলা স্কুলে যাতায়াতের পথে 'লীলাবতী ফার্মেসি'তে খোঁজ নিয়েছে, রণধীরের কোনো ফোন এসেছে কিনা।

যজ্ঞনাথ হেসে হেসে বলেছেন, 'আরে বাপু, আমার খেয়াল আছে। ফোন আসামাত্র খবর পেয়ে যাবি।'

যোগাযোগ না করায় আলোর ঝলকের মতো যে আশাটা দেখা দিয়েছিল তা ক্রমশ মিলিয়ে যেতে থাকে। না, কিছুই হবে না। কে জানে বাকি জীবনটা প্রিপারেটরি স্কুলে পড়িয়ে আর টুইশনি করে কাটিয়ে দিতে হবে কিনা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইচ্ছাপূরণটা হয়েই গেল।

আজ রবিবার। ছুটির দিন। সপ্তাহের এই দিনটা অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় সুজাতা। আজও তার হেরফের হয়নি। পৌনে ন'টায় বিছানা ছেড়ে মুখ টুখ ধুয়ে চায়ের কাপ নিয়ে সবে বসেছে, 'লীলাবতী ফার্মেসি'র নবগোপাল সামন্ত হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির।

নবগোপালরা এই শহরে বহুদিন ধরে আছে। প্রায় তিন চার পুরুষ। সুজাতাকে সে জন্মাতে দেখেছে। ব্যস্তভাবে বলল, 'শীগ্‌গির চল। তোমার ফোন।'

রণধীর মল্লিক ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না। কেননা তার আত্মীয়স্বজনরা বেশির ভাগই আদর্শনগরে বা আশেপাশের শহরে থাকে। তাদের কোনো দরকার থাকলে সোজা বাড়ি চলে আসে। এম. এ পড়ার সময় কলকাতায় কিছু বন্ধুবান্ধব হয়েছিল। ওদের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি যে এতদিন পর ফোন করবে। তা ছাড়া 'লীলাবতী ফার্মেসি'র ফোন নাম্বার সে তাদের কাউকে দেয়ও নি। মাঝে মধ্যে জরুরি কোনো কারণ ঘটলে বিজন কলকাতা থেকে ফোন করে। কিন্তু আজ তারও ছুটির দিন, কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার বন্ধ।

চায়ের কাপ ফেলে কোনোরকমে পায়ে স্লিপার গলিয়ে বাসি জামা কাপড়েই ছুটল সুজাতা। 'লীলাবতী ফার্মেসি' রবিবার খোলা থাকে। ওদের ছুটি বৃহস্পতিবারে।

'লীলাবতী ফার্মেসি'তে এসে ফোন তুলতেই রণধীর মল্লিকের ভাঙা, কর্কশ গলা ভেসে আসে, 'তোমার জন্যে কতক্ষণ ফোন ধরে বসে আছি।'

সুজাতা ভয়ে ভয়ে বলে, 'আমাদের বাড়ি খানিকটা দূরে তো। আপনার ফোনের খবর পেয়ে সেখান থেকে—'

'থাক থাক, অত ব্যাখ্যা করতে হবে না।' সুজাতাকে থামিয়ে দিয়ে রণধীর বলেন, 'কাজের কথায় আসা যাক। আমার এখানে কালই জয়েন কর।'

রণধীর যখন ফোন করেছেন তখন সুজাতা ধরেই নিয়েছিল চাকরিটা তার হয়ে গেছে। কিন্তু কালই জয়েন করতে হবে, ভাবতে পারেনি। স্কুলে এবং যে সব বাড়িতে টুইশনি করে, তাদের জানিয়ে রাখলেও ফের দেখা করে বলতে হবে, কোন তারিখ থেকে সে পড়ানোর কাজ ছেড়ে দিয়ে নতুন চাকরিতে যোগ দিচ্ছে।

সুজাতা বলল, 'আমাকে কাইগুলি চারটে দিন সময় দিন।'

রণধীর টেলিফোনে মুখ ঢুকিয়ে খেঁকিয়ে ওঠেন, 'তোমার কী এমন রাজকার্য যে কাল জয়েন করতে পারবে না? পড়াও তো কোথাকার কোন ওঁচা স্কুলে আর টুইশনি কর। ক'পয়সা দেয় তারা? কাল ন'টায় আমাদের বাড়িতে তোমায় দেখতে চাই।'

'কিন্তু—'

'কাজে ঢোকার আগেই এত ফ্যাচাং বাধাচ্ছ কেন—অ্যাঁ?'

কেন তার একটু সময় দরকার, অনেক কাকুতিমিনতি করে শেষ পর্যন্ত রণধীর মল্লিককে বোঝাতে পারল সুজাতা। তবে নিজের গোঁ পুরোপুরি ছাড়লেন না রণধীর। মাত্র একটা দিন কমাতে রাজি হলেন। বললেন, 'তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার টাইপ করিয়ে রাখছি। যেদিন জয়েন করবে সেদিন হাতে হাতে পেয়ে যাবে।'

চার

শুক্রবার রণধীর মল্লিকের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তিনদিন পর মঙ্গলবার সকাল ন'টার ক'মিনিট আগেই 'মল্লিক ভবন'-এ পৌঁছে গেল সুজাতা।

সেদিনের মতোই কলিং বেল টিপলে মঙ্গলা গেট খুলে দিল। বাড়ির ভেতর ঢুকে তার সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে সুজাতা লক্ষ করল, একটা মাঝারি হাইটের আধাবয়সী লোক লম্বা ঝাড়ু চালিয়ে দোতলার হল-ঘর সাফ করছে। মোটা মোটা হাড়ের ফ্রেমে তার দারুণ মজবুত স্বাস্থ্য। চুল মাথার চামড়া ঘেঁষে ছোট ছোট করে ছাঁটা। চৌকো ধরনের মুখ। রং তামাটে। পরনে সস্তা দামের খাটো হাফ প্যান্ট আর ফতুয়া এবং হাফ শার্টের মাঝামাঝি একটা ডোরাকাটা সবুজ জামা।

পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে তাকায় লোকটা। দেখে মনে হয় তেমন চালাকচতুর নয়—সাদাসিধে, সরল। একমুখ হেসে বলে, 'আমি মহেশ—'

সেটা আগেই আন্দাজ করে নিয়েছিল সুজাতা। বলল, 'তোমার কথা আমি শুনেছি।'

'আপনার কথাও আমি শুনেচি। আপনি তো আমাদের নতুন কাজের দিদিমণি।' বলে শান্ত, কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে থাকে মহেশ।

'কাজের দিদিমণি—' শব্দ দুটো খট করে সুজাতার কানে সজোরে ধাক্কা দেয়। কী ভেবেছে লোকটা? সেও তাদের সমগোত্রীয়? যে উষ্মা বা অস্বস্তিটা তাকে খোঁচা দিচ্ছিল, পরক্ষণে সেটা মিলিয়ে যায়। সত্যিই তো, সে তাদের মতোই কাজের মেয়ে—একটু উঁচু স্তরের, মাইনেটা হয়তো বেশি। এ ছাড়া তফাত কোথায়?

সুজাতা উত্তর দিল না। একটু হেসে মঙ্গলার পেছন পেছন সিঁড়ি ভাঙতে লাগল।

তেতলায় এসে সেদিনের মতোই দেখা গেল রণধীর মল্লিক তাঁর বিশাল ইজিচেয়ারে আধ-শোওয়া মতো হয়ে আছেন। পাশের ছোট ছোট নিচু টেবলগুলোর কোনোটার ওপর খবরের কাগজ, কোনোটায় টেলিফোন এবং অন্যান্য কাগজপত্র। এই ইজিচেয়ারটাকে খুব সম্ভব দিনের বেলায় অনন্তশয্যা করে নিয়েছেন রণধীর। সুজাতাকে দেখে হাতের ভর দিয়ে উঠে বসলেন। বললেন, 'বসো—' বলে সামনের একটা সোফা দেখিয়ে দিলেন।

সুজাতা রণধীরের দিকে চোখ রেখে বসে পড়ে। যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ত, ট্রেনে কি বাসে যাতায়াত করত সুজাতা। সেই অভ্যাসটা ক'বছর হল নষ্ট হয়ে গেছে। আদর্শনগর থেকে নর্থ ক্যালকাটায় আসতে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কপালে গলায় দানা দানা ঘাম জমেছে, রুমাল দিয়ে মুছে ফেলল সে।

রণধীর বললেন, 'মিনিট পনের রেস্ট নিয়ে নাও। তারপর কাজ শুরু করবে।'

সুজাতা শশব্যস্তে বলে, 'না না, রেস্টের দরকার নেই।'

উত্তর না দিয়ে তীব্র চোখে তার দিকে তাকান রণধীর। তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

এই ধরনের একটা বিদঘুটে লোকের মুখোমুখি চুপচাপ পনের মিনিট বসে থাকা ভীষণ অস্বস্তিকর। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কী সুজাতার?

ঠিক পনের মিনিট বাদে রণধীর পাশের একটা টেবল থেকে একটা লম্বা খাম তুলে সুজাতাকে দিতে দিতে বললেন, 'তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। পড়ে নাও—'

কাঁপা হাতে খাম খুলে একটা টাইপ-করা কাগজ এবং সেটার জেরক্স কপি বার করল সুজাতা। তাতে লেখা আছে মাসিক সাড়ে চার হাজার টাকায় সুজাতা ধরচৌধুরিকে বহাল করা হল। বছরে এক শ টাকা করে ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হবে। এক বছর সন্তোষজনকভাবে কাজ করলে ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্স এবং যাতায়াত ভাড়া দেবার কথা বিবেচনা করা হবে। সপ্তাহে রবিবার সম্পূর্ণ ছুটি। বছরে ক্যাজুয়াল লিভ পনের দিন, মেডিকেল লিভ পনের দিন। এর বাইরে কামাই করলে টাকা কাটা যাবে।

এ একেবারে আশাতীত। পাঁচ শ টাকা মাইনেই শুধু বাড়িয়ে দেননি রণধীর, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যা দিতে চেয়েছেন তা স্বপ্নেও ভাবেনি সুজাতা।

ভুরু কুঁচকে লক্ষ করছিলেন রণধীর। বললেন, 'খুশি তো?'

সুজাতার চোখেমুখে কৃতজ্ঞতা ফুটে বেরোয়। ভেতরে ভেতরে এক ধরনের উদ্দীপনা টের পাচ্ছিল সে। বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনি আমাদের ফ্যামিলিটাকে বাঁচিয়ে দিলেন।'

'অত আমড়াগাছি করার দরকার নেই। জেরক্স কপিটায় অ্যাকনলেজড অ্যান্ড আকসেপ্টেড লিখে সই করে আমাকে দাও।'

তৎক্ষণাৎ সুজাতা তাই করে। রণধীর কপিটা নিয়ে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে একটা টেবলে রাখেন।

মঙ্গলা ব্রেকফাস্ট আর চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে আসে। রণধীর তাকে বলেন, 'মহেশ বাজার থেকে ফিরে এসেছে?'

মঙ্গলা বলে, 'হ্যাঁ, অনেকক্ষণ। দোতলায় ঝাড়াঝুড়ি করচে।'

রণধীর বললেন, 'ওকে মিনিট পনের বাদে এখানে পাঠিয়ে দিবি।'

'আচ্ছা—' মঙ্গলা চলে যায়।

রণধীর এবার সুজাতাকে বললেন, 'খাও। তারপর কাজ শুরু করবে।'

আগের দিন ব্রেকফাস্টে ছিল লুচি-তরকারি। আজ টোস্ট, কলা, হাফ-বয়েলড ডিম। এ বাড়িতে খুব সম্ভব সকালবেলার খাবারটা রোজ বাঁধাধরা একরকম হয় না।

খাওয়া শেষ হলে ডান পাশের দেওয়াল ঘেঁষে বইপত্রে ঠাসা যে আলমারিগুলো দাঁড় করানো রয়েছে সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে রণধীর সুজাতাকে বললেন, 'মাঝখানের ওই আলমারিটা খুলে সেকেণ্ড তাকের একেবারে ডান পাশের খাতাটা নিয়ে এস।'

সুজাতা উঠে গেল। দূর থেকে দ্বিতীয় তাকে যেগুলোকে বই বলে মনে হয়েছিল, আসলে সেগুলো বইয়ের আকারে বাঁধানো মোটা মোটা খাতা।

নির্দিষ্ট খাতাটি নিয়ে ফিরে আসে সুজাতা। আর তখনই মহেশ এসে হাজির।

রণধীর বললেন, 'খাতাটা খুলে পাতা উলটে যাও।'

সুজাতা তাই করতে লাগল। লক্ষ করল, প্রতিটি পাতার মাথায় তারিখ দিয়ে সেই দিনের যাবতীয় খরচের খুঁটিনাটি বিবরণ লিখে রাখা হয়েছে। কাল পর্যন্ত এই হিসেব রয়েছে। তারপর থেকে সব পাতা সাদা। সুজাতা আন্দাজ করল, প্রতিদিনের খরচের হিসেব লিখে রাখাটা রণধীরের অভ্যাস।

রণধীর বললেন, 'কালকের পরের পাতায় আজকের ডেট দাও। তারপর মহেশ যা বলবে লিখে নেবে।'

সুজাতা তারিখটা লিখল।

এবার রণধীর মহেশের দিকে তাকিয়ে কর্কশ গলায় বললেন, 'কী বাজার করেছিস বল—'

গড় গড় করে নামতা পড়ার মতো মহেশ বলতে লাগল, 'কাটা পোনা এক কিলো আশি টেকা, পাবদা হাফ কিলো ষাট টেকা, মুরগির মাংস এক কিলো ষাট টেকা—' এইভাবে এক এক করে আনাজপাতির নাম ওজন এবং দাম বলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে টুকে নিতে লাগল সুজাতা। যোগ দিয়ে দেখা গেল খরচ সবসুদ্ধ তিনশ আশি টাকা।

রণধীর জিজ্ঞেস করলেন, 'যা দাম বললি ঠিক তো? নাকি সত্তর টাকার মাছ এনে আশি টাকা বলছিস?'

কানে হাত দিয়ে জিভ কেটে মহেশ বলল, 'বড়বাবু, আপনার সন্‌গে তঞ্চকতা করতে পারি! এত বড় বুকের পাটা আমার লেই।'

সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় মহেশকে খুব শান্ত আর নিরীহ মনে হয়েছিল। বাছুরের মতো নিষ্পাপ চোখ লোকটার। সুজাতার কেমন যেন খটকা লাগে, বাইরে থেকে মহেশকে যা দেখা যাচ্ছে, আসলে সে তা নয়। ভেতরে ভেতরে লোকটা অত্যন্ত ধড়িবাজ।

রণধীর বললেন, 'ওজন ঠিকঠাক এনেছিস? নাকি কিলোয় একশ দেড়শ গ্রাম করে কম?'

কানে হাত দিয়েই দাঁড়িয়ে আছে মহেশ। বলল, 'বড়বাবু, আপনি আমার মা-বাপ। আমায় খাইয়ে পরিয়ে বাঁচায়ে রেখিছেন। আপনারে ঠকালি সিদে লরকে যেতি হবে।'

রণধীর খেঁকিয়ে ওঠেন, 'ব্যাটা হারামজাদা, একেবারে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। শোন, নতুন দিদিমণি এসেছে। যদি টের পাই ঠকাচ্ছিস, তাকে তোর সঙ্গে বাজারে পাঠাব। ধরা পড়লে ঘাড়ে লাথি মেরে বাড়ি থেকে বার করে দেব।'

সচকিত মহেশ ঘাড় ফিরিয়ে দ্রুত সুজাতাকে দেখে নেয়। তারপর কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'বড়বাবু, সতের বচ্ছর আপনার নুন খাচ্চি, নেমকহারামি কি করতে পারি?'

রণধীর সুজাতাকে বললেন, 'তিন শ আশি টাকার বাজার এনেছে। তার টু পারসেন্ট কত হয়?'

সুজাতা মনে মনে হিসেব কষে বলল, 'সাত টাকা ষাট পয়সা।'

রণধীরের পাশে একটা সাইড টেবলে অনেকগুলো পাঁচ টাকা দশ টাকার নোট আর এক টাকা দু টাকার কয়েন এবং প্রচুর রেজগি থাক দিয়ে সাজানো রয়েছে। সেখান থেকে গুনে গুনে সাত টাকা ষাট পয়সা তুলে নিয়ে মহেশকে দিলেন তিনি।

মহেশ টাকাটা পকেটে পুরে চলে গেল।

সুজাতা অবাক। তাকিয়ে তাকিয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। রণধীর বললেন, 'হারামজাদা যত টাকার বাজার করে তার টু পারসেন্ট ঘুষ ওকে দিই।'

নিজের অজান্তে সুজাতার গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল, 'মানে?'

'বুঝতে পারছ না তো? এমনিতেই কম জিনিস এনে বেশি দাম বলে কিছু সরায়। টু পারসেন্ট কমিশন না দিলে আধাআধিই মেরে দেবে। সে যাক, হিসেব লেখা হল। এবার কাগজ পড়ে শোনাও।'

রণধীরের ডান দিকের সাইড টেবল থেকে আজকের মর্নিং এডিশনের খবরের কাগজগুলো তুলে নিয়ে এল সুজাতা। ইংরেজি বাংলা, দুই ল্যাংগুয়েজের কাগজের খবরগুলো খানিকক্ষণ শোনার পর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন রণধীর, 'দেশটা একেবারে নরককুন্ড হয়ে উঠেছে। রোজ মার্ডার রেপ গণধোলাই। যত সব রাসকেলের পাল—'

সুজাতা হকচকিয়ে যায়। 'রাসকেলের পাল' কারা ঠিক বুঝতে পারে না, কাগজ পড়া থামিয়ে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে।

দুই হাত ঝাঁকিয়ে চেঁচাতে থাকেন রণধীর, 'আমরা স্বাধীন হয়েছি! ওয়ার্ল্ডের বিগেস্ট ডেমোক্র্যাসি! রুল অফ ল বলতে কিছু আছে? খালি ঝান্ডাবাজি, মারদাঙ্গা, বোমাবাজি, কথায় কথায় বন্ধ, মিছিল, রেল লাইন অবরোধ। কলেজ আর ইউনিভার্সিটিগুলো থার্ডক্লাস পলিটিকসের আখড়া, পড়াশোনা নেই, আজ এ স্ট্রাইক ডাকল তো কাল ও পালটা ডাক দিল। ইন্ডিয়া, পার্টিকুলারলি এই ওয়েস্ট বেঙ্গল একেবারে উচ্ছন্নে গেছে।'

একটানা চেঁচানোর কারণে হাঁফিয়ে পড়েছিলেন রণধীর। একটু সামলে নিয়ে গলার স্বর আরো অনেকটা চড়ালেন, 'কী ছিল এই কলকাতা! নাম্বার ওয়ান সিটি অফ ইন্ডিয়া। আর এখন? পাবলিক

ল্যাভাটরিও এর থেকে ক্লিন। ছারপোকার মতো মানুষ, যেখানে সেখানে হাগছে, মুতছে। একসময় বাঙালিদের কত সম্মান ছিল বাইরে, এখন গায়ে থুতু দেয়। ফর্টি-সেভেনের আগে আমরা পরাধীন ছিলাম বটে, কিন্তু ইণ্ডিপেনডেন্স পেয়ে ক'টা হাত আর ক'টা ল্যাজ গজিয়েছে? ইংরেজ আমলে আমরা হাজার গুণে ভাল ছিলাম।' কী ভেবে সুজাতাকে লক্ষ করতে করতে বললেন, 'তোমার কী মনে হয়? ব্রিটিশ শাসন এখনকার চেয়ে ফার ফার বেটার ছিল না?'

বাবা বেঁচে থাকতে তাঁর মুখেও ইংরেজ রাজত্বের এই ধরনের সুখ্যাতি শুনেছে সুজাতা। সে বলল, 'আমি তো তখন জন্মাই নি। তবে বাবা আপনার মতোই বলতেন, ব্রিটিশ আমলে এত নোংরামি এত অসভ্যতা ছিল না।'

রণধীরকে উদ্দীপ্ত দেখাল। সোজা হয়ে বসে বললেন, 'হক কথা বলতেন। স্বাধীন হয়েছি! এই খচড়ামোর নাম স্বাধীনতা! হুঁ—'

সুজাতা উত্তর দিল না।

রণধীর বললেন, 'ওই সব রেপ, মার্ডার, পলিটিক্যাল লিডারদের কেচ্ছা আর পড়তে হবে না। তুমি শেয়ার মার্কেটের পাতাটা খুলে পড় তো —'

খবরের কাগজে ট্রেড কমার্স ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে দু-তিনটে পাতা থাকে। বিশেষ করে ইংরেজি কাগজে। এ ব্যাপারে সুজাতার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর নিয়ে কী করবে?

একটা ইংরেজি কাগজের শেয়ার বাজারের পাতা খুলে নানা কোম্পানির নাম এবং সেগুলোর পাশাপাশি আগের দিনের দরের তালিকা পড়ে যেতে লাগল সুজাতা। চোখ বুজে খুব মন দিয়ে শুনতে লাগলেন রণধীর। কিছুক্ষণ পর হাত তুলে সুজাতাকে থামিয়ে চোখ মেললেন। কয়েকটা নাম-করা কোম্পানির নাম করে বললেন, 'এগুলোর প্রচুর শেয়ার কিনে রেখেছিলাম। শেয়ারগুলোর বাজার দর অনেক বেড়ে গেছে। এখন যদি ছেড়ে দিই, কয়েক লাখ টাকা লাভ হবে। তুমি কী বল — ছাড়ব? নাকি আর কিছুদিন দেখব? মার্কেট হয়তো আরো চড়বে।'

বলে কী লোকটা? কয়েক লাখ টাকা লাভ করবে! সকাল আটটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত মুখে রক্ত তুলে যে সুজাতা এতকাল মাসে দু'হাজার টাকার বেশি রোজগারের কথা ভাবতে পারে নি তার কাছে লাখ লাখ টাকা অবাস্তব স্বপ্নের ব্যাপার। শেয়ার শব্দটা তার জানা, তা ছাড়া এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। কী উত্তর দেবে সুজাতা ভেবে পেল না।

রণধীর বলে চলেছেন, 'না, দু-একটা মাস ওয়েট করেই দেখি।'

সুজাতা বুঝতে পারছে, সে উপলক্ষ মাত্র। তাকে সামনে বসিয়ে স্বগতোক্তির মতো নিজের সঙ্গে কথা বলছেন রণধীর। হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠলেন তিনি। সুজাতাকে বললেন, 'বুঝতে পারছি শেয়ার মার্কেট সম্পর্কে তোমার কোনো আইডিয়া নেই। ঠিক আছে, এখন তো তুমি আমার কাছে রেগুলার আসছ। ওটা আস্তে আস্তে বুঝিয়ে দেব। কারো সঙ্গে যে সিরিয়াস কোনো টপিক নিয়ে ডিসকাস করব, ধারে কাছে তেমন কেউ নেই। যত সব নচ্ছার খচ্চরের দল।'

সুজাতার মনে হল, তাকে খুব সম্ভব ভাল লেগেছে রণধীরের। শুধু তাই নয়, কাজে জয়েন করার দিন থেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন।

একটা ঢ্যাঙা রোগাটে চেহারার লোক একতলা থেকে উঠে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকরে তার উপস্থিতি জানিয়ে দিল। ঘাড় ফিরিয়ে রণধীর তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখচোখ উগ্র হয়ে উঠল।

লোকটা অত্যন্ত বশংবদ ভঙ্গিতে বলল, 'আসব বড়বাবু?'

কড়া গলায় রণধীর বললেন, 'এস।'

লোকটা কাছে এগিয়ে আসে। সুজাতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে দেখে। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। মাথার কাঁচাপাকা চুলের মাঝখান দিয়ে সিঁথি। হাড় বার-করা চেহারা। লম্বাটে মুখ, ভাঙা গাল, হনু চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। চৌকো ফ্রেমের চশমার আড়ালে তার গোলাকার চোখদুটোয় ধূর্ত, সতর্ক চাউনি। পরনে ঢলঢলে ট্রাউজার্স আর বেটপ ফুল শার্ট। লোকটা যে অত্যন্ত চতুর, দেখামাত্র টের পাওয়া যায়।

ভুরু কুঁচকে সুজাতাকে দেখিয়ে রণধীর বললেন, 'আগে তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই।'

ঘাড় হেলিয়ে লোকটা বলল, 'আপনাকে আলাপ করাতে হবে না। আমরাই করে নিচ্ছি।' সুজাতার

দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে বলল, 'আপনি তো সুজাতা দিদিমণি। আপনার কথা বড়বাবুর মুখে শুনেছি। আমি হলাম গিয়ে দুলাল—এ বাড়ির চাকর, বড়বাবুর পায়ের নখের ধুলোও বলতে পারেন।'

লোকটা যে দুলাল, ওকে দেখেই আন্দাজ করেছিল সুজাতা। মুখে কিছু বলল না, শুধু হাতজোড় করল।

রণধীর খিঁচিয়ে উঠলেন, 'নখের ধুলো! হারামজাদা কাঁহাকা!'

গালাগালিটা খুব সম্ভব এ বাড়ির কাজের লোকেদের গা-সওয়া। কোনো প্রতিক্রিয়াই হল না দুলালের। মুখে হাসি ফুটিয়ে বিনয়ের অবতার হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রণধীরের পাশের একটা টেবলে কর্পোরেশন ট্যাক্স, টেলিফোন আর ইলেকট্রিসিটির বিল পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রাখা ছিল। সবগুলোর সঙ্গে চেক গাঁথা রয়েছে। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে রণধীর বললেন, 'এগুলো নিয়ে যাও। আজই জমা দেবে।'

নিঃশব্দে বিলগুলো তুলে নিল দুলাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'বাইরে আর কোনো কাজ আছে?'

রণধীর বললেন, 'পরশু দিন সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউর ব্যাঙ্ক থেকে আমার পাশ বই আপ টু ডেট করে নিয়ে এলে। মনে হচ্ছে বেশ কিছু টাকার গরমিল আছে। আজ ওই ব্যাঙ্কে যাবে। ভাল করে খোঁজখবর নেবে। যদি দেখি কেউ কারচুপি করেছে, ছাড়ব না। শুয়োরের বাচ্চাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে জেলের ঘানি ঘোরাবার ব্যবস্থা করব।'

জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিয়ে চোখের কোণ দিয়ে সুজাতাকে লক্ষ করতে করতে দুলাল বলল, 'বিলগুলো জমা দিয়ে ব্যাঙ্ক ঘুরে আসব।'

'বৌবাজারে আমাদের মার্কেটের ভাড়া ক'মাস ধরে চার পাঁচ হাজার করে কম দিচ্ছ। মতলবটা কী তোমার?'

'আজ্ঞে বড়বাবু, অনেকগুলো ত্যাঁদোড় ভাড়াটে আছে। কিছুতেই ভাড়া দিচ্ছে না। আজ না কাল করে সমানে ঘুরিয়ে যাচ্ছে।'

'রাসকেল লায়ার! আমার বয়স হয়েছে, বাড়ি থেকে বেরুতে পারি না বলে দশ হাতে লুট করে চলেছ!'

ঘাড় ঝুঁকিয়ে কাকুতি মিনতি করতে থাকে দুলাল, 'বিশ্বাস করুন বড়বাবু, আমি দু'দিন পর পর গিয়ে তাগাদা দিচ্ছি। না দিলে কী করতে পারি?'

আরক্ত চোখে অনেকক্ষণ দুলালের দিকে তাকিয়ে থাকেন রণধীর। তারপর দাঁতে দাঁত ঘষে উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলেন, 'তিন উইক সময় দিলাম। এর ভেতর যদি পুরো ভাড়ার টাকা না পাই, তোমার কপালে লেঠা আছে। নাউ গেট আউট।'

সুজাতা বুঝতে পারছিল, এ বাড়িতে পুরোপুরি ভৃত্যতন্ত্র চালু রয়েছে। কাজের লোকেরা রণধীরের বার্ধক্য এবং অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে সমানে টাকাপয়সা সরাচ্ছে। সব জানতে পেরেও তাঁর খুব সম্ভব কিছুই করার নেই। হম্বিতম্বি গালাগালই সার।

উত্তেজনা কেটে গেলে ঝিমিয়ে পড়েন রণধীর। চোখ বুজে কিছুক্ষণ কাত হয়ে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে বলেন, 'এই লোকটা আমার রক্ত শুষছে। কিন্তু ওকে ছাড়ারও উপায় নেই। নতুন যাকে রাখব সে যে এর চেয়ে বড় রক্তচোষা হবে না, তার কি কোনো গ্যারান্টি আছে? সে যাক, খবরের কাগজ আর ভাল লাগছে না। এক কাজ কর, ওই বড় টেবলের ড্রয়ারে মানি অর্ডার ফর্ম আছে। তার থেকে দশটা নিয়ে এস—'

সুজাতা ফর্ম নিয়ে এল।

রণধীর বললেন, 'আমি যেমন যেমন বলছি সেভাবে ফিল-আপ করে ফেল। মাস কাবার হয়ে এল, এখনও টাকা পাঠানো হয় নি।' ছ'টা ধর্মীয় মিশনের নাম এবং ঠিকানা মুখস্থ বলে গেলেন। প্রতিটিকে দেড় হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। মিশনের পর দুটো চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি। তারা পাবে এক হাজার করে। বেনারসের বাঙালি বিধবাদের ভরণপোষণের জন্য একটা অর্গানাইজেশন আছে। সেখানেও ডোনেশন এক হাজার। শেষ ফর্মটা জনৈক ডরোথি পেজের নামে ফিল-আপ করা হল। তার ঠিকানা রিপন স্ট্রিটে। সবচেয়ে বেশি টাকা, আড়াই হাজার, তাকে দেওয়া হবে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, দাতব্য চিকিৎসালয়, কাশীর অসহায় বিধবাদের খাওয়া-পরা—এসবের জন্য টাকা পাঠানোর কারণ বোঝা যায়। বাইরের দিকটা কর্কশ, নির্মম, খিটখিটে হলেও ভেতরটা, যতটুকু আঁচ করা যাচ্ছে, বেশ নরম লোকটার। তিনি হয়তো ধর্মপরায়ণও, দুঃস্থ মানুষের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিও রয়েছে। কিন্তু ডরোথি পেজকে আলাদাভাবে টাকা পাঠাচ্ছেন কেন? পেজ পদবিটা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছাড়া আর কারো হয় কিনা সুজাতার জানা নেই। রিপন স্ট্রিটটাও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদেরই পাড়া। এই মহিলাটি সম্পর্কে দারুণ কৌতূহল হচ্ছিল সুজাতার। কিন্তু সোজাসুজি তো জিজ্ঞেস করা যায় না। একটু ভেবে সে বলে, 'যদি রাগ না করেন একটা কথা জানতে চাইব।'

স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ খুঁটিয়ে সুজাতাকে দেখার পর বললেন, 'তুমি কী জানতে চাইছ, হয়তো গেস করতে পারছি। ঠিক আছে, বল—'

একটু থতিয়ে গেল সুজাতা। পরে বলল, 'আপনি কি ওই মিশন আর চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারিগুলোকে রেগুলার টাকা পাঠান?'

'হ্যাঁ, পাঠাই। পরলোক টরলোক আছে কিনা, আমার জানা নেই। যদি অ্যাট অল থেকে থাকে মরার পর সেখানে যাতে টরচার না করে, সে জন্যে স্লাইট পুণ্য টুণ্য করে রাখছি।'

লোকটার মধ্যে মজাদার একটা দিকও আছে, তা আগে টের পাওয়া যায় নি। সুজাতার মোটামুটি ভালই লাগল।

রণধীর একটা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কিন্তু সুজাতা, এসব তো তুমি জানতে চাও নি। আসল প্রশ্নটা কর—'

মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেল সুজাতা।

রণধীর বললেন, 'এই ডরোথি পেজ স্ত্রীলোকটি কে, সেটাই তোমার জিজ্ঞাস্য, তাই না?'

লোকটা তুখোড় থট-রিডার। সুজাতা থ হয়ে যায়। ঢোক গিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, মানে—'

সুজাতাকে বিব্রত হতে দেখে রণধীর হয়তো মজাই পান। বলেন, 'দু'দিন আগে হোক বা পরে হোক, জানতে তুমি পারবেই। আমার কোনো ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই। ডরোথি ছিল আমার বাঁধা মেয়েমানুষ। আমার যখন চুয়াল্লিশ বছর বয়েস তখন স্ত্রী মারা যায়। ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট, ফের বিয়ে করলে দ্বিতীয় পক্ষটি কেমন হবে, কে জানে। হয়তো বাচ্চাগুলোর সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাই বিয়ের চিন্তা মাথা থেকে বার করে দিলাম। কিন্তু আমি তো জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ নই। শরীরের চাহিদা ছিল। সেই কারণে একটা বাড়ি ভাড়া করে ডরোথিকে রাখলাম। ভাল মেয়ে, আমার খুব যত্ন করত। সতীসাধ্বী ঘরের বৌরাও এতটা করে না। তা এখন আমারও বয়েস হয়েছে, ডরোথিরও হয়েছে। এই বয়েসে কে তাকে দেখবে? কাজেই মাসোহারার ব্যবস্থা করেছি।'

নিজের জীবনের গুপ্ত কথা এভাবে অকপটে কাউকে আগে কখনও বলতে শোনেনি সুজাতা। রণধীরের দ্বিধাহীন স্বীকারোক্তি তাকে অবাক করে দিয়েছে। রণধীর ভুরু কুঁচকে বললেন, 'ভাবছ, একটা বুড়ো রাসকেল লম্পটের পাল্লায় পড়লে। ভীষণ ঘেন্না হচ্ছে তো?'

প্রথমটা দারুণ ধাক্কা লাগে সুজাতার। সে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। সেক্স সম্বন্ধে তার ধ্যানধারণা অন্যরকম। বিবাহিত জীবনের পরিধির বাইরে অন্য কোনো মহিলার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের কথা ভাবলে তার গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে রণধীরকে তেমন ঘৃণা করতে ইচ্ছা হয় না। একটা লোক, চুয়াল্লিশ বছর বয়সে যাঁর স্ত্রী মারা গেছেন তাঁর দেহের যে দাবি থাকতে পারে সেটা ভাবা উচিত। তা ছাড়া, নিজের অধঃপতন যিনি অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেন তাঁর মধ্যে আর যাই থাক, কোনোরকম লুকোচুরি নেই। এমনিতে লম্পটেরা মেয়েদের যথেচ্ছ ভোগ করে ছিবড়ের মতো ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু রণধীর তা করেন নি। বহুকাল আগে যৌবন পেরিয়ে যাওয়া ডরোথি পেজ নামে এক মহিলার বাকি জীবনের সব দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এমন বিচিত্র মানুষ আগে আর কখনও দেখেনি সুজাতা। মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে—ঘেন্না হচ্ছে না।

রণধীর অন্যমনস্কর মতো বলেন, 'পতন বল আর পা হড়কানোই বল, আমার জীবনে ওই একটাই ঘটেছে। তবে তার জন্যে অনুতাপ নেই। নিজের কাছে আমি সাচ্চা আছি—বুঝলে?'

এ কথার কী উত্তর দেবে সুজাতা? সে চুপ করে থাকে। ঘৃণা না হলেও একজন বৃদ্ধের রক্ষিতা সম্পর্কে আলোচনায় তার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল।

রণধীর আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। ধীরে ধীরে ইজিচেয়ার থেকে নেমে সোজাসুজি বড় বেডরুমটায় চলে গেলেন। মিনিট তিনেক বাদে ব্রাউন পেপারের মোটা একটা খাম নিয়ে এসে সুজাতার হাতে দিয়ে বললেন, 'এর ভেতর টাকা আছে। গুনে দেখ—'

সুজাতা অবাক হয়ে টাকা বার করে গুনতে শুরু করল—চোদ্দ হাজার আট শ।

রণধীর বললেন, 'আমার একটা কাজ করে দেবে?'

সুজাতা জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

'মানি অর্ডার ফর্ম আর এই টাকাগুলো নিয়ে যাও। তোমাদের ওখানকার পোস্ট অফিস থেকে কাল পাঠিয়ে দেবে।'

সুজাতা চমকে ওঠে, 'সেদিন বলেছিলেন, আপনার ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিসের সব কাজ দুলালবাবু করেন। তাঁকে—' বলতে বলতে থেমে যায় সে।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারেন রণধীর। বলেন, 'দুলালকে না দিয়ে তোমাকে মানি অর্ডার করতে দিচ্ছি কেন—এই তো? ওই ধড়িবাজ খচ্চরটা গোলমাল করছে। আমার ধারণা, ঠিকমতো টাকা পাঠাচ্ছে না।'

সুজাতা বলে, 'মানি অর্ডার করলে পোস্ট অফিস থেকে রিসিট দেয়। দুলালবাবু সেগুলো আপনাকে দেন না?'

'দু-চারটে হয়তো দিল। অন্যগুলোর কথা জিজ্ঞেস করলে বলে হারিয়ে গেছে।'

'যাদের নামে টাকা পাঠান তাদের রিসিটও তো ডাকে আসার কথা—'

স্বাভাবিক সুরে কথা বলতে বলতে আচমকা খেপে উঠলেন রণধীর, 'তুমি দেখছি উকিলদের মতো আমায় জেরা করতে শুরু করলে! কাল টাকাগুলো পাঠিয়ে দেবে, ব্যস। পোস্ট অফিস দশটার আগে খোলে না। কাজ সারতে সময় লাগবে। কাল ন'টায় আসতে হবে না, বারটা সাড়ে বারটায় এলেই হবে।'

একটু ইতস্তত করে সুজাতা বলল, 'কিন্তু—'

তেরিয়া মেজাজে রণধীর বললেন, 'তুমি তো আচ্ছা মেয়ে। ফের বখেড়া বাধাচ্ছ!'

'দয়া করে আমার একটা কথা শুনুন।'

'কী?'

'প্রথম দিন যখন এ বাড়িতে আসি, আমি অনেস্ট কিনা সে সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ ছিল। সেকেন্ড ডে'তেই ধারণাটা পালটে গেল?'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন রণধীর। কোনো উত্তর দিলেন না।

সুজাতা এবার বলল, 'এতগুলো টাকা আমার হাতে দিচ্ছেন। আমি যদি মানি অর্ডার না করে কাল থেকে এখানে আসা বন্ধ করে দিই?'

'অনেকে আমার বহু টাকা মেরে দিয়েছে। এখনও মারছে। এই ক'টা টাকা তুমি যদি মারো, আমাকে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে না।' বলতে বলতে রণধীর একটু থামলেন। তারপর কী ভেবে ফের শুরু করলেন, 'এই বয়েসে অসুস্থ শরীর নিয়ে তো বেরুতে পারি না। কাউকে না কাউকে বিশ্বাস করতেই হবে। ধর, ওই টাকা ক'টা তোমার ওপর বাজি ধরলাম।'

'তার মানে আমার অনেস্টি যাচাই করতে চাইছেন?'

'তুমি যদি তাই ভাবো, আপত্তি করব না।'

রণধীর মল্লিককে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আজই সুজাতা চাকরিতে জয়েন করেছে। প্রথম দিন থেকেই লোকটা নানাভাবে তাকে জড়িয়ে ফেলতে চাইছে। কী জবাব দেবে, ভেবে পেল না সে।

বাঁ দিকের দেওয়ালে মিউজিক্যাল ঘড়িতে সাড়ে বারটা বেজে ওঠে। রণধীর বললেন, 'এ বেলার মতো কাজ শেষ। একটায় লাঞ্চ করি। ওই ঘরটায় যাও। তুমি তো জানো, ওখানে অ্যাটচড বাথরুমে তোয়ালে সাবান টাবান আছে। হাতমুখ ধুয়ে এস।' বলে ডান দিকের দেওয়ালে একটা দরজা দেখিয়ে

দিলেন।

কথামতো ঘরটায় ঢুকে সুজাতা দেখল, ভারি খাট এবং নানা আসবাব দিয়ে সেটা সাজানো। খাটে ফিটফাট বিছানা।

বাথরুম থেকে ফিরে আসতে মিনিট কুড়ি লাগল। এর মধ্যে চারটে সাইড টেবল জোড়া দিয়ে দুপুরের খাবার সাজিয়ে ফেলেছে মঙ্গলা। দুটো বড় প্লেটে ধবধবে গরম ভাত থেকে ধোঁয়া উড়ছে। প্লেট দুটো ঘিরে স্টেনলেস স্টিলের অনেকগুলো বাটিতে শুক্তো, বেগুন ভাজা, ডাল, দু'রকমের তরকারি, দু'রকমের মাছ, আমের টক এবং ঘরে পাতা দই।

রণধীর বললেন, 'বসে পড়—'

সুজাতা অস্বস্তি বোধ করছিল। রণধীর মল্লিকের মুখোমুখি বসে একসঙ্গে খেতে হবে, ভাবতে পারেনি সে। বিব্রতভাবে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে বসব?'

ভ্রূকুটি করে রণধীর বললেন, 'আমার সঙ্গে বসে খেলে জাত যাবে নাকি? আমি আনটাচেবল? বসো—'

জড়সড় হয়ে অগত্যা বসতে হল সুজাতাকে।

রণধীর বলতে লাগলেন, 'খাওয়ার ব্যাপারে অত লজ্জা কিসের, অ্যাঁ? নাও, শুরু কর।'

সোজাসুজি বিরাট ঘরটা রণধীরের বেডরুম। খাওয়া শেষ হলে তিনি সেখানকার অ্যাটাচড বাথ থেকে আঁচিয়ে এলেন। আর ডান পাশের ঘরটায় আবার যেতে হল সুজাতাকে। সে ফিরে এলে রণধীর বললেন, 'এখন দু-আড়াই ঘন্টা আমি ঘুমবো। সাড়ে তিনটেয় আবার কাজ শুরু হবে। ততক্ষণ তুমিও রেস্ট নিতে পার। ওখানে বিছানা আছে—যাও।' ফের সেই ঘরটা দেখিয়ে দিলেন তিনি। তারপর লম্বা ইজিচেয়ারে কাত হয়ে শুয়ে চোখ বুজলেন।

আজ তৃতীয় বার ডান পাশের ঘরটায় যেতে হল সুজাতাকে। সপ্তাহের কাজের দিনগুলোতে দুপুরে ঘুমোবার অভ্যাস নেই তার। খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে, বিছানায় দুই পা টান টান করে বসল সে। এখান থেকে রণধীরকে দেখা যাচ্ছে। আগেও একবার মনে হয়েছিল, আজও হল, ইজিচেয়ারের অনন্তশয্যায় খুব সম্ভব লোকটার সারাদিন কেটে যায়। রাতেও তিনি এখানে ঘুমোন কিনা কে জানে।

দু-আড়াই ঘন্টা তো কম সময় নয়। সুজাতা ভাবল, এভাবে চুপচাপ হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকা অসম্ভব। এ বাড়িতে প্রচুর বই টই আছে। আজ আর ভাল লাগছে না। কাল থেকে এই সময়টা বই পড়ে কাটিয়ে দেবে।

রণধীর মল্লিকের সব কিছুই বুঝিবা ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে আটকানো। তিনটে পঁচিশে তাঁর দিবানিদ্রা ভাঙল। ইজিচেয়ার থেকে নেমে তিনি তাঁর বেডরুমে চলে গেলেন। সুজাতাও আর বসে থাকল না, সোজা হল-ঘরে এসে তার নির্দিষ্ট সোফাটিতে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর মুখটুখ ধুয়ে ফিরে এসে সুজাতাকে দেখে খুশি হলেন রণধীর। বললেন, 'যাক, ডাকতে হয় নি। নিজে থেকেই চলে এসেছ। গুড—'

সুজাতা উত্তর দিল না।

মঙ্গলা চা-বিস্কুট দিয়ে গেল। খাওয়া হয়ে গেলে হল-ঘরের শেষ প্রান্তের একটা আলমারি দেখিয়ে রণধীর বললেন, 'ওটার প্রথম তাকে রাজশেখর বসুর বাল্মীকি রামায়ণের বাংলা ট্রানস্লেশনটা রয়েছে। ওটা নিয়ে এস।'

বই আনা হলে রণধীর বললেন, 'অযোধ্যাকান্ডে 'রামের অভিষেকের আয়োজন' পর্বটা পড়।'

বই খুলে নির্দিষ্ট অংশটি বার করে পড়তে শুরু করল সুজাতা, 'পুরবাসিগণ চলে গেলে দশরথ পুনর্বার মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা ক'রে স্থির করলেন যে আগামীকল্য পুষ্যা নক্ষত্রে রামের অভিষেক হবে। তারপর তিনি অন্তঃপুরে গিয়ে আবার রামকে ডেকে আনলেন। দশরথ বললেন, রাম, আমি দীর্ঘ আয়ু এবং অভীপ্সিত বিষয় ভোগ ক'রে বৃদ্ধ হয়েছি, শত যজ্ঞ ক'রে প্রচুর দক্ষিণা পেয়েছি। ভুবনে যার তুলনা নেই এমন তোমাকে পুত্ররূপে পেয়েছি। আমি যথেষ্ট—'

হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে রণধীর বললেন, 'হারামজাদা, ফোন করার আর সময় পেলে না! দেখ তো সুজাতা—'

বই টেবলে নামিয়ে রেখে টেলিফোন তুলে নেয় সুজাতা। ওধার থেকে বিনীত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'নমস্কার। আপনি কে বলছেন ম্যাডাম?' লোকটা পরিষ্কার বাংলা বলছে ঠিকই, তবে সুরে সামান্য অবাঙালি টান।

সুজাতা বলল, 'আমাকে চিনবেন না। আপনি কাকে চান বলুন—'

লোকটা সঠিক নম্বরে ফোন করেছে কিনা, যাচাই করে নেবার জন্য জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি রণধীর মল্লিকের বাড়ি?'

সুজাতা বলল, 'হ্যাঁ।'

লোকটা এবার যেন ধন্দে পড়ে যায়। বলে, 'লেকিন ম্যাডাম, আপনার গলা তো কখনও শুনিনি।'

বোঝা যাচ্ছে, লোকটা আগেও এখানে ফোন করেছে। তখন সুজাতা এ বাড়ির চাকরিতে জয়েন করেনি। স্বাভাবিক ভাবেই আগে তার গলা শোনার কারণ নেই। সে বলল, 'আমার কথা থাক। আপনার কি কিছু দরকার আছে?'

শশব্যস্তে লোকটা বলল, 'হাঁ হাঁ, জরুর। কাইণ্ডলি ফোনটা মল্লিক সাহেবকে দিন।'

'আপনার নাম?'

'নামের কী জরুরত? ফোনটা হ্যান্ড-ওভার করুন না—'

সুজাতা বলল, 'আমার ওপর ইনস্ট্রাকশন আছে, নেম অ্যাণ্ড পারপাস না জানালে মিস্টার মল্লিককে ফোন দেওয়া চলবে না।'

লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'ম্যাডাম, আপনি কি ওঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি?'

কিছুটা রূঢ় গলায় সুজাতা বলল, 'আমি যে-ই হই, আপনি নাম টাম না বললে এক্ষুনি লাইন ডিসকানেক্ট করে দেব।'

'না না, প্লিজ। আমার নাম প্রভুদাস খৈতান। পারপাসটা মল্লিক সাহেব জানেন। এবার ওঁকে দিন।'

ফোনের মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে সুজাতা রণধীরের দিকে তাকায়। অসীম বিরক্তিতে তাঁর কপালে কত যে ভাঁজ পড়েছে, ঠিক নেই।

রণধীর বললেন, 'কার সঙ্গে এতক্ষণ বকবক করছিলে?'

সুজাতা বলল, 'প্রভুদাস খৈতান নামে একটা লোক আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

এক সেকেণ্ডের ভেতর রণধীরের মুখটা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো টকটকে লাল। শরীরের সব রক্ত যেন সেখানে গিয়ে জমা হয়েছে, যে কোনো মুহূর্তে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

সুজাতা ভয় পেয়ে গেল। একটা মানুষের চেহারা এত দ্রুত এমন হিংস্র হয়ে উঠতে পারে, তার ধারণা ছিল না।

রণধীর মাথা ঝাঁকিয়ে অসহিষ্ণুভাবে বললেন, 'শুয়োরটাকে বলে দাও আমি কথা বলব না।'

সুজাতা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ সিদ্ধান্তটা পালটে ফেললেন রণধীর। তাকে থামিয়ে বললেন, 'আচ্ছা থাক। ফোনটা আমাকে দাও।' টেলিফোনটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে কানে লাগিয়ে গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'ব্যাস্টার্ড বেজন্মা কাঁহিকা! তোকে না বলেছি, আমাকে কখনও ফোন করবি না—'

ওধার থেকে প্রভুদাস খৈতান কী বলছে, কিছুই শোনা যাচ্ছে না। তার প্রতিক্রিয়াও বুঝতে পারছে না সুজাতা। সে এতই ত্রস্ত যে ক্রমশ সিঁটিয়ে যাচ্ছে।

উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ রণধীরের গলা ক্রমাগত চড়ছে, 'চাবকে তোমার ছাল ছাড়িয়ে নেব.....রাসকেল স্কাউন্ড্রেল জোচ্চোর....এত বড় স্পর্ধা তোমার....'

একটানা মিনিট পাঁচেক কণ্ঠস্বরকে শেষ পর্দায় চড়িয়ে অদৃশ্য প্রভুদাসকে টার্গেট করে তোপ দাগলেন রণধীর। তারপর ঝড়াং করে ফোনটা নামিয়ে রেখে ইজিচেয়ারে শরীর এলিয়ে দিলেন। প্রচণ্ড উত্তেজনার পর শরীর ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বুক তোলপাড় করে জোরে জোরে শ্বাস পড়তে লাগল। অবসাদে চোখ বুজে এল তাঁর।

ভয় তো পেয়েই ছিল সুজাতা, সেই সঙ্গে হতচকিতও হয়ে গেছে। কী করবে, ঠিক করতে না পেরে বিমূঢ়ের মতো রণধীরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে।

আধ ঘন্টা পর চোখ মেললেন রণধীর। ধীরে ধীরে উঠে বসে নির্জীব সুরে বললেন, 'ওই মেরুন রঙের ওষুধের শিশিটা আর এক গেলাস জল নিয়ে এস।'

একটু দূরে একটা টেবলের ওপর নানা ধরনের ওষুধের শিশি, ক্যাপসুল ট্যাবলেট রয়েছে। আর আছে ওয়াটার বটল, কাচের গেলাস।

মেরুন শিশি আর জল নিয়ে এল সুজাতা। শিশিটা খুলে ফিকে হলুদ রঙের চ্যাপটা চৌকো একটা বড়ি বার করে এক ঢোক জলের সঙ্গে গিলে ফেললেন রণধীর। ওষুধটা মনে হয় খুবই তেজী। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তিনি আগের মতো চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। বললেন, 'তোমাকে কি বলেছি, আমার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল?'

এখন রণধীরকে বেশ স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। উত্তেজনাহীন, শান্ত। খানিক আগের উগ্রতা এবং ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই। হার্ট অ্যাটাকের খবর আগে দিয়েছিলেন কিনা, মনে পড়ল না সুজাতার। বলল, 'বোধ হয় বলেছিলেন।'

'তারপর থেকে ডাক্তারের ইনস্ট্রাকশন, কোনোভাবেই এক্সাইটেড হওয়া চলবে না। তা হলে নেক্সট অ্যাটাকটা হয়ে যাবে। আর সেটা হলে স্রেফ লোকের ঘাড়ে চড়ে নিমতলা ঘাটে যাত্রা করতে হবে।'

জ্ঞানের নাড়ি যার এতই টনটনে, সব জেনে বুঝেও কেন তিনি উত্তেজিত হয়েছিলেন, এটা জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না সুজাতার।

রণধীর বললেন, 'আসলে ব্যাপারটা কী জানো, ওই প্রভুদাস হারামীটা ফোন করলে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। তখন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, মনে হয়, জানোয়ারটাকে মার্ডার করে ফেলি। কত বার বলেছি, আমাকে ফোন করে জ্বালাবে না। তবু দু-চার দিন পর পর শয়তানের বাচ্চা মাথা গরম করে দিচ্ছে।'

কেন রণধীর প্রভুদাসের ওপর এত ক্ষিপ্ত, লোকটা তাঁর কী ক্ষতি করেছে, সুজাতা জানে না। জানতে চাইলে হয়তো মারমুখী হয়ে উঠবেন। কাজেই চুপ করে থাকা ভাল। নিজের থেকে যখন বলবেন তখন শোনা যাবে।

রণধীর বললেন, 'এবার থেকে লোকটা ফোন করলে নাম জেনে নিয়েই লাইন কেটে দেবে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর রণধীর বললেন, 'এখন আর অযোধ্যাকাণ্ডে মন বসবে না। বদমাইশটা রামায়ণের পিণ্ডি চটকে দিয়েছে। বইটা জায়গামতো রেখে এস।'

বই রেখে ফিরে এল সুজাতা।

একটা ফোন নাম্বার দিয়ে রণধীর বললেন, 'এখানে ডাক্তার অবনীশ অধিকারীকে পাবে। হার্ট স্পেশালিস্ট। উইকে একদিন করে এসে আমাকে দেখে যায়। ওকে বল কাল বিকেলে যেন ইসিজি মেশিনটা নিয়ে আসে।' একটু থেমে বললেন, 'ডাক্তার অধিকারীর নাম্বারটা মনে রেখ। হঠাৎ যদি আর একটা ম্যাসিভ অ্যাটাক হয়ে যায়, বলবার সময় পাব না।'

টেলিফোনের বোতাম টিপতে টিপতে সুজাতা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার শরীর কি খারাপ লাগছে?'

রণধীর বললেন, 'না। তবে খুব এক্সাইটেড হয়ে পড়েছিলাম তো। ডাক্তার এসে একবার হার্টের কন্ডিশনটা দেখে যাক। সাবধানের মার নেই, কী বল?'

ওধারে ফোন বেজে উঠেছিল। ডাক্তার অধিকারীর সঙ্গে কালকের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করে ফেলল সুজাতা।

মহেশ এক গাদা চিঠিপত্র নিয়ে এসে রণধীরের সামনে একটা টেবলে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রেখে চলে গেল। সুজাতা আন্দাজ করল, আজকের ডাকে এগুলো এসেছে।

রণধীর বললেন, 'দেখ তো কী কী এল?'

সুজাতা দেখল, ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের দুটো পুরনো রসিদ, দুটো বিরাট মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ের রিপোর্ট, আসছে মাসের বার তারিখে প্রিমিয়াম জমা দেবার জন্য তাগাদা দিয়ে এল আই সি'র চারটে নোটিশ এবং বিদেশ থেকে এয়ার মেলের একটা চিঠি। যা যা এসেছে, সব জানিয়ে দিল সে।

রণধীর খাড়া হয়ে বসে জিজ্ঞেস করলেন, 'এয়ার মেলটা কোত্থেকে এসেছে?'

সুজাতা বলল, 'আমেরিকা থেকে।'

রণধীরের মুখের চেহারা ফের পালটে যেতে থাকে। তীব্র, চাপা গলায় তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই সেই হারামজাদাটা—'

বুঝতে না পেরে সুজাতা তাকিয়ে থাকে।

রণধীর তাকে লক্ষ করছিলেন। বললেন, 'আমার বড় পুত্তুর গোপলা। নেক্সট মান্থের পাঁচ তারিখে আমার জন্ম দিন। প্রতি বছর তার ক'দিন আগে আমেরিকা থেকে চিঠি ছাড়ে। বছরে ওই একবার বাপের ওপর ভক্তি উথলে ওঠে। কাল পরশু জার্মানি থেকে মেজ হারামজাদা ভন্টের চিঠি আসবে। কলকাতায় আরো দুটো শয়তান আছে—আমার মেয়ে ছুটকি আর ছোট ছেলে নন্টে। তারাও চিঠি ছাড়বে। আমার তাতে এক্সট্রা দশটা হাত আর দশটা পা গজিয়ে যাবে। উল্লুকের দল—'

গোপলা ভন্টে নন্টে এবং ছুটকি রণধীরের ছেলেমেয়েদের ডাকনাম। আসলে বোধ হয় হবে গোপাল, ভন্টু নন্টু। তাদের ওপর রাগের বা অভিমানের কারণে ওইভাবেই ভেঙেচুরে বিকৃত করে তিনি উচ্চারণ করেন। ছুটকিটা খুব সম্ভব ঠিকই আছে।

রণধীর বলতে লাগলেন, 'চিঠিটায় বাঁধা গৎ থাকবে, যেটা বছরের পর বছর লিখে আসছে। বাবা, তোমার জন্যে সব সময় চিন্তায় থাকি, সাবধানে থাকবে, সময়মতো খাওয়া দাওয়া করবে। শরীর খারাপ হলে তক্ষুনি ডাক্তারকে খবর দেবে, একেবারে নেগলেক্ট করবে না। যাক গে, সবই জানি। তবু গুষ্টির মাথা কী লিখেছে, একবার পড়—'

সুজাতা ইতস্তত করতে লাগল, 'আপনার পার্সোনাল চিঠি। আমার পড়াটা কি ঠিক হবে?'

রণধীর ধমকে উঠলেন, 'ওটা প্রেমপত্তর নাকি? ছেলে বাপকে লিখেছে—পড়।'

অগত্যা খাম খুলে চিঠি বার করে পড়তে শুরু করল সুজাতা। অনেক কাল বিদেশবাসের কারণে বাংলা টাংলার সঙ্গে গোপালের যোগাযোগ নেই। ফলে যে বাংলাভাষাটা সে লিখেছে তাতে প্রচুর বানান ভুল। সেনটেন্সগুলো অবশ্য ঠিকই আছে। তবে হাতের লেখাটা ভাল নয়, কেমন বাঁকাচোরা। বোঝা যায়, বহুকাল বাংলা টাংলা লেখার অভ্যাস নেই।

রণধীর যা বলেছিলেন, চিঠির বয়ান হুবহু তা-ই। সুজাতা পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে খেপে উঠছেন তিনি, 'নচ্ছার, পাজি, কিংবা পগেয়া বজ্জাত—' ইত্যাদি

রণধীরের নানা মন্তব্যের মধ্যে একসময় চিঠি পড়া শেষ হল। তারপর সুজাতা বলল, 'আপনি কিন্তু আবার উত্তেজিত হয়ে উঠছেন?'

রণধীর চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না উঠে কী করব—অ্যাঁ? যেন আমার কত বড় ওয়েল-উইশার! কে চায় ওর চিঠি! কোনো সম্পর্ক নেই ওর সঙ্গে।'

উত্তেজনাটা থিতিয়ে যাবার জন্য একটু সময় দিল সুজাতা। তারপর বলল, 'উনি আপনাকে উত্তর দিতে লিখেছেন।'

'পরে ভাবা যাবে। এখন চিঠিটা রেখে দাও।'

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে পাঁচটায় বিকেলের টিফিন আর চা নিয়ে এল মঙ্গলা। পুরোপুরি বাঙালি টিফিন। ঘি-মাখা চিড়ে ভাজা, নারকেল কোরা এবং একটা করে বড় কড়া পাকের সন্দেশ।

খাওয়া যখন শেষ হয়ে এসেছে, দুলাল হালদার এল। জানাল সারাদিন ঘুরে ঘুরে নানা জায়গায় বিলের চেক জমা দিয়ে সেই ব্যাঙ্কটায় গিয়েছিল, যেখানে হিসেবের গরমিল রয়েছে। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ক'দিন সময় চেয়েছেন। কেন হিসেব মিলছে না, এর মধ্যে তার খোঁজ করে জানিয়ে দেবেন।

আরক্ত চোখে দুলালের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে রণধীর বললেন, 'ফেরেববাজ! আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।'

দুলাল কিন্তু গেল না, কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রণধীর খেঁকিয়ে ওঠেন, 'কী হল, আমি কী বললাম কানে ঢুকল না?'

গলা খাঁকরে দুলাল বলল, 'আজ্ঞে বড়বাবু, মিশন, চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি, কাশীর বিধবা আর মিস পেজকে টাকা পাঠানোর সময় কিন্তু হয়ে গেছে।'

'সে হুঁশ আমার আছে।'

'আপনার কাছে মানি অর্ডার ফর্ম আছে, নাকি কাল নিয়ে আসব?'

রণধীর আরো কড়া হয়ে উঠলেন, 'তা নিয়ে তোমায় অত মাথা ঘামাতে হবে না। এখন যেতে পার।'

আর কিছু বলল না দুলাল। নিঃশব্দে একতলায় নেমে গেল।

খানিকটা সময় কেটে যায়।

তারপর রণধীর বললেন, 'ভেবেছিলাম, তোমাকে ডিকটেশন দিয়ে পাতাখানেক ডায়েরি লেখাব। কিন্তু মেজাজটা সব দিক থেকে এত খারাপ হয়ে গেছে যে কিচ্ছু ভাল লাগছে না।'

সুজাতা বলল, 'ঠিক আছে, কাল ডিকটেশন দেবেন—'

ঘড়িতে সাতটা বাজলে রণধীর বললেন, 'আজকের মতো ডিউটি শেষ। বাড়ি যাও।' মঙ্গলাকে ডেকে সুজাতার সঙ্গে নিচে গিয়ে গেটের তালা খুলে দিয়ে আসতে বললেন।

সুজাতা সেই মানি অর্ডার ফর্মগুলো আর টাকা ব্যাগে ভরে উঠে দাঁড়াল।

পাঁচ

'মল্লিক ভবন' থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় চলে এল সুজাতা। সেখান থেকে দু'টো বাস পালটে শিয়ালদায় যখন পৌঁছুল সাতটা বেজে চল্লিশ।

এমন কিছু রাত হয় নি। শিয়ালদা পৃথিবীর সব চেয়ে ব্যস্ত স্টেশনগুলোর একটা। চারদিকে থিকথিকে ভিড়। অনবরত লাউড স্পিকারে ঘোষিকা জানিয়ে দিচ্ছেন, কখন কোন ট্রেন কত নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে।

লাইন দিয়ে টিকেট কেটে সুজাতা স্টেশনের বিশাল চত্বরে আসতে না আসতেই শুনতে পেল, তাদের লাইনের পরবর্তী ট্রেন আটটা বেজে পনের মিনিটে তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে। তার ব্যাগে নগদ চোদ্দ হাজার তিন শ টাকা রয়েছে। এত টাকা নিয়ে সে কখনও চলাফেরা করেনি। শিয়ালদা নর্থের দিকটা ভীষণ খারাপ। চুরি ছেনতাই ডাকাতি লেগেই আছে। চোর ডাকাতেরা যদি টের পায় তার কাছে মোটা অঙ্কের টাকা আছে, সঙ্গে সঙ্গে ছিনিয়ে নেবে। সুজাতার গা ভয়ে ছম ছম করতে লাগল।

তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকার মুখে যেখানে রেলের টিকেট কালেক্টররা দাঁড়ায়, বিজনকে সেখানে দেখা গেল। ভেতরকার ভয় অনেকখানি কেটে যায় সুজাতার। একটু অবাকও হয় সে। বড় বড় পা ফেলে বিজনের কাছে গিয়ে বলে, 'সন্ধের আগে আগে তোমার ছুটি হয়ে যায়। এখনও বাড়ি ফের নি যে?'

বিজন বলল, 'তোমার জন্যে যাওয়া হয়নি। একা একা রাত্তিরে বাড়ি ফিরবে। এ লাইনে গণ্ডগোল লেগেই আছে। হুট করে হয়তো ট্রেন বন্ধ হয়ে গেল, কি দু-আড়াই ঘন্টার জন্যে আটকে রইল, তখন মুশকিলে পড়ে যাবে। তাই—'

কৃতজ্ঞ সুরে সুজাতা বলে, 'তোমাকে দেখে আমার দারুণ একটা দুশ্চিন্তা কাটল।'

'কিসের দুশ্চিন্তা?'

'পরে শুনো। কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে আছ?'

বিজন তাড়া লাগায়, 'এখন আর কোনো কথা নয়। তাড়াতাড়ি চল। এর পর বসার জায়গা পাবে না।'

ট্রেনে উঠে মুখোমুখি দুটো সিট পেয়ে যায় ওরা। বিজন এবার বলে, 'তোমার ছুটি সাতটায়। নর্থ ক্যালকাটা থেকে শিয়ালদা পৌঁছুতে মিনিমাম চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট। আমার ছুটির পর রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরলাম। তারপর তোমার আসার টাইমটা হিসেব করে এখানে ওয়েট করছিলাম।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'প্রথম দিন কাজ করতে গিয়ে কিরকম এক্সপিরিয়েন্স হল?'

'ট্রেনে বসে এই গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যে সে সব বলা মুশকিল।'

'ঠিক আছে। পরেই শুনব। শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। কোনোরকম প্রবলেম হয় নি তো?'

'না।'

টাইম টেবল মিলিয়েই ট্রেন ছেড়ে দিল। পুরো কম্পার্টমেন্ট মানুষে ঠাসা। তার ওপর ভ্যাপসা গরম। দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

ট্রেন ছাড়ার পর বাইরে থেকে হু হু করে জানালা দিয়ে বাতাস ঢুকছে। খানিকটা আরাম বোধ করল সুজাতারা।

বিজন একসময় বলল, 'তুমি যতদিন রণধীর মল্লিকের চাকরি করছ, আমার একটা ডিউটি বাড়ল।'

বুঝতে না পেরে সুজাতা বলে, 'কিসের ডিউটি?'

বিজন বলল, 'তোমার বডিগার্ড হিসেবে রোজ রাতে বাড়ি পৌঁছে দেবার।'

সুজাতা উত্তর দিল না, একটু হাসল শুধু। বিজনের কথায় সে ভরসা পেয়েছে।

বিজন এবার বলে, 'রোজ সন্ধে সাড়ে সাতটায় তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের গেটের মুখে দাঁড়িয়ে থাকব। তুমি এলে একসঙ্গে বাড়ি যাব।'

মোটামুটি ঠিক সময়েই ডাউন ট্রেনটা আদর্শনগরে পৌঁছে গেল। এখন ন'টা বেজে আটত্রিশ। রাস্তায় এখনও প্রচুর লোকজন। তা ছাড়া রয়েছে অটো, সাইকেল রিকশা, ভ্যান রিকশা এবং বেশ কিছু প্রাইভেট কার আর জিপও। কলকাতার কাছাকাছি এই শহরটা রাত সাড়ে দশটা এগারটা পর্যন্ত সরগরম থাকে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে সুজাতাদের বাড়ি পৌঁছে গেল।

রাত্তিরে পারতপক্ষে সুজাতাদের বাড়ি আসে না বিজন। আজ যে এল তার কারণ অসীম কৌতূহল। রণধীর মল্লিকের কাছে সুজাতার চাকরির প্রথম দিনটার যাবতীয় বিবরণ জানতে না পারলে রাতে তার ঘুম হবে না।

ইন্টারভিউ দিয়ে ফিরে আসার পর ক'দিন আগে যেমন দেখেছিল, আজও নিরুপমা, ঝুনু এবং নান্টুকে তেমনই উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। ওদের মনোভাবটা আন্দাজ করতে পারছিল সুজাতা। হেসে হেসে বলল, 'খুব ভাবছিলে তো? রণধীর মল্লিক লোকটা বাঘও না, ভাল্লুকও না। আমাকে খেয়ে ফেলেনি। হাতমুখ ধুয়ে বাইরের শাড়ি টাড়ি পালটে নিই। তারপর সব শুনো—'

দুর্ভাবনা খানিকটা কাটল নিরুপমার। জিজ্ঞেস করলেন, 'বিজনের সঙ্গে তোর কোথায় দেখা হল?'

সুজাতা বলল। সেই সঙ্গে জানিয়ে দিল, এখন থেকে ছুটির পর নিয়মিত বিজনের সঙ্গে সে বাড়ি ফিরবে।

নিরুপমা স্বস্তি বোধ করেন। বলেন, 'তা হলে আমার আর চিন্তা থাকে না।'

কিছুক্ষণ পর পোশাক টোশাক বদলে বাইরের ঘরে বসে সবার সঙ্গে চা খেতে খেতে 'মল্লিক ভবন'-এ তার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কথা বলল সুজাতা। খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দিল না। তবে ডরোথি পেজ যে তাঁর রক্ষিতা ছিল সেটা আর বলল না। মা এবং ছোট ভাইবোনের সামনে সেটা বলতে ভীষণ সঙ্কোচ হচ্ছিল।

সব শোনার পর বিজন বলল, 'লোকটা ভীষণ খ্যাপাটে আর একসেনট্রিক টাইপের।'

সুজাতা ধীরে ধীরে বলল, 'মাত্র ওই দুটো অ্যাডজেকটিভ দিয়ে লোকটার ক্যারেক্টার বোধ হয় ঠিক বোঝানো যাবে না।'

'তোমার কি অন্যরকম কিছু মনে হয়?'

'হ্যাঁ।'

সুজাতা জানায়, রণধীর জটিল ধরনের চরিত্র। দয়ামায়া, প্রচণ্ড ক্রোধ, মানুষের প্রতি একদিকে গভীর বিশ্বাস, অন্যদিকে তীব্র সন্দেহ, সারল্য এবং কুচুটেপনা, নিজের সন্তানদের প্রতি বিদ্বেষ, সব মিলিয়ে বিচিত্র মিশ্রণ। লোকটাকে মোটামুটি খারাপ লাগে নি সুজাতার। তবে মাত্র একদিনেই একটা মানুষকে পুরোপুরি বোঝা যায় না। দু-চার সপ্তাহ যাক, তারপর হয়তো রণধীর সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা করা যাবে।

নিরুপমা চিন্তিতভাবে বললেন, 'এতগুলো নগদ টাকা মানি অর্ডার করার জন্যে তোকে দিলেন। শোনার পর থেকে আমার হাত-পা কাঁপছে। আমাদের এদিকে গুণ্ডা বদমাশদের যা উৎপাত!'

সুজাতা বলল, 'আমারও খুব ভয় করছিল। স্টেশনে বিজনকে পেয়ে দুশ্চিন্তা কেটেছে—'

বিজন বলল, 'আমার কী মনে হয় জানো?'

সুজাতা জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'রণধীর মল্লিকের চারপাশে ভাল লোকজন নেই। যারা আছে তারা ধান্দাবাজ, স্কাউন্ড্রেলস। সবাই মিলে লোকটাকে ঝাঁঝরা করার মতলবে রয়েছে। তোমাকে খুব সম্ভব, না না, মোস্ট সার্টেনলি তার পছন্দ হয়েছে। দেখো, নানাভাবে তোমাকে জড়িয়ে ফেলতে চাইবে।' বলে চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিল বিজন।

এই সম্ভাবনাটা আবছাভাবে আজ সারাদিন সুজাতার মনে হয়েছে। বিজনের কথায় সেটা আরো স্পষ্ট হল। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সে বলে, 'আমারও সেই রকমই ধারণা।'

ঝুনু এবং নান্টু এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। ওরা খুবই সভ্যভব্য, বড়দের কথার মধ্যে কথা বলে না।

কিন্তু ঝুনু কী ভেবে হঠাৎ বলে ওঠে, 'দিদি, রণধীর মল্লিক তোকে এক্সট্রা যে কাজ দেবে, সেগুলো খুব ভেবে চিন্তে নিবি।'

বুঝতে না পেরে সুজাতা জিজ্ঞেস করে, 'মানে?'

'তোর ডিউটি তো বই আর খবরের কাগজ পড়ে শোনানো, ফোন অ্যাটেণ্ড করা, ডিকটেশন নিয়ে ডায়েরি লেখা, আর সামনে বসে থাকা—এই সব। এত ক্যাশ টাকা নিয়ে মানি অর্ডার করাটা তোর এক্সট্রা কাজ, তাই কিনা?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'ওই দুলাল হালদার নামে লোকটা এতদিন মানি অর্ডার করত। টাকাপয়সা নিয়ে গোলমাল করেছে বলে সেই দায়িত্বটা তোকে দিয়েছেন রণধীর মল্লিক। এতে দুলালের ইন্টারেস্টে ঘা লাগবে। মাঝখান থেকে লোকটা তোর শত্রু হয়ে যাবে।'

ঝুনু শুধু শান্তশিষ্ট ভব্যই নয়, দারুণ বুদ্ধিমতীও। সুজাতা চমকে ওঠে। শত্রুতার দিকটা ভেবে দেখেনি সে। চিন্তিতভাবে বলল, 'তুই মনে হয় ঠিকই বলেছিস।'

বিজন বলল, 'হানড্রেড পারসেন্ট ঠিক।'

ঝুনু বলে, 'রণধীর মল্লিককে ঘিরে আরো কত দুলাল হালদার রয়েছে, কে জানে। খুব সাবধান দিদি। সবসময় চোখকান খোলা রাখবি।'

সুজাতা বলে, 'সে তো রাখতেই হবে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর বিজন বলল, 'অন্য একটা দিকও কিন্তু ভাববার আছে।'

জিজ্ঞাসু চোখে বিজনের দিকে তাকায় সুজাতা, 'কী বল তো?'

'রণধীর মল্লিক অসুস্থ বুড়ো মানুষ। তার একবার স্ট্রোক হয়ে গেছে। আজও হবার উপক্রম হয়েছিল। যেরকম রগচটা, কখন যে কী হয়ে যাবে। সে মারা গেলে ও বাড়ির চাকরি তোমার থাকবে না। তাই—'

'তাই কী?'

'রণধীর মল্লিকের ওপর ডিপেন্ড করে থাকলে চলবে না। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের সঙ্গে কনট্যাক্টটা রেখে যেতে হবে। ভাল জায়গায় পার্মানেন্ট সারভিস দরকার।'

সুজাতা বলল, 'তোমার কি ধারণা সেটা আমার মাথায় নেই? হঠাৎ কাজটা পেয়ে গেলাম। মাইনেটাও বেশি। এটা স্টপ-গ্যাপ ব্যাপার। ভাল কিছু পেলে ছাড়তে কতক্ষণ।'

সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছিল।

বিজন বলল, 'অনেক রাত হয়ে গেল। এবার উঠি। কাল আবার দেখা হবে।'

ছয়

দিন পনের কেটে গেল।

রোজ প্রায় একই রুটিনে সময় কাটছে। সেই কাগজ এবং বই পড়া, ফোন ধরা ইত্যাদি। এর মধ্যে রণধীর মল্লিক টাকাপয়সার ব্যাপারে সুজাতাকে আর জড়ান নি। তবে তাঁর ডিকটেশন নিয়ে চিঠি এবং ডায়েরি লিখতে হয়েছে।

জন্মদিন উপলক্ষে আমেরিকা এবং জার্মানি থেকে বড় আর মেজ ছেলে, কলকাতা থেকে মেয়ে আর ছোট ছেলে প্রণাম জানিয়ে রণধীরকে যে চিঠিগুলো লিখেছে তার উত্তরের বয়ান শুনে প্রথমটা চমকে উঠেছে সুজাতা। রণধীর মুখে মুখে বলেছেন, 'হারামজাদা শুয়ার, কে তোদের প্রণাম চায়? পিতৃভক্তি দেখানো হচ্ছে! জন্মদিন এলে হঠাৎ আমার কথা মনে পড়ে! পগেয়া বদমাইশ, ভবিষ্যতে আমার খোঁজখবর নিবি না, এই আমার লাস্ট ওয়ার্নিং।' মেয়ের বেলায় হারামজাদাটা হারামজাদী হয়ে গেছে।

সুজাতা একেবারে থ বনে যায়। রাগের মাথায় অনেকে অনেক কিছু বলে কিন্তু তাই বলে চিঠিতে সে সব লেখা যায় নাকি? বিমূঢ়ের মতো সে রণধীরের দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

রণধীর ধমকে উঠেছেন, 'কী দেখছ অমন করে? আমার কপাল থেকে কি গোটা দশেক ল্যাজ বেরিয়েছে? লেখ—'

সুজাতা ভীরু গলায় জানতে চেয়েছে, 'আপনি যা বললেন তাই লিখব! না, ল্যাংগুয়েজটা একটু পালটে—' বলতে বলতে চুপ করে গেছে।

রণধীর গলার স্বর কয়েক পর্দা চড়িয়ে বলেছেন, 'ছেলেমেয়ে বলে ল্যাংগুয়েজটা মোলায়েম করতে চাও? নেভার। যা বলেছি তার একটা ওয়ার্ডও চেঞ্জ করবে না। কমা, সেমিকোলন সুদ্ধু লিখে ফেল।'

অগত্যা তাই লিখতে হয়েছে সুজাতাকে, এবং সেই সব চিঠি ছেলেমেয়েদের কাছে পাঠানোও হয়েছে।

রণধীর রোজ এক পাতা করে দিনলিপি লেখান, সেগুলোর নমুনা এই রকম।

'খবরের কাগজে আজ প্রকাশ্য দিবালোকে একটি মেয়ের ইজ্জৎহানির ঘটনা পড়ে শিউরে উঠলাম। কয়েকটা দুর্বৃত্ত অন্তত শ তিনেক লোকের সামনে এই জঘন্য অপকর্মটি করেছে। একজনও তার প্রতিবাদ করেনি। সব হিজড়ের দল। প্রত্যেকে একটা করে যদি চড় কষাত, শুয়োরের বাচ্চা অ্যান্টি-সোশালগুলোকে চেনা যেত না, তাদের বডিগুলো স্রেফ দলা পাকিয়ে যেত। বাঙালি শেষ হয়ে গেছে। মেরুদণ্ডহীন এই কেঁচোদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই।' ইত্যাদি।

'স্বাধীনতার তিন দশক পর থেকে পলিটিকসে যে নেতাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের বলা হচ্ছে পোস্ট-ইন্ডিপেনডেন্স পেট্রিয়টস। পেট্রিয়ট শব্দটাকে এমন অপমান পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে কেউ কখনও করেনি। এদের বেশির ভাগেরই এতটুকু স্যাক্রিফাইস নেই। বন্দুকবাজ, মার্ডারারদের দিয়ে বুথ জ্যাম করে, ছাপ্পা ভোট দিয়ে পলিটিক্যাল পাওয়ার হাতের মুঠোয় রেখে ছেলেমেয়ে নাতিপুতির জন্য খালি মাল কামানো। রক্তচোষা দুশ্চরিত্র বজ্জাতের দল। এদের পাল্লায় পড়ে দেশ দিনকে দিন উচ্ছন্নে চলেছে। ইণ্ডিয়ার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সব অন্ধকার।'

দৈনন্দিন রুটিনের ফাঁকে ফাঁকে প্রায় রোজই সেই লোকটা, প্রভুদাস খৈতান ফোন করে। রণধীর মল্লিকের হুকুম, প্রভুদাসের নাম শোনামাত্র টেলিফোন নামিয়ে রাখতে হবে। মালিকের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে সুজাতা। কিন্তু লোকটা ভীষণ ধড়িবাজ। ফোন নামানোর মধ্যে যে সময়টুকু পায়, সে কাকুতি মিনতি করে, 'ম্যাডাম, বুঝতে পারছি, আমার নাম শুনলেই লাইন ডিসকানেক্ট করার ইনস্ট্রাকশন আছে আপনার ওপর। মল্লিক সাহেবকে ফোন দিতে হবে না। আপনার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই—' রূঢ় গলায় সুজাতা বলে, 'ডোন্ট ডিসটার্ব মি। আপনার কোনো কথা শোনার ইচ্ছা আমার নেই।'

এই ক'দিনে আরো কয়েকজন রণধীরকে ফোন করেছে। এরা হল জগন্ময় কুণ্ডু, নরেশ্বর খেমকা, হরগোবিন্দ দাগা, উমাপতি চট্টরাজ এবং বিশ্বনাথ সাহা। যথারীতি ফোনগুলো ধরতে হয়েছে সুজাতাকে। এদের সঙ্গে কথা বলবেন কিনা জিজ্ঞেস করায় একেবারে ফেটে পড়েছেন রণধীর, 'লাইন কেটে দাও, লাইন কেটে দাও। আমি ওদের কারো সঙ্গে কথা বলব না।'

লোকগুলো নাছোড়বান্দা জোঁকের মতো। লাইন কেটে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ফের তারা ফোন করে করে উত্যক্ত করে তুলেছে। সুজাতা অসহায়ভাবে রণধীরকে বলেছে, 'বার বার জ্বালাতন করছে। কী

করি বলুন তো?'

তাকে বাঁচাবার জন্য শেষ পর্যন্ত ওই লোকগুলোর ফোন এলে নিজেই কথা বলেছেন রণধীর, 'বাস্টার্ড, জানোয়ারের বাচ্চারা—' অকথ্য খিস্তিখেউড় করে প্রচণ্ড উত্তেজিত ভঙ্গিতে টেলিফোনটা আছাড় মেরে ফেলে দিয়েছেন তিনি।

জায়গামতো ফোনটা রেখে দিয়ে সুজাতা বলেছে, 'আপনি কিন্তু আবার এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছেন। আপনার হার্টের পক্ষে এটা ভীষণ ক্ষতিকর।'

চড়া গলায় রণধীর বলেছেন, 'হোক ক্ষতিকর। আমার সর্বনাশ করার চেষ্টা করবে আর মুখ বুজে থাকব! জুতিয়ে শালার ব্যাটাদের মুখ ভেঙে দেওয়া দরকার।'

প্রভুদাস সম্পর্কে আগেই সর্বনাশের কথা বলেছেন রণধীর। জগন্ময় কুণ্ডু নরেশ্বর খেমকাদের ব্যাপারেও তাঁর একই অভিযোগ, একই রকমের ক্রোধ। কিন্তু এই লোকগুলো কী ধরনের ক্ষতি করতে চায় সে সম্বন্ধে কিছুই জানাননি।

এর ভেতর একদিন যে ব্যাঙ্কটায় হিসেবের গোলমাল ধরা পড়েছে তার নাম করে রণধীর বলেছিলেন, 'সুজাতা, তোমাকে ওখানে যেতে হবে। আমার পাশ বই টই নিয়ে যাবে। ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা ভাল করে জেনে এস। আমার ধারণা, ওই দুলাল রাসকেলটাই সব গোলমালের রুট।'

সুজাতা ভয়ে ভয়ে বলেছে, 'একটা কথা বললে রাগ করবেন না তো?'

রণধীর একটা চোখ ছোট করে বলেছেন, 'রাগ করার মতো কিছু বলবে নাকি?'

সুজাতা উত্তর দেয় নি।

রণধীর কী ভেবে এবার বলেছেন, 'ঠিক আছে, বল—'

সুজাতা বলেছে, 'আপনার সঙ্গে প্রথম দিন আমার ডিউটির যে কথা হয়েছিল তার সঙ্গে টাকা পয়সার সম্পর্ক ছিল না। এ সব ব্যাপারে আমাকে জড়ালে—মানে হিসেব টিসেব আমি ঠিক বুঝি না।'

রণধীর সুজাতার মনোভাব আন্দাজ করে নিয়েছিলেন। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর অনুনয়ের সুরে বলেছেন, 'আমার সব কিছু চোর ডাকাতেরা লুটে পুটে নিক, এটাই কি তুমি চাও?'

সুজাতা চমকে উঠেছিল। পনের দিন কাজ হয়ে গেছে তার। সর্বক্ষণ তেরিয়া মেজাজে ছাড়া আগে তাঁকে দেখা যায়নি। সেদিনই প্রথম অমন নরম গলায় কথা বলতে শুনেছিল।

রণধীর থামেননি, 'আমি যদি সুস্থ থাকতাম, চিন্তা ছিল না। ডাক্তার বাড়ি থেকে বেরুতে, টেনসন নিতে বারণ করে। আমার টাকা পয়সা প্রোপার্টি প্রোটেক্ট করবে কে? তোমার ওপর অনেকটা নির্ভর করে আছি সুজাতা।'

অবাক সুজাতা বলেছে, 'আপনি আমাকে ক'দিনই বা দেখছেন! মাত্র দু সপ্তাহের পরিচয়ে কারো ওপর কি নির্ভর করা যায়?'

রণধীর বলেছেন, 'আমার চুল অনেক আগেই পেকে গেছে সুজাতা। এই বয়েসে মানুষ চিনতে ভুল হয় না। তোমাকে বিশ্বাস করে যদি ঠকি, বুঝব সেটা আমার অদৃষ্ট।'

অগত্যা নিরুপায় হয়েই সেই ব্যাঙ্কটায় যেতে হয়েছে সুজাতাকে। ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করার পর হিসেবের খাতা টাতা দেখে তিনি জানিয়েছেন, যে লাখ দেড়েক টাকার গোলমাল রয়েছে, ড় সেটা বিভিন্ন সময়ে পে-ইন স্লিপে তুলে নেওয়া হয়েছে।

খবরটা শোনামাত্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন রণধীর, 'এটা ওই দুলাল শুয়ারের বাচ্চাটার কাজ। আ এভাবে সিগনেচার জাল করে টাকাটা তুলে নিয়েছে। ওকে আজই আমি লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব' ও দিল না।

'সেটা কি ঠিক হবে?'

'কেন নয়? আমার টাকা মারবে, আর আমি ওকে কোলে বসিয়ে ক্ষীর খাওয়াব?' অর্ডার করাতেন।

সুজাতা বুঝিয়েছে, দুলাল লোকটা ভাল নয়। তবু যতদিন চাকরিতে আছে, খানি এ দেওয়া হয়েছে?' রাখা যাবে। কিন্তু তাড়িয়ে দিলে সে মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে।

যুক্তিটা মেনে নিয়েছেন রণধীর। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলেছেন, 'তুমি

স্কাউন্ড্রেল চিটটাকে ব্যাঙ্কে আর পাঠাব না।'

সুজাতা উত্তর দেয়নি। নিজের টাকা পয়সার ব্যবস্থা কাকে দিয়ে করাবেন, সেটা সম্পূর্ণ রণধীরের ব্যাপার। এ বিষয়ে তার কিছু বলার নেই।

রণধীর এবার বলেছেন, 'যে ব্যাঙ্কটায় তুমি গিয়েছিলে, সেটা ছাড়াও আরো পাঁচটা ব্যাঙ্কে আমার অ্যাকাউন্ট আছে। এখন থেকে তুমি যদি সেগুলো দেখাশোনা কর—মানে চেক জমা দেওয়া, টাকা-তোলা, পাশ বই আপ-টু-ডেট করা, ফিক্সড ডিপোজিটগুলো রিনিউ করার থাকলে করে আসা—'

তাঁকে শেষ করতে না দিয়ে সুজাতা বলেছে, 'দয়া করে আমাকে এ সবের মধ্যে ইনভলভ করবেন না। আপনি অনেক করে যে ব্যাঙ্কটায় হিসেবে গোলমাল আছে, দেখে আসতে বলেছিলেন। তাই গিয়েছিলাম। এরপর আমি আর পারব না।'

রণধীর কিন্তু খেপে ওঠেন নি। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর শান্ত গলায় বলেছেন, 'ঠিক আছে, যা বললে তাই হবে। তবে আমার একটা রিকোয়েস্ট কিন্তু রাখতে হবে। না বললে কিন্তু শুনব না।'

সন্দিগ্ধভাবে সুজাতা জিজ্ঞেস করেছে, 'কী রিকোয়েস্ট?'

রণধীর বলেছেন, 'মাসে দু বার আমি নিজেই ব্যাঙ্কে যাব। তখন আমার সঙ্গে তোমাকেও যেতে হবে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুজাতা বলেছে, 'আচ্ছা—'

এর মধ্যে অন্য একদিন রণধীর দুপুরে খেতে খেতে বলেছেন, 'তোমার একটা পরামর্শ চাই।'

এ বাড়িতে চাকরি নেবার পর থেকে লোকটা শত পাকে সুজাতাকে জড়িয়ে ফেলতে চাইছে। পরামর্শ চাওয়ার নাম করে আবার কী মতলব ভাঁজছে, কে জানে। সংশয়ের দৃষ্টিতে রণধীরকে লক্ষ করতে করতে সে জিজ্ঞেস করেছে, 'কী পরামর্শ?'

রণধীর জানিয়েছেন, 'মল্লিক ভবন' ছাড়াও তাঁদের আরো তিনটে বাড়ি আর বৌবাজারের কাছে মার্কেট রয়েছে। এগুলো ভাড়া দেওয়া আছে। এতকাল ব্যাঙ্কের কাজকর্মের সঙ্গে ভাড়া আদায়ের দায়িত্বও দুলালকে দেওয়া হয়েছিল। ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা তার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাড়ি ভাড়া এবং মার্কেট ভাড়া নিয়ে সমানে কারচুপি করে আসছে সে। রণধীরের ইচ্ছা, দুলালকে আর ভাড়া আদায় করতে পাঠাবেন না। সুজাতাকে জিজ্ঞেস করেছেন, 'তুমি কী করতে বল?'

সুজাতা কয়েক দিন আগের সেই যুক্তিটাই দেখিয়েছে। সবে ব্যাঙ্ক হাতছাড়া হয়েছে। এখন যদি দুলালের কাছ থেকে বাড়িভাড়া তোলার কাজটা কেড়ে নেওয়া হয়, সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে এবং রণধীরের সর্বনাশ করার জন্য উঠে পড়ে লাগবে। যা করার ধীরে সুস্থে করাই ভাল।

রণধীর বলেছেন, 'তার মানে আরো কিছুদিন দুলাল লুটে পুটে খাক, এই তো?'

সুজাতা জবাব দেয় নি।

একটু চিন্তা করে রণধীর বলেছেন, 'একটা কাজ কর তুমি। একজন বিশ্বাসী লোক জোগাড় করে দাও।'

সুজাতা জিজ্ঞেস করেছে, 'ভাড়ার টাকা তুলে আনার জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

'তেমন লোক আমি কোথায় পাব?'

'কেন, ওই ছোকরা, তোমার বয়ফ্রেন্ড—কী যেন নাম?'

সুজাতা চমকে উঠেছে। রণধীর মল্লিক তলায় তলায় বিজনকে যে টার্গেট করে বসেছেন, তা কে জানত! সে বলেছে, 'তাকে দিয়ে কী হবে?'

রণধীর বলেছেন, 'কেন, দুলালের কাজটা ও করবে।'

বিজন ভাড়াটেদের কাছে ঘুরে ঘুরে টাকা তুলবে, ভাবাই যায় না। সুজাতা বলেছে, 'ও এ সব করবে না।'

রণধীর গরম হয়ে উঠেছেন, 'কেন করবে না? এখন কী করে সে?'

সুজাতা আগেই জানিয়ে দিয়েছিল। খুব সম্ভব রণধীরের মনে নেই। অগত্যা আবার বলতে হয়েছে।

রণধীর জিজ্ঞেস করেছেন, 'কম্পিউটারে ট্রেনিং দিয়ে কত টাকা পায়?'

'সাড়ে তিন হাজার।'

'আমি তাকে দশ হাজার দেব। ওকে কালই আমার এখানে নিয়ে আসবে।'

'আমার যতদূর ধারণা, ও আসবে না।'

চোখমুখের চেহারা উগ্র হয়ে উঠেছে রণধীরের, 'ভাড়া আদায় করলে প্রেস্টিজ যাবে বুঝি? তাকে তো ডাকাতি রাহাজানি করতে বলছি না। অনেস্টলি কাজ করবে। দশ হাজার কম টাকা! অফিসে ঢুকলে কত বছর ঘষটালে এই টাকা পাওয়া যায়! প্রেস্টিজ করে করে বাঙালি উচ্ছন্নে গেল। যদ্দিন না এরা বুঝছে কোনো কাজই ফ্যালনা নয়, তদ্দিন এ জাতের কিস্‌সু হবে না।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় বেশ মজাই লেগেছিল সুজাতার। প্রথম দিনই রণধীর জানিয়ে দিয়েছিলেন, বিজন যেন কখনও 'মল্লিক ভবন'-এর চৌহদ্দির ভেতর না ঢোকে। তাকেই কিনা নিয়ে আসতে বলছিলেন। হয়তো নিষেধাজ্ঞার কথাটা তাঁর মনে ছিল না।

বিজন সম্পর্কে যা বলার আগেই বলে দিয়েছে সুজাতা। তাই রণধীরের শেষ কথাগুলোর জবাব দেয় নি।

রণধীরের মনে হয়তো একটু খটকা দেখা দিয়েছিল। কিছুক্ষণ ভেবে তিনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছেন, 'এক ক্ষুরে দু'জনে বুঝি মাথা কামাতে চাও না?'

অবাক হয়ে সুজাতা বলেছে, 'মানে?'

'মানে, এক জায়গায় দু'জনে কাজ করবে না—এই তো?'

সুজাতা চুপ করে থেকেছে।

রণধীর বলেছেন, 'ঠিক আছে, আমি আর রিকোয়েস্ট করছি না। তবে ভরসা করা যায়, এমন কাউকে দেখ।'

লেখাপড়া জানা বেকার, আপাত দৃষ্টিতে বেশ ভাল এবং সৎ, এই ধরনের চেনাশোনা দু-চারটি যুবক যে আদর্শনগরে নেই তা নয়। কিন্তু ভাড়া আদায় করতে গিয়ে প্রচুর নগদ টাকা হাতে পড়লে তাদের মাথা যে ঘুরে যাবে না, কে বলতে পারে! হয়তো টাকাটা নিয়ে উধাও হয়ে গেল। আজকাল একশ ভাগ ফুল-প্রুফ বিশ্বাসী মানুষ পাওয়া মুশকিল। কার ভেতর কী লুকিয়ে আছে, কে জানে। লোক জোগাড় করার দায়িত্ব কোনোমতেই নেবে না সুজাতা। মনে তার যা-ই থাক, মুখে বলছে, 'আচ্ছা দেখব।'

সাত

আরো কিছুদিন কেটে যায়। বই পড়া, কাগজ পড়া, ফোন অ্যাটেণ্ড করা ইত্যাদি ডিউটির সঙ্গে নতুন দুটো কাজও সুজাতার কাঁধে চেপেছে। গাড়ি ভাড়া করে যেদিন রণধীর ব্যাঙ্কে যান, তাকে সঙ্গে যেতে হয়। বিভিন্ন মিশন, কাশীর বিধবা আর ডরোথি পেজকে মানি অর্ডারের দায়িত্বও তাকে নিতে হয়েছে। সুজাতা আপত্তি করেছিল কিন্তু রেহাই মেলেনি।

রণধীর মানুষটা যথেষ্ট বিবেচক। দুটো বাড়তি কাজের জন্য মাইনের সঙ্গে এক্সট্রা আড়াই শ টাকা দেন।

গতানুগতিক পদ্ধতিতে সময় কাটতে কাটতে আজ দুটো অস্বস্তিকর ঘটনা ঘটল।

আদর্শনগর থেকে যথারীতি ন'টার কয়েক মিনিট আগে পীতাম্বর লাহা রোডে পৌঁছে গিয়েছিল সুজাতা। 'মল্লিক ভবন'-এর গেটের কাছে আসতেই দেখা গেল, দুলাল হালদার দাঁড়িয়ে আছে। হাতজোড় করে বলল, 'দিদি, আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

এক মাসেরও বেশি 'মল্লিক ভবন'-এ যাতায়াত করছে সুজাতা কিন্তু আগে কখনও দুলালকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেনি। ভয় ঠিক নয়, অস্বস্তি বোধ করল সে। তবে দুলালকে তা বুঝতে দিল না। সতর্কভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কেন বলুন তো? কিছু দরকার আছে?'

দুলাল ঘাড় হেলিয়ে বলে, 'হ্যাঁ। বড়বাবু আমাকে দিয়ে এতদিন নানা জায়গায় মানি অর্ডার করাতেন। আপনি এখানে জয়েন করার পর আর করাচ্ছেন না। ওই কাজটা কি আপনাকে দেওয়া হয়েছে?'

সুজাতা বলল, 'যদি দেওয়া হয়েই থাকে, আপনার অসুবিধাটা কোথায়?'

'অসুবিধা আর কী?' দুলাল বলে, 'আপনি লেখাপড়া জানা মেয়ে, এম. এ পাশ। এই সব ছ্যাঁচড়া কাজ আপনি কেন করবেন?'

উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সুজাতা।

দুলাল এবার বলে, 'বড়বাবুর সঙ্গে আপনি ব্যাঙ্কেও তো যাচ্ছেন। এই কাজটাও কিন্তু আমার ছিল।'

সুজাতা বলল, 'তা থাকতে পারে। কেন আমাকে মল্লিক সাহেব ব্যাঙ্কে নিয়ে যান, সেটা তাঁকেই জিজ্ঞেস করুন না। মনিব হুকুম করলে তা তো মানতেই হয়—আপনি কী বলেন?'

দুলাল বলল, 'আপনার যা ডিউটি তাতে মানি অর্ডার করা, ব্যাঙ্কে যাওয়া কিন্তু পড়ে না।'

লোকটা তার সম্বন্ধে অনেক খবর রাখে, দেখা যাচ্ছে। ভালমানুষের মতো মুখ করে সুজাতা বলল, 'এতে তো আপনার ভালই হয়েছে। কাজের চাপ অনেকটা কমে গেছে।'

'অনেক দিনের অভ্যাস তো। ওগুলো না করলে মনে হয়, পুরো ডিউটি করা হল না।'

ভাবখানা, এমন কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারী আর হয় না। মহা ধূর্ত, ধড়িবাজ লোক। মানি অর্ডার আর ব্যাঙ্কের কারচুপি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অস্থির হয়ে উঠেছে দুলাল। সুজাতা বলল, 'বেশ তো, মল্লিক সাহেবের কাছ থেকে কাজ দুটো চেয়ে নিন না।'

দুলাল বলল, 'যা রগচটা লোক! আমি বলতে গেলে চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে ফেলবেন। আপনি যদি দয়া করে—' বলতে বলতে থেমে যায়।

সুজাতা বলল, 'তার মানে আপনি চাইছেন, মল্লিক সাহেবকে বলব, ও দুটো যেন আপনাকে ফেরত দেন?'

হাত কচলাতে কচলাতে একমুখ হাসে দুলাল, 'হ্যাঁ, দিদি। আপনার দয়া তা হলে জীবনে ভুলব না।'

সুজাতা দুলালের চোখে চোখ রেখে বলল, 'যদি না বলি?'

দুলালের চোখের ভেতর থেকে আগুনের ঝলক বেরিয়ে আসে। তার হিংস্র চাউনি বুঝিয়ে দেয় লোকটা কতটা সাঙ্ঘাতিক। তার স্বার্থে ঘা লেগেছে, সহজে সে ছাড়বে না। স্বাভাবিক কারণেই সুজাতার ভয় পেয়ে যাবার কথা। কিন্তু হঠাৎ অসম্ভব এক জেদ তার ওপর যেন ভর করে। স্থির দৃষ্টিতে সে দুলালকে লক্ষ করতে থাকে।

দুলালের চোখের সেই আগুনটা পলকের জন্য দেখা দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল। আবার আগের মতোই বিনীত চেহারা তার। বশংবদ ভঙ্গিতে সে বলে, 'বলবেন, বলবেন—'

লোকটার বিনয়ের আড়ালে লুকনো হুমকি যে রয়েছে তা টের পাওয়া যাচ্ছে। মাথায় হঠাৎ আগুন ধরে যায় সুজাতার। রূঢ়ভাবে কিছু বলতে গিয়ে নিজেকে সংযত করে নেয় সে। জানায়, 'আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আপনার সঙ্গে এখন আর কথা বলতে পারব না।'

দুলালের যেন হঠাৎ মনে পড়ে যায়। সে ব্যস্তভাবে বলে, 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার তো ন'টা থেকে ডিউটি শুরু। ঠিক আছে, যান। আমার কথাটা কিন্তু মনে রাখবেন।'

উত্তর না দিয়ে গেটের গায়ের সেই কলিং বেলটা টেপে সুজাতা। একটু পর মঙ্গলা এসে গেট খুলে দিলে বাড়ির ভেতর চলে যায়।

তেতলায় উঠে রণধীরের মুখোমুখি বসে রুটিন অনুযায়ী কাজ করতে থাকে সুজাতা। কিন্তু মাথার ভেতর দুলালের চিন্তাটা অদৃশ্য ঘুণপোকার মতো থেকেই গেছে। তার কথা রণধীরকে জানানো কি ঠিক হবে? রণধীর মল্লিক অসুস্থ, বৃদ্ধ মানুষ। তাঁকে বললে খানিকক্ষণ তোড়ে গালাগাল দেবেন। এর বেশি আর কিছু করার ক্ষমতা তাঁর আছে কিনা কে জানে। দুলাল যদি বাড়াবাড়ি করে, সুজাতা নিজেও কী করবে, এই মুহূর্তে জানা নেই। তবে কিছু একটা করতেই হবে—কঠোর এবং নির্মম। আপাতত কিছুদিন সতর্কভাবে লোকটার গতিবিধি লক্ষ করা যাক।

আজকের দিনটা মোটামুটি ঘটনাবহুল এবং রীতিমত অস্বস্তিকরও।

সকালে দুলালের প্রচ্ছন্ন হুমকি শুনতে হয়েছে। সন্ধে সাতটায় ছুটির পর 'মল্লিক ভবন' থেকে বেরিয়ে সুজাতা যখন বড় রাস্তার মুখে চলে এসেছে, সেই সময় একটা মাঝবয়সী লোক—তরতরে কামানো

মুখ, মাঝারি হাইট, চোখে দামি চশমা, পরনে দামি ট্রাউজার্স আর শার্ট, হাতে সোনার ব্যাণ্ডে নাম-করা বিদেশি কোম্পানির ঘড়ি, দারুণ স্মার্ট—সামনে এসে হাতজোড় করে বলল, 'নমস্কার ম্যাডাম—'

লোকটাকে আগে কখনও দেখেনি সুজাতা। তবে গলার স্বর চেনা চেনা মনে হল। ভয় ঠিক নয়, ভেতরে ভেতরে বেশ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগল সে। দুলালকে দেখে যেমনটা লেগেছিল তার চেয়েও অনেক গুণ বেশি। বলল, 'নমস্কার। আপনাকে তো ঠিক—'

'চিনতে পারছেন না তো? আমি প্রভুদাস খৈতান।' লোকটা হেসে হেসে বলতে লাগল, 'যার নাম শুনলে আপনার এমপ্লয়ার মল্লিক সাহেব শালা শুয়ারের বাচ্চা বলে থাকেন। লেকেন আমি শুয়ারের বাচ্চা কতটা আছি জানি না, লেকেন গণ্ডারের বাচ্চা তো জরুর। আমার গায়ের চামড়া পাঁচ ইঞ্চি থিক। ইনসাল্ট, খিস্তি কুছ ভি আমার গায়ে বেঁধে না।'

নিজের চরিত্র সম্বন্ধে এমন স্বীকারোক্তি করতে আগে আর কাউকে কখনও দেখেনি সুজাতা। বলল, 'আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। যদি কিছু দরকার থাকে তাড়াতাড়ি বলুন।'

খানিক দূরে ফুটপাথ ঘেঁষে একটা মারুতি-এসটিম দাঁড় করানো রয়েছে। সেটা দেখিয়ে প্রভুদাস বলল, 'আপনি তো শিয়ালদায় গিয়ে ট্রেনে উঠবেন। কাইণ্ডলি আমার গাড়িতে উঠুন। স্টেশনে আপনাকে পৌঁছে দিতে দিতে দু-চারটে আর্জেন্ট কথা বলতে পারি।'

বোঝা যাচ্ছে, প্রভুদাসও তার সম্বন্ধে অনেক খবর রাখে। তার যাতায়াতের ওপর খুব সম্ভব সে লক্ষ রেখে গেছে। লোকটার স্পর্ধায় অসহ্য রাগে মাথার ভেতরটা টগবগ করে ফুটতে থাকে সুজাতার। শুরুতেই তাকে টিট করা দরকার। দাঁতে দাঁত ঘষে তীব্র গলায় সে বলে, 'আপনার সাহস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি মিস্টার খৈতান। যে সব মেয়েদের বললেই গাড়িতে উঠে বসে আমি তাদের মধ্যে পড়ি না।'

আঁতকে ওঠার ভাব করে, তাড়াতাড়ি জিভ কেটে, কানে হাত দিয়ে প্রভুদাস বলে, 'বহুৎ ব্যাপারে আমার কুছ কুছ বদনাম আছে। লেকেন মহিলাদের আমি ইজ্জৎ দিই। আপনি আমার বহীনের মতো। ঠিক আছে, আপনাকে গাড়িতে ওঠার কথা বলে অন্যায় হয়ে গেছে। ক্ষমা করে দেবেন। আপনি তো বাস স্টপেজ পর্যন্ত যাবেন—'

'হ্যাঁ, কেন?'

'আপনার সঙ্গে সেখানে যেতে চাই। আমার কুছ কুছ কথা আছে। দো-চার মিনিটের বেশি লাগবে না।'

কৌতূহল যদিও হচ্ছিল, সেটা বুঝতে দিল না সুজাতা। গম্ভীর মুখে বলল, 'আপনাকে আমি চিনি না, আপনিও আমাকে চেনেন না। আমার সঙ্গে আপনার কী এমন কথা থাকতে পারে?'

প্রভুদাস বলল, 'সেটা শুনলেই বুঝতে পারবেন।'

'ঠিক আছে, এখানেই বলুন।'

কোনোরকম ভণিতা না করে প্রভুদাস বলতে শুরু করল। সে নিজে একজন প্রোমোটার, বিরাট কনস্ট্রাকশন কোম্পানি আছে তার। প্রভুদাসের ইচ্ছা, 'মল্লিক ভবন' ভেঙে সে তিনটে বিরাট হাইরাইজ তুলবে। কলকাতা শহরে যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ, বাসস্থানের একান্ত অভাব, সেখানে বিঘেখানেক জায়গা নিয়ে একটা লোক থাকবে, এটা চূড়ান্ত স্বার্থপরতা। বিনা পয়সায় বাড়িটা দখল করতে চায় না প্রভুদাস। এর জন্য নগদ আড়াই তিন কোটি টাকা দেবে রণধীর মল্লিককে। তা ছাড়া বাড়ি তৈরি হয়ে গেলে একটা বাড়ির আস্ত একটা ফ্লোরও, কম করে পাঁচ ছ হাজার স্কোয়ার ফিটের মতো ফ্ল্যাট তাঁকে দেওয়া হবে।

প্রভুদাস বলতে লাগল, 'আপনি বলুন ম্যাডাম, আমার প্রোপোজালটা হানড্রেড পারসেন্ট ঠিক আছে কিনা?'

এতদিনে লোকটার অনবরত ফোন করার এবং এখন রাস্তায় তার জন্য অপেক্ষা করার উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট হয়ে যায়। সুজাতা কী বলবে ভেবে পায় না।

প্রভুদাস একটানা বলে যায়, 'মল্লিক ভবন'-এ ঢোকার উপায় নেই। সবসময় তালাবন্ধ, ফোন

করলে মল্লিক সাহেব ধরেন না। যদিও বা ধরেন, শালা শুয়ারের বাচ্চা বলে আমার ফোরটিন জেনারেশন উদ্ধার করে দেন।' একটু থেমে অনুনয়ের সুরে বলল, 'এই ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।'

সুজাতা চমকে ওঠে, 'আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করব?'

'আমি খবর পেয়েছি, আপনাকে মল্লিক সাহেব ভালবাসেন, খুব ট্রাস্ট করেন।' প্রভুদাস বলতে থাকে, 'ওঁর ছেলেমেয়েরা কেউ কাছে থাকে না। দু'জন আছে বিদেশে, দু'জন অবশ্য কলকাতাতেই রয়েছে। লেকেন বাবার সঙ্গে ওদের কোনো সম্পর্ক নেই। মল্লিক সাহেবের ম্যাসিভ একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। উনি তো ইমমর্টাল নন। আজ হোক কাল হোক, ওঁর দেহান্ত হবেই। ওঁকে বোঝান, তার আগেই বাড়িটা যেন আমার হাতে তুলে দেন। এতে মল্লিক সাহেবের ম্যাক্সিমাম লাভ হবে।'

'আমি ওঁর একজন অর্ডিনারি এমপ্লয়ী মাত্র। আমার কথা উনি শুনবেন কেন?'

প্রভুদাস বলে, 'শুনবেন শুনবেন। ওই যে বললাম আপনার ওপর মল্লিক সাহেবের বহুৎ অ্যাফেকশান আর ভরসা আছে।'

তেরিয়া মেজাজ আর রুক্ষ ব্যবহার সত্ত্বেও তার প্রতি রণধীর মল্লিক যে কিছুটা দুর্বল, তাকে যে খুবই বিশ্বাস করেন সেটা এই ক'দিনেই বুঝে গেছে সুজাতা। কিন্তু প্রভুদাস তো 'মল্লিক ভবন'-এ ঢোকার সুযোগ পায় না। তা হলে এ সব খবর সে পায় কী করে? নিশ্চয়ই রণধীরের কাজের লোকেদের ভেতর তার গুপ্তচর আছে। তাদেরই কেউ প্রভুদাসকে জানায়।

সুজাতা বলল, 'আপনার কথামতো ধরা যাক, মল্লিক সাহেব আমাকে স্নেহ করেন। কিন্তু তাই বলে আমি বোঝাতে চেষ্টা করলে উনি বুঝবেন কেন? এটা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'কেউ যদি তাঁর পূর্বপুরুষের বাড়ি ভেঙে হাইরাইজ করতে দিতে না চান, তাঁকে উত্যক্ত করা কি ঠিক হবে?'

প্রভুদাস বলে, 'ম্যাডাম, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। কারেক্ট জবাব দেবেন—'

সুজাতা বলে, 'বলুন কী জানতে চান?'

'জগন্ময় কুণ্ডু, নরেশ্বর খেমকা, হরগোবিন্দ দাগা, উমাপতি চট্টরাজ আর বিশ্বনাথ সাহা—এক্সকিউজ মাই ল্যাংগুয়েজ, এই শালে হারামজাদের বাচ্চাগুলো মল্লিক সাহেবকে রোজ ফোন করে না?'

'হ্যাঁ, করে।'

'এরা কারা জানেন?'

'না।'

'এরাও আমার মতো প্রোমোটার, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের বিজনেস আছে। 'মল্লিক ভবন'-এর ওপর ওদেরও নজর রয়েছে।'

প্রেমোটারদের নানা ভয়ঙ্কর কীর্তিকলাপের কাহিনী প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজে বেরোয়। স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরা না পারে এমন কাজ নেই। এদের হাতে থাকে পোষা বন্দুকবাজের দল। দেখা যাচ্ছে, এক পাল নেকড়ে 'মল্লিক ভবন' গ্রাস করার জন্য ওত পেতে আছে।

প্রভুদাস আবার বলল, 'মল্লিক সাহেবকে বলবেন, এই লোকগুলো বাড়িটার জন্যে যত টাকা অফার করবে, আমি তার চেয়ে পঞ্চাশ লাখ বেশি দেব।'

সুজাতা বলে, 'দেখুন মিস্টার খৈতান, আমি যতদূর জানি, ওই লোকগুলো এখন পর্যন্ত কোনো অফার দিতে পারে নি। মল্লিক সাহেব ওদের ফোনও ধরেন না।'

'ফাইন।'

একটু চুপ করে থেকে প্রভুদাস বলল, 'ম্যাডাম, আপনার ট্রেনের টাইম হয়ে যাচ্ছে, আর আটকে রাখব না। আমার ব্রিফ আর একটা কথা আছে।'

'বলুন—'

'আপনি আমার বহীন বরাবর। অ্যাজ গুড অ্যাজ মাই সিস্টার। আপনাকে আমি ডিপ্রাইভ করব না। মল্লিক সাহেবের সঙ্গে ডিল করিয়ে দিলে আপনি দশ পনের লাখ পেয়ে যাবেন।'

মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল সুজাতার। সে জিজ্ঞেস করল, 'এটা ঘুষ, না দালালি?'

প্রভুদাস লোকটা তুখোড় অভিনেতা। স্টেজে নামলে অনেক নটসূর্য বা নটকেশরীর নাক কেটে নিতে পারত। দ্রুত কানে হাত ঠেকিয়ে যেন মরমে মরে যেতে যেতে বলে, 'এ আপনি কী বলছেন ম্যাডাম! ঘুষ টুষ বলে শরমিন্দা করবেন না। এ হল অনারেরিয়াম—আপনার সম্মান।'

সুজাতা উত্তর দিল না। বোঝা যাচ্ছে, লোকটা তাকে টাকা দিয়ে কাজ গুছিয়ে নিতে চাইছে।

প্রভুদাস এবার বলল, 'আপনাকে আগেও বলেছি, আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি, মানুষ অমর নয়। মল্লিক সাহেব মারা গেলে, ওই বাড়িতে কেউ না কেউ ঢুকে পড়বে। একবার দখল নিয়ে বসলে তাকে চট করে হটানো মুশকিল। তারপর কানুনের অনেক প্যাঁচ আছে। বাড়িটা বিনা পয়সায় স্রিফ অন্যের হাতে চলে যাবে।' বলে আর দাঁড়াল না। লম্বা লম্বা পা ফেলে মারুতি-এসটিমটার দিকে চলে গেল।

আট

প্রভুদাসের সঙ্গে সেদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে যে কথা হয়েছিল, রণধীরকে এখনও তা জানায় নি সুজাতা। এমন কি, নিজের মা, ভাইবোন এবং বিজনকেও না।

লোকটার মতলব পরিষ্কার। চড়া দাম দিয়ে 'মল্লিক ভবন' সে কিনে নিতে চায়। রণধীর বিক্রি করতে রাজি না হলে অন্য পদ্ধতিতে বাড়িটা দখল করবে। নিজের নাম না করেই প্রভুদাস বুঝিয়ে দিয়েছে, রণধীর মারা গেলে সে এই অরক্ষিত বাড়িতে ঢুকে দখল নেবার চেষ্টা করবে। একদল জঘন্য টাইপের লোক আছে, আইন কানুনকে যারা পণ্য করে তুলতে চাইছে। প্রভুদাস হয়তো তাদের একজন।

কিন্তু ঢুকে পড়লেই বাড়ির স্বত্ব পাওয়া যায় না। তার জন্য কী করতে পারে প্রভুদাস? লোকটা রণধীর মল্লিকের দলিল টলিল জাল করে রাখে নি তো? যা ধুরন্ধর, নানা জায়গায় ঘুষ টুষ খাইয়ে হয়তো নিজের কাজ হাসিল করে নেবে। সময় খুব খারাপ, অসৎ নোংরা মানুষে চারদিক ভরে গেছে। টাকা ছড়ালে এখন সব কিছু করিয়ে নেওয়া যায়।

সুজাতা অনেক বার ভেবেছে, প্রভুদাস যদি কৌশলে বা কারচুপি করে 'মল্লিক ভবন' দখল করে নেয় তাতে তার কী? একটা বয়স্ক মানুষ, কতদিন আর বাঁচবেন! তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ও বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। তারপর কী হল না হল তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ? রণধীর তো তাঁর প্রপার্টির ভাগ তাকে লিখে দেবেন না। একদিন 'মল্লিক ভবন'-এ সে কিছুকাল কাজ করেছিল, বিচিত্র একটা চরিত্রের সংস্পর্শে এসেছিল, স্মৃতিতে এটুকুই থেকে যাবে। তার বেশি কিছু নয়।

কিন্তু রণধীর এবং তাঁর 'মল্লিক ভবন'-এর চিন্তাটা মস্তিষ্ক থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলেও পারছে কই? ঘুরে ফিরে সেটা অনবরত হানা দিয়ে যাচ্ছে। যখন কোথাও ভাল কিছু সে পাচ্ছে না, এই লোকটিই তাকে ভদ্র রকমের একটা কাজ দিয়েছেন। যদিও রণধীর অত্যন্ত দুর্মুখ, রূঢ়ভাষী, মুখে তাঁর কিছুই আটকায় না, তবু নিয়মিত দিনে কয়েক ঘন্টা তাঁর সঙ্গে কাটিয়ে দেবার কারণে এটুকু বোঝা যাচ্ছে তাঁর মনটা আশ্চর্য রকমের ভাল। কঠোর আবরণের তলায় দয়া করুণা সহানুভূতি এই গুণগুলো রয়েছে। মানুষটার প্রতি ক্রমশ কেমন একটা মায়া পড়ে যাচ্ছে সুজাতার।

রণধীর সম্পর্কে রোজই তাদের বাড়িতে মা ভাইবোন এবং বিজনের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা হয়। বিজন তার সম্বন্ধে একটা মজাদার মন্তব্য করেছে—'লাভেবল খচ্চর'।

রণধীরকে নিয়ে প্রথম দিকে চিন্তা করবে না ভাবলেও সুজাতার মনে হয়, তাঁর মৃত্যুর পর মল্লিক বংশের বিশাল প্রপার্টির কী ভবিষ্যৎ? প্রভুদাস খৈতানদের মতো ফেরেববাজ বদমাশদের পেটে কি সব ঢুকে যাবে? হাত পেতে মাসের শেষে লোকটার টাকা সে নেয়। চূড়ান্ত ক্ষতি থেকে তাঁর বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করা কি তার উচিত নয়? কিন্তু কিভাবে?

একদিন দুপুরবেলা মুখোমুখি বসে খেতে খেতে সুজাতা জিজ্ঞেস করে, 'একটা কথা জানতে চাইলে আপনি কি রাগ করবেন?'

কপাল কুঁচকে রণধীর বললেন, 'আমি বুঝি সারাক্ষণ রেগেই থাকি? ঠিক আছে, বল—'

বোঝা যাচ্ছে, মেজাজটা যে কারণেই হোক, ভাল আছে রণধীরের। সে বলল, 'আপনার অনেক

প্রপার্টি, প্রচুর টাকাপয়সা, বড় বড় কোম্পানির অসংখ্য শেয়ার—'

'তুমি তো সবই জানো। নতুন করে এসব জিজ্ঞেস করার মানে কী?'

'দেখুন, মানুষের বয়েস বাড়লে বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কে আগেই সব ব্যবস্থা করে রাখে। তাই—'

খাওয়া থামিয়ে স্থির দৃষ্টিতে সুজাতাকে লক্ষ করতে লাগলেন রণধীর। বললেন, 'আমি উইল টুইল করে রেখেছি কিনা, এটাই কি জানতে চাইছ?'

সুজাতা উত্তর দিল না।

রণধীর এবার বললেন, 'তুমি হয়তো ভাবছ, ফট করে মরে গেলে আমার প্রপার্টির কী হবে?'

সুজাতা আস্তে মাথা নাড়ে, 'হ্যাঁ, মানে—'

রণধীর একটু ভেবে বললেন, 'তুমি কি আমার কাছে কিছু চাও?'

সুজাতা হকচকিয়ে গেল, 'না না, কিচ্ছু না। আমার স্যালারির বাইরে এক্সট্রা একটা পয়সাও আমি নেব না। আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু লোভী নই। পরিশ্রম করে অনেস্টলি যা রোজগার করতে পারব না, তাতে আমার লোভ নেই। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।' শেষ দিকে তার গলার স্বর অত্যন্ত দৃঢ় শোনায়।

কপালের ভাঁজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় রণধীরের। মুখটা এখন অনেক নরম দেখাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হলে উইলের কথা জানতে চাইছ কেন?'

সুজাতা বলল, 'আপনার ছেলেমেয়েরা আছে। তারা—'

কথাটা শেষ করার আগেই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিলেন রণধীর, 'সেই উল্লুকের বাচ্চাদের সম্বন্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করবে না। ওদের সঙ্গে আমার কোনো রিলেশান নেই।'

এরপর আর কিছু বলার থাকে না। সুজাতা চুপ করে যায়।

নয়

আজ ডিউটি শেষ হবার পর শিয়ালদা স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের গেটে এসে দেখা গেল, অন্যদিনের মতো যথারীতি দাঁড়িয়ে আছে বিজন। ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। দু'জনে সেদিকে হাঁটতে লাগল।

অন্যদিন বনগাঁ লাইনের এই ট্রেনটার জন্য থিকথিকে ভিড় থাকে প্ল্যাটফর্মে। তুলনায় লোকজন আজ অনেক কম। খুব সম্ভব আগের ট্রেনটায় অনেক প্যাসেঞ্জার চলে গেছে, নইলে এর পরের ট্রেনটায় যাবে।

মোটামুটি ফাঁকা একটা কামরায় জানালার ধার ঘেঁষে বিজন আর সুজাতা বসে পড়ে।

রোজই আদর্শনগরে যেতে যেতে 'মল্লিক ভবন'-এ সারাদিনে যা যা ঘটেছে, সব জানায় সুজাতা। আজও জানাল। রোজকার রুটিন অনুযায়ী সমস্ত কিছু হয়েছে। তার বাইরে চাঞ্চল্যকর কিছু ঘটে নি।

রাতের অন্ধকারে ট্রেন উর্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে। দুধারে প্রচুর বাড়িঘর, আলো। মাঝে মাঝে ফাঁকা মাঠ, খাল, খালের ওপর সাঁকো। কলকাতা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। কয়েক বছরের ভেতর শহরটা খুব সম্ভব বাংলাদেশ বর্ডারে গিয়ে ঠেকবে।

'মল্লিক ভবন'-এর ঘটনাবলী রিপোর্ট করার পর এখন সুজাতা জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে। পাঁচ সাত মিনিট পর পর এক একটা স্টেশনে ট্রেন থামে। তিরিশ সেকেন্ডও দাঁড়ায় কি দাঁড়ায় না, আবার দৌড় শুরু হয়।

হঠাৎ বিজন একসময় ডাকে, 'রুনু—' আদর্শনগরে একই পাড়ায় তারা থাকে, একই সঙ্গে তারা বড় হয়ে উঠেছে। ডাক-নামেই পরস্পরকে তারা ডাকে।

সুজাতা মুখ ফিরিয়ে বিজনের দিকে তাকায়। বিজন বলে, 'তোমাকে একটা মোটামুটি সুখবর দিচ্ছি।'

একটু অবাক হয়ে তাকায় সুজাতা। সুখবর তাদের জীবনে একান্তই দুর্লভ। তার চোখে মুখে সত্যিকারের বিস্ময় ফুটে বেরোয়।

বিজন এবার বলে, 'হানড্রেড পারসেন্ট সিওর নই, তবে মনে হচ্ছে, বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লেও ছিঁড়তে পারে।'

সুজাতা বলে, 'হেঁয়ালি করা তোমার চিরকালের অভ্যাস। কী হয়েছে সেটাই বল—'

'মূর্তিমান অপটিমিজম তোমাকে দেখা করতে বলেছে।'

'মানে?'

'শৈলেশ্বর ভট্টশালীর কথা বলছি।'

শৈলেশ্বর এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের একজন অফিসার। বছরের পর বছর তাঁর কাছে নিয়মিত হানা দেবার কারণে বিজন এবং সুজাতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় তো বটেই, খানিকটা ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে। সারাক্ষণ মুখে হাসি, অনবরত পান চিবোন। বয়স পঞ্চাশের ওপরে। চার্লি চ্যাপলিন মার্কা গোঁফ ভদ্রলোকের, মাথার ডানপাশ দিয়ে সিঁথি। মুখখানা গোলাকার, আধখানা সার্কেলের মতো ভুরু। পরনে ঢোলা ফুল প্যান্ট এবং ডাবল-কাফওলা ঢলঢলে ফুল শার্ট। সিনেমার কমিক চরিত্রে নামলে মাত করে দিতে পারতেন।

একদা পূর্ব বাংলায় পূর্বপুরুষদের বাড়ি ছিল শৈলেশ্বরের। খুব ছেলেবেলায়, তখন তাঁর বয়স সাত কি আট, সীমান্তের এপারে চলে আসেন মা-বাবার সঙ্গে। দেশের সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক নেই। সেই যে এসেছিলেন, তারপর পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে পূর্ব বাংলা স্বাধীন বাংলাদেশ হল, কিন্তু আর সেখানে যাওয়া হয়নি। সর্বস্ব গেছে কিন্তু ওখানকার ভাষাটা প্রাণপণে অসীম জেদে আঁকড়ে ধরে আছেন। এতকাল কলকাতায় কেটে গেল কিন্তু ঢাকার ডায়ালেক্ট ছাড়া কথা বলেন না। সুদূর অতীতে পূর্বপুরুষের যে দেশটা ছিল, তাঁর স্মৃতি থেকে যা প্রায় বিলীন হয়ে গেছে, তার সঙ্গে ওটুকু বন্ধনই বজায় আছে। দেশ কোথায়, জিজ্ঞেস করলে এখনও বলেন—ঢাকা।

দিনে শ খানেক তরুণ তরুণী তাঁর সঙ্গে দেখা করে। বার বার ঘোরাঘুরি করে হতাশ হয়ে হয়তো কেউ বলল, 'দূর, কিছুই হবে না। আপনার কাছে ছোটাছুটিই সার।'

তাড়াতাড়ি জিভ কেটে শৈলেশ্বর বলেন, 'আশা ছাড়তে নাই। হতাশ হওন মহাপাপ। একদিন না একদিন কিছু একটা হইবই। রেগুলার আমার লগে কনট্যাক্টটা রাইখা যান।'

শৈলেশ্বরের আড়ালে সবাই তাঁকে মজা করে বলে, মূর্তিমান অপিটিমিজম। যারাই তাঁর কাছে যায়, তাদের তিনি উৎসাহ দিয়ে চাঙ্গা করে রাখেন। কাউকে কখনও ভেঙে পড়তে দেন না।

সুজাতা জিজ্ঞেস করল, 'শৈলেশ্বরবাবু দেখা করতে বলেছেন কেন?'

'তা জানি না। তবে ব্যাপারটা ভীষণ আর্জেন্ট।' বিজন বলতে লাগল, 'এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের অফিসার এতকাল পর যখন ডেকেছেন, আশা করা যায়, গুড নিউজ কিছু পাবে। গুড নিউজটা অবশ্য আমি গেস করেছি। উনি বলেন নি।'

'কবে যেতে বলেছেন?'

'কালই।'

'কাল কী করে যাব? মল্লিক সাহেবকে বলা নেই। যা খ্যাপা টাইপের লোক, না জানিয়ে ডুব দিলে ভীষণ খেপে যাবেন।'

বিজন বলল, 'জানিয়েই ডুব দেবে। এটা কিন্তু ভীষণ ইমপর্টান্ট ব্যাপার।'

ইমপর্টান্ট যে, সেটা ঠিকই বুঝতে পারছিল সুজাতা। কিন্তু এবার আর কিছু বলল না।

আদর্শনগর স্টেশনে নেমে পাশাপাশি হেঁটে যেতে যেতে এলোমেলো কথা বলছিল দু'জনে। কিন্তু চোখের সামনে রণধীর মল্লিকের মুখটা বার বার ভেসে উঠছিল। কাল না গেলে তার প্রতিক্রিয়াটা কী হবে বুঝে উঠতে পারছিল না সুজাতা।

একসময় তারা 'লীলাবতী ফার্মেসি'র সামনে চলে আসে। হঠাৎ কিছু মনে পড়ায় বিজন জিজ্ঞেস করে, 'রণধীর মল্লিক রাত্তিরে কখন যেন শুতে যান?'

সুজাতা বলল, 'সাড়ে ন'টায়। কেন?'

ঘড়ি দেখে বিজন বলল, 'এখনও ন'টা বাজে নি। নিশ্চয়ই উনি জেগে আছেন। 'লীলাবতী ফার্মেসি' থেকে ফোন করে জানিয়ে দাও, কাল তুমি যাচ্ছ না।'

কথাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হল। 'ঠিক বলেছ—' বলে সুজাতা 'লীলাবতী ফার্মেসি'তে ঢুকল। বিজন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে।

যজ্ঞনাথ চাকলাদার তাঁর চেয়ারটিতে বসে ছিলেন। তিনি বিজনের সঙ্গে সুজাতার সম্পর্কটা জানেন। একটু হেসে বিজনকে বললেন, 'বাইরে কেন, ভেতরে আয়।' এই পাড়ারই ছেলে, ছোটবেলা থেকে 'তুই' করেই বলেন।

দোকানে এখনও প্রচুর খদ্দের। বিজন বলল, 'আমি এখানেই থাকি। ভেতরে গেলে শুধু শুধু ভিড় বাড়ানো হবে।'

বিজনকে আর কিছু না বলে সুজাতার দিকে তাকালেন যজ্ঞনাথ, 'কি রে, কোনো দরকার আছে?'

সুজাতা বলল, 'একটা ফোন করব কাকা।'

'কর না—'

সুজাতাদের বাড়ির কেউ এখান থেকে ফোন করলে এক পয়সাও নেন না যজ্ঞনাথ। অন্যের বেলায় প্রতি ফোনের জন্য তাঁকে দুটাকা দিতে হয়।

যজ্ঞনাথ যেখানে বসেন তার পাশেই একটা সরু উঁচু কাঠের স্ট্যান্ডে ফোনটা রয়েছে। সেটা তুলে ডায়াল করে রণধীর মল্লিককে ধরে ফেলল সুজাতা।

রণধীর বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এ সময় ফোন আশা করেন নি। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার?'

সুজাতা ভয়ে ভয়ে বলল, 'একটা বিশেষ দরকারে কাল আমি যেতে পারব না। তাই ফোনটা করলাম। আপনার হয়তো একটু অসুবিধা হবে।'

রণধীর হয়তো ভাল মেজাজে রয়েছেন। তেরিয়া হয়ে উঠলেন না। শান্ত গলায় বললেন, 'অত ভণিতার দরকার নেই। চাকরির কন্ডিশন অনুযায়ী বছরে পনেরটা ক্যাজুয়াল লিভ রয়েছে কী করতে? যখন ইচ্ছা নিতে পার। আমার অসুবিধার কথা বললে? তা একটু হবে। কী আর করা যাবে? একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'হ্যাঁ, করুন না—'

'কাল তোমার রাজকার্যটা কী?'

এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জে যাবার কথাটা বলতে গিয়েও থেমে গেল সুজাতা। অন্য জায়গায় চাকরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, জানতে পারলে রণধীর মল্লিক নির্ঘাত খেপে যাবেন। চাকরি হবে কিনা তার ঠিক নেই। অকারণে আগে থেকে লোকটাকে চটিয়ে দিয়ে লাভ নেই। ভাসা ভাসা ভাবে সুজাতা বলল, 'এই, বাড়ির একটা দরকারে—'

রণধীর ধুরন্ধর লোক। বললেন, 'মানে স্পষ্ট করে আমাকে বলতে চাও না, এই তো? ঠিক আছে, আমি আর কিছু জানতে চাইছি না। পরশু আসছ তো?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'ঠিক আছে।'

রণধীর লাইন কেটে দিলেন। যজ্ঞনাথকে 'যাচ্ছি' বলে 'লীলাবতী ফার্মেসি' থেকে বাইরে বেরিয়ে এল সুজাতা।

বিজন জিজ্ঞেস করল, 'কাজ হয়েছে? বুড়ো ঘুঘু ব্যাগরবাই করেনি?'

সুজাতা বলল, 'না। এক কথায় রাজি হয়ে গেছে।'

'ফাইন।'

পরদিন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে একাই গেল সুজাতা। তার ইচ্ছা দিল, বিজন সঙ্গে যাক। কিন্তু আজ এগারটা থেকে ওর কম্পিউটার ক্লাস। সাড়ে তিনটের আগে ছাড়া পাবে না। ক্লাসগুলো পর পর, মাঝখানে একটুও গ্যাপ নেই।

শৈলেশ্বর ভট্টশালী অফিসের ভেতর দিকের একটা কামরায় বসেন। অন্যদিনের মতো আজও চ্যাপলিন-মার্কা গোঁফ, মুখে পান, গায়ে ঢলঢলে প্যান্টশার্ট, একটা চৌকো বড় টেবলের ওধারে গাদয়ান হয়ে বসে আছেন।

সরকারি অফিসে যেমন হয়, দেওয়াল ঘেঁষে ক'টা মান্ধাতার আমলের আলমারি, শৈলেশ্বরের টেবলে

চা এবং কালির চিরস্থায়ী দাগ, কিছু ফাইল, টেলিফোন এবং সামনের দিকে ভিজিটরদের জন্য ক'টা চেয়ার, ইত্যাদি।

শৈলেশ্বর পান চিবুতে চিবুতে চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বসো—' কয়েক বছর যাতায়াতের ফলে যে সম্পর্কটা হয়ে গেছে তাতে প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের ছোট সুজাতা বা বিজনকে তিনি আপনি টাপনি করে বলেন না।

সামনাসামনি বসে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে সুজাতা বলল, 'বিজন কাল রাতেই খবর দিয়েছিল, আপনি আজ দেখা করতে বলেছেন।'

শৈলেশ্বরের পান খাওয়ার নিজস্ব একটা স্টাইল আছে। তিনি পিক ফেলেন না। পানের রস মুখের ভেতরে অনেকক্ষণ রেখে দিতে পারেন এবং সেই অবস্থাতেই কথা বলেন। ফলে গলার ভেতর থেকে বগবগানো আওয়াজ বেরোয়। বললেন, 'ছ্যামরার (ছেলের) দায়িত্ব বোধ আছে, দেখতে আছি। ভ্যারি গুড—'

শৈলেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল সুজাতা, কিছু বলল না।

শৈলেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, 'চা খাইবা?'

আস্তে মাথা নাড়ে সুজাতা, 'না।' আসলে কেন শৈলেশ্বর তাকে ডেকেছেন, জানার জন্য ভেতরে ভেতরে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে সে। খানিকটা উদ্বিগ্নও। যদিও বিজন জানিয়েছে, সুখবরই দেবেন শৈলেশ্বর, তবু সেটা না জানা পর্যন্ত উদ্বেগটা কাটছে না।

সুজাতার মুখটা ভাল করে লক্ষ করতে করতে শৈলেশ্বর বললেন, 'অত ট্যানসনের কারণ নাই। চা আনাই। খাইতে খাইতে ডাকনের কারণখান শোনবা।'

তার জবাবের অপেক্ষা না করেই শৈলেশ্বর বেয়ারাকে দিয়ে দু কাপ চা আনালেন। মুখে পান থাকলে চা খাওয়া যায় না, অগত্যা টয়লেট থেকে মুখ ধুয়ে এলেন। চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'ম্যালা (অনেক) দিন তুমাগো দুই জনেরে ঘুরাইছি। মুখ শুকনা কইরা গ্যাছ গিয়া। মনে বড় দুঃখু পাইছি। কী কইছিলাম দুই জনেরে?'

লোকটা একটু বেশিই বক বক করেন। আগে অনেক কিছুই তো বলেছেন। এখন ঠিক কোনটা জানতে চাইছিলেন, বোঝা যাচ্ছে না। সুজাতা শৈলেশ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

শৈলেশ্বর বলেন, 'কইছিলাম নিরাশ হইতে নাই। আশা মাইনষেরে বাচাইয়া রাখে।'

এই কথাগুলো কত বার সুজাতা এবং বিজনকে শুনতে হয়েছে তার হিসেব নেই। সুজাতা বলে, 'হ্যাঁ।'

'আশার ঝুটি ধইরা বইসা আছিলা। এইবার তার র‍্যাজাল্ট পাইতে চলছ।'

শ্বাস বন্ধ করে থাকে সুজাতা।

শৈলেশ্বর মুখে পান থাকা সত্ত্বেও প্রকাণ্ড সিলভারের কৌটো খুলে আরো একটা খিলি বার করে মুখে পোরেন। চাকুম চুকুম করে চিবোতে চিবোতে বলেন, 'তিনখান বড় কোম্পানিতে তুমার ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করছি। এইর মইধ্যে একখান হইল মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানি।'

সুজাতা তীব্র উত্তেজনা অনুভব করতে থাকে। মনে হয়, বুকের ভেতর দিয়ে হাজারটা ঘোড়া ঝড় তুলে ছুটে যাচ্ছে। ক'বছর ব্যর্থ ঘোরাঘুরির পর শৈলেশ্বর ভরসা দেওয়া সত্ত্বেও যখন প্রায় আশা ছেড়ে দিতে বসেছে, সেই সময় একসঙ্গে তিন তিনটে ইন্টারভিউ, ভাবা যায়!

কাঁপা গলায় সুজাতা কোনোরকমে বলতে পারে, 'স্যার, ইন্টারভিউ-লেটারগুলো কিভাবে পাব?'

শৈলেশ্বর বললেন, 'সগলটি ডাকে চইলা যাইব।'

'খুব তাড়াতাড়ি যাবে?'

'আশা তো করতে আছি। দশ পনের দিনের ভিতর পাইয়া যাইবা।'

একটু চিন্তা করে সুজাতা জিজ্ঞেস্ করল, 'ইন্টারভিউতে কী ধরনের প্রশ্ন করতে পারে?'

শৈলেশ্বর মজার গলায় বললেন, 'তার কি মাথামুণ্ডু আছে! হয়তো জিগাইল হিটলারের মাসি শাউড়ির কী নাম, কি গান্ধিজি কোন দোকান থেইকা খড়ম কিনতেন বা এলিজাবেথ টেইলার হ্যার (তোর) পয়লা হাজব্যান্ডের লগে কুনখানে হনিমুন করতে গেছিল, চার্চিলের পিসাতো শালা কে—

এই সগল।'

শৈলেশ্বরের বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলল সুজাতা, 'আপনাকে নিয়ে পারা যায় না স্যার—'

শৈলেশ্বর এবার বললেন, 'রঙ্গরস থাউক। জ্যানারেল নলেজ আর ক্যারিয়ার গাইডের কয়খান বই—আইজই কিন্যা নিবা। আর যেই যেই কোম্পানির ইন্টারভিউ পাইবা হেইগুলির ফাউন্ডার কারা, এই বচ্ছর তারা কত প্রফিট করছে, এই সগল জিগাইতে পারে।'

সুজাতা বলে, 'কোম্পানিগুলোর ফাউন্ডার, তাদের প্রফিট অ্যান্ড লসের ইনফরমেশন কোথায় পাব?'

'উই যে ছ্যামরা, তুমার বেস্ট ফ্রেন্ড বিজন, তারে কইবা কোম্পানিগুলার অ্যানুয়াল জ্যানারাল মিটিংয়ের পর হিসাবপত্তরের যে বই বাইর হয় হেইগুলান য্যান কালেক্ট কইরা দ্যায়। আর ইন্টারভিউর দিনের খবরের কাগজখান খুটাইয়া পইড়া যাইও—বুঝলা?'

ঘাড় হেলিয়ে দেয় সুজাতা।

শৈলেশ্বর থামেন নি। ইন্টারভিউর টিপসগুলো দেবার পর বললেন, 'তুমি তো পরীক্ষায় জব্বর র‍্যাজাল্ট-করা মাইয়া। ব্রিটিশ ইনস্টিটিউট থেইকা স্পোকেন ইংলিশে তালিম নিছ। স্মার্টলি চোস্তো ইংরাজি কইবা। এক্কেবারে ডরাইবা না। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'

একটু চুপচাপ।

তারপর খানিক ইতস্তত করে সুজাতা জিজ্ঞেস করে, 'রাগ যদি না করেন, একটা কথা বলব?'

শৈলেশ্বর বললেন, 'রাগ করতে আমারে কুনোদিন দ্যাখছ?'

এটা ঠিক, শৈলেশ্বর খুবই ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। রোজ কত ছেলেমেয়ে আসছে। ঘুরে ঘুরে হতাশ হয়ে তাদের অনেকে মাঝে মাঝে মেজাজ গরম করে ফেলে। তাঁর ওপর কেউ কেউ চড়াও হয়েছে, এমন ঘটনার কথাও জানে সুজাতা। কিন্তু শৈলেশ্বর নিজে কখনও উত্তেজিত হন না। শান্তভাবে তাদের বোঝান, গভর্নমেন্ট বা প্রাইভেট অর্গানাইজেশনগুলো রিক্রুটমেন্টের জন্য লোক না চাইলে তাঁর কিছু করার নেই। সুযোগ আসামাত্র তিনি ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করে দেবেন। মানুষটা সহৃদয় এবং সহানুভূতিশীল।

সুজাতা জানায়, সত্যিই কখনও শৈলেশ্বরকে সে রেগে উঠতে দেখে নি।

শৈলেশ্বর বললেন, 'যা কওনের নির্ভয়ে কইয়া ফালাও।'

সুজাতা বলল, 'আমার ব্যবস্থা তো করে দিলেন। বিজনও কিন্তু অনেকদিন ধরে ঘুরছে। তার জন্যে—'

'খাড়াও, খাড়াও—' হাত তুলে সুজাতাকে থামিয়ে দিতে দিতে মুখের অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে শৈলেশ্বর বললেন, 'নিজে শুইতে জায়গা পায় না, শঙ্করারে ডাকে। আগে তুমারটা হউক। হ্যার (তার) পর ওর কথা ভাবুম।'

সুজাতা জানে, সুযোগ আসামাত্র বিজনের ইন্টারভিউর বন্দোবস্ত শৈলেশ্বর করে দেবেন। আরো কিছুক্ষণ ওঁর সঙ্গে কাটিয়ে সে উঠে পড়ে।

দশ

রণধীর মল্লিকদের বিষয় সম্পত্তি কী করে রক্ষা করবে, এই ভাবনাটা ফিক্সেশনের মতো সুজাতার মাথায় আটকে গেছে যেন। এ ব্যাপারে একটা নৈতিক দায় বুঝিবা এসে পড়েছে তার ওপর। স্বাভাবিক নিয়মেই পৈতৃক বিষয় আশয়ের উত্তরাধিকার সন্তানদের ওপর বর্তায়। কিন্তু ছেলেমেয়েদের নাম করলেই রণধীর এমন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যে মনে হয় তক্ষুনি আর একটা স্ট্রোক হয়ে যাবে। রণধীর সুস্থ থাকবেন, তাঁর ছেলেমেয়েরা বঞ্চিত হবে না, প্রভুদাসের মতো বজ্জাতেরা কারচুপি করে তাঁর প্রপার্টি দখল করতে পারবে না—এতগুলো সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান কী করে করা যাবে; সেই পদ্ধতিটা সুজাতার জানা নেই। শেষ পর্যন্ত একদিন এ বিষয়ে বাড়িতে নিরুপমা নান্টু ঝুনু এবং বিজনের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেছে সে। সকলেরই এক পরামর্শ, রণধীরদের প্রপার্টির যা খুশি হোক, যে কেউ লুটেপুটে নিক, সুজাতা যেন এই নিয়ে কোনোভাবেই জড়িয়ে না পড়ে। তিন তিনটে ইন্টারভিউর ব্যবস্থা হয়েছে। তার ভেতর

একটা চাকরি নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। অন্তত শৈলেশ্বরের সেই রকমই ধারণা। সে সবার মতামত শুনেছে ঠিকই, কিন্তু তা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি।

আজ ডিউটি শেষ করে বিজনের সঙ্গে আদর্শনগরে ফিরতে ফিরতে রোজকার মতোই সাড়ে ন'টা বেজে গেল। অন্য দিন বিজন তাদের বাড়িতে এসে কিছুক্ষণ গল্পটল্প করে দশটা সোয়া দশটায় তাদের বাড়িতে যায়। ওর মায়ের শরীরটা খারাপ, তাই আজ আর সুজাতাদের বাড়ি এল না। 'কাল দেখা হবে'—বলে রাস্তা থেকেই সোজা চলে গেল।

সদর দরজায় কড়া নাড়তে নান্টু দরজা খুলে চাপা গলায় বলল, 'এক ভদ্রলোক আটটা থেকে তোর জন্যে বসে আছেন।'

সুজাতাদের বাড়িতে বিজন আর 'লীলাবতী ফার্মেসি'র যজ্ঞনাথ চাকলাদার ছাড়া রাত্তিরে অন্য কেউ আসে না। অবশ্য আত্মীয়স্বজনদের কথা আলাদা।

সুজাতা জিজ্ঞেস করল, 'কে এসেছে রে?'

'অচেনা লোক।'

'কী নাম?'

'নাম বলে নি। বলল তুমি তাকে চেনো। তোমার সঙ্গে নাকি বিশেষ দরকার আছে।'

সদর দরজার কাছ থেকে সুজাতাদের একতলার বসার ঘরের খানিকটা অংশ দেখা যায়। সেখানে আলো জ্বলছে। একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লোক এমনভাবে বসে আছে যাতে তার মুখটা পুরো চোখে পড়ছে না। তাই লোকটা পরিচিত কিনা, বোঝা যাচ্ছে না।

সুজাতা নান্টুকে সদর দরজা বন্ধ করতে বলে বড় বড় পা ফেলে উঠোন পেরিয়ে বাইরের ঘরে চলে এল। তার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল।

যে লোকটি বসে আছে তার বয়স পঞ্চাশ বাহান্ন। চৌকো মুখ, মাঝারি হাইট, নিরেট স্বাস্থ্য। চুল কুচকুচে কালো। বোঝা যায়, সে নিয়মিত কলপ লাগায়। পরনের ধুতি আর গিলে-করা পাঞ্জাবিটা সাদা ধবধবে, পায়ে চকচকে পাম্প-শু, চোখে দামি মেটাল ফ্রেমের চশমা। একাই বসে আছে সে।

লোকটাকে আদৌ কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না সুজাতা। অথচ নান্টুকে বলেছে সে নাকি তার পরিচিত। সংশয়ের দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ করতে লাগল সুজাতা।

সুজাতাকে দেখে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ায় লোকটা। মাথা ঝুঁকিয়ে হাতজোড় করে বলে, 'নমস্কার ম্যাডাম—'

লোকটার দিকে চোখ রেখে সুজাতাও হাতজোড় করে, 'নমস্কার।'

এই বাড়িটা যেন তারই, আর সুজাতা একজন সম্মানিত অতিথি, সুতরাং তাকে আপ্যায়ন করা উচিত—এমন একটা ভঙ্গি করে লোকটা বলল, 'বসুন ম্যাডাম, বসুন—'

সদর দরজা বন্ধ করে নান্টু ফিরে এসেছিল। তাকে দেখিয়ে লোকটা হাসিমুখে বলল, 'আমি বেশ কিছুক্ষণ হল এসেছি। আপনার ভাই চমৎকার ছেলে, আমার সঙ্গে বসে গল্প করছিল। চা-বিস্কুট খাইয়েছে।' বোঝা যাচ্ছে, কথায় কথায় সুজাতার সঙ্গে নান্টুর সম্পর্কটা সে জেনে নিয়েছে।

নিঃশব্দে বসে পড়েছিল সুজাতা। মুখোমুখি লোকটাও বসেছে। সে এবার বলল, 'আমি জানি আপনি সাড়ে ন'টা নাগাদ বাড়ি ফেরেন। আমি একটু আগে আগেই এসে পড়েছি। আসলে কলকাতা থেকে বাই রোড আসছি তো। রাস্তায় সব সময় জ্যাম লেগে থাকে। তাই ভাবলাম খানিকটা সময় হাতে নিয়ে বেরুই। কিন্তু ম্যাডাম, আজ যেন ম্যাজিক ঘটে গেছে। গাড়ি কোথাও জ্যামে আটকায় নি।'

সুজাতা লোকটার দিক থেকে চোখ ফেরায় নি। সমানে মনে করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু না, সে পুরোপুরি নিশ্চিত, লোকটাকে আগে কোথাও দেখে নি। ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট সতর্ক হয়ে গেল সুজাতা, কিছুটা উদ্বিগ্নও। কেন লোকটা এসেছে, তার উদ্দেশ্য কী, খানিক পরেই জানা যাবে। কিন্তু কী কারণে নান্টুকে বলেছে, সে তার পরিচিত? ব্যাপারটা রীতিমত অস্বস্তিকর, এবং সন্দেহজনকও। অবশ্য লোকটা সামনেই বসে আছে। এই চাতুরির হেতুটা নিশ্চয়ই সে জানাবে, নইলে সুজাতা জেরা করে বার করে নেবে।

সুজাতা জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে আমি তো ঠিক চিনতে পারলাম না। আগে কখনও আমাদের দেখা হয়েছে বলেও মনে পড়ছে না।'

লোকটা তক্ষুনি স্বীকার করে নিল, 'না, আমরা কেউ কাউকে কখনও দেখি নি।'

ঝাঁঝাল গলায় সুজাতা বলল, 'অথচ আমার ভাইকে বলেছেন, আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে!'

সুজাতার কণ্ঠস্বরের তীব্রতা লক্ষ করছিল লোকটা। খুব শান্ত গলায় বলল, 'হ্যাঁ, বলেছি। টেকনিক্যালি আমি কারেক্ট।'

'মানে?'

'একটু চেষ্টা করলেই মনে করতে পারবেন, ফোনে আপনার সঙ্গে আমার বেশ কয়েক বার কথা হয়েছে। সেদিক থেকে আমাদের পরিচয় তো আছেই। আমার নাম জগন্ময় কুণ্ডু।'

জগন্ময় সেই হাঙরের পালের একজন যারা 'মল্লিক ভবন' গ্রাস করতে চায়। প্রভুদাসের গলা ফোনে যেমন শোনায়, সামনাসামনি শুনলেও হুবহু তাই মনে হয়। কিন্তু জগন্ময়ের বেলা ব্যাপারটা আলাদা। ফোনে একরকম, ফোনের বাইরে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। যেন দুটো ভিন্ন লোকের গলা।

জগন্ময় যে বাড়ি পর্যন্ত এসে হাজির হবে, ভাবতে পারেনি সুজাতা। অবশ্যই লোকটার মাথায় পরিষ্কার দুরভিসন্ধি রয়েছে। সুজাতার শিরদাঁড়া বেয়ে সিরসিরানির মতো কিছু খেলে যায়। সে কিছু বলার আগেই জগন্ময় হেসে হেসে বলে, 'আপনাকে ভাল করে ধরিয়ে দিচ্ছি। ওই যে যার নাম শোনামাত্র আপনার বস রণধীর মল্লিকের ব্লাডপ্রেসার অ্যাবনরমালি হাই হয়ে যায়, শুয়ারের বাচ্চা টাচ্চা বলে, আমি হলাম—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে রূঢ় গলায় সুজাতা জিজ্ঞেস করে, 'আপনি আমাদের বাড়ি এসেছেন কেন? এখানকার ঠিকানাই বা কে আপনাকে দিল?'

'সেকেন্ড প্রশ্নটার উত্তর আগে দিচ্ছি। ইচ্ছা থাকলে একজনের ঠিকানা জোগাড় করা কি খুব কঠিন কাজ? আপনি বনগাঁ লোকালে রোজ আদর্শনগর থেকে শিয়ালদা যান, সেখান থেকে মিনি কি স্পেশাল বাস ধরে সেন্ট্রাল এভিনিউ গ্রে স্ট্রিটের ক্রসিংয়ে নামেন। তারপর রাস্তা পেরিয়ে পীতাম্বর লাহা রোডে 'মল্লিক ভবন'-এ যান। কী, ঠিক বলছি?' জগন্ময় বলতে লাগল, 'আবার সন্ধে সাতটার পর উলটো দিকে একই রুট ধরে বাড়ি ফেরেন। যাবার সময় একলা যান, ফেরার সময় একজন হ্যাণ্ডসাম ইয়াং ম্যান সঙ্গে থাকে। খুব সম্ভব তার নাম বিজন সেনগুপ্ত।'

শুনতে শুনতে চোখের তারা স্থির হয়ে যায় সুজাতার। বিস্ময়টা থিতিয়ে এলে অসহ্য রাগে শরীরের সব রক্ত মাথায় উঠে আসে। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে, 'আপনি আমার ওপর স্পায়িং চালিয়েছেন? পেছনে লোক লাগিয়ে এ সব জোগাড় করেছেন?'

নিঃশব্দে হাসল জগন্ময়, কোনো উত্তর দিল না।

অর্থাৎ সুজাতা যা বলেছে তা মেনে নিচ্ছে জগন্ময়। সে প্রায় খেপেই ওঠে, 'এ সবের মানে কী?'

জগন্ময়ের মধ্যে অদ্ভুত একটা ব্যাপার, দোষ বা গুণ যা-ই বলা যাক না, পুরোমাত্রায় রয়েছে। সারাক্ষণ তার মুখে হাসি। রাগ বা টেনসনের বিন্দুমাত্র লক্ষণ নেই। মেজাজ বরফের মতো শীতল। সে বলল, 'অকপটে একটা কথা বলতে পারি?'

জবাব না দিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সুজাতা।

জগন্ময় বলে, 'আপনি তো জানেন আমি একজন বিজনেসম্যান।'

'তাতে কী?'

'কাজ উদ্ধার করার জন্যে বিজনেসম্যানদের অনেক কিছু করতে হয়। দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন।'

সারাদিন কাজকর্ম, এবং ট্রেন আর বাসে জার্নি করে ভীষণ ক্লান্তি বোধ করছিল সুজাতা। তাছাড়া লোকটার সঙ্গে কথা বলতে একেবারেই ভাল লাগছিল না। সে বলল, 'আমি খুব ক্লান্ত। যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন—'

শশব্যস্ত জগন্ময় বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নেব না ম্যাডাম।'

সুজাতা অপেক্ষা করতে লাগল।

জগন্ময় বলল, 'আপনার সঙ্গে আমি একটা ডিল করতে চাই। প্রভুদাস আপনাকে যা অফার করেছে

আমি তার ডাবল দেব।'

জগন্ময়ের উদ্দেশ্য অনেক আগেই টের পেয়েছিল সুজাতা। লোকটা শুধু তার গতিবিধির ওপরই নজর রাখেনি। কে তার সঙ্গে দেখা করছে, কী কথা বলছে, সব দিকে জগন্ময়ের লক্ষ রয়েছে। হাজার গণ্ডা অদৃশ্য গোয়েন্দা তার পেছনে লাগিয়ে রেখেছে সে।

সুজাতা বলল, 'আপনি প্রভুদাসের খবর রাখেন দেখছি।'

'ওই যে বললাম ম্যাডাম, বিজনেসম্যান তো। আমাদের অনেক কিছুই জানতে হয়।'

'কী ধরনের ডিল আমার সঙ্গে করতে চান?'

'রণধীর মল্লিককে বুঝিয়ে সুঝিয়ে 'মল্লিক ভবন'টা যদি আমাকে পাওয়াবার ব্যবস্থা করে দেন, অ্যাট লিস্ট টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি লাখ পেয়ে যাবেন।'

সুজাতা বলল, 'মিস্টার কুণ্ডু, প্রভুদাসের মতো আপনিও আমাকে দালাল বানাতে চাইছেন!'

শিউরে ওঠার ভঙ্গি করে জিভ কেটে, দুই কানে হাত ঠেকিয়ে জগন্ময় বলল, 'ছি ছি ছি, এ কী বলছেন! দালাল ভীষণ খারাপ কথা। এটা আপনার প্রাপ্য—অনেস্ট ইনকাম।'

সুজাতা তীক্ষ্ণ গলায় এবার বলে, 'মিস্টার কুণ্ডু, আমি রণধীরবাবুর খুব সামান্য একজন এমপ্লয়ী। আমি বললেই তিনি বাড়িটা আপনাদের লিখে দেবেন, এটা ভাবছেন কী করে? রণধীর মল্লিক কি এতই কাঁচা লোক?'

গলার ভেতর হুঁ হুঁ শব্দ করে রহস্যময় একটু হাসল জগন্ময়। বলল, 'কেউ কি অত সহজে লিখে দেয়! কৌশলে কাজটা গুছিয়ে নিতে হবে।'

লোকটা যে অত্যন্ত ধুরন্ধর তা বোঝাই যাচ্ছে। সে রণধীরের বাড়িটা দখল করার জন্য তাকে ব্যবহার করতে চাইছে। সুজাতা বলল, 'কৌশল টৌশলের ব্যাপারে আমাকে জড়াতে চেষ্টা করবেন না। অনেক রাত হয়ে গেছে। কাল সকালে আমাকে বেরুতে হবে। বুঝতেই পারছেন—'

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। জগন্ময় যেন খুবই বিব্রত হয়েছে, এমনভাবে উঠে দাঁড়াল। কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'আমি ভীষণ লজ্জিত। অনেকক্ষণ আপনাকে আটকে রেখেছি। কী কৌশলের কথা ভেবেছি, সেটা পরে ভাল করে বুঝিয়ে দেব।'

'দেখুন, আপনাকে পরিষ্কার বলে দিয়েছি, এখনও বলছি, আমি এসব কৌশলের ভেতর থাকব না।'

'থাকবেন, থাকবেন। পঁচি' তিরিশ লাখ টাকা খুব কম ব্যাপার না। পরে আপনার সঙ্গে আবার যোগাযোগ করব। আচ্ছা চলি, নমস্কার—'

অদ্ভুত হেসে জগন্ময় কুণ্ডু চলে গেল।

এগার

আজ 'মল্লিক ভবন'-এ আসার পর ব্রেকফাস্ট সেরে সবে সুজাতা খবরের কাগজ পড়ে শোনাতে শুরু করেছে, হঠাৎ বুকে হাত চাপা দিয়ে রণধীর ইজিচেয়ারে কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁর গলার ভেতর থেকে গোঙানির মতো কাতর আওয়াজ বেরিয়ে এল, 'ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। শীগ্গির ডাক্তারকে ফোন কর।'

সুজাতা লক্ষ করল, যন্ত্রণায় মুখ নীল হয়ে যাচ্ছে রণধীরের, কপালে গলায় বিন বিন করে ঘাম বেরিয়ে আসছে। লক্ষণটা পরিষ্কার। কয়েক বছর আগে নিজের চোখে এক বন্ধুর মায়ের ম্যাসিভ স্ট্রোক হতে দেখেছিল সে। অবিকল সেই সব চিহ্ন রণধীরের শরীরে ফুটে উঠেছে। সুজাতা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। প্রথমটা কী করবে, কী করা উচিত, ভেবে পেল না।

তারপরই মনে পড়ল, কিছুদিন আগে হার্ট স্পেশালিস্ট ডাক্তার অবনীশ অধিকারীর ফোন নাম্বার তাকে দিয়েছিলেন রণধীর। সেটা ছোট নোটবুকে টুকে রেখেছে। দ্রুত নাম্বারটা বার করে ফোন করল সে।

মাস দুয়েকের মতো 'মল্লিক ভবন'-এ কাজ করছে সুজাতা। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার ডাক্তার অধিকারী এ বাড়িতে এসে রণধীরকে দেখে গেছেন। সুজাতাকে তিনি খুব ভাল করেই চেনেন।

ডাক্তার অধিকারী জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, লাস্ট উইকেই তো রণধীরকে দেখে গেছি। এর ভেতর হতচ্ছাড়াটা আবার কী বাধিয়ে বসল?' তিনি রণধীরের খুব ছেলেবেলার বন্ধু। শরীর স্বাস্থ্য, অসুখবিসুখের ব্যাপারে তিনি ছাড়া অন্য ডাক্তারের ওপর রণধীরের আস্থা নেই।

রণধীরের হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া এবং তার লক্ষণগুলো জানিয়ে দিল সুজাতা।

ডাক্তার অধিকারী বললেন, 'ঝামেলায় ফেললে দেখছি। আচ্ছা, পনের কুড়ি মিনিটের ভেতর আমি চলে আসছি। রণধীরকে আস্তে আস্তে চিত করে শুইয়ে বুকে ম্যাসাজ করে যাও। লক্ষ করো ব্রিদিংটা যেন ঠিকমতো হয়—'

মঙ্গলাকে ডেকে দু'জনে খুব আস্তে আস্তে ইজিচেয়ারেই ডাক্তার অধিকারীর কথামতো রণধীরকে চিত করে শুইয়ে দিল সুজাতা। উদ্বিগ্ন ভাবে রণধীরের বুকে ম্যাসাজ করতে থাকে সে। মাঝে মাঝে তাঁর বুকে কান ঠেকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, সত্যিই শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে কিনা।

পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে মঙ্গলা। তার চোখেমুখে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার ছাপ। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী হবে দিদি?'

সুজাতাও জানে না কী হবে। শুধু বলল, 'ডাক্তারবাবুকে আসতে দাও।'

ডাক্তার অধিকারী এলেন। ততক্ষণে জামা টামা ঘামে ভিজে গেছে রণধীরের। চোখ দুটো বোজা, জ্ঞান আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

ডাক্তার অধিকারীর চেহারা প্রকাণ্ড। গোলাকার মুখ, স্যার আশুতোষের মতো ঝুঁপো গোঁফ, জোড়া রোমশ ভুরু, চোখে গোল ফ্রেমের চশমা, পাকা চুল চামড়া ঘেঁষে ছোট ছোট করে ছাঁটা। পরনে বেঢপ ঢোলা ফুল প্যান্ট আর ফুল শার্ট যার হাতার বোতাম লাগানো নেই, ফলে ঢল ঢল করছে।

চিকিৎসা শুরু হল। প্রথমে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে ইসিজি করলেন ডাক্তার অধিকারী। তার ফাঁকে ফাঁকে সুজাতাকে দিয়ে ফোন করিয়ে স্ট্রেচার আর দু'জন নার্স আনালেন।

স্ট্রেচারে শুইয়ে খুব সাবধানে রণধীরকে তাঁর বেডরুমে এনে শোওয়ানো হল। তিনি ঘুমিয়ে আছেন। খুব সম্ভব যে ইঞ্জেকশানটা তাঁকে দেওয়া হয়েছে তাতে সিডেটিভ ধরনের আছে।

উৎকণ্ঠিত সুজাতা জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কি খুব সিরিয়াস ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তার অধিকারী জোর দিয়ে বললেন, 'আলবত সিরিয়াস। রণধীরটা ঝামেলায় ফেললে দেখছি।' ঝামেলায় ফেলাটা তাঁর কথার মাত্রা।

'লাইফের কোনো রিস্ক নেই তো?'

'আটচল্লিশ ঘন্টার আগে কিচ্ছু বলতে পারছি না। পাজিটা যে টাইপের মাথাগরম, নিশ্চয়ই কোনো কারণে খেপে উঠেছিল। রেগে গেলে তো ওর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, সমানে চেঁচাতে থাকে। এটা যে শয়তানটার পক্ষে কতখানি হার্মফুল, হাজার ওয়ার্নিং দিলেও শুনবে না।'

সুজাতা বলল, 'আজ কিন্তু একটুও রাগারাগি করেননি। এক্সাইটমেন্টের কোনো কারণই ঘটেনি। সকাল থেকে খুব শান্ত ছিলেন।'

ডাক্তার অধিকারীকে চিন্তিত দেখাল, 'তা হলে এরকম হল কেন? ঝামেলায় ফেললে দেখছি।' একটু ভেবে বললেন, 'ওকে এখনই নার্সিং হোম টোমে নিয়ে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ঢুকিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু যা অবস্থা, টানাহ্যাঁচড়া করা ঠিক হবে না। ট্রিটমেন্টটা আপাতত বাড়িতেই হোক। পরে যদি বুঝি নার্সিং হোমে শিফট করতে হবে।'

ডাক্তার যা বললেন তার ওপর কথা চলে না। সুজাতা চুপ করে থাকে। রণধীরকে যদি শেষ পর্যন্ত নার্সিং হোমে নিয়েই যাওয়া হয়, এ বাড়ির কাজকর্ম কিভাবে চলবে, সে ভাবতে পারছে না।

ডাক্তার অধিকারী বললেন, 'দু'জন নার্সের ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। বার ঘন্টা করে এক একজনের ডিউটি। তোমাকে আমার বিশেষ একটা ইনস্ট্রাকশন আছে।'

সুজাতা উৎসুক দৃষ্টিতে তাকায়।

ডাক্তার অধিকারী বললেন, 'রণধীরের মুখে শুনেছি, সব বিষয়েই তোমার ওপর ও খুব ডিপেণ্ড করে। তুমি তো রোজ সন্ধে সাতটায় ডিউটি শেষ হলে বাড়ি ফিরে যাও।'

সুজাতা আস্তে মাথা নাড়ে, 'হ্যাঁ।'

'ঝামেলায় ফেললে দেখছি। আমার ইচ্ছা, যে ক'দিন রণধীরের ক্রাইসিস চলবে, তুমি এখানেই থেকে যাও। কখন কী দরকার হবে, তুমি ছাড়া সামাল দেবার কেউ নেই।'

সুজাতা চমকে ওঠে, 'কিন্তু—'

'কী?'

'বাড়িতে না ফিরলে সবাই ভীষণ চিন্তা করবে।'

'ঝামেলায় ফেললে দেখছি। এক কাজ করা যাক, আমি তোমার মা-বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলে নিচ্ছি।'

'আমার বাবা নেই। মায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। অবশ্য—'

'আবার কী?'

'আমাদের বাড়িতে ফোন নেই। তবে একটা কনট্যাক্ট নাম্বার আছে।'

'সেখানেই কর।'

আদর্শনগরের 'লীলাবতী ফার্মেসি'-তে ফোন করে নিরুপমাকে ডাকিয়ে আনাল সুজাতা। ডাক্তার অধিকারী তাঁকে বোঝালেন কেন রণধীর মোটামুটি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সুজাতার 'মল্লিক ভবন'-এ থাকা দরকার। এ বাড়িতে তার কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। দু দু'জন মহিলা নার্সও পালা করে দিনরাত রণধীরের পরিচর্যার জন্য থাকবে। ডাক্তার অধিকারীও দরকার হলে থেকে যাবেন। একটা বিপন্ন, মরণোন্মুখ বৃদ্ধের জন্য মানবিক কারণে এটুকু করা একান্ত জরুরি। মেয়ের জন্য যেন দুশ্চিন্তা না করেন নিরুপমা। যদি ইচ্ছা করেন, তিনিও 'মল্লিক ভবন'-এ এসে থাকতে পারেন।

সুজাতা নিজেও নিরুপমার সঙ্গে কথা বলল। ডাক্তার অধিকারী যা বলেছেন, আরো বিস্তারিতভাবে তা জানিয়ে সে বলে, 'তোমাকে সবই তো বলেছি। এই অবস্থায় ভদ্রলোককে ফেলে চলে যাওয়া ঠিক হবে না মা।'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে নিরুপমা বলেন, 'আচ্ছা, থাক তা হলে। তেমন বুঝলে ফোন করবি। বিজনকে নিয়ে আমি চলে যাব।'

রণধীরের স্ট্রোক হয়েছিল দশটা নাগাদ। সাড়ে এগারটায় প্রভুদাসের ফোন এল, 'ম্যাডাম, একটা খারাপ খবর শুনলাম।'

সুজাতা চমকে ওঠে। ইচ্ছা করেই বলে, 'কী খবর বলুন তো?'

'ম্যাডাম, সিক্রেট রাখতে চান রাখুন, লেকেন নিউজটা আমার কাছে পৌঁছে গেছে।' প্রভুদাস বলে যায়, 'ডাক্তারা কী বলছে, মল্লিক সাহেব ধাক্কাটা সামাল দিয়ে উঠতে পারবেন?'

রণধীরের মৃত্যুর জন্য লোকটার বোধহয় নাওয়া খাওয়া নেই, সারাক্ষণ তার একটাই চিন্তা, কখন রণধীর মারা যাবেন। সেই খবরটার জন্য সে ব্যগ্র হয়ে আছে। হঠাৎ সুজাতার মাথায় প্রচণ্ড জেদ চেপে যায়। এত সহজে সে 'মল্লিক ভবন' ওই হারামজাদা বদমাশটাকে দখল নিতে দেবে না।

সুজাতা বলল, 'ডাক্তার বলেছেন, দুশ্চিন্তার কারণ নেই। খুব মাইনর ব্যাপার। দু-চার দিন রেস্ট নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'না না, বহীনজি—' প্রভুদাস বলে, 'আমার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই। মল্লিক সাহেবের কেসটা অত সিম্পল নয়।' একটু থেমে বলল, 'ভগোয়ান গণপতিজি আপনার মনোকামনা পূরণ করুন। জলদি জলদি উনি সুস্থ হয়ে উঠুন।'

শুধু প্রভুদাসই নয়, এরপর একে একে জগন্ময় কুণ্ডু, নরেশ্বর খেমকা, হরগোবিন্দ দাগা, উমাপতি চট্টরাজ এবং বিশ্বনাথ সাহাও ফোন করল। রণধীর মল্লিকের হার্ট অ্যাটাকের খবর তারাও জেনে গেছে। সব শকুনেরই নজর ভাগাড়ের দিকে। যেন কতই না দুঃখ পেয়েছে; সেটা বোঝাবার জন্য জিভের ডগায় চুক চুক শব্দ করে জানতে চেয়েছে, অ্যাটাকটা কতখানি সিরিয়াস, আর কত দিন রণধীরের বাঁচার সম্ভাবনা। লোকটার মৃত্যু সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওরা 'মল্লিক ভবন'-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

প্রভুদাসকে যা বলেছে, অন্যদেরও তাই জানিয়েছে সুজাতা। রণধীরের অসুস্থতা খুবই সামান্য এবং

সাময়িক, জগন্ময় নরেশ্বরদের মতো শুভাকাঙ্ক্ষীদের টেনসনের কারণ নেই। প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে বলেছে, 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, মল্লিক সাহেব যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন।'

খুব কষ্ট করে হেসে সবাই বলেছে, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই।'

তবে জগন্ময় কুণ্ডু একবার নয়, বেশ কয়েকবার ফোন করল। শেষ বার সে বলেছে, 'ম্যাডাম, এখন আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটা খুব দরকার। কোথায়, কিভাবে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে সুজাতা বলেছে, 'আমি দরকার মনে করছি না। দয়া করে—'

সুজাতার কথার মধ্যেই জগন্ময় বলে উঠেছে 'লাইনটা কেটে দেবেন না ম্যাডাম। আমার কথাটা শুনুন।'

'বলুন—'

'মল্লিক সাহেবের জ্ঞান কি ফিরে আসবে? ডাক্তার কী বলছে?'

'নিশ্চয়ই ফিরবে।'

'আপনাকে একটা কৌশলের কথা বলেছিলাম মনে আছে?'

'আছে।'

এবার চাপা গলায় জগন্ময় বলেছে 'আপনাকে আমি একটা কাগজ দেব। জ্ঞান ফেরার পর মল্লিক সাহেবকে দিয়ে ওটায় একটা সই করিয়ে নেবেন।'

সুজাতা এমনিতে খুবই ঠাণ্ডা মাথার মেয়ে। এবার সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, 'জোচ্চার, ঠক, আমাকে ভবিষ্যতে আর ফোন করবেন না।' বলে ফোনটা ঝড়াং করে ক্রেডেলে নামিয়ে রেখেছে সে। কী ধরনের কাগজে সই করতে চাইছে জগন্ময়, তার জানা নেই। তবে এর মধ্যে যে চরম দুরভিসন্ধি রয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে। জগন্ময়কে ফোন করতে বারণ করেছে ঠিকই, তবে সুজাতা জানে লোকটা সহজে তাকে ছাড়বে না।

সকালের দিকে সেই যে স্ট্রোকটা হয়েছিল, তারপর থেকে আচ্ছন্নের মতো বিছানায় শুয়ে আছেন রণধীর। দিনের বেলার নার্সটি তাঁর খাটের পাশে বসে আছে। আর আছে সুজাতা। ডাক্তার অধিকারীর নির্দেশমতো তিন ঘন্টা পর পর একটা করে ইঞ্জেকশন দিচ্ছে নার্সটি। ডাক্তার অধিকারী সকালে দেখে যাবার পর আরো দুবার এসে রণধীরকে দেখে গেছেন, দ্বিতীয় বার ইসিজিও করেছেন। অবস্থার কোনোরকম পরিবর্তন হয় নি।

কিছুই ভাল লাগছিল না সুজাতার। এই প্রচণ্ড রগচটা, অসম্ভব বদমেজাজি, খামখেয়ালি রণধীর সম্পর্কে কবে থেকে যে অদ্ভুত এক মায়ায় তার মন ভরে গেছে, নিজেই জানে না। খাটে শুয়ে আছেন তিনি। খুব ধীরে ধীরে শ্বাস পড়ছে, চোখ দুটি বন্ধ। এত বিষয় সম্পত্তি, এমন বিপুল অর্থ কিন্তু কী আশ্চর্য রকমের অসহায়। এক পাল হায়না তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস চিরতরে বন্ধ হবার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

সুজাতার নিজের কোনো স্বার্থ নেই। কিন্তু বিছানায় শায়িত, প্রায় নিশ্চল ওই লোকটা একদিন ডেকে তাকে কাজ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর ওপর রণধীরের বিশ্বাস আস্থা এবং মমতার তুলনা নেই। লোকটার প্রতি তারও কিছু নৈতিক দায়িত্ব আছে। তাঁকে সুস্থ করে তো তুলতেই হবে, তাঁর বিষয় আশয় যাতে লুটেরাদের হাতে গিয়ে না পড়ে সেটাও সে দেখবে। কিন্তু কিভাবে? প্রতিপক্ষ অসীম শক্তিমান। প্রোমোটারদের হাতে থাকে প্রচুর অ্যান্টি-সোশাল বন্দুকবাজেরা, তাদের টাকার জোর অসীম। তার মতো লোয়ার মিডল ক্লাসের একটি মেয়ের কতটুকু শক্তি যে এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে!

কিন্তু না, কিছু একটা করতেই হবে তাকে। অদ্ভুত এক অস্থিরতার মধ্যে নাকে মুখে সামান্য কিছু গুঁজে ফের রণধীরের খাটের পাশে এসে বসে সুজাতা।

দিনটা তো কেটে গেলই। রাতটাও জেগে জেগেই যখন প্রায় কাবার হয়ে এসেছে সেই সময় একটা উপায় মাথায় এসে যায় সুজাতার। সে স্থির করে ফেলে, রণধীরের ছেলেমেয়েদের তাদের বাবার খবরটা জানাবে। এই দুঃসময়ে সেটা না জানালে অন্যায় হবে। পারলে ওরাই পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি রক্ষা

করতে পারবে। তা ছাড়া, রোগশয্যায় শায়িত বৃদ্ধের পাশে ওদের থাকাটাও একান্ত প্রয়োজন।

রণধীরের বড় দুই ছেলে, যাদের ডাক-নাম গোপাল এবং ভন্টু থাকে আমেরিকা আর জার্মানিতে। ছোট ছেলেমেয়ে দু'জন, নন্টু আর ছুটকি, কলকাতাতেই আছে। কলকাতায় যারা রয়েছে, সে নিজে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করবে। তবে গোপাল এবং ভন্টুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে হয় টেলিফোনে, নইলে চিঠিতে।

সুজাতার মনে পড়ে গেল, জন্মদিন উপলক্ষে চার ছেলেমেয়েই রণধীরকে প্রণাম জানিয়ে চিঠি লিখেছিল। হল-ঘরের বড় টেবলের ড্রয়ারে সেই চিঠিগুলো রয়েছে। সেগুলোতে তাদের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার আছে। সকাল হলেই চিঠি চারটে বার করবে সে।

বার

পরদিন সকালের দিকে ন'টা বাজতে না বাজতেই ডাক্তার অধিকারী এলেন। রণধীরের অবস্থা পালটায় নি; আচ্ছন্নের মতো চোখ বুজে একইভাবে তিনি শুয়ে আছেন।

এর মধ্যে রাতের নার্স চলে গেছে, তার জায়গায় দিনের নার্স তার ডিউটি শুরু করে দিয়েছে। সুজাতাও রণধীরের ছেলেমেয়েদের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার তাদের চিঠি থেকে একটা কাগজে লিখে নিয়েছে। লেটার-হেডের পাতায় চিঠিগুলো লেখা বলে তাদের ভাল নাম জানা গেছে। আমেরিকা প্রবাসী গোপালের আসল নাম অভিজিৎ, জার্মানিতে যে থাকে সেই ভন্টুর নাম সর্বজিৎ, নন্টু হল বিশ্বজিৎ। তবে ছুটকির ভাল নামটা জানা যায় নি। যে লেটার-হেডে তার চিঠি এসেছে তাতে ছাপা আছে: জয়ব্রত দত্ত, লেকচারার ইন ইংলিশ। খুব সম্ভব জয়ব্রত ছুটকির স্বামী।

এর ভেতর 'লীলাবতী ফার্মেসি'তে ফোন করে সুজাতা মাকে ডাকিয়ে এনে জানিয়ে দিয়েছে, তার জন্য উৎকণ্ঠার কারণ নেই। সে ভাল আছে। রণধীর সুস্থ হলেই সে বাড়ি ফিরবে। বিজনের কম্পিউটার সেন্টারে ফোন করেও একই কথা বলেছে সে। বিজন জানিয়েছে, তেমন দরকার হলেই সুজাতা যেন খবর দেয়। সে তক্ষুনি 'মল্লিক ভবন'-এ চলে যাবে।

ডাক্তার অধিকারী রণধীরকে ভাল করে পরীক্ষা করলেন। পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সুজাতা। জিজ্ঞেস করল, 'কেমন মনে হচ্ছে ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তার অধিকারী বললেন, 'কাল যেমন দেখেছি, প্রায় সেই রকমই। তোমাকে তো বলেছি, ফর্টি এইট আওয়ার্স না কাটলে জোর দিয়ে বলা যাবে না। তবে পালস আর হার্টবিট কিছুটা নর্মাল মনে হচ্ছে।'

একটু ইতস্তত করে সুজাতা বলে, 'আপনার একটা অ্যাডভাইস চাই ডাক্তারবাবু।'

'কী?'

'মল্লিক সাহেবের এখন যা শরীরের হাল, আমার মনে হয় ওঁর ছেলেমেয়েদের তা জানানো দরকার। আপনি কী বলেন?'

ডাক্তার অধিকারী খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'জানানো নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু ওদের ওপর ভীষণ রেগে আছে রণধীর। ধরা যাক, ও সুস্থ হয়ে উঠল। তারপর ছেলেমেয়েদের দেখে যদি ভায়োলেন্টলি রি-অ্যাক্ট করে, আবার ওর হার্টের ক্ষতি হতে পারে।'

একটু চুপচাপ।

একজন অভিজ্ঞ শুভাকাঙ্ক্ষী চিকিৎসক হিসেবে ডাক্তার অধিকারী যা বলেছেন তার সবটাই ঠিক। কিন্তু রণধীরের যথেষ্ট বয়স হয়েছে, দু দুবার স্ট্রোক হয়ে গেল। তিনি আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে আছেন। আরোগ্যলাভ ঘটবে কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চয়তা নেই। যদি দুর্ভাগ্যবশত রণধীরের মৃত্যু হয়, তাঁর বিপুল বিষয় সম্পত্তির কী হবে? এই কথাগুলো ডাক্তার অধিকারীকে বুঝিয়ে বলল সুজাতা। তবে প্রভুদাসরা যে ওত পেতে আছে সেটা আপাতত জানাল না।

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে ডাক্তার অধিকারী বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ। এ সময় ছেলেমেয়েদের কাছে থাকা দরকার। নইলে মল্লিকদের বিশাল প্রপার্টি নয় ছয় হয়ে যাবে। তুমি কি ওদের ঠিকানা

টিকানা জানো?'

সুজাতা বলল, 'জানি।'

'তা হলে ওদের খবর দাও। তবে একটা কথা—'

'বলুন—'

'ধর রণধীর সুস্থ হয়ে উঠল, তারপর ছেলেমেয়েদের দেখে যদি খেপে ওঠে, তোমাকে কিন্তু সামলাবার দায়িত্ব নিতে হবে।'

'আমি চেষ্টা করব।' মনে মনে সুজাতা স্থির করে ফেলল, একটা ঝুঁকি তাকে নিতেই হবে।

ডাক্তার অধিকারী বললেন, 'বেশ, তাই কর।'

সুজাতা বলল, 'যোগাযোগের কাজটা আমি আজই শুরু করতে চাই। কলকাতায় মল্লিক সাহেবের যে দুই ছেলেমেয়ে আছে, ওদের সঙ্গে আজ দেখা করব।'

ডাক্তার অধিকারী বললেন, 'ঠিক আছে, কর।'

সে যা ভেবেছে তাতে ডাক্তার অধিকারীর সম্পূর্ণ সায় আছে। এতে স্বস্তি বোধ করল সুজাতা। বলল, 'আপনি বললে আমি এখনই বেরিয়ে পড়তে পারি। ঘন্টা দুইয়ের ভেতর ওদের সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসব।'

ডাক্তার অধিকারী বললেন, 'ঠিক আছে, আমি নার্সকে বলে যাচ্ছি। মেয়েটার দায়িত্ববোধ আছে। সে সারাক্ষণ রণধীরের কাছে বসে থেকে তার ওপর নজর রাখবে। তুমি ঘুরে এস।'

তের

রণধীর মল্লিকের মেয়ে ছুটকি থাকে বাগবাজারে, রমাকান্ত হালদার রোডে। তার ভাল নাম জানা নেই, তবে তার স্বামীর নাম যে জয়ব্রত দত্ত লেটার-হেড থেকে তা জেনে নিয়েছে সুজাতা।

'মল্লিক ভবন' থেকে বেরিয়ে বাস ধরে বাগবাজারের মুখে এসে নেমে পড়ল সুজাতা। রমাকান্ত হালদার রোডে ছুটকিদের বাড়ি খুঁজে বার করতে অসুবিধা হল না।

পুরনো আমলের সাদামাঠা দোতলা বাড়ি। নিচের তলায় একটা লন্ড্রি আর একটা মনিহারি দোকান রয়েছে। লন্ড্রিতে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, জয়ব্রতরা দোতলায় থাকে।

মনিহারি দোকানের পাশ দিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। ওপরে এসে কলিং বেল টিপতেই একটি সুশ্রী চেহারার মহিলা দরজা খুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। একটা তাঁতের শাড়ি ঘরোয়া ধরনে পরা। এখনও স্নানটান হয়নি। কপালে বাসি সিঁদুরের টিপ, তেলহীন রুক্ষ চুল কপালের ওপর উড়ে উড়ে এসে পড়ছে।

নিজের নাম জানিয়ে সুজাতা হাতজোড় করে বলল, 'আমাকে চিনবেন না। আমি রণধীর মল্লিকের কাছে কাজ করি। আমি কি তাঁর মেয়ের সঙ্গে কথা বলছি?'

মহিলাও হাতজোড় করে বলে, 'হ্যাঁ।'

সুজাতা বলল, 'মাপ করবেন, আপনার ভাল নাম আমার জানা নেই। মল্লিক সাহেবের মুখে শুনেছি—ছুটকি।'

মহিলা বলল, 'সবার ছোট বলে ছুটকি। ভাল নাম মণিদীপা।'

সুজাতা বলল, 'আপনার সঙ্গে বিশেষ দরকার আছে। সে জন্যে ছুটে আসতে হল।'

অচেনা একটি মেয়েকে দেখে মণিদীপা এতটাই অবাক হয়ে গিয়েছিল যে সাধারণ ভদ্রতার কথা খেয়াল ছিল না। ভীষণ ব্যস্তভাবে এবার সে বলে, 'ওই দেখুন, আপনাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আসুন, ভেতরে আসুন—'

বাড়ির ভেতরের দিকটা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। একটা ছিমছাম ড্রইংরুমে এনে সুজাতাকে বসিয়ে তার মুখোমুখি বসল মণিদীপা।

কিভাবে রণধীর মল্লিকের কথাটা বলবে, মনে মনে তা গুছিয়ে নিয়ে সুজাতা বলল, 'আমি একটা খারাপ খবর নিয়ে এসেছি।'

মণিদীপাকে উদ্বিগ্ন দেখায়। রুদ্ধশ্বাসে সে জিজ্ঞেস করে, 'কী খবর?'

রণধীরের স্ট্রোকের কথা জানায় সুজাতা।

দু হাতে মুখ ঢেকে বালিকার মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মণিদীপা। স্বাভাবিক হতে তার খানিকটা সময় লাগে। তারপর চোখ মুছে ধরা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'বাবার অবস্থা কি খুবই ক্রিটিক্যাল?'

সুজাতা বলে, 'নিশ্চয়ই। ডাক্তার অধিকারীকে তো চেনেন?'

'হ্যাঁ। বাবার বন্ধু আর ডাক্তার। ভাল হার্ট স্পেশালিস্ট।'

'উনি বলেছেন, আটচল্লিশ ঘন্টার আগে কিছু বলা যাবে না। তার মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা কেটেছে। একটু চুপচাপ।

তারপর সুজাতা বলে, 'আমি শুধু আপনার বাবার অসুখের খবর দিতেই আসি নি। অন্য একটা বিশেষ প্রয়োজনেও আসতে হয়েছে।'

মণিদীপা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

সুজাতা বলে, 'তাঁর যা অবস্থা, এই সময় আপনাদের ওঁর পাশে থাকা দরকার। আপনাদের বলতে কাদের কথা বলছি, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন?'

মণিদীপা বলে, 'হ্যাঁ, আমি আর আমার ভাইবোনরা। কিন্তু—'

'কী?'

'আপনি তো বেশ কিছুদিন বাবার কাছে কাজ করছেন। ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে ওঁর কী মনোভাব তা বোধ হয় আপনাকে বলে দিতে হবে না।'

'সবই আমি জানি।'

ডাক্তার অধিকারী যা আশঙ্কা করেছিলেন, সেই কথাটাই মণিদীপার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, 'বাবা যদি সুস্থ হয়ে ওঠেন, আমরা গেলে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়বেন। তাতে তাঁর ক্ষতি হয়ে যাবে।'

সুজাতা একটু ভেবে বলল, 'এক্ষুনি আপনাদের যেতে বলছি না। মল্লিক সাহেব সুস্থ হয়ে উঠুন। তারপর সুযোগমতো আমি আপনাদের খবর দেব। তখন যাবেন।'

মণিদীপা উত্তর দিল না।

সুজাতা বলতে লাগল, 'আপনি আমার থেকে বয়েসে বড়; দিদিই বলছি। মণিদীপাদি, আপনারা হয়তো জানেন না, আপনাদের বিশাল প্রপার্টি ছিনিয়ে নেবার জন্যে বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। নিজেদের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্যে মল্লিক সাহেবের পাশে আপনাদের থাকা খুবই জরুরি।'

মণিদীপা জিজ্ঞেস করল, 'কারা ষড়যন্ত্র করছে?'

'পরে আপনাকে সব বুঝিয়ে দেব। মল্লিক সাহেবকে নার্সের হাতে রেখে এসেছি। আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে। তার আগে আপনার ছোটদা বিশ্বজিৎবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে যাব।' বলে একটু থামে সুজাতা। তারপর দ্বিধান্বিতভাবে জিজ্ঞেস করে, 'একটা কথা জানতে চাইলে আপনি রাগ করবেন না তো?'

মণিদীপা বলে, 'না না, কী জানতে চান বলুন—'

'আপনাদের চার ভাইবোনের ওপর মল্লিক সাহেব এত অসন্তুষ্ট কেন?'

মণিদীপা ধীরে ধীরে বিষণ্ণ সুরে যা জানায় তা এইরকম। মণিদীপা যাকে বিয়ে করেছে সেই জয়ব্রত সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। রণধীর মল্লিকের বংশগৌরব এবং আভিজাত্য নিয়ে প্রচণ্ড বাতিক। এই বিয়ে তাঁর পছন্দ হয়নি। মেয়ে-জামাইয়ের ওপর তিনি এত ক্ষিপ্ত যে তাদের বাড়িতে ঢুকতে দেন না।

বিশ্বজিৎ চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট। সে বিয়ে করেছে একটি দক্ষিণ ভারতীয় মেয়েকে। ঘোরতর বাঙালি রণধীর এই বিয়েও মেনে নিতে পারেন নি। তিনি তাদের মুখদর্শন করেন না। ছোট ছেলে এবং ছোট পুত্রবধূর তাই 'মল্লিক ভবন'-এ প্রবেশ নিষেধ।

বড় ছেলে অভিজিৎ এবং মেজ ছেলে সর্বজিতের ওপর অসন্তোষের কারণটা ভিন্ন। নিজেদের বিপুল বিষয় সম্পত্তি এবং অর্থ থাকা সত্ত্বেও তারা আমেরিকা আর জার্মানিতে চলে গিয়েছিল কেরিয়ারের জন্য। এতে প্রচণ্ড আপত্তি ছিল রণধীরের। তিনি খামখেয়ালি, বদরাগী। তাঁর মতের বিরুদ্ধে কেউ গেলেই খেপে যান। বড় দুই ছেলের সঙ্গেও তাই কোনোরকম সম্পর্ক রাখেন নি।

সুজাতা এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করল না; সোফা থেকে উঠে পড়ল। ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে বাইরের দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, 'আপনাকেই শুধু দেখছি। বাড়িতে আর কেউ নেই?'

মণিদীপা বলল, 'আমার হাজব্যাণ্ডের মর্নিং কলেজ। সকাল সাতটার মধ্যে তাকে বেরিয়ে যেতে হয়। আমার এক ছেলে এক মেয়ে। তাদেরও মর্নিং স্কুল। আটটায় ওদের স্কুল বাস আসে। তারপর থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত বাড়ি একদম ফাঁকা। ওরা থাকলে আপনার সঙ্গে আলাপ হত। আর একদিন কিন্তু আসবেন।'

'আসব।'

বিশ্বজিৎরা থাকে দক্ষিণ কলকাতায়। লেকের কাছে রাজা বসন্ত রায় রোডে।

সেখানে এসে বিশ্বজিতের সঙ্গে দেখা হল না, সে অফিসে বেরিয়ে গেছে। ওর স্ত্রী পদ্মার সঙ্গে অবশ্য আলাপ হল। কে বলবে সে তামিলনাড়ুর মেয়ে। তিন পুরুষ ধরে ওরা কলকাতায় আছে। চমৎকার বাংলা বলে। আদ্যোপান্ত বাঙালি হয়ে গেছে সে।

ওদের একটিই ছেলে, ক্লাস সেভেনে পড়ে। সাড়ে ন'টায় তার ক্লাস শুরু। ন'টার ভেতর তাকে বেরিয়ে যেতে হয়। বাড়িতে কাজের মেয়ে আর পদ্মা ছাড়া অন্য কেউ নেই।

পদ্মার কাছ থেকে বিশ্বজিতের অফিসের ঠিকানা নিয়ে সুজাতা সোজা সেখানে চলে আসে। ক্যামাক স্ট্রিটের বিশাল এক হাইরাইজে নাম-করা মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির টপ অ্যাকউন্টস অফিসার বিশ্বজিৎ।

রিসেপশানে স্লিপ লিখে দেবার পরও আধঘন্টা বসে থাকতে হল সুজাতাকে। তারপর একটা বেয়ারা এসে বিরাট আকারের এয়ারকুলার-বসানো সুসজ্জিত চেম্বারে নিয়ে গেল তাকে।

বিশ্বজিতের হাইট মাঝারি, লম্বাটে মুখ, উজ্জ্বল তামাটে রং, চুল ব্যাকব্রাশ-করা, চওড়া কপাল, দামি ফ্রেমের ওপারে বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। পরনে সাফারি। একটা অর্ধবৃত্তাকার টেবলের ওধারে বসে আছে সে। সুজাতা ঢুকতেই বলল, 'বসুন—' সুজাতা বসতেই ফের বলল, 'আই অ্যাম এক্সট্রিমলি বিজি। হাতে একেবারেই সময় নেই। বলুন, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর?'

বিশ্বজিতের মধ্যে একটা দেখানেপনার ব্যাপার আছে। সে যে ভীষণ কাজের লোক এবং ব্যস্ত, সেটাই হাবেভাবে এবং কথাবার্তায় স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ মাথা গরম হয়ে ওঠে সুজাতার। নিজেকে যতটা সম্ভব সংযত রেখে সে বলে, 'আপনার কাছে আমার ব্যক্তিগত কোনো প্রয়োজন নেই।'

বিশ্বজিৎ একটু থমকে গেল। তারপর অবাক হয়ে বলল, 'তা হলে—'

সুজাতা বলল, 'আপনাদের দরকারেই আমাকে আসতে হয়েছে।'

বিশ্বজিতের অবাক ভাবটা অনেক বেড়ে যায়। সে বলে, 'মানে—'

এবার নিজের পরিচয় দিয়ে এখানে আসার উদ্দেশ্যটা জানিয়ে সুজাতা বলে, 'মণিদীপা দেবীর বাড়ি গিয়েছিলাম। তাঁকেও বলে এসেছি এবং আপনাকেও বলছি, আপনার বাবার এই অবস্থায় তাঁর পাশে আপনাদের থাকা উচিত।'

মণিদীপার মতোই বিশ্বজিৎও বলল, 'আমার বাবাকে তো আপনি জানেন। ক্রাইসিস কেটে যাবার পর আমাদের দেখলেই ফ্লেয়ার আপ করবেন।'

'যাতে না করেন, সে দায়িত্ব আমার। আপনারা প্রস্তুত থাকবেন। আমি খবর দিলেই চলে যাবেন।'

'ঠিক আছে।'

'আর একটা কথা—'

'বলুন—'

সুজাতা বলল, 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনার বাবা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন। কোনো কারণে, যদি খারাপ কিছু ঘটে যায়, আমি ও বাড়িতে থাকব না। মানে থাকা সম্ভব নয়। আপনাদের বিশাল প্রপার্টির দিকে অনেক বদমাশ লোকের নজর পড়েছে। আপনারা যদি এখনও দূরে সরে থাকেন আপনাদেরই তাতে ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে।' বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ায়।

বিশ্বজিতের অফিস থেকে বেরিয়ে বিদেশ সজ্জার নিগমের অফিসে চলে এল সুজাতা। এখান থেকে

পৃথিবীর নানা দেশে ফোন করার ব্যবস্থা আছে।

রণধীর মল্লিকের বড় এবং মেজ ছেলে অভিজিৎ আর সর্বজিতের ফোন নাম্বারও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। ফোনে তাদেরও ধরে ফেলে সে। অন্য দুই ভাইবোনকে যেমন দিয়েছিল তেমনি প্রথমে তাদেরও নিজের পরিচয় দিয়ে রণধীরের দ্বিতীয় হার্ট অ্যাটাকের কথা বলে। সেই সঙ্গে জানায়, তাদের বিষয় সম্পত্তি দখল করার জন্য একদল ধুরন্ধর লোক চক্রান্ত করছে। এক মুহূর্ত দেরি না করে তাদের কলকাতায় চলে আসা প্রয়োজন।

অভিজিৎ এবং সর্বজিৎ দু'জনেই পৃথিবীর দুই প্রান্ত থেকে সুজাতাকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে, 'যত তাড়াতাড়ি পারি কলকাতায় আসছি।'

চোদ্দ

ধাক্কাটা শেষ পর্যন্ত সামলে উঠলেন রণধীর। ডাক্তার অধিকারী বলেছিলেন, ক্রাইসিসটা আটচল্লিশ ঘন্টা থাকবে। সেটা কাটাতে পারলে আপাতত আর দুশ্চিন্তা নেই।

বিপদ কাটলেও মোটামুটি সুস্থ হতে আরো তিন চারদিন লেগে গেল। সর্বক্ষণের নার্সরা তো রয়েছেই। একদিন কয়েক ঘন্টার জন্য রণধীর মল্লিকের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বেরিয়ে ছিল সুজাতা। ওই সময়টুকু বাদ দিলে 'মল্লিক ভবন' থেকে আর একবারও বেরোয় নি; রণধীরের বিছানার পাশে বসে থেকেছে। আদর্শনগরের 'লীলাবতী ফার্মেসি'তে ফোন করে অবশ্য রোজই মা বা ভাইবোনের সঙ্গে দু-তিন বার কথা বলেছে। জানিয়েছে, তার জন্য যেন ওরা দুশ্চিন্তা না করে। রণধীরের রোগমুক্তি ঘটলেই সে বাড়ি ফিরবে।

আজ সকালে অন্যদিনের মতো ডাক্তার অধিকারী এলেন। রাতের নার্স চলে গেছে, তবে দিনের নার্স এখনও এসে পৌঁছয় নি। দশ পনের মিনিটের ভেতর চলে আসবে।

রণধীর বেডরুমে তিন চারটে বালিশের ওপর হেলান দিয়ে তিনি বসে আছেন। ক্রাইসিস কেটে গেলেও এখনও অসুস্থতার ছাপ রয়েছে তাঁর চোখেমুখে।

ডাক্তার অধিকারী বললেন, 'খুব একখানা খেল দেখালে বটে।'

রণধীর হাসলেন, 'তোমার দয়ায় আগের বারও বেঁচে উঠেছিলাম। এবারও বাঁচলাম।'

ডাক্তার অধিকারী বললেন, 'এবারটা আমার জন্যে নয়, এই মেয়েটা তোমাকে রক্ষা করেছে। ছ'টা দিন বাথরুমে যাওয়া ছাড়া এক সেকেন্ডের জন্যে তোমার বিছানার পাশ থেকে ও ওঠে নি। নিজের মেয়েও এতটা করে না।'

রণধীর সুজাতাকে কাছে ডেকে পাশে বসিয়ে তার পিঠে একটা হাত রেখে আর্দ্র সুরে বললেন, 'ও তো আমার মেয়েই।'

প্রথম দিন থেকেই সুজাতা দেখে আসছে, রণধীরের মেজাজ সবসময় সপ্তমে চড়ে আছে। রুক্ষ, কর্কশ গলায় ছাড়া কখনও তাঁকে কথা বলতে শোনে নি সে। আজই তাঁর কণ্ঠস্বর এত কোমল শোনাল। চোখের কোণ দুটো শিরশির করতে থাকে সুজাতার।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে, রণধীর কখন কী ওষুধ খাবেন, সকাল থেকে কী পথ্য হবে, সব একটা চার্ট তৈরি করে দিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার অধিকারী।

রণধীর কী ভেবে হঠাৎ বললেন, 'আমার জন্যে তুমি এত কিছু করেছ সুজাতা। তার প্রতিদান হয় না। যতটা দেখেছি, মনে হয়েছে তোমার আত্মসম্মান বোধ খুবই প্রখর। খেপে না ওঠ, একটা কথা বলব—'

সুজাতা উৎসুক দৃষ্টিতে তাকায়, 'কী?'

'তোমাকে আমি কিছু দিতে চাই।' ব্যগ্রভাবে রণধীর বলতে লাগলেন, 'ধর, ইটস এ টোকেন অফ মাই গ্র্যাটিটিউড।'

একটু চিন্তা করে সুজাতা বলল, 'ঠিক আছে, আপনার কাছে আমি একটা জিনিস চাইব। সেটা দিলে নিতে পারি।'

সামনের দিকে ঝুঁকে রণধীর জিজ্ঞেস করলেন, 'বল, কী চাও?'

'এখন না। পরে আপনাকে জানাব।'

'পরে না, এখনই জানতে চাই।'

সুজাতা গভীর গলায় বলে, 'নিজের ছেলেমেয়েদের ওপর রাগ করে থাকবেন না। ওদের কাছে ডেকে নিন। এটা হলেই আমি খুশি।'

কনুইয়ের ভর দিয়ে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে উঠে বসলেন রণধীর। তাঁর চোখের দৃষ্টি স্থির। মানুষটা এতটাই হতবাক যে একটি কথাও বললেন না।

সুজাতা বলতে লাগল, 'আপনি যখন অত্যন্ত অসুস্থ, আচ্ছন্নের মতো বিছানায় শুয়ে আছেন, আপনার চার ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করেছি। আপনি হয়তো খুব অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, কিন্তু এ ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।'

সুজাতার ভয় ছিল, ছেলেমেয়েদের কথা বললে রণধীরের প্রতিক্রিয়া হবে তীব্র। হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো তিনি চিৎকার করে উঠবেন। কিন্তু কিছুই হল না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ একইভাবে নিশ্চল বসে রইলেন। তারপর আবার সুজাতার দিকে ঘুরে খুব নরম গলায় বললেন, 'এত সব কাণ্ড তুমি এর ভেতর করে বসে আছ!'

সুজাতা উত্তর দিল না।

রণধীর বললেন, 'তুমি কি শুধু এটুকুই চাও?'

সুজাতা আস্তে মাথা নাড়ে, 'হ্যাঁ।'

'আর কিছু না?'

'না।'

বেশ খানিকক্ষণ পর রণধীর জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেমেয়েদের কাছে ডেকে নিতে বলছ কেন?'

সুজাতা বলল, 'সেটা আমি ওদের জানিয়েছি। ওরাই আপনাকে সব বলবে। আপনার দু দুটো স্ট্রোক হয়ে গেছে, এত বড় বাড়িতে একা থাকেন। শুধু এই জন্যেই নয়, আরো বড় কারণে আপনার কাছে ওদের কারো কারো থাকা দরকার।'

'তুমি যখন বলছ, তাই হবে।'

'আমি তা হলে ওদের খবর দিই?'

'দাও।'

সুজাতা লক্ষ করল, রণধীরের চোখেমুখে আশ্চর্য এক পরিতৃপ্তি ফুটে উঠেছে। আপাত-রুক্ষ মানুষটির মধ্যে হয়তো এমন একটা গোপন ইচ্ছা থেকে গিয়েছিল। নিজে তিনি তা বুঝতে পারেন নি। রণধীরকে দেখতে দেখতে খুব ভাল লাগল সুজাতার।

একটু নীরবতা।

তারপর সুজাতা বলল, 'আপনি এখন অনেকটাই ভাল আছেন। চব্বিশ ঘন্টার নার্সও রয়েছে। অনেকদিন বাড়ি যাওয়া হয় নি। আজ কিন্তু আমাকে যেতে দিতে হবে।'

ব্যস্তভাবে রণধীর বললেন, 'নিশ্চয়ই যাবে। কখন যেতে চাও?'

'এখনও তো দিনের বেলার নার্স এসে পৌঁছয় নি। সে এলেই যাব।'

'আচ্ছা। আজ আর তোমাকে ফিরতে হবে না। কাল থেকে যেমন আসো তেমনি আসবে।'

মিনিট কুড়ির ভেতর নার্স এসে গেল। তারপর বেরিয়ে পড়ল সুজাতা।

পনের

সেই যে তিনটে কোম্পানিতে সুজাতা ইন্টারভিউ দিয়ে এসেছিল তারপর মাসখানেক কেটে গেছে। ইন্টারভিউ বোর্ডের বাঘা বাঘা মেম্বাররা একের পর এক যে সব প্রশ্ন সুজাতাকে করেছিল ভেবেচিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় তার প্রত্যেকটারই উত্তর দিয়েছে সে। সুজাতার ধারণা, পক্ষপাতিত্ব না হলে যে কোনো একটা চাকরি তার হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে সে, কোনোরকম খুঁটির জোর নেই। শেষ পর্যন্ত তার কপালে শিকে ছিঁড়বে কিনা সে সম্পর্কে কিছুটা সংশয় ছিল।

ইন্টারভিউর কথাটা রণধীরকে জানায় নি সুজাতা। চাকরি যদি আদৌ হয় তখন তো বলতেই হবে।

এর মধ্যে রণধীরের ছেলেমেয়েরা 'মল্লিক ভবন'-এ এসে গিয়েছিল। ওরা সরাসরি বাড়ি আসে নি। সর্বজিৎ আর অভিজিৎ কলকাতায় এসে বিশ্বজিতের ফ্ল্যাটে ওঠে। সেখান থেকে প্রথমে সুজাতাকে ফোন করে। সুজাতা তাদের সঙ্গে মণিদীপাকেও নিয়ে আসতে বলে।

রণধীর তাদের দেখে খেপে ওঠেননি, বা তর্জনগর্জনও করেননি। শুধু সামান্য ভুরু কুঁচকে বলেছেন, 'শুয়ারগুলো।' বোঝা গেছে তিনি খুশি হয়েছেন।

অলৌকিক ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে যায়। একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে শেষ পর্যন্ত চাকরিটা হয়েই গেল সুজাতার। খবরটা জানাবার পর রণধীর এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের দিক থেকে প্রচণ্ড আপত্তি উঠল। কেউ তাকে ছাড়তে চায় না। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের রাজি করলে সুজাতা। জানাল, অন্য চাকরি নিলেও রণধীরদের সঙ্গে তার সম্পর্ক অটুট থাকবে। মাঝে মাঝে এসে সে রণধীরের খবর নিয়ে যাবে। প্রভুদাস খৈতানদের মতো হাঙরদের গ্রাস থেকে পারিবারিক বিষয়সম্পত্তি যাতে রক্ষা করতে পারে, সে জন্য তাঁর ছেলেমেয়েদের সতর্কও করে দিল।

দেখতে দেখতে দুটো বছর কেটে যায়। প্রথম প্রথম প্রতি সপ্তাহে একবার এসে রণধীর মল্লিককে দেখে যেত সুজাতা। তারপর যা হয়, যাতায়াতটা অনিয়মিত হতে হতে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, যোগাযোগটাও আর থাকে না।

ঠিক দুবছর বাদে হঠাৎ রণধীর মল্লিকের অ্যাটর্নির কাছ থেকে একটা চিঠি পায় সুজাতা। তিনি লিখেছেন রণধীর মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে একটা উইল করে গেছেন। তাতে স্পষ্ট লেখা আছে, 'আমি সজ্ঞানে, সুস্থ মস্তিষ্কে শ্রীমতী সুজাতা ধরচৌধুরিকে দশ লক্ষ টাকা দিচ্ছি। এই মেয়েটির কাছে আমাদের পরিবারের কৃতজ্ঞতা এবং ঋণের শেষ নেই। সে নানাভাবে আমাদের বিষয় সম্পত্তি ও আমার জীবন রক্ষা করেছে। সামান্য দশ লক্ষ টাকা দিয়ে তার ঋণ শোধ করা যায় না। তবে সে যদি গ্রহণ করে, মৃত্যুর পর আমার আত্মা কৃতার্থ হবে।'

অ্যাটর্নির চিঠিটা পড়তে পড়তে দু চোখ জলে ভরে যায় সুজাতার। কিছুদিনের জন্য বিচিত্র একটি মানুষের সংস্পর্শে এসেছিল সে। রণধীরের মৃত্যুতে তার মনে হয়, দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হল।

নতুন দিগন্তে

এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরটায় রিয়া আর ঝিনুক ঢুকেছিল দুপুর একটায়। পুরো তিনটি ঘন্টা ধরে শ পাঁচেক দামি দামি শাড়ি ঘেঁটে পঁচিশটা পছন্দ করেছে তারা। সেই সঙ্গে নানা ধরনের ডজন ডজন ফ্যাশনেবল লেডিজ শু থেকে আট জোড়া বেছে নিয়েছে। কাউন্টারের সেলসম্যানরা এখন সেগুলো গুছিয়ে প্যাক করছে।

রিয়ার বয়স পঁচিশ। টান টান, ঝকঝকে চেহারা। গায়ের রং পাকা গমের মতো। ত্বক এমনই মসৃণ আর উজ্জ্বল, মনে হয় ভেতর থেকে আলো বেরিয়ে আসছে। কাঁধ পর্যন্ত রেশমের মিহি সুতোর মত শ্যাম্পু-করা চুল। লম্বাটে মুখ, ভুরু প্লাক-করা, চোখের মণিদুটো বাদামি। পরনে জিনস আর ঢোলা শার্ট। গলায় সরু সোনার চেন, যার কারুকাজ-করা চৌকো লকেটটার মাঝখানে একটা ছোট্ট গোল ঘড়ি। বাঁ হাতে পেতল আর ব্রোঞ্জের তৈরি নকশাওলা সরু-মোটা এক গোছা চুড়ি, ডান হাতের মাঝখানের আঙুলে জ্বলজ্বলে লাল পাথর বসানো আংটি। চামড়ার ফিতেয় বাঁধা একটা দারুণ লেডিজ ব্যাগ কাঁধ থেকে নেমে এসে কোমরের কাছে ঝুলছে। সব মিলিয়ে রিয়াকে বাঙালি তো নয়ই, কেমন যেন অভারতীয় মনে হয়।

ঝিনুক রিয়ার খুড়তুতো বোন। তার বয়স কুড়ির বেশি হবে না। রং একটু চাপা হলেও, খুবই সুশ্রী। নাকমুখ কাটা-কাটা, ঘন পালকে ঘেরা চোখের মণিদুটো কুচকুচে কালো। তার অজস্র কোঁচকানো চুল হেয়ার ব্যাণ্ড দিয়ে আটকানো। চমৎকার স্বাস্থ্য। পরনে লম্বা স্কার্ট আর টপ। রিয়ার মতোই তার গলাতেও সোনার চেন, তবে লকেটটার আকার অনেকটা নৌকোর মতো। ঝিনুকের ডান হাতেও গোছা গোছা চুড়ি, তবে সেগুলো রংবেরংয়ের কাচের। বাঁ হাতে সোনার ব্যাণ্ডে আটকানো একটা চৌকো বিদেশি ঘড়ি। তার কাঁধ থেকেও ব্যাগ ঝুলছে।

ঠিক তিন সপ্তাহ পর রিয়ার বিয়ে। দশ দিন আগে থেকে আর কেনাকাটা শুরু হয়েছে। ঝিনুককে সঙ্গে নিয়ে সে রোজ কিছু কিছু কিনছে। ওদিকে মা মন্দিরা আর দুই কাকিমা প্রীতিকণা এবং বিনীতা জুয়েলারি শপ, টিভি ফ্রিজ আর ফার্নিচারের দোকানগুলো চষে ফেলছেন। বাবা-কাকারা কেনাকাটার ব্যাপারে ঘোর আনাড়ি। বাড়ির মেয়েদের হাতে এই দায়িত্বটা তুলে দিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত। অবশ্য বিয়ের জন্য বাড়ির বিশাল ছাদে এবং সামনের লন-এ প্যাণ্ডেল করানো আর নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়নের দিকটা ওঁরা দেখছেন। নাম-করা ডেকরেটর এবং ক্যাটারারদের সঙ্গে ওঁদের কথাবার্তা চলছে। দু-একদিনের ভেতর এদের মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে অর্ডার দেওয়া হবে।

রিয়া পনের বছর লন্ডনে ছিল। শার্ট কোট ট্রাউজার্সেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। যতই করুক, সে বাংলাদেশের মেয়ে, বিয়েও হচ্ছে একটা বাঙালি যুবকের সঙ্গে, কলকাতাতেই তাকে থাকতে হবে। জিনস টিনস পরে বিয়েটা এখনও চালু হয় নি। তাই শাড়ি কিনতে হচ্ছে। শাড়ি অবশ্য তার অপছন্দ নয়। কিন্তু আঁচল টাচল সামলাতে অসুবিধা হয়। তবে কিছুদিনের ভেতর নিশ্চয়ই অভ্যাস হয়ে যাবে।

শাড়ি টাড়ি বেছে দেবার পর রিয়া আর ঝিনুক ক্যাশ কাউন্টারে চলে এসেছিল। ক্যাশ ক্লার্ক কম্পিউটারে তাদের জিনিসপত্রের দাম জুড়ে জুড়ে হিসেব করছে।

একসঙ্গে প্রায় তিরিশ হাজার টাকার শাড়ি আর জুতো কিনেছে রিয়ারা। এত বড় কাস্টমারদের খাতির করার জন্য স্টোরের ম্যানেজার ওদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন। একটা উর্দি-পরা বেয়ারাকে দিয়ে দুটো চেয়ার ক্যাশ কাউন্টারের সামনে আনিয়ে রিয়াদের বললেন, 'ম্যাডাম, আপনারা বসুন—'

রিয়া বলল, 'না না, এখন আর বসব না। অনেকক্ষণ এসেছি। হিসেবটা হয়ে গেলে পেমেন্ট করে চলে যাব। কাইণ্ডলি আপনাদের লোক দিয়ে আমাদের প্যাকেটগুলো যদি গাড়িতে তুলে দেন—'

ম্যানেজার বললেন, 'নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু আপনাদের বসতেই হবে ম্যাডাম—'

ভদ্রলোক এমনভাবে অনুরোধ করতে লাগলেন যে না বসে পারা গেল না।

ম্যানেজার বললেন, 'কী আনাব বলুন—চা, না কোল্ড ড্রিংক?'

এর আগেও একবার কোল্ড ড্রিংক আনিয়ে দিয়েছে ম্যানেজার। রিয়া বলল, 'নো, থ্যাংকস। প্লিজ আপনি ব্যস্ত হবেন না।' তারপর কী ভেবে নিচু গলায় ঝিনুককে বলল, 'এই একটা কাজ কর

না—'

ঝিনুক একটা চোখ সামান্য কুঁচকে মজাদার ভঙ্গিতে বলল, 'বুঝেছি—বুঝেছি। সেই যে সেক্রেড ডিউটিটা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়েছিস, সেটা তো?'

এই ক'দিন রোজই শপিংয়ের পর ঝিনুককে দিয়ে স্নেহাশিসকে ফোন করাচ্ছে রিয়া। স্নেহাশিসের সঙ্গেই তার বিয়ে ঠিক হয়েছে।

ঝিনুক আরো কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে রিয়া বলল, 'একদম ফাজলামো করবি না।'

ঝিনুক বলল, 'ঠিক আছে দিদিভাই, করব না। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'স্নেহাশিসদাকে ধরতে একটা টেলিফোন যে দরকার—' ম্যানেজার একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রিয়া তাঁকে বলল, 'এক্সকিউজ মি, আপনাদের এখান থেকে একটা ফোন করা যেতে পারে?'

'নিশ্চয়ই।' ম্যানেজার দৌড়ে গিয়ে কোত্থেকে একটা কর্ডলেস ফোন এনে রিয়াকে দিতে দিতে বললেন, 'একটা কেন, যে ক'টা ইচ্ছে করুন।' বলে অন্য দিকে চলে গেলেন। অনাত্মীয় মহিলারা, বিশেষ করে তরুণীরা যখন ফোন করে তখন কাছে দাঁড়িয়ে থাকাটা অশোভন।

ফোনটা রিয়ার হাত থেকে এবার ঝিনুকের হাতে গেল। বাটন টিপে টিপে স্নেহাশিসকে তাদের অফিসে পেয়ে যায় ঝিনুক। বলে, 'এই ফোনটার জন্যে দম বন্ধ করে ওয়েট করছিলেন তো?'

লাইনের ওধার থেকে স্নেহাশিসের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কারেক্ট।'

ঝিনুক সুরেলা শব্দ করে একটু হাসল।

স্নেহাশিস বলল, 'ঝিনুক, তোমার গলা শুনলে কী মনে হয় জানো?'

'কী?'

'একেবারে সেভেনথ হেভেনে পৌঁছে গেছি।'

'অত ফ্ল্যাটারির দরকার নেই! আমার জন্যে দিদিভাইয়ের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা হয়, তাই এত ভাল ভাল কথা মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। অল ভেরি সুইট লাইজ।'

স্নেহাশিস বলল, 'বিশ্বাস কর, দিজ আর অল ট্রু, অ্যাবসোলিউট ট্রু।' একটু থেমে বলল, 'অন্য দিন তিনটের ভেতর তোমার ফোন আসে। আজ চারটে বেজে গেছে। ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে দেখাটা বুঝি হল না।'

ঝিনুক বলল, 'তোমাদের সঙ্গে না বলে, বলুন শ্রীমতী রিয়া মিত্রর সঙ্গে। আমি তো স্রেফ ফালতু। দিদিভাইয়ের সঙ্গে অ্যাডহেসিভের মতো জুড়ে আছি।' জিভের ডগায় অদ্ভুত একটা আওয়াজ করে বলতে লাগল, 'বিয়েটা হয়ে গেলেই চকাং। আমাকে সট করে ছেঁটে ফেলা হবে।'

পনের বছর লণ্ডনে ছিল রিয়া। মা-বাবা তাকে বাংলা ভুলতে দেন নি। মাতৃভাষাটা সে খুব ভালই লিখতে এবং পড়তে পারে। দেশে ফেরার পর লক্ষ করেছে তাদের বাড়িতে ফালতু, চকাং, ছেঁটে ফেলা—এ জাতীয় শব্দ কেউ ব্যবহার করে না। লণ্ডনের ককনির মতো এগুলোও বোধ হয় কলকাতার ককনি। ঝিনুক কোত্থেকে শিখেছে, কে জানে। রিয়া আলতো করে বোনের পিঠে একটা চাপড় মারল।

স্নেহাশিস বিব্রতভাবে কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, পারল না। তার আগেই ঝিনুক ফের বলল, 'অফিসে বাবার চোখে ধুলো দিয়ে স্ট্রেট 'গোল্ডেন অ্যারো'তে চলে যান। আমরা আসছি।' 'গোল্ডেন অ্যারো' হল পার্ক স্ট্রিটের নাম-করা একটা রেস্তোরাঁ।

ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের বেয়ারারা রিয়াদের মারুতি-ওমনিতে জুতো আর শাড়ির প্যাকেটগুলো তুলে দিয়েছিল। বিল চুকিয়ে দু'জনে পার্ক স্ট্রিটে চলে এল। ওরা বাড়ির ড্রাইভার সঙ্গে আনে নি। আসার সময় রিয়া ড্রাইভ করেছিল। এখন ঝিনুক চালাচ্ছে।

'গোল্ডেন অ্যারো'র সামনে গাড়িটা পার্ক করে ভেতরে ঢুকে পড়ল রিয়ারা।

রেস্তোরাঁটা একতলা এবং দোতলা মিলিয়ে। একতলার মাঝখান দিয়ে ওপরে যাবার সিঁড়ি। রিয়া আর ঝিনুক দোতলায় উঠে এল।

নিরিবিলি একটি কোণে নির্দিষ্ট একটা টেবলে বসে আছে স্নেহাশিস। ত্রিশের কাছাকাছি বয়স। গায়ের রং বাদামি, ধারাল মুখ, ব্যাক ব্রাশ-করা চুল, চওড়া কপাল, চিবুকের গঠনটি বেশ দৃঢ়, চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ। হাইট পাঁচ ফুট ন' দশ ইঞ্চির মতো। পরনে দামি ট্রাউজার্স আর বুশ শার্ট। হাতে চওড়া স্টিলের ব্যাণ্ডে বিদেশি ঘড়ি যা শুধু সময়ই নয়, দিন এবং তারিখও জানিয়ে দেয়।

সব মিলিয়ে স্নেহাশিস রীতিমতো সুপুরুষ। রিয়ার পাশে সে দাঁড়ালে বিজ্ঞাপনের ভাষায় যাকে 'মেড ফর ইচ আদার' বলে, তাই মনে হয়।

রিয়ারা এগিয়ে এসে স্নেহাশিসের দু' পাশে বসে পড়ে।

এয়ার-কণ্ডিশনড এই রেস্তোরাঁয় নানা ধরনের ল্যাম্পশেডের ভেতর বাতিগুলো তীব্র নয়। নরম, নীলাভ আলোয় কেমন যেন অলৌকিক স্বপ্নের মতো মনে হয়। চারপাশে বেশির ভাগ টেবলে জোড়ায় জোড়ায় মহিলা আর পুরুষ বসে আছে। অন্যগুলোতে তিন চার জন করে।

স্টুয়ার্ড খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে রিয়াদের লক্ষ করছিল। ওরা বসতেই সামনে এসে হাজির। স্নেহাশিসের কাছ থেকে কফি, চিকেন কাটলেট আর ফিঙ্গার চিপসের অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

ডান দিকের উঁচু একটা ডায়াসে বাজনার তালে তালে কোমর দুলিয়ে একটি তরুণী গান গায়। এ সময় তার ডিউটি থাকে না। ফলে মঞ্চটা ফাঁকা। শুধু মিউজিক সিস্টেমে খুব আস্তে মাতাল-করা একটা দারুণ জনপ্রিয় বিদেশি প্রেমের গানের সুর বাজানো হচ্ছে।

স্নেহাশিস রিয়া আর ঝিনুককে এক পলক দেখে নিয়ে হেসে হেসে বলল, 'তোমরা দুই বোন শপিং করছ বটে। মনে হচ্ছে, কলকাতার সব দোকানের সব জিনিস কিনে ফেলবে।'

ঝিনুক বলল, 'আফটার অল, মিত্র বংশের আমাদের জেনারেশনের এটাই হচ্ছে প্রথম বিয়ে। কেনাকাটা তো করতেই হবে। শুধু কি আমরা দু'জনে, মা কাকিমা জেঠিমা—সবাই বেরিয়ে পড়েছে। এটা হবে ক্যালকাটা মেট্রোপলিসে মোস্ট স্পেক্টাকুলার ম্যারেজ অফ দ্য লাস্ট ডিকেড অফ দিস সেঞ্চুরি।' বেশ মজা করে বলল, 'বরমশাই যখন বিয়ে করতে আসবেন, আপনার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে।'

স্নেহাশিস হাসতে লাগল।

ওয়েটার ট্রেতে খাবার এনে টেবলে সাজিয়ে দিয়ে গেল। পরে কফি আনবে।

খেতে খেতে ঝিনুক জিজ্ঞেস করল, 'আপনার পাশপোর্টের কী হল?'

ঝিনুক শুনেছে, স্নেহাশিসের এতদিন পাশপোর্ট ছিল না। বিয়ের পর বিদেশে হনিমুন করতে যাবে বলে দিন পনের আগে ওটার জন্য আবেদন-পত্র জমা দিয়েছে। তারপর থেকে রোজ ট্র্যাভেল এজেন্টকে দিয়ে পাশপোর্ট অফিসে তাগাদা দিচ্ছে, নিজেও ফোন করছে। কিন্তু ওটা কবে পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে না।

স্নেহাশিস বলল, 'এখনও কিছু হয়নি। আশা করি, শীগ্‌গরই পেয়ে যাব।'

'হনিমুনটা কোথায় করবেন—ইওরোপ না আমেরিকায়?'

'তোমার দিদি যেখানে বলবে।'

চোখ গোল করে ঝিনুক বলল, 'বাব্বা, বিয়ে হবার আগেই হেনপেকড, মানে স্ত্রৈণ হয়ে গেলেন!'

স্নেহাশিস হেসে হেসে বলল, 'আমি শুধু স্ত্রীরই নয়, শ্যালিকারও অনুগত। আমার ইচ্ছে, হনিমুনে তোমাকেও নিয়ে যাব।'

ঝিনুক দুই হাতের আঙুলগুলোতে বিচিত্র মুদ্রা ফুটিয়ে বলল, 'আপনি একটা আস্ত হাঁদারাম মশাই।'

স্নেহাশিস জিজ্ঞেস করল, 'কিরকম?'

'জানেন না, হনিমুনে যেতে হয় দু'জনে? কেউ একটা বিগ্রেড সঙ্গে নিয়ে যায় না।'

'জানি। আমার ইচ্ছে আমাদের সঙ্গে গিয়ে হনিমুনের দু-একটা লেসন নিয়ে আসবে। ফিউচারে কাজে লাগবে।'

ঝিনুক বলল, 'অন্যের কাছ থেকে লেসন নেবার দরকার নেই। যাকে বিয়ে করব সে আর আমি ওটা ঠিক শিখে নেব।'

ঘন্টাদেড়েক হালকা মেজাজে গল্প টল্প করার পর রিয়া বলল, 'সন্ধে হয়ে এল। এবার বাড়ি ফিরতে হবে।'

বিল মিটিয়ে তিনজন উঠে পড়ল।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরুতে বেরুতে স্নেহাশিস ঝিনুককে জিজ্ঞেস করল, 'কাল দুই বোন আবার শপিং করতে বেরুবে তো?'

ঝিনুক বলল 'অনেক কেনাকাটা বাকি। কসমেটিকসে তো এখনও হাতই দিই নি। বিয়ের আগের দিন পর্যন্ত ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোতে হানা দিয়ে যেতে হবে।'

'তা হলে কালও এই রেস্তোরাঁয় দেখা হচ্ছে।'

'হোপ সো।'

রাস্তায় এসে রিয়া আর ঝিনুক তাদের মারুতি-ওমনিতে উঠল, আর স্নেহাশিস উঠল তার ঝকঝকে নতুন সিয়েলোতে।

দুই

উত্তর কলকাতার প্রাচীন, বনেদি পাড়ায় বিশাল কমপাউণ্ডের মাঝখানে রিয়াদের বিরাট দোতলা বাড়ি 'মিত্র নিকেতন', যার চৌহদ্দি উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। সামনের দিকে বাগান, তার মাঝখানে একটা শ্বেত পাথরের পরী। পরীটার ডানা এমনভাবে মেলে দেওয়া, মনে হয় যে কোনো মুহূর্তে আকাশে উড়ে যাবে। রাস্তার দিকে প্রকাণ্ড লোহার গেট। গেট থেকে নুড়ির রাস্তা বৃত্তাকারে বাগানটাকে ঘিরে মূল বাড়ির সামনে গাড়ি-বারান্দার নিচে গিয়ে থেমেছে।

বাড়ির পেছন দিকে অনেকগুলো সুপুরি আর নারকেল গাছ লাইন দিয়ে আকাশের দিকে মাথা তুলে আছে। সেখানে কমপাউণ্ড ওয়ালের গায়ে সার্ভেন্টস কোয়ার্টার্স আর সারি সারি গ্যারেজ।

পঞ্চান্ন বছর অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হওয়ারও পাঁচ বছর আগে এই বাড়িটা তৈরি করিয়েছিলেন রিয়া আর ঝিনুকের ঠাকুরদা প্রিয়ভূষণ মিত্র। স্টিভেডরি ব্যবসা করে ভদ্রলোক একদা দু হাতে দেদার টাকা রোজগার করেছেন।

প্রিয়ভূষণ ছিলেন খুবই দূরদর্শী। তাঁর তিন ছেলে এবং এক মেয়ের জন্য বাড়ির নকশাটা এমনভাবে করেছিলেন যাতে ভবিষ্যতে ভাগাভাগির সময় যেন গোলমাল না বাধে কিংবা অন্য কোনো জটিলতার সৃষ্টি না হয়।

গাড়ি-বারান্দা থেকে দশটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলে থামওলা বিরাট চাতাল, তারপর সেগুন কাঠের কারুকার্যময় দরজা। ভেতরে ঢুকলে মস্ত হল। সেটার ঠিক মাঝখান দিয়ে দোতলায় যাবার সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ির একদিকে হল-ঘরটার আধখানা ঘিরে তিনটে বড় বড় বেডরুম, প্রতিটি ঘরের গায়ে অ্যাটাচড টয়লেট। তা ছাড়া কিচেন, স্টোর ইত্যাদি। আর এক দিকেও সেই একই রকম ব্যবস্থা। একতলার সঙ্গে দোতলার তফাত নেই। একই পদ্ধতিতে দু ভাগ করা হয়েছে।

রিয়ার বাবা-কাকারা হলেন যথাক্রমে পরাশর, ইন্দ্রনাথ এবং তরুণাভ। তার একমাত্র পিসির নাম আলপনা।

প্রিয়ভূষণ ষোল সতের বছর আগে মারা গেছেন। তিনি বেঁচে থাকতে থাকতেই বাড়িটা ছেলেমেয়েদের ভাগ করে দিয়েছিলেন। ওপরের তলাটা পেয়েছেন রিয়ার বাবা পরাশর আর বড় কাকা ইন্দ্রনাথ। নিচের তলাটার এক ভাগ ছোট কাকা তরুণাভর, আর এক ভাগ পিসি আলপনার।

প্রিয়ভূষণের ছেলেদের বাবার মত ক্ষুরধার ব্যবসা বুদ্ধি ছিল না। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতে বিপুল পরিশ্রমে গড়ে তোলা স্টিভেডর কোম্পানিটি বন্ধ হয়ে যায়।

রিয়ার বাবা পরাশর একজন অত্যন্ত সফল ডাক্তার। তিনি হার্ট স্পেশালিস্ট। বড়কাকা ইন্দ্রনাথ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, একটা বড় কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিসনের দায়িত্বে রয়েছেন। ছোট কাকা তরুণাভ বিরাট মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির টপ একজিকিউটিভ। পিসি আলপনার বিয়ে হয়ে গেছে। তিনি আছেন কানাডায়। পিসেমশাই ওখানকার একটা ইউনিভার্সিটিতে ইকনমিকসের অধ্যাপক। তাঁর রিটায়ারমেন্টের পর ওঁরা দেশে ফিরে আসবেন।

রিয়া তার মা-বাবার একমাত্র সন্তান। ইন্দ্রনাথেরও একটিই মেয়ে-ঝিনুক। সে লরেটোতে বি. এ পড়ছে। তরুণাভ নিঃসন্তান। আলপনার একটাই ছেলে— বাবুন। সে কানাডায় একটা স্কুলে পড়ে। বয়স

তের।

বছর পনের আগে লণ্ডনের এক বিশাল হাসপাতালে চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন পরাশর। তখন রিয়া সবে দশে পা দিয়েছে। কলকাতায় শুরু হলেও রিয়ার পড়াশোনার বেশির ভাগটাই ওখানে। লণ্ডন থেকেই সে গ্র্যাজুয়েশন করেছে।

কসমোপলিটন আবহাওয়ায়, যুবক-যুবতীদের লাগামছাড়া অবাধ মেলামেশার দেশে ভেসে যায় নি রিয়া। বরং বলা যায়, যেতে পারে নি। তার কারণ ওর মা-বাবা। পরাশর আর মন্দিরা, অর্থাৎ রিয়ার মা ওর মধ্যে বাঙালিয়ানা ব্যাপারটা পুরোপুরি প্রবেশ করিয়ে দিতে পেরেছিলেন। স্কুল কলেজে সুযোগ ছিল না, কিন্তু বাড়িতে নিয়মিত মায়ের কাছে বাংলা ভাষাটা শিখতে হত।

এপার এবং ওপার, দুই বাংলার কয়েক লাখ বাঙালি লণ্ডনে থাকে। এদের জন্য রয়েছে অসংখ্য বেঙ্গলি ক্লাব, রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখার স্কুল, বেঙ্গলি রেস্তোরাঁ। বাঙালির বার মাসে তের পার্বণ। বর্ষবরণ, রবীন্দ্রজয়ন্তী, দুর্গোৎসব, সরস্বতী পুজো—কোনোটাই এখানে বাদ যায় না। তাছাড়া উইক এণ্ডে গানের আসর, সাহিত্য পাঠের আসর, পুজোর সময় নাটক মঞ্চস্থ করা, এ সব তো আছেই। কলকাতা থেকে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক বা তপন সিংহদের নাম-করা ছবির প্রিন্ট এনে ক্লাবগুলোতে দেখানো হয়। অর্থাৎ লণ্ডনে থেকেও বাঙালিরা তাদের নিজস্ব আইডেনটিটি সযত্নে রক্ষা করে চলে।

পরাশর আর মন্দিরা রিয়াকে শুধু বাংলা ভাষাটাই শেখান নি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন। গানটা ভালই শিখেছে সে। কাজের খাতিরে ইংরেজ বা অন্য জাতের লোকজনের সঙ্গে যেটুকু মেশা। তারপর সময় পেলেই মেয়েকে নিয়ে বেঙ্গলি ক্লাবে, কিংবা অন্য বাঙালি বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি যেতেন পরাশররা। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল কলকাতা থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে যতটা সম্ভব মেয়েকে বাঙালি পরিবেশের মধ্যে রাখা। এই ভাবেই রিয়ার রুচি, পছন্দ-অপছন্দ গড়ে উঠেছে।

পনের বছর পর কলকাতায় চলে এসেছেন পরাশররা। লণ্ডনে তাঁরা আর ফিরে যাবেন না। তাঁর ইচ্ছা, জন্মভূমির শহরে এমন একটা নার্সিং হোম করা যেখানে খুব সাধারণ মানুষও সস্তায় চিকিৎসার সুযোগ পাবে।

পরাশরের কলকাতার কর্মসূচিতে প্রথম আইটেমটা হল মেয়ের বিয়ে। রিয়ার পঁচিশ চলছে। এটাই মেয়েদের বিয়ের পক্ষে উপযুক্ত সময়। কন্যাদায়টা চুকিয়ে দেবার পর তিনি নার্সিং হোমের কাজে হাত দেবেন।

কলকাতায় এসে ভাইদের তো বটেই, আত্মীয়স্বজনদেরও একটি উচ্চশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, যোগ্য পাত্রের খোঁজ করতে অনুরোধ করেছেন পরাশর। এমনকি খবরের কাগজের 'ম্যাট্রিমোনিয়াল' কলমে বিজ্ঞাপনও দিয়েছেন।

অনেক পাত্রেরই খবর এসেছিল। তাদের অভিভাবকরা এসেও কথা বলেছেন। এদের ভেতর থেকে স্নেহাশিসকে পছন্দ করেছেন পরাশররা।

স্নেহাশিস ভদ্র, মার্জিত, সুপুরুষ। চার্টার্ড একাউনটেন্সিতে দারুণ রেজাল্ট তার। যে কোনো মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে বড় একটা পোস্ট সে পেয়ে যেতে পারত কিন্তু চাকরি করার ইচ্ছা তার নেই।

স্নেহাশিসের বাবা নিরঞ্জন বসু একজন মাঝারি মাপের ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। তাঁদের ওষুধের কারখানা ছাড়াও ছোটখাট আরো কিছু ফ্যাক্টরি আছে। স্নেহাশিস সেগুলোর একাউন্টস ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বে রয়েছে। ওরা দু ভাই। সে-ই বড়, ছোট বিপ্লব কানপুরের আই আই টিতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। আসছে বছর তার ফাইনাল পরীক্ষা। ওদের বাড়ি ল্যান্সডাউন রোডের শেষ মাথায়, লেকের কাছাকাছি।

পার্ক স্ট্রিট থেকে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। গাড়ি থেকে নেমে, শাড়ি টাড়ির প্যাকেটগুলো নিয়ে চাতালে উঠে, ভেতরে ঢুকে সোজা দোতলায় উঠে এল রিয়া আর ঝিনুক।

বাড়ি ভাগাভাগি করা হলেও ওদের বাবা-কাকারা কেউ পাঁচিল তুলে নিজের নিজের সীমানা নির্দিষ্ট করেন নি। সংসার যদিও আলাদা, তবু ভাইবোনদের ভেতর খুবই সদ্ভাব। একতলা এবং দোতলার

হল-ঘর দুটোর দুধারেই সোফা, বইয়ের আলমারি, টিভি আর অন্যান্য ক্যাবিনেট দিয়ে সাজানো। দুই অংশেই রয়েছে টেলিফোন।

দোতলায় আসতেই দেখা গেল, রিয়ার মা মন্দিরা আর দুই কাকিমা বিণীতা এবং প্রীতিকণা হই হই করে নতুন নতুন প্যাকেট খুলে নানা জিনিস বার করছেন। ওঁরা কেনাকাটা করে এসেছেন। এনেছেন কয়েক সেট সোনা আর রুপোর গয়নাও। আর এনেছেন স্নেহাশিসের মা বাবা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের জন্য শাড়ি আর ধুতি।

একধারে ঢাউস চুরুট মুখে বসে আছেন পরাশর। তাঁর অন্য দুই ভাই ইন্দ্রনাথ এবং তরুণাভকেও দেখা যাচ্ছে।

মন্দিরা বলছিলেন, 'এখন ডিজাইন পছন্দ করে গয়না গড়তে দিলে বিয়ের আগে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। তাই সারা কলকাতা ঘুরে এগুলো আমরা কিনে এনেছি। চেকে পেমেন্ট করেছি। যদি পছন্দ না হয় বদলে দেবে। দেখ তো কেমন হয়েছে।'

গয়নাগুলো মন্দিরাদের হাত থেকে নিয়ে পরাশররা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, 'বাঃ চমৎকার। এখন রিয়া আর ঝিনুকের পছন্দ হলেই হয়।'

'এবার দানের শাড়ি ধুতিগুলো দেখ—'

কিন্তু তার আগেই পায়ের শব্দে সবাই রিয়াদের দিকে তাকালেন। পরাশর বললেন, 'হল তোদের শপিং?'

প্যাকেটগুলো মেঝেতে নামিয়ে রাখতে রাখতে ঝিনুক বলল, 'হল আজকের মতো—'

রিয়া কিছু বলল না। তার হাতের প্যাকেটগুলো নামিয়ে রেখে একটা সোফায় বসে পড়ল।

বিণীতা দারুণ উৎসাহের সুরে বললেন, 'দেখি দেখি, তোরা কী কিনে আনলি—'

ঝিনুক বলল, 'আগে তোমাদেরগুলো দেখাও।'

এরপর রিয়াদের এবং মন্দিরাদের সমস্ত প্যাকেট খোলা হল। শাড়ি ধুতি গয়না জুতো—সবারই পছন্দ হয়ে গেল। কোনোটাই আর বদলাবার দরকার নেই।

দেখাদেখি যখন চলেছে সেই সময় হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে। ঝিনুক গিয়ে সেটা তুলে ধরে হ্যালো বলতেই ওধার থেকে একটি মেয়ের গলা ভেসে আসে, 'আমি আমি মধুরা মিত্রর সঙ্গে কথা বলতে চাই।' মধুরা রিয়ার স্কুল-কলেজের নাম।

কণ্ঠস্বরটি কাঁপা কাঁপা এবং অস্থির। ঝিনুক জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনি?'

'খুব সাধারণ একটি মেয়ে। নাম বললে চিনতে পারবেন না।'

'মধুরা মিত্রর সঙ্গে আপনার কোনো দরকার আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'আমাকে বলতে পারেন। আমি ওর ছোট বোন।'

ওধার থেকে মেয়েটি বলল, 'আপনাকে বললে হবে না। যা বলার ওঁকেই বলব—'

দ্বিধান্বিতভাবে ঝিনুক বলল, 'কিন্তু—'

'উনি থাকলে দয়া করে লাইনটা ওঁকে দিন। নইলে আমাকে আপনাদের বাড়ি যেতে হবে।'

ঝিনুক বেশ অবাক হচ্ছিল। বলল, 'আচ্ছা আপনি ধরে থাকুন। আমি দিদিকে ডাকছি—'

হল-ঘরের সবাই উৎসুকভাবে ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁদের চোখেমুখে গভীর কৌতূহল। লাইনের ওধারের অদৃশ্য মেয়েটির কথা শুনতে না পেলেও ঝিনুক যা বলেছে সবাই শুনেছেন। ঔৎসুক্যের সঙ্গে একটু উদ্বেগও তাঁদের মধ্যে দেখা দিয়েছে।

ফোনের মাউথপিসটায় হাত চাপা দিয়ে ঝিনুক রিয়াকে ডাকল, 'দিদি এদিকে আয়—'

পরাশর জিজ্ঞেস করলেন, 'কে ফোন করছে রে?'

ঝিনুক বলল, 'নাম বলছে না।'

'ঠিক আছে, আমি দেখছি।' রিয়া উঠে গিয়ে ঝিনুকের হাত থেকে টেলিফোন নিয়ে বলল, 'আমি মধুরা। বলুন কী চান—'

টেলিফোনের অন্য প্রান্ত থেকে মেয়েটি বলল, 'যাক, শেষ পর্যন্ত আপনাকে পাওয়া গেল। সাতদিন

চেষ্টার পর আপনাদের ফোন নাম্বার আর বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করতে পেরেছি।'

রিয়া বলল, 'আমি ভীষণ টায়ার্ড। সারাদিন ঘোরাঘুরির পর এই সবে বাড়ি ফিরেছি। আপনার যদি খুব দরকারি কথা থাকে, প্লিজ তাড়াতাড়ি বলুন।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মেয়েটি বলল, 'দরকার না থাকলে অকারণে বিরক্ত করব কেন?'

রিয়া উত্তর দেয় না।

মেয়েটি বলতে লাগল, 'শুনেছি স্নেহাশিস বসুর সঙ্গে আপনার বিয়ে ঠিক হয়েছে। খবরটা সত্যি?' গলার স্বরটা শেষের দিকে চাপা শোনাল তার।

রিয়ার স্নায়ুমণ্ডলীতে হঠাৎ যেন ধাক্কা লাগে। সর্তক ভঙ্গিতে সে বলল, 'উত্তরটা আপনি পাবেন। তার আগে আপনার পরিচয়টা আমার জানা দরকার।'

'এক্ষুনি নিজের পরিচয় জানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একটা কথা বলতে পারি, এই বিয়েটা হওয়া না-হওয়ার সঙ্গে আমার বাঁচা মরা নির্ভর করছে।'

রিয়া হকচকিয়ে গেল, 'তার মানে?'

মেয়েটি বলল, 'আমার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু দেননি। সেটা পেলে মানেটা বুঝিয়ে দিতে পারব।'

মেয়েটাকে অদ্ভুত রহস্যময়ী মনে হচ্ছে। রিয়া কয়েক পলক ভেবে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, স্নেহাশিসের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে। এবার বলুন, এর সঙ্গে আপনার লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ কিভাবে জড়িত?'

টেলিফোনের ওধার থেকে অনুচ্চ আর্ত গোঙানির মতো আওয়াজ ভেসে এল। রিয়া চকিত হয়ে ওঠে। মাউথপিসে মুখ ঠেকিয়ে ব্যগ্র গলায় বলল, ' এ কি, আপনি কাঁদছেন?'

কোনো কথা নেই। একটানা অনেকক্ষণ কান্নার পর ধরা ধরা, জড়ানো গলায় মেয়েটি বলল, 'আপনাকে একটা অনুরোধ করব?'

'বলুন—'

'আপনার মা-বাবা আর অন্য অভিভাবকদের দিয়ে এই বিয়ে ভেঙে দেবার ব্যবস্থা করুন।'

অনেকক্ষণ হতবুদ্ধির মতো ফোনটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে রিয়া। তারপর বলে,' এমন আনথিংকেবল রিকোয়েস্ট একজন মেয়ে আর একটি মেয়েকে কখনও করেছে বলে শুনিনি।'

'আপনি হয়তো বলতে চাইছেন আমার মাথা খারাপ কিনা?'

'এগ্‌জ্যাক্টলি তাই।'

মেয়েটি বলল, 'আমি সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে কথা বলছি।'

রিয়া বলল, 'ধরুন আপনার কথামতো বিয়েটা ভেঙে দেওয়া হল। এতে আপনার কী লাভ?'

'আমার কতটা লাভ জানি না। সামান্য একটা প্রতিশোধ অন্তত নিতে পারব আর আপনি বেঁচে যাবেন।'

'বেঁচে যাব!'

'হ্যাঁ। স্নেহাশিস একটা দুশ্চরিত্র, লম্পট, আমার চরম সর্বনাশ করেছে সে।'

বিহুলের মতো রিয়া যেন প্রতিধ্বনি করল, 'চরম সর্বনাশ করেছে!' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'কী বলতে চাইছেন আপনি?'

মেয়েটি বলল, 'মেয়েদের সর্বনাশ বলতে কী বোঝায় তা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে।'

রিয়া খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'আপনাকে চিনি না, নিজের পরিচয় দেন নি। আপনি যে সত্যি বলছেন তা বিশ্বাস করব কী করে?'

'বিশ্বাস করা না-করা আপনার ইচ্ছে।'

'এমনও তো হতে পারে, স্নেহাশিস সম্পর্কে আপনার কোনো আক্রোশ আছে। তাই—'

'তাই এসব বানিয়ে বানিয়ে বলছি— এই তো? একবারও কি ভেবে দেখেছেন, কোনো মেয়ে কতটা মরিয়া হলে নিজের চূড়ান্ত ক্ষতির কথা মুখ ফুটে বলতে পারে।'

রিয়া উত্তর দিল না। তার মাথার ভেতর সব কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটি বলল, 'আপনাকে সাবধান করা উচিত বলে মনে হয়েছিল, তাই ফোন করলাম। আর আপনার সময় নষ্ট করব না। শুধু শেষ কথাটা শুনে রাখুন, আপনারা যদি এ বিয়ে ভেঙে না দেন, আমি কিন্তু এটা হতে দেব না।' বলেই লাইন কেটে দিল।

রিয়া উৎকণ্ঠিতের মতো বলতে লাগল, 'হ্যালো—হ্যালো, শুনুন—' ওধারের সাড়া না পেয়ে শিথিল হাতে ফোন নামিয়ে রেখে প্রায় টলতে টলতে ফের সোফায় এসে বসল। তাকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল।

রিয়াকে এতক্ষণ সবাই লক্ষ করছিলেন। তাকে দেখতে দেখতে পরাশরদের মধ্যে প্রচণ্ড এক উৎকণ্ঠা চারিয়ে যাচ্ছিল।

পরাশর জিজ্ঞেস করলেন, 'কে ফোন করেছে রে?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল রিয়া, 'চিনি না। কিছুতেই নাম বলল না।'

শুধু পরাশরই নন, ঘরের বাকি সবাই জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বলল মেয়েটা?'

অজানা মেয়েটা যা বলেছে, সব জানিয়ে দিল রিয়া।

পরাশর প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন,'এ তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!'

ইন্দ্রনাথ বললেন, 'এক্ষুনি খোঁজ খবর নেওয়া দরকার।'

তরুণাভ বললেন, 'যদি ওই মেয়েটার কথা সত্যি হয় এই বিয়ে আমরা ভেঙে দেব।'

মন্দিরা বললেন, 'স্নেহাশিস ছ'সাত বার এ বাড়িতে এসেছে। ওকে দেখে খারাপ তো কিছু মনে হয়নি। লম্পট, বদমাশদের চোখেমুখে অন্যরকম একটা ছাপ থাকে। দেখলেই বোঝা যায়, এদের মধ্যে কুমতলব রয়েছে। স্নেহাশিসের ব্যবহার, কথার্বাতা চমৎকার। ওর—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বললেন, 'বৌদি, পৃথিবীতে এমন অনেক ক্রিমিনাল আছে যাদের দেখলে মনে হবে দেবশিশু। তারা মুখোশ পরে থাকে। আর সেই মুখোশটা দেখে মানুষ ভুল করে বসে।'

পরাশর গভীরভাবে কিছু ভাবছিলেন। বললেন, 'একটা ব্যাপার তোমরা লক্ষ করেছ?'

'কী?'

'যদি মেয়েটার কথা সত্যিই হবে, সে নিজের পরিচয় দিচ্ছে না কেন?'

ইন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন, 'নো ডাউট, এটা একটা ভেরি ইমপর্টান্ট পয়েন্ট। পরিচয় গোপন রাখার মধ্যে কোনো অভিসন্ধি থাকতে পারে।'

পরাশর বললেন, 'রিয়ার কাছে সে স্বীকার করেছে স্নেহাশিসের ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়। এই অবস্থায়—'

রিয়ার ছোট কাকিমা বিণীতা বললেন, 'মেয়েটা ভীষণ অস্বস্তিতে ফেলে দিল।'

পরাশর বললেন, 'বিয়ের তো এখনও তিন উইকের মতো বাকি। ক'দিন অপেক্ষা করে দেখা যাক, মেয়েটা আবার ফোন করে কিনা। যদি করে আর ওর পরিচয়টা জানা যায়, তখন বিয়ের ব্যাপারে অন্যরকম ডিশিসন নিতে হবে। তেমন বুঝলে বিয়ে ভেঙে দেব। অবশ্য—'

'কী?'

'ইন্দ্র যে খোঁজ খবর নেবার কথা বলছিল, সেটাও গোপনে চালিয়ে যেতে হবে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর পরাশর ঝিনুক আর রিয়াকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোরা দু'জনে তো স্নেহাশিসের সঙ্গে বেশ কয়েকবার লাঞ্চ আর ডিনার খেয়েছিস। ওকে ভাল করে দেখার সুযোগ পেয়েছিস। কিরকম মনে হয়েছে তোদের? মানে মেয়েদের লোক চেনার আলাদা একটা ইনস্টিংক্ট থাকে। সেই জন্যেই জিজ্ঞেস করছি।'

রিয়া উত্তর দিল না। তবে ঝিনুক বলল, 'স্নেহাশিসদাকে ভীষণ ভাল লেগেছে আমাদের। ডিসেন্ট অ্যাণ্ড ওয়েল-বিহেভড। এমন একটা জামাইবাবু পেলে আমি অন্তত খুশি হব।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন পরাশর। তারপর বললেন,'সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।'

ইন্দ্রনাথ বললেন, 'কত কাল পর বাড়িতে শুভকাজ হচ্ছে বেশ একটা আনন্দের মধ্যে ছিলাম। কেমন যেন গোলমাল পাকিয়ে গেল।'

তিন

একটা সপ্তাহ কেটে গেল।

এর মধ্যে পরাশররা স্নেহাশিস সম্পর্কে যতটা সম্ভব খোঁজখবর নিয়েছেন। কিন্তু সন্দেহজনক বা আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায় নি। ফলে পরাশরদের দুশ্চিন্তা এবং টেনসন অনেকটাই কেটে গেছে।

যে উদ্যমে বিয়ের তোড়জোড় চলছিল, অচেনা মেয়েটার ফোন আসার পর তা অনেকটাই থমকে গিয়েছিল। প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠার পর আবার নতুন উৎসাহে তা শুরু হয়ে যায়।

এই এক সপ্তাহে তিন চার বার স্নেহাশিসের সঙ্গে রিয়া আর ঝিনুকের দেখা হয়েছে। রিয়া সেই মেয়েটি সম্পর্কে স্নেহাশিসকে কিছু প্রশ্ন করতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। অপরিসীম সঙ্কোচ তাকে বাধা দিয়েছে। রেস্তোরাঁয় মুখোমুখি বসে তারা কথা বলেছে, হাসাহাসি করেছে, কফি খেয়েছে কিন্তু রিয়ার মধ্যে সর্বক্ষণ একটা অস্বাচ্ছন্দ্য ছিলই। মেয়েটা খানিকটা ফিক্সেশনের মতো তার মাথায় যেন আটকে গিয়েছিল। পরাশররা যখন জানালেন স্নেহাশিস সম্পর্কে দুর্ভাবনার কারণ নেই তখন অস্বস্তি কেটেছে।

আজ মাঝরাতে 'মিত্র নিকেতন' যখন গভীর ঘুমের আরকে ডুবে আছে, চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ, রাস্তায় মানুষজন বা গাড়ি-টাড়ি কিছুই নেই, মেঘশূন্য আকাশ জুড়ে লক্ষকোটি তারার মেলা, ঠিক সেই সময় দোতলার হল-ঘরে ফোন বেজে উঠল। বাড়িটা নিঝুম বলে ফোনের আওয়াজটা তীব্র শোনাল।

রিয়ারা লণ্ডন থেকে আসার পর সে আর ঝিনুক দোতলার একটা ঘরে শুচ্ছে। পাশের ঘরটা পরাশর আর মন্দিরার।

টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল রিয়া আর ঝিনুকের। ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলে বাইরে এল তারা। ঝিনুক হল-ঘরের আলো জ্বেলে দিল আর রিয়া ফোনটা তুলে নিয়ে হ্যালো বলতেই ওধার থেকে একটা ব্যাকুল পুরুষকণ্ঠ ভেসে এল, 'কে, কে বলছেন?'

রিয়া জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কাকে চান?'

'ডক্টর পরাশর মিত্রর সঙ্গে কথা বলব।'

'উনি ঘুমোচ্ছেন। আমি ওঁর মেয়ে। কিছু দরকার থাকলে আমাকে বলতে পারেন। কাল সকালে বাবাকে জানিয়ে দেব।'

'ও, তুমি মধুরা।'

'হ্যাঁ। আপনি?'

'আমি নিরঞ্জন বসু, স্নেহাশিসের বাবা। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে মধুরা।'

নিরঞ্জনকে সামনাসামনি মাত্র বার দুই দেখেছে রিয়া। স্বাভাবিকভাবে কথা বললে হয়তো আগেই চিনে ফেলত। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরে ব্যগ্রতা, অথবা আতঙ্ক এমনভাবে মিশে আছে যে কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয়েছে। তা ছাড়া এত রাতে তিনি ফোন করবেন, ভাবা যায় নি।

নিরঞ্জনের 'সর্বনাশ' শব্দটা শুনে চমকে উঠেছিল রিয়া। উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

নিরঞ্জন বললেন, 'তোমার বাবাকেই বলব। ওঁকে ঘুম থেকে তুলে ফোনটা দাও।'

হল-ঘরের আলো জানালা দিয়ে পরাশরদের ঘরে গিয়ে পড়েছিল। তা ছাড়া রিয়ার গলাও আবছাভাবে কানে আসছিল। ফলে ওঁদের ঘুম ভেঙে যায়।

পরাশর আর মন্দিরা কখন ওঁদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন, রিয়া টের পায়নি। পায়ের শব্দে মুখ ফেরাতেই মা-বাবাকে দেখতে পেল।

পরাশর জিজ্ঞেস করলেন, 'এত রাতে কার সঙ্গে কথা বলছিস?'

'স্নেহাশিসের বাবার সঙ্গে। তোমাকে চাইছেন। এই নাও—'

রিয়ার হাত থেকে টেলিফোনটা নিয়ে এক পলক তাকে দেখে নিলেন পরাশর। রিয়াকে ভীষণ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। মনে হল, ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেছে। মেয়েকে কোনো প্রশ্ন না করে ফোনটা কানে ঠেকালেন, 'মিস্টার বসু, আমি পরাশর—'

ওধার থেকে নিরঞ্জনের গলা ভেসে এল, 'আমাদের চরম বিপদ ঘটে গেছে। সেই জন্যেই আপনাদের এত রাতে ঘুম ভাঙাতে হল।'

পরাশর উত্তর দিলেন না। এরপর নিরঞ্জন কী বলেন, সেজন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

নিরঞ্জন এবার বললেন,'ঘন্টাখানেক আগে একটা মেয়ে আমাদের বাড়িতে ঢুকে স্নেহাশিসকে গুলি করেছে। একটা গুলি ওর পিঠে লেগেছে, আর একটা পেটে। প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে।'

শ্বাসরুদ্ধের মতো পরাশর বললেন, 'কী বলছেন আপনি! স্নেহাশিস এখন কোথায়?'

'সাবার্বন নার্সিং হোমে। আমি সেখান থেকেই কথা বলছি। ডাক্তাররা রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। কাল বোধ হয় অপারেশন হবে।'

'মেয়েটা কে?'

'জানি না। গুলি করেই সে পালিয়ে যায়। আমরা তখন ঘুমোচ্ছিলাম।'

'পুলিশকে খবর দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। থানায় ফোন করে ঘটনাটা জানিয়ে আমরা স্নেহাশিসকে নিয়ে নার্সিং হোমে চলে এসেছি।'

পরাশর বললেন, 'আপনাদের বাড়ি তো খুবই প্রোটেক্টেড। চারদিকে উঁচু কমপাউণ্ড ওয়ালের ওপর তারকাঁটা। গেট বন্ধ করলে একটা ফোর্ট। কোনো মেয়ের পক্ষে ওর ভেতর ঢোকা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।'

নিরঞ্জন বললেন, 'মনে হয়, দিনের বেলা কোনো সময় ঢুকে লুকিয়ে ছিল।'

পরাশর বললেন, 'আমরা এখনই নার্সিং হোমে আসছি।'

'এখন আর কষ্ট করে আসতে হবে না। স্নেহাশিসকে এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে রাখা হয়েছে। কাউকে ওখান যেতে দিচ্ছে না।'

'আমি একজন ডাক্তার। আমাকে দেবে।'

নিরঞ্জন বললেন, 'আপনাদের কষ্টের কথা ভেবে বারণ করেছিলাম।' একটু থেমে কৃতজ্ঞ সুরে বললেন, 'আপনারা এলে সত্যিই ভরসা পাব।'

ফোন নামিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়াতেই পরাশরের চোখে পড়ল ইন্দ্রনাথ, তরুণাভ প্রীতিকণা আর বিণীতা সোফায় বসে আছেন। তা ছাড়া মন্দিরা, রিয়া আর ঝিনুক তো ছিলই। তিনি যখন ফোনে নিরঞ্জনের সঙ্গে কথা বলছেন, ঝিনুক আর রিয়া ওঁদের ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে এনেছে।

পরাশর লক্ষ করলেন, সবার মুখে চোখে প্রবল টেনসন, সেই সঙ্গে চাপা অস্থিরতা। মন্দিরারা পরাশরের কথাই শুধু শুনেছেন কিন্তু নিরঞ্জন কী বলেছেন জানতে পারেননি। তবু পরাশরের প্রশ্নোত্তর থেকে আঁচ করে নিয়েছেন স্নেহাশিস এখন নার্সিং হোমে। তাকে ঘিরে মারাত্মক কিছু ঘটে গেছে।

নিরঞ্জন বসু যা বিবরণ দিয়েছেন, সব বিশদভাবে জানিয়ে দিয়ে পরাশর বললেন, 'আমি এখন নার্সিং হোমে যাব।'

সকলেই তাঁর সঙ্গে যেতে চাইল। পরাশর শুধু মন্দিরা আর তরুণাভকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

রিয়া অন্যমনস্কর মতো ভাবছিল, অচেনা সেই মেয়েটা তা হলে মিথ্যে হুমকি দেয়নি। কিন্তু সে কে?

পরাশররা চলে যাবার পর এ বাড়ির কেউ আর ঘুমোয়নি। দোতলার হল-ঘরে বসে স্নেহাশিসের আততায়ী কে হতে পারে, এই নিয়ে সারাক্ষণ আলোচনা করেছে।

রিয়া অন্যদের কথায় মাঝে মাঝে হুঁ হাঁ করছিল ঠিকই, কিন্তু তার ভেতরে একটা নিদারুণ তোলপাড় চলছে। একটা মেয়ে কতটা প্রতিহিংসাপরায়ণ হলে সুরক্ষিত বাড়ির ভেতর ঢুকে গুলি করতে পারে, এই চিন্তাটাই তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

রাত শেষ হয়ে ভোরের আলো যখন ফুটতে শুরু করেছে সেই সময় ফিরে এলেন পরাশররা।

পরাশর বললেন, 'খুব ক্রিটিক্যাল কণ্ডিশন। আটচল্লিশ ঘন্টা না কাটলে স্নেহাশিস বেঁচে উঠবে কিনা বলা যাচ্ছে না।' একটু থেমে বললেন, 'মিস্টার বসুর ফোন পেয়ে এমন শকড্ হয়েছিলাম যে নার্সিং হোমে যাব বলে কথা দিয়ে ফেললাম। ফেরার সময় ভাবছিলাম, কোনো প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর লাগিয়ে স্নেহাশিস সম্পর্কে আরো ভাল করে খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল।'

ইন্দ্রনাথ বললেন, 'একটা মেয়ে যখন তাকে মার্ডার করার অ্যাটেম্পট নিয়েছে তখন তার পেছনে সিরিয়াস কারণ আছে। আমার মতে এই বিয়ে ভেঙে দেওয়া দরকার।'

তরুণাভ সায় দিয়ে বললেন, 'আমারও তা-ই মত। একের পর এক যে গোলমাল শুরু হয়েছে

তাতে আর না এগুনোই ভাল।'

পরাশর বললেন, 'বিয়ে ভাঙার ডিশিসানটা পরে নেওয়া যাবে, আপাতত ক্যাটারার আর ডেকরেটরদের যে অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, আজই তা ক্যানসেল করে দে।'

চার

কাল মাঝরাতের পর থেকে এ বাড়ির অন্য সবার মতো রিয়াও ঘুমোতে পারে নি। তার চোখ জ্বালা জ্বালা করছে। কপালের দু পাশের শিরাগুলো সমানে লাফাচ্ছে। মাথাটা প্রচণ্ড ভারি লাগছে। পরাশর নার্সিং হোম থেকে ফেরার পর কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে সবাই যে যার ঘরে চলে গিয়েছিল। রিয়া তার বেডরুমে গিয়ে সোজা অ্যাটাচড টয়লেটে চলে যায়। শাওয়ার চালিয়ে অনেকটা সময় নিয়ে স্নান করে। তারপর বেরিয়ে এসে একটা লম্বা স্কার্ট, আর ঢোলা শার্ট পরে বিছানায় শুয়ে পড়ে। এখন শরীরটা অনেকখানি সুস্থ আর ঝরঝরে লাগছে। ঝিনুক আর সঙ্গে আসে নি, দোতলার অন্য অংশে তার নিজের বেডরুমে চলে গেছে।

শুয়ে শুয়ে স্নেহাশিসের কথাই ভাবছিল রিয়া। স্মার্ট, ঝকঝকে, সুপুরুষ এই যুবকটিকে তার সত্যিই ভাল লেগেছিল। এর সঙ্গে স্বপ্নের একটা জীবন শুরু করার জন্য নিজেকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে তুলেছে সে। এমনকি সেই মেয়েটি যখন ফোনে স্নেহাশিস সম্পর্কে অস্বস্তিকর কথাগুলো বলেছে, তার মনে সংশয় যে দেখা দেয় নি তা নয়। কিন্তু সেগুলোকে ততটা গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি রিয়া। পরে যখন খোঁজটোজ নিয়ে পরাশররা ঢালাও সার্টিফিকেট দিয়ে বসলেন, নির্দ্বিধায় তা বিশ্বাস করে নিয়েছে। আসলে স্নেহাশিস তাকে এতই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে তার সম্পর্কে কেউ ভাল কিছু বললে চোখ বুজে বিশ্বাস করার জন্য সে উন্মুখ হয়ে ছিল।

রিয়া যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, আবেগের স্রোতে ভেসে যাবার মতো মেয়ে সে নয়। অথচ সেই অচেনা মেয়েটার কথায় সে গুরুত্ব দিল না। দেওয়াটা একান্তভাবে উচিত ছিল। হঠাৎ তার মনে হল, মেয়েটাকে এই মুহূর্তে পাওয়া গেলে ভাল হত। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে তাকে? নিরঞ্জন জানিয়েছেন, গুলি করে রাতের অন্ধকারে সে উধাও হয়ে যায়। অচেনা আততায়ী যুবতীটি সম্পর্কে তার কৌতূহল তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। ভাবতে ভাবতে কখন দু চোখ জুড়ে এসেছিল, খেয়াল নেই। ঝিনুকের ডাকে ঘুমের আবেশটা ভেঙে গেল। বিছানায় উঠে বসতে বসতে দেখতে পেল, ঝিনুক খাটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তারও স্নান হয়ে গেছে। পরনে ম্যাক্সি, চুলগুলো হেয়ার ব্যাণ্ড দিয়ে আটকানো। খুব তাজা আর সুন্দর দেখাচ্ছিল ঝিনুককে।

ঝিনুক উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, 'দিদিভাই, স্নেহাশিসদাদের খবরটা আজ পেপারগুলোতে বেরিয়েছে। এই দ্যাখ— 'এ বাড়িতে বাংলা আর ইংরেজি মিলিয়ে পাঁচখানা কাগজ আসে। একটা ইংরেজি কাগজ নিয়ে এসেছিল ঝিনুক। সেটা রিয়ার দিকে বাড়িয়ে বলে, 'পড়। সেই মেয়েটা ধরা পড়েছে।'

কাগজের প্রথম পাতায় মধ্যরাতে স্নেহাশিসের ওপর গুলি চালানোর চাঞ্চল্যকর ঘটনাটা বিশদভাবে ছাপা হয়েছে। সেই সঙ্গে জানানো হয়েছে, হাতে রিভলবার নিয়ে আক্রমণকারী রূপা ভৌমিক নির্জন রাস্তার ওপর দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে উত্তর কলকাতার দিকে যাচ্ছিল। কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে মেডিক্যাল কলেজের সামনে পুলিশ তাকে ধরে ফেলে। আপাতত সে পুলিশ লক-আপে রয়েছে। ল্যান্সডাউন রোডে স্নেহাশিসকে গুলি করার পর কেন রূপা উত্তর কলকাতার দিকে যাচ্ছিল, সেটা খুবই রহস্যময়। এ সম্পর্কে তার মুখ থেকে একটি শব্দও বার করা যায় নি। তা ছাড়া কেন সে স্নেহাশিসকে খুন করতে গিয়েছিল, অনেক চেষ্টা করেও তা অজানা থেকে গেছে।

প্রতিবেদনের সঙ্গে রূপার একটি ছবিও ছাপা হয়েছে। লক-আপের ভেতর বসে আছে সে। এমনিতে খুবই সুশ্রী, তবে চোখের দৃষ্টি কেমন যেন উন্মাদের মতো। চুল এলোমেলো, পরনে সালোয়ার কামিজ।

প্রতিবেদনটা একটানা পড়ার পর জোরে শ্বাস টানল রিয়া। কী বলতে যাচ্ছিল সে, সেই সময় তরুণাভ একতলা থেকে একসঙ্গে দুটো করে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ওপরে উঠে তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখেমুখে প্রবল উত্তেজনা। বললেন, 'রিয়া, থানা থেকে একজন পুলিশ অফিসার এসেছেন। তোর সঙ্গে কথা বলতে চান। আমি ওঁকে নিচে বসিয়ে এসেছি।'

রিয়া অবাক। জিজ্ঞেস করল, 'আমার সঙ্গে কথা বলতে চান কেন?'

'তা বলেন নি। আয়—'

শুধু রিয়াকেই নয়, দোতলা থেকে পরাশর, মন্দিরা, আর ঝিনুককেও ডেকে নিয়ে গেলেন তরুণাভ। যেতে যেতে পরাশরকে পুলিশ অফিসারের উদ্দেশ্য জানিয়ে দিলেন।

একতলার হল-ঘরে আসতেই দেখা গেল, পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছরের মেদহীন ধারাল চেহারার একটি অফিসার বসে আছেন। তাঁকে এখনও যুবকই বলা যায়। পরনে পুলিশের ইউনিফর্ম। তাঁকে ঘিরে বসে রয়েছেন প্রতিকণা ইন্দ্রনাথ আর বিণীতা। দূর থেকে দরজা জানালা দিয়ে কাজের লোকেরা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। পুলিশ আসায় সারা বাড়িতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

তরুণাভ ঝিনুক, রিয়া, মন্দিরা আর পরাশরের সঙ্গে পুলিশ অফিসারের পরিচয় করিয়ে দিলেন। জানা গেল, অফিসারটির নাম জয়দীপ লাহা। জয়দীপ রিয়াকে বললেন, 'আপনার কাছে একটা সাহায্যের জন্য এসেছি।'

বিমূঢ়ের মতো রিয়া বলল, 'সাহায্য! আমার কাছে!'

পরাশর চিন্তিতভাবে বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো মিস্টার লাহা? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

হাসিমুখে জয়দীপ বললেন, 'ভয় নেই ডক্টর মিত্র। হঠাৎ এসে আপনাদের অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছি, কিন্তু উপায় ছিল না। আপনারা নিশ্চয়ই আজকের কাগজে দেখেছেন, স্নেহাশিস বসু নামে একটি যুবককে মার্ডার করার জন্যে কাল রাতে গুলি চালানো হয়েছে।'

হল-ঘরের প্রতিটি মানুষ শ্বাসরুদ্ধের মতো বসে রইল। বেশ কিছুক্ষণ পর পরাশর সতর্কভাবে বললেন, 'হাঁ, দেখেছি। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'তার সঙ্গে রিয়ার সম্পর্ক কী?'

প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে জয়দীপ জিজ্ঞেস করলেন, 'শুনেছি, আপনার মেয়ের সঙ্গে স্নেহাশিসের বিয়ে ঠিক হয়েছে।'

ঢোক গিলে পরাশর বললেন, 'হ্যাঁ, তবে—'

হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে জয়দীপ বললেন, 'আপনারা জানেন রূপা ভৌমিক নামে একটি মেয়ে কাল স্নেহাশিসকে খুন করতে গিয়েছিল। কাল সে ধরাও পড়েছে।'

'হ্যাঁ, কাগজে দেখেছি।'

'এই অ্যাটেম্পট অফ মার্ডার কেসটার ইনভেস্টিগেশনের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। সে জন্যেই আপনাদের, বিশেষ করে মধুরা দেবীর কাছে আমার আসা। ওঁর সহযোগিতা পেলে খুব সম্ভব এই ঘটনার পেছনে যে মোটিভ রয়েছে তা জানতে পারব।'

রিয়া প্রথম দিকে একটু ঘাবড়ে গেলেও এখন মনস্থির করে ফেলেছে। আসলে কোন প্রতিহিংসার কারণে রূপা স্নেহাশিসকে খুন করতে গিয়েছিল সেটা সেও জানতে চায়। বলল, 'বলুন মিস্টার লাহা, আপনাকে কিভাবে সহযোগিতা করব?'

পরাশর, মন্দিরা, ইন্দ্রনাথ এবং অন্য সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। ইন্দ্রনাথ বললেন, 'রিয়া এই সবে ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছে। এখানকার কিছুই তেমন চেনে না। ও কিভাবে আপনাকে সাহায্য করবে? কী চান আমাদের কাছে বলুন। সাধ্যমতো হেল্প করব।'

জয়দীপ বললেন, 'আপনাদের আগেও বলেছি, এখনও বলছি, কোনো চিন্তা নেই। যে সাহায্যটা আমার দরকার মধুরাদেবী ছাড়া আর কারো পক্ষে তা করা সম্ভব নয়।'

ইন্দ্রনাথ কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন। জয়দীপ এবার রিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'প্রথমে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই—'

রিয়া বলল, 'ঠিক আছে।'

'আমি খবর পেয়েছি মাত্র কিছুদিন আগে স্নেহাশিসের সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা পাকা হয়েছে।'

'হ্যাঁ।'

'ওর সঙ্গে মেলামেশার কোনো সুযোগ হয়েছিল?'

'খুব বেশি নয়।' বিয়ের জিনিসপত্র কেনাকাটার পর সে আর ঝিনুক যে স্নেহাশিসের সঙ্গে দু-একঘন্টা রেস্তোরাঁয় বসে গল্প টল্প করত তা জানিয়ে ছিল রিয়া। আরো জানাল এ বাড়িতেও কয়েকবার সে এসেছে।

জয়দীপ বললেন, 'ছেলেটাকে আপনার কিরকম মনে হয়েছে?'

'এত অল্প সময়ের ভেতর কতটুকু আর জানা যায়। যেটুকু দেখেছি, অভিযোগ বা সন্দেহ করার মতো কিছুই পাইনি। কথাবার্তা, ব্যবহার, সবই খুব ডিসেন্ট।'

'আচ্ছা, যে মেয়েটি, মানে রূপা ভৌমিক, স্নেহাশিসকে গুলি করেছে তাকে কখনও দেখেছেন?'

'না। আজ কাগজে তার ছবি দেখেছি। অবশ্য—'

'কী?'

'কয়েক দিন আগে একটা মেয়ে আমাকে ফোন করে স্নেহাশিসের সঙ্গে বিয়েটা ভেঙে দিতে বলেছিল। তবে সে রূপা ভৌমিক কিনা, জানি না।'

'বিয়ে ভাঙার কথা ছাড়া আর কিছু বলেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কী?'

'বিয়ে বন্ধ না করলে তার ফল খুব খারাপ হবে বলে শাসিয়েছিল। আর বলেছিল, আমরা বিয়েটা ভেঙে না দিলে যেভাবে হোক সে এটা বন্ধ করবে।'

'আর কিছু?'

'হ্যাঁ। স্নেহাশিস ইজ আ লেচার। তার চরিত্র খুব খারাপ। আর—'

'আর কী?'

'স্নেহাশিস তার চরম সর্বনাশ করেছে।'

তারপর জয়দীপ বললেন, 'কাল মাঝরাতে রূপাকে ধরা হয়েছে। এখন পর্যন্ত তার মুখ থেকে কিছু বার করা যায়নি। আপনি যে ইনফরমেশনগুলো দিলেন আমার ইনভেস্টিগেশনে সেগুলো খুব কাজে লাগবে। এবার আপনার যে সাহায্যটা সব চেয়ে বেশি করে দরকার, সেটা বলছি।'

রিয়া উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইল।

জয়দীপ বললেন, 'রূপা সারাক্ষণ মুখ বুজে থাকলেও একটা মাত্র কথাই বলেছে। সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

ঘরের সবাই চমকে ওঠেন। পরাশর জিজ্ঞেস করেন,'ওর সঙ্গে মেয়েটার কী দরকার?'

জয়দীপ বললেন, 'মধুরাদেবীকে সে কিছু বলতে চায়।' একটু থেমে বললেন, 'রূপাকে এখানে আনা সম্ভব নয়। দয়া করে আপনি কি থানায় আসবেন?'

পরাশররা তীব্র আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই রিয়া বলল, 'যাব।'

'আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। আপনাকে নিয়ে যেতে পারি। আপনার বাবা কি কাকারা ইচ্ছা করলে সঙ্গে যেতে পারেন।'

তরুণাভ বললেন, 'আপনি যান। আমি ঘন্টাখানেকের ভেতর রিয়াকে নিয়ে থানায় যাচ্ছি।' বাড়ির অন্য সবার আপত্তি থাকলেও তাঁর মনে হয়েছে, রিয়ার থানায় যাওয়া উচিত।

'ধন্যবাদ।' আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন জয়দীপ।

পাঁচ

জয়দীপ লাহা যখন 'মিত্র নিকেতন'-এ রিয়াদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, সেই সময় চেতলার একটা ছোট ফ্ল্যাটের একখানা ঘর সিঙ্গল-বেড খাটে শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়ছিল বিনায়ক। তার বয়স সাতাশ আটাশ। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম। চওড়া কপাল, ছোট করে ছাঁটা চুল। নাকমুখ কাটা কাটা। বুদ্ধিদীপ্ত, বড় বড় চোখ। তার পরনে আধময়লা পাজামা আর গেঞ্জি। এবার ঘরটার দিকে তাকানো যেতে পারে। খাট ছাড়াও রয়েছে লেখাপড়ার জন্য টেবল চেয়ার। টেবলের ওপর প্রচুর ফাইলপত্র এবং

লাল রঙের একটা টেলিফোন। একদিকের দেওয়াল ঘেঁষে চারটে আলমারি আইনের বইতে ঠাসা। বিনায়ক একজন ল'ইয়ার। হাইকোর্টের নাম-করা অ্যাডভোকেট মঞ্জুলিকা সেনগুপ্তর সে জুনিয়র। স্বাধীনভাবে এখনও সে কোথাও কেস করে নি। তবে তার ওপর মঞ্জুলিকার গভীর আস্থা। তাঁর ধারণা, আইনের প্রফেশনে একদিন বিনায়কের খুব খ্যাতি হবে। অন্য দিন, এই সময় তার মুখ ধোয়া এবং ব্রেকফাস্ট হয়ে যায়। কিন্তু আজ রবিবার। কোর্টে বেরুবার তাড়া নেই। সকাল ন'টা পর্যন্ত ছুটির দিনগুলোতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আলস্য উপভোগ করে বিনায়ক।

কাগজের ওপর দিকে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ, কাশ্মীরে জঙ্গীদের বিচ্ছিন্নতাবাদ, নির্বিচারে গুলি চালিয়ে বাইশ জন নাগরিককে হত্যা, রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে ইরাকের অসহযোগিতা ইত্যাদি জাতীয় এবং আন্তজার্তিক ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ পড়তে পড়তে হঠাৎ নিচের দিকে স্নেহাশিসের ওপর তরুণী আততায়ীর আক্রমণের প্রতিবেদনটা বিনায়কের চোখে পড়ল।

খুনখারাপির ঘটনা এমনিতে খুবই চাঞ্চল্যকর। এর সঙ্গে যদি কোনো যুবক এবং যুবতী যুক্ত থাকে, কথাই নেই। গভীর কৌতূহলে প্রতিবেদনটা পড়তে পড়তে বিনায়ক হঠাৎ দেখতে পেল, স্নেহাশিসের পরিচয় বিশদভাবে দেওয়া হয়েছে। সে শিল্পপতি নিরঞ্জন বসুর একমাত্র ছেলে, ল্যান্সডাউন রোডে তাদের বিশাল বাড়ি। কোন কোন কোম্পানির ওরা মালিক তাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রূপা ভৌমিক নামে যে তরুণীটি স্নেহাশিসকে খুন করতে গিয়েছিল, তার নাম ছাড়া আর কিছুই জানা যায়নি। রূপাকে অ্যারেস্ট করে থানার লক-আপে রাখা হয়েছে। প্রতিবেদনের সঙ্গে তার একটা ছবিও দেখা যাচ্ছে। কী উদ্দেশ্যে রূপা খুন করতে গিয়েছিল, প্রতিবেদক তা অবশ্য জানাতে পারেন নি।

রূপার চেয়েও স্নেহাশিস যে নিরঞ্জন বসুর ছেলে, এই খবরটা বিনায়কের কাছে অনেক বেশি উত্তেজক। বহুকালের পুরনো একটা আক্রোশ বুকের ভেতর থেকে লাফ দিয়ে উঠে এল যেন। নিরঞ্জন বসুর পরিবারকে ধ্বংস করার একটা অদম্য সঙ্কল্প সে তার অল্প বয়স থেকে নিজের মধ্যে জিইয়ে রেখেছে। তার টার্গেট অবশ্য স্নেহাশিস নয়— নিরঞ্জন বসু। রূপা যে নিরঞ্জনের পরিবারের একজনকে শেষ করতে চেয়েছে সেটা এক হিসেবে তাঁকেই আঘাত হানা। বিনায়কের হঠাৎ মনে হল, তার এবং আততায়ী মেয়েটির উদ্দেশ্য এক। একই কঠিন প্রতিজ্ঞা অচেনা তরুণীটিকে তার অনেক কাছে টেনে এনেছে যেন।

একটি মেয়ের মধ্যে প্রতিহিংসা কতটা তীব্র হলে সে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়, সেটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না বিনায়কের। কিন্তু তার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায়নি। সে কার মেয়ে, কোথায় থাকে, কে কে আছে তার, এই তথ্যগুলো বোধহয় প্রতিবেদক বা পুলিশ কেউ জোগাড় করতে পারেনি।

নিরঞ্জন বসু রূপাকে নিশ্চয়ই ছাড়বেন না। তাঁর অর্থবল বিশাল, প্রভাব সর্বস্তরে, প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী তিনি। একমাত্র ছেলের রক্তপাত ঘটানোর জন্য রূপাকে তিনি শেষ করে দিতে চাইবেন। বিনায়ক স্থির করে ফেলল, নিরঞ্জনের হাত থেকে মেয়েটাকে বাঁচাতেই হবে।

রূপা যখন গুলি করে স্নেহাশিসকে খুন করতে চেয়েছে, এর পেছনে গুরুতর কারণ আছে। স্নেহাশিস তার মারাত্মক ক্ষতি করে থাকবে। ক্ষতিটা কী ধরনের সেটা জানতে পারলে রূপাকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে নিরঞ্জন বসুকে চরম আঘাতও হানা যাবে। যে সুযোগটার জন্য তের বছর বয়স থেকে বিনায়ক অপেক্ষা করছিল, অযাচিতভাবে তা তার হাতের কাছে চলে এসেছে।

হঠাৎ বিনায়কের খেয়াল হল, খবরটা বাবাকে দেওয়া দরকার। আসলে নিরঞ্জন বসু সম্পর্কে যাবতীয় ঘৃণা আর আক্রোশ তার বাবা হরিচরণের উত্তরাধিকার সূত্রে সে পেয়েছে।

বিছানা থেকে নেমে পড়ল সে। দু কামরার এই ফ্ল্যাটে তার পাশের ঘরটা হরিচরণের। বাবা ছাড়া বিনায়কের আর কেউ নেই। তার মা অনেকদিন আগেই মারা গেছে।

পাশের ঘরে এসে হরিচরণকে পাওয়া গেল না। রান্নাঘরে খুটখাট, ঠুং ঠাং আওয়াজ শুনে সেখানে চলে গেল বিনায়ক। হরিচরণ চা করছিলেন।

একটি ঠিকে কাজের মেয়ে আছে বিনায়কদের। সে দু বেলা আসে। তার কাজ হল কাপড় কাচা, বাসন মাজা, ঘরটর সাফ করা। কিন্তু চা করা, রান্নাবান্না, বাজার, এ সবই হরিচরণ করে থাকেন। বিনায়ক রাগারাগি করে বলে, একটা রান্নার লোক রাখবে। হরিচরণ শোনেন না। ছেলের রোজগার

এখনও এত নয় যে দু দুটো কাজের লোক রাখা যায়।

বিনায়ক বলল, 'বাবা, কাগজে একটা সাঙ্ঘাতিক খবর বেরিয়েছে। এই দেখ।'

ছেলের বলার ভঙ্গিতে এমন এক উত্তেজনা ছিল যে চমকে উঠলেন হরিচরণ। বললেন, 'কী খবর রে?'

'নিরঞ্জন বসুর ছেলে স্নেহাশিসকে একটি মেয়ে কাল রাতে গুলি করেছে।'

হরিচরণের বয়স ষাটের কাছাকাছি। রোগা, ভাঙাচোরা চেহারা। মাথায় কাঁচাপাকা চুল, গালে তিন চার দিনের দাড়ি, চামড়া কুঁচকে গেছে। কপালে অসংখ্য বলিরেখা। চোখের কোলে পুরু কালির ছোপ। দৃষ্টিটা কেমন যেন ঘোলাটে। লোকটার ওপর দিয়ে বহুকাল ধরে যে বহু ঝড় বয়ে গেছে সেটা ওঁর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। শোনামাত্র চোখদুটো জ্বলে ওঠে হরিচরণের। বললেন, 'তুই তোর ঘরে যা। আমি চা নিয়ে আসছি। সব ভাল করে শুনব।'

বিনায়ক বলল, 'না না, তোমাকে চা নিয়ে যেতে হবে না। আমাকে দাও।'

দু কাপ চা আর একটা প্লেটে কিছু বিস্কুট নিয়ে বিনায়ক তার ঘরে চলে এল। সঙ্গে হরিচরণ।

ছেলের খাটের একধারে বসে হরিচরণ জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার বল।'

বিনায়ক বলল, 'আমি খবরের কাগজের রিপোর্টটা পুরো পড়ে যাচ্ছি। শোন—'

পড়া হয়ে গেলে হরিচরণ বললেন, 'অকারণে মেয়েটা গুলি করেনি। স্নেহাশিস নিশ্চয়ই জঘন্য কিছু করেছে। নিরঞ্জন বসুর মতো একটা ক্রিমিনালের রক্ত যার শরীরে বইছে সে কখনও ভাল কাজ করতে পারে না।' একটু থেমে বললেন, 'বিনা দোষে আমার সারাটা জীবন ওরা নষ্ট করে দিয়েছে। আমার মন বলছে, এবার ওদের ধ্বংসের শুরু হল।'

বিনায়ক বলল, 'বাবা, আমি ভাবছি ওই মেয়েটা মানে রূপা ভৌমিককে আমি ডিফেণ্ড করব। মনে হচ্ছে, মেয়েটার কাছ থেকে এমন কিছু তথ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে যা নিরঞ্জন বসুদের বিরুদ্ধে যায়।'

'আমি তো নিরঞ্জন বসুদের গায়ে একটা আঁচড়ও কাটতে পারি নি। শুধু অক্ষম আক্রোশ নিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে যাচ্ছি। ওই মেয়েটা ঘা মারতে পেরেছে। ওকে যেমন করে হোক বাঁচাতেই হবে।'

'আজ ছুটির দিন। কোর্ট বন্ধ। পুলিশ রূপাকে আদালতে হাজির করাবে না। আমি এখনই একবার থানায় গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলব। রূপাকে ডিফেন্ড করতে হলে ওকালতনামায় ওর সই দরকার।'

'রূপার সঙ্গে কথা তো বলতেই হবে। তার আগে তোর ম্যাডামকে ফোন করে তাঁর অনুমতি নেওয়া দরকার।'

স্নেহাশিসের ওপর মধ্যরাতে আক্রমণের ঘটনাটা বিনায়কের মধ্যে এমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল যে মঞ্জুলিকার কথা মনেই ছিল না। অথচ তাঁর অনুমতিটা একান্তভাবেই দরকার। কেননা সে তাঁর সহকারী হিসেবে কাজ করছে।

ফোন করে বিনায়ক মঞ্জুলিকাকে স্নেহাশিসের ঘটনাটা জানিয়ে বলল, 'ম্যাডাম, আপনার পারমিশন পেলে আমি এই কেসটা নিতে চাই।' এই মামলাটা নেবার পেছনে তার কী উদ্দেশ্য রয়েছে সেটা জানিয়ে দিল।

মঞ্জুলিকা খুশিই হলেন, 'কেসটা অবশ্যই করবে। আমার শুভেচ্ছা আর আর্শীবাদ রইল।'

'ম্যাডাম, এই একটাই কেস। আমি কিন্তু আপনার জুনিয়র হিসেবে আরো কয়েক বছর কাজ করতে চাই।'

'যতদিন ইচ্ছা করবে।'

'আর একটা কথা—'

'বল—'

'এই কেসটায় আপনি কিন্তু আমাকে গাইড করবেন।'

মঞ্জুলিকা বললেন, 'অবশ্যই। যেখানে তোমার আটকাবে, আমাকে বলো। সাহায্য করব।'

কিছুক্ষণ পর চা খেয়ে, শেভ টেভ করে, স্নান সেরে বিনায়ক বেরিয়ে পড়ল, রাস্তায় একটা ফাঁকা ট্যাক্সি পেয়ে সেটায় উঠে কোন থানায় যেতে হবে, ড্রাইভারকে বলে দিল।

যেতে যেতে বাবার কথা ভাবছিল বিনায়ক। অনেকদিন আগে হরিচরণ স্নেহাশিস বসুদের ওষুধের ফ্যাক্টরি জেনিথ ড্রাগ কোম্পানির কেমিস্ট ছিলেন। মানুষ হিসেবে তিনি সৎ, সাদাসিধে, কারো সাতে পাঁচে থাকতেন না। চার বছরের ছেলে বিনায়ক আর স্ত্রী সুধাকে নিয়ে তাঁর সুখের সংসার। প্রচুর অর্থ তাঁদের ছিল না। যা ছিল তা হল অঢেল আনন্দ।

বছর কয়েক জেনিথ ড্রাগে কাটানোর পর হঠাৎ হরিচরণের নজরে পড়েছিল, ফ্যাক্টরির অন্য অংশে গোপনে ভেজাল ওষুধ তৈরি হচ্ছে, যা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। হরিচরণের মধ্যে শুধু সততাই নয়। এক ধরনের চারিত্রিক দৃঢ়তাও ছিল। অন্যায় দেখলে তিনি মুখ বুজে সহ্য করতেন না। তীব্রভাবে প্রতিবাদ করতেন।

ভেজাল ওষুধের ব্যাপারটা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। এই ওষুধ আর ইঞ্জেকশন ব্যবহার করলে মানুষের চরম ক্ষতি হয়ে যাবে। কিন্তু যিনি এগুলো তৈরি করিয়ে বাজারে ছাড়ছেন সেই নিরঞ্জন বসু তাঁর অন্নদাতা। এসব বন্ধ করতে হলে তাঁর বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়াতে হয়।

ক'টা রাত ভাল করে ঘুমোতে পারেননি হরিচরণ। একটা প্রচণ্ড অস্বস্তি তাঁকে এক মুহূর্তের জন্য স্থির থাকতে দেয়নি।

সুধা স্বামীকে লক্ষ করতে করতে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। বার বার জিজ্ঞেস করেছেন, 'কী হয়েছে তোমার? রাতে ঘুমোও না। ঘরের ভেতরে পায়চারি করে বেড়াও—'

প্রথম প্রথম সুধার কাছে ব্যাপারটা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন হরিচরণ। সুধা খুব নরম মানুষ, ভীতু। শুনলে ভীষণ ঘাবড়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না বলে পারা যায়নি।

সুধা আঁতকে উঠেছেন,'বল কী!'

'ঠিকই বলছি। কী করব ভেবে উঠতে পারছি না।'

'তোমার কিছু করার দরকার নেই। নিরঞ্জনবাবুদের অনেক টাকা, অনেক ক্ষমতা। কিছু করতে গেলে আমাদের শেষ করে ফেলবে।'

চিন্তিতভাবে হরিচরণ বলেছেন, 'চোখের সামনে দেখছি হাজার হাজার মানুষের সর্বনাশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। হাত-পা গুটিয়ে থাকি কী করে?'

সুধা কী বলবেন, ভেবে পাননি। দিশেহারার মতো স্বামীর মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে থেকেছেন।

নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে উঠেছেন হরিচরণ। একদিন সোজা নিরঞ্জন বসুর বাড়ি চলে গিয়েছিলেন তিনি। বলেছেন, 'স্যার, একটা গুরুতর ব্যাপার নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।'

বসতে বলে জিজ্ঞেস করেছেন, 'কী ব্যাপার?'

'আপনার ফ্যাক্টরির একটা অংশে গোপনে ভেজাল ড্রাগ তৈরি হয় তা কি আপনি জানেন?'

নিরঞ্জনের মেরুদণ্ড টান টান হয়ে গিয়েছিল। চোখের দৃষ্টি স্থির। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। পুরো একটি মিনিট হরিচরণের চোখের দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকার পর দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞেস করেছেন, 'জানতে পেরে গেছেন তা হলে?'

মানুষের দৃষ্টি যে কত হিংস্র আর নিষ্ঠুর হতে পারে, হরিচরণের আগে ধারণা ছিল না। তাঁর শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা স্রোতের মতো কিছু বয়ে গিয়েছিল। টের পাচ্ছিলেন, তাঁর শরীর ভীষণ কাঁপছে। কিন্তু যেখানে এসে তিনি পৌঁছেছেন সেখান থেকে ফেরা অসম্ভব। বলেছিলেন, 'হ্যাঁ স্যার, জেনেছি।'

'জেনেছেন, ভাল করেছেন, কিন্তু এ নিয়ে কখনও কারো কাছে মুখ খুলবেন না। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?'

'হ্যাঁ স্যার, কিন্তু—'

'কিসের কিন্তু?'

ভেজাল ওষুধে বহু মানুষের সর্বনাশ হবে, এই দুর্ভাবনাটা কিছুতেই মাথা থেকে বার করে দিতে পারছিলেন না হরিচরণ। হঠাৎ তাঁর ওপর প্রচণ্ড দুঃসাহস যেন ভর করেছিল। বলেছিলেন, 'এই অন্যায়

বন্ধ করা উচিত।'

অসহ্য রাগে মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিল নিরঞ্জনের। তাঁর ফ্যাক্টরির সামান্য একজন কেমিস্ট যে মুখের ওপর এমন কথা বলতে পারে, শুনেও বিশ্বাস হচ্ছিল না।

হরিচরণ হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো বলে যাচ্ছিলেন, 'এর মধ্যে কত লোকের, কত ক্ষতি হয়ে গেছে, কে জানে। আর পাপ করবেন না স্যার—'

তাকিয়েই ছিলেন নিরঞ্জন। হঠাৎ আশ্চর্য এক ম্যাজিকে তাঁর মুখচোখের ভাব একেবারে পালটে গিয়েছিল। উঠে এসে হরিচরণের কাঁধে একখানা হাত রেখে স্বাভাবিক গলায় বলেছিলেন, 'আপনি আমার সত্যিকারের শুভাকাঙ্খী; ভাল অ্যাডভাইস দিয়েছেন। কিন্তু বাজে লোকের পাল্লায় পড়ে আমাকে এসব করতে হয়েছে। আমি অনুতপ্ত। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগুলো বন্ধ করে দেব।'

হরিচরণ অবাক যতটা হয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি। বলেছিলেন, 'শুনে আমার খুব ভাল লাগছে স্যার—'

'দয়া করে এ নিয়ে কারো সঙ্গে যেন আলোচনা টালোচনা করবেন না।'

'না স্যার, কখনও নয়।'

বুকের ওপর থেকে একটা ভার নেমে গিয়েছিল হরিচরণের।

নিরঞ্জনের সঙ্গে কথা বলার পর বেশ কয়েক দিন কেটে গেল। প্রতি রবিবার বা অন্য ছুটির দিনে হরিচরণেরা বাড়ি থাকতেন না। কোনোদিন যেতেন ডায়মণ্ডহারবারে, কোনো দিন ব্যারাকপুর গঙ্গার ঘাটে। সারাদিন বাইরে বাইরে কাটিয়ে বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যেত।

দু সপ্তাহ পরের এক রবিবার হরিচরণরা গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বর। সকালে গিয়ে পুজো দিয়ে হোটেলে খেয়ে গঙ্গা পার হয়ে বেলুড়েও গেছেন। তারপর এধারে ওধারে আরোও ঘন্টা দু'তিন ঘুরে বাড়ি ফিরে আসতে আসতে আটটা বেজে গিয়েছিল।

শরীর এত ক্লান্ত ছিল যে তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া চুকিয়ে সবাই শুয়ে পড়েছিলেন।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙেছিল তীব্র কড়া নাড়ার আওয়াজে। ধড়মড় করে উঠে হরিচরণরা দেখতে পেয়েছিলেন, পুলিশ সারা বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। তারা জানিয়েছিল, সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছে।

হতবুদ্ধির মতো হরিচরণ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কেন? আমাদের কী অপরাধ?'

পুলিশ ইনস্পেক্টর বলেছিলেন, 'জেনিথ ড্রাগ কোম্পানি থেকে চার লাখ টাকা চুরি গেছে। কোম্পানির মালিকদের সন্দেহ আপনার ওপর।'

আতঙ্কগ্রস্তের মতো হরিচরণ বলেছিলেন, 'কী বলছেন আপনি!'

সুধা কিছু বলেন নি, শুধু দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন।

পুলিশ এবার সার্চ শুরু করেছিল। ছোট্ট ফ্ল্যাটটা তোলপাড় করে শোওয়ার ঘরের খাটের তলায় বাক্স-পেটরার আড়াল থেকে একটা বড় অ্যাটাচি কেস বার করে এনেছিল। সেটা খুলতেই দেখা গেছে, থরে থরে সাজানো নতুন একশ টাকার নোটের অগুনতি বান্ডিল।

এমন একটা অকল্পনীয় ব্যাপার চোখের সামনে দেখে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন হরিচরণ। একটু সুস্থ হলে তাঁকে পুলিশ ভ্যানে তুলে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিভাবে টাকাভর্তি অ্যাটাচি কেসটা তাঁর ফ্ল্যাটে ঢুকল, কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলেন না। পরে অবশ্য জানতে পেরেছেন, লোক লাগিয়ে তাঁর বাড়ির তালার ছাঁচ নিয়ে চাবি তৈরি করিয়ে যেদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন সেদিনই ওই অ্যাটাচিটা ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

ষড়যন্ত্রটা ছিল নিখুঁত। আগের দিন ব্যাঙ্ক থেকে নতুন নোটে চার লাখ টাকা তোলা হয়েছিল। সেই টাকার নম্বরগুলো টুকে রেখেছিলেন নিরঞ্জন এবং পুলিশের হাতে তা তুলে দিয়েছেন।

উকিল টুকিল লাগিয়েও কিছু করা যায়নি। টাকা চুরির দায়ে চার বছর জেল হয়ে গিয়েছিল হরিচরণের।

ন'বছরের একটা ছেলেকে নিয়ে অথৈ সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিলেন সুধা। শেষ পর্যন্ত বিনায়কের এক দূর সম্পর্কের পিসি এসে নর্থ বেঙ্গলের শাজাহানপুরে ওদের নিয়ে গিয়েছিলেন।

পিসি মমতা আর পিসেমশাই নবকুমারের মতো মানুষ পৃথিবীতে খুবই দুর্লভ। ওঁদের সহৃদয়তা আর সহানুভূতির কোনো তুলনা নেই। নবকুমার ছিলেন টি গার্ডেনের অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার। ওঁরা নিঃসন্তান। দু হাতে বিনায়ক আর সুধাকে আগলে আগলে রেখেছেন দু'জনে।

নিরপরাধ স্বামীর লাঞ্ছনায় সুধা এতই ভেঙে পড়েছেন যে শাজাহানপুরে এসে বেশিদিন বাঁচেন নি; মাত্র কয়েক মাস পরেই মারা গেছেন।

চার বছর জেল খাটার পর শাজাহানপুরে যখন হরিচরণ এলেন তখন তাঁকে ধ্বংসস্তূপের মতো দেখাচ্ছিল। সে সময় বিনায়ক তের বছরের কিশোর, ক্লাস এইটে পড়ছে।

ছেলেবেলায় ভাসা ভাসাভাবে বিনায়ক শুনেছিল, তার বাবা জেলে আছেন। ব্যস, এইটুকুই। এবার হরিচরণ ছেলেকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে কেন তাঁকে জেলে যেতে হয়েছে, সমস্ত খুলে বলেছিলেন। ভেজাল ওষুধের ব্যাপারে তাঁর মুখ চিরতরে বন্ধ করার জন্য চক্রান্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মুক্তির পর তিনি যদি এ নিয়ে হইচই করেন কেউ তাঁর কথা কানে তুলবে না। চুরির অপরাধে জেল-খাটা একজন আসামীকে কে বিশ্বাস করবে?

হরিচরণ বলেছিলেন, 'শরীর মন একেবারে ভেঙে গেছে। প্রতিশোধ নেবার শক্তি আমার আর নেই। যদি পারিস তুই নেবার চেষ্টা করিস বাবা।' ছেলের মনে সেদিন প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

মাসখানেক বিশ্রাম নেবার পর হরিচরণ যখন কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন, নবকুমার তাঁদের টি গার্ডেনে ওঁকে ছোটখাট একটা কাজ জোগাড় করে দিয়েছিলেন।

তারপর বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে স্কুল ফাইনাল, হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করার পর বিনায়ককে বি. এ. পড়ার জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল। সে হোস্টেলে থাকত। ইংরেজি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার পর ল-এর ডিগ্রি নিয়ে সে যখন মঞ্জুলিকা সেনগুপ্তর জুনিয়র হয়ে হাইকোর্টে যেতে শুরু করল, সেই সময় চেতলায় ফ্ল্যাট ভাড়া করে শাজাহানপুর থেকে বাবাকে নিয়ে আসে। সেই থেকে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল বিনায়ক। হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে কাল রাতে স্নেহাশিসের ওপর অচেনা মেয়েটি গুলি চালানোয় সেটা তার হাতের মুঠোয় চলে এসেছে।

একসময় বিনায়কের ট্যাক্সি থানার সামনে এসে থামল। ভাড়া মিটিয়ে সোজা অফিসার ইন-চার্জ জয়দীপ লাহার চেম্বারে চলে আসে সে।

ছয়

জয়দীপ তাঁর কামরাতেই ছিলেন। বিনায়ক নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি রূপা ভৌমিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

জয়দীপ জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

'ওর হয়ে আমি কেসটা লড়ব।'

'আপনি ওকে চেনেন?'

'না।'

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, রূপার বিরুদ্ধে অ্যাটেমপ্ট অফ মার্ডারের চার্জ আসবে। স্নেহাশিস বসু নামে একটি যুবককে সে গুলি চালিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করেছে।'

'জানি।'

'গুলি চালানোর কথা সে নিজের মুখে স্বীকার করেছে।'

বিনায়ক বলল, 'খবরের কাগজে আমি তা দেখেছি।'

জয়দীপ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ওকে বাঁচাতে চাইছেন?'

'অবশ্যই।'

'যে নিজের হাতে গুলি করে পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করেছে তাকে বাঁচানো কি সম্ভব?'

একটু চিন্তা করে বিনায়ক বলল, 'দেখুন, খবরের কাগজে পড়ে যেটুকু বুঝেছি তাতে মনে হয়েছে

রূপা সাধারণ মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির মেয়ে। এরকম একটি মেয়ের পক্ষে একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের ছেলেকে গুলি করার পেছনে নিশ্চয়ই মারাত্মক কারণ আছে। সেটা জানতে পারলে খুব সম্ভব ওকে বাঁচানো যেতে পারে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জয়দীপ বললেন, ' মেয়েটাকে দেখে মনে হয় না প্রফেশনাল মার্ডারার। আমার ধারণা স্নেহাশিস ওর এমন কিছু ড্যামেজ করেছে যাতে ও অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে। আপনি ওকে ডিফেণ্ড করুন। চলুন আমার সঙ্গে—'

জয়দীপ উঠতে যাবেন, ছোট কাকা তরুণাভকে সঙ্গে নিয়ে রিয়া তাঁর কামরায় এসে ঢুকল।

জয়দীপ বললেন, 'আসুন—আসুন। আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

রিয়া বলল, 'আমাকে রূপার কাছে নিয়ে চলুন।'

'সে তো নিয়ে যাবই। আমাদের প্রয়োজনেই ওর সঙ্গে আপনার দেখা হওয়া দরকার। তার আগে—' বিনায়ককে দেখিয়ে জয়দীপ বলতে লাগলেন, 'এঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। ইনিও রূপার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

পরিচয় করানো হয়ে গেলে জয়দীপ বললেন, 'এবার যাওয়া যাক।' তরুণাভকে তাঁর চেম্বারে বসিয়ে রিয়া আর বিনায়ককে সঙ্গে করে লক-আপের সামনে চলে এলেন।

রূপা ডান দিকের দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে দুই হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে শূন্য চোখে তাকিয়ে ছিল। চুল পিঠময় ছড়িয়ে আছে।

জয়দীপ ডাকলেন, 'এই যে শুনছেন? মিস রিয়া মিত্র আর বিনায়কবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

রূপা যেন ঘোরের মধ্যে ছিল, আচমকা জয়দীপের গলা কানে আসতে চমকে ওঠে। একইভাবে খানিকক্ষণ বসে থাকার পর হাতের ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে লক-আপের মোটা মোটা গরাদগুলোর কাছে চলে আসে। বিনায়কের দিকে আঙুল বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আমি রিয়া মিত্রর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। ইনি এসেছেন কেন?'

বিনায়কের আসার উদ্দেশ্য জানিয়ে দেন জয়দীপ।

রূপা অদ্ভুত হাসে। বিনায়ককে বলে, 'আপনি আমাকে ফাঁসির হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন?'

বিনায়ক বলে, 'সব কথা খুলে বললে হয়তো পারব।'

ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ কী ভাবে রূপা। মনে হয়, সে মনস্থির করতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত দ্বিধা কাটিয়ে বলে, 'ঠিক আছে, সব জানাব।' তারপর রিয়ার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে, 'স্নেহাশিসকে গুলি করার জন্য নিশ্চয়ই আমাকে ঘৃণা করছেন?'

রিয়া উত্তর দিল না।

রূপা থামেনি, 'সমস্ত শোনার পর আপনি বুঝবেন আমি ঠিকই করেছি। আমার জীবন নষ্ট করে দিয়েছে স্নেহাশিস। চাই নি, আপনারও চরম সর্বনাশ হোক। আমার প্রতিহিংসা তো ছিলই। একটা বিশ্বাসঘাতক, দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গে জীবন কাটানোর যন্ত্রণা যাতে আপনাকে ভোগ করতে না হয় সে জন্যেও অস্ত্রটা হাতে তুলে নিতে হয়েছিল।'

ক্লান্তভাবে মাথাটা গরাদের ওপর রেখে বেশ খানিকটা সময় চোখ বুজে রইল রূপা। তারপর হঠাৎ টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে আবেগহীন, কঠিন গলায় বলতে শুরু করল।

রূপাদের সংসারে সে এবং তার বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই। ওরা থাকে বনগাঁয়ে। কয়েক বছর আগে বাবা মারা গেছেন। তিনি ছিলেন একটা ছোট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ক্লার্ক। কয়েক দিনের জ্বরে হঠাৎ তিনি মারা যাওয়ায় সংসারটা বিপন্ন হয়ে পড়ে। বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ড টান্ড বাবদ রূপারা যা পেয়েছিল তা ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে কোনোরকমে চলছিল। সঞ্চয় যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় দিশেহারা হয়ে পড়ে ওরা।

রূপা পাশ কোর্সে বি. এ পাশ করেছে। দেখতেও বেশ সুশ্রী। একটা চাকরির আশায় টালিগঞ্জে দূর সম্পর্কের এক কাকার ভাড়া বাড়িতে এসেছিল কয়েক মাস আগে। তারপর কাজের খোঁজে সারা শহর তোলপাড় করে ফেলে। যেখানে ভাল ভাল রেজাল্ট-করা অনার্স গ্র্যাজুয়েট আর এম. এ'রা

বছরের পর বছর হন্যে হয়ে ঘুরছে, তার মতো সাধারণ পাশ কোর্সের গ্র্যাজুয়েটকে কে চাকরি দেবে?

ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত জেনিথ ড্রাগ কোম্পানিতে এসেছিল রূপা। তাকে দেখে দারুণ ভাল লেগে যায় স্নেহাশিসের। সে ভরসা দেয়, চাকরির ব্যবস্থা করে দেবে। স্নেহাশিসকে ত্রাণকর্তা বলে মনে হয়েছিল রূপার। সুপুরুষ এই যুবকটিকে তারও ভাল লেগে গিয়েছিল। কয়েক মাসের মধ্যে দু'জনের সম্পর্ক এই ভাল লাগার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তারা এতটাই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল যে একদিন রূপা টের পেল সে গর্ভবতী। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে স্নেহাশিসের কাছে ছুটে গিয়েছিল। স্নেহাশিস বলেছিল, সে রূপাকে ভালবাসে, তাকে বিয়ে করবে। মানুষের চোখে তার সম্মান, তার মর্যাদা কখনও ক্ষুন্ন হতে দেবে না।

রূপা তাকে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু দু-চারদিনের মধ্যে টের পাওয়া গেল, স্নেহাশিস তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তার দেখা পাওয়া যেত না। অফিসে গেলে জানানো হত, সাহেব আসেন নি। বারকয়েক ওদের বাড়িতে গেছে। দারোয়ান ভেতরে ঢুকতে দেয় নি।

আতঙ্কগ্রস্ত রূপা ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে। একবার আত্মহত্যার কথা চিন্তা করেছিল। পরক্ষণে মনে হয়েছে, একটা দুশ্চরিত্র ক্রিমিনালকে চরম শাস্তি না দিয়ে নিঃশব্দে মরে যাবার মানে হয় না।

এই সময় রূপা হঠাৎ জানতে পারে, রিয়ার সঙ্গে স্নেহাশিসের বিয়ে ঠিক হয়েছে। প্রতিহিংসার সঙ্কল্পটা সেই মুহূর্তে আরো কঠোর হয়ে উঠেছিল তার। রিয়াদের ফোন নম্বর জোগাড় করে সে তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল। তার একটা সরু সোনার হার ছিল। সেটা বেচে রূপা রিভলবার ভাড়া নেয়। তারপর স্নেহাশিসদের বাড়ির কাছে গিয়ে তক্কে তক্কে থাকে। কিন্তু গেটে সর্বক্ষণ দারোয়ান মোতায়েন আছে। তার চোখে ধুলো দিয়ে ভেতরে ঢোকা অসম্ভব।

দু-তিনদিন ঘোরাঘুরির পর কাল বিকেলে কাঙ্খিত সুযোগটা এসে যায়। দারোয়ান কী কারণে যেন বাড়ির মধ্যে গিয়েছিল। সেই ফাঁকে রূপা ভেতরে ঢুকে পড়ে। বাড়ির পেছন দিকটা নির্জন। সেখানে প্রচুর গাছপালা আর ঝোপঝাড়। একটা ঝোপের আড়ালে সন্ধে পর্যন্ত লুকিয়ে থাকে সে। অন্ধকার নামলে পেছন দিকের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে ট্যাঙ্কের পাশে বসে থাকে।

রাত বারটায় বাড়ি যখন নিঝুম, সবাই গভীর ঘুমে ডুবে আছে, সেই সময় ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নেমে আসে রূপা। দোতলার কোন ঘরটা স্নেহাশিসের তা ওর মুখেই শুনেছিল সে। সেই ঘরের সামনে এসে দরজায় কয়েক বার টোকা দিতেই ঘুমচোখে বেরিয়ে আসে স্নেহাশিস। রূপাকে দেখে ভীষণ আঁতকে উঠেছিল। দরজাটা বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল সে, কিন্তু সে সময় তাকে দেয়নি রূপা। পর পর তিন বার গুলি করে ঘোরানো সিঁড়ির দিকে দৌড়ে যায়। পলকের জন্য তার চোখে পড়েছিল, আর্ত চিৎকার করে লুটিয়ে পড়েছে স্নেহাশিস। তার শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

গুলির আওয়াজ আর স্নেহাশিসের কাতরানি শুনে বাড়ির সবার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। মুহূর্তে চারদিকে আলো জ্বলে উঠেছে। গোটা বাড়ি জুড়ে তখন হই চই, চেঁচামেচি। একটা হুলস্থুল কাণ্ড বেধে গিয়েছিল।

আহত, রক্তাক্ত স্নেহাশিসকে গাড়িতে তুলে নিরঞ্জন বসু এবং তাঁর স্ত্রী নার্সিং হোমে ছুটে গিয়েছিলেন। বাকি সবাই আততায়ীকে ধরার জন্য খোঁজাখুঁজি করছিল। কিন্তু কেউ রূপার সন্ধান পায়নি, সে নিঃশব্দে বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে আসতে পেরেছিল।

তারপর উত্তর কলকাতার দিকে ছুটতে শুরু করেছে। তার ইচ্ছা ছিল রিয়ার সঙ্গে দেখা করে স্নেহাশিসকে গুলি করার ঘটনাটা জানিয়ে দেবে।

মধ্যরাতে নিস্তব্ধ, ঘুমন্ত শহরের জনশূন্য রাস্তার ওপর দিয়ে কতক্ষণ ছুটেছিল খেয়াল নেই রূপার। হঠাৎ একটা পুলিশ ভ্যান পেছন থেকে ধাওয়া করে এসে তাকে থামিয়ে দিয়েছে। তারপর রিভলবারসুদ্ধু অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে এসেছিল।......

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলার কারণে হাঁফিয়ে গিয়েছিল রূপা। বেশ কয়েক বার জোরে জোরে শ্বাস টানল।

তারপর কিছুক্ষণের জন্য লক-আপ এবং সেটার চারপাশে স্তব্ধতা নেমে এল।

একসময় রূপা রিয়ার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আমার কথা তো শুনলেন মিস মিত্র। বলুন আমি কি খুব অন্যায় করেছি?'

অভিভূতের মতো তাকিয়ে ছিল রিয়া। এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে চমকপ্রদ এক রহস্য কাহিনী শুনে যাচ্ছিল সে। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল—না, কোনো অন্যায় হয়নি।

এবার রূপার চোখদুটো বিনায়কের দিকে ঘুরে গেল, 'যা শুনলেন, তারপর আমাকে বাঁচানো কি সম্ভব হবে?'

বিনায়ক বলল, 'মনে হচ্ছে—হবে। তবে আরো অনেক কিছু ডিটেলে জানা দরকার।'

'কী জানতে চান বলুন—'

'এখন নয়, পরে আবার আসব। এখন আপনি এখানে একটা সই করে দিন—' পকেট থেকে ওকালতনামা আর পেন বার করে রূপার দিকে বাড়িয়ে দিল বিনায়ক।

রূপা জিজ্ঞেস করল, 'সই কেন?'

'আপনার হয়ে কেসটা যে আমাকে লড়তে দিচ্ছেন, কোর্টকে তো জানাতে হবে। এটা হল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি।'

রূপা নামটা সই করে ওকালতনামাটা বিনায়কের হাতে দিয়ে অনিশ্চিত ভাবে বলল, 'কিভাবে আমাকে রক্ষা করবেন জানি না। তবে আমার যা হবার হবে, সে জন্যে ভাবি না। একটা লম্পট ক্রিমিনালকে নিজের হাতে কিছুটা শাস্তি দিতে পেরেছি, সে জন্যে আমি খুশি।'

আরো কিছুক্ষণ কথা বলে বিনায়ক আর রিয়া বিদায় নিল। জয়দীপ লাহার চেম্বারের দিকে যেতে যেতে রিয়া বলল, 'রূপাকে সত্যিই কি বাঁচানো সম্ভব হবে বলে আপনি মনে করেন?'

বিনায়ক বলল, 'শাস্তি হয়তো কিছু হবে, তবে সেটা মারাত্মক নয়। আমি ভাবছি, স্নেহাশিসকে পুরোপুরি এক্সপোজ করে দেব।'

'নিশ্চয়ই। একটা মেয়ের অসহায়তা, সারল্য আর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে যে এত বড় ক্ষতি করতে পারে তার সিভিয়ার পানিশমেন্ট হওয়া উচিত।' রিয়ার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ফুটে বেরোয়।

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে বিনায়ক।

রিয়া বলে, 'এর জন্যে আমার কোনোরকম সাহায্য যদি দরকার হয় বলবেন। আমাদের ফোন নম্বর দিচ্ছি, লিখে নিন। তেমন বুঝলে কনট্যাক্ট করবেন।'

বিনায়ক রিয়ার নম্বরটা টুকে নিয়ে তার নম্বরও রিয়াকে লিখে দিল।

রিয়া হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'একটা কথা আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।'

'কী?'

'যতদূর বুঝতে পারছি, রূপার পক্ষে আপনার ফীস দেওয়া সম্ভব নয়। তবু—' বলতে বলতে চুপ করে গেল রিয়া।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছিল বিনায়ক। বলল, 'তবু বিনা রেমুনারেশনে ওর কেসটা নিলাম কেন, এই তো?'

বিব্রতভাবে রিয়া বলল, 'হ্যাঁ, মানে—'

বিনায়ক বলল, 'রূপার মতো স্নেহাশিসদের ওপর আমার একটা রিভেঞ্জ নেবার ব্যাপার আছে মিস মিত্র—'

রিয়া চমকে উঠে, 'রিভেঞ্জ? কিসের?'

'বলতে অনেকটা সময় লাগবে।' বিনায়ক বলতে থাকে, 'আশা করি আপনার সঙ্গে পরে বহুবার দেখা হবে। তখন শোনাব।'

'আচ্ছা—'

সাত

পরদিন কোর্টে তোলা হল রূপাকে।

এমন একটা চাঞ্চল্যকর কেসে কলকাতার মানুষের প্রচণ্ড কৌতূহল। বিচারক আসার অনেক আগেই আদালত ভর্তি হয়ে গেল। সাধারণ লোকজন তো বটেই, শহরের সবগুলো কাগজের ক্রাইম রিপোর্টাররা কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে এসে হাজির হয়েছে।

রিয়া এবং ঝিনুকও এসেছে। রিয়া আসুক, বাড়ির কেউ তা চায়নি। পরাশররা নিরঞ্জন বসুকে ফোন করে বিয়ে ভেঙে দিয়েছেন। রূপার কেস মানে স্নেহাশিসের কেস। এই নোংরা ছেলেটার সঙ্গে রিয়া কোনোভাবে জড়িয়ে পড়ুক, সেটা পরাশরদের কাছে আদৌ কাম্য নয়। কিন্তু রিয়া প্রায় জোর করেই চলে এসেছে। যে রূপা তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে তার প্রতি এক ধরনের দায়িত্ব বোধ করতে শুরু করেছে সে।

বিনায়ক জোর আবেদন করলেও পুলিশ রূপার জামিনের তীব্র বিরোধিতা করল। তাদের বক্তব্য, ইনভেস্টিগেশনের জন্য বেশ কয়েকদিন তার পুলিশের হেফাজতে থাকা দরকার।

এরপর মোট চারবার আদালতে আনা হল রূপাকে। কিন্তু পুলিশের বাধায় জামিন সম্ভব হল না।

জয়দীপ লাহার রূপার ওপর যথেষ্ট সহানুভূতি রয়েছে। তবু তাঁদের দিক থেকে জামিনে যে বাধা দেওয়া হয়েছে সেটা পুলিশের রুটিন ব্যাপার। রিয়া এবং বিনায়ককে তিনি তা জানিয়েও দিয়েছেন। বলেছেন, পরের বার রূপাকে যদি কোর্টে জামিন দিতে চায় তাঁরা আপত্তি করবেন না।

এদিকে মেয়ে গুলি চালিয়ে একজনকে গুরুতর জখম করেছে এবং সেই অপরাধে পুলিশের হেফাজতে রয়েছে, এই খবরটা পাওয়ামাত্র ঊর্ধ্বশ্বাসে বনগাঁ থেকে ছুটে এসেছেন তার বিধবা মা লীলাময়ী। রূপার দূর সম্পর্কের সেই কাকার বাড়িতেই উঠেছেন। রোজই তিনি থানায় এসে মেয়ের সঙ্গে দেখা করেন। পুলিশ রূপাকে কোর্টে তুললে তিনি আদালতে যান। রিয়া আর বিনায়কের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর আলাপ হয়েছে। তিনি তাদের হাত ধরে ব্যাকুলভাবে বলেছেন, 'রূপাকে তোমরা বাঁচাও।'

কলকাতায় আসার পর একটা নিদারুণ সংকটে পড়েছেন লীলাময়ী। রূপার যে কাকার বাড়িতে তিনি উঠেছেন তারা মানুষ খারাপ না। কিন্তু প্রায় একটা হত্যাকাণ্ড যে ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের কারো সঙ্গে তারা কোনোরকম সংস্রব রাখতে চায় না।

রূপার এই দূর সম্পর্কের কাকাটির নাম কালীনাথ। কলকাতায় কালীনাথরা ছাড়া এমন আর কেউ নেই যার কাছে গিয়ে লীলাময়ী উঠতে পারেন। একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন তিনি, মেয়েকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে তাঁর পক্ষে বনগাঁয় ফিরে যাওয়া এখন একেবারেই সম্ভব নয়।

নিজের সমস্যার কথা বিনায়ক এবং রিয়াকে বলেছেন লীলাময়ী। অনুরোধ করেছেন, কোথাও তাঁর একটু থাকার ব্যবস্থা করে দিতে। লীলাময়ী তো আছেনই, রূপাকে নিয়েও গভীর সমস্যা দেখা দিয়েছে। জামিন পাওয়া গেলে তারও থাকার মতো একটা জায়গা চাই। এই নিয়ে রিয়া আর বিনায়কের মধ্যে কথাও হয়েছে। বিনায়ক বলেছে, 'এমন একটা ব্যবস্থা করা দরকার যেখানে মা আর মেয়ে নিরাপদে থাকতে পারবে।'

রিয়া বলেছে, 'একটু চেষ্টা করে দেখুন।'

বিনায়ক বলেছে, 'আমি অনেককে বলেছি কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারছি না।'

'রূপার যদি নেক্সট উইকে 'বেল' হয়ে যায়, ও কোথায় গিয়ে উঠবে?'

'সেটা কি আমি ভাবি নি? কিন্তু কী করব?'

একটু চুপচাপ।

তারপর হঠাৎ কী মনে পড়ে যাওয়ায় বিনায়ক বলেছে, 'আজ একবার আমার সিনিয়র মঞ্জুলিকা সেনগুপ্তর সঙ্গে কথা বলব। ওঁর প্রচুর ইনফ্লুয়েন্স, অনেক ক্ষমতাবান লোকের সঙ্গে ওঁর জানাশোনা। হয়তো কিছু একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে যাবে।'

প্রথম দিকে রূপার ব্যাপারে কোনোভাবে রিয়া জড়িয়ে পড়ুক, এতে ভীষণ আপত্তি ছিল তার বাড়ির লোকেদের। পরে তাঁদের মনোভাব অনেকখানি বদলে যায়। অতি সাধারণ পরিবারের একটি মেয়ে হতাশার কোন প্রান্তে পৌঁছুলে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে পারে, সেটা তাঁরা বুঝতে পেরেছেন। রূপা সম্পর্কে ওঁরা ইদানীং সহানুভূতিও বোধ করছেন। এটা সম্ভব হয়েছে রিয়ার জন্য।

রিয়া তার বাবা আর কাকাদের বার বার বলেছে, কোর্ট থেকে 'বেল' পেলে রূপার একটা থাকার জন্য ওঁরা যেন ব্যবস্থা করে দেন। ওঁরা কথা দিয়েছেন, চেষ্টা করবেন।

শেষ পর্যন্ত বিনায়কের সিনিয়র মঞ্জুলিকা সেনগুপ্ত তাঁর এক বড়লোক মক্কেল প্রিয়গোপাল মল্লিককে অনুরোধ করতেই সুরাহা হয়ে গেছে। প্রিয়নাথের কলকাতায় অনেকগুলো বাড়ি। তাঁর ভবানীপুরের প্রকাণ্ড পুরনো পাঁচতলা বাড়িতে বহু ভাড়াটে থাকে। ওখানকার একটা ফাঁকা দু-কামরার ফ্ল্যাটে রূপা এবং তার মা যতদিন ইচ্ছা থাকবে। বাড়িটা সুরক্ষিত। বন্দুকওলা পাহারাদার আছে। সেখানে রূপাদের নিরাপত্তা নিয়ে দুর্ভাবনার কারণ নেই।

এর মধ্যে খবর পাওয়া গেল, স্নেহাশিসের মৃত্যুর আশঙ্কা আর নেই। তবে আরো অনেকদিন তাকে নার্সিং হোমে থাকতে হবে।

আট

জামিন পাওয়ার পর রূপা আর লীলাময়ী ভবানীপুরে আছেন। কিন্তু অ্যাটেম্পট টু মার্ডারের' মামলা মুখের কথায় শেষ হয়ে যায় না। বহুদিন ধরে তা চলতে থাকে।

কিন্তু মারাত্মক সমস্যাটা দেখা দিয়েছে আর এক দিক থেকে। এখনও সেভাবে না হলেও, তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করলে দেখা যাবে, রূপার শরীরে মাতৃত্বের লক্ষণ ফুটে উঠতে শুরু করেছে। বেশিদিন তা ঢেকে রাখা সম্ভব হবে না। হাতে যথেষ্ট সময় নেই। এ ব্যাপারে যা করণীয় দু-একমাসের ভেতর করে ফেলা দরকার।

আজকাল প্রায় রোজই রিয়ার সঙ্গে বিনায়কের দেখা হচ্ছে। রূপার জটিল সমস্যাটা তাদের দু'জনকে অনেক কাছে এনে দিয়েছে। পরস্পরকে এখন তারা 'তুমি' করে বলে। কোন প্রতিহিংসার জন্য রূপার কেসটা সে হাতে নিয়েছে, বিনায়ক জানিয়ে দিয়েছে। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছে রিয়া। বলেছে, 'দেখা যাচ্ছে নিরঞ্জন বসু আর তাঁর ছেলে স্নেহাশিস, দু'জনেই জঘন্য টাইপের ক্রিমিনাল।'

রিয়া আর বিনায়ক বেশির ভাগ দিনই রূপাদের ফ্ল্যাটে এসে দেখা করে। কোনো কোনো দিন বিনায়ক উত্তর কলকাতায় 'মিত্র নিকেতন'-এ চলে আসে। তাকে পরাশরদের খুব ভাল লেগেছে। এক তরুণ আইনজীবী নিঃস্বার্থভাবে অসহায় একটি মেয়ের জন্য প্রচণ্ড শক্তিমান এক পরিবারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে, এতে বিনায়কের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে।

আজ সন্ধেবেলায় কোর্ট থেকে সোজা 'মিত্র নিকেতন'-এ চলে এল বিনায়ক। আগেই রিয়াকে ফোন করে বলে দিয়েছিল, সবাই যেন বাড়িতে থাকেন। রূপার বিষয়ে একটা অত্যন্ত জরুরি আলোচনা সে পরাশরদের সঙ্গে করতে চায়।

দোতলার হল-ঘরে রিয়া ঝিনুক পরাশর তরুণাভ ইন্দ্রনাথ মন্দিরা প্রীতিকণা বিণীতারা বিনায়ককে ঘিরে বসলেন। চা খেতে খেতে বিনায়ক বলল, 'আমরা সকলেই জানি রূপা প্রেগনান্ট। এর জন্যে দায়ী স্নেহাশিস।'

পরাশর বললেন, 'সে তো জানিই।'

'দু-একমাস পর মেয়েটা লোকের সামনে বেরুতে পারবে না। এ ব্যাপারে কী করা উচিত বলে আপনারা মনে করেন?'

'এটা আমরা যে ভাবিনি তা নয়। তবে প্রবলেমটা এমনই কমপ্লিকেটেড যে কী বলব বুঝতে পারছি না।'

বিনায়ক বলল, 'আমি একটা সলিউশন চিন্তা করেছি। আপনাদের তা বলছি। এছাড়া আর কিছু আমার মাথায় আসছে না।'

সবাই উৎসুক চোখে বিনায়কের দিকে তাকালেন।

বিনায়ক বলতে লাগল, 'রূপার কেসটা সাব-জুডিস। কতদিন এই মামলা চলবে আমাদের জানা নেই। কিন্তু তার সন্তান ততদিন মায়ের পেটে অপেক্ষা করবে না। এই বাচ্চাটার জন্ম হলে তার স্টেটাস কী হবে, কুমারী মা হিসেবে রূপাকে সোসাইটি কী চোখে দেখবে তা আমরা জানি। মেয়েটাকে

এবং তার বাচ্চাকে সবদিক থেকে রক্ষা করতে হবে।'

ইন্দ্রনাথ হতবুদ্ধির মতো বললেন, 'কিভাবে রূপার মর্যাদা রক্ষা করা যাবে, আমি তো কিছুই ভেবে উঠতে পারছি না।'

'আমি যা ভেবেছি তা হল, রূপাকে নিরঞ্জন বসুর পুত্রবধূ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।'

'তার মানে তুমি চাও স্নেহাশিস রূপাকে বিয়ে করুক।'

'এগ্‌জ্যাক্টলি।'

পরাশর প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ইমপসিবল। নিরঞ্জন বসুরা এতে কখনও রাজি হবে?'

বিনায়ক বলল, 'আমরা তাদের বাধ্য করব।'

সবাই একসঙ্গে জানতে চাইলেন, 'কিভাবে?'

বিনায়ক এবার তার পরিকল্পনার কথা বিশদভাবে বলল।

কলকাতায় মহিলাদের অসংখ্য প্রতিষ্ঠান আছে। এরা লাঞ্ছিত, বঞ্চিত বা নানাভাবে অত্যাচারিত মেয়েদের জন্য প্রচুর কাজ করে যাচ্ছে। এদের দিয়ে নিরঞ্জন বসুদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। তাতে নিশ্চয়ই ফল পাওয়া যাবে।

পরাশর জিজ্ঞেস করলেন, 'কিভাবে প্রেসার দিতে চাও?'

বিনায়ক বলল, 'মহিলাদের অর্গানাইজেশনগুলোর সঙ্গে কথা বলে তা ঠিক করব।'

পরাশর সংশয়ের সুরে বললেন, 'এতে কি কিছু কাজ হবে?'

উদ্দীপনায় রিয়ার চোখ চকচক করছিল। সে বলল, 'নিশ্চয়ই হবে বাবা। এতগুলো অর্গানাইজেশনের স্ট্রেনথ একসঙ্গে মেলাতে পারলে তার রেজাল্ট হতে বাধ্য। আমার বিশ্বাস, নিরঞ্জন বসুরা মাথা না নুইয়ে পারবে না।' বিনায়ককে বলল, 'কবে থেকে তুমি অর্গানাইজেশনগুলোর সঙ্গে কথা বলবে?'

'ভাবছি কাল থেকে যোগাযোগ করব।'

'আমিও তোমার সঙ্গে যেতে চাই।'

'ঠিক আছে।'

নয়

পরদিন থেকেই বিনায়ক আর রিয়া মহিলা প্রতিষ্ঠানগুলোর অফিসে যেতে শুরু করল। সাত দিনে সাতটা প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি বা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলল দু'জনে। সব জায়গা থেকে ভাল সাড়া পাওয়া গেল। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান থেকে জানানো হল, রূপার ব্যাপারে তারা সমস্ত রকম সাহায্য করবে। ঠিক হল, প্রতিটি অর্গানাইজেশন থেকে পঞ্চাশ জন করে সক্রিয় মহিলা সদস্য নিরঞ্জন বসুর বাড়ির সামনে অবস্থান শুরু করবে। যতদিন না তাদের দাবি মেনে নেওয়া হচ্ছে তারা কেউ নড়বে না। লাগাতার অবস্থান চলতেই থাকবে।

দিন চারেক পর নিরঞ্জন বসুদের বাড়ির গেটের কাছে অনেকগুলো তেরপল খাটিয়ে সাতটা মহিলা প্রতিষ্ঠানের সাড়ে তিনশ সদস্য অবস্থান শুরু করল। ফেস্টুনে পোস্টারে প্ল্যাকার্ডে চারদিক ছয়লাপ। সেগুলোতে লেখা আছে, 'রূপা ভৌমিকের গর্ভবতী হওয়ার জন্য দায়ী স্নেহাশিস বসু', 'রূপাকে পুত্রবধূ হিসেবে বসুদের মেনে নিতে', 'নিরঞ্জন বসুদের অপরাধ ক্ষমা করা হবে না' ইত্যাদি।

অবরোধ আর অবস্থানের জন্য পুরো একটা দিন নিরঞ্জন বসুদের বাড়ি থেকে কেউ বেরুতে পারে নি, কারো পক্ষে ভেতরে ঢোকাও সম্ভব হয়নি। শুধু লাগাতার অবস্থানই নয়, মহিলা সদস্যরা প্রায় সারাক্ষণ শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছিল।

'নিরঞ্জন বসুদের—'

'চিনে নিন, চিনে নিন—'

'রূপাকে পুত্রবধূ হিসেবে মেনে নিতে—'

'বসুদের বাধ্য করুন, বাধ্য করুন—'

মহিলা প্রতিষ্ঠানের মেম্বারদের ভেতর রিয়া আর ঝিনুককে প্রথম থেকেই দেখা গেছে। সমস্ত ব্যাপারটা তাদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। ওরা অবশ্য রাতে এখানে থাকে না, দুপুরে বারটা নাগাদ

খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে চলে আসে। সন্ধের পর চলে যায়।

বিনায়ক মঞ্জুলিকার কাছ থেকে ক'দিন ছুটি নিয়ে সারাক্ষণ এখানে পড়ে থাকছে। দুপুরে শুধু স্নান-খাওয়া আর পোশাক বদলানোর জন্য একবার বাড়ি গেছে।

পুরো দুটো দিন কেটে গেলে তৃতীয় দিন সকালে রিয়া আর বিনায়ককে বাড়ির কাজের লোককে দিয়ে ভেতরে ডেকে পাঠালেন নিরঞ্জন বসু। বিনায়করা অর্গানাইজেশনগুলোর কয়েকজন মহিলা সদস্যকেও তাদের সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে গেল।

নিরঞ্জন একতলার ড্রইংরুমে অপেক্ষা করছিলেন। আটচল্লিশ ঘন্টায় তাঁর চেহারা একেবারে ভেঙে-চুরে গেছে। চোখের কোণে কালি, গালে দাড়ি, চুল এলোমেলো, পোশাকে কোনোরকম পারিপাট্য নেই। বোঝা যায়, তাঁর ওপর দিয়ে নিদারুণ ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

বিনায়কদের বসিয়ে নিরঞ্জন রিয়াকে বললেন, 'একদিন তোমার এ বাড়িতে পুত্রবধূ হয়ে আসার কথা ছিল। তুমি যে আমাদের বিরুদ্ধে মুভমেন্ট শুরু করবে, কল্পনা করতে পারিনি।'

রিয়া বলল, 'আপনার ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি সেটা আমার সৌভাগ্য। যে মেয়েটা আমাকে রক্ষা করেছে তার জন্যে মুভমেন্ট তো করতেই হবে। আন্দোলন না করলে আপনি কি রূপাকে মেনে নেবেন?'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন নিরঞ্জন।

একসময় বিনায়ক বলল, 'রূপার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলুন—'

নিরঞ্জন হাতজোড় করে বললেন, 'আমাদের খুব নাম-করা বনেদি ফ্যামিলি। ওইরকম একটা মেয়েকে বাড়ির বৌ করে আনলে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনদের চোখে আমরা কোথায় নেমে যাব ভাবতে পার?'

বিনায়ক বলল, 'এই যে আমরা পুরো দুটো দিন এখানে পোস্টার-প্ল্যাকার্ড নিয়ে বসে আছি, স্লোগান দিচ্ছি, তাতে আপনাদের সম্বন্ধে কারো জানতে কিছু বাকি আছে?' একটু থেমে বলল, 'একটা মেয়েকে নিয়ে ফুর্তি করা যায়, তাকে সামাজিক মর্যাদা দিতে বড় কষ্ট, তাই না? তখন ফ্যামিলির প্রেস্টিজের ব্যাপারটা চাড়া দিয়ে ওঠে।'

নিরঞ্জনের মুখটা কালো হয়ে গেল। বললেন, 'আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। সেটা মনে হচ্ছে সবার পক্ষে ভাল হবে।'

'কী প্রস্তাব?'

'দেখ, স্নেহাশিস একটু ভুল করে ফেলেছে। তার জন্যে আমরা যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দেব।'

'কী ধরনের ক্ষতিপূরণ?'

'রূপাকে নার্সিং হোমে ভর্তি করে সামান্য একটা অপারেশন। কয়েক ঘন্টার মধ্যে লোকলজ্জার হাত থেকে সে রক্ষা পেয়ে যাবে। সব খরচ আমার । তা ছাড়া নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকাও দেব।'

'আমরা রাজি নই। কয়েক হাজার টাকা খরচ করে পার পেয়ে যাবেন, তা আমরা হতে দেব না। তা ছাড়া আদালতে স্নেহাশিসের নামে রূপা বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাকে গর্ভবতী করার অভিযোগ রয়েছে। এখন অ্যাবরশন করালে আপনাদের সুবিধা হবে কিন্তু মেয়েটার বিপদ বাড়বে। টাকা খরচ করে এবার আপনারা পার পাবেন না।'

একেবারে হতাশ হয়ে পড়লেন নিরঞ্জন। অবসন্ন গলায় বললেন, 'তা হলে আমাকে ভাবতে দাও—'

রিয়া বলল, 'ভাবুন—'

আরো দিন তিনেক পর পুরোপুরি ভেঙে পড়লেন নিরঞ্জন। বিনায়কদের ডাকিয়ে বললেন, 'তোমরা যা বলছ তাতে আমি রাজি।'

বিনায়ক বলল, 'মুখের কথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমি যা বলছি তা নিজের হাতে লিখে দিতে হবে।'

নিরঞ্জন লিখে দিলেন, রূপাকে তিনি মাসখানেকের ভেতর স্নেহাশিসের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। তার বিরুদ্ধে আদালতে যে মামলা দায়ের করেছেন, তুলে নেবেন। তবে গুলি চালাবার জান্য পুলিশ হয়তো

তাকে ছাড়বে না। সেক্ষেত্রে পুত্রবধূর পক্ষে মামলা লড়বেন এবং তাকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করবেন।

লেখা হয়ে গেলে সাক্ষী হিসেবে মহিলা অ্যাক্টিভিস্টদের কয়েকজন সই করল।

নিরঞ্জন বললেন, ' তোমাদের সব শর্তেই রাজি হয়েছি। এবার তা হলে বাড়ির সামনে থেকে অবস্থানটা তুলে নাও।'

'নিশ্চয়ই—' বলে রিয়াদের নিয়ে ঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়াল বিনায়ক। জিজ্ঞেস করল, 'আমার পুরো পরিচয়টা কি আপনি জানেন মিস্টার বসু?'

একটু অবাক হয়ে বিনায়ক বললেন, 'জানব না কেন? তুমি একজন ল'ইয়ার, রূপার কেসটা ডিফেন্ড করছ।'

'ওটা ঠিক আছে। তা ছাড়াও আমার আর একটা পরিচয় আছে। সেটা আপনার জানা দরকার।' বিনায়ক বলে, 'হরিচরণকে মনে আছে?'

নিরঞ্জন বললেন, 'কোন হরিচরণ?'

'আপনার জেনিথ ড্রাগ কোম্পানিতে যিনি চাকরি করতেন— কেমিস্ট। আপনি যাঁকে ষড়যন্ত্র করে মিথ্যে চুরির অভিযোগে জেলে পাঠিয়েছিলেন। আমি তাঁর ছেলে।'

অবরুদ্ধ গলায় নিরঞ্জন কিছু বলতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না।

বিনায়ক বলল, 'রূপাকে আপনার পুত্রবধূ করার ব্যবস্থা করে সামান্য একটু প্রতিশোধ নিলাম। এরপর আরো বড় আঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকবেন।' বলে আর দাঁড়াল না। বাইরে এসে রিয়াকে বলল, 'একটা যুদ্ধ শেষ হল। এরপর বোধহয় তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।'

পরিপূর্ণ চোখে বিনায়কের দিকে তাকাল রিয়া। তার একটা হাত ধরে বলল, 'নিশ্চয়ই হবে। তোমার মতো মানুষ আমি আগে কখনও দেখিনি।' একটু থেমে গভীর গলায় বলল, 'তোমাকে ছাড়া এখন আর কিছু ভাবতে পারি না।' বলে মিষ্টি করে হাসল। এমন হাসি মেয়েরা জীবনে মাত্র একবারই হাসে।

চারদিকে যুদ্ধ

চৈত্র মাস যায় যায়। আর ক'দিন পরেই নতুন বছর পড়ে যাবে।

উত্তরের বিশাল মাঠখানা এখন একেবারে ফাঁকা। দেড়-দু মাস আগেও রবিফসলে চারদিক ভরে ছিল। তখন যেদিকেই চোখ ফেরানো যেত—শুধু মুগ মসুর কাউন সর্ষে আর তিল। তিলের হলুদ ফুলগুলো যেন মাঠের অলঙ্কার—সেগুলোর দিকে তাকিয়ে চোখ আর ফেরানো যেত না।

কিন্তু শীতের শেষে যেই দক্ষিণ দিক থেকে ফাল্গুনের হাওয়া দিতে শুরু করল, সব ফসল গিয়ে উঠল চাষীদের ঘরে। এখন এক দানা শস্য কোথাও পড়ে নেই। শীতের পর থেকেই লাবণ্য খুইয়ে মাঠটা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে। তার গায়ে সব-হারানোর সাজ।

এখন দুপুর।

নির্জন মাঠের ওপর দিয়ে অন্যমনস্কের মতো হাঁটছিল হাসেম। উত্তরের এত বড় চকটায় সে ছাড়া আর কেউ নেই।

চকটার একধারে খাল। খালের পাড় ধরে মুত্রা অর নলখাগড়ার বন, কিছু কিছু বেতঝোপও চোখে পড়ে। চকের আরেক ধারে পিচ-ঢালা বড় সড়ক। জেলা বোর্ডের এই রাস্তাটা দু বছর আগেও ছিল কাঁচা আর নিচু, বর্ষা নামতে না নামতেই দু হাত জলের তলায় ডুবে যেত। আষাঢ় থেকে কার্তিক পর্যন্ত ডুবেই থাকত। তখন যাতায়াতের কী কষ্ট!

এই তো সেদিন দলে দলে সরকারি লোক এসে দিনরাত খেটে রাস্তাটা উঁচু করে পিচ ঢেলে বাঁধিয়ে দিয়ে গেল। তাতে চারপাশের বিশ তিরিশটা গ্রাম বেঁচে গেছে। গেল দু বর্ষা এদিকব্কার মানুষের আর কষ্ট নেই।

সড়কটা মাঠের গা ঘেঁষে পুবে-পশ্চিমে আড়াআড়ি চলে গেছে। পুব দিকে মাইল তিনেক গেলে গিরিগঞ্জের বড় বন্দর। আর পশ্চিমে গেলে গ্রামের পর গ্রাম। প্রথমেই যে গ্রামটা পড়ে তার নাম নহরপুর, তারপর একে একে তাজহাটি, রসুনিয়া, ইনামগঞ্জ, রসুলপুর, মাইনকার চর, চিতলমারি ইত্যাদি।

এখন, এই দুপুরবেলা সূর্যটা আকাশের মাঝখানে আটকে আছে। চৈত্রের সূর্য গনগনে, তীব্র। কিন্তু রোদের তাত তেমন করে গায়ে লাগে না। কেননা প্রচুর উলটো পালটা হাওয়া বইছে আজ। ধুলোর অগুনতি ঘূর্ণি পাক খেয়ে খেয়ে মাঠময় ছুটে বেড়াচ্ছে।

আকাশ ঝকঝকে, পরিষ্কার। কোথাও এক ফোঁটা মেঘ নেই। উজ্জ্বল নীল প্রকাণ্ড একখানা আয়না কেউ যেন মাথার ওপর টাঙিয়ে রেখেছে।

হাসেম কখনও আলের ওপর দিয়ে হাঁটছিল, আবার একটু পরেই হয়তো মাঠে নেমে যাচ্ছিল।

তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মুখ লম্বাটে, নাকটা খাড়া কপাল থেকে নেমে এসেছে। চোখ দুটো বড় সরল আর নিষ্পাপ। এক পলক দেখেই টের পাওয়া যায়, জগতের কোনো কিছুকে সে অবিশ্বাস করতে শেখে নি। রং একসময় টকটকে ছিল, রোদে পুড়ে জলে ভিজে এখন তামাটে। গা থেকে খই উড়ছে। হাত-পা ফাটা ফাটা। এক মাথা রুক্ষ চুল জটপাকানো, তেল আর চিরুনির সঙ্গে কোনোকালেই ওগুলোর সম্পর্ক নেই।

এই মুহূর্তে হাসেমের পরনে সবুজ লুঙ্গি আর আধছেঁড়া ময়লা নিমা (ফতুয়ার মতো জামা)।

হাসেমের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, শুধু বেঁচে থাকার জন্য আজন্ম তাকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। সেই সব যুদ্ধের স্থায়ী ছাপ তার সারা গায়ে মারা রয়েছে।

উত্তরের এই চকে যখন তখন চলে আসে হাসেম। মাঠটার সঙ্গে তার বাঁচা-মরা জড়িয়ে আছে। কিন্তু সে সব পরের কথা।

আজ সে এখানে এসেছিল শাকপাতার খোঁজে। ঘরে কয়েক দানা চাল ছাড়া আনাজপাতি কিছু নেই। ধর্মজাল নিয়ে খালে নামলে দু-একটা নলা কি বেলে মাছটাছ সে খুব সহজেই ধরে ফেলতে পারত। কিন্তু সকাল থেকে তাকে এমন আলস্যে ধরেছিল যে হাত-পা নাড়তে ইচ্ছা করছিল না। গোঁসাইদের পুবের ঘরের দাওয়ায় দুই হাঁটুর মাঝখানে থুতনি ডুবিয়ে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসেই থেকেছে। ভুবন গোঁসাইর মা, যাকে সে ঠাকুরমা বলে, মাঝে মাঝেই তাড়া দিয়েছে, 'কি রে হাসমা,

আইজ তমস্ত দিন (সারা দিন) বইসা বইসাই কাটাইয়া দিবি? হাতে পায়ে রস নাইমা যাইব যে।'

হাসেম হেসেছে, 'আইজ আর কিছু করতে ইচ্ছা করে না ঠাকুরমা। মনে লয় খালি বইসা থাকি।'

ভুবন গোঁসাইর মাও হেসেছে, 'বুঝছি, তরে আইলসামিতে (আলসেমি) পাইছে, তয় বইসাই থাক। আমার লগে তর চাউল নিমু?' মাসের ভেতর বিশ দিনই ভুবন গোঁসাইর মা তার ভাত রেঁধে দেয়।

হাসেম তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, 'আইজ থাউক ঠাকুরমা, আইজ তো বাড়িতেই আছি। নিজেরটা নিজে রাইন্ধা লমু নে (নেব'খন)।' তারপর রাঁধতে গিয়ে দ্যাখে চাল ছাড়া আর কিছু নেই। দু-একটা মাছ সে ধরে নিতে পারত। কিন্তু মাছ ধরলেই কাট রে, কোট রে, ধোও রে। সে অনেক ঝঞ্ঝাট। অথচ শুধু ভাত তো আর গলা দিয়ে নামানো যায় না। অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত হাসেম চলে এসেছে উত্তরের চকে। এক মুঠো শাক তুলে এনে ভেজে ভুজে নেবে।

আলের ধারে ঘাসের সঙ্গে প্রচুর জলসেঁচি শাক হয়ে আছে। একটু দূরে খালের পাড়ে আছে হেলেঞ্চা আর গীমা শাক।

মাথার ওপর ঝাঁক ঝাঁক পাখি উড়ছিল—শালিক চড়াই চিল বুনো টিয়া। উড়তে উড়তে পাখিরা হঠাৎ হঠাৎ ফাঁকা মাঠে নেমে আসছিল, ঠোঁট দিয়ে মাটি ঠুকরে দেখছিল, কিন্তু বৃথাই। কেউ তাদের জন্য এক দানা শস্যও ফেলে রেখে যায় নি।

অস্পষ্টভাবে পাখি দেখতে দেখতে হাসেম একবার ভাবল, জলসেঁচি শাক নিয়ে যাবে। তারপরেই ঠিক করল জলসেঁচি না, হেলেঞ্চাই ভাল। জলসেঁচিতে কেমন যেন একটা বুনো বুনো গন্ধ।

হেলেঞ্চা তুলবার জন্য খালের দিকে ঘুরতে যাবে, সেই সময় শব্দটা কানে এল হাসেমের।

প্রথমটা মনে হল ঝড়ের শব্দ। কিন্তু চৈত্রমাসের এই দুপুরে আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার, কোথাও এক ছিটে মেঘ নেই, বাতাসের ভাবগতিকও এমন না যে ঝড় উঠতে পারে।

চমকে একবার সামনে তাকাল হাসেম, একবার পেছনে। তারপর দূরে পিচ-ঢালা সড়কটার দিকে চোখ পড়তেই তার বুকের ধুকপুকানি বন্ধ হয়ে গেল।

সড়কটা ধরে পুব দিকে সোজা খানিকটা গেলে একটা উঁচু বাঁধানো পুল। সেই পুল পেরিয়ে বার চোদ্দটা কালচে সবুজ রংয়ের ট্রাক এদিকেই আসছে। দেখেই হাসেম চিনতে পারল, ওগুলো খান সেনাদের গাড়ি।

গিরিগঞ্জের বন্দর থেকে 'গয়নার নৌকো'য় এক দুপুরের পথ গেলে জামতলি—বেশ বড়সড় এক শহর। সেখানে মিলিটারিদের বিরাট ছাউনি আছে। তিন বছর আগে একবার জামতলিতে গিয়েছিল হাসেম; ওখানেই খান সেনাদের কালচে সবুজ রংয়ের নানা গাড়ি দেখে এসেছে। সেই থেকে মিলিটারি ট্রাক দেখলেই সে চিনতে পারে।

গাড়িগুলো পুলের ওপর দিয়ে যখন আসছিল, গুম গুম আওয়াজ হচ্ছিল। আচমকা শব্দটা শুনে হাসেমের মনে হয়েছিল—ঝড়।

পুল পেরিয়ে মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে ট্রাকগুলো এখন এদিকেই ছুটে আসছে।

চোখের তারা স্থির করে তাকিয়েই ছিল হাসেম। সে না পারছিল এগুতে, না পিছিয়ে যেতে। তার পা দুটো পেরেক ঠুকে কেউ যেন মাটির সঙ্গে আটকে দিয়েছে। কী করবে হাসেম ভেবে উঠতে পারছিল না। আসলে ভাবনার শক্তিটাই তার অসাড় হয়ে গেছে।

ট্রাকগুলো যখন আরো কাছে এসে পড়ল, সেই সময় হাসেমের রক্তের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চমকানির মতো খুব দ্রুত কী খেলে গেল। সে শুনেছে, আজকাল খান সেনারা যেখানে যাচ্ছে, সেখানেই দোজখ নেমে আসছে। গ্রামের পর গ্রাম ওরা জ্বালিয়ে দিচ্ছে, মানুষ দেখলেই গুলি করছে, কাঁচা বয়সের যুবতী মেয়েদের ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পরে দেখা যাচ্ছে তাদের ক্ষতবিক্ষত লাশ পড়ে আছে মাঠেঘাটে কি খালপাড়ের হোগলা বনের ধারে। আর চলছে লুটপাট। সোনাদানা টাকাপয়সা থেকে থালাঘটিবাটি যা চোখে পড়ছে গাড়ি বোঝাই করে তুলে নিচ্ছে।

গিরিগঞ্জ বন্দরের গা ঘেঁষে যে নদীটা, তার নাম ধলেশ্বরী। হাসেম শুনেছে, নদীর ওপারে একটা গ্রামও নাকি আর মাথা তুলে নেই, খানের বাচ্চারা পুড়িয়ে জ্বালিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। কত লোক ওরা মেরেছে, কেউ বলতে পারে না। ওখানে রাস্তায় রাস্তায় মরা মানুষের পাহাড়। হাজার

হাজার শকুন আর শিয়াল দিনরাত মানুষের মাংস খেয়ে যাচ্ছে। যে দু'চারজন কোনোরকমে বাঁচতে পেরেছিল, দেশ ছেড়ে কোথায় পালিয়ে গেছে।

খবর পাওয়া যাচ্ছিল, খান সেনারা খ্যাপা কুত্তার মতো চারদিক টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। যখন যে গ্রামে খুশি ঢুকে পড়ছে। আজ তারা ধলেশ্বরীর এ পারে গিরিগঞ্জ বন্দরের নিচের দিকটায় চলে এসেছে।

হায় আল্লা, কী হবে তাদের? পর পর ওই গ্রামগুলো—নহরপুর রসুনিয়া তাজহাটি মাইনকার চর—কি আর আস্ত থাকবে?

শিক্ষিত ভদ্র মানুষের মতো গুছিয়ে টুছিয়ে সুষ্ঠুভাবে ভাবতে শেখে নি হাসেম। এই মুহূর্তে এলোমেলোভাবে তার যা যা মনে হচ্ছিল, সেগুলো সাজিয়ে নিলে এইরকম দাঁড়ায়।

এই সব গ্রাম কি একদিনে গড়ে উঠেছে? দুনিয়ার এক কোণে এক এক টুকরো ভূখণ্ড ঘিরে কতকাল ধরে মানুষ কত মায়ায় ঘর বাড়ি সংসার জনপদ সৃষ্টি করেছে। বংশানুক্রমে আপন সন্তান সন্ততির মধ্যে রেখে যাচ্ছে অন্তহীন জীবনের স্রোত। দেশভাগের পর ক'টা বছর গোলমাল অবশ্য হয়েছে। বহু মানুষ সাত পুরুষের ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে কলকাতা না আসাম কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। দুঃস্বপ্নের মতো সেই বছর ক'টা বাদ দিলে এদিকের মানুষ বড় শান্তিতে আছে। রয়ানি গান, গাজীর গীত, নীলপূজা আর বাস্তুপূজার ঢাকের বাদ্যি, মাঘমণ্ডলের ব্রত, ঈদের দিনের দাওয়াত, বড় নদীতে বাইচ খেলা, সবই আবহমান কালের নিয়মে চলে আসছে। এ সব গ্রাম বড় লাবণ্য দিয়ে ঘেরা।

কিন্তু দোজখের সরীসৃপেরা আজ এখানে হানা দিয়েছে। চোখের পলক পড়তে না পড়তেই কত যত্নে সাজানো ওই সব গ্রাম পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে, যুগ যুগান্ত ধরে জীবনের যে প্রবাহ বয়ে আসছে তা যাবে স্তব্ধ হয়ে।

হঠাৎ তাদের নহরপুর গ্রামের সব চাইতে বড় ধানী মহাজন মোতালেফ হোসেন চৌধুরি সাহেবের ছোট ছেলে শফিকুলের কথা মনে পড়ে গেল হাসেমের।

বিশ বাইশ বছরের তাজা জোয়ান ছেলে শফিকুল। কী তার গায়ের বন্ন, কী বা চোখ মুখ! সব সময় ছেলেটা যেন টগবগ করে ফুটছে। অথচ মুখে হাসি ছাড়া কথা নেই।

ঢাকার কলেজে সে এম.এ, বি.এ পড়ে। টাকা পয়সাওলা বড় ঘরের ছেলে, কত লেখাপড়া জানে। তবু এক ফোঁটা দেমাক নেই। ছুটিছাটায় ঢাকা থেকে নহরপুর এলে এ বাড়ি যায়, ও বাড়ি যায়। ডেকে ডেকে হেসে সবার সঙ্গে কথা বলে। এমন যে হাসেম, যার বাড়ি নেই, ঘর নেই, জমি নেই, জেরাত নেই, খোদাতাল্লার দুনিয়ায় সব চাইতে গরিব—তার সঙ্গেও দু দণ্ড দাঁড়িয়ে গল্প করে।

সেই শফিকুল ক'দিন আগে রাত্তিরবেলা হঠাৎ ঢাকা থেকে নহরপুরে চলে এসেছিল। এসেই সারা গ্রামের মানুষকে তাদের বাড়ি ডাকিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সবার সঙ্গে হাসেমও গেছে সেখানে।

গ্রামের লোকেরা অবাক, এভাবে তো কখনও ডকে না শফিকুল!

চিরদিনের হাসিখুশি প্রাণবন্ত ছেলেটাকে সেদিন চেনা যাচ্ছিল না। ভিড়ের ভেতর থেকে পলকহীন তাকিয়ে তাকিয়ে হাসেম দেখেছে, শফিকুলের চোখ দুটো লাল টকটকে, চুল উস্কখুস্ক, গাল ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেছে, মুখময় কয়েক দিনের দাড়ি, কণ্ঠার হাড় গজালের মতো ঠেলে বেরিয়েছে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছিল তাকে।

এর আগে শীতকালে একবার ঢাকা থেকে নহরপুরে এসেছিল শফিকুল। তখনও কী সুন্দর চেহারা তার! কী চমৎকার স্বাস্থ্য! ক'দিনের মধ্যে কী এমন হল যাতে তার শরীর এত ভেঙে পড়েছে!

শফিকুল সম্বন্ধে হাসেমের মনে এক ধরনের বিস্ময় আছে। সেই বিস্ময়ের সঙ্গে শ্রদ্ধা আর সম্ভ্রম মেশানো। তার কারণ শফিকুল ঢাকা শহরে থেকে পড়ে। কোনোদিন ঢাকায় যায় নি হাসেম। তার দৌড় বড় জোর ধলেশ্বরীর ওপারে জামতলি পর্যন্ত, তাও মোটে একবারই সেখানে গেছে সে। যেতে হলে 'গয়নার নৌকা'য় উঠতে হবে। যাতায়াতের খরচা লেগে যাবে দু টাকা দু টাকা চার টাকা। অত টাকা কোথায় পাবে সে? বার বার জামতলি যাবার সৌখিনতা তার অন্তত মানায় না। পুবে গিরিগঞ্জের বন্দর, পশ্চিমে নহরপুরের বড় হাট, উত্তরে বিলের রাজ্য রসুলপুর, মাইনকার চর আর দক্ষিণে ধলেশ্বরীর বাঁক—জীবনের চল্লিশটা বছর এর মধ্যেই কেটে গেছে তার।

হাসেম শুনেছে, ঢাকা জবর শহর। সেটা যে কত বড়, তার ধারণায় আসে না। সেখানে নাকি

কাতারে কাতারে বাড়ি। সে সব বাড়ি কি ছ্যাঁচা বাঁশ আর ছিটে বেড়ার? দস্তুরমতো পাকা দালান। একশ হাত দুশ হাত করে একেকটা উঁচু। সেগুলোর মাথা আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। শুধু কি বাড়িই, গাড়িও কাতারে কাতারে। পিঁপড়ের জাঙ্গালের মতো গাড়ি। তার ওপর আছে মানুষ। ওই যে কথায় বলে মানুষের মাথা মানুষে খায়, এ হচ্ছে তাই। পাকিস্তান হবার পর ঢাকা শহরে মানুষ যাচ্ছেই, যাচ্ছেই। তাদের এই ঢাকা জেলা, ফরিদপুর জেলা, বরিশাল খুলনা যশোর জেলা, আরো দূরে চাটগাঁ-নোয়াখালি-ময়মনসিং জেলার মানুষ তো আছেই। দুনিয়ার নানা রাজ্য থেকেও নাকি মানুষ এসেছে। এমন কি ধলা ফকফইকা সাহেব-মেমরাও যে কত এসেছে! হাসেমের বড় ইচ্ছা, একবার গিয়ে ঢাকা শহরটা দেখে আসে। কিন্তু সে সাধটা এখনও মেটে নি।

তার সেই স্বপ্নের শহরে থাকে শফিকুল। তাদের নহরপুরের শুধু কেন, আশেপাশের দশ-বিশটা গ্রামের মধ্যে একমাত্র শফিকুলই ঢাকায় থেকে পড়ে। সে যখন ছুটিতে আসে, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে হাসেম। ঢাকা থেকে কী রহস্য সারা গায়ে মেখে এনেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তা দেখতে চেষ্টা করে।

সেদিন রাত্রিবেলা সবাইকে ডেকে শফিকুল বলেছিল, সর্বনাশ হয়ে গেছে। খান সেনারা হাজার হাজার মানুষকে গুলি করে মেরেছে, কামানের গোলায় মহল্লার পর মহল্লা উড়িয়ে দিয়েছে। মুজিবর রহমান সাহেবকে ধরে নিয়ে গেছে। মেয়েদের ইজ্জত বলতে আর কিছু নেই। সারা ঢাকা শহর যেন এক বিশাল কবরখানা। দিনের বেলাতেও সেখানে শিয়াল ঘুরছে, অগুনতি শকুন উড়ছে মাথার ওপর। মরা মানুষ পচে পচে ঢাকার বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। শুধু কি ঢাকায়, শহরের চারপাশের গ্রামগুলোতেও নরক নামিয়ে এনেছে খান সেনারা।

শফিকুল বলে যাচ্ছিল, 'খানের বাচ্চারা যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় হানা দিতে পারে। কাজেই হুঁশিয়ার। শেখ সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। সেই স্বাধীনতা জান দিয়ে হলেও রক্ষা করতে হবে। ঘরে ঘরে অস্ত্র বানাও, লড়াইয়ের জন্য তৈরি হও। আর সবাই নজর রাখবে জানোয়ারের বাচ্চারা কোন পথ দিয়ে আসছে। দেখতে পেলেই গ্রামে এসে খবর দেবে।'

শফিকুলের কথা কিছুটা বুঝেছে হাসেম, বেশির ভাগটাই দুর্বোধ্য থেকে গেছে। দেশের খবর সে বিশেষ রাখে না। শুধু প্রাণে বেঁচে থাকার জন্য জলে-স্থলে তাকে নিয়ত এত যুদ্ধ করতে হয় যে, তারপর আর কোনোদিকে তাকাবার সময় থাকে না।

তবে ঢাকায় যে সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা হয়েছে, গোলাগুলি চলেছে, অনেক মানুষ মরেছে— আবছাভাবে এ সব খবর আগেই কানে এসেছিল হাসেমের। গিরিগঞ্জের বন্দর, রসুলপুরের গঞ্জ কিংবা ইনামগঞ্জের হাট—যেখানেই সে গেছে শুধু ঢাকার কথা।

দুনিয়ার খবর তেমন একটা না রাখলেও মুজিবর সাহেবের নাম সে শুনেছে। আর শুনেছে হক সাহেব, জিন্না সাহেব এবং ভাসানি সাহেবের নাম। তবে মুজিবর রহমান ছাড়া আর কাউকে চোখে দেখে নি। মুজিবর সাহেবকেও সে দেখেছে মাত্র একবার। মাস কয়েক আগে এদিকে ভোট হয়ে গেছে। তারও কিছু দিন আগে মুজিবর সাহেব গিরিগঞ্জের বন্দরে এসে 'মিটিন' করেছিলেন। আশেপাশের গ্রামগুলোতে একটা মানুষও ঘরে ছিল না, সব ছুটেছিল গিরিগঞ্জে। মৃধা বাড়ির রমজান, নিকারি পাড়ার গয়জদ্দি, আনিসুর, তালেব আর বারুইবাড়ির নিবারণের সঙ্গে হাসেমও গিয়েছিল। কী মানুষ, কী মানুষ! বন্দরের ডান পাশে নদীর ধার ঘেঁষে অত বড় মাঠটায় একটা কুটো ফেলবার জায়গা ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তান, অবিচার, পূর্ববঙ্গের দাবি—এই রকম কত কথা বলে গিয়েছিলেন শেখ সাহেব। তার একটা বর্ণও ভাল করে বোঝে নি হাসেম। হাঁ করে বড় বড় চোখ মেলে সে শুধু তাকিয়ে থেকেছে।

সেই শেখ সাহেবকে নাকি খানের বাচ্চারা ধরে নিয়ে গেছে।

যাই হোক, শফিকুল বলবার পর একটা সুপারি গাছ আর বাঁশ ঝাড়ও আস্ত রইল না, সব লাঠি এবং সড়কি হয়ে গেল। আরো দেখা গেল নহরপুর রসুলপুর মাইনকার চর ইনামগঞ্জ—চারদিকের গ্রামগুলোর যত জোয়ান ছেলে মেয়ে, সব লাঠিখেলা ছোরাখেলা শিখছে। নহরপুর গ্রামে মতিউর সাহেব, মোতালেফ হোসেন চৌধুরি, আতিকুল ইসলাম আর কামরুল হাসান সাহেবদের বন্দুকের লাইসেন্স আছে। ওঁদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা তো বটেই, ওঁদের বন্দুক নিয়ে গ্রামের অন্য ছেলেমেয়েরাও গুলি চালানো শিখেছে। আর কী আশ্চর্য, গ্রামে গ্রামে ঘুরে যিনি বন্দুক চালানো শিখিয়েছেন তিনি আর কেউ নন—

স্বয়ং গিরিগঞ্জ থানার বড় দারোগা আলতাফ আলি সাহেব।

হাসেম দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। যত দেখেছে ততই অবাক হয়েছে। আর কী এক অজানা অদ্ভুত ভয়ে বুকের ভেতরটা থর থর করে কেঁপেছে। তার কেন যেন মনে হয়েছে, কিছু একটা ঘটবে, ভয়ঙ্কর কিছু—সাংঘাতিক কিছু।....

মিলিটারি ট্রাকগুলো এতক্ষণে অনেক কাছে এসে গেছে। গাঁ গাঁ আওয়াজে চমকে উঠল হাসেম।

শফিকুল বলেছিল, খানের বাচ্চাদের গাড়ি দেখলেই যেন গ্রামে খবর দেওয়া হয়। কিন্তু হাসেম নহরপুর যাবে কিভাবে? ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে গেলে নির্ঘাত সে খানদের চোখে পড়ে যাবে। ওদের হাতে গুলি আছে, বন্দুক আছে। একবার যদি তাকে দেখে ফেলে তারপর যে কী হবে, ভাবতেও সাহস হল না হাসেমের।

তা ছাড়া ওরা যাচ্ছে গাড়িতে। হাসেম নহরপুর যাবার আগেই ওরা সেখানে পৌঁছে যাবে।

ট্রাকগুলো যখন আরো কাছাকাছি এসে যায়, হাসেম আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। এই মুহূর্তে না পালালে নিশ্চয়ই সে খানেদের চোখে পড়ে যাবে। আচমকা অলৌকিক শক্তির মতো কিছু একটা ধাক্কা মারতে মারতে খালের দিকে উড়িয়ে নিয়ে গেল তাকে। চোখের পলক পড়তে না পড়তেই হাসেম দেখল চৈত্র মাসের মজা খালের ওপর দিয়ে সে মুত্রা বনের ভেতর ঢুকে পড়েছে।

এই ঘন জঙ্গলের ভেতর থেকে খানের বাচ্চারা এ জন্মে তাকে খুঁজে বার করতে পারবে না। তবু হাসেমের বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ছিল যেন। হাত-পায়ের জোড় আলগা আলগা হয়ে আসছিল। শিরদাঁড়াটা আর শক্ত নেই, নরম হয়ে বেঁকে চুরে যাচ্ছে। তবু শরীরের সবটুকু শক্তি হাঁটুতে জড়ো করে দাঁড়িয়েই থাকল সে, মুত্রার মসৃণ কালো কালো ডাঁটাগুলো ফাঁক করে বড় সড়কটার দিকে তাকিয়ে রইল। হায় খোদাতাল্লাহ, এবার যে কী হবে!

হাসেম আর ভাবতে পারছিল না। চৈত্র মাসের উজ্জ্বল রোদ তার চোখের সামনে যেন দ্রুত নিভে যেতে লাগল। আর তারই মধ্যে সে দেখতে পেল, মিলিটারিদের গাড়িগুলো ধোঁয়া উড়িয়ে পশ্চিম দিকের ঘন গাছগাছালির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ওরা নহরপুর গ্রামের মধ্যে ঢুকে গেল।

নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়েই থাকল হাসেম।

মুত্রাবনে এই চৈত্র মাসেই ফুল এসে গেছে। কুচকুচে কালো মসৃণ সতেজ গাছগুলোর মাথায় সাদা সাদা ফুলগুলোতে অল্প অল্প মিষ্টি গন্ধ। ঝাঁক ঝাঁক মৌমাছি আর প্রজাপতি সেগুলোর ওপর উড়ে বেড়াচ্ছিল। পেছন দিকে জঙ্গল যেখানে খুব ঘন সেখান থেকে ঝিঁঝিদের কান্না উঠে আসছিল। ঝিল্লিস্বর একটানা অনেকক্ষণ চলবার পর হঠাৎ থেমে যায়, তারপর আবার নতুন করে শুরু হয়। কোথায় যেন ডাহুক ডাকছিল। পেট টেনে টেনে সর সর করে সোনালি গোসাপেরা চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, আর আছে নানা রকমের পোকামাকড়, পতঙ্গ। তারা হাসেমের গায়ে উড়ে উড়ে পড়ছিল।

কিন্তু কাছের কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না হাসেম, কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না। মুত্রাবনের ফাঁক দিয়ে চোখ টান করে সে দূর নহরপুর গ্রামটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

গাছপালার আড়াল খুব ঘন বলে এই মুত্রাবন থেকে গ্রামটাকে পুরোপুরি দেখা যায় না। শুধু শোভান আলিদের উঁচু ভিতের ওপর বড় বড় সাতাশের বন্দের ঘরগুলোই যা চোখে পড়ে। এই বছরই অঘ্রান মাসে ধান ওঠার পর নতুন ঢেউ-টিন দিয়ে ঘরগুলো ছেয়ে নিয়েছে শোভান আলিরা। এখন, এই চৈত্রের দুপুরে নতুন টিনের চালগুলো থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে।

কতক্ষণ আর, একটু পরেই নহরপুরের দিক থেকে গুলির আওয়াজ আসতে লাগল—বুম বুম বুম—

গুলি চলছে তো চলছেই। সেই সঙ্গে অসংখ্য মানুষের চিৎকার চৈত্রের বাতাসে ভেসে আসতে থাকে। আরো কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, সমস্ত নহরপুর গ্রামটা থেকে ধোঁয়া উঠছে। দুপুরবেলার ধারাল রোদে আগুন দেখা যাচ্ছে না। তবু বোঝা যায়, খানের বাচ্চারা গ্রামটা জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

অসহায় ভীত মানুষের চিৎকার আর গুলির শব্দ ছাড়া এখন আর কিছু নেই।

এ দিকে মুত্রাবনে ঝিঁঝির ডাক থেমে গেছে, ডাহুক আর কোড়া পাখিরা এখন একেবারেই চুপ। মৌমাছি আর প্রজাপতিগুলো উধাও। পোকামাকড়েরা ওড়াউড়ি বন্ধ করে দিয়েছে। পেট টেনে টেনে গোসাপেরা এখন আর চলছে না। এমন কি উত্তরের চকে টুকরো টুকরো রঙিন কাগজের মতো নানারঙের

যে পাখিগুলো উড়ছিল তাদেরও আর দেখা যাচ্ছে না। ওরা কিছু একটা টের পেয়েছে—নিদারুণ, ভয়ঙ্কর কিছু।

বুকের ভেতর সেই যে নিশ্বাসটা আটকে গিয়েছিল সেটা আটকেই আছে। কিছুতেই আর তা বার করে দিতে পারছে না হাসেম। নিবিড় মুত্রাবনে ভয়ে আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সে ভাবতে চেষ্টা করল, এই মুহূর্তে তাদের নহরপুর গ্রামটায় কী চলছে। কিন্তু তার কল্পনা খুব বেশি দূর এগুলো না। হাসেমের কল্পনাশক্তি ভারি দুর্বল।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, হুঁশ নেই। কখন সূর্যটা আকাশের ঢালু গা বেয়ে বেয়ে পশ্চিমের উঁচু উঁচু চাপ-বাঁধা গাছপালার ওধারে নেমে গেল, কে জানে।

সেই দুপুরবেলা হাসেম যখন উত্তরের চকে জলসেঁচি কি হেলেঞ্চ শাক কুড়োতে এসেছিল সেই সময় রোদ ছিল গলা কাঁসার মতো। সূর্য ডুবে যাবার পর যে মরা মরা মলিন আলোটুকু এখন গাছপালার মাথায় আটকে আছে তার রং যেন বাসি হলুদ। চৈত্র মাসের শেষ বেলাটা খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

সকালবেলা ভুবন গোঁসাইর মা বুড়ি স্বর্ণময়ী তাকে এক ডালা মুড়ি, দুটো নারকেল ছাপা আর সাত-আটটা তিলের নাড়ু খেতে দিয়েছিল। ওইটুকু ছাড়া সমস্ত দিন পেটে আর কিছুই পড়েনি। চানও হয়নি।

নিয়ম অনুযায়ী এতক্ষণে তার পেট জ্বলে যাবার কথা। কিন্তু দুপুরে খানের বাচ্চারা নহরপুরে ঢুকবার পর খিদে টিদের কথা আর মনে নেই হাসেমের। শরীরের সবরকম অনুভূতিই তার অসাড় হয়ে গেছে। শুধু মাঝে মাঝে সে টের পাচ্ছিল, গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ঢোক গিলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল।

গুলির শব্দ এখনও শোনা যাচ্ছে, তবে আগের মতো অত বেশি আর একটানা নয়। থেমে থেমে—কিছুক্ষণ পর পর। গাছপালার ওপর দিয়ে গল গল করে যে ধোঁয়া উঠছিল এখন আর তা দেখা যাচ্ছে না। তবে খানেরা হানা দেবার পর একটা ব্যাপার চোখে পড়েছে হাসেমের। নহরপুরের দিক থেকে যত রাজ্যের কুকুর আর শিয়াল আর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি বেরিয়ে এসে উত্তরের চকের ওপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়েছিল।

দিনের আলো আরো ঝাপসা হয়ে এলে হাসেম দেখতে পেল, মিলিটারি ট্রাকগুলো নহরপুরের ঘন গাছপালার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। ওরা যত কাছে এগিয়ে আসছিল, গাঁ গাঁ শব্দের সঙ্গে তীক্ষ্ণ বুক ফাটানো মেয়ে-গলার চিৎকার শোনা যাচ্ছিল, 'বাচাও—বাচাও—'

মুত্রাবনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শিউরে উঠল হাসেম। তার চোখে পড়ল গাড়ি বোঝাই করে লুঠের মাল আর অনেকগুলো যুবতীকে ইবলিশেরা নিয়ে যাচ্ছে। প্রায় সবাইকেই চিনতে পারল হাসেম। শফিকুলের বোন নাজিমা, শোভান আলির দুই মেয়ে কামরণ আর জুলেখা, বারুই বাড়ির পাখি আলো আর কাজল, মতিউর রহমান সাহেবের দুই ভাতিজি। তা ছাড়া রসুলপুর ইনামগঞ্জ মাইনকার চর তাজহাটির অনেকগুলো মেয়েও আছে। চারপাশের বিশ পঁচিশটা গ্রামে যত মানুষ তাদের সবাইকে শুধুই চেনেই না হাসেম, অনেকের নামও জানে।

জেলা বোর্ডের এই লম্বা সড়কটা গিরিগঞ্জের বন্দর থেকে নহরপুরের ভেতর দিয়ে সোজা মাইনকার চর পর্যন্ত চলে গেছে। মেয়েগুলোকে দেখে টের পাওয়া যাচ্ছে খানের বাচ্চারা মাইনকার চর পর্যন্ত গিয়েছিল। 'হায় আল্লা, কী হইব এই মাইয়াগুলির, কী হইব!' নিজের মনে মনেই ফিস ফিস করে হাসেম, 'কে অগো বাচাইব?'

গ্রামের মেয়ে, ওদের জন্মের পর থেকে দেখে আসছে। কেউ তাকে চাচা ডাকে, কেউ ভাই, কেউ মামু। নাকমুখ দিয়ে হলকা ছুটতে লাগল হাসেমের। একবার তার ইচ্ছা হল মিলিটারি ট্রাকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েদের ছিনিয়ে আনে। আর তখনই চোখে পড়ল, খানের বাচ্চাদের হাতে বন্দুক আর আরো সাঙ্ঘাতিক চেহারার সব অস্ত্র।

মাথার ভেতর হঠাৎ চরকির মতো কী ঘুরে গেল হাসেমের। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। সারা দিন পেটে ভাত পড়ে নি, চান হয়নি। তার ওপর ঠাটা-পড়া রোদে সারা দুপুর চোখ টান করে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছে। ভয়ে ক্লান্তিতে আতঙ্কে দুর্বল শরীর নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল হাসেম।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে মুত্রাবন ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেল। চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। তারই মধ্যে ট্রাকের শব্দ এবং মেয়েদের চিৎকার হাসেমের কানে দ্রুত অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল।

দুই

মুত্রাবনে কতক্ষণ পড়ে ছিল, হাসেমের মনে নেই। জ্ঞান যখন ফিরল, সন্ধে হয়ে গেছে।

আবার চারদিকে ঝিঁঝিদের ডাক শুরু হয়েছে। থেকে থেকে ঝোপের গভীর থেকে ডাহুক ডাকছিল। আর জ্বলছিল জোনাকি। মুত্রাবনে, পাশের শর এবং নলখাগড়ার ঝোপে, খালপাড়ের হেলেঞ্চার দামে লাখ লাখ আলোর পোকা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

চৈত্রের শেষ বলে সন্ধের সঙ্গে সঙ্গে ঝপ করে অন্ধকার নেমে যায়নি। দিনের আলোর একটু-খানি আভা এখনও আলতোভাবে চারদিকে লেগে আছে।

প্রথমটা হাসেম ভাবতে পারল না, এই মুত্রাবনে সে কেমন করে এল। তারপরেই দ্রুত সব কথা মনে পড়ে গেল।

জেলা বোর্ডের সড়কে এখন আর মিলিটারি ট্রাকগুলো দেখা যাচ্ছে না। কখন যেন দূরের উঁচু পুল পেরিয়ে সেগুলো গিরিগঞ্জ বন্দরের দিকে চলে গেছে।

আস্তে আস্তে হাতের ভর দিয়ে উঠে পড়ল হাসেম, মুত্রার জঙ্গল ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর কচুরিপানায় ঠাসা মজা খাল পার হয়ে এসে উঠল উত্তরের চকে।

নহরপুরে হাসেমের কেউ নেই। না বাপ, না মা, না একটা ভাই। আত্মীয়স্বজন বলতেও কেউ না। খোদাতাল্লার এতবড় দুনিয়ায় সে একা, একেবারে একা।

নিজের কেউ না থাক, নহরপুরের সঙ্গে তার হাজার নাড়ির যোগ। ওখানে জন্মেছে সে, জীবনের চল্লিশটা বছর ওখানেই কেটে গেল। ওই নিকারিরা মৃধারা কামাররা বারুইরা যুগিরা—রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও ওরাই তার আপনজন। তা ছাড়া আছে ভুবন গোঁসাইর মা বুড়ি স্বর্ণময়ী। তার সঙ্গেই হাসেমের সম্পর্কটা ক'বছর ধরে সব চাইতে গভীর।

এ পারে বুড়ির কেউ নেই। দেশখানা দুই টুকরা হবার পর ক'বছর পর ভুবন গোঁসাই স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে সীমান্তের ওপারে সেই কতদূরে কইলকাতার শহরে চলে গিয়েছিল। বুড়ি কিন্তু যায় নি, দেশের বাড়ির মাটি কামড়ে পড়ে আছে। কত রায়ট গেছে, কত রক্তারক্তি, কত হাঙ্গামা আর উত্তেজনা—বুড়িকে কিন্তু এক চুল নড়ানো যায়নি। দেশের বাড়িঘর, জমি জমা, ফলপাকড় পাহারা দেয় বুড়ি।

ভুবন গোঁসাইদের জমিজমা কি একটুখানি ছিল! তিন কানি জমির ওপর বাড়ি, দু'তিনটে বড় বড় দীঘির মতো পুকুর, বাগ বাগিচা, নব্বই কানি দোফসলা জমি। অবশ্য অতখানি জমিজমা এখন আর নেই। হিন্দুস্থানে যাবার আগে ভুবন গোঁসাই কিছু বেচেছে। তারপর এক একটা রায়ট হয়েছে—শোভান আলিরা, ইসমাইল ভুঁইয়ারা খানিকটা খানিকটা করে জমি কেড়ে নিয়েছে। এখন পাঁচ সাত কানির বেশি নাবাল খেত ছাড়া আর কিছুই নেই। ওতেই বুড়ির কোনোরকমে চলে যায়। অবশ্য বাড়ি আর পুকুরগুলো আছে।

আগে আগে যখন জমিজমা বেশি ছিল, ধানপাট বেচে হুন্ডি করে বুড়ি কলকাতায় টাকা পাঠাত। মাঝে মধ্যে ভুবন গোঁসাইও দেশে আসত। তবে সেবার হিন্দুস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধবার পর আর আসে নি ভুবন গোঁসাই। আজকাল চিঠি পত্তরেই মায়ের খোঁজখবর রাখে। অনেক সময় হাসেম অবাক হয়ে ভেবেছে, মা হল এক দেশের মানুষ, ছেলে আরেক দেশের। এ জন্মে মায়ে-পোলায় আর কি দেখা হইব?

অতবড় বাড়িতে খান পাঁচেক বড় বড় পঁচিশের বন্দের ঘর ভুবন গোঁসাইদের। সেখানে একা একা বুড়ি কী করে থাকে? এখান থেকে যাবার আগে হাসেমকে ডেকে একটা ঘর দিয়ে গেছে ভুবন গোঁসাই। তাতে দু'জনেরই সুবিধে হয়েছে। ভুবন গোঁসাইর মা একটা সঙ্গী পেয়ে বেঁচেছে। মানুষই হচ্ছে বল ভরসা, হাসেমকে পেয়ে বুড়ির সাহস বেড়েছে। হাসেমেরও লাভ কম হয়নি, সেই কবে এর ওর বাড়ির খোলা বারান্দায় রাত কাটিয়ে জীবনের তেত্রিশ চৌত্রিশটা বছর পার করে দিয়েছে সে। বর্ষায় আর

শীতে কী কষ্টই না গেছে! বৃষ্টি পড়লেই চারপাশ খোলা বারান্দা ভেসে যেত, শীতে হু হু করে উত্তুরে হাওয়া এসে হাড়ের ভেতর পর্যন্ত জমিয়ে দিত। ভুবন গোঁসাই ডেকে ঘর দেবার পর জীবনে সেই প্রথম সে টিনের চাল-ওলা একখানা আস্ত ঘরের নিচে আশ্রয় পেয়েছে। শীতে বা বর্ষায় এখন আর কষ্ট নেই।

ভুবন গোঁসাইর বাড়িতেই থাকে হাসেম, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা তার নিজস্ব। নিজেরটা নিজেরই ফুটিয়ে নেবার কথা। কিন্তু ভুবন গোঁসাইর মা ক'দিন আর তাকে চুলা ধরাতে দেয়! নিজের সঙ্গে হাসেমেরও চাল ফুটিয়ে নেয় বুড়ি।

হায় রে, হায়! খানের বাচ্চারা তো ঢুকেছিল নহরপুরে। ভুবন গোঁসাইর মা কি বেঁচে আছে এখনও? কী হাল হয়েছে শফিকুলদের? শোভান আলি, হাসমত মিঞা, কামরুল হাসান, মতিউর হোসেন চৌধুরি—খান সেনারা এদেরও কি বাঁচিয়ে রেখেছে? কী অবস্থা হয়েছে নিকারিদের, মৃধাদের, বারুইদের, কামারদের, কুমোরদের? ওদের বাড়িগুলো তো বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা, একবার আগুন লাগিয়ে দিলে ফাত ফাত করে পাড়াকে পাড়া ছাই হয়ে যাবে।

উত্তরের নাবাল চক থেকে জেলা বোর্ডের বাঁধানো সড়কে উঠে এল হাসেম। তারপর নিশি পাওয়া মানুষের মতো নহরপুরের দিকে ছুটতে লাগল।

গ্রামের ভেতর পা দিয়েই শিউরে উঠল হাসেম। শোভান আলিদের বাড়িটা প্রথমেই পড়ে। বাড়িটার আর কিছুই নেই। ইবলিশেরা পুড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে গেছে। পোড়া শালকাঠের খুঁটি আর টিনের চাল ছত্রখান হয়ে পড়ে আছে। উঠোনের একধারে সারি সারি ধানের ডোল ছিল ; জানোয়ারেরা সেগুলোও পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। ধান পোড়া গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে।

হায় রে হায়, ধান বলে কথা! দুই মুঠা ভাতের জন্য সারাটা জীবন কী না করেছে হাসেম! আর সেই ধান—কত কষ্টের আর সাধের ফসল, ইবলিশেরা পুড়িয়ে দিয়ে গেল!

এখনও আগুন সবটা নেভে নি, বাড়িময় জ্বলন্ত অঙ্গার ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে কাঁথা-বালিশ-তোষক-বাক্স-প্যাঁটরার স্তূপ।

বাড়িটা এই মুহূর্তে একেবারে নিস্তব্ধ। কোথাও সাড়াশব্দ নেই। থেকে থেকে পেছনের ঝোপঝাড় থেকে ঝিঁঝি ডাকছে।

আচমকা অদ্ভুত এক ভয় হাসেমকে পেয়ে বসল। গলা ফাটিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'ছোভান সাব—ছোভান সাব—'চেঁচাল বটে, কিন্তু গলার ভেতর থেকে খুব সরু, দুর্বল শব্দ বেরিয়ে এল মাত্র।

কেউ উত্তর দিল না।

হাসেম আবার ডাকল, 'ছোভান সাব—আপনারা কই গ্যালেন হগলে—'এবার গলাটা আরেকটু চড়াল।

এবারও সাড়া নেই।

চেঁচাতে চেঁচাতে গলা যখন চিরে এল, সেই সময় শোভান আলিদের দেখতে পেল হাসেম। হায় আল্লা, এর চাইতে যদি না দেখত! শোভান আলি, তার তিন ছেলে, এক মেয়ে, শোভান আলির দুই বিবি আর ওদের বাড়ির তিনটে কামলা— কেউ প্রাণে বেঁচে নেই। উত্তরের ঘর, পুবের ঘর, দক্ষিণের ঘর আর উঠোনের পশ্চিম কোণায় ওদের লাশ, ওরা পড়ে আছে, রক্তে চারদিক ভেসে যাচ্ছে।

এক পাল শিয়াল বাড়ির পেছন দিক থেকে বেরিয়ে এসে উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছে। ওরা কিভাবে টের পেয়ে গেছে, কে জানে। নেহাত হাসেমকে দেখে থমকে আছে, সে চলে গেলেই শোভান আলিদের শরীরগুলোর কী হাল হবে, ভাবতেই শিউরে উঠল হাসেম।

সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। এই নিঝুম সন্ধ্যায় যখন মরা মানুষের মাংসের লোভে শিয়ালের চোখ জ্বলছে, চারপাশ থেকে কী যেন একটা উঠে এসে হাসেমের দম বন্ধ করে দিচ্ছিল। সে অনুভব করছিল, জিভটা ভেতর থেকে.কেউ টানছে, কণ্ঠার হাড় জোরে জোরে ওঠানামা করছিল। বুকের ভেতরটা কাঁপছিল বাঁশপাতার মতো।

হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগাল হাসেম। মনে হল, তার পেছন পেছন কারা যেন তাড়া করে আসছে। শোভান আলিদের বাড়ি থেকে খানিকটা গেলেই মৃধা পাড়া। সেখানেও একটা বাড়ি আস্ত নেই, খানের

বাচ্চারা জ্বালিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে গেছে। শুধু পোড়া পোড়া খুঁটিগুলো আকাশের দিকে কোনোরকমে মাথা খাড়া করে আছে।

এদিকে দূরে ঘন জঙ্গলের তলা থেকে রূপার থালার মতো গোল একখানা চাঁদ উঠে এসেছে। ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্নায় হাসেম দেখতে পেল, অগুনতি মরা মানুষ চারদিকে ছড়িয়ে আছে। সে চিৎকার করে ডাকতে লাগল, 'তমিজদ্দি—তমিজদ্দি, রাজেক—উসমাইনা—'

পর পর অনেকগুলো নাম বলে গেল সে কিন্তু কোনোদিক থেকে সাড়া নেই। তার গলার স্বর চৈত্রমাসের উলটাপালটা বাতাসে ভাসতে ভাসতে উত্তরের চকের দিকে মিলিয়ে গেল।

এ কোথায় এল হাসেম? এই কি তার আজন্মের চেনা নহরপুর? মরা মানুষের এই রাজ্যে সে ছাড়া আর কি কোনো জীবন্ত তাজা মানুষ নেই? তার মনে হতে লাগল, আর কিছুক্ষণ এই মৃধাপাড়ায় থাকলে নির্ঘাত পাগল হয়ে যাবে।

খানিক আগের সেই আতঙ্কটা হাসেমকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল নিকারিপাড়ায়। এখানেও সেই একই দৃশ্য। চতুর্দিকে মৃত মানুষ। জোয়ান পুরুষরা তো আছেই। বাচ্চা-কাচ্চা, বুড়ো-বুড়ি, মাইয়া মানুষ—শয়তানের ছাওরা কাউকে বাদ দেয় নি। হাসেম চেঁচিয়ে উঠল, 'কেউ বাইচা (বেঁচে) আছ গো? হালিম-গাজিউদ্দি-মস্তাইজা, পরানে বাইচা থাকলে হুমের (সাড়া) দাও—'

কোনো উত্তর নেই।

গলায় রক্ত তুলে হাসেম আবার চেঁচাল, 'কেউ বাইচা আছ? তোমাগো কিরা, হুমের (সাড়া) দ্যাও—' তার ভীষণ ভয় করছিল। এই মহূর্তে একটা জ্যান্ত মানুষ চাই হাসেমের যে কথা বলে, সঙ্গ দিয়ে, সাহস দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। জীবন্ত মানুষের মুখ না দেখলে সে আর বেশিক্ষণ মাথা খাড়া রাখতে পারবে না।

হঠাৎ চাঁদের আলোয় হাসেমের চোখে পড়ল নিকারিপাড়ার পেছন দিকে নলখাগড়ার বন থেকে কে যেন ফোঁপাতে ফোঁপাতে উঠে আসছে।

হাসেম চমকে উঠল। মনে প্রাণে যদিও সে জীবন্ত মানুষ দেখতে চাইছিল তবু গ্রামজোড়া এই মৃত্যুপুরীতে কেউ যে বেঁচে আছে, এটা সে বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না।

ফোঁপানিটা কাছাকাছি এলে হাসেম চিনতে পারল—জহিরদ্দির বউ কুলসম। সে আগেই জানত, বউটা ন'দশ মাসের গাভীন। তার চেহারা দেখেও তাই মনে হয়।

চেনা মানুষ পেয়ে ফোঁপানির জায়গায় ডাক ছেড়ে বুক ফাটিয়ে কেঁদে উঠল বউটা, 'অয় রে, অয় রে, আমার কী সব্বনাশ হইল রে—'

সর্বনাশটা কী হতে পারে, হাসেম বুঝতে পেরেছে। তবু নিজের অজান্তেই সে ঝাপসা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী হইছে?'

প্রথমটা কিছুই বলতে পারল না কুলসম। কাঁদতে কাঁদতে হিক্কার মতো আওয়াজ বেরুতে লাগল তার গলা থেকে। তারপর ভাঙা ভাঙা জড়ানো স্বরে যা বলল, সংক্ষেপে এইরকম। দুপুর বেলা কাঠকুটো আর শুকনো পাতা জ্বালিয়ে কুলসম ভাত রাঁধতে বসেছিল। তার সোয়ামী জহির উঠানের এক পাশে বড় জাম্বুরা গাছটার তলায় বসে তামাক খাচ্ছিল। আর তাদের তিন তিনটা পোলামাইয়া খিদের জ্বালায় ঘ্যান ঘ্যান করছিল। সেই সময় এল জল্লাদেরা। খানের বাচ্চাদের দেখেই ভয়ে কুলসম এক দৌড়ে পেছনের নলখাগড়া ঝোপে গিয়ে ঢুকেছিল। জহির কিংবা ছেলেমেয়ে তিনটে সে সুযোগ পায়নি। নলখাগড়া ঝোপে শ্বাস বন্ধ করে কুলসম দেখেছিল, খানেরা গুলি করে জহিরকে মারল বাচ্চাগুলোকে মারল, তাদের নাড়ার ছাউনি দেওয়া ক্যাঁচা বাঁশের ঘর জ্বালিয়ে দিল। শুধু কি ওদের ঘরই, সারা নিকারি পাড়াটাই ওরা জ্বালিয়ে দিয়েছে। মাইয়া পুরুষ বলতে আর কিছুই রাখে নি, সবাইকে শেষ করে দিয়ে গেছে। শুধু কুলসমের মতো দু চারজন, যারা জঙ্গল-টঙ্গলে পালাতে পেরেছিল, বেঁচে গেছে।

কথা শেষ করে দু হাতে কপাল আর বুক চাপড়ে আবার দারুণ কান্না শুরু করল কুলসম, 'অয় রে, কী পাষাণ পরাণ আমার, চোখের সুমখে (সামনে) সোয়ামীরে মারল, পোলা-মাইয়ারে মারল, আমি চাইয়া চাইয়া দেখলাম। অয় রে খোদা, আমি রে ক্যান বাইচা আছি!'

কী বলবে, ভেবে পেল না হাসেম। এইটুকুই সে বলতে পারল, 'কাইন্দো না, কাইন্দো না জহিরের

বিবি—'

কুলসমের কান্না তাতে থামল না, দশ বিশগুণ বেড়ে গেল, 'অহন (এখন) আমি কী করি রে, কী করি? এই পরাণ রাইখা আর কী হইব? কোন কামে লাগব?'

এই গ্রামেরই মেয়ে কুলসম, এই গ্রামেরই বৌ হয়েছে। জহিরের দূর সম্পর্কের চাচাতো বোন হত সে। ছেলেবেলা থেকেই হাসেমকে চেনে কুলসম। সে বলতে লাগল; 'হাসমা ভাই, আমারে মাইরা ফালাও, মাইরা ফালাও। আমি আর সইতে পারি না।'

হাসেম এবারও শুধু বলতে পারল, 'কাইন্দো না, কাইন্দো না।'

কুলসম আর কিছু বলল না। কাঁদতেই লাগল, কাঁদতেই লাগল।

এই হত্যাপুরীতে এতক্ষণে একটা জীবন্ত মানুষ দেখল হাসেম। সত্যিই কি কুলসম জীবন্ত? কথা বললে, হাত-পা নাড়লেই কি একটা মানুষ বেঁচে থাকে? সে বলল, 'যা হওনের হেয়া তো হইয়াই গ্যাছে, এইখানে খাড়ইয়া থাইকা আর কী হইব! লও যাই—'

শূন্য চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল কুলসম। তারপর বলল, 'কই যামু? কী করুম?'

'দেখি গেরামের আর কেউ বাইচা আছে নিহি (নাকি)। তাগো লগে পরামশ্য করি। হগলে (সবাই) যা কয়, হেয়া (তাই) করণ যাইব।'

'কিন্তুক—'

'কী?'

'অগো এমনে ফালাইয়া আমি যাইতে পারুম না—' স্বামী আর সন্তানদের মৃতদেহগুলো দেখিয়ে কুলসম বলতে লাগল, 'আমি বাইচা থাকতে অগো শিয়ালে শকুনে ছিড়া খাইব!'

'কী করতে চাও?'

'যদি গোরও দ্যাওন যাইত—'

একটু ভেবে হাসেম বলল, 'হেয়া তো ঠিকই, ঘরে কুদাল (কোদাল) আছে?'

কুলসম মাথা নাড়ল, 'আছে।'

'লইয়া আসো—'

কোদাল এলে কুলসমদের বাড়ির উঠোনে ক্ষিপ্র হাতে প্রকাণ্ড এক গর্ত খুঁড়ে ফেলল হাসেম। তার ভেতর জহির আর তার তিন ছেলেমেয়েকে শুইয়ে যখন মাটি চাপা দিচ্ছে তখন আর পারল না কুলসম। এতক্ষণ কাঁদছিলই, এবার জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

দৌড়ে গিয়ে পেছনের খাল থেকে জল এনে কুলসমের চোখেমুখে ঝাপটা দিতে দিতে অনেকক্ষণের চেষ্টায় জ্ঞান ফিরল। উঠে বসে দুই হাঁটুর মাঝখানে থুতনি গুঁজে ফাঁকা চোখে বোবার মতো তাকিয়ে থাকল সে। এখন আর কাঁদছে না কুলসম, কোনো কথাও বলছে না। মাথাটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল নাকি জহিরের জরুর?

কুলসমের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় এখন নয়। তাড়াতাড়ি জহিরদের মাটি চাপা দিয়ে কুলসমকে নিয়ে হাসেম নিকারিপাড়া থেকে বেরিয়ে এল।

এখান থেকে ডান দিকে গেলে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের উঁচু পাকা সড়ক। বাঁ দিকে কাঁচা রাস্তা। নহরপুরের নানা পাড়ার ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে এঁকে বেঁকে পথটা দক্ষিণের চকে গিয়ে নেমেছে।

পথটার দু'ধারে ঝোপঝাড়, ছোট ছোট খাল, কোথাও চাপ-বাঁধা গাছপালা, কোথাও খানিকটা ফাঁকা জায়গা।

এই সন্ধ্যাবেলাতেই চারদিকে নিশুতি নেমে এসেছে। অন্য দিন এই সময় ঘরে ঘরে কুপি কি হেরিকেন জ্বলে ওঠে। নিকারিপাড়ায়, মৃধাপাড়ায় গাজির গীত কি গুনাইবিবির গানের আসর বসে যায়। যুগিপাড়া থেকে তাঁতের খটখটানি কি কুমোরপাড়া থেকে ঝাঁক ঝাঁক পইতনা চালাবার আওয়াজ ভেসে আসে। আজ আলো নেই, শব্দ নেই, মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে না। নহরপুর গ্রামে জীবনের সব লক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গেছে। কোনো দিন যে এখানে মানুষ বাস করেছিল, সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্খা দিয়ে এক একটা সংসার সাজিয়ে নিয়েছিল, তা যেন ভাবাই যায় না।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো চাঁদের আলো এসে পড়েছে রাস্তায়। তার মধ্য দিয়ে ওরা

হেঁটে যাচ্ছিল। যেতে যেতে মাঝে মাঝে হাসেম চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল,'কেউ বাইচা আছ গো, কেউ বাইচা আছ?' হাসেম যেন এক অলৌকিক বার্তাবাহক। এই মৃত্যু আর হত্যার রাজ্যে সে জীবনের ঘোষণা ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

নিকারিপাড়া পেছনে ফেলে দক্ষিণে বাঁক ঘুরতেই পিটকীরা আর সোনালের জঙ্গল থেকে জন তিনেক উঠে এল। চাঁদের আলোয় ওদের দেখেই চেনা গেল—গহরদ্দি, আনিস আর বায়তুল্লা। গহরদ্দি আর আনিস নিকারিপাড়ার, বায়তুল্লা মৃধাপাড়ার। ওদের চোখ লাল টকটকে, যেন রক্ত জমাট বেঁধে আছে। খাপচা খাপচা চুল মুখের ওপর এসে পড়েছে। তিনজনকেই উন্মাদের মতো দেখাচ্ছিল।

হাসেমকে দেখে ওরা তিনজনেই একসঙ্গে কেঁদে উঠল, 'তমস্ত দিন তুই আছিলি কই রে হাসমা?'

কোথায় ছিল, হাসেম বলল।

তিনজন ভাঙা, উদ্‌ভ্রান্ত গলায় বলতে লাগল, 'হায় রে হায়, আমাগো হগল শ্যাষ। বাড়িঘর, পোলা-মাইয়া হগল (সবই)। হায় রে হায়, কী করুম অহন? হেই দুফার থনে জঙ্গলে বইসা বইসা মানুষ মারণ দেখলাম, আগুন ধরাইতে দেখলাম, যুবুতী মাইয়াগো ধইরা লইয়া যাইতে দেখলাম। হায় রে হায়, কী হইব? কী হইব?'

প্রথম দিকে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল হাসেম। এখন মনে মনে খানিকটা সাহস ফিরিয়ে এনেছে সে। বলল,'আগে খোজ লইয়া দেখি আর কেউ বাইচা আছে নিহি। আহো (এসো)—'

ওদেরও সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে লাগল হাসেম।

নিকারিপাড়ার পর বারুইপাড়া, তারপর কুমোরপাড়া, কুমোরপাড়ার পর যুগি পাড়া। যেখান দিয়েই যাচ্ছে সেখানেই হাসেম হাঁকছে, 'কেউ বাইচা আছ?'

তিন পাড়ার পাশের বন আর বাঁশঝোপ থেকে মোট ছ'জন উঠে এল। ওরা কুমোরপাড়ার বিনোদ, হাচাই আর বেঙ্গা। বাকি তিনজন যুগিপাড়ার—সুবল, রসময় আর নিবারণ। ওদের স্বর্বস্ব গেছে।

যুগিপাড়ার পর প্রকান্ড ফাঁকা মাঠ। তার এক পাশে বড় মসজিদ। আরেক পাশে শফিকুলদের বাড়ি।

মাঠ পেরিয়ে শফিকুলদের বাড়ির সীমানায় আসতেই সেই একই দৃশ্য, খানের বাচ্চারা ওদের বাড়িটা ভেঙেচুরে পুড়িয়ে জ্বালিয়ে শেষ করে দিয়েছে। আর সেই ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে রক্তের নদীর মধ্যে পড়ে আছে শফিকুল, তার বাজান মোতালেফ হোসেন চৌধুরি, তার দাদী, দুই ভাই, মা এবং এক আপা। শফিকুলের ছোট বোন নাজিমাকে অবশ্য দেখা গেল না।

হাসেমের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মুত্রাবনের ভেতর দাঁড়িয়ে সন্ধের আগে সে দেখছিল খানসেনারা নাজিমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। হায় রে হায়, শফিকুলদের গোটা পরিবারটাই শেষ হয়ে গেল!

চাঁদের আলোয় হাসেম দেখতে পেল, শফিকুলের বুক গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে আছে। তার হাতে একটা দোনলা বন্দুক। খুব সম্ভব ইবলিশের ছাওদের বাধা দিতে বেরিয়েছিল সে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল হাসেম। তারপর কুলসমদের নিয়ে মৃতদেহগুলোর পাশ দিয়ে আবার হাঁটতে লাগল।

শফিকুলদের বাড়ির পেছন দিকে কামারপাড়া, তারপর নাপিতপাড়া, গণকপাড়া।

নহরপুর গ্রামটা ঘুরে জনকুড়ি জীবন্ত মানুষ সংগ্রহ করে হাসেম যখন দক্ষিণের চক পেরিয়েছে সেই সময় ভুবন গোঁসাইর মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। হায় রে হায়, সারা গ্রাম যখন শেষ তখন বুড়ি কি আর বেঁচে আছে?

ভুবন গোঁসাইর মায়ের সঙ্গে এক বাড়িতে দশ-বার বছর আছে হাসেম। আজকাল সমস্ত দিনের বেশির ভাগ সময়টা তার সঙ্গেই কেটে যায়। অথচ সারা গ্রাম ঘুরবার পর কিনা বুড়ির কথা মনে পড়ল!

হাসেম হঠাৎ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল।

নহরপুরের আর সব বাড়ির যা দশা হয়েছে, ভুবন গোঁসাইর বাড়ির হাল তার চাইতে আলাদা হবে কেন? উত্তরের ঘর, পুবের ঘর, পশ্চিমের ঘর, দক্ষিণের ঘর বলতে আর কিছু নেই। গোটা বাড়িখানা টিন এবং পোড়া কাঠের স্তূপ হয়ে আছে।

হাসেম একবার এদিকে যায়, একবার ওদিকে। বুড়ি কি এই বাড়ির সঙ্গেই পুড়ে ছাই হল? পাগলের

মতো টিনের স্তূপ টানাটানি করতে করতে হাসেম শিথিল কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, 'ঠাকুরমা—ঠাকুরমা—'

হাসেমের সঙ্গে আনিস গহরদ্দি নিবারণরাও ডাকাডাকি শুরু করে দিল এবং হাতে হাতে সব সরিয়ে দেখতে লাগল তার তলায় বুড়ি মরে পড়ে আছে কিনা।

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর খানিক দূরে একটা মজা পুকুরের তলা থেকে ক্ষীণ দুর্বল স্বর ভেসে এল, 'হাসমা নিহি? কই তুই—কই?'

শুনেই চিনতে পারা গেল—ভুবন গোঁসাইর মা। টিন-ফিন ছেড়ে খাড়া উঠে দাঁড়াল হাসেম। তার শিরায় শিরায় অস্বাভাবিক বেগে রক্ত ছুটতে লাগল। জোরে জোরে বুক ভরে বারকতক শ্বাস টেনে সে পুকুরটার দিকে দৌড়ে গেল। পাড় থেকে চিৎকার করে বলল, 'এই যে আমি—এই যে—'

পুকুরটা বড় বড় কচুরিপানায় বোঝাই। তার মধ্যে থেকে ভুবন গোঁসাইর মা উঠে এল। বুক পর্যন্ত তার জল কাদায় মাখা। বোঝা যাচ্ছে, খান সেনাদের দেখে সে কচুরিবনে গিয়ে ঢুকেছিল।

বুড়িকে নিজের চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না হাসেম। পলকহীন তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনে বাইচা আছেন ঠাকুরমা, অহনও বাইচা আছেন!'

'আছি রে আছি—' ভুবন গোঁসাইর মা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, ' পোড়াকপাইলা তুই আছিলি কই? আমি তো ভাবলাম ওই খান নিব্বইংশরা তরে শ্যাষ করছে। তরাসে আমার বুক কাপতে আছিল।'

হাসেম বলল, 'আমি উত্তরের চকের উই কিনারে মোতরাবনে ঢুইকা আছিলাম। আহেন (আসুন) আহেন—'

'তুই যে বাইচা ফিরা আবি (আসবি), ভাবি নাই।'

হাসেম উত্তর দিল না, ভুবন গোঁসাইর মাকে নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

বুড়ি কাঁদছিলই। জড়ানো জড়ানো ভাঙা গলায় বলতে লাগল, 'যম আইছিল, যম। হা ঈশ্বর, অগো শরীলগুলাই মাইনষের। এমুন কইরা কেউ যে খুন করতে পারে, ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া দিতে পারে, না দ্যাখলে বিশ্বাস যাইতাম না।'

বাড়ি এসে ঘরগুলোর অবস্থা দেখে ভুবন গোঁসাইর মায়ের কান্না বিশগুণ হয়ে উঠল, 'অয় রে, অয় রে, ডাকাইতরা কী কইরা গ্যাছে রে!'

কুলসমরা উঠোনের একধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, ভুবন গোঁসাইর মাকে কাঁদতে দেখে তারাও বুক ফাটিয়ে কেঁদে উঠল।

কান্নাটা একটু কমে এলে নিকারিপাড়ার গহরদ্দি বলল, 'বাড়ি গ্যাছে, ঘর গ্যাছে। অহন কী করণ?'

আরো দু-চারজন একসঙ্গে বলে উঠল, 'কী করণ? কও কী করণ?'

প্রথমটা কেউ কিছু বলল না। অনেকক্ষণ পর যুগিপাড়ার সুবল বলল, 'এহানে আর থাকন যাইব না। বাড়িঘর জ্বালাইয়া দিছে। চাউল-ডাইল-ধান-কলই— হেইর লগে পুড়ছে। এহানে থাকলে খামু কী? থাকুম কই?'

হঠাৎ ফোঁপাতে ফোঁপাতে বায়তুল্লা বলল, 'না গ্যালে যেই কয়জনও বাইচা আছি তাগোও বাচতে হইব না।'

সবাই চমকে উঠল, 'ক্যান?'

'বড় সড়কের কিনারে ব্যাত ঝোপড়ার (বেত ঝোপের) ভিত্‌রে আমি পলাইয়া আছিলাম। খানের বাচ্ছারা বিকালবেলা যহন ফিরা যায় কওয়াকওয়ি করতে আছিল, কাইল আবার আইব। আইজ মাইনকার চর তরি (পর্যন্ত) গেছিল। কাইল দক্ষিণ দিকের গেরামগুলানে যাইব। হায় রে হায়, কাইল রসুলপুর তাজহাটি ইনামগঞ্জ, রসুনিয়ার অবস্থা যে কী হইব!' একটু থেমে আবার বলল, 'যাইব তো এই সড়ক ধইরা ইবলিশেরা, যদি আমাগো দ্যাখে আর কি পরাণে বাচুম!'

রুদ্ধশ্বাসে সবাই বলল, 'তয় (তা হলে)?'

হাসেম বলল, 'বাচতে হইলে আইজই এহান থিকা পলাইতে হইব।'

'কই যাওন যায়?'

একটু ভেবে বায়তুল্লা বলল, 'গিরিগঞ্জের দিকে যাওন যাইব না। খানের বাচ্চারা উই দিকে আছে।'

হাসেম বলল, 'ঠিক কইছ। আমরা যামু উলটা দিকে। যেহানে গেলে বাচতে পারি তেমুন একখান জাগা (জায়গা) বিচারাইয়া (খুঁজে) বাইর করতেই হইব।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর নিবারণ শ্বাস টানার মতো শব্দ করে বলল, 'কিন্তুক—'

'কী?'

'পলানের (পালাবার) কথা তো কইতে আছ। কিন্তুক পোলা-মাইয়া-বউ-ভাই বইন মইরা পইড়া রইল। তাগো কী হইব?'

এতক্ষণ যে যার প্রাণ বাঁচাবার কথা ভাবছিল। মৃত প্রিয়জনের কথা মনে করিয়ে দিতে আবার নতুন করে কান্নার রোল উঠল। কেউ কেউ উদ্‌ভ্রান্তের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে বলতে লাগল, 'যামু না, যামু না, যা হওনের হউক। ধনেগো ফালাইয়া পরাণ থাকতে যাইতে পারুম না।'

হাসেম বলল, 'পাগলামি কইরো না তুমরা। যারা গ্যাছে হেয়ারা (তারা) আর ফিরা আইব না। পরাণখান যহন আছে বাচনের কথা ভাবো।'

ভুবন গোঁসাইর মা বলল, 'হ, এই একখান কথা। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।'

আনিস বলল, 'তয় এক কাম করি—'

'কী?'

'যারা মরছে তাগো লাশ কবর দিয়া যাই, হিন্দুগোটা পোড়াইয়া লও।'

রসময় বলল, 'পোড়ানের কি গোর দ্যাওনের সোমায় (সময়) নাই। ওই হগল করতে গ্যালে রাইত ভোর হইয়া যাইব। শুনছি, সকাল হইলেই খানের বাচ্চারা মানুষ মারতে বাইর হয়। পলাইতে হইলে রাইতের আন্ধারই ভাল।'

বায়তুল্লা বলল, 'ঠিকই কইছ।'

অন্য সবাই বলল, 'তুমরা যা ভাল বোঝ, কর—'

বলামাত্রই কিন্তু ওরা চলে যেতে পারল না। গহরদ্দি-আনিস-নিবারণ-রসময়-বিনোদ, সবাই যে যার বাড়ি গিয়ে শেষ বারের মতো নিহত প্রিয়জনদের মুখগুলো দেখে চোখের জলে বুক ভাসাতে ভাসাতে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে এসে উঠল।

নহরপুর পাঁচশ লোকের গ্রাম। তার ভেতর মাত্র বাইশ জন জীবন্ত মানুষ চোদ্দ পুরুষের জন্মভূমি ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যাচ্ছে। বাকি পৌনে পাঁচশ বাচ্চা-বুড়ো-মেয়ে-পুরুষের শব সারা গ্রামে ছড়িয়ে রইল। যেতে যেতে হাসেম ভাবতে লাগল, আজকালের মধ্যেই ওরা শিয়াল এবং শকুনের খাদ্য হয়ে যাবে।

তিন

জেলা বোর্ডের সড়ক ধরে ওরা হাঁটছিল হাঁটছিল আর হাঁটছিল। এখন কেউ কথা বলছে না। মাঝে মাঝে শুধু বুকচাপা দমকা কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এখন কত রাত, কে জানে। সড়কটার দু ধারে কচুরিপানায় বোঝাই খাল। তার পরে কোথাও বউন্যা ও হিজলবন, কোথাও শরের জঙ্গল। আবার কোনো কোনো জায়গা একেবারে ফাঁকা। তবে খালের ওপার থেকে মাইলের পর মাইল চক, চৈত্র মাসের এই শেষের দিকে চকগুলো ফসলশূন্য।

চাঁদটা এখন সোজা মাথার ওপরে। জ্যোৎস্নায় চারদিক ধুয়ে যাচ্ছে। ঝোপঝাড়ে, হিজল বনে লক্ষ লক্ষ জোনাকি উড়ছিল, ঝিঁঝি ডাকছিল। বউন্যা গাছের মাথা থেকে হুতোম প্যাঁচা কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠছিল।

বড় সড়কের দু ধারে চকের ফাঁকে ফাঁকে গ্রাম।

নহরপুরের সীমানা ছাড়িয়ে একসময় হাসেমরা তাজহাটি এসে পড়ল। সড়কের গায়েই গ্রামটা। জ্যোৎস্নাটুকু বাদ দিলে তাজহাটির কোনো বাড়িতেই আলোটালো জ্বলছে না। মানুষের সাড়াশব্দ নেই। নহরপুরের মতো এ গ্রামও নিশ্চয়ই খানেদের হাতে ধ্বংস হয়ে গেছে।

রাস্তা থেকে খালের ওপর দিয়ে বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে তাজহাটিতে ঢুকলে প্রথমে যে কাঁচা বাঁশের ঘরখানা পড়ে সেটা ফরিদদের।

পাশাপাশি গ্রামের মানুষ, ফরিদের সঙ্গে কত কালের জানাশোনা। হাসেম চেঁচিয়ে ডাকল, 'ফরিদ ভাই—অ ফরিদ ভাই—'

উত্তর নেই।

ভাল করে তাকাতে হাসেমের চোখে পড়ল, ফরিদ ভুঁইয়াদের ঘরবাড়ির চিহ্ন নেই, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। একবার সে ভাবল, সাঁকো পেরিয়ে ফরিদদের খোঁজখবর নিয়ে আসে। পরক্ষণেই ঠিক করল, যাবে না। কী হবে গিয়ে? ওখানে গেলে কী দেখা যাবে, সে জানে। পোড়া বাড়ির ছাই-এর গাদার পাশে নিশ্চয়ই ফরিদ ভুঁইয়া তার ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে মরে পড়ে আছে। এ দৃশ্য দেখবার সাধ আর তার নেই।

বড় করে শ্বাস টেনে হাসেম আবার হাঁটতে লাগল, ওর সঙ্গে বাকি একুশ জনও চলেছে।

খানিকটা যাবার পর পাশের ধঞ্চে বন থেকে চাপা ভীত সুরে কে বলে উঠল, 'ক্যাঠা (কে) যায়?'

হাসেমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সবার হয়ে হাসেম বলল, 'আমরা নহরপুরের মানুষ।'

'কী নাম তুমার?'

'হাসমা—'

'আহি (আসছি), খাড়াও—'

ধঞ্চে বন থেকে শুধু একজন না, যে কথা বলছিল সে তো বটেই, তার সঙ্গে আরো চার পাঁচজন উঠে এল। সেই এক চেহারা তাদের—উদ্‌ভ্রান্ত, ভীত, বিপর্যস্ত।

চেনাজানা মানুষ। ওরা বলল, 'আমাগো এই কয়জনেরে বাদ দিলে আর কেউ বাইচা নাই, খানেরা বেবাকরে (সকলকে) শ্যাষ কইরা দিছে। ধইঞ্চা খ্যাতে পালাইয়া আমরা পরাণ বাচাইছি—' বলতে বলতে লোকগুলো ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল।

হাসেম বলল, 'আমাগো গেরামও দোজখ। কাইন্দো না, কাইন্দো না।'

কাঁদতে কাঁদতে লোকগুলো বলল, 'এই রাইতে তুমরা কই চলছ?'

হাসেমরা জানায়, নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে তারা বেরিয়ে পড়েছে।

তাজহাটির লোকগুলো বলল,'তোমাগো লগে আমরাও যামু। পোলা মাইয়া গ্যাছে, বাড়িঘর পুড়ছে—এই জাহান্নামে থাইকা আর কী করুম!'

'গ্যালে চল—'

নহরপুরের বাইশ জনের সঙ্গে তাজহাটির পাঁচ ছ'জন যোগ হয়ে দলটা বড় সড়কের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল।

তাজহাটির পর রসুলপুর। তারপর একে একে চিতলমারি, রসুনিয়া, ইনামগঞ্জ।

সবগুলো গ্রামেরই এক অবস্থা। যে গ্রামের পাশ দিয়েই হাসেমরা যাচ্ছে, ঝোপজঙ্গল থেকে দু'জন চারজন করে জীবন্ত মানুষ উঠে এসে তাদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

ভোর রাতের দিকে ওরা মাইনকার চরে পৌঁছে গেল। আর তখনই ফুলবানুর কথা মনে পড়ল হাসেমের। সে শুনেছে, খানেরা আজ এই মাইনকার চর পর্যন্ত এসেছিল। হায় রে হায়, তারপরেও কি ফুলবানু বেঁচে আছে?

ফুলবানুর কথা মনে পড়া উচিত ছিল অনেক আগেই। পড়ল কিনা তাদের ঘরের দুয়ারে এসে! সারা নহরপুর ঘুরবার পর ভুবন গোঁসাইর মায়ের কথা মনে পড়েছিল তার। যাদের কথা আগে ভাবা উচিত ছিল, তাদের কথাই সে ভেবেছে সবার পরে।

মাইনকার চরের ঝোপঝাড় থেকেও আট দশজন উঠে এসেছিল। কেঁদে কেঁদে গোঙানির মতো শব্দ করে তারা নিজেদের দুঃখের কথা বলছিল। খানেরা কিভাবে তাদের গ্রাম জ্বালিয়ে, মানুষ মেরে, লুটপাট করে এবং যুবতী মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে গেছে—তার একঘেয়ে খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে যাচ্ছিল।

কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছিল না হাসেম। শ্বাসরুদ্ধের মতো সে বলল, 'ফজল মিয়ারে চিন (চেনো) তুমরা?'

'কুন ফজল?'

'ফজল গাজী—'

'চিনুম না ক্যান? এক গেরামের মানুষ—'

'তাগো খবর কী?'

'তমস্ত গেরাম শ্যাষ, অরা কি বাইচা আছে?'

'নিয্যস (নিশ্চয়) কইরা কইতে পার অরা বাইচা নাই?'

'আমরা জঙ্গলে পলাইছিলাম। তয় (তবে) খানেগো ফজল গাজীর বাড়িত যাইতে দেখছি। গ্যাছে যহন, পরাণে কি আর বাচাইয়া রাখছে! অরা কি মনিষ্য! অয় রে, অয় রে—এক একটা রাইক্ষস—'

এই শেষ রাতে চকের ওপর দিয়ে যখন ঠাণ্ডা হাওয়া ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে, যখন গায়ে কাঁটা দেবার কথা, সেই সময় ঘামে শরীর ভিজে গেল হাসেমের। শিরদাঁড়ার মধ্য দিয়ে আগুনের মতো কী ওঠা নামা করতে লাগল।

হঠাৎ ওধার থেকে ভুবন গোঁসাইর মা ডাকল, 'হাসমা শোন—'

হাসেম তার কাছে গেলে নিচু গলায় বুড়ি বলল, 'কারো কথা শুনিস না, মাইয়াটারে একবার দেইখা আয়। যদি পলাইয়া পুলাইয়া কুনোখানে গিয়া বাইচা থাকে।' ভুবন গোঁসাইর মা ফুলবানুকে চেনে। তার কাছে কতদিন ফুলবানুর কথা বলেছে হাসেম। ফুলবানুকে নিয়ে যৌবনের সেই শুরু থেকে স্বপ্ন দেখে আসছে সে। সে সব স্বপ্নের কথা বুড়ির অজানা নেই। আজ দশ বছর ধরে প্রাণের কথা বলবার এই একটাই তো মানুষ তার।

হাসেম বলল, 'তয় যাই ঠাকুরমা—'

ভুবন গোঁসাইর মা বলল, 'আবার জিগায় (জিজ্ঞাস করে)! যাবি, নিয্যস যাবি। আমি যামু তর লগে?'

'না, আপনে এইখানেই থাকেন। বুড়া মানুষ, রাইত কইরা আপনের গিয়া কাম নাই।'

বুড়িকে নিল না বটে, নিকারিপাড়ার গহরদ্দি কিন্তু হাসেমকে একা যেতে দিল না। সে তার সঙ্গে সঙ্গে চলল।

জেলা বোর্ডের সড়ক থেকে নেমে একটুখানি গেলেই মাইনকার চর গ্রাম। পোড়া বাড়ি আর অগুনতি মৃতদেহের মধ্য দিয়ে হাসেমরা ফজল গাজীদের বাড়ির সীমানায় এসে পড়ল।

তৃতীয় বার তালাক হবার পর ফুলবানু তার বাপজানের ঘরে ফিরে এসেছে শুনে এই ক'দিন আগেই শুধু না, এখন তার বয়স হল প্রায় দুই কুড়ি, সেই বিশ বাইশ বছর থেকে এদিকে যাওয়া আসা হাসেমের। চেনা না থাকলে সে বুঝতেই পারত না এটা ফজল গাজীদের বাড়ি।

নহরপুর থেকে মাইনকার চর পর্যন্ত সব ঘরবাড়ি যখন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তখন ফজলদের বাড়িটার গায়ে আঁচ লাগবে না, এমন কথা ভাবাই যায় না। আর সব বাড়ির মতো এটাও ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে আছে।

দূর থেকেই হাসেম ডাকতে লাগল, 'গাজী ছাব, গাজী ছাব—'তরাসে তার গলার স্বর এবং বুকের ভেতরটা একসঙ্গে কাঁপতে লাগল।

সাড়া দেবার মতো ওখানে কেউ আছে বলে মনে হল না।

বাড়ির সীমানা থেকে ওরা উঠে ভেতরের দিকে চলল। সেই কোন সকালে ভুবন গোঁসাইর মা তাকে একডালা মুড়ি খেতে দিয়েছিল। তারপর এই শেষ রাত পর্যন্ত পেটে আর কিছুই পড়েনি। মৃত্যুর রাজ্য থেকে জীবন্ত ক'টি মানুষকে কুড়িয়ে নিয়ে চলতে চলতে খিদের কথা একবারও তার মনে পড়েনি।

কিন্তু এই মুহূর্তে ফুলবানুদের বাড়ির ভেতর যেতে যেতে হাত-পা টলতে লাগল হাসেমের। শরীরটা হঠাৎ এত কাহিল হয়ে পড়ল যে হাসেমের মনে হতে লাগল আর সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, এখনই মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। হায় রে হায়, ভেতরে গিয়ে কী দেখবে সে? ফুলবানু—সারা যৌবন যার কথা ভেবে ভেবে সে পার করে দিল— সে কি আর বেঁচে আছে! খানেরা তাকে ধরে নিয়ে যায়নি তো? দুর্বল শরীরে হাসেম ভাবতে চেষ্টা করল, বিকেলবেলা মুত্রাঝোপে দাঁড়িয়ে সে মিলিটারি ট্রাকগুলোকে গিরিগঞ্জে ফিরে যেতে দেখেছিল। খানেরা চারপাশের গ্রামের অনেকগুলো যুবতী মেয়েকে

নিয়ে গেছে। তাদের মধ্যে ফুলবানু ছিল কি? হাসেম যদ্দুর মনে করতে পারল, ফুলবানুকে তখন সে দেখেনি। এই ভাবনাটা তাকে খানিকটা ভরসা দিল।

বাড়িতে ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়ল, ফজল গাজীর দুই ছেলে মরে পড়ে আছে। ফজল কিংবা তার মেয়ে ফুলবানুকে দেখা যাচ্ছে না। উথল পাথল ঢেউয়ের মতো অদ্ভুত এক ভয় হাসেমের বুক ভেঙে দিতে লাগল। গলা চিরে চিরে সে ডাকতে লাগল, 'গাজী ছাব—গাজী ছাব—ফুলবানু-উ-উ-উ—' তার কণ্ঠস্বর চারপাশের গাছগাছালি ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে দূর চকের দিকে মিলিয়ে গেল।

ঘাড়ের পাশ থেকে গহরদ্দি বলল, 'হ্যারা (তারা) নাই, থাকলে এহানেই মইরা পইড়া থাকত।'

শিথিল, ভাঙা গলায় হাসেম জিজ্ঞেস করল, 'তুমার কী মনে হয়?'

আধবুড়ো অভিজ্ঞ গহরদ্দি কিছু না ভেবেই বলল, 'পলাইছে।'

'কুন দিকে যাইতে পারে?'

'হে ক্যামনে কমু? খানেগো দেইখা যেই দিকে পারছে গ্যাছে গা। হুদাহুদি (শুধু শুধু) এহানে থাইকা আর কী হইব? ল—যাই গা, অরা আবার সড়কে আমাগো লেইগা খাড়াইয়া রইছে।'

চলে যাবার কথায় হাসেমের মন সায় দিল না। কিছুক্ষণ ভেবে সে বলল, 'আহো (এস), এট্টু বিচারাইয়া (খুঁজে) দেখি—'

'বিচরানের কী আছে, হ্যারা (তারা) নাই।'

'তভু দেখি একবার।'

এতক্ষণে চাঁদটা অনেকখানি ঢলে পড়েছে। তবু জ্যোৎস্নার উজ্জ্বলতা এখনও মরে নি। গহরদ্দিকে নিয়ে সারা বাড়ি তোলপাড় করে খুঁজতে লাগল হাসেম।

বেশিক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতে হল না। পাছ-দুয়ারের ওধারে যেখানে পিটক্ষীরার জঙ্গল নিবিড় হয়ে আছে সেখানে আসতেই দেখা গেল, ফজল গাজী আর ফুলবানু পড়ে আছে। ফজলের দিকে আর তাকানো যায় না। খানেরা ধারাল কোনো অস্ত্র দিয়ে খুঁচিয়ে বুড়ো মানুষটাকে মেরেছে। হাত-পা-মুখ-বুক, সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত। চোখদুটো খুবলে বার করে আনা হয়েছে। গলার কাছে এবং বুকে ডেলা ডেলা ওপড়ানো মাংস ঝুলে আছে।

ফুলবানুর সারা গা রক্তে মাখামাখি। জামা কাপড় ছিঁড়ে ফালা ফালা, গাল এবং কপালে বড় বড় গর্ত। মনে হয়, কেউ কামড়ে মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।

কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল হাসেমের, মাথার ভেতরটা দ্রুত ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল। শূন্য চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ পাগলের মতো সে চেঁচিয়ে উঠল, 'মইরা গ্যাছে গহর ভাই—ফুলবানু মইরা গ্যাছে—'

গহরদ্দি কিন্তু অত সহজে বিচলিত হল না। হাড়-পাকা পোড়-খাওয়া মানুষ সে, পঞ্চাশ বাহান্ন বছরের জীবনে তার বিপুল অভিজ্ঞতা। একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে সে মেয়েটাকে দেখছিল। ফুলবানুকে সে চেনে, যৌবনের আরম্ভ থেকে এই মেয়েটার জন্য হাসেম যে অস্থির হয়ে আছে সে খবরও তার জানা। বয়সের অনেক তফাৎ থাকলেও এই নিয়ে হাসেমের সঙ্গে ঠাট্টা-ঠিসারা করেছে প্রচুর। হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল গহরদ্দি, ফুলবানুর গায়ে হাত দিয়ে কী দেখল। তারপর চমকে উঠে বলল, 'শরীলে অহনও (এখনও) ওম (তাপ) আছে রে, মাইয়াগা বাইচা রইছে মনে লয়—'

হুড়মুড় করে, যেন হাড়গোড় ভেঙে গহরদ্দির গা ঘেঁষে বসে পড়ল হাসেম। নিশ্বাস বন্ধ করে বলল, 'হাচা (সত্য) কও বাইচা আছে।'

গহরদ্দি ততক্ষণে তার হাতটা ফুলবানুর নাকের কাছে নিয়ে এসেছে। বলল, 'এট্টু এট্টু শ্বাসও পড়ে—'

'শ্বাস পড়ে!'

'হ—তয়—'

'তয় কী?'

'হুশ নাই।' বলতে বলতে গহরদ্দি ফুলবানুর একখানা হাত তুলে নাড়ি টিপে ধরল, 'নাড়িখানও

তিরতিরাইয়া বয়। চ্যাষ্টা করলে অহনও মাইয়াগারে বাচান যায়—'

'বাচান যায়!'

'মনে তো লয়।'

আচমকা চিৎকার করে উঠল হাসেম, 'তাইলে অরে বাচামু, নিয্যস বাচামু—'

গহরদ্দি ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'কিন্তুক এহানে ফালাইয়া রাখলে তো হইব না।'

'অরে লইয়া যামু গহর ভাই, বাচাইতে অরে হইবই।'

'নিবি ক্যামনে?'

চারদিক ভাল করে দেখে যখন কিছুই পাওয়া গেল না, ফুলবানুর জ্ঞানশূন্য শরীরটা পাঁজাকোলে করে তুলে উঠে দাঁড়াল হাসেম। সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ে কাঁটা দিল। এতকাল দূর থেকেই ফুলবানুকে দেখেছে সে, কখনও সখনও দু-একটা কথা বলার সুযোগ পেয়েছে কিন্তু এই প্রথম তাকে ছুঁল।

গহরদ্দি বলল, 'তর কি মাথাখান খারাপ হইয়া গেল হাসমা?'

'ক্যান?'

'কুলে (কোলে) কইরা ভরা বয়সের মাইয়া মাইনষেরে কদ্দূর লইয়া যাইতে পারবি?'

'দেখি কদ্দূর পারি।'

ফজল গাজীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওরা ঝোপজঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগল। সমস্ত দিনের না-খাওয়া দুর্বল শরীরে অলৌকিক শক্তি যেন ভর করেছে হাসেমের।

পাশাপাশি যেতে যেতে গহরদ্দি বলতে লাগল, 'বাশ দিয়া একখান চালি বানাইয়া লইলে ভাল হইত, হ্যার (তার) উপুর শোয়াইয়া কান্ধে কইরা লইয়া যাইতাম—'

হাসেম বলল, 'হ—'

'বাশ না হয় ছোপ (ঝাড়) থনে পামু। কিন্তুক দড়ি কই, দা-ও কই?'

'হে একখানা কথা। লও (চল), যাইতে যাইতে যদি পাইয়া যাই।'

একসময় ওরা জেলাবোর্ডের সড়কে এসে পড়ল। পাঁচ সাতটা গ্রামের অবশিষ্ট জীবন্ত মানুষের দলটা এদিকেই তাকিয়ে ছিল।

উদ্বেগের গলায় ভুবন গোঁসাইর মা বলল, 'বাইচা আছে মাইয়াগা—বাইচা আছে?'

গহরদ্দি বলল, 'আছে। তয় হুশ নাই।'

এবার খুব ভাল করে ফুলবানুকে লক্ষ করল ভুবন গোঁসাইর মা। সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল, 'অয় রে অয়, জল্লাদেরা কী সর্বনাশ কইরা গ্যাছে রে মাইয়াগার! অয় রে অয়—'

বুড়ির দেখাদেখি অন্য সবাইও কেঁদে উঠল। ফুলবানুকে দেখতে দেখতে কিছুক্ষণ আগে তাদের ছেলেমেয়ে ঘর-সংসার এবং গ্রামগুলোর কী দশা হয়েছে, সেইসব টাটকা রক্তাক্ত ভয়াবহ স্মৃতি আবার নতুন করে মনে পড়ে গেছে হয়তো।

কান্নার মধ্যেই ওরা আবার হাঁটতে শুরু করল।

চাঁদটা গাছগাছালির তলায় আরো অনেকটা নেমে গেছে। খানিক আগেও জ্যোৎস্না ছিল উজ্জ্বল, গলানো রুপোর মতো। এখন সেটা ক্রমশ নিস্তেজ এবং হলুদবর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

গহরদ্দি, আনিস কিংবা বিনোদ এধার ওধার থেকে বলল, 'না পারলে কইস হাসমা, মাইয়াগারে আমরাও কান্দে কইরা এট্টু এট্টু লইয়া যামু। হগলে মিলা নিলে তর একার অত কষ্ট হইব না।'

হাসেম বলল, 'আইচ্ছা কমু—'

ওরা চলেছে, চলেছে, চলেছে। খানের বাচ্চাদের বন্দুকের পাল্লার বাইরে এত বড় আসমানের তলায় কোথায় নিরাপদ আশ্রয় আছে, তারা জানে না। কোথায় যাচ্ছে তার নির্দিষ্ট ধারণা নেই। তবু যেতে হচ্ছে।

দুধারে চকের পর চক, বউন্যা আর হিজেলের বন, হলুদবর্ণ চাঁদের আলো কিংবা খালবিল, ঝোপ-জঙ্গল, ঝিঁঝিদের অশান্ত বিলাপ, থেকে থেকে হুতুম প্যাঁচার গম্ভীর আওয়াজ, ঝাঁক ঝাঁক জোনাকির ওড়াউড়ি—কিছুই দেখতে শুনতে বা বুঝতে পারছিল না হাসেম। ফুলবানুর অসাড় জ্ঞানশূন্য শরীরটা

বয়ে নিয়ে যেতে যেতে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল সে। আর নিজের জীবনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।

হায় রে হায়, কী জীবন ছিল তার!

সেই কোন ছোটকালে বাপ-মাকে খেয়ে বসেছে হাসেম, সে কি আজকের কথা! তখন তার বয়স দশও পেরোয় নি।

সব কথা ভাল মনেও নেই। তিরিশ বছর আগের সেই দিনগুলো স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে গেছে। আবছা আবছা এটুকু মনে পড়ে, তার বাপজান ছিল হেলে চাষা। জমিজিরাত বাড়িঘর তার কিছুই ছিল না। সম্পত্তি বলতে শুধু একজোড়া হাল। চাষের সময় কিংবা ধানকাটার মরসুমে নহরপুরের ধানী গৃহস্থেরা তাকে কাজে নিত। যে কাজে নিত সে-ই থাকবার জন্য একখানা ঘর টর দিত ওদের। তারপর কাজ ফুরোলে ঘর ছেড়ে চলে যেতে হত।

কাজ আর ক'দিনের? ধান বুনতে দুমাস, কাটতে দুমাস। এই চারটে মাস বাদ দিলে বাকি আটটা মাস বড় কষ্টে কাটত তাদের।

এই দেশে কত লোক কত রকম কাজ করে পেটের ভাত জোগাড় করে। কেউ কামলা খাটে, কেউ লোকের বাড়ি গিয়ে পাট 'জাগ' দেয়, খালবিল থেকে নদী থেকে মাছ ধরে হাটে-গঞ্জে বেচে আসে কেউ। কিন্তু হাসেমের বাপ রহিমুদ্দি চাষের কাজ ছাড়া আর কিছুই পারত না।

ধানের খন্দ বাদ দিলে সংসারের সব দায় গিয়ে পড়ত মায়ের ওপর। মা তখন এর বাড়ি ধান ভেনে ওর বাড়ি মুড়ি ভেজে দিয়ে কখনও বা চেয়ে চিন্তে ভিক্ষে করে তিনটে মানুষের পেট চালাত। যেদিন মা কিছু জোটাতে পারত না, সেদিন একেবারে নির্জলা উপোস। উপোস দিয়ে দিয়ে হাড় কালি হয়ে গেছে হাসেমের।

তারপর একদিন বাপ মরল, তার কিছুদিন বাদে এক সপ্তাহের ধুম জ্বরে মা-ও মরল।

যেমনই হোক একটা বাপ ছিল মাথার ওপর, একটা মা ছিল। তারা মরে গেলে একেবারে অথৈ সমুদ্রে গিয়ে পড়ল হাসেম।

বাপ-মা তার জন্য কিছুই রেখে যায় নি। না একখানা ঘর, না এক টুকরা জমি, না টাকাপয়সা সোনাদানা। একটা কানাকড়িও সে পায় নি। পাওয়ার মধ্যে পেয়েছে খানতিনেক ছেঁড়া তেলচিটে কাঁথা, একটা খেজুর পাতার চাটাই, দুখানা লুঙ্গি। আর পেয়েছে অভাব কষ্ট আর উপোসের উত্তরাধিকার।

হায় রে হায়, মা-বাপ মরবার পর কী দিন শুরু হল তার! দুমুঠো ভাতের জন্য তখন কুকুরের বাচ্চার মতো নহরপুরে যত বাড়ি আছে, ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে হাসেম। তিরিশ বছর আগে দেশের হাল কি আজকের মতো ছিল! সস্তাগণ্ডার দিন তখন, সবার না হলেও জমিজিরাতওলা গৃহস্থদের ঘরে প্রচুর খাদ্য। চাল-ডাল মাছের তো কথাই নেই, সারা বছর ঘি-দুধের বান ডেকে থাকত তাদের সংসারে। একটা ছোট ছেলে সেই প্রাচুর্যের কতটুকুই বা কমাতে পারে? হাসেম গেলে তাই কেউ আর না বলত না। ওর বাপ রহিমুদ্দি ছিল বেজায় ভালমানুষ, সবসময় হাসিমুখ। মার আর ধর, গালাগাল দাও আর যাই কর, সে শুধু হাসত। আর যে যা বলত মুখ বুজে হাসিমুখে তা-ই করে দিত। এমন একটা মানুষ যখন মরল তখন স্বাভাবিক কারণেই তার ছেলেটার ওপর সবার করুণা এসে পড়ল। হাসেমকে দেখলেই সারা নহরপুর গ্রামটা বলাবলি করত, 'আহা রে, কী দুঃখু ছ্যামরার!'

সবার করুণা এবং সহানুভূতি গায়ে জড়িয়ে ক'টা বছর কেটে গেল। কিন্তু হাসেমের মধ্যে কোথায় যেন একটা স্বাধীন মর্যাদাসম্পন্ন একরোখা মানুষ ছিল। সে যত বড় হচ্ছিল ভেতরের সেই মানুষটা তাকে অস্থির করে তুলছিল, 'এমুনভাবে পরের বাড়িত্ চাইয়া খাইয়া আর কদ্দিন কাটাবি? জুয়ান (জোয়ান) মরদ হইছস, তর কি শরমও লাগে না হাসমা! এইর থনে মইরা যা।'

হাসেম ঠিক করে ফেলেছিল, আর না, এমন কুকুরছানার মতো দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াবে না। ভাবামাত্র মতিউর হোসেন সাহেবের কাছ থেকে চেয়ে ওঁদের ঝাড় থেকে দুটো মূলি বাঁশ কেটে এনেছিল। তাই দিয়ে বানিয়ে নিয়েছিল 'পলো' আর 'চাই'। উত্তরের চক-এর গা ঘেঁষে যে খালটা, 'চাই'গুলো সেখানে পেতে রেখে এসেছিল, 'পলো' নিয়ে নেমেছিল বিলে। তাছাড়া নিকারিপাড়া থেকে একখানা আধ-ছেঁড়া 'ধর্মজাল'ও চেয়ে এনে সারিয়ে সুরিয়ে নিয়েছিল। সেটা নিয়ে সে যেত গিরিগঞ্জের কাছে

বড় নদীটায়। দারুণ পরিশ্রমে জল থেকে যে রুপালি ফসল তুলে আনত, তাই নিয়ে চলে যেত ইনামগঞ্জের হাটে।

তবে মাছ ধরাটাই তার একমাত্র রোজগারের পথ ছিল না। শুধু প্রাণে বেঁচে থাকার জন্য হাজারটা উঞ্ছবৃত্তি করতে হত। কখনও দেখা যেত কামলা খাটছে, কখনও 'গয়নার নৌকা'য় গুণ টানছে, কখনও বা ইনামগঞ্জের বড় বড় আড়তগুলোতে ধানচালের বস্তা বইছে। তবে চাষ-আবাদের কাজ সে ছাড়ে নি, বাপ রহিমুদ্দির মতো জমিজিরাতওলা গৃহস্থদের বাড়ি দুমাস ধান বুনে আর দুমাস ধান কেটে মোট চারটে মাস কাটিয়ে দিত। তখন রহিমুদ্দির মতোই যে বাড়িতে সে কাজ নিত সেখানেই থাকত। বাকি আটটা মাস তার থাকার ঠিকানা ছিল না, খাওয়ারও ঠিক থাকত না। তখন সারাদিন খালে-বিলে কি চকে-টকে ঘুরে সন্ধেবেলায় চলে যেত নিকারি কি মৃধাদের পাড়ায়। চাল-ডাল, আনাজপাতি কিংবা খানিকটা করে মাছ নিয়ে যেত সঙ্গে করে। ওদের রান্নাটান্না হয়ে গেলে সেই আখায় নিজেরটা ফুটিয়ে নিত। তারপর ওখানেই কারো ঘরের দাওয়ায় রাত কাটিয়ে দিত।

নিকারি কি মৃধারা বড় গরিব। কারো হোগলার ঘর, কারো বা ক্যাঁচা বাঁশের। ঘরই যাদের এমন তাদের দাওয়া কেমন হতে পারে? তার তিনদিকই খোলা। সারা বছর যেমন তেমন, বর্ষা আর শীতটা ভারি কষ্টে কাটত হাসেমের।

সমস্ত বছর শুধুমাত্র প্রাণে বেঁচে থাকবার জন্য জলে-স্থলে নিদারুণ যুদ্ধ তার। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে এবং পৌষ মাঘ মাসে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে তার চামড়া ফেটে ফুটে গিয়েছিল। হাত-পা হেজে বার মাস আঙুলের ফাঁকে ঘা হয়ে থাকত। হায় রে, কী জীবন ছিল তার!

এই পৃথিবীতে টিকে থাকবার জন্য সবসময় তাকে এত লড়াই করতে হত যে অন্য কোনোদিকে তাকাবার সময় ছিল না। তবে তার গলাখানা ভারি মিঠা। বাঁ হাতে একটা কান চেপে ডান হাতখানা সামনে বাড়িয়ে যখন গাজীর গীত, রয়ানি গান কি গুণাই বিবির গান ধরত, শ্রোতাদের বুকের ভেতর রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করে ভাঙতে থাকত। তার গান শুনবার জন্য দূর দূর হাটে কি গঞ্জে ডাক পড়ত। সব জায়গায় সে যেতে পারত না, কোথাও কোথাও যেত।

মনে আছে, সেই যেবার বড় নদী খেপে উঠে গিরিগঞ্জের বন্দর ডুবিয়ে দিয়েছিল, এত বড় বান এ অঞ্চলের কেউ বাপের জন্মে দেখে নি— সেবার গুণাইবিবির গান গাইতে হাসেম গিয়েছিল মাইনকার চরে। আর তখনই সে প্রথম দেখল ফুলবানুকে।

কিন্তু ফুলবানুর কথা পরে। তার আগে আরো ক'টা বছর আছে।

জন্ম ইস্তক হাসেমের জীবনে একটাই রং, তার নাম কষ্ট। বাঁচবার জন্য যুদ্ধ করতে করতে হঠাৎ একদিন তার চোখে পড়েছিল নহরপুরে, শুধু নহরপুর কেন, গিরিগঞ্জ রসুলপুর মাইনকার চর থেকে আরম্ভ করে সেই সুদূর ইনামগঞ্জ পর্যন্ত দাঙ্গা লেগে গেছে। রক্তে এখানকার মাটি লাল হয়ে উঠেছিল। সে সব কী দিন গেছে! ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিল হাসেম।

তার কিছুদিন পর দেশখানা দুটুকরা হয়ে গেল। তাদের এই টুকরাটার নাম হল পাকিস্তান। যেদিন পাকিস্তান হল সেদিন এলাহী কাণ্ড। সেদিনই বড় মসজিদের সামনের মাঠটায় প্রকাণ্ড শামিয়ানা খাটানো হল। ফুলপাতা আর চাঁদতারা-মার্কা পতাকা দিয়ে সেটা সাজানোও হয়েছিল।

পাকিস্তান যেদিন হল সেদিন সারা সকাল সেই শামিয়ানার তলায় ইংরাজি বাজনা বেজেছে। বিকেলে বসেছিল 'মিটিন'। চারপাশের গ্রামগুলো ওখানে ভেঙে পড়েছিল। ঢাকা শহরের বড় বড় মিয়াসাহেবরা এসেছিলেন, মহকুমা আর জেলা শহর থেকে এসেছিলেন এস.ডি. ও এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। তারপর সে কি বক্তৃতার ধুম! সাত গ্রামের মানুষের সামনে সবাই এক কথা বলেছিলেন, 'এতকাল আমাগো উপুর মেলা অবিচার হইছে। হেই কারণে দ্যাশ ভাগ কইরা লওয়া হইল। অহন থনে আমরা সুখে থাকতে পারুম, শান্তিতে থাকতে পারুম। আমাগো সগল দুঃখু ঘুচব।'

আরো অনেক কথা বলেছিলেন বড় শহরের বড় মানুষরা। তার একটা বর্ণও বুঝতে পারেনি হাসেম। আবছাভাবে এইটুকুই তার মাথায় ঢুকেছিল, এই পাকিস্তান দেশটা তাদের ভালর জন্য তৈরি হল। তারপর সন্ধে হলে আতসবাজি পোড়াবার সে কি বিপুল আয়োজন। মাঝরাত পর্যন্ত নহরপুরের আকাশ আলোয় আলোয় ভরে ছিল।

দেশভাগের পর আট দশ মাসও কাটল না, বারুইপাড়া কুমোরপাড়া যুগিপাড়া বামুনপাড়া থেকে অনেক লোক কোথায় যেন চলে গেল। এক একটা দিন যায়, আর গ্রাম ফাঁকা হতে থাকে। শুধু তাদের গ্রামই না, চারপাশের গ্রামেও ভাঙন ধরল। হাটেগঞ্জে গিয়ে হাসেম শুনেছে শুধু তাদের এই অঞ্চলেই না, অনেক দূরে কোথায় ফরিদপুর জিলা, কোথায় নোয়াখালি, কোথায় যশোর খুলনা, চাটগাঁ—সব জায়গা থেকেই নাকি বহু মানুষ চলে যাচ্ছে। সে শুনেছে ওরা সব যাচ্ছে কলকাতায় আসামে আগরতলায়। এইসব দেশ কতদূরে, দুনিয়ার কোন প্রান্তে— কে জানে।

শহরের মানুষরা এসে ভরসা দিয়ে গিয়েছিল, এবার থেকে তাদের সব দুঃখ ঘুচে সুদিন আসবে। কিন্তু পাকিস্তান হবার পর ক'বছর কেটে গেল, তবু কিছুই হল না, অন্তত হাসেমের। তার দিন আগেও যেমন কাটছিল—পরের জমিতে হাল দিয়ে, পরের খেতের ধান কেটে, নিকারি কি মৃধাপাড়ার খোলা বারান্দাগুলোতে শুয়ে, শীতে আর বর্ষায় দারুণ কষ্ট পেয়ে—তেমনই কাটতে লাগল।

সেজন্য বড় একটা আপসোস নেই হাসেমের, অভিযোগও না। পৃথিবীর কাছে তার দাবি সামান্য। সারা জীবন কষ্ট করে করে এমন হয়েছে যে চাওয়ার মাপটা তার খুব ছোট হয়ে গেছে।

হাসেমের চোখের সামনেই নহরপুরের বামুনদের যুগিদের ছেড়ে যাওয়া ঘরবাড়ি জমিজিরাত কত লোকে দখল করে নিল। সে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখল, কিন্তু কোনো একটা ফাঁকা বাড়িতে গিয়ে যে ঢুকবে তেমন ইচ্ছাটুকুও হল না।

দেশের কথা থাক। মনে পড়ে পাকিস্তান হবার ছ'সাত বছর পর গুণাইবিবির গীত গাইতে গিয়েছিল মাইনকার চরে। সেখানে আসরভরা মানুষ। একধারে বসে ছিল পুরুষ মানুষেরা, আর এক দিকে একটু আড়ালমতো জায়গায় মেয়েদের বসবার জায়গা হয়েছিল।

গান গাইতে গাইতে মেয়েদের ভিড়ে বার বার তার চোখ চলে যাচ্ছিল। সেইখানে সে প্রথম দেখেছিল ফুলবানুকে।

সেদিন ফুলবানুর নাম জানত না হাসেম। সে কাদের মেয়ে, কোথায় থাকে— সবই ছিল অজানা। তবে মোটামুটি আন্দাজ করেছিল, এই মাইনকার চরেই তাদের বাড়ি।

তার দিকে তাকিয়ে চোখ আর ফেরাতে পারে নি হাসেম। পরস্তাবে (রূপকথায়) হুরী-পরী আর সুন্দরী রাজকন্যার গল্প শুনেছে সে। এ যেন সে-ই। কিবা মুখ তার, কিবা চোখ, কিবা গড়ন! মেয়েটার গায়ের রং পাকা ধানের মতো, পাতলা ফুরফুরে ঠোঁট, ছোট্ট কপাল, ঘন মেঘের মতো একমাথা চুল।

সেই বয়সে কত মেয়েই তো দেখেছে হাসেম। ভুঁইয়াদের মেয়ে, মীরেদের মেয়ে, গোঁসাইদের মেয়ে। কিন্তু মাইনকার চরের এই মেয়েটার মতো আর কেউ তার চোখে পড়ে নি। যতক্ষণ সে গান গেয়েছে, মেয়েটা মুগ্ধ চোখে পলকহীন তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। কত আর বয়স তখন হাসেমের! সবে নতুন যৌবন, তার বুকে সিরসিরিয়ে ঢেউয়ের মতো কী যেন খেলে গেছে।

গান টান গেয়ে সেইদিনই মাইনকার চর থেকে ফিরে এসেছিল হাসেম। কিন্তু মেয়েটাকে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না।

জীবনধারণ ছাড়া এতকাল আর কিছুই ভাবতে পারে নি হাসেম। কোনোরকমে শুধু টিকে থাকা—জন্মে থেকে এই ছিল তার ধ্যানজ্ঞান। কিন্তু মাইনকার চরের ওই মেয়েটা সব ওলট পালট করে দিয়েছিল।

সেদিন গুণাইবিবির গান গেয়ে আসার পর তার জীবনের বাইরের দিকটায় তেমন কিছুই বদলায় নি। আগের মতোই সব চলছিল। কিন্তু পরের জমিতে নিড়ান দিতে দিতে, নিরালা বিলের জলে ধর্মজাল পেতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কিংবা নিকারিদের খোলা বারান্দায় শুয়ে শুয়ে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যেত হাসেম। আর মাইনকার চরের ওই মেয়েটা স্বপ্নের মতো তার চোখের সামনে ভাসতে থাকত।

দিনকয়েক পর আর পারে নি হাসেম। নিজের অজান্তেই কী এক ঘোরের মধ্যে ঠাটা-পড়া রোদ মাথায় নিয়ে দুপুরবেলা সে মাইনকার চরে চলে গিয়েছিল।

ক'দিন আগে গুণাইবিবির গান গেয়ে গ্রামটাকে মাত করে গিয়েছিল হাসেম। তাকে দেখে সবাই চিনতে পেরেছিল। যার সঙ্গেই দেখা হয়েছে সে-ই জিজ্ঞেস করেছে, 'কি মিয়া, এই দুফারবেলায় আমাগো গেরামে?'

হাসেম বলেছিল, 'এট্টা কামে আইছিলাম।'

'কী কাম?'

এবার অস্পষ্টভাবে এমন জবাব দিয়েছে হাসেম যে কিছুই বোঝা যায় নি।

'খাওন দাওন হইছে?'

'হ।'

'হউক। নহরপুর থনে (থেকে) খাইয়া আইছ, হেই ভাত কি আর প্যাটে আছে! এই দুফারবেলায় তুমারে দু'গা না খাওয়াইয়া ছাড়ুম না।' খুব আদর করে মাইনকার চরের লোকেরা তাকে ডেকেছে, 'আহো (এস)—'

হাসেম বলেছে, 'আইজ না, আরেকদিন আইসা খাইয়া যামু—'

'আইবা তো?'

'নিয্যস আসুম।'

মাইনকার চর একটুখানি জায়গা না। সমস্ত দুপুর আর বিকেল স্মরা গ্রাম সে চযে বেড়িয়েছে কিন্তু গানের আসরের সেই মেয়েটির দেখা পায় নি।

হায় হায় রে, কী আহাম্মক হাসেম! তার জন্য যুবতী মেয়ে কি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকবে! তা ছাড়া মেয়েটার নামও জানা নেই। আর জানলেই বা কী। এ কথা কি কাউকে জিজ্ঞেস করা যায়, 'আমি অমুক মাইয়ার লাইগা আইছি গো, তুমরা আমারে তার বাড়ি দেখাইয়া দাও।' কারো বাড়ির ভেতর ঢুকেও খুঁজে খুঁজে দেখা যায় না। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পুকুরঘাট, খালের পাড় কিংবা যে বাড়ির যতটুকু দেখা যায়, হাসেম লক্ষ করেছে। কিন্তু পরস্তাবের সেই সুন্দরী রাজকন্যা নেই, কোথাও নেই। এক এক বার তার সন্দেহ হয়েছে, সত্যিই সেদিন ওরকম একটা মেয়ে দেখেছিল কিনা। এমনও হতে পারে, মেয়েটা ভিন গেরামের, এখানে কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বেড়াতে এসেছিল। তা হলে কি এ জন্মে তার সঙ্গে আর দেখা হবে না? ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত, তার চাইতেও বেশি হতাশ, হাসেম সন্ধের আগে আগে নহরপুরে ফিরে যাবার জন্য যখন জেলাবোর্ডের সড়কে এসে উঠেছে সেই সময় আরে—আরে—কি আশ্চর্য, উত্তর দিক থেকে সেই মেয়েটা, সেই মেয়েটাই তো আসছে। তার সঙ্গে কাঁচা পাকা দাড়িওলা মধ্যবয়সী একটি লোক এবং দু'তিনটে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে।

মাঝবয়সী লোকটা আধ-চেনা গোছের। ইনামগঞ্জের হাটে অনেকবার দেখেছে তাকে, তবে আলাপ-সালাপ হয় নি। হাসেম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। মেয়েটার মুখের ওপর তার চোখের তারা স্থির।

একটু পর ওরাও কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মাঝবয়সী লোকটা এক পলক তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'হাসেম মিয়া না?'

হাসেম খুব বিনীতভাবে বলেছিল, 'হ মেয়াছাব, সালাম—' মাথা ঝুঁকিয়ে সে আদাব জানিয়েছিল।

'সালাম—' বলেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল প্রৌঢ়, 'ওঃ, হেইদিন গুণাইবিবির আসরে কিবা গীত গাইলা! চৌখের পানি আর ধইরা রাখতে পারি না।'

'ভাল লাগছে তাইলে আমার গীত!' প্রৌঢ়র সঙ্গে কথা বলছিল ঠিকই হাসেম কিন্তু তার চোখ অস্থিরভাবে বার বার সেই মেয়েটার দিকে চলে যাচ্ছিল।

মাঝবয়সী গলা তুলে প্রায় চেঁচিয়েই উঠেছিল, 'লাগছে। আমার বিবি, পোলামাইয়া—হগ্গলের ভাল লাগছে।' বলেই সেই মেয়েটির দিকে ফিরেছিল, 'নারে ফুলবানু?'

সেই প্রথম হাসেম জানতে পেরেছিল, মেয়েটার নাম ফুলবানু।

ফুলবানু চোখ নামিয়ে আস্তে করে মাথা নেড়েছিল। আর হঠাৎ শীত লাগার মতো হাসেমের গায়ে যেন কাঁটা দিয়েছিল। কত লোকেই তো তার গান শুনে কত তারিফ করেছে কিন্তু ফুলবানুর ওই আস্তে আস্তে মাথা নাড়ার তুলনা নেই। হাসেমের মনে হয়েছিল, গানের জন্য জীবনের সব চাইতে সেরা পুরস্কারটা সে সেদিনই পেয়ে গেছে।

প্রৌঢ় আবার বলেছিল, 'খোদাতাল্লা তুমারে গলা দিছিল একখান মিয়া! হে যাউক, তুমি না নহরপুরে থাক?'

'হ।'

'এহানে (এখানে) কই আইছিলা?'

হাসেম চমকে উঠেছিল, জড়ানো গলায় ভাসা ভাসা জবাব দিয়েছিল, 'এই কাছাকাছি—'

'কাম আছিল?'

যে কাজে এসেছিল তা তো আর বলা যায় না। হাসেম বলেছিল, ' তেমুন কিছু না।' পাছে এ ব্যাপারে প্রৌঢ় আর কিছু জিজ্ঞেস করে, সেই ভয়ে হাসেম তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, 'মনে লয়, আপনেরা কই যিনি (যেন) যাইতে আছেন—'

'যাই না, ফিরতে আছি।' দক্ষিণ দিকে ধু ধু চকের ওপারে আঙুল বাড়িয়ে প্রৌঢ় বলেছিল, 'উই-উইদিকে ছন্দিপুর গেরাম, চিন (চেন) তো?'

'চিনুম না ক্যান?'

'হেইখানে আমার হউর বাড়ি (শ্বশুর বাড়ি)। দাওয়াত আছিল, বুঝল মিয়া। সকালে উইঠ্যা গেছিলাম পোলামাইয়া লইয়া।' একটু থেমে আবার বলেছিল, 'জবর খাওয়াইছে হউরে (শ্বশুরে)। চাইর কিসিমের মাছ, গোস্ত, দুধ, অমত্তসাগর কলা, পাতক্ষীর। খাওনের কি চোট রে! খাইয়া প্যাটের ভারে আর উঠতে পারি না।'

টের পাওয়া গিয়েছিল, লোকটা খেতে টেতে ভালবাসে। হাসেম কিছু বলেনি, অল্প একটু হেসেছিল।

মধ্যবয়সী একটু ভেবে আবার বলেছিল, 'খাওনের কথা থাউক। অহন তুমি চললা কই মিয়া? নহরপুরে নিহি?'

'হ।'

'সময়-সুযুগ পাইলে আমাগো বাড়িত আইসো। এই যে মাইনকার চর গেরাম, এহানে ঢুইকা আমার নাম কইলেই মাইনষে বাড়ি দেখাইয়া দিব।'

'আইচ্ছা। কিন্তুক—'

'কী?'

'আপনের নামখান যদি জানতাম—'

'আমার নামই জানো না? মাইনষে আমারে ফজল গাজী কয়—'

সেই শুরু। তারপর থেকে মাসে দু'তিনবার করে মাইনকার চরে যেতে লাগল হাসেম।

ফজল গাজীদের অবস্থা মোটামুটি। চকে কানি দশকের মতো ভাল তেফসলা টনকি জমি আছে তার। তাতে পাট হয়, ধান হয়, আবার রবিশস্যও ফলে। ধলেশ্বরীর নামাল চরে অল্প কিছু নীরেস জমিও আছে, সেখানে হয় গাবের দানার মতো মোটা মোটা বোরো ধান।

জমিজমা ছাড়া আছে ছোট একখানা বাড়ি। তাতে খানদুই তেইশের বন্দের টিনের ঘর, কিছু বাগবাগিচা, একখানা পুকুর।

জমির ফসল ছাড়া আর কোনো আয় নেই ফজল গাজীর। জমিই তার বল-ভরসা, জমির সঙ্গেই তার বাঁচা-মরা জড়ানো।

মানুষটা বেশ ভালই। হাসেম গেলে আদর করে তাকে বসাত, মুড়ি-চিঁড়ে-ফলফলারি—ঘরে যখন যা থাকত খাওয়াত, পান-তামাক দিয়ে আপ্যায়ন করত। আর করত নানা রকম গল্প। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার সব খবর জেনে নিয়েছিল ফজল গাজী। বাপ-মা নেই শুনে বলেছিল, 'আহ্‌হা রে!' ঘরবাড়ি জমি জিরাত নেই শুনে বলেছিল, 'আহ্‌হা রে।' লোকের বাড়ির বারান্দায় রাত কাটায় শুনে বলেছিল, 'আহ্‌হা রে!'

গল্পই শুধু হত না, মাঝে মধ্যে গানের আসরও বসত। তখন ফজল গাজীর বিবিজান আর ছেলেমেয়েরা ভেতর বাড়ি থেকে চলে আসত। তবে হাসেম যাকে চাইত, যার জন্য রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে পাক্কা সাত-আট মাইল পাড়ি দিত, সে কিন্তু কাছে ঘেঁষত না। অন্য সময় তাকে বড় একটা দেখা যেত না। কিন্তু যেই এক হাতে বাঁ কানটা চেপে অন্য হাতটা সামনে বাড়িয়ে সে গান ধরত, জানালার ফাঁকে কিংবা দরজার পাশে ঘন পালকে-ঘেরা এক জোড়া বড় কালো চোখ চকিতের জন্য দেখা দিয়েই মিলিয়ে যেত।

যাওয়া-আসা করতে করতে ফজল গাজীর বিবিজানের সঙ্গেও আলাপ হয়ে গিয়েছিল। মেলার আহ্লাদী পুতুলের মতো ছোটখাট গোলগাল চেহারা। কথায় কথায় বিবিজানের হাসি। এমন হাসিখুশি

মানুষ আগে আর কখনও দেখে নি হাসেম।

তাকে দেখলে গাজী সাহেবের অন্য ছেলেমেয়েরা ছুটে আসত। যতক্ষণ সে ও বাড়িতে থাকত, তারা ওর কাছছাড়া হত না, গায়ের সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকত। কিন্তু যার জন্য দিনের পর দিন এত ছোটাছুটি এত পরিশ্রম, সেই ফুলবানু কেন যে কাছে ঘেঁষত না।

মাইনকার চরে কোথায় কার জন্য দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিয়মিত যাতায়াত করছে, এই খবরটা কেমন করে যেন নহরপুরের মৃধাপাড়ায় নিকারিপাড়ায় রটে গিয়েছিল।

নিকারি পাড়ার বৌ-ঝিরা চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই নিয়ে আড়ে-ঠারে ঠাট্টা-ঠিসারা করত। একদিন সন্ধেবেলা চালডাল নিয়ে যখন সে নিকারিপাড়ায় গেছে, গহরদ্দির জরু হারুনা বিবি বলেছিল, 'মাইয়াগা ক্যাঠা (কে)?'

আশেপাশে নিকারিপাড়ার আরো অনেক মেয়ে-বউ ছিল। চোখের তারা নাচিয়ে ওরাও গলায় রং তামাসা লাগিয়ে বলেছিল, 'ক্যাঠা গো, ক্যাঠা?'

বুকের ভেতরটা ছাঁত করে উঠেছিল হাসেমের। এমনিতে তার স্বভাবটা লাজুক ধরনের। চোখে মুখে সে কথা বলতে পারে না। দুটোর বেশি একসঙ্গে চারটে কথা বলতে গেলে তার গলার স্বর জড়িয়ে যায়।

এতগুলো মেয়েমানুষ তার কী হাল করে ছাড়বে, ভাবতেই দম আটকে এসেছিল। ভয়ের গলায় সে বলেছিল, 'কার কথা কও?'

'কার কথা! আহ্‌হা রে, কিছুই য্যান জানে না। ডুইবা ডুইবা জল খাও, ভাবো আমরা ট্যার পাই না! পাই গো মিয়া, পাই। অহন কও কে বা তুমারে 'গুণ' করল।'

হাসেম চুপ।

ওসমানের বউ তাহেরা বিবি বলেছিল, 'হ্যায় (সে) কি বড় সোন্দরী!'

হাসেমের উত্তর নেই।

জালালের চাচাতো বোন নছিরনের রূপের বড় দেমাক। চামড়াখানা ধলা বলে মাটিতে তার পা পড়তে চায় না। সে বলেছিল, 'কেমুন সোন্দর? আমার থনেও (চাইতেও)?'

হাসেমের মুখে এসে গিয়েছিল, 'হারামজাদী মাইয়া, তুই তার কাছে একখান আস্তা বান্দরী (বাঁদরী)।' কিন্তু মুখ ফুটে তা তো আর বলা যায় না।

যে মানুষ মুখ খোলে না, তার পেছনে আর কতক্ষণ লাগা যায়! নিকারিপাড়ার বৌ-ঝিরা একসময় ক্লান্ত হয়ে যে যার ঘরে চলে গিয়েছিল। সেদিনকার মতো গেলেও ঠাট্টা-ঠিসারা তারা ছাড়েনি। সন্ধেবেলা নিকারিপাড়া কি মৃধা পাড়ায় গেলেই মেয়েমানুষগুলো তাকে ছেঁকে ধরত। খানিকটা সময় তাকে নিয়ে আমোদ করা আর কি।

নহরপুর থেকে মাইনকার চর, মাইনকার চর থেকে নহরপুর—এই করে ক'বছর কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন ফজল গাজী আর তার বিবিজান কথায় কথায় জানিয়েছিল তারা ফুলবানুর সাদি দেবে। ধলেশ্বরীর ওপারে রহমতপুরের খানেদের সঙ্গে এ নিয়ে কথাবার্তা চলছে। খানেরা নাম করা ঘর। অবস্থাও ভাল। দু-তিন শ কানি দোফসলা জমি ওদের। হাল-হালুটি বিশ জোড়া। একমাল্লাই দোমাল্লাই চারমাল্লাই আর কোষ মিলিয়ে ষোলখানা নৌকা, ধানের ডোলই আছে তিরিশটা, বাড়িতে নতুন ঢেউটিনের ঘর যে কত লেখাজোখা নেই। তা ছাড়া মানুষও ওরা খুব সৌখিন। ফজল গাজী নিজের চোখে দেখে এসেছে খানেদের ঘরে কলের গান আছে, ব্যাটারিওলা রেডিও আছে, সাইকেল আছে। সব চাইতে বড় কথা, যে ছেলেটির সঙ্গে সাদির কথা চলছে সে চকে গিয়ে হাল দেয় না। চার বছর স্কুলে যাওয়া-আসা করেছে, পেটে অনেকখানি বিদ্যা আছে। দেখতে শুনতেও চমৎকার। এই লম্বা, ভরা ভরতি শরীর, পুরুষ মানুষ বলতে যা বোঝায়, তা-ই। রংটা একটু চাপা, তা হোক। পুরুষ মানুষের রং ধুয়ে কি লোকে জল খাবে? মোট কথা, খানেদের বাড়ির ছেলেকে খুবই পছন্দ হয়ে গিয়েছিল ফজল গাজীর।

শুনতে শুনতে চোখের আলো নিভে গেছে হাসেমের। ভাঙা, ঝাপসা গলায় সে বলেছিল, 'শাদি কি ঠিক হইয়া গ্যাছে?'

'না, কথাবাত্‌রা চলতে আছে।'

'পোণ কত ট্যাকা দিব?'

'পচিশ কুড়ি চাইছি।'

'পচিশ কুড়ি—' শব্দ দুটো পুরোপুরি উচ্চারণ করবার আগেই শ্বাস আটকে গিয়েছিল হাসেমের।

সেদিন আর বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে নি সে। ফজল গাজীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যখন জেলাবোর্ডের উঁচু সড়কটায় গিয়ে উঠেছিল তখন বিকেল। খালে-বিলে মাঠে-ঘাটে এবং গাছপালার গায়ে প্রচুর আলো মাখানো ছিল, তবু কিছু সে দেখতে পাচ্ছিল না। অন্ধের মতো পথ হাতড়ে হাতড়ে হাঁটতে হাঁটতে হাসেম শুধু ভাবছিল পঁচিশ কুড়ি টাকা কত টাকা!

নহরপুরে ফিরে সোজা সে চলে গিয়েছিল নিকারিপাড়ার গহরদ্দির কাছে। সারা রাস্তা যে কথাটা ভাবতে ভাবতে সে এসেছে তাকে তা-ই জিজ্ঞেস করেছিল।

খানিকক্ষণ হাঁ করে থেকে গহরদ্দি বলেছিল, 'ক্যান রে, ক্যান?'

'কাম আছে, কও না—'

বিড় বিড় করে হিসেব কষতে কষতে রাত প্রায় কাবার করে এনেছিল গহরদ্দি, সঙ্গে সঙ্গে ঘেমে নেয়ে অস্থির। বলেছিল,'হে মেলা (অনেক) ট্যাকা।'

অসীম ধৈর্য নিয়ে সারাক্ষণ গহরদ্দির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল হাসেম। তার হিসেব কষা শেষ হলে বলেছিল, 'মেলা (অনেক) ট্যাকা তো বোঝলাম। কয় শ—'

'চাইর পাঁচশ হইব।'

চার পাচশ! একটা একটা করে অতগুলো টাকা এক জায়গায় 'ভুর' (স্তূপ) করলে কিরকম দেখাবে ভাবতে চেষ্টা করেছিল হাসেম। কিন্তু থই পায়নি।

বাপের জন্মে একসঙ্গে পঞ্চাশ ষাট টাকার বেশি দেখে নি হাসেম। তার কল্পনাশক্তি এত দুর্বল যে চার পাঁচ শ পর্যন্ত পৌঁছয় না। তবু মনে মনে সে স্থির করে ফেলেছিল, টাকা জমাতে থাকবে। কিসের আশায় সে সম্বন্ধে তার পরিষ্কার ধারণা ছিল না। তবে অদ্ভুত এক গোঁ চেপেছিল ঘাড়ে, টাকা তাকে জমাতেই হবে।

খেয়ে না খেয়ে জমানো চলছিল। কোমরের একটা গেঁজেতে তার সব টাকা-পয়সা বেঁধে রাখত হাসেম। কত জমালো, ধান কাটতে কাটতে কিংবা কামলা খাটতে খাটতে দিনের মধ্যে দশ বার করে গেঁজে থেকে বার করে গুণে দেখত। তা ছাড়া মাইনকার চরে যাওয়া-আসা তো ছিলই।

ওদিকে খানেদের বাড়িতে কিন্তু এক কথায় ফুলবানুর শাদি হয়নি। সেখানে ফজল গাজী সপ্তাহে দুবার করে গিয়ে কথা চালাতেই লাগল, চালাতেই লাগল। কিন্তু কিছুতেই আর শাদির তারিখ ঠিক হয় না। ফজল গাজী যা চায় খানেরা পুরোপুরি তা মানে না, আবার খানেরা যা চায় ফজল গাজী মানে না। এই করে করে ফুলবানুর শাদিটা শুধু পিছিয়েই চলল। ফুলবানুর শাদি যত পিছোয় হাসেমের চোখমুখ কী এক ভীরু আশায় চকচক করতে থাকে।

দেখতে দেখতে একটা বছর ঘুরে গিয়েছিল। ততদিনে পঞ্চাশ ষাটটা টাকা জমিয়ে ফেলেছে হাসেম। চার পাঁচ শ টাকার আর কত বাকি? হাসেমের ভীরু আশা সর্বক্ষণ ফিসফিসিয়ে তাকে ভরসা দিত, যেভাবে ফুলবানুর শাদি পিছোচ্ছে, এমন চলতে থাকলে চার পাঁচশ টাকা নিশ্চয়ই জমিয়ে ফেলতে পারবে।

কিন্তু বছর ঘুরে একটা মাস যেতে না যেতেই হঠাৎ খানেদের বাড়িতে ফুলবানুর শাদির কথা পাকা হয়ে গেল। তারপর তিনটে দিনও কাটেনি, গিরিগঞ্জ বন্দর থেকে প্রকান্ড আট মাল্লাই নৌকোয় উঠে ধলেশ্বরীর ওপারে খানেদের বাড়ি চলে গিয়েছিল ফুলবানু।

ফুলবানুর শাদিতে হাসেমকে দাওয়াত করেছিল ফজল গাজী, সে গিয়েও ছিল। সারাদিন থেকে না খেয়েই সন্ধেবেলা নহরপুরে ফিরে এসেছিল। তারপর মৃধাপাড়ার ফেলু মৃধার ঘরের বারান্দায় শুয়ে শুয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিয়েছিল।

সেই একটা দিনই না, রাতের পর রাত সে জেগে থেকেছে আর কেঁদেছে।

কাজকর্ম কিছুই তখন আর ভাল লাগত না। ক'দিন পলো নিয়ে জলে নামল না সে, জমিতে কাজ

করতে গেল না। হাড়গোড়-ভাঙা জবুথবু মানুষের মতো কখনও নিকারিপাড়ায়, কখনও বা বারুইপাড়ায় গিয়ে চুপচাপ শূন্য চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত।

সবাই জিজ্ঞেস করত, 'কী হইছে রে তর, কী হইছে?'

হাসেম উত্তর দিত না।

কিন্তু পেট বলে কথা। হাত-পা ভেঙে এভাবে বসে থাকলে কে তাকে খাওয়াবে? ক'দিন পর আবার হাসেমকে মাঠে যেতে হয়েছিল, খালে বিলে নামতে হয়েছিল। জলে-স্থলে তার সেই আজন্মের জীবনযুদ্ধ আবার নতুন করে শুরু করতে হয়েছিল।

ধান কাটতে কাটতে কিংবা ধর্মজাল বাইতে বাইতে এক এক দিন হাসেমের ইচ্ছা হত, ধলেশ্বরী পেরিয়ে খানেদের বাড়ি গিয়ে একবার ফুলবানুকে দেখে আসে। পরক্ষণেই একটা কথা তার মনে পড়ে যেত। ফজল গাজী বলেছিল, খানেদের বাড়িতে বড় আব্রু। কয়েক কানি জমির মালিক ফজল গাজীর বাড়ির সঙ্গে দু-তিন শ কানি জমির মালিক খানেদের বাড়ির অনেক তফাত। যত সহজে ফজল গাজীর অন্দর মহলে যাওয়া যায়, তত সহজে কি খানেদের বাড়ি ঢোকা যাবে? তা ছাড়া খানেরা তাকে চেনে না। সেখানে গিয়ে বলবেই বা কী? 'তোমাগো অমুক পোলার বিবি মাইনকার চরের ফুলবানুরে দেখতে আইলাম। তার লগে (সঙ্গে) দুইখান কথা কমু—' বললে ফলাফলটা কী দাঁড়াবে? হয়তো ট্যাটা বার করে খানেরা তাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে ফেলবে।

ফুলবানুর শাদির পর ক'টা মাস কেটে গেল। দুঃখটা অনেকখানি সয়ে এলেও পাঁজরের তলায় ধিকিধিকি জ্বলতেই থাকল।

এই সময় অসুখে পড়ল হাসেম। পুরো একটা মাস গহরদ্দিদের খোলা বারান্দায় পড়ে পড়ে পালা জ্বরে ভুগল সে, তারপর যখন উঠে বসল একেবারে হাড্ডিসার হয়ে গেছে। ভুগে ভুগে শরীর এত কাহিল হয়ে গিয়েছিল যে, জ্বর ছাড়বার পর আরো পনেরটা দিন সে মাঠে কিংবা জলে নামতে পারল না। পাক্কা দেড়টি মাস কাজ নেই। ওষুধপত্তরে আর বসে খেয়ে জমানো টাকা ক'টা ফতুর হয়ে গেল।

দেড় মাস পর যেদিন আবার সে উত্তরের চকে গিয়ে নামল সেদিন বিকেলে নিড়ান দিতে দিতে হঠাৎ তার চোখে পড়েছিল সামনের জেলাবোর্ডের সড়ক (তখন রাস্তাটা কাঁচা ছিল) ধরে ফজল গাজী আর ফুলবানু এগিয়ে আসছে। গিরিগঞ্জ বন্দরের দিক থেকে ওরা আসছিল। খুব সম্ভব মাইনকার চরে যাবে।

অত দূর থেকে দু'জনকে শুধু চেনা যাচ্ছিল; আলাদা আলাদাভাবে তাদের চোখমুখ—কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

কতকাল পর ফুলবানুকে দেখেছিল হাসেম। তার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা আচমকা জমাট বেঁধে গেছে, তারপরেই দুরন্ত বেগে ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছিল।

মাঠের মাঝখানে আর বসে থাকতে পারে নি সে। লাফ দিয়ে উঠে বড় সড়কের দিকে দৌড়ে গিয়েছিল।

ফজল গাজীরা তাকে দেখে অবাক। এভাবে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, হয়তো ভাবে নি। থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে পড়তে ফজল গাজী বলেছিল, 'তুমি কই থন (কোথা থেকে) মিয়া?'

হাসেম বলেছিল, 'উই চকে আছিলাম। কাম করতে করতে মুখ তুলতেই দেহি আপনেরা যাইতে আছেন। দৌড়াইয়া আইসা পড়লাম।'

'কত দিন পর তুমার লগে দেখা! ফুলবানুর শাদির দিন হেই যে না খাইয়া চইলা আইলা, হের (তার) পর আর যাও নাই। আমরা ভাবলাম, গুস্‌সা হইছে বুঝিন। বিবিজানে কয় মিয়া আমাগো ভুইলাই গ্যাছে।'

অস্পষ্টভাবে কিছু একটা উত্তর দিয়ে হাসেম বলেছিল, 'আপনেরা কই থন (কোথা থেকে) আইলেন? গিরিগঞ্জে গেছিলেন নিহি?'

ফজল গাজী বলেছিল, 'ধলেশ্বরীর উই পারে ফুলবানুর হউরবাড়ি গেছিলাম, হেইখান থন মাইয়ারে জন্মের লাহান (মতো) লইয়া আইলাম।'

হাসেম চমকে উঠেছিল, 'জন্মের লাহান কইতে?'

'ফুলবানুর তালাক হইয়া গেল আইজ—' বলতে বলতে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ফজল গাজী, 'তুমি তো মাইনকার চরে এইর মইধ্যে যাও নাই, গেলে আগেই জানতে পারতা, ওই খানেরা কত বড় শয়তান। যে ছ্যামরার লগে মাইয়ার শাদি দিছিলাম, হেই হমুন্দির পুতে এট্টা আস্তা কসাই। দিন-রাইত মাইয়ারে মারত, খাইতে দিত না।'

ফজল গাজী সমানে বকে যাচ্ছিল। তার শেষ দিকের কথাগুলো আবছাভাবে শুনতে শুনতে হাসেম ফুলবানুর দিকে তাকিয়েছিল। এতক্ষণ ভালভাবে তাকে লক্ষ করেনি, এবার করেছিল। পাকা ধানের মতো তার সেই উজ্জ্বল রং এখন কালিবর্ণ, মুখটা একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। যেন সারা গায়ে তার রক্ত নেই। কি সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল। এখন কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়েছে, গাল দুটো ভাঙা, চোখ দুটো মরা মাছের চোখের মতো। হায় রে হায়, সোনার বর্ণ মেয়েটার কী চেহারা হয়ে গেল!

একটু পর ফজল গাজীর গলা আবার শুনতে পেয়েছিল হাসেম,'হেই ভোরে বাইর হইছিলাম, বিকাল পার হইতে চলল। মাইনকার চরে পৌঁছাইতে পৌঁছাইতে রাইত দুফার হইয়া যাইব। অহন যাই। তয় একখান কথা মনে রাইখ মিয়া—'

অন্যমনস্কের মতো হাসেম বলেছিল, 'কী?'

'উই কুত্তার ছাওগো থন (কুকুরের বাচ্চাদের থেকে) অনেক ভাল ঘরে ফুলবানুর আবার শাদি দিমু—' বলেই হাঁটতে শুরু করেছিল।

ওদের সঙ্গে অনেকটা পথ গিয়েছিল হাসেম। তারপর বড় সড়কটা যেখানে বাঁক ঘুরে তাজহাটির দিকে গেছে সেইখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

ফজল গাজীরা অবশ্য আর দাঁড়ায় নি। যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, 'আমাগো বাড়িত্ যাইও মিয়া—'

'যামু—' মাথা হেলিয়ে দিয়েছিল হাসেম।

তারপর আবার মাইনকার চরে যাতায়াত আরম্ভ হয়েছিল হাসেমের। মনের ভেতর থেকে সেই ভীরু আশাটা মুখ তুলে তাকে উসকে দিয়েছিল, 'ট্যাকা জমা হাসমা, ট্যাকা জমা—' আবার কোমরের গেঁজেতে খেয়ে না-খেয়ে টাকা জমাতে শুরু করেছিল হাসেম।

ফুলবানু তালাক নিয়ে আসার পর দু তিন বছর কেটে গেল। হাসেমের গেঁজে যখন চার কুড়ির মতো টাকা জমে উঠেছে সেই সময় রসুলপুরের ধানী মহাজন রহমৎ চৌধুরির ভাতিজা আতিকুলের সঙ্গে আবার ফুলবানুর নিকা হয়ে গিয়েছিল। রহমৎ চৌধুরিদের জমিজিরাত, টাকাপয়সা, হাল-হালুটি, নৌকো-টৌকো খানেদের তুলনায় অনেক—অনেক বেশি।

মেয়েকে যে আগের বারের চাইতে অনেক বড় ঘরে দিতে পেরেছে এতেই ফজল গাজী ডগমগ। লোক ডেকে ডেকে সে বলে বেড়িয়েছিল 'খানেগো গালে একখানা জুতা মারলাম। যে ঘরে এইবার মাইয়া দিছি, খানেরা তাগো বাড়িত্ বান্দা থাকনেরও যুগ্যি না। ফুলবানু আমার সুখে থাকব।'

ফুলবানুর দ্বিতীয় শাদির পর আবার মাইনকার চরে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিল হাসেম। বুকের ভেতর যে দুর্বল বাসনাটা পিদীমের আলোর মতো কতকাল ধরে কাঁপছে, সেটা যেন দপ করে নিভে গিয়েছিল। এবারও চোখের জলে ক'রাত বুক ভাসিয়ে বিনা ঘুমে কাটিয়ে দিয়েছে হাসেম।

ফুলবানুর নতুন শাদির কিছুদিন পর নামল বর্ষা। পূর্ব বাংলার এদিকটায় ফি বছরই বর্ষাকালটা বড় সমারোহ করে নামে। তখন চক ভাসে, মাঠ ভাসে, খালবিল-দীঘি-নদী সব একাকার হয়ে যায়। কিন্তু সেবারের বর্ষাটা ছিল নিদারুণ। মাঠঘাট তো সেবার ভাসলই, লোকের বাড়িঘরও ডুবে গেল। নেহাত যাদের বাড়িগুলো উঁচু ভিতের ওপর তেমন দু-চারটে দ্বীপের মতো মাথা তুলে থাকল।

এমন ভন্নার দিনে কোথায় কাজকর্ম? কাজ নেই, তাই রোজগারও ছিল না হাসেমের।

হাসেমদের মতো যারা, সব বছরই বর্ষার সময়টা তাদের বড় কষ্টে কাটে। সাময়িক একটা দুর্ভিক্ষ লেগে যায় তখন। সেবার সেই দুর্দান্ত বর্ষার বছর যে দুর্ভিক্ষটা লেগেছিল তার জের চলেছিল একটানা দুটি মাস। তখন হাতের পয়সা ভেঙে ভেঙে খাওয়া ছাড়া উপায় কী? যে চার কুড়ি টাকা হাসেম জমিয়েছিল, ভয়ানক দুর্দিনে তা খরচ হয়ে গেল।

বর্ষা নামলেই পাকিস্তান যেদিন হল, সেই দিনটার কথা মনে পড়ে যেত হাসেমের। চমৎকার করে

সাজানো প্রকাণ্ড শামিয়ানার তলায় বড় বড় মিয়াসাহেবরা গলা ফাটিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, পাকিস্তান হয়েছে, এবার থেকে সব দুঃখ ঘুচবে। এমন একখানা সুদিনের ছবি তারা চোখের সামনে টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিল যাতে হাসেমের মনে হয়েছিল, ঘিয়ে আঁচানো দুধে চান করার দিন খুব বেশি দূরে নয়। আসমানের চাঁদ এবার থেকে হাত বাড়ালেই পেড়ে আনা যাবে।

পাকিস্তান হয়ে গেছে সেই কবে। কিন্তু হাসেম যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই আছে। পরের জমিতে হাল দেওয়া আর ধান কাটা, পলো কি ধর্মজাল নিয়ে খালে বিলে নামা, কোনোদিনই তার ঘুচল না। হাত-পায়ের ঘা আদপেই সারল না। খই-ওঠা চামড়া ফাটতেই থাকল, ফাটতেই থাকল।

সেবার বর্ষার পর ভাদ্র আশ্বিন গেল, তারপর হেমন্তে ধান কাটার খন্দ পেরিয়ে যেই পৌষ মাস পড়ল অমনি হাওয়ায় হাওয়ায় খবর এল মাইনকার চরের ফজল গাজীর মেয়ে ফুলবানুর আবার তালাক হয়ে গেছে। আগের বারের মতো এবারও তার বিয়েটা সুখের হয়নি।

খবরটা কানে আসামাত্র মাইনকার চরে ছুটে গিয়েছিল হাসেম। যা শুনেছে তা সত্যি। ফুলবানুর চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে। সেই সে-বছর প্রথম বার তালাক হবার পর হাসেম যেমন দেখেছিল, তার চেয়েও অনেক খারাপ। মুখ আরো কালিবর্ণ, কণ্ঠার হাড় আরো ঠেলে বেরিয়েছে। কি রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা!

ফজল গাজী বলেছিল, 'বড় মাইনষের ঘরে আর না, খুব আক্কল হইছে। এইবার কাম করুম গরিব ঘরে। খাওয়াইয়া-পরাইয়া রাখতে পারলেই হইল। তয় পোলাগা (ছেলেটা) ভাল চাই। কুচরিত্তির হইব না, মাইয়ার গায়ে হাত তুলব না। বড় মাইনষে আমার ঘিন্না ধইরা গ্যাছে!' একটু থেমে আবার বলেছিল, 'এইবার আর অত ট্যাকা চাই না, দশ কুড়ি ট্যাকা পাইলেই মাইয়ার শাদি দিমু।'

শুনতে শুনতে বুকের ভেতরটা তিরতিরিয়ে কাঁপতে শুরু করেছে হাসেমের। সেই ম্রিয়মাণ আশাটা মনের তলায় মরে পড়ে ছিল, হঠাৎ আবার সেটা মাথা তুলতে শুরু করছে। ফুলবানুকে ঘিরে হাসেমের স্বপ্নটা কতকাল ধরে জুনি পোকার (জোনাকি) মতো জ্বলছে নিভছে নিভছে জ্বলছে!

মাইনকার চর থেকে ফিরে আবার নতুন করে টাকা জমাতে শুরু করেছিল হাসেম। দশ কুড়ি টাকা কত টাকা! যতই হোক, এবার সে নিশ্চয়ই জমিয়ে ফেলবে।

এই সময় তাদের এদিকে একটা রায়ট হয়ে গেল। বড় গাঙের পারে গিরিগঞ্জের বন্দরে দিনদুপুরে ক'টা লোক মরল। নহরপুরেও মরল জনাকয়েক। দূর দূর গ্রাম থেকে খুনখারাপির খবর আসতে লাগল। চারদিকের দশ বিশটা গ্রাম জুড়ে ক'দিন দারুণ উত্তেজনা। তারপর থেকে এই এলাকার গ্রামে গ্রামে ভাঙন শুরু হয়ে গেল। নহরপুর থেকেও রাতের অন্ধকারে ক'ঘর যুগি কুমোর গণক আর বারুই চলে গেল। আর গেল ভুবন গোঁসাইরা।

দেশভাগের পর আশেপাশে এবং দূরে দূরেও অনেক বার রায়ট হয়েছে। ভুবন গোঁসাই তখন যায় নি। এবার তার কী যে হয়ে গেল, আর দেশের বাড়িতে থাকল না।

ভুবন গোঁসাই অবশ্য আর সবার মতো রাত্রিবেলা পালায় নি, সবার চোখের সামনে দিয়ে খালের ঘাটে গিয়ে উঠেছিল। নহরপুরের বড় মিয়ারা—ওই শফিকুলের বাজান, মোতালেক হোসেন সাহেব, তমিজুদ্দিন সাহেব—সবাই অনেক বুঝিয়েছে, বলেছে, 'যা হওনের হইয়া গ্যাছে। আর কিছু হইতে দিমু না। আপনে থাকেন ভোবন কত্তা। আমরা আছি, কেও (কেউ) আপনের কিছু করতে পারব না!' কিন্তু ভুবন গোঁসাই কোনো কথাই শুনল না।

ভুবন গোঁসাই বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু তার মা এখানকার মাটি কামড়ে পড়েই থাকল। তাকে নহরপুর থেকে নড়ানো গেল না। স্বামী-শ্বশুরের ভদ্রাসন ছেড়ে সে যাবে না।

যাবার আগে ভুবন গোঁসাই হাসেমকে তাদের বাড়ি ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'তুই তো এর বাড়ি অর (ওর) বাড়ি পইড়া থাকস। তার থনে এক কাম কর না—'

'কী?'

'অহন থনে তুই আমাগো বাড়িত্ আইসা থাক হাসমা। পুবদুয়ারী বড় ঘরখান তরে ছাইরা দিমু।'

হাসেম সৎ, হাসেম নিরীহ, হাসেম ভালমানুষ—এটা নহরপুরের কে না জানে! তার ওপর সবার খুব বিশ্বাস। সকলে তাকে ভালবাসে, পছন্দ করে।

ভুবন গোঁসাই আবার বলেছিল, 'মায় একলা দ্যাশে রইল, তুই দেখাশুনা করবি। তর ভরসায় মায়েরে রাইখা যাইতে আছি।'

সেই থেকে ভুবন গোঁসাইদের বাড়িতে আছে হাসেম।

রায়ট টায়ট বাধলে ভীষণ মন খারাপ হয়ে যেত হাসেমের। তখন মানুষ মরে, চেনাজানা লোকেরা দেশ ছেড়ে কোথায় কোথায় চলে যায়। গ্রাম ফাঁকা করে যারা যায় তারা আর ফিরে আসে না।

ভুবন গোঁসাইরা চলে যাবার পর কিছুদিন মনটা ভারি হয়ে থাকল হাসেমের। তারপর আবার সব কিছু সহজ হয়ে এল।

জীবনে এই প্রথম একটা গোটা ঘর পেয়ে বেঁচে গিয়েছিল হাসেম। ভুবন গোঁসাইর মা-ও তাকে পেয়ে বেঁচে গেছে।

একই গ্রামের মানুষ, আগে থেকেই ভুবন গোঁসাইর মায়ের সঙ্গে আলাপ ছিল। এ বাড়িতে কতদিন কামলা খেটে গেছে সে। দুটো চারটে পয়সা নিয়ে উঁচু উঁচু গাছের মাথা থেকে নারকেল সুপুরি পেড়ে দিয়েছে।

এই বাড়িতে থাকতে এসে হাসেম টের পেয়েছিল, বাড়ির মায়া বড় মায়া।

আগে আগে খাওয়া দাওয়ার ঠিকঠিকানা ছিল না হাসেমের। ভোরবেলা ঘুম ভাঙলে নিকারি কি মৃধাপাড়া থেকে উঠে সে মাঠেঘাটে কিংবা খালেবিলে চলে যেত। জেলা বোর্ডের সড়কের ওপর যে বাঁধানো পুলটা, তার গা ঘেঁষে আমজাদের পানবিড়ি চায়ের দোকান। মুড়ি চিঁড়ে পাউরুটি টুটিও ওখানে পাওয়া যায়। বছর কয়েক হল দোকানটা হয়েছে। দুপুরবেলা আমজাদের দোকানে গিয়ে চিঁড়ে মুড়ি কিনে খেত হাসেম। ভাত খেত সেই রাত্রিবেলা।

কিন্তু ভুবন গোঁসাইর বাড়ি আসার পর আগের নিয়ম আর চলল না। বুড়ি ভীষণ বকাবকি করত, 'আরে নিঃবইংশা, অত বড় শরীলটা (শরীরটা) তর, দুফারে চিড়ামুড়ি খাইয়া নি থাকন যায়! তুই মরবি— নিয্যস মরবি।'

হাসেম কী করে বোঝায়, জ্ঞান হওয়া থেকে এইরকমই চলছে। এতকাল যখন সে বেঁচে আছে, সহজে মরবে না। হাসেম যা ভাবত তা কিন্তু বলত না। দাঁত বার করে সে শুধু হাসত।

বুড়ি তাতে আরো রেগে যেত, 'হাসিস না হাসমা। তর হাসন দেখলে গা-ও (শরীর) জ্বইলা যাই। অহন থনে (এখন থেকে) দুফারে আইসা রান্‌বি (রাঁধবি)।'

বুড়িই বকেঝকে হাসেমের এতকালের অভ্যাস বদলে দিয়েছিল। তার ভয়ে হাসেম রোজ দুপুরে মাঠঘাট খালবিল থেকে ফিরে এসে কাঠকুটো জ্বেলে রান্না চড়াত। অবশ্য বেশির ভাগ দিন তাকে কিছুই করতে হত না, ভুবন গোঁসাইর মা-ই নিজের সঙ্গে ওর ভাত ফুটিয়ে রাখত।

ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনীরা—সব কলকাতায় চলে গেছে। অত বড় বাড়িতে একা থাকে বুড়ি, আর থাকে হাসেম। এক বাড়িতে কাছাকাছি থাকার জন্য ভুবন গোঁসাইর মায়ের সবটুকু মমতা গিয়ে পড়েছিল হাসেমের ওপর।

সারা দিন খাটা খাটনির পর চক ফক থেকে ফিরে হাত-পা ধুয়ে পুবের ঘরের বারান্দায় বসত হাসেম, আর বুড়ি বসত দক্ষিণের ঘরের বারান্দায়। তারপর শুরু হত গল্প—সুখদুঃখের গল্প, দেশকালের গল্প, পুরনো আমলের গল্প। তা ছাড়া হাসেমের বাপ রহিমুদ্দির কথা উঠত। ভুবন গোঁসাইর কথা হত। দূর দেশে গিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে সে কেমন আছে, দু'জনে এইসব বলাবলি করত।

কথায় কথায় চোখ যখন ঘুমে জুড়ে আসত, যখন আর মাথাটা খাড়া রাখা যেত না, সেই সময় হাসেম বলত, 'ঠাকুরমা, আর যে পারি না। শরীল ভাইঙ্গা আইতে আছে।'

ভুবন গোঁসাইর মা বলত, 'তয় (তবে) আর কি, খাওন সাইরা শুইয়া পড়—'

রাতের দিকে আর রাঁধত না হাসেম। দুপুর বেলা বেশি করে ভাত রেঁধে ওবেলার জন্য রেখে দিত। যেদিন যেদিন বুড়ি দুপুরে খাওয়াত, সেদিন সেদিন অবশ্য সন্ধেবেলা ফিরেই আখা ধরতে হত তাকে। কেননা ভুবন গোঁসাইর মা বামুনের ঘরের বিধবা, একবেলার বেশি দু বেলা সে রাঁধে না। রাত্রিবেলা কোনোদিন একটু খই কি এক বাটি দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ে, কোনোদিন আবার তা-ও খায় না।

ভুবন গোঁসাইর মায়ের স্নেহ-মমতা গায়ে মেখে দিন কাটছিল। এরই মধ্যে ফাঁক পেলে হাসেম মাইনকার চরে ছুটত, নতুন করে টাকা পয়সা জমানো তো চলছিলই। যেদিন মাইনকার চরে যেত সেদিন দুপুরে আর ফিরত না, ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যেত।

দু'চারদিন লক্ষ করে ভুবন গোঁসাইর মা একদিন বলেছিল, 'মইধ্যে মইধ্যে যে দুফারে আসস না, যাস কই রে হাসমা?'

হাসেম বলেছিল, 'মাইনকার চরে।'

'হেইখানে কী?'

হাসেম হকচকিয়ে গিয়েছিল, 'না, কিছু না। এমনেই যাই।'

কিন্তু বুড়ির চোখে অত সহজে ধুলো ছিটানো যায় নি। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে বলেছিল, 'এমনে? ক' (বল) পোড়াকপাইলা, যাস ক্যান?'

প্রথমে হাসেম বলতে চায় নি, খুবই লজ্জা লেগেছে। কিন্তু বুড়ি দারোগা-উকিলের মতো জেরা করে ফুলবানুর কথা বার করে নিয়েছিল। ক'বছর ধরে হাসেম যে মাইনকার চরে ঘোরাঘুরি করছে, তার মধ্যে দু দুবার শাদি হয়েছে ফুলবানুর, দু দুবার তালাক হয়েছে—কিচ্ছু আর জানাতে বাকি রাখে নি।

সব শুনে চোখ বড় বড় হয়ে গিয়েছিল বুড়ির, 'আরে পিছা-কপাইলা, একখান বিয়ার লেইগা তুই এমুন কইরা মরতে আছস?'

হাসেম উত্তর দেয় নি।

ভুবন গোঁসাইর মা আবার বলেছিল, 'মাইয়াগা তালাক হইয়া অহন বাপের ঘরেই আছে?'

'হ।'

'তয় (তবে) আর কি, বিয়া কইরা ফালা (ফেল)।'

হাসেম বলেছিল, 'ক্যামনে করি? ঘরদুয়ার নাই, শাদি কইরা বউ আইনা কুনখানে তুলুম?'

'ঘরের লেইগা বিয়া আটকাইব নিহি (নাকি)? ঘর তো তরে একখান দিয়াই দিছি। বউ আইনা এইখানেই তুলবি।'

'ঘর পাইলাম। কিন্তুক—'

'আবার কী?'

'ট্যাকাও তো লাগব। ফুলবানুর বাজানরে দশ কুড়ি ট্যাকা দিতে হইব। আমার জমছে খালি এক কুড়ি।'

একটু চুপ করে থেকে ভুবন গোঁসাইর মা বলেছিল, তার হাত এখন শূন্য। তবে ঘরে কিছু কাউন, তিসি আর সর্ষে আছে। সে সব বেচে চার কুড়ির মতো টাকা হতে পারে। পুরো টাকাটাই সে হাসেমকে দিয়ে দেবে। এই চার কুড়ি আর হাসেমের এক কুড়ি, দুইয়ে মিলে দাঁড়াল পাঁচ কুড়ি। তারপরও পাঁচ কুড়ির দরকার, এই টাকাটা হাসেমকে জমাতে হবে।

হাসেম আবার বলেছিল, 'কিন্তুক—'

'কী হইল আবার?'

'ঘর আর ট্যাকা হইলেই হইব না।'

'আর কী চাই?'

'গাজী সাহেব কি আমার লাখান (মতো) মাইন্ষের হাতে মাইয়া দিব?'

'এইটা আবার কেমুন কথা। ফুলবানুর বাপেরে বিয়ার কথা কস নাই অহনও!'

'না।' আস্তে করে মাথা হেলিয়েছিল হাসেম।

অনেকক্ষণ অবাক হয়ে থেকেছে ভুবন গোঁসাইর মা। তারপর বলেছে, 'কয় বছর ধইরা মাইনকার চরে যাইতে আছস?'

'হে চাইর পাচ বচ্ছর হইব।'

'এইর ভিত্‌রে বিয়ার কথা কইয়া উঠতে পারলি না!'

'কেমনে কই? ডর লাগে যে—'

'কিসের ডর?'

'যদি গাজী সাব মুখের উপুর না কইয়া দ্যায়—'

'তয় (তবে) ট্যাকা জমাইছিলি কোন আশায়? অহনও তো জমাইয়া যাইতে আছস—'

এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয় নি হাসেম। বুড়ি কী ভেবে বলেছিল, 'আমারে একবার মাইনকার চরে লইয়া যাইতে পারবি?'

'ক্যান?'

'গাজী সাহেবের লগে বিয়ার কথাখান পাকা কইরা আসুম। পুরুষমানুষ হইয়া তুই তো পারলি না! আস্তা পিছা-কপাইলা তুই একটা।'

বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে বান ডেকে গিয়েছিল যেন। হাসেমের ইচ্ছা হয়েছিল ভুবন গোঁসাইর মায়ের দুই পায়ে মাথা দিয়ে পড়ে থাকে। সে বলেছিল, 'কবে যাইবেন মাইনকার চরে?'

'ট্যাকা পয়সাগুলান জমাইয়া নে। হের পর যামু—'

'হেই ভাল।'

কিন্তু এবারও টাকা জমাবার আগে আবার শাদি হয়ে গিয়েছিল ফুলবানুর। আর বোকা হাসেম, সৎ সরল ভালমানুষ বলে যার খ্যাতি সেই হাসেম, আগের দু বারের মতো কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিল। ভুবন গোঁসাইর মায়েরও খুব দুঃখ হয়েছিল। হাসেমের কান্না দেখে বুড়িও না কেঁদে পারে নি। সে বলেছিল, 'দ্যাশে কি আর মাইয়া নাই রে? অর থনেও (ওর থেকেও) ভাল মাইয়ার লগে তর বিয়া দিমু—'

হাসেম রাজি হয় নি। সে শুধু কেঁদেই গেছে, কেঁদেই গেছে।

ফুলবানুর তৃতীয় শাদির কিছুদিন পর থেকেই দেশের অবস্থা হঠাৎ খারাপ হতে শুরু করেছিল। হাটে-গঞ্জে লোকেরা বলাবলি করত, আয়ুব খাঁ নাকি মুজিব সাহেবকে জেলে দিয়েছে, শীগ্গিরই তার বিচার হবে। মুজিব সাহেবের নাম কত কাল ধরে শুনে আসছে হাসেম। তবে আয়ুব খাঁর নামটা নতুন শোনা। এই তো সেদিন, ফুলবানুর দ্বিতীয় শাদির কিছু আগে তার নাম কানে এসেছে। আয়ুব খাঁ পশ্চিম পাকিস্তানের খান। সারা দেশখানা নাকি তাঁরই হাতের মুঠোয়।

মোতালেফ সাহেবের ছেলে শফিকুল সেই সময় বলেছিল, খুব তাড়াতাড়িই একটা গোলমাল বাধবে। সে আরো জানিয়েছিল, তাদের এই পুব বাংলার রক্ত চুষে খানেরা শেষ করে দিচ্ছে। টাকাপয়সা লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলেই জেলে পুরে দিচ্ছে। মুজিব সাহেব প্রতিবাদ করেছিলেন, তাই তাঁকে জেলে যেতে হয়েছে।

মোতালেফ সাহেবের এই ছেলেটাকে জন্মাতে দেখেছে হাসেম। চোখের ওপরেই সে বড় হয়ে ঢাকায় এম.এ. বি.এ পড়তে গেল।

শফিকুল যা বলেছিল, তা-ই হয়েছে। ঢাকা থেকে গোলমালের খবর এসেছিল। ছাত্ররা খেপে উঠেছে। শুধু কি ঢাকা শহরের ছাত্ররাই, সমস্ত পুব বাংলাই সেদিন রাগে ফেটে পড়েছিল। এমন কি তাদের এই নহরপুর তাজহাটি রসুনিয়া রসুলপুরের স্কুল-মাদ্রাসায় একটা ছেলে ছিল না, সব মিছিল করে বেরিয়ে এসেছিল। তার কিছুদিন পর খবর এল মুজিব এবং সব নেতাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তারও দিনকয়েক পর শোনা গেল, আয়ুব খাঁর জায়গায় ইয়াহিয়া খাঁ বলে একজন খান দেশের মাথায় চড়ে বসেছে। তারপরেই এখানে ভোট হয়ে গেল।

ভোটের আগে বা পরে সারা দেশ জুড়ে সে কি উত্তেজনা! কি মিছিল! চিৎকার আর চেঁচামেচি! ভোটের ফল বেরুবার পর শোনা গেল, মুজিব সাহেবের দল জিতে গেছে। মুজিব সাহেব এবার দেশের রাজা বাদশা হবেন, তাঁর কথামতো সব চলবে।

ঠিক এই সময় ফুলবানুর তৃতীয় শাদিটা ভেঙে গেল। তালাক হয়ে আবার মাইনকার চরে ফিরে এল সে। মেয়েটার কপালই খারাপ। তিন তিনবার শাদি হল কিন্তু কোনোটাই টিকল না।

আবার মাইনকার চরে যাতায়াত শুরু করে দিয়েছিল হাসেম।

এদিকে ভোটের পর কিন্তু দেশ জুড়ে আবার গোলমাল আরম্ভ হয়ে গেল। গিরিগঞ্জের বন্দরে গিয়ে একদিন হাসেম শুনে এল, ইয়াহিয়া সাহেব সেই কোন মুল্লুক থেকে ঢাকায় আসছে মুজিব সাহেবের

সঙ্গে কথা বলতে। দিনের পর দিন কথাবার্তা চলল। তারপর হঠাৎ কী যে হয়ে গেল! ঢাকায় শহরে গুলি চলল, আগুন জ্বলল, খানের বাচ্চারা হাজারে হাজারে লোক মারতে লাগল।

হায় রে হায়, আজ এসে খানেরা নহরপুর থেকে মাইনকার চর পর্যন্ত সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শ্মশান করে দিয়ে গেছে।

জেলাবোর্ডের বাঁধানো সড়ক ধরে ওরা হাঁটছিলই, হাঁটছিলই।

চাঁদটা কখন উঁচু উঁচু গাছগাছালির ওপারে ডুবে গেছে, কেউ লক্ষ করে নি। জ্যোৎস্না নিভে গেলে কিছুক্ষণ পাতলা অন্ধকারে সব কিছু মাখামাখি হয়ে রইল। তারও পর অন্ধকার ভেঙে পুব দিকটায় আবছা আলো ফুটল। গাছপালার মাথা থেকে, ঝোপঝাড় থেকে পাখিদের কিচিরমিচির শোনা যেতে লাগল।

মাইনকার চরের সীমানা পেরিয়ে হাসেমরা একসময় আজিপুরের খালের পাড়ে পৌঁছে গেল।

চার

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কটা সেই গিরিগঞ্জের বন্দর থেকে আজিপুরের খাল পর্যন্ত সোজা চলে এসেছে। তারপর বাঁ দিকে মোচড় খেয়ে গেছে দক্ষিণে।

হাসেমরা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সেই কখন থেকে ফুলবানুর জ্ঞানশূন্য অসাড় শরীর বয়ে আনছে হাসেম। প্রথম দিকে তার মধ্যে একটা অলৌকিক শক্তি ভর করেছিল। ফুলবানুর শরীরটাকে ভার বলেই মনে হয়নি। কিন্তু আজিপুরের খালের পাড়ে পৌঁছে এখন হাসেমের মনে হল, ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত একেবারে ছিঁড়ে যাচ্ছে। এভাবে আর খুব বেশিক্ষণ ফুলবানুকে কোলে বা ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে পারবে না।

গহরদ্দি বলল, 'এলায় (এবার) কী করন? দক্ষিণে যাইবা, না খাল পার হইয়া আজিপুরের দিকে যাইবা?'

কেউ উত্তর দিল না।

হাসেম একবার খালের ওপারে আজিপুরের দিকে তাকাল। তারপর তার চোখ গেল দক্ষিণে। আর তখনই সে দেখতে পেল, দক্ষিণ দিক থেকে মেয়ে পুরুষ বাচ্চা কাচ্চা বুড়োবুড়ি মিলিয়ে চল্লিশ পঞ্চাশ জনের একটা দল এদিকেই আসছে।

অন্য সবাইও তাদের দেখেছে। ভুবন গোঁসাইর মা বলল, 'অরা কারা রে?'

কে যেন বলল, 'দক্ষিণের মানুষ!'

'হেয়া (তা) তো বুঝলাম, কিন্তুক দল বাইন্ধা এই দিকে আহে ক্যান?'

'কেমনে কই? আগে আহুক, জিগাইয়া (জিজ্ঞেস করে) দেখি।'

একটু পরে দলটা কাছে এসে গেল। ওদের চোখ লাল টকটকে, চুল উষ্কখুষ্ক, সারা গায়ে ভয় আর আতঙ্ক মাখানো। মনে হয়, হাসেমদের মতো ওরাও সারারাত হেঁটে হেঁটে আসছে।

গহরদ্দি বলল, 'আপনেরা কুনখান থন আইতে আছেন?'

দলের ভেতর থেকে একটা আধবুড়ো কোমর-বাঁকা লোক এগিয়ে এসে বলল, 'নুবীগঞ্জ মীরপুরের নাম শুনছেন নিয্যাস। আমরা উই দিক থনে আইতে আছি। আপনেরা?'

'আমরা নহরপুর তাজহাটি রসুইনার দিক থন। চিনেন?'

'চিনুম না ক্যান? কত বার উই হগল জাগার (জায়গার) ভিতর দিয়া গিরিগুঞ্জ গেছি। অহন আপনেগো উই দিকের খবর ক'ন।'

'খবর আর কি, খানেরা জ্বালাইয়া পুড়াইয়া মানুষ মাইরা দোজখ বানাইয়া দিছে। গেরামে থাকতে আর সাহস হইল না। শুনতে আছি ইবলিশেরা আবার আইব। হেইর লেইগা বাইর হইয়া পড়লাম। কপালে কী আছে, খোদাতাল্লাই জানে।'

আধবুড়ো লোকটা বড় করে শ্বাস টেনে বলল, 'অয় রে অয়, আমাগো উই দিকেও তো একই ব্যাপার। বিশখান গেরামে এই চল্লিশ পাচচল্লিশ জন বাইচা আছি। খানেগো ডরে আমরাও বাইর হইয়া

পড়ছি। কুন দিকে যামু, কুনখানে গ্যালে পরাণে বাচতে পারুম বুঝতে আছি না।'

হাসেমরা বুঝল আর যেখানেই যাওয়া যাক, দক্ষিণে যাওয়া যাবে না। দক্ষিণের চল্লিশ পঞ্চাশজন আর হাসেমরা বিশ পঁচিশ জন—সবাই ওখানে বসে ঠিক করে ফেলল, আপাতত আজিপুরের খাল পেরিয়ে ওপারে যাবে। তারপর অবস্থা বুঝে কী করা যায়, ভাবা যাবে। একই সর্বনাশ আর দুর্ভাগ্য অনেকগুলো অচেনা মানুষকে কাছাকাছি এনে দিয়েছে।

আজিপুরের খালটা খুব ছোট নয়, রীতিমত একটা নদীই বলা যায় সেটাকে। চৈত্র মাসের এই উইন্না কালেও সেখানে প্রচুর জল, পনের বিশ হাত লগি থই পায় না। স্রোত অবশ্য নেই, তবে জায়গায় জায়গায় কচুরিপানা চাপ বেঁধে আছে।

খালের ওপর দিয়ে আঁকাবাঁকা বাঁশের পুল। গহরদ্দি হাসেমকে বলল, 'মাইয়াগারে লইয়া পুল পার হইতে পারবি?'

হাসেম বলল, 'পারুম।'

ওরা পুল পেরিয়ে ওপারে চলে গেল। এ ধারে জেলাবোর্ডের পাকা সড়ক নেই। পুলের তলা থেকে ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা শুরু হয়েছে। রাস্তাটা কাঁচা হলেও বেশ উঁচু আর চওড়া।

খানিকটা হাঁটবার পর রসময় ডাকল, 'হাসমা—'

হাসেম মুখ ফেরাল, 'কী কও?'

'হেই মইধ্য রাইত থন মাইয়াটারে কুলে-কান্ধে (কোলে এবং কাঁধে) কইরা আনতে আছস। এইবার আমার এট্টু দে।'

হাসেম বলল, 'যাই আরেট্টু। হের (তার) পর তো দিতেই হইব। একলা কি আর লইয়া যাইতে পারুম?' আসলে সে কারো কাছেই ফুলবানুকে ছাড়তে চাইছিল না। হায় রে হায়, তার ভীরু দুর্বল বাসনা কিভাবে পেতে চেয়েছিল ফুলবানুকে, আর কিভাবেই বা তাকে নিয়ে চলেছে!

যেতে যেতে ফুলবানুর মুখের দিকে তাকাল হাসেম। সকালের প্রথম সোনালি রোদ এসে পড়েছে তার ওপর। ফুলবানুর চোখ দুটো আধ-বোজা।

হঠাৎ দূর থেকে কার গলা ভারি ভেসে আসে,'কারা আহে (আসে)?'

চমকে এদিকে সেদিকে তাকায় হাসেমরা, দেখতে পায় দূরে একটা পাকা দোতলা দালানের ছাদে দাঁড়িয়ে আছে জাফর সাহেব।

আজিপুর খালের এপারে যেখানে এসে ভয়তাড়িত মানুষগুলো এসে পড়েছিল সেটা একটা বড় বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এটার নামও আজিপুর। এ অঞ্চলের অন্য সব বড় গ্রামের চেহারা যেমন হয় আজিপুরও অবিকল তাই। বেশির ভাগই ক্যাঁচা বাশের বেড়া আর ঢেউটিনের চালওলা ঘর। দু-চারটে ইটের একতলা বাড়িও চোখে পড়ে না। তবে জাফর সাহেবদের বাড়িটাই দোতলা।

জাফর সাহেব এদিকের সব চেয়ে বড় ধনী গৃহস্থ। আই.এ.বি.এ. পাশ। ইচ্ছা করলে ঢাকায় গিয়ে বড় চাকরি বাকরি নিতে পারত। তা না করে গ্রামেই চাষবাস নিয়ে পড়ে আছে। প্রায় পাঁচশ কানি জমি তাদের। নিজে না দেখলে বার ভূতে লুটে পুটে খাবে।

জাফরসাহেব জারি সারি যাত্রা আর পালাগানের বিরাট সমঝদার। এক জারি গানের আসরে হাসেমের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। নিজেই শ্রোতাদের মধ্য থেকে উঠে এসে তার সঙ্গে আলাপ করেছিল জাফর সাহেব। হাসেমের গান শুনে বেজায় খুশি। তারপর আরো দু-চার আসরে গান গাইতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। জাফর সাহেবের ইচ্ছা ছিল আজিপুরে হাসেমকে ডেকে এনে গানের আসর বসাবে। সেটা আর হয়ে ওঠে নি।

হাসেম চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি হাসেম। লগে মেলা (অনেক) মানুষ।'

জাফর সাহেব বলল, 'খাড়াও, আইতে আছি।'

হাসেম লক্ষ করল, গ্রামের প্রতিটি বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ। চারদিক নিঝুম। মনে হয়, বেশির ভাগ লোকই বাড়িঘর ফেলে পালিয়েছে।

একটু পর জাফর সাহেব এল। হাতে দোনলা বন্দুক। জিজ্ঞেস করল, 'খবর কী হাসেম?' দেইখা তো মনে হয়, তুমাগো উই দিকে খানের ছাওরা আইসা জ্বালাইয়া পুড়াইয়া গুলি চলাইয়া শ্যাষ কইরা

দিয়া গ্যাছে।

হাসেম মাথা নাড়ে। যা যা ঘটেছে সব জানায়। বেহুঁশ ফুলবানুকে নিয়ে আসার পর নানা গ্রামের জীবন্ত কিছু মানুষ প্রাণ বাঁচাবার জন্য কিভাবে তার সঙ্গ নিয়েছে, জানিয়ে দেয়।

জাফর সাহেবের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। চোখ দুটো জ্বলতে থাকে। বলে, 'খানের ছাওরা মানুষ না, এক একটা আস্তা জানোয়ার।' তা 'তুমরা যাইবা কুন দিকে?'

'বুঝতে পারি না কুন দিকে গ্যালে পরাণটা বাচাইতে পারুম।' হাসেম ফুলবানুকে দেখিয়ে বলল, 'সগলের অগে এই মাইয়াটারে বাচান দরকার। কী যে করি?'

কখন যে ফুলবানুর জ্ঞান ফিরবে, কে জানে।

জাফর সাহেব প্রথম থেকেই ফুলবানুকে লক্ষ করছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'মাইয়াটা কেঠা?'

ফুলবানুর পরিচয় দিয়ে কিভাবে তাকে উদ্ধার করেছে, জানায় হাসেম।

জাফর সাহেব বলে, 'তুমরা তালতলিতে যাও। উইখানে ডাক্তার আমিরুল হোসেনেরে পাইবা। আমার লগে আসো। তারে একখান চিঠি লেইখা দিমু। তালতলিতে অহনও (এখনও) কিছু হয় নাই, হইব বইলা শুনিও নাই। ডাক্তারসাহেব যা কইব তা-ই কইরো।'

'আইচ্ছা।' নির্জন আজিপুরের রাস্তা দিয়ে জাফর সাহেবের সঙ্গে যেতে যেতে হাসেম জিজ্ঞেস করে, গেরামে জনমনিষ্য দেখি না যে গেল কই?'

'দুই-চাইর ঘর ছাড়া খানেগো ডরে পালাইছে।'

জাফর সাহেবের বাড়ি এসে দেখা গেল, তাঁর বাড়িও প্রায় জনশূন্য। কথায় কথায় জানা যায়, সে আর তার বড় ছেলে হাবিব ছাড়া বাকি সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।

হাসেম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তুক আপনেরা দুই জনে—' বলতে বলতে থেমে যায় সে।

'আমরা কী?'

'খানেরা আইব, আপনেরা যাইবেন না? এইখানে থাকলে বিপদে পড়বেন জাফর সাব।'

জাফর সাহেব হাসল, 'জানি বিপদ হইব। কিন্তুক (সগলে) যদি পলাইয়া যাই, থাকব কে? ইবলিশের ছাওগো (বাচ্চাদের) মুকাবিলা করব কে?' হাতের বন্দুকটা দেখিয়ে বলল, 'এই অস্তরখান আমার দিন-রাইতের সাথী, এইটা থাকতে কেওরে (কাউকে) ডরাই না।'

খান সেনাদের হাতে যে সব অস্ত্র আছে সেগুলোর তুলনায় দোনলা বন্দুকটা যে কিছুই না, তারা এসে গেলে এটা যে কোনো কাজেই লাগবে না, এই কথাটা জাফর সাহেব কি জানে না? তার সাহস দেখে হাসেম স্তম্ভিত হয়ে গেল। গ্রামের পর গ্রাম ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, যে কোনো সময় খানেরা এসে পড়তে পারে—এত সব জেনেও জাফর সাহেব আজিপুরেই পড়ে থাকবে। হাসেম তাকে কী যে বলবে, ভেবে পেল না।

জাফর সাহেব আবার বলল, 'একখান কথা ভাইবা (ভেবে) দেখছ মিয়া?'

'কী?'

'বেবাক গেরামের বেবাক মানুষ যদি পলাইতে থাকে, দ্যাশের অবস্থা কী হয়? এত মানুষ যাইবই বা কই?'

সারা দেশের সমস্ত মানুষ পালালে কী হবে, এতখানি ভাববার মতো জোরাল কল্পনাশক্তি হাসেমের নেই। সে কিছু বলল না।

অন্য সঙ্গী যারা আছে তাদের মুখেও কথা নেই।

দুপুরের কিছু পরে জাফর সাহেবের চিঠি নিয়ে হাসেমরা আজিপুর থেকে বেরিয়ে পড়ল। বেরুবার সময় রাস্তায় খাবার জন্য তাদের সবাইকে খানিকটা খানিকটা করে চিঁড়ে আর মুড়ি দিয়ে জাফর সাহেব ইউনিয়ন বোর্ডের সড়ক ধরে অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে গেল।

পাঁচ

ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা ধরে খাড়া পশ্চিমে এগিয়ে চলল হাসেমরা। নিদারুণ এক অনিশ্চয়তা তাদের তাড়া করে নিয়ে যেতে লাগল যেন।

মাইনকার চর থেকে আজিপুর পর্যন্ত একলাই কোলে-কাঁধে করে ফুলবানুকে নিয়ে এসেছিল হাসেম। পশ্চিম দিকে যেতে যেতে পথের বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কেটে চালি বানিয়ে নিল তারা। এখন সেটার চওড়া পাটাতনে ফুলবানুকে শুইয়ে নিয়ে চলেছে। মাচার এক দিকের বাঁশ হাসেমের কাঁধে, আরেক ধারেরটা গহরদ্দির। সামনে আছে গহরদ্দি, পেছনে হাসেম। এভাবে নিয়ে যাবার জন্য কষ্টটা আর হচ্ছে না। তাছাড়া হাঁপিয়ে গেলে কাঁধ বদল করে নেওয়া যাবে। এত মানুষ আছে, যাকে বলা যাবে সে-ই এসে কাঁধ দেবে।

চালির পাশে পাশে হেঁটে চলেছে ভুবন গোঁসাইর মা আর দশ মাসের ভরা গাভীন কুলসম এবং মীরপুর নবীগঞ্জের আরো ক'টি মেয়েমানুষ। ওদের বেশির ভাগই হিন্দুঘরের সধবা বউ, মুসলমান ঘরেরও দু-চারজন আছে। এদের কারো সঙ্গেই আলাপ হয়নি হাসেমের, হবার সময় কোথায়? আজই তো সকালবেলা আজিপুরের খালপারে প্রথম ওদের দেখেছে হাসেম।

এখন সূর্যটা পশ্চিম দিকে অনেকখানি টাল খেয়েছে। চৈত্র মাসের সূর্য— যেমন তীব্র তেমনি গনগনে। তবে এটুকু বাঁচোয়া, প্রচুর হাওয়া আছে।

ফুলবানুর জ্ঞান এখনও ফেরে নি। রোদটা যাতে খাড়া মুখে না পড়তে পারে তাই তাকে কাত করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। মুখটা হাসেমের দিকে ফেরানো।

আজিপুরে সকাল থেকে দুপুরের শেষাশেষি পর্যন্ত কাটিয়ে এসেছে হাসেমেরা। সেই সময় ফুলবানুর মাথাটা খুব যত্ন করে ধুয়ে দিয়েছিলে ভুবন গোঁসাইর মা, গা মুছিয়ে দিয়েছিল।

এখন মাথাটা শুকিয়ে গেছে। উলটাপালটা হাওয়ায় ফুলবানুর রুক্ষ চুল মুখের ওপরে এসে পড়ছিল। যতবার মুখের ওপর চুল আসছে ততবারই ঝুঁকে ভুবন গোঁসাইর মা সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝেই সে বলে উঠছে, 'যম—যমেরা মাইয়াটারে শ্যাষ কইরা গ্যাছে।'

হাসেম উত্তর দেয় না। পলকহীন সে শুধু ফুলবানুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

ভুবন গোঁসাইর মা আবার বলে, 'কবে যে অর জ্ঞান ফিরব, কবে সুস্থ মাইনষের লাখান উইঠা বইব, হাইটা চইলা (হেঁটে চলে) বেড়াইব, ঈশ্বর জানে। হায় হায় রে—' বলতে বলতে তার গলার ভেতর থেকে ফোঁপানির মতো শব্দ উঠে আসতে থাকে।

ফুলবানুকে আগে আর কখনও চোখে দেখে নি বুড়ি, হাসেমের মুখে তার সম্বন্ধে যেটুকু শুনেছে। প্রায় অচেনা একটা মেয়ের জন্য কাল রাত থেকে মাঝে মাঝেই কাঁদছে ভুবন গোঁসাইর মা। বুড়ির প্রাণে বড় মায়া।

কুলসম কিন্তু ফুলবানুর দিকে একবারও তাকাচ্ছিল না। আজিপুরে তাকে হাজার বলে বলেও স্নান করানো যায় নি, খাওয়ানো যায়নি। চুলগুলো এক রাত্তিরেই রুক্ষ, উষ্কখুষ্ক। সারা রাত না ঘুমিয়ে শুধু হেঁটেছে, হেঁটেই চলছে। চোখ দুটো লাল টকটকে। গালে চোখের জলের দাগ শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে। তার ওপর পেটে রয়েছে নতুন বাচ্চার ভার। মুখ থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীরটা ভেঙেচুরে যেন কিরকম হয়ে গেছে।

কুলসম বুঝিবা কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না, অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে হেঁটে যাচ্ছিল। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে—কিছুই সে বুঝতে পারছিল না।

অন্য মেয়েমানুষগুলো থেকে থেকে ডুকরে উঠছিল, 'অয় রে অয় রে, কী সব্বনাশ হইল। কই যামু, কী করুম!'

আজিপুরের পর টুঙ্গা, টুঙ্গার পর সখির বাজার। তারপর ঘোড়ামারার হাট পেরুলেই হাবিবগঞ্জ।

টুঙ্গা, সখির বাজার, ঘোড়ামারার হাট—হাসেমরা যেখান দিয়েই যাচ্ছে সেখানেই রাস্তার পাশ থেকে উদ্বিগ্ন মুখে অনেক মানুষ উঠে আসছে।

'কই থন (কোথা থেকে) আইতে আছ?'

হাসেমরা জানায়, নহরপুর, তাজহাটি, রসুনিয়া, মাইনকার চরের দিক থেকে তারা আসছে। নবীগঞ্জ-মীরপুরের লোকগুলো জানিয়ে দেয়, তারা কোথা থেকে আসছে।

'উই সগল দিকের খবর কী?'

গ্রামে গ্রামে খান সেনারা ঢুকে কী করেছে, হাসেমরা তার বর্ণনা দিয়ে যায়।

'আমরাও শুনছি, নহরপুরের পর থনে আর কিছু নাই। তুমরা কী কও, খানেরা এই দিকে আইব?'

'হেই রকমই শুনছি।'

'অয় অয় রে, গেরাম ছাইড়া কই যামু গা?'

'হে (তা) তুমরা বোঝ। শুনাশুন শুনছি, খানেরা এইখানেও আইব।'

'কী সব্বনাইশা কথা!'

ঘোড়ামারার হাটুরে চালাগুলো ছাড়িয়ে হাবিবগঞ্জের দিকে মাইলখানেক যেতে না যেতেই আরো পশ্চিম থেকে হঠাৎ বহু মানুষের চিৎকার ভেসে এল।

হাসেমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন ভীত স্বরে বলল, 'ব্যাপারখান কী?'

আর একজন বলল, 'ক্যামনে কই? কিছুই তো বুঝতে আছি না।'

ভুবন গোঁসাইর মা বলল, 'আর আউগাইয়া (এগিয়ে) কাম নাই। এইখানেই খাড়াও। ভাবগতিক বুইঝা যা হয় করণ যাইব।'

ওরা সারা মুখেচোখে আতঙ্ক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

বেলা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। নেহাত চৈত্র মাস, তাই দিনের আভা একেবারে নিভে যায় নি, পশ্চিমের ভাসন্ত মেঘে আবছাভাবে একটু আলো লেগে আছে। তবে চারপাশের গাছপালার ছায়া অনেক ঘন হয়ে গেছে। পুব উত্তর আর দক্ষিণ দিক জুড়ে কেউ যেন কালচে একটা জাল ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছে।

দম বন্ধ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর হাসেমরা দেখতে পেল, পশ্চিমের উঁচু উঁচু গাছগাছালির মাথা ছাড়িয়ে আগুন আর ধোঁয়া উঠছে। দেখতে দেখতে লকলকে আগুনের জিভ আকাশে গিয়ে ঠেকল।

গহরদ্দি চেঁচিয়ে উঠল, 'অয় অয় রে, জল্লাদেরা উই দিকে গ্যাছে বুঝিন।'

হাসেম কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা দিয়ে অনেক লোক—পুরুষ-মেয়ে, বাচ্চা কাচ্চা, জোয়ান-বুড়ো—উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এদিকে আসতে লাগল।

ওরা কাছাকাছি এসে গেলে হাসেম চেঁচিয়ে উঠল, 'কী হইছে, কী হইছে, অমুন দৌড়াও ক্যান?'

লোকগুলো ভয়ার্ত উদ্‌ভ্রান্ত সুরে বলল, 'খানেরা আইছে হাবিবগঞ্জে। বেবাক জ্বলাইয়া পুড়াইয়া শ্যায কইরা দিতে আছে। আমরা পলাইছি। এইখানে আর খাড়াইয়া থাইকো না, পুব মুখি দৌড়াইতে থাক।'

রসময় বলল, 'পুব দিক থনেই তো আমরা আইলাম।'

'পুবেও যমেরা আইছে নিহি (নাকি)?'

'হ। পুব দক্ষিণ দুই দিকেই আইছে। জান বাচানের লেইগা আমরা পচ্চিমে যাইতে আছিলাম।'

'পচ্চিমেও কুনো আশা নাই। খানেরা হেইখানেও আইসা গ্যাছে।'

'তাইলে উপায়?'

'উপায় আর কিছু নাই। এইবার মরণ। কিন্তুক সড়কের উপুর খাড়াইয়া বিপদ ডাইকো না। জল্লাদেগো গাড়ি-গুড়ি আছে। গুলি-বন্দুক আছে। এই মুখি যদি আইসা পড়ে রক্ষা নাই।'

'কী করতে চাও?'

'পুব পচ্চিম দক্ষিণ, তিনদিক গ্যাছে। খালি আছে উত্তর দিকখান। লও হেই মুখিই যাই—'

এখান থেকে উত্তর দিকে যাবার রাস্তা নাই। ইউনিয়ন বোর্ডের সড়কের তলাতেই মজা খাল। তারপর দুই কাইক গেলে নিবিড় উলুবন।

কে যেন বলল, 'উলুবনের ভিতর দিয়া যাইবা ক্যামনে?'

বনটা প্রায় আধ মাইলের মতো লম্বা, যেতে হলে অনেকখানি উজিয়ে কিংবা পিছিয়ে নিচের দিকের সড়ক ধরতে হয়। হাসেম কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কে যেন চিৎকার করে বলল, 'আরে সব্বনাশ, উই দ্যাখ—উই মুখি—'

তক্ষুনি সবার চোখ পশ্চিমে ঘুরল। অনেক দূরে ইউনিয়ন বোর্ডের সড়কটা সরু হতে হতে যেখানে একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে সেইখানে দুটো কালো ফোঁটার মতো কী যেন ফুটে উঠেছে। চক্ষের পলকে ফোঁটা দুটো মিলিটারি ট্রাক হয়ে গেল।

ইউনিয়ন বোর্ডের এই সড়কটা কাঁচা হলেও বেশ চওড়া। বর্ষার জলে পুব বাংলার অন্য সব মেটে রাস্তার মতো এটাও জলের তলায় ডুবে যায়। তবে খরার দিনে আর শীতে মানুষ এবং গরুবাছুর হেঁটে চলে বেড়ায়। আগে শুধু গরুর গাড়িই চলত, ক'বছর ধরে মোটর টোটরও যাতায়াত করছে।

ভুবন গোঁসাইর মা চেঁচিয়ে উঠল, 'নিঃবইংশারা আইতে আছে, তরাতরি উলুবনে ঢুইকা পড়।'

উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়ুতে দৌড়ুতে রাস্তা আর মজা খালের ওপর দিয়ে সবাই উলুর জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।

গহরদ্দি চিৎকার করে বলতে লাগল, 'যত পার ভিতরমুখি যাও—'

উলুবন ভেঙে সবাই ছুটছে। ইউনিয়ন বোর্ডের সড়ক থেকে যতদূরে চলে যাওয়া যায় ততই তারা নিরাপদ।

কিন্তু পায়ে পায়ে বাধা সরিয়ে কত দূর যাওয়া সম্ভব! দু হাতে ঘন জঙ্গল তোলপাড় করে ছুটতে ছুটতে অনেকে, বিশেষ করে মেয়েমানুষ আর বাচ্চাদের এগিয়ে যেতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল।

দু শ কাইকের বেশি তারা যেতে পারে নি, তার আগেই সড়কে ভারি ট্রাকের আওয়াজ শোনা গেল। ওরা এসে গেছে।

অন্য সবাই অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চালিতে মানুষের ভার নিয়ে হাসেম আর গহরদ্দি পিছিয়ে পড়েছে। তবু সমস্ত শক্তি দুই পায়ে জড়ো করে ওরা এগুচ্ছে।

হাসেম সড়কের দিকে কান খাড়া করে রেখেছিল। হঠাৎ সে শুনতে পায়, ট্রাক দুটো শব্দ করে থেমে গেছে। তবে কি খানেরা তাদের উলুবনে ঢুকতে দেখেছে? যদি দেখে থাকে? তার ভাবনাটা শেষ হল কি হল না, ঝাঁক ঝাঁক গুলির শব্দ আসতে লাগল—বুম—বুম—বুম—

উলুবনের ভেতর দিয়ে গুলি আসছে। ভীত আতঙ্কিত জন্তুর মতো উলুর জঙ্গল ডলে মুচড়ে হাসেমরা একবার এদিকে একবার ওদিকে ছোটাছুটি করতে থাকে। কোন দিকে গেলে বাঁচা যাবে, কেউ বুঝে উঠতে পারছিল না। কে কোথায় আছে, ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। তবে সন্ত্রস্ত ছোটাছুটির মধ্যে আকাশ ফাটানো চিৎকার উঠছিল, 'হায় আল্লা, গেলাম!' কিংবা 'হে ভগবান, মরলাম।' তারপরেই টের পাওয়া যাচ্ছিল, অনেকে লুটিয়ে পড়েছে। নির্ঘাত ওদের গুলি লেগেছে।

আশে পাশে কত লোক যে ছুটতে ছুটতে গুলি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, হিসেব নেই। একটা গুলি শেষ পর্যন্ত, হায় হায় রে, গহরদ্দির বুকে এসে লাগল। তক্ষুনি তীক্ষ্ণ চিৎকার করে মুখ গুঁজে পড়ে গেল সে। ভলকে ভলকে তাজা লাল উষ্ণ রক্ত তার বুক থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল।

নহরপুরে খানেদের হাতে গহরদ্দির ছেলে মেয়ে বিবি মরেছে। প্রাণে বাঁচবার জন্য খুব বেশিদূর তাকে যেতে হল না, উলুবনের ঘন ছায়ায় সে পড়ে রইল।

গহরদ্দি পড়ে যেতে তার কাঁধ থেকে ডুলির বাঁশটা খসে গিয়েছিল। কাজেই ফুলবানুকে নিয়ে ডুলিটা ওধারে পড়ে গেছে। আস্তে আস্তে তার দিকের বাঁশটা নামিয়ে গহরদ্দির মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল হাসেম। সারা গা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। একটা মানুষের দেহে কত রক্ত আছে কে জানে। হাসেম ডাকল, 'গহরভাই—গহরভাই—'

ঘোলাটে চোখে একবার তাকাল গহরদ্দি। কাতরানির মতো একটা শব্দ করল। তারপরেই তার চোখ বুজে গেল।

গহরদ্দিকে নিয়ে কী করবে, ভেবে উঠতে পারছিল না হাসেম। এই মানুষটার সঙ্গে তার কতকালের চেনাশোনা। ভুবন গোঁসাইরা ডেকে নিয়ে যাবার আগে নিকারিপাড়ায় গহরদ্দির ঘরের খোলা বারান্দায় কত বছর যে কাটিয়ে দিয়েছে! এক সঙ্গে কত দিন ধলেশ্বরীতে গেছে মাছ মারতে, পলো আর ধর্মজাল নিয়ে নেমেছে বিলে—বর্ষায় ডুবে-যাওয়া চকে। আষাঢ় শ্রাবণের ভরা কোঁটালে খালে গিয়ে কতদিন 'চাই' পেতে রেখে এসেছে দু'জনে। জীবনধারণের জন্য জলে জলে যে লড়াই তাতে গহরদ্দি ছিল সর্বক্ষণের সহযোদ্ধা। হায় রে হায়, সেই মানুষটা উলুবনে মরে পড়ে রইল!

হাসেমের বুকের তলা থেকে মোচড় দিয়ে দিয়ে হাজার মণ ভারি কী একটা যেন উঠে আসছিল। ঢোক গিলতে, নিশ্বাস ফেলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তার। এর মধ্যেই আবছাভাবে সে টের পাচ্ছিল, ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তার দিক থেকে গুলির শব্দ থেমে গেছে। হয়তো খানেরা চলে গেছে।

কতক্ষণ গহরদ্দির মুখের ওপর ঝুঁকে বসে ছিল, হুঁশ নেই। হঠাৎ উলুবনের ভেতর থেকে অগুনতি গলার ভীত চিৎকার উঠতে লাগল, 'পলাও, পলাও—উত্তরমুখি পলাও। ইবলিশেরা আগুন ধরাইয়া দিছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে দ্রুত ওপর দিকে তাকাল হাসেম। সত্যিই আগুন, উলুবনের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে। আগুন লাগালেও এত তাড়াতাড়ি আসবার কথা নয়, দক্ষিণের বাতাস পিঠে চড়িয়ে সেটাকে যেন ছুটিয়ে নিয়ে আসছে।

তক্ষুনি ফুলবানুর কথা মনে পড়ে গেল হাসেমের আর মনে পড়ল ভুবন গোঁসাইর মাকে।

লাফ দিয়ে উঠে ফুলবানুকে পাঁজাকোলে তুলে হাসেম ছুটতে লাগল, আর গলা ফাটিয়ে ডাকতে লাগল, 'ঠাকুরমা—ঠাকুরমা—' বাঁশের চালিটা উলুবনেই পড়ে থাকল।

ভুবন গোঁসাইর মায়ের সাড়া পাওয়া গেল না।

হাসেম এবার ডাকল কুলসমকে। তারপর নহরপুরের যে ক'টা জীবন্ত মানুষ একসঙ্গে এসেছিল, তাদের সবার নাম ধরে ধরে। কিন্তু কারো সাড়া পাওয়া গেল না। গুলি আর আগুনে কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, কে জানে!

উলুবন তছনছ করে দুদ্দাড় মানুষ ছুটে যাচ্ছে। হাসেমও ছুটছিল, কিন্তু একটা মানুষের ভার নিয়ে প্রতিটি কাইকে উলুর বাধা সরিয়ে সরিয়ে কত তাড়াতাড়িই বা এগুনো সম্ভব! ওদিকে আগুন যেভাবে, যত দ্রুত তাড়া করে আসছে তাতে আর বোধ হয় পারা যাবে না। ছুটন্ত আগুনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পালাতে পালাতে হাসেমের মনে হচ্ছিল, যে কোনো সময় সে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। হায় হায় রে, শেষ পর্যন্ত বেড়া আগুনে পুড়ে মরবে তারা!

উলুবনটা যে কত বড়, কে জানে। এটার বোধ হয় শেষ নেই।

পালাতে পালাতে হঠাৎ এক কাণ্ড হল। হাসেম দেখতে পেল, ছুটে আসতে আসতে আগুনটা থমকে দাঁড়িয়ে গেছে এবং উলটোদিকে মুখ ফিরিয়েছে। কিন্তু সেদিকে যাবার জো নেই, কেননা উলুবন যা ছিল সব পুড়িয়ে থাক করে তো সেটা এতখানি এগিয়ে এসেছে। ওদিকে এমন আর কিছুই নেই যা ধরে আগুনটা ফিরে যেতে পারে।

ব্যাপারটা কী হল, প্রথমে বুঝে উঠতে পারল না হাসেম। একটু পরেই তার খেয়াল হল, এতক্ষণ দক্ষিণ থেকে হাওয়া দিচ্ছিল, সেটা বন্ধ হয়ে এখন উত্তর দিক থেকে ঝড়ো বাতাস ছুটে আসছে। উল্টুরে হাওয়ার দাপটে আগুনটা এগিয়ে আসতে পারছে না। হাসেম মনে মনে বলল, 'হগলই (সবই) খোদাতাল্লার ইচ্ছা।'

আগুনের ভয় আপাতত নেই।

হাসেম ছোটাছুটি থামিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল।

দিনের শেষ নিভু নিভু যে আলোটুকু খানিক আগেও আকাশের গায়ে আটকে ছিল, সেটা একেবারেই মরে গেছে। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নেমে এল। তারপর অনেকক্ষণ হেঁটে উলুবন পার হয়ে বিশাল এক চকে এসে পড়ল হাসেম।

এর মধ্যেই দিগন্তের তলা থেকে রুপোর থালার মতো গোল একখানা চাঁদ উঠে এসেছে। ধবধবে জ্যোৎস্নায় চকটা ভেসে যাচ্ছিল।

হাসেম দেখল, সে আসবার আগেই কুলসম আর ভুবন গোঁসাইর মা চকে এসে পড়েছে। নহরপুরের আরো কয়েকজনকে দেখা গেল। তা ছাড়া নবীগঞ্জ বীরপুর মাইনকার চর হাবিবগঞ্জের মানুষরা তো আছেই। এক পলক দেখেই হাসেমের মনে হল, তারা যত মানুষ উলুবনে ঢুকেছিল তার আধাআধি চকে এসেছে, বাকি অর্ধেক নিশ্চয়ই উলুবনে গুলি খেয়ে পড়ে আছে।

হাসেমকে দেখে ভুবন গোঁসাইর মা ছুটে এল, 'অয় রে ড্যাকরা, নিঃবইংশা, আমি তো ভাবছিলাম তুই নাই। কসাইগুলা তরে শ্যাষ করছে।'

ফুলবানুকে কোল থেকে নামিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিতে দিতে হাসেম বলল, 'আমি মরি নাই ঠাকুরমা। কিন্তুক গহরদ্দি ভাই গুলি খাইয়া মরছে।'

'গহইরা মরছে!' বলেই স্তব্ধ হয়ে গেল ভুবন গোঁসাইর মা।

হাসেম আবছা গলায় বলতে লাগল, 'আমরাও কেও (কেউ) বাচুম না ঠাকুরমা। কয়দিন আর পলাইয়া থাকুম, ইবলিশগো চোখে একদিন না একদিন পইড়া যামুই। আর তহন—'বলতে বলতে আচমকা সেই চালিটার কথা মনে পড়ে গেল। তক্ষুনি উঠে পড়ল সে।

ভুবন গোঁসাইর মা জিজ্ঞেস করল, 'উঠলি যে?'

'এট্টু উলুবনে যাইতে হইব। ফুলবানুর চালিখানি ফালাইয়া আইছি, হেইটা লইয়া আহি—'

'উলুবনে গিয়া মরবি? ডাকাইতরা গুলি চালাইয়া তরে শ্যাষ করব।'

'হ্যারা (তারা) নাই, আগুন ধরাইয়া গ্যাছে গা—' হাসেম আর দাঁড়াল না।

উলুবনে ঢুকে তার বুক ছমছম করতে লাগল। চারদিক থেকে গোঙানির শব্দ আসছে। কেউ কেউ জড়িয়ে জড়িয়ে বলছে, 'পানি—এট্টু পানি—'

'মইরা গ্যালাম রে—'

যাদের গুলি লেগেছে তারা সবাই মরে নি। জলটল আর ওষুধ পেলে এখনও হয়তো কাউকে কাউকে বাঁচানো যায়। কিন্তু হাঁড়ি পাতিল বাটি গেলাস কিছুই সঙ্গে নেই যা দিয়ে জল আনা যায়। তা ছাড়া এখানে জলই বা কোথায়?

খুঁজে খুঁজে চালি বার করে আবার চকে ফিরে এল হাসেম। উলুবন থেকে যারা বেঁচে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল তারা গা ঘেঁষাঘেঁষি আর আচ্ছন্নের মতো বসে আছে।

হাসেম তাদের বলল, 'উলুবনে অহনও কেও কেও (কেউ কেউ) বাইচা আছে, কাতরইতে আছে। এট্টু পানি হইলে অগো বাচান যায়।'

তক্ষুনি দলের শক্ত সবল পুরুষ মানুষগুলো উঠে পড়ল এবং উলুবনের ভেতর যারা গুলিতে জখম হয়ে পড়েছিল তাদের তুলে চকে এনে শুইয়ে দিল। কেউ কেউ কোত্থেকে কানা-ভাঙা মাটির পাতিল জোগাড় করে মাঠের মাঝখানে একটা মজা খাল থেকে জল নিয়ে এল। খানিকটা খানিকটা জল খেয়ে আহত মানুষগুলো কাতর শব্দ করতে করতে একসময় চুপ করে গেল।

সমস্ত দিন শরীর এবং মনের ওপর দিয়ে যা গেছে তাতে সুস্থ জীবন্ত মানুষগুলোও আর মাথা খাড়া রাখতে পারছিল না, শূন্য চকে সারা গায়ে জ্যোৎস্না মেখে তারা শুয়ে পড়ল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমে অসাড় হয়ে গেল।

হাসেম শুয়েছিল ফুলবানুর পাশে। শোওয়ামাত্র তার কিন্তু ঘুম এল না। চিত হয়ে চাঁদেব দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে ভাবছিল, কাল রাত্তিরে কোথায় ছিল, আর আজ কোথায়! আসছে কালই বা কোথায় থাকবে কে জানে। কাল থেকে আজ পর্যন্ত সব ঘটনাই তার কাছে অদ্ভুত এক দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল। সেই সঙ্গে অবিশ্বাস্যও।

কিছুক্ষণ চিত হয়ে থাকবার পর পাশ ফিরে ফুলবানুর দিকে তাকাল হাসেম। এখনও মেয়েটার জ্ঞান ফেরে নি। ফুলবানুকে দেখতে দেখতে বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে দীর্ঘশ্বাস উঠে এল তার। সাড়া পাবে না জেনেও ডাকতে লাগল, 'ফুলবানু, ফুলবানু—' অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর গলার স্বর নামিয়ে বলতে লাগল, 'আর কি তুমি চৌখ মেলবা (চোখ খুলবে) না, আর কি কথা কইবা না?' বলতে বলতে আর ফোঁপাতে ফোঁপাতে হাসেম কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

ছয়

সকালবেলা ঘুম ভাঙলে হাসেম দেখতে পেল, উলুবন থেকে কাল রাত্রে যে রক্তাক্ত জখমী লোকগুলোকে তুলে আনা হয়েছিল তাদের বেশির ভাগই মরে গেছে। যে আট দশ জন এখনও বেঁচে আছে, ভয়ার্ত করুণ সুরে তারা গোঙাতে গোঙাতে বলছিল, 'আমাগো ফালাইয়া তুমরা যাইও না।'

কিন্তু ওদের ফেলে না গিয়ে উপায়ই বা কী। এত লোককে কে ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যাবে? ওদের জন্য যদি এখানে পড়ে থাকতে হয়, নানা দিক থেকে বিপদের সম্ভাবনা। খানেদের ভয় তো আছেই, এই নির্জন চকে তার চাইতে অনেক বেশি ভয়, না খেয়ে মরার।

কাল দুপুরে আজিপুরের জাফর সাহেব কিছু চিঁড়ে আর গুড় সঙ্গে দিয়েছিল। রাত্তিরে কেউ খায় নি। এখন দু মুঠো করে খেয়ে, আহত লোকগুলোকে খানিকটা খানিকটা দিয়ে হাসেমরা চকের ওপর

দিয়ে উত্তর দিকে হাঁটতে লাগল।

পেছন থেকে জখমী লোকগুলো ভাঙা দুর্বল সুরে চেঁচাতে লাগল, 'তোমরা যে যাও গিয়া। আমাগো কী হইব?'

অন্য সময় হলে এভাবে কি চলে যেতে পারত? হাসেম ভাবল, তার মন একদিনে কি পাষাণ হয়ে গেছে!

কাল গহরদ্দি চালির একদিকের বাঁশ কাঁধে নিয়েছিল। আজ সে নেই, তার জায়গায় যুগীপাড়ার রসময় কাঁধ দিয়েছে। চকটার যেন শেষ নেই। হাসেমরা হাঁটছে তো হাঁটছেই। সকাল গেল, দুপুর গেল, সন্ধের কিছু আগে আগে ওরা একটা গ্রামের কাছে এসে পড়ল।

চক থেকে ওরা সবে গ্রামে ঢুকছে, সেইসময় কে চিৎকার করে বলল, 'কারা তুমরা?'

হাসেমরা চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপরেই দেখতে পেল, চারপাশের ঝোপজঙ্গল থেকে অনেকগুলো লোক বেরিয়ে এল। বেশির ভাগই যুবক, তবে দু-চার জন প্রৌঢ় এবং বার চোদ্দ বছরের ক'টি কিশোরও আছে। তাদের কারো পরনে পাজামা-গেঞ্জি, কারো বা লুঙ্গি-শার্ট। কিন্তু সবার হাতেই বন্দুক। বন্দুক থাকলেও এরা অন্তত খান সেনা নয়, এদেশেরই মানুষ।

হাসেমরা ভয়ে ভয়ে জানাল, তারা কারা, কোথা থেকে কিভাবে আসছে।

সব শুনে লোকগুলোর চোখ দপদপ করতে লাগল। চোয়ালের হাড় শক্ত হল। তাদের একজন বলল, 'তাইলে (তাহলে) তো তোমাগো খাওন দরকার, বিশ্রাম দরকার। আসো আমাগো লগে—'

হাতে যেন বেহেস্ত পেয়ে গেল হাসেমরা। ওদের সঙ্গে গ্রামের ভেতর যেতে যেতে হঠাৎ জিজ্ঞেস কর, 'আপনেরা?'

একজন বলল, 'আমরা মুক্তিফৌজ—'

'মুক্তিফৌজ' কথাটা হাসেমের জানা। কিন্তু কোথায় শুনেছে, এই মুহূর্তে মনে করতে পারল না। সে বলল, 'একখান কথা জিগামু?'

'কী?'

'জঙ্গলের ভিত্‌রে বইসা আপনেরা কী করতে আছিলেন?'

'পরি (পাহারা) দিতে আছিলাম। শুনছি খানের বাচ্চারা আমাগো গেরাম জ্বালাইতে আইব। তাগো মুকাবিলা করতে হইব তো।'

হাসেমের মনে পড়ল, তাদের নহরপুরের ছেলেমেয়েরা খানেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য লাঠি-চালানো, ছোরা চালানো এবং বন্দুক ছোঁড়া শিখেছিল। কিন্তু কী হয়েছে তাতে? কেউ কি প্রাণে বেঁচেছে? খানেরা কি মানুষ? জানোয়ার, ইবলিশ। প্রাণে ওদের দয়ামায়া নেই।

একটা কথা ভেবে হাসেমের বুকে কাঁপুনি ধরল, অচেনা এই গ্রামের এই নানা বয়সের মানুষগুলোও বাঁচবে না, ক'টা দোনলা বন্দুক দিয়ে কি খানেদের রোখা যায়?

গ্রামের ভেতর এসে একটা ফাঁকা মাদ্রাসায় হাসেমদের থাকার ব্যবস্থা করে দিল লোকগুলো। খাওয়ারও বন্দোবস্ত হল।

নহরপুর থেকে বেরুবার পর দাঁতে আর কিছু কাটে নি ভুবন গোঁসাইর মা। বামুনের ঘরের বিধবা, যখন তখন যেখানে সেখানে খাওয়ার অভ্যাস নেই। তাছাড়া অন্যের রান্নাও তার চলবে না। ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা বুড়ি দারুণভাবে মেনে চলে।

একই বাড়িতে আট দশ বছর একসঙ্গে কাটিয়ে ভুবন গোঁসাইর মায়ের সব অভ্যাস এবং জীবনযাত্রার মোটামুটি ছক জেনে গেছে হাসেম। দুদিন বুড়ি নির্জলা উপোস দিয়েছে। তার ওপর আছে প্রাণের ভয়ে মাইলের পর মাইল হাঁটা। একে তো ফুলবানুকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হচ্ছে, বুড়ির যদি কিছু হয় নতুন একটা বিপদ জুটে যাবে।

বলে কয়ে একটু দুধ, খানিকটা খই আর পাকা কলা জোগাড় করে ভুবন গোঁসাইর মাকে খাওয়াল হাসেম।

সবার খাওয়া দাওয়া হতে হতে রাত নেমে গেল।

সেই বন্দুকওলা লোকগুলো তাদের তদারক করছিল কোত্থেকে দুটো হেরিকেন জ্বালিয়ে তারা

মাদ্রাসায় এনে রাখল।

বন্দুকওলারা তো আছেই, গ্রামের অন্য লোকেরাও মাঝে মাঝে এসে হাসেমদের দেখে যাচ্ছে। নহরপুর থেকে হাবিবগঞ্জ পর্যন্ত দুধারের গ্রামগুলোতে কী হয়েছে, খানেরা কত লোক মেরেছে, কত বাড়ি পুড়িয়েছে, কত মেয়ে লুট করেছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিচ্ছে। তারপর বলছে, 'হায় হায় রে, জল্লাদেরা যদি আমাগো গেরামে আসে কী হইব? হায় হায় রে—'

ওদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক বন্দুকধারীটিকে হাসেম বলল, 'আপনেগো এইখানে ডাক্তর আছে?'

'না, ক্যান?'

ফুলবানুকে দেখিয়ে হাসেম বলল, 'দুই দিন ধইরা এয়ার হোশ নাই। ডাক্তর পাইলে বাচান যাইত।'

বন্দুকওলা ফুলবানুকে দেখতে দেখতে চমকে উঠল, 'কী হইছে মাইয়াটার?'

কী হয়েছে, হাসেম বলল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বন্দুকওলা বলল, 'হ, এট্টা ডাক্তর পাওন দরকার। কিন্তুক এই গেরামে নাই, জবর চিন্তায় ফালাইলা মিয়া—'

হাসেম উত্তর দিল না।

রাত একটু বাড়লে বন্দুকওলারা বলল, 'সমস্ত দিন ধকল গ্যাছে, অহন তুমরা ঘুমাও। কাইল সকালে আসুম—'ওরা দল বেঁধে চলে গেল।

তারপর কেউ আর বসে থাকল না। মাদ্রাসার তিনটে ঘরে যে যেখানে পারল আড়াআড়ি লম্বালম্বিভাবে গাদাগাদি করে শুয়ে পড়ল।

হাসেম কাল রাতের মতো আজও ফুলবানুর কাছে শুয়েছিল। ফিসফিস করে সে বলল, 'আইজও ডাক্তর পাইলাম না, তুমারে বাচাইতে পারুম না ফুলবানু, পারুম না—' তার গলার স্বর কাঁপতে লাগল।

পরের দিন সকালে হাসেমদের ঘুম ভাঙতেই বন্দুকওলারা এসে পড়ল।

হাসেমরা বলল, 'আপনেগো লগে একখান পরামশ্য করতে চাই—'

'কও—'

'আমাগো খবর সগলই তো শুনছেন। অহন আমরা কই যাই? কুনখানে গ্যালে পরাণখান বাচাইতে পারি?' ঠিক এই প্রশ্নগুলিই হাসেমরা আজিপুরের জাফর সাহেবকে করেছিল।

জাফর সাহেব যা বলেছিল, এরাও তা-ই বলল। এই গ্রামেই হাসেমদের তারা থাকতে বলতে পারত। কিন্তু খান সেনারা যে কোনোদিন হানা দিতে পারে। কাজেই এখানে থাকা হাসেমদের পক্ষে নিরাপদ নয়।

হাসেমরা বলল, 'আমরা কই যামু কইয়া দ্যান—'

একটু ভেবে বয়স্ক বন্দুকওলা বলল, 'পুবে পশ্চিমে দক্ষিণে যাইও না। খাড়া উত্তরেও না। শুনাশুন শুনতে আছি, উত্তরেও নিহি অরা আইব।'

'তাইলে?'

'তুমরা কোনাকুনি উত্তর-পচ্চিমে যাও। উই দিকে অহন তরি (এখন পর্যন্ত) বিপদ নাই। কানে অন্তত কিছু আহে নাই।'

হাসেমদের কিছু খাইয়ে, কিছু মুড়ি চিঁড়ে বেঁধে দিয়ে সড়কে তুলে দিল বন্দুকওলারা।

সাত

ছোটবেলায় কার কাছে একটা পরস্তাব (রূপকথা) শুনেছিল হাসেম। তাতে কে যেন কাকে বলেছিল, 'উত্তরে যাইও, পচ্চিমে যাইও, পুবেও যাইও কিন্তুক দক্ষিণে যাইও না।'

পরস্তাবে একটা দিকেই ছিল বিপদ, বাকি তিন দিকে নিশ্চিন্তে পা বাড়ানো যেত। হায় হায় রে, খানেদের ভয়ে একটা দিকও আর এদেশে নিরাপদ নেই। উত্তর-পশ্চিমও অর্থাৎ বায়ু কোণেও তাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে কে জানে।

সারা সকাল হাসেমরা হাঁটল আর হাঁটল। তারপর দুপুরবেলা চৈত্রের খাড়া রোদ মাথায় নিয়ে প্রথম যে গ্রামটায় এসে পড়ল, সেখানে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

গ্রামটার ভেতর থেকে ভীষণ দুর্গন্ধ আসছে। মাথার ওপর ঝাঁক ঝাঁক শকুন উড়ছে। আর দেখা যাচ্ছে শিয়াল। চারপাশের বনজঙ্গলে একটা শিয়ালও আর নেই, সব ওই গ্রামটায় গিয়ে জড়ো হয়েছে।

ভাল করে তাকাতেই হাসেমরা দেখতে পেল, গ্রামটার আর কিছু অবশিষ্ট নেই। পোড়া ঘরবাড়ির ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য মৃতদেহ পড়ে আছে। শিয়াল এবং শকুনরা সেগুলো নিয়ে টানাটানি ছেঁড়াছেঁড়ি করছে।

দুর্গন্ধের কারণটা বোঝা যাচ্ছে—মৃতদেহগুলো পচাগলা। মানুষের শরীর একদিনে নিশ্চয়ই পচে নি, পচতে পচতে কম করে তিন চার দিন লেগেছে। তার মানে খান সেনারা এখানে আগেই হানা দিয়ে গেছে। অথচ যে গ্রাম থেকে এল হাসেমরা সেখানকার লোকেরা এ ব্যাপারে কিছুই জানে না।

ভুবন গোঁসাইর মা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'যমেরা এইখানেও আইছিল রে—'

ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন বলে উঠল, 'অয় রে, অয় রে, মাইন্‌ষের শরীল!'

হাসেম বলল, 'এইখানে আর খাড়াইয়া থাকতে পারতাছি না, গন্ধে প্যাটের নাড় (নাড়ি) পাক দিতে আছে।'

বাকি সবাই বলল, 'হ হ, লও যাই—'

সড়কের ডান ধারে গ্রাম, বাঁ ধারে ফাঁকা মাঠ। হাসেমরা মাঠে নেমে সড়ক থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে হাঁটতে লাগল।

দূরে যাওয়ার জন্য গন্ধটা তেমন করে নাকে লাগছে না। মাঝে মাঝে এক একটা ঝলক বাতাসে ভেসে আসছে শুধু।

সড়কের ডান ধারে গ্রামের পর গ্রাম। দূর থেকে গ্রামগুলো স্পষ্ট দেখা যায় না, তবে অস্পষ্টভাবে টের পাওয়া যায়। যা দেখা যাচ্ছে তা হল লাখ লাখ শকুন, গ্রামগুলোর মাথায় সেগুলো উড়ছে।

হাসেমরা বুঝতে পারছিল, খানের বাচ্চারা এদিকের গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে দিয়ে গেছে।

সন্ধের পর হাসেমরা একটা ফাঁকা হাটে এসে পৌঁছুল। কেউ কোথাও নেই, নির্জন হাটে অসংখ্য চালা সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে।

সেই সকাল থেকে হাসেমরা হাঁটছে। আর পারছিল না তারা, হাত-পা ভেঙে আসছিল যেন। শরীরের সব শক্তি তাদের যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে।

রসময় বলল, 'আইজ রাইতটা এইখানে কাটাইয়া দেই। কাইল সকালে উইঠা আবার দেখা যাইব।'

অন্য সবাই বলল, 'হ হ, শরীলে আর দিতে আছে না।'

কাল রাতে যে গ্রামে ওরা ছিল সেখানকার মুক্তিফৌজরা আজ যে চিঁড়ে মুড়ি দিয়ে দিয়েছিল তা-ই অল্প অল্প খেয়ে বাকিটা পরের দিনের জন্য রেখে সবাই খোলা হাটের চালায় মাটির ওপর শুয়ে পড়ল।

কালকের মতো আজও দিগন্তের তলা থেকে একখানা চাঁদ উঠে এসেছে। তবে জ্যোৎস্না আগের দু দিনের মতো অত উজ্জ্বল না। পূর্ণিমার চাঁদ যত দিন যাচ্ছে, ক্ষয়ে ক্ষয়ে আসছে।

হাসেম ফুলবানুর কাছেই শুয়েছে। চাঁদের অনুজ্জ্বল আলোয় সে ফুলবানুকে দেখতে লাগল।

আজও জ্ঞান ফেরেনি মেয়েটার। সারাদিন রোদে পুড়ে একেবারে কালো হয়ে গেছে ফুলবানু। তার ওপর খাওয়া নেই দাওয়া নেই, মুখ শুকিয়ে একটুকু হয়ে গেছে। হায় রে হায়, যাকে একদিন পরস্তাবের হুরী-পরী বলে মনে হয়েছে, তার চেহারা ভেঙেচুরে কী হয়ে গেছে।

'আর বুঝি তুমারে বাঁচাইতে পারলাম না ফুলবানু, বাচাইতে পারলাম না—' রোজকার মতো আজও বলতে বলতে আর ফোঁপাতে ফোঁপাতে ঘুমিয়ে পড়ল হাসেম।

তারপর কতক্ষণ কেটে গেছে, কে জানে। হঠাৎ কাদের চেঁচামেচিতে ধড়মড় করে উঠে বসল হাসেম। দেখল ভুবন গোঁসাইর মা, কুলসম, রসময়—তাদের দলটার সবাই জেগে উঠেছে। আর মীরপুর-নবীগঞ্জের একটা লোক, তমিজদ্দি তার নাম, সমানে চিৎকার করছে। তার ডান পায়ের উরুর কাছটা খোবলানো। সেই ক্ষত থেকে গল গল করে রক্ত পড়ছে।

উদ্বেগের গলায় হাসেম জিজ্ঞেস করল, 'কী হইছে?'

'কে যেন বলল, 'তমিজদ্দিরে শিয়ালে কামড়াইছে।'

'শিয়াল।'

'হ হ, শিয়াল। উই যে—' যে বলছিল, সামনের দিকে সে আঙুল বাড়িয়ে দেয়।

হাসেম দেখতে গেল, তাদের চালাগুলো থেকে খানিকটা দূরে আট দশটা শিয়াল দাঁড়িয়ে আছে, চাঁদের আলোয় জন্তুগুলোর চোখ জ্বল জ্বল করছিল।

রসময় মুখের ভেতর একটা শব্দ করে তাড়া লাগাল, 'এই হালারা, হট্ হট্—'

জন্তুগুলোর ভয়ডর নেই যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জীবন্ত মানুষদের দেখতে লাগল।

ভুবন গোঁসাইর মা বলল, 'কী সব্বনাইশা কাণ্ড! শিয়ালে জীয়ন্ত মানুষ খাইতে আসে এমুন তাজ্জব কথা বাপের জম্মে শুনি নাই।'

মীরপুর-নবীগঞ্জের একটা লোক বলল, 'ঘুমাইয়া আছিলাম। আমরা মড়া না জ্যাতা (জীবন্ত) বুঝতে পারে নাই। দ্যাশ ভরা খালি মড়া আর মড়া। মড়া খাইয়া খাইয়া হালার পুতেগো জিভ্যা বাইড়া গ্যাছে।'

রসময় আবার বলল, 'কী সাহস শয়তানের ছাওগো, খেদাইলে যায় না। র হালারা—' বলেই খুঁজে পেতে একটা বাঁশের টুকরো জোগাড় করে ছুঁড়ে মারল। এবার শিয়ালগুলো দৌড়ে পালিয়ে গেল।

সবার কথা অস্পষ্টভাবে শুনতে শুনতে হাসেম ভাবতে লাগল, তমিজদ্দিকে না কামড়ে শিয়ালটা যদি ফুলবানুকে কামড়াত!

হায় হায় রে, ফুলবানুর তো জ্ঞান নেই। সে চিৎকার করে কাউকে জানাতে পারত না। জন্তুগুলো তাকে খেয়ে হাড় ক'খানা ফেলে রেখে চলে যেত। ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল হাসেম।

বাকি রাতটা আতঙ্কে কেউ আর ঘুমাতে পারল না, হাটের চালায় জেগেই কাটিয়ে দিল।

পরের দিন ভোরের আলো ফুটতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে হাসেমদের বুকের রক্ত জমাট বেঁধে যেতে লাগল।

কাল তারা যেখানে রাত কাটিয়েছে সেখান থেকে পঞ্চাশ হাতও হবে না, সারি সারি অনেকগুলো কবর। দেখেই টের পাওয়া যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত খুঁড়ে সেগুলোর ভেতর কয়েক শ, নাকি কয়েক হাজার করে মৃতদেহ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে মাটি ভালভাবে চাপা দেওয়া হয়নি। ফলে চারদিক দিয়ে অনেক হাত, পা, মাথা এবং শরীরের অন্য অংশ বেরিয়ে আছে। কিংবা এ-ও হতে পারে শিয়াল কিংবা অন্য জন্তুরা মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে মড়া বার করেছে।

হাসেমরা আরো দেখতে পেল, অসংখ্য শিয়াল কবরগুলোর কাছে টহল দিচ্ছে। চারপাশের গাছগুলোর পাতা দেখা যায় না, শুধু শকুন আর শকুন। সারা রাত তারা বোধ হয় ওখানে বসে ছিল। এখন সকালের আলো ফুটতে ডানা মেলে ঝপাঝপ নেমে আসছে।

কাল আবছা চাঁদের আলোয় এসব দৃশ্য চোখে পড়ে নি। হাসেমরা বুঝতে পারে নি কোথায় কিসের পাশে তারা রাত কাটাতে এসেছে।

ভুবন গোঁসাইর মা দু-হাতে মুখ ঢেকে চিৎকার করে উঠল, 'তরাতরি এইখান থনে ল (চল)। আমি আর সইতে পারতাছি না।'

শুধু ভুবন গোঁসাইর মা-ই না, সহ্য কেউই করতে পারছিল না। সবার শিরা যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল। শূন্য হাটের চালা পেছনে ফেলে টলতে টলতে ওরা সামনের সড়কে গিয়ে উঠল।

তারপর তিন দিনে ওরা তিরিশটা গ্রাম পেরুল কিন্তু একটা জীবন্ত মানুষেরও দেখা পাওয়া গেল না।

তিরিশটার ভেতর পনেরটা গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গ্রাম-জোড়া সেই সব ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে অগুনতি মৃতদেহ। মরা মানুষের শরীর ঘিরে ঝাঁক ঝাঁক শিয়াল ঘুরছে আর মাথার ওপর হাজার হাজার শকুন চক্কর দিচ্ছে। নহরপুর থেকে বেরুবার পর অনবরত এই দৃশ্যই দেখে আসছে হাসেমরা।

পনেরটা গ্রামের তো এই দশা। বাকি পনেরটা অবশ্য পোড়ে নি, তবে সেখানে লোকজন বলতে কেউ নেই, খানেদের ভয়ে বাড়িঘর ফেলে কোথায় পালিয়ে গেছে।

হাসেমরা শেষ ভাত খেয়েছিল মুক্তি ফৌজদের গ্রামে। ওরা সঙ্গে কিছু চিঁড়ে টিঁড়ে দিয়ে দিয়েছিল। সেই কবেই শেষ হয়ে গেছে।

এই তিন দিনে চকের ক্ষীরাই আর বাঙ্গি (ফুটি) ছাড়া হাসেমদের কিছুই জোটেনি। ওই খেয়ে কি মানুষ প্রাণে বাঁচে?

সবাই খুব কাহিল হয়ে পড়েছিল। হাত-পা-বুক-মাথা ভয়ানক টলছিল, ওদের কেউ আর ঠিকমতো কাইক ফেলতে পারছিল না। এলোমেলো দুর্বল পা ফেলে ফেলে কোনোরকমে এগিয়ে যাচ্ছিল।

কে একজন বলে উঠল, 'আর পারুম না। চাউরগা ভাত না পাইলে মইরা যামু।'

অন্য একজন বলল, 'খানেগো গুলির ডরে পলাইলাম, অহন না খাইয়া উপাস দিয়া মরতে হইব।'

তৃতীয় জন বলল, 'তিন দিন ধইরা হাটতে আছি, এট্টা তাজা মাইন্‌ষের মুখ দেখি নাই। সারা দ্যাশে যদি কুনো মানুষ বাইচা না থাকে, কে খাইতে দিব? কার কাছে আশ্‌শয় পামু?'

রসময় বলল, 'তার থিকা যে যেইখান থন আইছি, হেইখানেই ফিরা যাই। কপালে যা আছে তাই হউক। পরাণে বাচনের লৈইগা পাগলের নাহান (মতো) কই চলছি কিছুই বুঝি না।'

ভুবন গোঁসাইর মা বলল, 'ফিরা আর যাওন হইব না। ছয় দিন ধইরা হাটতে আছি, ফিরতে আবার ছয় দিন লাগব। এই ছয় দিন খাবি কী?'

'তাইলে?'

'সুম্‌খেই আউগাইয়া যাইতে হইব। যদি কিছু না মিলে তভু যাইতে হইব। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।'

ওরা হাঁটতেই থাকে। সবার হাল যেমন তেমন। কিন্তু হাসেম ফুলবানু তমিজদ্দি আর কুলসমের দিকে তাকানো যায় না। তমিজদ্দির শিয়ালে কামড়ানো উরুটা ফুলে পেকে দুনিয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে আরেক উপসর্গ, জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে টলতে টলতে খানিকটা হাঁটে তমিজদ্দি। দশ বিশ কাইক যেতে না-যেতেই তাকে ফুলবানুর পাশে চালিতে তুলে নেয় হাসেম। ফুলবানুর জ্ঞান এখনও ফেরেনি। রোদে আরো শুকিয়ে, আরো কালো হয়ে গেছে মেয়েটা। এক এক সময় হাসেমের মনে হয়, ফুলবানু বোধহয় বেঁচে নেই। তখনই চমকে উঠে একটা হাত তার নাকের কাছে নিয়ে আসে। নাঃ, এখনও তির তির করে শ্বাস পড়ছে। 'এট্টা ডাক্তর যদি পাইতাম! হায় খোদা, এট্টা ডাক্তর যদি মিলাইয়া দিতা!' নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে আপন মনে বলে যায় হাসেম।

এরপর কুলসমের কথা। খানের বাচ্চারা তার সোয়ামীকে মেরেছে, ছেলেমেয়েদের মেরেছে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে ছারখার করে দিয়েছে। সেই শোক তো আছেই, তার ওপর আছে দশ মাস গর্ভের ভার। না খেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো একটা ঘোরের মধ্যে সে সবার সঙ্গে হাঁটছিল। তাকে দেখে মনে হয়, খুব বেশিক্ষণ কুলসম আর হাঁটতে পারবে না। তার বাঁচবার ইচ্ছা, শরীর এবং মনের শক্তি—সব ফুরিয়ে গেছে।

আর হাসেম নিজে? ফুলবানুর চালির একটা বাঁশ প্রথম দিকে গহরদ্দি কাঁধে নিয়েছিল, তারপর রসময়। একা রসময় না, কিছুক্ষণ পর পরই ওদিকটায় কাঁধ বদল হয়েছে। হাফেজ আলতাফ নিবারণ আনিসুর হাচাই পাল কত লোক যে ওধারটা কাঁধে নিয়েছে। কিন্তু এদিকের বাঁশটা কাউকে ছাড়ে নি হাসেম, ছ'দিন ধরে সমানে বয়ে নিয়ে আসছে। তার ফল হয়েছে এই, দু কাঁধের মাংসে মস্তবড় গর্ত হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে দুটো হাতই তার যে কোনো সময় ছিঁড়ে পড়ে যাবে।

অনবরত হাঁটবার পর ওরা বিরাট এক নদীর পাড়ে এসে পৌঁছুল।

নদীটার ওপার দেখা যায় না, অনেক দূরে আবছা ধু ধু একটা দাগের মতো মনে হয়।

এখন দুপুর। চৈত্রের ঝকঝকে রোদে নদীর ঢেউ জ্বলছিল। কালো কালো বিন্দুর মতো ক'টা নৌকো ছাড়াছাড়া ভাবে নদীময় ছড়িয়ে আছে।

ককানির মতো শব্দ করে কে বলে উঠল, 'এই আমরা আইলাম কই?'

একজন বলল, 'আর তো আউগানের জাগা নাই। এলায় (এবার) কী করণ?'

এইসময় রসময় চেঁচিয়ে উঠল, 'উই—উই দ্যাখ—'

সবাই দেখল, এখান থেকে প্রায় সিকি মাইল উজানে পঞ্চাশ ষাটটা নৌকো দাঁড়িয়ে আছে। অনেক লোক সেগুলোর পাটাতনে বসে রয়েছে। মনে হচ্ছে, ওরা এখনই নৌকো ছেড়ে দেবে।

ভুবন গোঁসাইর মা বলল, 'অরা কারা?'

'আমাগো দ্যাশের মানুষই মনে লাগে।'

'খানেরা না তো?'

'না।'

'ভাল কইরা দ্যাখ। আমার চোখে ছানি পড়ছে, খুয়া খুয়া (আবছা আবছা) দেখি। দূরের জিনিস ঠাওর পাই না।'

হাসেম বলল, 'না না, অরা খানের ছাও না। আমাগো নাহান চাষাবাসী গিরস্ত মানুষ। হেয়া ছাড়া—'

'কী?'

'খান হইলে নায়ে উঠত না। অরা পানিরে জবর ডরায়। পানি অগো যম।'

একটু ভেবে ভুবন গোঁসাইর মা বলল, 'অরা যায় কই?'

হাসেম বলল, 'না জিগাইলে জানুম ক্যামনে?'

'জিগা—জিগা—'

হাসেম কিছু বলবার আগেই দশ বার জন চিৎকার করে উঠল, 'ভাইজানেরা এট্টু খাড়াও গো—এট্টু খাড়াও—'

নৌকোর লোকগুলো এদিকে ফিরল। একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'ক্যান?'

'কামের কথা আছে।'

'আহো তাইলে। তরাতরি—'

কিছুক্ষণের মধ্যে হাসেমরা নৌকাগুলোর কাছে পৌঁছে গেল। সামনে আসতে দেখা গেল, নৌকোর লোকগুলোর চেহারা তাদেরই মতো—সন্ত্রস্ত, উদ্‌ভ্রান্ত।

লোকগুলো জিজ্ঞেস করল, 'তুমরা কুনখানকার মানুষ?'

হাসেমরা বলল, 'গিরিগুঞ্জ বন্দরের নাম শুনছ?'

সবাই শোনে নি। দু'চারজন শুনেছে। তারা বলল, 'হ হ, হেই ধলেশ্বরীর পাড়ে—দুই একবার গেছি।'

'আমরা হেই দিক থন আইতে আছি।'

'উই ধারে কিছু হইছে?'

'হায় হায় রে, হয় আবার নাই!'

'কী হইছে?' পঞ্চাশ ষাটটা নৌকোর সব লোক উদ্বিগ্ন মুখে হাসেমদের দিকে তাকাল।

কী হয়েছে, সব বলল হাসেমরা। তারপর কিভাবে শুধু প্রাণটুকু হাতে নিয়ে তারা এই নদীর পাড় পর্যন্ত পৌঁছেছে, সে কথা জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমরা কুনখানকার মানুষ?'

নৌকোর লোকগুলো জানাল, হাসেমরা যে পথ দিয়ে এসেছে তার পাশে যে পনেরটা গ্রাম এখনও অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে তারা সেই সব গ্রামের বাসিন্দা। তিন দিন আগে খানেরা এদিকে হানা দিয়েছিল, তাদের দেখেই ওরা জঙ্গলে পালিয়েছিল। তিনদিন জঙ্গলে কাটিয়ে এখন নৌকোয় করে চলে যাচ্ছে।

'কই যাইতে আছ?'

'নদীর উইপারে তো আগে যাই। হের পর দেখা যাইব।'

হাসেমরা নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ পরামর্শ করে ঠিক করল, ওপারেই চলে যাবে। বলল, 'আমাগো তোমাগো নায়ে নিবা (তোমাদের নৌকোয় আমাদের নেবে)?'

'নিয্যস নিমু (নিশ্চয়ই নেব)। সগল্ জাইনা শুইনা তোমাগো ফালাইয়া যাইতে পারি? আহো—'

প্রতিটি নৌকোয় দু-একজন করে হাসেমদের সকলের জায়গা হয়ে গেল। নৌকোয় উঠে ওরা দেখতে

পেল, লোকগুলো খালি হাতে-পায়ে তাদের মতো এক কাপড়ে যাচ্ছে না। বাক্স-বিছানা, হাঁড়ি-পাতিল, চাল-ডাল, বাসন-কোসন, বদনা-সানকি—পাড়ি দেবার আগে যে যা পেরেছে সব নৌকোয় তুলে নিয়েছে।

হাসেমরা ওঠার পর নৌকোগুলো ছেড়ে দিল।

পাড় থেকে খানিকটা যাবার পর হাসেম বলল, 'নদীখানের নাম কী?'

'পদ্মা।'

আরো খানিকক্ষণ যাবার পর তাদের নৌকোর একটা বুড়োমতো লোককে হাসেম বলল, 'একখান কথা কমু?'

বুড়ো বলল, 'কও না—'

ভয়ে ভয়ে হাসেম বলল, 'তিনদিন আমাগো প্যাটে ক্ষীরাই আর বাঙ্গি ছাড়া কিছুই পড়ে নাই। দুগা ভাত না পাইলে এইবার যে মরি।'

'আমাগো লগে চাউল আছে, নদী পার হইয়া ভাত বসামু, তহন আমাগো লগে খাইও। আমরা খামু আর তুমরা চাইয়া থাকবা, হে তো হয় না।'

বিশাল নদী পার হতে হতে বেশ রাত হয়ে গেল। ওপারে নৌকোগুলো যেখানে গিয়ে 'লগি' পুঁতল সেটা ছোটখাট একটা গঞ্জমতো জায়গা।

গঞ্জের দোকানগুলোতে টিমটিম করে হেরিকেন জ্বলছিল। হাসেমরা নৌকো থেকে উঠে এসে দোকানদারদের জিজ্ঞেস করল, এধারে কোন গোলমাল হয়েছে কিনা।

দোকানদাররা জানাল এখনও কিছু হয় নি। তবে খবর পাওয়া যাচ্ছে যে কোনো সময় খানেরা এসে পড়তে পারে।

নাঃ, এই দুনিয়ায় খানেদের বন্দুকের পাল্লার বাইরে একটুও জায়গা নেই। তা হলে তারা কোথায় যাবে? কোথায় গিয়ে প্রাণ রক্ষা করবে?

গঞ্জের দোকানদাররা জিজ্ঞেস করল, নদীর ওপার থেকে তারা চলে এল কেন? কেন আসতে হয়েছে, হাসেমরা জানাল।

দোকানদাররা এবার বলল, 'আমাগো এইদিকের মেলা মানুষ পলাইয়া গ্যাছে। দুই একদিনের ভিত্রে আমরাও যামু গা।'

'কই যাইবেন?'

'দেখি কই যাই—'

তারপর হাসেমরা আর নৌকোর সেই লোকগুলো নদীর পাড় ঘেঁষে মাটি খুঁড়ে কাঠকুটো দিয়ে উনুন ধবাল, ভাত বসাল।

এক ফাঁকে হাসেম গিয়ে ভুবন গোঁসাইর মার জন্য দোকানদারদের হাতে পায়ে ধরে চেয়ে চিন্তে খানিকটা খই নিয়ে এল।

খাওয়া দাওয়ার পর সবাই পরামর্শ করে ঠিক করল এখানে তারা থাকবে না, কাল সকালে উঠেই রওনা হবে। একটা নিরাপদ আশ্রয় তাদের চাই-ই।

পদ্মার পাড়ে রাত কাটিয়ে ওরা আবার বেরিয়ে পড়ল। নৌকোর সেই লোকগুলো তাদের বাক্স-টাক্স হাঁড়ি পাতিল মাথায় চাপিয়ে হাসেমদের সঙ্গে হাঁটতে লাগল।

হাসেমরা সংখ্যায় ছিল চল্লিশ পঞ্চাশ জন। তাদের সঙ্গে আরো ছ'সাত্‌শ লোক যোগ হয়েছে।

দুপুরবেলা একটা ফাঁকা মাঠের মাঝখানে ভাত রেঁধে খেয়ে একটু জিরিয়ে আবার ওরা চলতে লাগল। তারপর বিকেলে সূর্য যখন পশ্চিমের গাছগাছালির ওপর ঝুঁকে পড়েছে সেইসময় হঠাৎ ভুবন গোঁসাইর মাকে জড়িয়ে ধরে গোঙানির মতো শব্দ করে টলতে টলতে বসে পড়ল কুলসম। অসহ্য যন্ত্রণায় তার মুখ নীলবর্ণ হয়ে গেছে, ঠোঁট দুটো থরথর করছে।

কুলসমের গোঙানির আওয়াজ যারা শুনেছে তারা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাদের দেখাদেখি অন্যরাও দাঁড়িয়ে পড়েছে।

হাসেম কাঁধ থেকে চালি নামিয়ে বলল, 'কী হইছে ঠাকুরমা?'

অভিজ্ঞ চোখে একপলক কুলসমকে দেখে খুব ব্যস্তভাবে বুড়ি পাশের দুটো বউকে বলল, 'মাইয়গারে

ধর তো—'

ভুবন গোঁসাইর মা আর সেই বউ দুটো কুলসমকে ধরাধরি করে কাছের শরবনে নিয়ে গেল। হাসেম এবং আরো দু'চারজন ওদের সঙ্গে যাচ্ছিল। ভুবন গোঁসাইর মা ধমকে উঠল, 'আক্কল নাই রে তগো। পুরুষ মাইন্‌ষের এই সোমায় (সময়) যে আইতে নাই।'

বুকভর্তি উৎকণ্ঠা নিয়ে সবাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকল। কিছুক্ষণ পর শরবনের ভেতর থেকে আকাশ-ফাটানো ট্যা-ট্যা শব্দে নতুন জন্মের ঘোষণা শোনা গেল। কুলসমের বাচ্চা হয়েছে। আরো খানিকটা পর সূর্য ডুবে গিয়ে অন্ধকার যখন ঘন হয়েছে সেই সময় শরবন থেকে ওরা বেরিয়ে এল। বউ দুটো নির্জীব কুলসমকে কোলে করে নিয়ে এসেছে, আর বাচ্চাটা রয়েছে ভুবন গোঁসাইর মায়ের বুকের ভেতর। বুড়ি বলল, 'অহন কী করণ? এই অবস্থার তো কুলসমরে হাটাইয়া লওন যাইব না।'

রসময় বলল, 'পাগল! অরে চালিতে ফুলবানুর কাছে শোয়াইয়া দ্যান।'

হাসেমও বলল, 'হেই ভাল।'

ধরাধরি করে বউ দুটো কুলসমকে চালিতে তুলে দিল।

আবার সাত আটশ মানুষের জনতা চলতে লাগল। যেতে যেতে কুলসমের দিকে তাকিয়ে বার বার মৃধাপাড়ার জহিরের মুখটা মনে পড়ে যাচ্ছিল হাসেমের। কোথায় কতদূরে কোন নহরপুরে মরে পড়ে থাকল সে, আর কোথায় শরবনে তার সন্তান জন্ম নিল!

ওদিকে ভুবন গোঁসাইর মায়ের বুকের ভেতর একটানা কেঁদেই চলেছে বাচ্চাটা। সে যে এসেছে এই খবরটা দুনিয়ার সবাইকে না জানানো পর্যন্ত বোধহয় থামবে না।

আট

আরো তিন চারটে দিন কাটল।

জ্বালিয়ে-দেওয়া গ্রাম, হাজার হাজার মরা মানুষ, শিয়াল, শকুন এবং পচা মৃতদেহের দুর্গন্ধের ভেতর দিয়ে হাসেমরা চলছে তো চলছেই।

ওরা কোথায় কোন দিকে যাচ্ছে, জানে না। শুধু একটা ব্যাপার ওদের জানা আছে, সামনেই তাদের এগুতে হবে, ফেরা আর চলবে না।

এই ক'দিনে কুলসম খানিকটা সুস্থ হয়েছে। মাঝে মাঝে চালি থেকে নেমে পড়ে সে, তবে বেশিক্ষণ হাঁটতে পারে না। বিশ পঞ্চাশ কাইক গিয়েই আবার চালিতে ওঠে। তার বাচ্চাটা সারা দিনরাত ভুবন গোঁসাইর মায়ের কোলেই থাকে, শুধু খাওয়াবার সময় বুড়ি তাকে কুলসমের কাছে দেয়। বাচ্চাটা ভীষণ কাঁদুনে হয়েছে। যতক্ষণ ঘুমোয় ততক্ষণই সে শান্ত, নইলে বাকি সময়টা কেঁদে কেঁদে সবাইকে, বিশেষ করে ভুবন গোঁসাইর মাকে ঝালাপালা করে দিচ্ছে। বুড়ি তাকে ভোলাতে ভোলাতে বলে, 'কী কান্দইনা (কাঁদুনে) পোলা রে তুই!'

ফুলবানুর জ্ঞান ফেরেনি, তবে এখনও সে বেঁচে আছে।

সবচেয়ে বিপদ হয়েছে তমিজদ্দিকে নিয়ে। শিয়ালের কামড় খেয়ে তার পা দুনিয়ে ফুলে উঠেছিল, সেই ফোলাটা এখন দু-তিন গুণ বেড়ে গেছে। ঘা থেকে সবুজ রস গড়াচ্ছে। তার ওপর জ্বর। জ্বরের তাড়সে তমিজদ্দি চোখ মেলতে পারছিল না। এই অবস্থায় তার পক্ষে হাঁটাও সম্ভব নয়। মীরপুর-নবীগঞ্জের ক'টা লোক তাকে কাঁধে নিয়ে চলেছে।

পদ্মার পাড় থেকে হাসেমরা কখনও কাঁচা রাস্তা, কখনও বা চকের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আজ একটা পিচ-ঢালা বড় সড়কে এসে উঠল।

সড়কটা ধরে এক দুপুর হাঁটবার পর ওরা একটা বাঁকের মুখে এসে পড়ল। আর সেই সময় দূরে ট্রাকের গাঁক গাঁক আওয়াজ শোনা গেল।

সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কে যেন ভয়ার্ত সুরে বলল, 'খানেরা আইতে আছে নিহি?'

রসময় চেঁচিয়ে বলল, 'যারাই হউক, সড়কে আর খাড়াইয়া থাইকো না, উই ঝোপরার (ঝোপের) ভিত্‌রে লও (চল)।'

রাস্তার ধারেই নলখাগড়ার বন। হাসেমরা লাফ দিয়ে তার ভেতরে ঢুকে গেল। গায়ের ওপর নানারকম পোকামাকড় উড়ে উড়ে বসছে, কামড়াচ্ছে। পায়ের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা শরীর টেনে টেনে সাপ চলে যাচ্ছে। তবু কারো নিঃশ্বাসের শব্দ নেই। দম বন্ধ করে হাসেমরা অসাড় দাঁড়িয়ে আছে।

সবাই চুপচাপ। কিন্তু কুলসমের বাচ্চাটা পোকামাকড়ের কামড় খেয়ে এইসময় এমন কান্না জুড়ে দিল যে আর থামে না। ভুবন গোঁসাইর মা অনেক করেও যখন তাকে শান্ত করতে পারল না সেই সময় কুলসম বলল, 'আমার কুলে (কোলে) দ্যান দেখি ঠাকুরমা—'

কোলে নিয়ে বাচ্চাটাকে খাওয়াতে গেল কুলসম, কিন্তু সে কিছুতেই খাবে না। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সে শুধু চেঁচাতেই থাকে।

এদিকে ট্রাকের আওয়াজ দ্রুত এগিয়ে আসছে। চারদিক থেকে ফিস ফিস করে সন্ত্রস্ত গলায় বলতে লাগল, 'পোলা থামাও, পোলা থামাও। যদি ওইগুলা খানেগো গাড়ি হয় কান্দনের শব্দে এইখানে থামব। হের পর কী যে হইব ভাবতে পারতাছি না। পোলা সামাল দাও—'

নলখাগড়ার ঝোপ ফাঁক করে হাসেম সড়কের দিকে তাকিয়ে ছিল। ট্রাকগুলো খানিকটা দূরে থামতেই সে চিনে ফেলল—মিলিটারি গাড়ি। চাপা গলায় হাসেম বলল, 'খানেরাই আইছে। পোলা থামাও জহিরের জরু।'

'পোড়া কপাইলা পোলা—' বলেই বাচ্চাটার মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরল কুলসম।

একটু পরেই মিলিটারি ট্রাকগুলো নলখাগড়া বনের পাশ দিয়ে গাঁ গাঁ করে বেরিয়ে গেল। কোন দিকে গেল, কে জানে।

গাড়িগুলো চলে যাবার পরও অনেকটা সময় হাসেমরা নলখাগড়া ঝোপের ভেতরই বসে থাকল। তারপর বেশ রাত হলে আবার সড়কে উঠে এল। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরামর্শ করে ওরা ঠিক করল, সড়ক দিয়ে হাঁটা ঠিক হবে না, খানের বাচ্চারা গাড়িতে ঘোরাফেরা করে, যে কোনো সময় তাদের মুখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

হাসেমরা ফের সড়ক থেকে নেমে নলখাগড়া ঝোপের পাশ দিয়ে চকে গিয়ে পড়ল। তারপর আবার নতুন করে পাড়ি।

কুলসমের বাচ্চাটা অনেকক্ষণ কাঁদছে না। কোনোরকম নড়াচড়া বা সাড়াশব্দ—কিছুই করছে না। মায়ের কোলে চুপচাপ শুয়ে আছে।

ভুবন গোঁসাইর মা বলল, 'তর পোলাটা বড় লক্ষ্মী হইয়া গ্যাছে কুলসম। ওইটুক ছাওটাও বুঝছে খানেরা আইলে চুপ কইরা থাকতে হয়।'

কুলসম উত্তর দিল না।

ভুবন গোঁসাইর মা আবার বলল, 'দে, তর পোলাটারে আমার কুলে দে—'

কুলসম ছেলে দিল না, কিছু বললও না।

জন্মের পর থেকেই বাচ্চাটা ভুবন গোঁসাইর মায়ের কোলে কোলে আছে। ছেলে বায়না ধরলে চাইবার আগেই কুলসম কতবার বুড়ির কোলে গুঁজে দিয়েছে। কিন্তু এখন সাতবার চেয়েও বাচ্চা পাওয়া যাচ্ছে না। বুড়ি তাড়া দিল, 'কী হইল তর? দে—' বলেই হাত বাড়াতে গিয়ে বাচ্চাটার গায়ে হাত ঠেকে গেল। তক্ষুনি চমকে উঠল ভুবন গোঁসাইর মা। বাচ্চাটার শরীর একেবারে ঠাণ্ডা। নিজের অজান্তেই বুড়ির হাত তার নাকের কাছে চলে গেল। নাঃ, নিশ্বাস পড়ছে না। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল বুড়ি, 'এই কী সর্বনাশ করছস নিঃবংশী, পিছাকপালী!'

কুলসম শূন্য চোখে এক পলক তাকিয়ে থেকে বলল, 'কী করুম, খানেগো ডরে অর কান্দন থামানোর লাইগা মুখে হাত চাপা দিছিলাম, হের পর দেখি আর লড়েও না, উয়াসও (শ্বাসও) লয় না। বুঝলাম মইরা গ্যাছে।'

'অয় রে মায়ের পরাণ! তুই মা, না রাইক্ষসী!' বলেই ঠাস করে কুলসমের গালে এক চড় মেরে হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল ভুবন গোঁসাইর মা। তার হাতেই বাচ্চাটা জন্মেছে। এ ক'দিন নাড়াচাড়া করে শিশুটার ওপর খুব মায়া পড়ে গিয়েছিল।

কুলসম আগের মতোই ফাঁকা চোখে তাকিয়ে ছিল। খুব আস্তে করে বলল,'পোলারে না মারলে

এতগুলান মানুষ যে বাচত না ঠাকুরমা—' সে কাঁদছিল না। ভেতরকার কী এক উত্তাপে তার চোখের সব জল শুকিয়ে গেছে।

কুলসমের কথা শেষ হতে না হতেই এক হ্যাঁচকা টানে ভুবন গোঁসাইর মায়ের কান্নাটা থমকে গেল। সাত আট শলোকের জনতার ওপর অদ্ভুত এক স্তব্ধতা নেমে এসেছে। ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো চকের ওপর দিয়ে ওরা এগিয়ে চলল।

কুলসম বাচ্চাটাকে কারো হাতেই দিল না। যে সন্তানকে সে নিজের হাতে শেষ করেছে তার শক্ত অসাড় শরীর কোলে করে সবার সঙ্গে হাঁটতে লাগল।

নয়

আরো দুদিন পর ওরা একটা জীবন্ত মানুষের গ্রামে পৌঁছুল।

চক থেকে হাসেমরা সব গ্রামে উঠেছে, চারদিকের ঝোপ জঙ্গল থেকে অনেকগুলো অল্পবয়সী ছেলে, হাতে বন্দুক, উঠে এল।

আগেও অন্যগ্রামে ছেলেদের এইরকম বন্দুক হাতে পাহারা দিতে দেখেছে হাসেমরা। এরা মুক্তিফৌজ।

মুক্তিফৌজের ছেলেরা জানতে চাইল, তারা কোত্থেকে আসছে, কোথায় যাবে। হাসেমরা সব জানাল। গন্তব্য কোথায় তা অবশ্য বলতে পারল না। তাদের গ্রামগুলোর কী অবস্থা হয়েছে, কিভাবে মৃত্যু আগুন হত্যা ধ্বংসে শিয়াল শকুনের ভেতর দিয়ে তারা দিনের পর দিন পাড়ি দিয়ে এখানে পৌঁছেছে, সে সবের ভয়াবহ বর্ণনা দিয়ে হাসেমরা বলল, 'এমন এক জাগায় আমরা যাইতে চাই যেখানে গ্যালে পরাণে বাচতে পারুম।'

মুক্তিফৌজের ছেলেরা বলল, এ জায়গাটা আদৌ নিরাপদ নয়, খানেরা একবার এসে সুবিধে করতে পারে নি। নিশ্চয়ই তারা আবার হানা দেবে। সে যাক গে, দিনের পর দিন হাসেমরা হেঁটে আসছে। আপাতত আজকের দিনটা এখানে বিশ্রাম করুক। বিশ্রামই শুধু, এত লোককে তারা খাওয়াতে পারবে না। কেননা এখানে কারো ঘরেই বিশেষ চাল ডাল নেই। চারদিকের গ্রাম-গঞ্জে যত ধান চাল ছিল, খানেরা আগুন লাগিয়ে সব পুড়িয়ে দিয়েছে। তার ফলে এ অঞ্চলে মোটামুটি একটা দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থা চলছে। কোথাও একদানা খাদ্যশস্য পাওয়া যাচ্ছে না।

সেই লোকগুলো, যাদের নৌকোয় পদ্মা পেরিয়েছিল হাসেমরা, বলল, 'আমাগো লগে চাউল আছে। থাকতে দিলেই চলব, খাওনেরটা আমরা ব্যবস্থা কইরা নিমু।'

'তাইলে আর কি—'

মুক্তিফৌজের ছেলেদের সঙ্গে গ্রামের ভেতর গিয়ে প্রথমে ওরা স্নান করে নিল। তারপর রান্না খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে হাসেম বলল, 'একখান কথা কমু?'

মুক্তিফৌজের ছেলেরা বলল, 'কী?'

'আপনেগো এইখানে ডাক্তর আছে?'

'ক্যান?'

ফুলবানু আর তমিজদ্দিকে দেখিয়ে ওদের সব কথা জানিয়ে হাসেম বলল, 'অগো লেইগা—'

মুক্তিফৌজের ছেলেরা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এই দুই জনরে নিয়া লও আমাগো লগে। বেশি লোক আইবা না, অগো নিতে যে কয়জন লাগে খালি হেই কয়জন।'

ফুলবানু আর তমিজদ্দিকে নিয়ে হাসেমরা চার পাঁচ জন মুক্তিফৌজের ছেলেদের সঙ্গে গ্রাম ছাড়িয়ে অনেক দূরে একটা ঝুপসি জঙ্গলের ভেতর ঢুকল। কী আশ্চর্য, জঙ্গলের ভেতর সারি সারি দশ-বারটা তাঁবুর ভেতর ছোটখাট একটা হাসপাতাল। হাসেম পড়তে পারে না, পারলে দেখতে পেত একটা তাঁবুর গায়ে সাদা কাগজ আঁটা রয়েছে, তাতে লেখা 'আমেদপুর মুক্তিবাহিনী হাসপাতাল'।

অসংখ্য রুগী চারদিকে গাদা দিয়ে পড়ে ছিল। কারো হাত নেই, কারো পা নেই, কারো মুখ পুড়ে গেছে। তবে বেশির ভাগই গুলিতে জখম হয়েছে। দেখেই বোঝা গেল, খানেদের কীর্তি।

ক'জন ডাক্তার আর নার্স ব্যস্তভাবে ছোটাছুটি করছিল। হাসেমদের দেখে একজন ডাক্তার এগিয়ে এল। বলল, 'কী হইছে?'

ফুলবানু আর তমিজদ্দিকে দেখিয়ে হাসেম বলল, 'এয়াগো দ্যাখেন—'

দু'জনকে পরীক্ষা করে তক্ষুনি ইঞ্জেকশন দিল ডাক্তার। বলল, 'চাইর ঘন্টা বসতে হইব, আবার ইঞ্জেকশন দিমু।'

হাসেম কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'মাইয়াটা বাচব তো ডাক্তার সাব?'

'হ হ, বাচব। তয় খুব সাবধানে রাখতে লাগব।'

চার ঘন্টা পর ফুলবানু আর তমিজদ্দিকে আরেকটা করে ইঞ্জেকশন দিল ডাক্তার। একটা কাগজে খস খস করে কী লিখে মুখে বলল, 'কাইল আরো দুইটা ইঞ্জেকশন দিতে হইব, এই লেইখা দিলাম। তার আগেই মাইয়াটার জ্ঞান ফিরা আসব বইলা মনে হয়।'

কাল তারা কোথায় থাকবে, কোথায় ডাক্তার পাওয়া যাবে, কোথায় ওষুধ—কিছুই জানে না হাসেম। ঘোরের মধ্যে মাথা নাড়ল সে।

ফুলবানু আর তমিজদ্দিকে নিয়ে হাসেমরা যখন মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের সঙ্গে গ্রামে ফিরে এল, মাঝরাত পার হয়ে গেছে।

বাকি রাতটুকু কাটিয়ে সকাল হতেই আবার বেরিয়ে পড়ল ওরা। দুপুর পর্যন্ত হেঁটে পাঁচ সাতটা গ্রাম পেরিয়ে গেল। যে গ্রামের পাশ দিয়েই তারা যাচ্ছে সেখানেই দেখা যাচ্ছে, মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা হয় পাহারা দিচ্ছে কিংবা প্যারেড করছে। এদিকটায় মুক্তিফৌজের খুব দাপট।

পাঁচ সাতখানা গ্রাম পেরুবার পর হঠাৎ হাসেমদের চোখে পড়ল খানিক দূরে একটা উঁচু রাস্তার ওপর দিয়ে হাজার হাজার মানুষের স্রোত চলেছে। তাদের মাথায় ধামা-কুলো, বাক্স-প্যাঁটরা, হাঁড়ি-কুড়ি এবং সংসারের তাবত জিনিস। হাসেমেরা যেভাবে ফুলবানুকে নিয়ে চলেছে সেইভাবে ডুলির মতো বানিয়ে অনেকে অথর্ব বুড়ো এবং বাচ্চাদের নিয়ে যাচ্ছে।

হাসেমেরা চেঁচিয়ে বলল, 'তুমরা যাও কই?'

উঁচু রাস্তা থেকে উত্তর এল, 'ইণ্ডিয়ায়।'

ইণ্ডিয়ার নাম অনেক বার শুনেছে হাসেম। সে বলল, 'হেইখানে যাও ক্যান?'

'পরাণে বাচনের আশায়।'

'তুমরা আইতে আছ কুনখান থনে?'

কেউ বলল, 'ঢাকা জিলা—' কেউ বলল, 'ময়মনসিং জিলা—' কেউ বলল, 'কুমিল্লা—'

'তুমাগো উইদিকে কিছু হইছে?'

'হয় আবার নাই, খানেরা হগল শ্যাষ কইরা দিছে। তুমরা কুন দিকের মানুষ?'

হাসেমরা জানাল, তারা কোত্থেকে আসছে। তারপর বলল, 'ইণ্ডিয়ায় গ্যালে বাচন যাইব?'

উঁচু সড়কের লোকেরা বলল, 'হেই রকমই তো শুনছি।'

একটু ভেবে হাসেম বলল, 'ইণ্ডিয়া এইখান থন কদ্দূর?'

'বেশি দূর না। আমরা বডারের কাছে আইসা গেছি।'

'খাড়াও, আমরাও তুমাগো লগে যামু।'

'আহো—'

হাসেমরা উঁচু সড়কের জনস্রোতে মিশে গেল।

দশ

সন্ধের একটু আগে ইণ্ডিয়ার বর্ডারে পৌঁছে গেল হাসেমরা। আর সেই সময় চালির ভেতর চোখ মেলে তাকাল ফুলবানু। আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার গলার ভেতর থেকে দুর্বল, কাতর শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল। তার চোখ দেখে মনে হল, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। কোথায় আছে, কিভাবে আছে, কিছুই বুঝতে পারছে না।

হাসেম চমকে উঠল। তার বুকে ঢেঁকির পাড় পড়ছে। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'ঠাকুরমা—ঠাকুরমা—ফুলবানু চোখ মেলেছে। অর হোঁশ ফিরছে—'

রসময় ডুলির ওধারের বাঁশ বইছিল, তাকে বলল, 'লামাও—লামাও, চালিখান লামাও—'

দু'জনে চালি নামিয়ে ফেলল। হাসেম দ্রুত হাঁটু মুড়ে ফুলবানুর মুখের ওপর ঝুঁকল। ভুবন গোঁসাইর মাও হাসেমের পাশে বসে আশায় উদ্বেগে ফুলবানুকে দেখছে।

হাসেম ডাকতে লাগল, 'ফুলবানু—ফুলবানু—'

ফুলবানু শুনতে পেল কিনা কে জানে। ঝাপসা নির্জীব দৃষ্টিতে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার চোখ বুজল। কাতর গোঙানির মতো সেই শব্দটা তার গলা থেকে বেরিয়ে আসতেই লাগল।

হাসেম আবার ডাকতে যাচ্ছিল, হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে ভুবন গোঁসাইর মা বলল, 'অহন ডাকাডাকি করিস না। চোখ যখন মেলছে আর ডর নাই।'

সেই কবে নহরপুর থেকে তারা বেরিয়েছিল, কখন মাইনকার চর থেকে ফুলবানুর অসাড় প্রাণহীন দেহ তুলে এনেছিল, হাসেমের মনে নেই। তারপর কত কাল ধরে—দুদিন, চারদিন, এক সপ্তাহ, নাকি দু মাস, চার মাস, তারা মাঠের ওপর দিয়ে, শ্মশানের মতো গ্রাম-গ্রামান্তরের ওপর দিয়ে, মৃত্যু হত্যা আর রক্তের ওপর দিয়ে হাঁটছে কিছুই মনে পড়ে না।

এতদিন পর চোখ মেলেছে ফুলবানু, তার জ্ঞান ফিরেছে।

ফুলবানু বাঁচবে—বাঁচবে—বাঁচবে। কথাটা যতবার ভাবল, প্রাণের ভেতর ঢেউ খেলে যেতে লাগল হাসেমের। অনেক, অনেক দিন পর বুক ভরে বাতাস টানতে লাগল সে।

রণসজ্জা

সাড়ে চারশ কিলোমিটার দূরের সেই শহরটা থেকে, যার নাম আসানগঞ্জ, কাল বিকেলে সবিতা যখন ট্রেনে ওঠে, তার মধ্যে একটিমাত্র উদ্দীপনাই কাজ করছিল—কলকাতায় এসে সাউথ-এন্ড পার্কের 'হ্যাপি ভিলা' নামের বাড়িটা প্রথমে খুঁজে বার করতে হবে। উদ্দীপনা যতটা, উত্তেজনা হয়তো তার চেয়ে ঢের বেশিই ছিল। সে যত কলকাতার দিকে এগিয়েছে, টের পেয়েছে, স্নায়ুমন্ডলীতে ক্রমশ চাপ বাড়ছে। 'হ্যাপি ভিলা'য় তার অভ্যর্থনা কেমন হবে—কতটা আন্তরিক বা স্বতঃস্ফূর্ত, সে জানে না। যদিও তার চিঠির উত্তরে মাত্র তিনটি লাইনে মোট ছাব্বিশটি শব্দ খরচ করে তাকে এখানে আসতে বলেছেন হিরণ্ময় লাহিড়ি। উত্তরটা তিনি নিজের হাতে লেখেননি, বাংলায় টাইপ করিয়ে নিজের নামটা নিচে সই করে দিয়েছেন। এ ধরনের নির্লিপ্ত, বাহুল্যহীন, টাইপ-করা চিঠি অফিসের কাজেই ব্যবহার করা হয়। এমনটা আশা করেনি সবিতা। মনে মনে সে বেশ ধাক্কা খেয়েছিল। কিন্তু পৃথিবীর শেষ দেওয়ালে তার পিঠ ঠেকে গেছে। হিরণ্ময় লাহিড়িকে সে আদ্যোপান্ত ঘৃণা করে। এই লোকটার প্রতি আক্রোশ আর ক্রোধের বিষে তার শরীরের যাবতীয় রক্তবিন্দু নীল হয়ে আছে। তবু তার কাছে না এসে উপায় কী?

ট্রেন সবিতাকে পৌঁছে দিয়েছিল সকালে। কলকাতায় সে খুব বেশি আসেনি, বড়জোর আট দশ বার। এখানে তাকে আগন্তুকই বলা যায়। আগে যে এসেছে, প্রতিবারই সঙ্গে মা থাকত। কিন্তু এবার সে একেবারে একা, নিঃসঙ্গ। সবিতা বুঝতে পারছিল, এখন থেকে রুক্ষ, কর্কশ পৃথিবীর মুখোমুখি তাকে এককভাবেই দাঁড়াতে হবে।

ট্রেন থামতেই কামরাগুলো থেকে হুড় হুড় করে মানুষের ঢল নেমেছিল প্ল্যাটফর্মে। নিজের উদ্যোগে কিছু করতে হয়নি সবিতাকে। জনস্রোতই তাকে ঠেলে ঠেলে স্টেশনের বাইরে নিয়ে এসেছে। এই সকালবেলাতেই চারদিকে থিকথকে ভিড়, হইচই, ট্রাম বাস ট্যাক্সি মিনিবাস আর প্রাইভেট কারের অন্তহীন প্রবাহ।

সাত বছর আগে শেষ এখানে এসেছিল সবিতা। তারপর এই। তখনও প্রচুর লোকজন চোখে পড়েছে, কিন্তু এখন তার বহুগুণ। জনবিস্ফোরণ বোধহয় একেই বলে।

হাতে চামড়ার মাঝারি একটা সুটকেস। হতচকিত এবং বিহ্বল সবিতা চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছে। যেদিকেই তাকানো যাক, কেউ থেমে নেই, শুধুই অপার ব্যস্ততা আর ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়।

ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে যে বিপুল জনসমষ্টি, এদের কাউকেই চেনে না সবিতা। এই সুবিশাল মেট্রোপলিসের প্রায় সমস্ত কিছুই তার অজানা। অল্প বয়সে, যখন সে খুবই ছোট, হিরণ্ময়কে সামনা সামনি দেখেছে কিনা, মনে নেই। তবে বড় হবার পর খবরের কাগজে মাঝে মাঝে তাঁর ছবি চোখে পড়েছে। এই লোকটির সঙ্গে তার আদৌ কোনো সম্পর্ক অবশিষ্ট আছে বা নেই, সেটা 'হ্যাপি ভিলা'য় না পৌঁছুনো পর্যন্ত সে নিশ্চিত নয়। এমনও হতে পারে, তার চিঠি পড়ে হিরণ্ময়ের করুণা হয়ে থাকবে। হয়তো নেহাত অনুকম্পা করেই তিনি তাকে আসতে লিখেছেন।

সবিতা সবে একুশে পা দিয়েছে। ছিপছিপে ধারাল চেহারা হলেও তার সর্বাঙ্গে ঝকঝকে শহুরে পালিশটা কম। শাড়ি পরার ধরন, ঘন লম্বা চুল এক বেণী করে পিঠের ওপর ফেলে রাখা বা চলাফেরা, তাকানো—এ সবের মধ্যে কেমন একটা মফস্বলি গন্ধ। তবু অনেকক্ষণ লক্ষ করলে টের পাওয়া যায়, ওর ভেতর কোথাও একটা অনমনীয়তা লুকনো রয়েছে। সেটা আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্ট নয়, কোনো অদৃশ্য খাপে পোরা আছে। মুহূর্তে ইস্পাতের ফলার মতো ঝলকে উঠতে পারে।

সবিতা যথেষ্ট সাহসী মেয়ে। কিন্তু এই শহরের অনভ্যস্ত বিশালতা, অবিরাম জনস্রোত তার মধ্যে শিহরণ ধরিয়ে দিয়েছিল। কলকাতা যেন প্রকাণ্ড হাঁ করে তাকে গিলে খাবে।

প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে বেশি সময় লাগেনি। তার ওপর কোনো একগুঁয়ে আবিষ্কারকের আত্মা যেন ভর করল। রাস্তার লোকেদের জিজ্ঞেস করে একটা বাসে উঠে পড়ে সে। ভয় পেয়ে যে আসানগঞ্জে ফিরে যাবে, সে রাস্তা বন্ধ। এখন তার সামনে একটাই গন্তব্য—সাউথ-এণ্ড পার্কের 'হ্যাপি ভিলা'। নিয়তিতাড়িত মানুষের মতো তাকে সেখানে পৌঁছুতেই হবে।

টিকিট কাটার সময় সবিতা কম বয়সী কন্ডাক্টরটিকে বলে রেখেছিল, সাউথ-এণ্ড পার্ক এলে সে যেন জানিয়ে দেয়। ছোকরার দায়িত্ববোধ আছে। নানা রাস্তায় বাহান্ন পাক ঘুরে ঘন্টাখানেক বাদে নির্দিষ্ট স্টপেজে সে সবিতাকে নামিয়ে দেয়।

এর মধ্যেই চারপাশের অনেক দোকানপাট খুলে গেছে। একটা বড় ওষুধের দোকানে গিয়ে সবিতা জেনে নেয় কিভাবে সাউথ-এণ্ড পার্কের 'হ্যাপি ভিলা'য় যেতে হবে।

বাস রাস্তা পেরিয়ে ওধারে গিয়ে যে আড়াআড়ি রাস্তাটা পাওয়া গেল, সেটা ধরে মিনিট তিনেক হাঁটার পর বাঁ ধারে ঘুরতেই সবিতার চোখে পড়ল, কালো পাথরের চতুষ্কোণ ফলকে বড় বড় সোনালি হরফে লেখা আছে ঃ সাউথ-এন্ড পার্ক।

জায়গাটা যেন বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপ। বাস রাস্তা এত কাছে, তবু পোড়া গ্যাসোলিনের বিষবাষ্প এখানে ভেসে আসে না, হইচই নেই, দুর্গন্ধওলা আবর্জনার পাহাড় চোখে পড়ে না। সব কিছুই দূষণমুক্ত, পরিচ্ছন্ন, ঝলমলে।

সাত বছর পর সবিতা কলকাতায় এল। সে শুনেছে এর মধ্যে মানুষের চাপে শহরটা প্রায় নুয়ে পড়েছে। বাসে আসতে আসতে প্রচণ্ড ভিড় সে নিজের চোখেই দেখেছে। কিন্তু জনবিস্ফোরণের কোনো ছাপই এখানে নেই। শান্ত, নিরিবিলি সাউথ-এণ্ড পার্ক যেন অসংলগ্নভাবে কলকাতার গায়ে জুড়ে আছে।

চওড়া রাস্তার দুপাশে লাইন দিয়ে সোডিয়াম লাইটের পোস্ট আর উঁচু উঁচু সব গাছ, যেগুলোর ডালপালা ঘন সবুজ পাতায় ঢাকা। এমনিতে কলকাতা ছিরিছাঁদহীন, সৃষ্টিছাড়া শহর। এখানে কোথাও হাই-রাইজের মাথা আকাশে গিয়ে ঠেকেছে, আর তার একপাশে হয়তো দগদগে ঘায়ের মতো দেড় কিলোমিটার জুড়ে বস্তি কিংবা মোষের খাটাল। এ এমন এক শহর যেখানে সকলের অপার স্বাধীনতা; যার যা খুশি করে পার পেয়ে যায়। কিন্তু পিকচার পোস্টকার্ডে যেমন দেখা যায়, সাউথ-এণ্ড পার্কে অবিকল তেমনই বিরাট বিরাট কমপাউণ্ডের ভেতর সাজানো গোছানো সব বাড়ি। প্রতিটি বাড়ির সামনে ফিটফাট উর্দি- পরা নেপালি বা গাড়োয়ালি দারোয়ান। সোসাইটির কোন স্তরের মানুষের এখানে বসবাস, এক নজরেই তা ধরা পড়ে।

ওষুধের দোকানের লোকটা জলের মতো বুঝিয়ে দিয়েছিল। 'হ্যাপি ভিলা' খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। বাড়িটার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সবিতা। গেটের একটা পাল্লা খোলা, তার ওধারে দারোয়ানকে দেখা যাচ্ছে। সাড়ে ছ ফুটেরও বেশি হাইট, চওড়া পাটার মতো মজবুত বুক, মাথায় জবরদস্ত পাগড়ি, জমকালো গালপাট্টা, চাউনিটা শীতল এবং হিংস্র। এমন একটা ভীতিকর প্রাণীকে গেটে বসিয়ে রাখার অর্থ হল, বাড়ির ভেতর ঢোকাটা বাইরের কারো পক্ষে সহজসাধ্য নয়।

বাংলা ক্যালেণ্ডারের হিসেবে ভাদ্র পেরিয়ে এখন আশ্বিনের শুরু। সারা বর্ষার জলে ধুয়ে ধুয়ে আকাশ আশ্চর্য রকমের নীল। দূর দিগন্তে স্ফটিকের পাহাড়ের মতো সাদা মেঘ স্থির হয়ে আছে। ফুটপাথের ল্যাম্পপোস্টগুলোর ওপর জোড়ায় জোড়ায় শালিক আর দুর্গা টুনটুনি নাচানাচি করছে। এই সব পাখি তার আজন্মের চেনা। কেননা, দুর্গা টুনটুনি আর শালিকে শালিকে আসানগঞ্জ সারাক্ষণ ছয়লাপ হয়ে থাকে। এদের মতোই তার চেনা শরতের মায়াময় নীলাকাশ এবং শুভ্র মেঘপুঞ্জ।

হঠাৎ বিচিত্র এক অনুভূতি হল সবিতার। এই প্রায় অজানা শহরে সমস্ত কিছুই তার অপরিচিত নয়। প্রকৃতির একটা চেনা অংশ তার জন্য যেন এখানে হাজির রয়েছে।

দারোয়ান সবিতাকে লক্ষ করছিল। দু পা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কাউকে খুঁজছেন দিদিজি?'

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সবিতা। চমকে দারোয়ানের দিকে তাকাল। লোকটা বাংলা বলছে ঠিকই, তবে তাতে পশ্চিমা টান। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক তার গলার স্বর—মোলায়েম এবং সহৃদয়, যা কিনা তার চেহারার সঙ্গে আদপেই খাপ খায় না।

সবিতা খানিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বলে, 'হ্যাঁ। আমি হিরণ্ময় লাহিড়ির সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

দারোয়ানের চোখে ঔৎসুক্য ফুটে বেরোয়। সে বলে, 'আপনি কি সবিতা দিদিজি?'

'হ্যাঁ।'

'আইয়ে—আইয়ে—'

সবিতা বুঝতে পারে, তার কথা দারোয়ানকে আগেই জানিয়ে রাখা হয়েছে। সে গেটের দিকে পা বাড়ায়। কাছাকাছি যেতেই দারোয়ান তার হাত থেকে সুটকেসটা টেনে নেয়, আপত্তি করলেও শোনে না।

এখন পর্যন্ত যেটুকু দেখা গেল, হতাশ হবার কারণ নেই। সবিতার আসাটাকে একেবারে হেলাফেলা করেননি হিরণ্ময়, মোটামুটি গুরুত্বই দিয়েছেন। পরবর্তী পর্যায়ে যখন তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে তখন বোঝা যাবে এ বাড়িতে তার জন্য কী অপেক্ষা করছে। আপাতত তা নিয়ে অবশ্য তেমন ভাবছে না সে। একটা মরিয়া মনোভাব অস্তিত্বের অতল স্তর থেকে উঠে আসছে যেন—যা হবার হবে। জীবনের কুড়িটা বছর তাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। সবিতা জানে, যে কোনো অঘটনের জন্য সারাক্ষণ প্রস্তুত থাকতে হয়।

গেট পেরিয়ে ওধারে যেতেই চোখে পড়ে সবুজ ভেলভেটের মতো লন, ফুলের বাগান, ফোয়ারা এবং নুড়ির রাস্তা। রাস্তাটার দুধারে সারিবদ্ধ সিলভার পাম।

নুড়ির পথটা মূল বাড়ির সামনে গিয়ে থেমেছে। নিপুণ গাইডের মতো দারোয়ান সবিতাকে সেখানে নিয়ে আসে। গলা চড়িয়ে ডাকতে থাকে, 'অনিল ভাইয়া—অনিল ভাইয়া—'

শ্বেত পাথরের চওড়া চওড়া দশটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলে ছপাল্লার নকশাওলা কাচের দরজা। পাল্লাগুলো খোলা ছিল। একটা মাঝবয়সী লোক, পরনে পাজামা আর লম্বা লম্বা ডোরাকাটা হাফশার্ট, সাদামাঠা চেহারা, দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়।

দারোয়ান তাকে বলে, 'অনিল ভাইয়া, দিদিজি এসে গেছেন।' সবিতাকে বলে, 'আপনি ওর সঙ্গে যান।'

বোঝা যাচ্ছিল, দারোয়ানের দৌড় এই সিঁড়ি পর্যন্ত। বাড়ির ভেতর তার প্রবেশাধিকার নেই। অনিল নিচে নেমে আসে। তার হাতে সবিতার সুটকেস এবং সবিতাকে তুলে দিয়ে দারোয়ান গেটের দিকে ফিরে যায়। অনিল নামের লোকটির সঙ্গে ওপরে উঠে দরজা পেরিয়ে ডিম্বাকৃতি প্রকাণ্ড একটা হল-ঘরে চলে আসে সবিতা। কার্পেট, তিন-চার সেট সোফা, অ্যাকুয়েরিয়াম, টিভি, সিলিং থেকে ঝুলন্ত নানা আকারের ঝাড়লণ্ঠন, গোটা চারেক এয়ারকুলার ইত্যাদি দিয়ে হলটা আগাগোড়া সাজানো। দেওয়ালের নিচের দিকে সুদৃশ্য ক্যাবিনেটে অজস্র বই, ওপরের দিকে সোনালি ফ্রেম আর কাচ দিয়ে বাঁধানো দামি দামি পেন্টিং। কপি নয়, সবগুলোই ওরিজিনাল।

হল-ঘরের একধারে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। সবিতাকে নিয়ে সোজা সেখানে যায় অনিল। মুখ উঁচু করে ডাকে, 'মায়া—মায়া—'

একটি ডাঁটো চেহারার মেয়েমানুষ, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, দেখে মনে হয় বহু ঘাটের জল খাওয়া, যৌবন এখনও পুরোপুরি অস্তাচলে যায়নি, পরনে প্রিন্টেড শাড়ি আর ব্লাউজ, সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়ায়। এক পলক সবিতাকে দেখে তর তর করে নেমে আসে।

এবার সবিতার সুটকেসটা অনিলের হাত থেকে মায়ার হাতে চলে যায়। 'আসুন—'বলে মায়া ফের ওপরে উঠতে থাকে। সবিতা তার পেছনে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করে। দুটো ব্যাপার তার কাছে এখন স্পষ্ট। এ বাড়ির কাজের লোকেদের সর্বত্র যাতায়াতের স্বাধীনতা নেই। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা গণ্ডি টানা আছে। দারোয়ান যেমন বাইরের সিঁড়ি পর্যন্ত আসতে পারে, তেমনই দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখ অবধি অনিলের চৌহদ্দি। তা ছাড়া সে লক্ষ করল, তার আসার খবরটা শুধু দারোয়ানকেই নয়, 'হ্যাপি ভিলা'র অন্য কাজের লোকেদেরও জানিয়ে রাখা হয়েছে এবং সে এলে কাকে কী করতে হবে সেটাও আগে থেকে স্থির করা আছে।

বাড়িটা তেতলা। মায়ার সঙ্গে দোতলায় উঠে সবিতার চোখে পড়ল, নিচের তলার মতোই এখানেও অবিকল একই রকম সুসজ্জিত হল-ঘর। সেটা ঘিরে ক'টা বেড-রুম। সিঁড়িটা দোতলাতেই শেষ হয়নি, বাঁক খেয়ে ওপরে উঠে গেছে।

মায়া দক্ষিণ দিকের একখানা বড় বেড-রুমে সবিতাকে নিয়ে আসে। একপাশে একেবারে আধুনিক ডিজাইনের খাটে নিভাঁজ, ধবধবে বিছানা। এ ছাড়া ইনটেরিয়র ডেকরেটরদের দিয়ে সাজানো ওয়ার্ডরোব, ড্রেসিং টেবল, পড়াশোনার জন্য শেডওলা ল্যাম্প লাগানো টেবল, শরীর এলিয়ে বিশ্রাম করার জন্য

গদি মোড়া আরাম চেয়ার, এয়ারকুলার, টেলিফোন, একটা দেওয়াল জুড়ে কোমর সমান হাইটের কাচের পাল্লা বসানো ক্যাবিনেটে নানা ধরনের বই, এনসাইক্লোপিডিয়া, ক্যাবিনেটটার মাথায় পেতলের অনেকগুলো টবে বিচিত্র ধরনের সব ক্যাকটাস, আরেকটা দেওয়ালের পুরোটা জুড়ে কাচের জানালা। দরজা-জানালায় যে পর্দাগুলো ঝুলছে তার দাম যে কত, কে জানে।

শিয়ালদা স্টেশনে নামার পর যে বিহুলতা কিছুক্ষণের জন্য সবিতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তার রেশ মাঝখানে থিতিয়ে এলেও এ বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যভাবে ফের শুরু হয়ে গেছে। হিন্দি ফিল্মে ছাড়া এমন বাড়ি নিজের চোখে সে কখনও দেখেনি। মায়ের মুখে কবে যেন শুনেছিল, হিরণ্ময় লাহিড়িরা বড়লোক। তাঁদের যে কত টাকা এখানে না এলে টের পাওয়া যেত না।

সুটকেস নামিয়ে রেখে মায়া বলল, 'এখন বিশ্রাম করুন। ঠাণ্ডা কলটা কি চালিয়ে দেব?' বলে এয়ারকুলার দেখিয়ে দেয় সে।

আরামের এত উপকরণ তার জন্য মজুত করে রেখেছেন হিরণ্ময় লাহিড়ি—এ যেন ভাবাই যায় না। বিহুলতা বা বিস্ময় কোনোটাই কাটতে চাইছে না। কী উদ্দেশ্য লোকটার? সবিতা মায়ার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'না, দরকার নেই।'

মায়া এবার ডান পাশের দেওয়ালের একটা বন্ধ দরজার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'ওটা চানের ঘর। জিরোবার পর ওখানে হাতমুখ ধুয়ে নেবেন। আমি আপনার চা আর জলখাবার নিয়ে আসছি।'

সবিতা সারারাত ট্রেন জার্নি করে এসেছে। তার মুখে, গলায়, উস্কখুস্ক চুলে, শাড়িতে, জামায় ধুলোবালির পুরু একটা স্তর পড়েছে। যদিও আশ্বিন মাস, এখনও যথেষ্ট গরম। গা থেকে ঘামের দুর্গন্ধ উঠে আসছিল। সে বলল, 'আমি স্নান করব।'

'তাই করে নিন। রেলগাড়িতে কাল রাত্তিরে নিশ্চয়ই ভাল ঘুম হয়নি। চান করলে আরাম লাগবে।'

বাথরুমে ঠাণ্ডা এবং গরম জলের কল, নতুন সাবান, পেস্ট, তোয়ালে, ঘরে পরার পোশাক এবং চটি আছে—এইসব জরুরি তথ্য জানিয়ে দিয়ে মায়া চলে গেল।

তারপরও বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সবিতা। সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে অবিশ্বাস্য, নাকি অলৌকিক মনে হচ্ছে। এমন একটা বাড়িতে তার অভ্যর্থনাটা এত রাজকীয় হবে, কে ভাবতে পেরেছিল।

নিজের অজান্তে পড়ার টেবলের পাশের চেয়ারটিতে কখন বসে পড়েছিল, খেয়াল নেই সবিতার। সে জোড়া কাচের জানালার বাইরে পলকহীন তাকিয়ে থাকে। এদিকে অনেকটা জায়গা ফাঁকা, সেখানে প্রচুর উঁচু উঁচু গাছ আকাশে ডালপালা ছড়িয়ে আশ্বিনের উষ্ণ সোনালি রোদ শুষে নিচ্ছে। এসব পেরিয়ে রেল লাইন। মহাশূন্যে সেই চিরচেনা শরতের নীলাকাশ আর সাদা মেঘের স্তূপ।

ধন্দ-ধরা ভাবটা কেটে এলে সবিতা উঠে গিয়ে নিজের সুটকেস খুলে ব্রাশ পেস্ট ইত্যাদি বার করে বাথরুমের দিকে পা বাড়ায়। যদিও মায়া জানিয়ে দিয়েছে তার জন্য সবই সাজানো রয়েছে, তবু নিজের মধ্যে কোথাও একটা প্রবল আড়ষ্টতা কাজ করছে।

বাথরুমে ঢুকে মাথাটা আরো ঘুরে যায় সবিতার। প্রায় চারশ স্কোয়ার ফিটের এই স্নানঘরে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত সবুজ মার্বেলে মোড়া। কী নেই এখানে? শাওয়ার, বাথ-টব, গিজার ছাড়াও কত রকমের যে গ্যাজেট; যার বেশির ভাগেরই নাম জানে না সে। এগুলোর কার্যকারিতা সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। কাচের ওয়াল বক্সগুলোতে শ্যাম্পু, হেয়ার টনিক লোশন, ক্রিম থেকে শুরু করে রকমারি বিদেশি পারফিউম। মায়া মিথ্যা বলেনি, গোলাপি রঙের নতুন তোয়ালে থেকে ঘরে পরার হাউসকোট হ্যাঙ্গারে ঝুলছে। একধারে রয়েছে ফোমের চটি।

মেঝে থেকে আতর বা ওই জাতীয় পারফিউম মেশানো ফিনাইলের টাটকা সুগন্ধ উঠে আসছে। সে আসবে বলেই হয়তো ফিনাইল দিয়ে ধুয়ে মুছে স্নানঘরের রোগজীবাণু ধ্বংস করে রাখা হয়েছে।

অনেক আগেই যা মনে রাখা উচিত ছিল, বিদ্যুৎচমকের মতো সেটা চোখের সামনে অদৃশ্য কোনো টিভির পর্দায় ফুটে ওঠে। আসানগঞ্জে তাদের দেড় কামরার বাসস্থান যার মেঝেতে অজস্র গর্ত, যখন তখন দেওয়ালের প্লাস্টার খসে পড়ে, মাথার ওপর সিলিং থেকে ঝুরঝুর করে বালি ঝরে, সেখানে আলোবাতাস খেলে না, সারাক্ষণ একটা স্যাঁতা গন্ধ, ঝাঁকে ঝাঁকে তেলাপোকা ওড়ে, তাদের ধরার

জন্য তক্কে তক্কে থাকে টিকটিকির পাল। সন্ধের পর থেকেই শুরু হয় ইঁদুরদের দৌড় প্রতিযোগিতা। ঘরের সস্তা ছিটের পুরনো, ময়লা পর্দাগুলো ন্যাতার মতো ঝোলে। বাথরুমটা স্যাঁতসেঁতে, কোণে কোণে শ্যাওলা জমে আছে। পায়খানার প্যান বেশির ভাগ দিনই মলমূত্রে উপচে থাকে।

কোত্থেকে কোথায় চলে এসেছে! সাউথ-এণ্ড পার্কের এই 'হ্যাপি ভিলা' যেন আলাদা কোনো গ্রহ—অপার্থিব এবং স্বপ্নবৎ।

সবিতা চারপাশটা খুঁটিয়ে বেশ কয়েকবার দেখে নিল। এখানে যে সব জটিল মেশিন টেশিন রয়েছে তার কোনটা চালালে কী ধরনের আরাম উৎপন্ন হয় সে সম্পর্কে তার ধারণা নেই। এখানকার সাবান শ্যাম্পু ব্রাশ পেস্ট বা তোয়ালে কিছুই ছুঁল না সে। এক কোণে বালতি আর মগ রয়েছে। বালতিটা টেনে এনে একটা কলের তলায় বসিয়ে জল ভরে নিল। তারপর নিজের ব্রাশ পেস্ট দিয়ে দাঁত মেজে, মুখ ধুয়ে, মগ দিয়ে জল ঢেলে স্নান করে নিল। পরনের বাসি জামাকাপড় কেচে নিজের শুকনো একটা শাড়ি আর ব্লাউজ পরে সেই বেডরুমটায় আবার ফিরে আসে। চুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছিল। ভেজা শাড়িটাড়ি একধারে রেখে নিজের তোয়ালে দিয়ে ভাল করে মাথা মুছে, সুটকেস থেকে চিরুনি বার করে ড্রেসিং টেবলের আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চুল আঁচড়ে বিশাল খাটের একপাশে জড়সড় হয়ে বসল। মায়া বলে গেছে, এ ঘরের সমস্ত কিছুই তার ব্যবহারের জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে, তবু আড়ষ্টতা কাটছে না। মনে হচ্ছে, অনধিকার প্রবেশকারীর মতো সে এখানে চলে এসেছে।

কাল সারারাত জেগেই কাটিয়েছে সবিতা। এমনিতে ট্রেনে উঠলে তার ঘুম আসে না। তার ওপর ছিল প্রচণ্ড চাপ। যাকে সে নিদারুণ ঘৃণা করে তার কাছেই যেতে হচ্ছে, এই চিন্তাটা তাকে সারাক্ষণ অস্থির করে রেখেছে।

স্নান করার পর যদিও অনেকখানি তাজা লাগছে তবু দু চোখ ঘুমে জুড়ে আসছে। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারলে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যেত। কিন্তু না, হিরণ্ময় লাহিড়ির সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত সে কিছুতেই ঘুমোবে না।

হঠাৎ সবিতার চোখ এসে পড়ল তার ভেজা কাপড়চোপড়ের ওপব। ওগুলো শুকোতে দেওয়া দরকার। কিন্তু কোথায় দেবে, ভেবে পেল না।

মায়া ফিরে এল। তার পেছন পেছন একটা অল্পবয়সী বেয়ারা। বেয়ারাটার হাতে মস্ত একটা ট্রে। মায়ার নির্দেশমতো একটা নিচু টেবলে সেটা নামিয়ে রেখে সে চলে গেল। ট্রেতে রয়েছে কর্ণ ফ্রেকস, বাদামি রঙের টোস্ট, দুধের ধবধবে পাত্র, কলা মাখন এবং জেলির কৌটো, অমলেট এবং চায়ের সরঞ্জাম।

মায়া এক পলক সবিতাকে দেখে নিয়ে বলল, 'চান হয়ে গেছে দেখছি।' তারপরেই প্রায় আঁতকে উঠল, 'এ কী, আপনি ঘরে পরার নতুন জামা তো গায়ে দেননি!'

সবিতা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই হঠাৎ কী ভেবে মায়া বাথরুমে চলে গেল। একপাক ঘুরে এসে চিন্তিতভাবে বলল, 'সাবান, তোয়ালে, তেল, কিরিম—সব য্যামনটা ছিল ত্যামনটা পড়ে আছে। কিচ্ছুটি ছুঁয়ে দ্যাখেননি।' সে এই ফিটফাট, ঝকঝকে বাড়িতে কাজ করলেও তার কথাবার্তায় এবং বলার ভঙ্গিতে গেঁয়ো গন্ধ রয়েছে।

সবিতা কিছু বলল না।

মায়া বলল, 'সাহেব খুব রাগ করবেন।'

সাহেব যে হিরণ্ময় লাহিড়ি সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না সবিতার। কিন্তু এবারও সে চুপ করে রইল।

ঘরের কোণ থেকে একটা নকশাদার চামড়ার মোড়া নিয়ে এসে মুখোমুখি বসল মায়া। দুধের পাত্রে কর্নফ্রেকস ঢেলে, কলা টুকরো টুকরো করে কেটে চামচ দিয়ে মিলিয়ে সবিতার হাতে দিয়ে বলল, 'আপনি আসবেম বলে এত জিনিসপত্তর কিনিয়ে এনেছেন। আর আপনিই যদিন সেগুলো ব্যাভার না করেন, রাগ হবে না? শুধু রাগই না, কষ্টও পাবেন সাহেব।' বলতে বলতে লক্ষ করল, কর্নফ্রেকসের পাত্রটা সবিতার হাতে ধরাই আছে, সে খাচ্ছে না। বলল, 'কী হল, খান—'

সবিতা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। যে লোক তিন লাইনের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, আবেগহীন একটা চিঠি লিখে তাকে আসতে বলেছে সে কিনা আরামের এত উপকরণ সাজিয়ে রেখেছে, এ যেন ভাবা যায় না। মায়ার তাড়ায় ধীরে ধীরে খেতে শুরু করল সে।

কর্নফ্লেকসের পর মাখন এবং জেলি মাখানো টোস্ট, অমলেট এবং চা। একসঙ্গে এত সুখাদ্য কখনও খেয়েছে কিনা, সবিতার মনে নেই। তাছাড়া পরিমাণটাও অনেক। সে আপত্তি করলেও মায়া শুনছিল না।

খেতে খেতে হঠাৎ সবিতা জিজ্ঞেস করল, 'এ বাড়িতে কে কে থাকে?' হিরণ্ময় লাহিড়ির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ বহুকাল আগেই ছিন্ন হয়ে গেছে। সে জানে না, তিনি ফের বিয়ে করেছেন কিনা, করলে তাঁর স্ত্রী থাকার কথা, হয়তো ছেলেমেয়েও। এই ব্যাপারটা নিয়ে সবিতার দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ রয়েছে।

মায়া বলল, 'দারোয়ান, ডেরাইভার, অন্য সব কাজের লোক মিলিয়ে আমরা এগার জন। আর সকলের মাথার ওপর সাহেব তো রয়েচেনই।'

সবিতার মস্তিষ্কে কাঁটার মতো যা খোঁচা দিচ্ছে সেই অস্বস্তিকর প্রশ্নটা করবে কিনা, প্রথমটা ভেবে পেল না। দ্বিধাগ্রস্তের মতো কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে। তারপর প্রায় চোখকান বুজে জিজ্ঞেস করল, 'এ ছাড়া আর কেউ থাকে না?'

ইঙ্গিতটা খুব সম্ভবত ধরতে পেরেছে মায়া। তার চোখে ঝিলিক খেলে গেল। কিন্তু ভীষণ ভালমানুষের মতো মুখ করে বলল, 'আর কেউ বলতে?'

সবিতা বলল, 'তোমার সাহেবের আত্মীয়স্বজন।'

'না।' মায়ার পুরু ঠোঁটের ফাঁকে সূক্ষ্ম হাসির একটি রেখা ফুটি ফুটি করেও ফুটল না। ডাইনে থেকে বাঁয়ে, বাঁয়ে থেকে ডাইনে, মাথাটা ধীরে ধীরে বার দুই নেড়ে চাপা গলায় সে বলল, 'তবে একজন মধ্যি মধ্যি এসে থাকে।'

সবিতা কৌতূহল বোধ করছিল। বলল, 'কে সে?'

শিউরে ওঠার মতো ভঙ্গি করে মায়া বলল, 'উরে বাবা, ছোট মুখে কি বড় কথা মানায়! আপনি তো এখন থাকচেনই। নিজের চোখেই সব দেখতে পাবেন।'

সবিতা একদৃষ্টে লক্ষ করছিল। মায়ার এই শিহরণটা যে নেহাতই চতুর অভিনয় তা ঠিকই বুঝতে পেরেছে সে। হিরণ্ময় সম্পর্কে একটা খিঁচ সৃষ্টি করেই মায়া থেমে গেছে। কিছুটা গেঁয়ো ভাব থাকলেও আধবয়সী এই মেয়েমানুষটি যে অত্যন্ত ধুরন্ধর সে ব্যাপারে সংশয় নেই। সবিতার স্নায়ুমণ্ডলী জানিয়ে দিল ভবিষ্যতে মায়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কে এসে এ বাড়িতে থাকে তা নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করল না সে।

একটু চুপচাপ।

তারপর সবিতা বলল, 'তোমাদের সাহেব কি এখন বাড়ি নেই?'

মায়া বলল, 'আচেন। ঘুমুচ্চেন।'

এই বেডরুমের একটা দেওয়ালে সুদৃশ্য ওয়াল ক্লক রয়েছে। স্বয়ংক্রিয় কোনো নিয়মে সেদিকে চোখ চলে গেল সবিতার। দশটা বেজে বত্রিশ। বেশ অবাক হয়ে বলল, 'সাড়ে দশটা বেজে গেছে। এখনও—'

মায়া বলল, 'কোনো কোনো দিন ঘুম ভাঙতে এগারটা পেরিয়ে যায়।'

'ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।'

'যাখন এসে পড়েচেন দেখা তো হবেই। সাহেব উঠুন। চান টান করুন। চা-জলখাবার খান। তারপর আমি গিয়ে আপনার আসার খবর দেব। এবার আপনাকে এট্টু কষ্ট করে খাট থেকে নিচে নামতে হবে দিদি।'

'কেন?'

মায়া বলল, 'ত্যাখন তাড়াহুড়ো করে আপনার খাবার আনতে গেলাম। তাই জিনিসগুলো দেখানো হয়নি।'

সবিতাকে সামান্য উৎসুক দেখায়। সে জিজ্ঞেস করে, 'কী জিনিস?'

মায়া বলল, 'না নামলে কী করে দেখাই?'

অগত্যা টাইলস-বসানো, মসৃণ মেঝেতে নামতেই হয় সবিতাকে। মায়া তাকে একটা ওয়ার্ডরোবের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। তারপর কোনো যাদুকরীর মতো ওটার পাল্লা ঠেলে একধারে সরিয়ে দিয়ে বলে, 'দেখুন—'

সবিতার সামনে আলিবাবার সেই আশ্চর্য গুহার রহস্যময় দরজা যেন খুলে যায়। ভেতরে রকমারি শাড়ি—মাইশোর সিল্ক থেকে কটকী, কোটা, সম্বলপুরী, টাঙ্গাইল, সিনথেটিক, কী নেই? এছাড়া হ্যাঙ্গারে ঝুলছে হাউসকোট, সালোয়ার কামিজ, নানা ধরনের রাতপোশাক। যে এগুলো কিনেছে তার রুচিকে কুর্নিশ করতেই হয়। সারা কলকাতা চষে এসব বাছাই করতে কতটা সময় আর উদ্যম লেগেছে, ভাবতেই অবাক লাগল সবিতার।

ওয়ার্ডরোবের পাল্লা বন্ধ করে এবার ড্রেসিং টেবলের সামনে ওকে নিয়ে যায় মায়া। ডিম্বাকৃতি, লাইফ-সাইজ আয়নার নিচে পর পর তিনটে শেলফ। সবগুলো খুলে খুলে দেখায় সে। বেঁটে মোটা সরু লম্বা—নানা আকার আর রঙের টিউব এবং শিশিতে সেগুলো বোঝাই। আই-লাইনার, বডি-পাউডার, নেল-পালিশ, দু-তিন রকম ক্রিম, আর সেন্ট ছাড়া অন্যগুলো চিনতে পারল না সবিতা।

মায়া বলল, 'সমস্ত দেখিয়ে দিলাম। নতুন জামাকাপড়গুলো পরবেন কিন্তু। সাজের জিনিস ফেলে রাখবেন না। কলকাতা শহরে থাকতে হলে মেয়েদের সাজগোজ দরকার।' একটু থেমে বলল, 'সঙ্গে করে যে শাড়ি-বেলাউজ এনেচেন ওগুলো আমারে দিয়ে দেবেন; অন্য কোথাও রেখে দেব।'

সবিতা উত্তর দিল না। তার মাথায় তীব্র ঘূর্ণিজলের মতো কী যেন দুরন্ত গতিতে ঘুরে যাচ্ছে। অল্প যে দু-চারটে শাড়ি আর সালোয়ার টালোয়ার তার সুটকেসে আছে সেগুলো ওয়ার্ডরোবের পোশাকগুলোর তুলনায় পা-মোছা তেনার মতো তুচ্ছ। বাথরুমে রয়েছে দামি দামি অগুনতি পারফিউম, তার দশ গুণ রয়েছে ড্রেসিং টেবলের তিনটে ড্রয়ারে। সাজসজ্জার জিনিস আর পোশাক আশাকের চোখ ধাঁধানো এই যে প্রদর্শনী—এর পেছনে হিরণ্ময়ের কোনো সূক্ষ্ম চাল আছে কিনা ধরা যাচ্ছে না।

মায়া বলল, 'আমি এখন যাই। সাহেব য্যাখন বলবেন আপনারে ডেকে নে যাব।'

'আচ্ছা।'

মায়া চলে যাবার পর আবার খাটে গিয়ে বসে সবিতা। হঠাৎ করে মনে পড়ে যায়, আসানগঞ্জ থেকে চলে আসার সময় অনুরাধা মাসি বলেছিলেন, কলকাতায় নেমেই সে যেন তার পৌঁছুবার খবর দেয়। তার মা যেখানে পড়াতেন অনুরাধা তালুকদার সেই স্কুলেরই হেডমিস্ট্রেস। আসানগঞ্জে সবিতার এই একটিমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষীই অবশিষ্ট রয়েছে। অনুরাধা আরো বলেছিলেন, হিরণ্ময় লাহিড়ির বাড়িতে সে যদি অপমানিত বোধ করে, তক্ষুনি যেন আসানগঞ্জের ট্রেন ধরে ফিরে আসে।

সুটকেসে তার শাড়িটাড়ির নিচে ক'টা নতুন ইনল্যান্ড লেটারও রয়েছে। সবিতা চিঠি লেখার চিন্তাটা আপাতত স্থগিত রাখল। এ বাড়িতে পা দেবার পর থেকে এখন পর্যন্ত যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে মনে হয়নি, সে এখানে অবাঞ্ছিত। সবিতা ভাবল, হিরণ্ময়ের সঙ্গে দেখা হবার পর চিঠিটা লিখবে।

এই ফাঁকা ঘরে এখন অপার নৈঃশব্দ। কোথাও এতটুকু আওয়াজ নেই। কাচের জোড়া জানালার বাইরে এক টুকরো প্রকৃতি ফ্রিজ শটের মতো স্থির হয়ে আছে।

সবিতা ঠিক করে রেখেছিল, হিরণ্ময়ের সঙ্গে কথা বলার আগে সে ঘুমোবে না। কিন্তু শরীর জুড়ে এমনই অবসাদ যে ঘুমটাকে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা গেল না। ধীরে ধীরে তার চোখ বুজে আসে।

দুই

কতক্ষণ গাঢ়, গভীর ঘুমের আরকে ডুবে ছিল, খেয়াল নেই। একসময় কার আবছা কণ্ঠস্বর তার কানে ভেসে আসে, 'দিদি—দিদি—'

সবিতা চোখ মেলে তাকায়। ঘুম এবং জাগরণের মাঝামাঝি একটা অবস্থা থেকে প্রথমে বুঝতে

পারে না, সে এই মুহূর্তে কোথায় রয়েছে। গলার স্বরটা ফের শোনা যায়, এবার অনেক স্পষ্ট। 'দিদি, আমি মায়া—' দ্রুত উঠে বসে সবিতা।

মায়া খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অপ্রস্তুত মুখে বলে, 'কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলাম। আপনার শরীল খারাপ হবে।'

সবিতা আন্দাজ করে নিল, হিরণ্ময় লাহিড়ি মায়াকে পাঠিয়েছেন। বলল, 'আমার জন্যে ভেবো না, পরেও ঘুমোতে পারব।' মায়ার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের সাহেব নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'একটু দাঁড়াও।'

বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিল সবিতা। ঘুমের রেশটা এবার পুরোপুরি কেটে গেল। ভাল করে মুখ মুছে বাইরে এসে সে মায়াকে বলল, 'চল।' হিরণ্ময়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে নিয়েছে সে।

মায়া তাকে সঙ্গে করে তেতলায় নিয়ে গেল। একতলা এবং দোতলার মতো এখানেও একই রকম হল-ঘর, পর পর বেডরুম, ইত্যাদি।

হলটার মাঝখানে একটা সোফায় হিরণ্ময় বসে ছিলেন। দেখামাত্র তাঁকে চিনতে পারল সবিতা। খবরের কাগজে আগে তাঁর যে সব ছবি দেখেছে সেগুলোর সঙ্গে ভাল করে মিলিয়ে দেখে নিল সে।

হিরণ্ময়ও ওদের দেখতে পেয়েছিলেন। হাত নেড়ে মায়াকে চলে যেতে বলে সবিতাকে ডাকলেন, 'এস—'

মায়া নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যায়। সবিতা পায়ে পায়ে হিরণ্ময়ের কাছে এগিয়ে আসে। জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার পর এই প্রথম তাঁকে সামনাসামনি দেখল। এই মানুষটি তার কত কাছের, অথচ কত অপরিচিত। ভাবতে অবাক লাগছে, এরই রক্তস্রোত তার শরীরে বয়ে চলেছে।

সবিতা সাহসী মেয়ে। জীবনের কুড়িটা বছর ক্রমাগত শান দিয়ে দিয়ে তাকে ধারাল করে তুলেছে। তবু এই মুহূর্তে চামড়ার নিচে কনকনে ঠাণ্ডা জলের মতো কী যেন খেলে যায়। তা কি ভয়ে, না প্রচণ্ড স্নায়বিক কোনো চাপে?

ভীতিটা কাটিয়ে উঠতে কয়েক পলক লাগে। সে সোজাসুজি হিরণ্ময়ের দিকে তাকায়।

হিরণ্ময় মুখোমুখি একটা সোফা দেখিয়ে বলেন, 'বসো।'

ধীরে ধীরে বসে পড়ে সবিতা। তার পাঁচ ফুট দূরত্বে যিনি বসে আছেন তাঁর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। পেটানো স্বাস্থ্য, মুখ চৌকো ধরনের, দৃঢ় চোয়াল, ঘন ভুরু, চুলে এবং জুলপিতে পাক ধরেছে। চশমার ওধারে দুই চোখের দৃষ্টি গভীর এবং তীক্ষ্ণ, চওড়া কপাল। খুতনিতে একটা কাটা দাগ তাঁর চেহারায় এক ধরনের নিষ্ঠুরতা ফুটিয়ে তুলেছে।

হিরণ্ময়ের স্নান হয়ে গিয়েছিল। পরনে ধবধবে পাজামা আর পাঞ্জাবি, পায়ে ফ্যাশনেবল চটি। তাঁর গা থেকে দামি সেন্টের সুগন্ধ উঠে আসছে।

হিরণ্ময় বললেন, 'খুব ছোটবেলায় তোমাকে দেখেছিলাম। তারপর এই। না জানা থাকলে বুঝতেই পারতাম না তুমি কে।'

উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে থাকে সবিতা।

হিরণ্ময় বললেন, 'কাল ট্রেনে এসেছ। নিশ্চয়ই ভিড়ে খুব কষ্ট হয়েছে—'

এতক্ষণে মুখ খুলল সবিতা, 'না, কষ্ট কিসের? হাজার হাজার মানুষ তো এভাবেই যাতায়াত করে।'

হিরণ্ময় সামান্য হাসলেন, 'এ বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়নি?'

'না। ঠিকানা ছিল।' সবিতা বলল, 'অসুবিধা হবে কেন?'

হিরণ্ময় হঠাৎ ইংরেজিতে বলে উঠলেন, 'আর ইউ ফিলিং কমফোর্টেবল ইন দিস হাউস?'

সবিতা খুব নিস্পৃহ সুরে বাংলাতেই বলল, এত আরামে থাকার অভ্যাস তার নেই। সে বুঝতে

পারছিল, এতক্ষণ যা কথা হল তা নেহাতই মামুলি; একজন অচেনা মানুষ বাড়িতে এলে শিষ্টাচারের খাতিরে যে সব প্রশ্ন করা হয় এগুলো তার বেশি কিছু নয়। কুড়ি-পেরুনো একটি তরুণীর সঙ্গে যে হিরণ্ময়ের পার্থিব সম্পর্কটা সবচেয়ে গভীর, এতকাল পরে তাকে দেখে তাঁর মধ্যে কোনোরকম আবেগের সৃষ্টি হয়েছে কিনা, বোঝা যাচ্ছে না।

হিরণ্ময় বললেন, 'তোমার চিঠি পড়ে জানতে পেরেছি মাস তিনেক আগে তোমার মা মারা গেছে। খবরটা এই প্রথম পেলাম। কী হয়েছিল শোভনার?'

শোভনা সবিতার মা। মায়ের প্রসঙ্গ যে অনিবার্য নিয়মেই উঠবে সেটা জানা ছিল। সবিতা সঙ্গে সঙ্গে টের পেল, তার মধ্যে জমানো বহুকালের আক্রোশ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দাঁতে দাঁত চেপে সেটাকে ঠেকিয়ে রাখল সে। নীরস গলায় বলল, 'ক্যানসার।'

হিরণ্ময় পায়ের ওপর পা তুলে আলস্যের ভঙ্গিতে সোফায় সামান্য কাত হয়ে ছিলেন। এবার পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, 'খুব কষ্ট পেয়েছে নিশ্চয়ই?' তাঁর কণ্ঠস্বর খুব নরম, একটু দুঃখের আভাসও যেন তাতে ফুটে ওঠে।

এই প্রথম হিরণ্ময়কে কিছুটা মানবিক মনে হয়। সবিতা বলল, 'হ্যাঁ। শেষ পনেরটা দিন কিছু খেতে পারেনি, ঘুমোয়নি, যন্ত্রণায় সারাক্ষণ চিৎকার করেছে।'

হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করলেন, 'কার ট্রিটমেন্টে ছিল?'

এখন এ প্রশ্নের কোনো মানে হয় না। তবু সবিতা উত্তরটা দিল, 'আসানগঞ্জেরই একজন ডাক্তার।'

হিরণ্ময় ধীরে ধীরে বললেন, 'ক্যানসারের ওষুধ এখনও খুব সম্ভব বেরোয়নি। আর্লি স্টেজে ধরা পড়লে অপারেশন করে অনেক সময় সারিয়ে তোলা যায়। পেশেন্ট অ্যাট লিস্ট এক্সট্রা কয়েকটা বছর বেঁচে থাকে।' একটু থেমে বললেন, 'শোভনার অসুখটা কোন স্টেজে জানা গেল?'

সবিতা বলল, 'অনেক পরে। তখন কিছু করার ছিল না।'

হিরণ্ময় বললেন, 'তবু মাকে কলকাতায় নিয়ে আসতে পারতে। এখানকার ক্যানসার হাসপাতাল আর নার্সিং হোমগুলোতে ইওরোপ আমেরিকার অ্যাডভান্সড কান্ট্রি থেকে নতুন নতুন মেশিন আসছে। আসানগঞ্জের মতো মফঃস্বল শহরে সে সব ভাবাও যায় না। কলকাতায় এলেও শোভনা হয়তো বাঁচত না, তবে শেষ সময়ের যন্ত্রণাটা নিশ্চয়ই কমত।'

হতচকিত সবিতা হিরণ্ময়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। যে প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে বহুকাল আগেই সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে তার মৃত্যুকালীন কষ্টভোগের খবর শুনে তিনি সামান্য হলেও বিচলিত হবেন, সবিতার সুদূর কল্পনাতেও তা ছিল না।

সবিতা জানে, তার মায়ের সঙ্গে হিরণ্ময়ের ক্ষণস্থায়ী দাম্পত্যজীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল প্রচণ্ড ঘৃণা আর অন্তহীন গ্লানির মধ্যে। মৃত স্ত্রীর মুখ এতদিনে তাঁর স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে যাবার কথা। তবু তার জন্য হিরণ্ময় যে মমতাটুকু প্রকাশ করলেন তা বিস্ময়কর। মা কি তবে এই মানুষটিকে বুঝতে ভুল করেছিল? ছেলেবেলা থেকে তীব্র রাগ আক্রোশ আর চরম বিতৃষ্ণা দিয়ে গড়া হিরণ্ময়ের একটা দানবীয় মূর্তি সবিতার মনের ভেতর পাকাপাকিভাবে স্থাপন করে দিয়েছে সে। আর সেটাকে একটানা বয়ে বয়ে কুড়ি পেরিয়ে একুশ পৌঁছেছে সবিতা।

মা যে হিরণ্ময়ের কথা আমৃত্যু বলে গেছে তার সঙ্গে এই মুহূর্তে উলটোদিকের সোফায় বসা মানুষটিকে যেন মেলানো যায় না। মৃদু গলায় সবিতা বলে, 'কলকাতায় এনে মাকে হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে রাখার মতো টাকা আমাদের ছিল না।'

চশমার ভেতর হিরণ্ময়ের চোখদুটো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, 'আমি তাকে অনেক টাকা দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শোভনা এত অ্যারোগান্ট এত জেদি যে একটা পয়সাও নিল না। টাকাটা হাতে থাকলে অন্তত চিকিৎসাটা ভাল হত।'

হিরণ্ময় সম্পর্কে সবিতার ধারণা পালটাতে শুরু করেছিল। পলকে তার মন কঠোর হয়ে ওঠে। সে শুনেছে ডিভোর্সের চড়া দাম হিসেবে উনিশ বছর আগে সাত লাখ টাকা দিতে চেয়েছিলেন হিরণ্ময়। মায়ের মতো আত্মসম্মানওলা একজন মহিলার পক্ষে তা নেওয়া সম্ভব ছিল না।

হিরণ্ময় মায়ের সম্পর্কে যে মন্তব্য করলেন তার প্রতিবাদ করা দরকার। আসানগঞ্জ থেকে কাল

সবিতা যখন ট্রেনে ওঠে তখনই মনে হয়েছিল এই লোকটার সঙ্গে সংঘাত বাধবে। প্রথম দিনেই সেটা শুরু করে দেওয়া ভাল। এখানে আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে এসেছে ঠিকই, কিন্তু মায়ের ব্যাপারে সে কোনো-ভাবেই আপস করবে না।

সবিতা বলল, 'জেদ আর অ্যারোগান্সের যথেষ্ট কারণ ছিল। মা কেন টাকাটা নেয়নি, সেটা আপনি ভাল করেই জানেন।'

একটু চমকে উঠলেন হিরণ্ময়। আপাতদৃষ্টিতে মেয়েটাকে যতটা শান্ত আর নিরীহ মনে হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে সে তা নয়। ভেতরে ভেতরে তিনি সতর্ক হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর হিরণ্ময় একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে যান। জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা তোমার মামাবাড়িতে থাকতে না?'

সবিতা বলল, 'সে অনেকদিন আগে। আমার যখন পাঁচ বছর বয়েস মা আমাকে নিয়ে ভাড়া বাড়িতে চলে যায়।'

কী কারণে মামাবাড়ি ছাড়তে হয়েছিল তা আর জানতে চাইলেন না হিরণ্ময়। বললেন, 'তারপর?'

'ওই ভাড়া বাড়িতেই কাল পর্যন্ত থেকেছি। ওটা ছাড়িনি। তালা লাগিয়ে কলকাতায় এসেছি।'

'তোমাদের চলত কী করে?'

'মা আসানগঞ্জ গার্লস স্কুলে চাকরি নিয়েছিল। জিওগ্রাফি পড়াত।'

হিরণ্ময় এবার বললেন, 'যদি কিছু মনে না কর, একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

সবিতা বলল, 'করুন।'

'তোমাদের সঙ্গে আমার কোনোরকম যোগাযোগ ছিল না, হয়তো তোমরা আমার অস্তিত্বই স্বীকার করতে না। তবু মায়ের মৃত্যুর পর হঠাৎ আমাকে চিঠি লিখলে কেন? ইন ফ্যাক্ট, আমি রীতিমত অবাকই হয়েছিলাম।'

'মা যখন মারা যাচ্ছে তখন লিখতে বলেছিল।'

'সে তো তোমার চিঠিতেই জানতে পেরেছি। কিন্তু—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন হিরণ্ময়।

তাঁর মনোভাব বুঝতে পারছিল সবিতা। বলল, 'নিজের প্রোটেকশনের কথা চিন্তা করে চিঠিটা লিখেছিলাম।'

'প্রোটেকশন!'

'হ্যাঁ।'

'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

সবিতা বলল, 'মা নেই। আমার বয়সের একটা মেয়ের পক্ষে এই সোসাইটি কি খুব নিরাপদ? কলকাতার কথা জানি না, আসানগঞ্জে ইভ-টিজারদের জন্যে কোনো মেয়ে একা একা রাস্তায় বেরোতে পারে না। তার ওপর যদি ওরা জানতে পারে মেয়েটির পেছনে দাঁড়াবার কেউ নেই, তা হলে তার যে কী বিপদ, বলে বোঝান যাবে না।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন হিরণ্ময়। চিঠি লেখার উদ্দেশ্যটা তাঁর কাছে বোধহয় বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়।

সবিতা থামেনি, 'তিনমাস হল মা মারা গেছে, বদমাসরা আমার প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। রাস্তায় বেরুলে মনে হত, যে কোনো মুহূর্তে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে।'

হিরণ্ময় বললেন, 'তোমার মামারা তো আসানগঞ্জে থাকে। তবু প্রোটেকশনের জন্য আমার কথা ভাবলে যে?'

'মামাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তাছাড়া মায়ের ইচ্ছার কথা আপনাকে আগেই বলেছি।' কথা বলছিল ঠিকই, তার মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসায় হিরণ্ময় কতটা খুশি হয়েছেন, আদৌ হয়েছেন কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। লোকটার মুখের ভাব আশ্চর্য শান্ত, আবেগহীন। ভেতরে কী প্রতিক্রিয়া চলছে, বাইরে থেকে বোঝা মুশকিল।

সবিতা এমন মেয়ে যে চাতুরী বা কৌশল জানে না। কিছু গোপন করতে শেখেনি। যা ভাবে,

স্পষ্টাস্পষ্টি মুখের ওপর বলে দিতে পারে। মা জানিয়ে দিয়েছিল, এ বাড়িতে এসে থাকার শতকরা একশ ভাগ অধিকার তার আছে। কিন্তু এ সম্পর্কে একটি শব্দও এখন পর্যন্ত উচ্চরণ করেননি হিরণ্ময়। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে সবিতা বলতে লাগল, 'আচমকা চলে এসে আপনাকে বোধহয় খুব অসুবিধায় ফেলে দিলাম।'

হিরণ্ময় হাসলেন, 'না। নট অ্যাট অল। তোমার অসুবিধা না হলেই হল।'

তাঁর কথার উত্তর না দিয়ে সবিতা বলল, 'তিনটে বছর আমি এখানে থাকতে চাই। তারপর আর বিরক্ত করব না।'

হিরণ্ময়ের ভুরু কুঁচকে গেল। বললেন, 'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

সবিতা জানায়, এ বছর তার বি. এ পার্ট টু'র ফাইনাল। তারপর এম. এ'র দুটো বছর। ইউনিভার্সিটির শেষ ডিগ্রিটা পাওয়ার পর তার আর কোনো সমস্যা থাকবে না।

হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করলেন, 'এম. এ'র ডিগ্রিটা পেলে আর প্রোটেকশনের দরকার নেই?'

'না।'

'তিন বছর পর তোমার বয়েস কত হবে—চব্বিশ, না পঁচিশ?'

'চব্বিশ।'

'সেই বয়েসটাও বিপজ্জনক। দেশের যা অবস্থা তাতে নেক্সট তিন বছরে ইভ-টিজার আর কিডন্যাপারদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে।'

সবিতা উত্তর দিল না।

হিরণ্ময় কৌতূহল বোধ করছিলেন। বললেন, 'এম. এ পাস করার পর কী করতে চাও?'

সবিতা বলল, 'স্টুডেন্ট হিসেবে আমি খারাপ না। আমার বিশ্বাস এম. এ'তে ফার্স্ট ক্লাস পাব। যদি তা না হয়, হাই সেকেণ্ড ক্লাস তো অবশ্যই। তারপর একটা চাকরি জোগাড় করে ওয়ার্কিং উইমেন্স হস্টেলে চলে যেতে চাই।'

'আই সি। কিন্তু চাকরির বাজার সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে?'

'আছে। বাজার যত খারাপই হোক, আমি মনে করি ভাল রেজাল্টের দাম এখনও যথেষ্ট। কিছু না কিছু একটা জুটে যাবেই।'

'খুব অপটিমিস্টিক দেখছি।'

'আশা ছাড়া মানুষ কি বেঁচে থাকতে পারে?'

একটু চুপচাপ।

তারপর হিরণ্ময় বললেন, 'এম. এ'র ভাল রেজাল্ট আর একটা চাকরি—এই দুটোই তুমি নিজের সিকিউরিটি বলে ভাবছ?'

সবিতা বলল, 'পুরোপুরি না হলেও অনেকটা তো বটেই।'

'ঠিক আছে, তিনটে বছর তো কাটুক। তারপর এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা যাবে।' বলে, কিছুক্ষণ ভেবে ফের শুরু করলেন হিরণ্ময়, 'খানিক আগে বলেছিলে আসানগঞ্জে ভাড়াটে বাড়িতে তালা দিয়ে এসেছ। ওটা রেখে কী লাভ? বাড়িওলাকে চিঠি দিয়ে ছেড়ে দাও। আমি লোক পাঠিয়ে তোমার যা মালপত্র আছে, আনিয়ে দেব।'

সবিতা বলল, 'আপাতত বাড়িটা থাক। কিছুদিন দেখি। তারপর এ নিয়ে যা ডিশিসান নেবার নেব।'

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন হিরণ্ময়। তারপর বললেন, 'তার মানে এখানে থাকতে ভাল না লাগলে আসানগঞ্জে ফিরে যেতে চাও?'

সবিতা চুপ করে থাকে।

হিরণ্ময় বললেন, 'আমি কিন্তু তোমার কমফোর্টের সবরকম ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

সবিতা বলল, 'কমফোর্টের কথা আগেও বোধহয় আরেকবার বলেছেন। দোতলায় বেডরুমে আর বাথরুমে যেসব পারফিউম আর জামাকাপড় রয়েছে তার বেশির ভাগই জন্মের পর থেকে চোখে দেখিনি। মনে হচ্ছিল, একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে এসে পড়েছি।'

সবিতার শেষ কথাটায় স্পষ্ট খোঁচা ছিল। সেটা উপেক্ষা করে হিরণ্ময় বললেন, 'তা হলে অসুবিধাটা কোথায়?'

চাপা, অথচ তীব্র গলায় সবিতা বলল, 'আপনি আমার মাকে চরম অপমান করেছেন। সেটা মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারি না। সারাক্ষণ একটা ট্রমার মধ্যে থাকি। আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কিরকম দাঁড়াবে তার ওপর আমার এখানে থাকা নির্ভর করছে।' করুণাপ্রার্থীর পক্ষে এ জাতীয় কথা বলা যে ঠিক নয় তা বুঝতে পারছিল সে। কিন্তু মায়ের ব্যাপারে তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। এ এক বিচিত্র পরিস্থিতি। যার কাছে আশ্রয়ের খোঁজে এসেছে তাকেই আঘাত হানতে চায় সবিতা।

অসহ্য রাগে হিরণ্ময়ের মুখটা গনগনে লোহার পিণ্ডের মতো দেখাচ্ছে। চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে তাঁর। টের পান নাক মুখ চোখ থুতনিতে আগুন জ্বলছে। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে চুরমার করে দিতেন। কিন্তু সামনের সোফায় যে প্রতিপক্ষটি বসে আছে তার দিকে আঙুল তুলতে গেলেও দশ বার ভাবতে হয়। ধীরে ধীরে হিরণ্ময়ের মুখ স্বাভাবিক হয়ে আসে। হয়তো নমনীয়ও। বলেন, 'তোমার মায়ের সঙ্গে আমার রিলেশান অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে এখন বেঁচে নেই। তার সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করতে চাই না।' একটু থেমে বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি আমাকে যখন যাচাই করতে চাইছ তাই করো।'

সবিতা জবাব দেয় না।

হিরণ্ময় এবার বলেন, 'এখানে ভাল না লাগলে আসানগঞ্জে ফিরে যাবার কথা বললে। সেখানে গেলে ফের শার্কদের মুখে পড়তে হবে। এটা ভেবে দেখেছ?'

সবিতা বলল, 'আগে ভাবিনি। মা আপনাকে চিঠি লিখতে বলেছিল আর অনুরাধা মাসি আসতে বলল, তাই চলে এসেছি।'

'আসানগঞ্জে ফিরলে তোমার প্রোটেকশনের কী হবে? কে তোমাকে বদমাসদের হাত থেকে রক্ষা করবে?'

'ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করার কৌশল নিশ্চয়ই শিখে ফেলব। মনে জোর থাকলে সব সামলে নেওয়া যায়।'

হিরণ্ময় হেসে বললেন, 'তোমার অভিজ্ঞতা কম। তাই জানো না, শুধু মনের জোর আর ডিটারমিনেশান দিয়ে আজকের ওয়ার্ল্ডে বাঁচা যায় না।'

সবিতা কী বলতে যাচ্ছিল, ডানদিকের শেষ বেডরুম থেকে হঠাৎ যিনি বেরিয়ে এলেন তাঁর দিকে তাকিয়ে তার দু'চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মহিলাটির বয়স অবশ্যই চল্লিশ পেরিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য ম্যাজিকে যৌবনকে তিনি পায়ের পাতা থেকে চুল পর্যন্ত সমস্ত শরীরে ধরে রেখেছেন। কলেজ লাইব্রেরিতে এনসাইক্লোপিডিয়ার পাতা উলটোতে উলটোতে একদিন ভেনাসের ছবি দেখেছিল সবিতা। মহিলার সৌন্দর্য প্রায় সেই রকমই। তার সঙ্গে বিপুল পরিমাণে অতিরিক্ত যা আছে তার নাম সেক্স। কাঁধ পর্যন্ত ফাঁপানো সিল্কের মতো নরম চুল, তাঁর তাকানো, নিটোল নগ্ন হাত, মোমের সঙ্গে সোনার জল মিশিয়ে তৈরি মসৃণ ত্বক, উপচে-আসা বুক, লম্বা আঙুলের মাথায় লাল পালিশের চমক-লাগানো নখ, প্লাক-করা নিখুঁত ভুরু, ভেজা ভেজা রক্তাভ ঠোঁট— সব মিলিয়ে যে কোনো পুরুষকে আমূল ঝাঁকিয়ে দেবার মতো অফুরন্ত শক্তি মহিলাটির রয়েছে। ইচ্ছা করলে পারিপার্শ্বিক সমস্ত কিছুকে তুড়ি মেরে পলকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারেন।

হিরণ্ময় মহিলাকে দেখতে পেয়েছিলেন। ডাকলেন, 'এখানে এস—'

ডাকার দরকার ছিল না, মহিলা সবিতাদের দিকেই আসছিলেন। কাছে এগিয়ে এসে একটা সোফায় বসলেন।

হিরণ্ময় সবিতাকে বললেন, 'তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। এ হল নীনা। ভাল নাম মনীষা। তুমি একে নীনা আন্টি বলতে পার।' নীনাকে বললেন, 'আর এ হল—'

হিরণ্ময়কে থামিয়ে দিয়ে নীনা বললেন, 'আমি জানি, ও সবিতা।'

সবিতা মনীষাকে লক্ষ করছিল। তাঁর পরনে মেরুন রঙের মাইশোর সিল্ক, স্লিভলেস ব্লাউজ, পায়ে হালকা ফ্যাশনেবল স্লিপার। বাঁ হাতে সোনার ব্যান্ডে ওভাল শেপের ঘড়ি, ডান হাতে রিস্টলেট, গলায়

হীরের লকেটওলা সরু চেন। তাঁর শরীর থেকে দামি পারফিউমের সুগন্ধ উঠে আসছিল। গন্ধটা নেশা ধরিয়ে দেয়।

মনীষাও সবিতাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। সারা মুখে মৃদু, আধফোটা হাসি। বললেন, 'তোমার চিঠি পাওয়ার পর হিরণ খুব মুশকিলে পড়ে গিয়েছিল। ওর তো কেনাকাটার অভ্যাস নেই। তাই আমি এয়ার-কন্ডিশনড আর নিউ মার্কেট ঘুরে তোমার জন্যে শাড়ি, সালোয়ার, সাজের মেটিরিয়াল কিনে এনে তোমার বেডরুমের ওয়ার্ডরোবে আর বাথরুমে গুছিয়ে রেখেছি।'

নিউ মার্কেটের নাম শুনেছে সবিতা কিন্তু এয়ার-কন্ডিশনড মার্কেট সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা নেই। মহিলাটি হিরণ্ময়ের নামটা কাটছাঁট করে যে হিরণ বললেন তাতে স্পষ্ট দু'জনের মধ্যে গভীর, ঘনিষ্ঠ কোনো সম্পর্ক রয়েছে। মায়া জানিয়েছে হিরণ্ময় আর বিয়ে করেননি। তা হলে তাঁর সঙ্গে মহিলার সম্পর্কটা ঠিক কী? স্ত্রী নয়, তবে কি বান্ধবী কিংবা অন্য কিছু যা নির্ণয় করা এই মুহূর্তে সবিতার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। একজন এসে মাঝে মাঝে এ বাড়িতে থাকে, রহস্যময় ভঙ্গিতে এই খবরটা দিতে দিতে আচমকা থেকে গিয়েছিল মায়া। সে কি মনীষার কথাই বলেছিল? জিজ্ঞেস করেও উত্তর পাওয়া যায় নি।

নীনা বা মনীষা নামের এই মহিলাটির সমান্তরাল একটা জায়গায় নিজের অজান্তে মাকে দাঁড় করিয়ে দেয় সবিতা। তার মা-ও একদা ছিল যথেষ্ট সুন্দরী কিন্তু মনীষার পাশে কিছুই না। এই আকস্মিক তুলনাটা হঠাৎ কেন মাথায় এল সবিতার কাছে তার কোনো পরিষ্কার ব্যাখ্যা নেই।

মনীষা ফের বললেন, 'জিনিসগুলো তোমার পছন্দ হয়েছে তো?'

যে মহিলার সঙ্গে এ বাড়ির সম্পর্কটা এখনও পর্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে আছে, তিনি কেন মার্কেটে ঘুরে তার জন্য সময় অপচয় করলেন, কে জানে। সবিতা বলল, 'আমার জন্যে আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে। এর দরকার ছিল না।'

'নিশ্চয় ছিল।'

'মানে?'

'তুমি প্রথম এ বাড়িতে এলে। তোমার যাতে কোনোরকম অসুবিধা না হয় সেটা তো দেখা উচিত।'

অর্থাৎ হিরন্ময় যে আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বলেছিলেন, মনীষাও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাই বললেন। সবিতা উত্তর দিল না।

মনীষা এবার বলেন,' তোমার টেস্ট আমি ঠিক জানি না। আন্দাজে আন্দাজে সব কিনেছি। কোনোটা অপছন্দ হলে বলো, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে চেঞ্জ করে আনব।'

সবিতা এবারও চুপ।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন মনীষা। হিরন্ময়কে বললেন, 'আমি যাচ্ছি।'

হিরণ্ময় বললেন, 'এখনই যাবে।'

ভ্রূ সামান্য কুঁচকে গেল মনীষার। চোখের কোণ দিয়ে হিরণ্ময়কে বিদ্ধ করতে করতে চাপা গলায় বললেন, 'আমারও তো বাড়ি-টাড়ি আছে।'

'ঠিক আছে।'

যে উত্তরটা হিরণ্ময় দিতে যাচ্ছিলেন সেটা দিলেন না। শুধু বললেন, 'আবার কবে আসবে?'

'তোমাকে ফোন করে জানাব।'

'ঠিক আছে।'

'তোমার মারুতি এসটিমটা নিয়ে যাচ্ছি।'

'বলার কী আছে। নিয়ে যাও।'

মনীষা সবিতার দিকে তাকালেন। বললেন, 'তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।' তিনি আর দাঁড়ালেন না, সিঁড়ির দিকে চলে গেলেন।

মনীষা চলে যাবার পর সবিতা জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে আর কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়লেন হিরণ্ময়।

সবিতার কেন যেন মনে হয়েছিল হিরণ্ময় মনীষা সম্পর্কে হয়তো বলবেন। ভেতরে ভেতরে সে

উৎসুক হয়ে ছিল। কিন্তু তিনি ধার দিয়েও গেলেন না। বললেন, 'এখানে তোমার সঙ্কোচের কারণ নেই। ফিল ফ্রি। মায়াকে বলে দেব, কাজের লোকেদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবে। মায়াই এক্সক্লুসিভলি তোমার সব কাজ করবে। অন্য কাউকে দরকার হলে ডেকে নিও। আর—'

'আর কী?'

'তোমার জন্যে একটা গাড়ি আর শোফার থাকবে। কোথাও বেরুতে হলে শোফার তোমাকে নিয়ে যাবে।'

লোকটা কি অঢেল আরামের ব্যবস্থা করে তার সমস্ত আক্রোশের ঝাঁঝ নষ্ট করে দিতে চাইছে? তাকে বশীভূত করার এটা কি হিরণ্ময়ের সুচতুর পরিকল্পনা? সবিতা বলল, 'এভাবে গাড়িতে কখনও চড়িনি। বাইরে বেরুলে ট্রাম বাসই তো আছে।'

'আমার অনেকগুলো গাড়ি। একটা না হয় তোমার জন্যে আলাদা করে রেখেই দিলাম। কখনও যদি ইচ্ছে হয় চড়ো।'

হিরণ্ময় যেন স্থিরই করে রেখেছেন, সবিতার কোনো আপত্তি বা অনিচ্ছা কানে তুলবেন না। সুদূরপ্রসারী এক ছক কষে তিনি বুঝিবা এগোচ্ছেন। ইহ জগতের যাবতীয় সুখের বস্তুগুলি চারদিবে মজুদ করে হয়তো মজাই পাচ্ছেন। ভাবছেন, 'না না' বলতে বলতে একদিন বাধা দেবার ইচ্ছাটাই আর থাকবে না সবিতার। ধীরে ধীরে আরাম আর প্রাচুর্যের মধ্যে সে ডুবে যাবে। যে অপার বিতৃষ্ণা আর আক্রোশ নিয়ে সে কলকাতায় পা দিয়েছে তার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না।

সবিতা পলকহীন হিরণ্ময়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাঁর কথার জবাব দেয় না।

হিরণ্ময় উত্তরের জন্য অপেক্ষা করেন না। বলেন, 'তোমার পড়াশোনার খবর ঠিকমতো নেওয়া হয়নি।'

সবিতা জিজ্ঞেস করল, 'কী জানতে চান বলুন?'

'কোন সাবজেক্টে তোমার অনার্স?'

'হিস্ট্রি।'

'তুমি যদি চাও একজন টিচারের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। ইউনিভার্সিটির রিটায়ার্ড প্রফেসর। খুব ভাল পড়ান।'

সবিতা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'পরে ভেবে আপনাকে জানাব।'

হিরণ্ময় এক পলক সবিতাকে লক্ষ করে বললেন, 'বেশ।' একটু থেমে জানতে চাইলেন, 'তোমার বইটই সব নিয়ে এসেছ তো?'

'না। অল্প দু-একটা এনেছি। বাকিগুলো অনুরাধা মাসির কাছে রয়েছে।'

'সেগুলো আনার কী হবে? আমি কি কাউকে পাঠাব?'

'না। অনুরাধা মাসিকে বলা আছে, আমার চিঠি পেলে পাঠিয়ে দেবে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর হিরণ্ময় বললেন, ' তোমাকে একটা কথা জানানো দরকার। নানা কাজে আমাকে সারাদিন ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হয়। কখন বাড়ি থেকে বেরুব, কখন ফিরব, ঠিক থাকে না। একসঙ্গে বসে ক'দিন লাঞ্চ বা ডিনার করতে পারব জানি না। তুমি তোমার সময়মতো খেয়ে নিও; আমার জন্যে ওয়েট করো না।'

সবিতা বলল, 'আচ্ছা—'

হিরণ্ময় বললেন, 'সারা রাত ট্রেন জার্নি করে এসেছ। এখন খেয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও। আমি পরে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

সবিতা ভেতরে ভেতরে সামান্য থতিয়ে গেল। কী ইঙ্গিত দিলেন হিরণ্ময়? এই যোগাযোগ করার মানেটা কী? তিনি না চাইলে কি তাঁর সঙ্গে দেখা করা যাবে না? কোনো প্রশ্ন না করে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় সে।

তিন

হিরণ্ময়ের কাছে আসার সময় মায়া সঙ্গে ছিল। এখন একা একাই নিচে নামতে লাগল সবিতা। কিছুটা অবসাদ বোধ করছিল সে। ছেলেবেলা থেকে হিরণ্ময়ের জন্য কত মারণাস্ত্র নিজের মধ্যে জড়ো করে রেখেছে তার ঠিক নেই। সব সময় একটা চিন্তাই তার মাথায় অদৃশ্য বিষপোকার মতো কামড় দিয়ে আসছে। দেখা হওয়া মাত্র লোকটাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। কিন্তু এক ঘন্টারও বেশি সময় হিরণ্ময়ের মুখোমুখি বসে কাটিয়ে এল, অথচ একটা আঘাতও সেভাবে হানতে পারল না।

দোতলায় নেমে দেখা গেল, সিঁড়ির মুখে মায়া দাঁড়িয়ে আছে। কী মনে হতে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ?'

মায়া বলল, 'হ্যাঁ।'

'কতক্ষণ?'

'আপনাকে সাহেবের কাছে দিয়ে এলাম, সেই ত্যাখন থেকে।'

কালো ছায়ার মতো একটা সন্দেহ সবিতার মস্তিষ্কে উঁকি দেয়। মায়া কি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে তাদের কথা শুনছিল? অবশ্য চোদ্দ পনের ফুট নিচে থেকে তেতলার কথোপকথন শোনা যায় কিনা, সবিতা সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয়।

মায়া বলল, 'আসুন—'

তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে এসে বিছানায় বসল সবিতা।

মায়া সহবত জানে। তার গণ্ডি কতদূর পর্যন্ত টানা, সারাক্ষণ সেটা মনে রাখে। সে বিছানায় নয়, মেঝেতে থেবড়ে বসে পড়ল। একটা চোখ সামান্য ছোট করে আড়ে আড়ে কিছুক্ষণ সবিতাকে লক্ষ করল। তারপর বলল, 'সাহেবের সঙ্গে অনেকক্ষণ ছিলেন, অনেক কথা হল—তাই না?'

সবিতা স্থির দৃষ্টিতে মায়ার দিকে তাকায়। খুব শান্ত গলায় বলে, 'তুমি তো সব শুনেছ।'

জিভ কেটে, মাথা ঝাঁকিয়ে, সচকিত মায়া বলে, 'বিশ্বাস করুন দিদি, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখেন থেকে অত উঁচুর কথা শোনা যায় না। আমি কাজের লোক, মুনিবদের কথা কি শুনতে আচে!'

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কিছু শুনে থাকলেও মায়া স্বীকার করবে না। তার চোখ থেকে চোখ সরায়নি সবিতা। আচমকা জিজ্ঞেস করল, 'ওই মহিলাটি কে?'

সারা শরীরে যেন তীব্র ঝাঁকুনি খেল মায়া। বলল, 'কার কথা বলচেন দিদি?'

সবিতার মুখ শক্ত হয়ে ওঠে, 'তুমি সেটা ভাল করেই জানো।' একটু থেমে ফের বলল, 'তেতলা থেকে তোমার সামনে দিয়েই তো উনি নেমে গেছেন।'

মায়া চোখ নামিয়ে নিল, উত্তর দিল না।

সবিতা জিজ্ঞেস করল, 'তখন বলেছিলে, একজন এ বাড়িতে এসে মাঝে মাঝে থাকে। এই মহিলাই কি?'

মায়া এবারও চুপ।

সবিতা কিন্তু তাকে এত সহজে রেহাই দিল না। খাটের ধারের দিকে খানিকটা এগিয়ে এসে বলল, 'মহিলার সঙ্গে এ বাড়ির সম্পর্ক কী?'

জাঁতাকলে-পড়া ইঁদুরের মতো ছটফট করতে করতে মায়া বলল, 'আমি কিচ্চু জানি না দিদি।'

মেয়েমানুষটা যে অত্যন্ত ধড়িবাজ তা আগেই কিছুটা আঁচ করেছে সবিতা। এক বাড়িতে বছরের পর বছর আছে, অথচ সে কিছুই জানে না, এ কখনও হতে পারে? মায়া যখন অস্বীকার করছে তখন আর চাপ দেবে না সবিতা। বলল, 'আমার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই। এ বাড়িতে যদি শেষ পর্যন্ত থাকি, সম্পর্কটা ঠিক বার করে ফেলব।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর মায়া বলল, 'ত্যাখন আপনার ঘুমটা ভাঙিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলাম। আরেট্টু শুয়ে নেবেন?'

সবিতা বলল, 'দেখি কী করি—'

'দুকুরে কখন খান?'

'কলেজ থাকলে দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে খেতাম। অন্যদিন একটা দেড়টায়।'

মায়া জানাল, এ বাড়ির প্রত্যেক তলায় খাবার ঘর আছে। সে একটা নাগাদ সবিতার জন্য ভাত নিয়ে আসবে।

সবিতা বলল, 'এই তো খানিকক্ষণ আগে অতগুলো টোস্ট আর ডিম টিম খেয়েছি। খিদে নেই। দুপুরে কিছু খাব না।'

মায়া এবার বেশ আন্তরিক সুরে বলল, 'ভাত না খেলে শরীল খারাপ হবে।'

'খেলেই খারাপ হবে।'

'অল্প করে দু-চার গেরাস—'

একটু কড়া গলায় সবিতা বলল,' তুমি এখন যেতে পার।'

রীতিমতো অবাক হল মায়া, 'সে কী, কোথায় যাব! সব্বোক্ষণ সাহেব আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে বলেচেন।'

হিরণ্ময় কি গুপ্তচর হিসেবে এই মেয়েমানুষটাকে তার পেছনে লাগিয়েছেন? সবিতা চমকে ওঠে, 'সবসময় সঙ্গে সঙ্গে থাকবে কেন?'

'আপনার কখন কী দরকার হয়—'

'আমার দরকার খুব কম।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে পড়ল মায়া। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'আমি বাইরের হল ঘরটায় থাকব। এট্টুখানির জন্যি একবার শুদু নিচে খেতে যাব। ধরেন দশ পনের মিনিট। এছাড়া য্যাখনই ডাকবেন চলে আসব।'

মায়া চলে যাবার পর প্রথম জরুরি কাজটা সেরে ফেলল সবিতা। সুটকেস থেকে কাগজ কলম আর খাম বার করে অনুরাধাকে চিঠি লিখল।

অনুরাধা ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। সবিতার চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর দুশ্চিন্তা কাটবে না। কলকাতায় আসার পর থেকে যা যা ঘটেছে সব সংক্ষেপে জানিয়ে তার বইপত্র এবং অনার্স ক্লাসের নোটগুলো কুরিয়ারে পাঠিয়ে দিতে লিখেছে সে। চিঠিটা খামে পুরে অনুরাধার ঠিকানা লিখে পড়ার টেবলে রেখে দিল। পরে মায়াকে বলবে, কাউকে দিয়ে যেন ওটা লেটার বক্সে ফেলার ব্যবস্থা করে।

ঘরে কেউ নেই, সারা শরীরে অসীম ক্লান্তি, শুয়ে পড়লেই দু চোখ জুড়ে আসবে। তবু ঘুমোতে পারল না সবিতা। চিঠি লিখে চুপচাপ বিছানায় বসে সামনের জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল। দূরে মহাশূন্যে ডানা মেলে অজস্র পাখি ভেসে বেড়াচ্ছে। গাঢ় নীল আকাশে সাদা মেঘের যে স্তূপগুলো কিছুক্ষণ আগেও অনড় দাঁড়িয়ে ছিল, এলোমেলো বাতাস সেগুলোকে ঠেলে ঠেলে এখন নানাদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ ছাড়া বাকি সব কিছুই স্থির, নিঃশব্দ। শরতের দুপুর আশ্চর্য এক ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আছে যেন।

বাইরের দৃশ্যাবলী এই মুহূর্তে সেভাবে লক্ষ করছিল না সবিতা। এলোপাথাড়ি নানা চিন্তা কত দিক থেকে যে অদৃশ্য দরজা জানালা দিয়ে তার মস্তিষ্কে ঢুকে যাচ্ছে!

এই যে অনেকটা সময় হিরণ্ময়ের সঙ্গে তেতলায় কাটিয়ে এল, এমন সাক্ষাৎকার আগে কোনো মেয়ের সঙ্গে তার বাবার আদৌ ঘটেছে কিনা, সবিতার জানা নেই। পাশাপাশি অন্য কথাও মনে পড়ছে।

দাম্পত্য জীবনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তার জন্ম। জীবনের প্রথম কয়েকটা বছর মায়ের সঙ্গে সে কাটিয়েছে আসানগঞ্জে, মামাবাড়িতে। সেখানে সারাক্ষণ তুমুল চিৎকার, ঝগড়াঝাঁটি আর তীব্র উত্তেজনা। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত সময়টা কাটত দুঃসহ গ্লানির মধ্যে।

দুই মামা অমলেন্দু আর বিমলেন্দু, তাদের স্ত্রীরা মণিকা এবং প্রমীলা আর ওদের ছেলেমেয়েরা একেবারেই চাইত না সবিতারা ওখানে থাক। সর্বক্ষণ মামারা ওদের দিকে বন্দুক তাক করে রাখত। বাড়ির আবহাওয়ায় তখন বারুদ উড়ছে, কথায় কথায় শুধুই বিস্ফোরণ।

সবিতার মা শোভনা কিন্তু মুখ বুজে, মাথা ঝুঁকিয়ে কিছুই মেনে নিত না। সে একাই ছিল আস্ত একটি বাহিনী, 'ওয়ান ওম্যান আর্মি।' ভাই, ভাইদের স্ত্রী এবং ভাইপো ভাইঝিদের সঙ্গে মরণপণ লড়াই

চালিয়ে যেত। শোভনা তাদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিল, ভাইদের মতোই ও বাড়িতে থাকার পুরোমাত্রায় তার অধিকার আছে। কিন্তু যুদ্ধ চালিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত এত শত্রুতার মধ্যে টিকে থাকা হয়তো সম্ভব হত না, যদি না সবিতার দাদামশাই রাজশেখর তাদের পাশে দাঁড়াতেন। দিদিমা অনেক আগেই মারা গেছেন, নিজের গর্ভজাত সন্তানদের কুৎসিত কামড়াকামড়ি তাঁকে দেখে যেতে হয়নি। রাজশেখর যতদিন বেঁচে ছিলেন, সবিতাদের আগলে রেখেছেন।

মনে আছে, সেই সুদূর ছেলেবেলায় মামা-মামীদের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়ার সময় প্রায়ই হিরণ্ময় লাহিড়ির নাম শোনা যেত। সবিতা জানত, ওই লোকটাই তার বাবা। তার নামের সঙ্গে হিরণ্ময়ের পদবি সে জন্মের পর থেকে বয়ে নিয়ে চলেছে।

একটু বড় হবার পর মা একদিন তাদের ঘরের দরজা বন্ধ করে সবিতাকে বলেছিল, 'তোর বয়েস এখনও অনেক কম। তবু কয়েকটা কথা তোকে না বললেই নয়। সব জানা থাকলে ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে আস্তে আস্তে তৈরি করে নিতে পারবি।' সে দিগ্‌নির্ণয় যন্ত্রের মতো হিরণ্ময়ের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে আরো বলেছে, মামাবাড়িতে উঠতে বসতে এত যে লাঞ্ছনা আর অপমান, এই যে কদর্য জীবনযাপন—এ সবের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ওই লোকটি।

শোভনা থামেনি, 'তোর নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে, লোকটা আমার জীবনে এল কী করে?'

উত্তর না দিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল সবিতা।

শোভনা ঘোরের মধ্যে যেন বলে যাচ্ছিল। তার শ্রোতাটি একটি বালিকা মাত্র। সে কতটা বুঝতে পারবে, সেদিকে লক্ষ্য ছিল না শোভনার। মেয়েকে সামনে বসিয়ে নিজের সঙ্গেই যেন কথা বলছিল সে।

ঠিক মনে পড়ে না, শোভনা একদিনেই তার জীবনকাহিনী পুরোটা শুনিয়েছিল কিনা। এমনও হতে পারে শুরুটা সেদিনই করেছিল। তারপর টুকুরো টুকরো ভাবে অনেকদিন ধরে বলে গেছে। তার সঙ্গে কল্পনার কিছু খাদ মিলিয়ে যে মিশ্রণটি সবিতা মনের ভেতর তৈরি করে নিয়েছে তা এইরকম।

আসানগঞ্জ এমন একটা শহর যার চারদিকে প্রচুর চা বাগান। আর আছে চমৎকার এক পাহাড়ি নদী যেটা দিনরাত অর্কেস্ট্রা বাজিয়ে যায়। নদীর ওধারে বিশাল জঙ্গল। সেখানে রয়েছে অজস্র হরিণ, নানা জাতের পাখি, দাঁতাল শুয়োর। মাঝে মাঝে দু-চারটে চিতা অন্য জঙ্গল থেকে ছিটকে চলে আসে। শীতে দিগন্ত পাড়ি দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আসে পরিযায়ী পাখিরা। নভেম্বরের শেষাশেষি এসে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত বনভূমি আর নদীতে নানা রঙের ফোয়ারা ছুটিয়ে তারা ফিরে যায়।

আসানগঞ্জ হল আসাম আর উত্তর বাংলায় যাবার গেটওয়ে। আগে ছিল বেশ শান্ত আর নিরিবিলি। গত কুড়ি বাইশ বছরে হু হু করে লোক বেড়েছে। জায়গাটা এখন জমকাল, গমগমে শহর।

সবিতার মামাবাড়িটা আসানগঞ্জের দক্ষিণ দিকে। রাজশেখররা ওখানে চার প্রজন্ম ধরে আছেন। চব্বিশ বছর আগে ওই অঞ্চলটা ছিল বেশ নির্জন, মানুষজন কম, ফাঁকা জায়গা বেশি। জলের দরে এক বিঘে জায়গা কিনে চারপাশে অনেকটা করে ছাড় দিয়ে মাঝখানে বার কামরার দোতলা বাড়িটা করিয়েছিলেন রাজশেখরের ঠাকুরদা বিধুশেখর ভাদুড়ি।

তখন ইংরেজ রাজত্ব। বিধুশেখর এখানকার 'গোল্ডেন একর টি গার্ডেন্স'—এ কাজ করতেন। চা-বাগানটার মালিক ছিলেন খাস ব্রিটিশ—মাইকেল গর্ডন। রিটায়ারমেন্টের আগেই গর্ডন সাহেবকে ধরে একমাত্র ছেলে নির্মলশেখরকে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। নির্মলশেখরেরও একটি ছেলে—রাজশেখর। তিনিও একই পদ্ধতিতে বাপ-ঠাকুরদার কোম্পানিতে ঢুকেছিলেন।

চা বাগানের চাকরি যেন এই বংশের ভবিতব্য। পারিবারিক পরম্পরা বজায় রেখে রাজশেখরের পর তাঁর বড় ছেলে অমলেন্দু 'গোল্ডেন একর টি গার্ডেনস'-এর ভাল পোস্ট পেয়ে গেল। ততদিনে অবশ্য দেশ স্বাধীন হয়েছে। 'গোল্ডেন একর টি গার্ডেনস'-এর মালিকানাও বদলে গেছে। গর্ডন সাহেব আগেই মারা গিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে অ্যালেক গর্ডন এক গুজরাতি বিজনেসম্যানের কাছে বাগান বেচে লন্ডনে চলে গেলেন।

রাজশেখরের ছোট ছেলে বিমলেন্দু অবশ্য পারিবারিক ট্র্যাডিশন ভেঙে সরকারি চাকরি নিয়েছে। সে সমাজকল্যাণ দপ্তরের একজন মাঝারি অফিসার।

তখনও রাজশেখরের স্ত্রী মহামায়া বেঁচে আছেন। ছেলেদের বিয়ে হয়ে গেছে। ভাইবোনদের মধ্যে সবার ছোট শোভনা সেই সময় বি. এ ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী। দারুণ টগবগে, তেমনি প্রাণবন্ত আর হাসিখুশি এবং সুন্দরী। শোভনার মধ্যে একটা অফুরন্ত জলপ্রপাত যেন ছিল। অনর্গল কলকল করে কথা বলত আর ঝংকার তুলে হাসত। দুই ছেলে, দুই বৌমা আর শোভনাকে নিয়ে রাজশেখর এবং মহামায়ার তখন সোনার সংসার।

বি. এ ফাইনালের টেস্ট সবে শেষ হয়েছে, সেই সময় একদিন নদীর ধারে বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করতে গিয়েছিল শোভনা। সেখানে হিরণ্ময়ের সঙ্গে তার পরিচয়। জানা গেল, সুদর্শন স্মার্ট ঝকঝকে এই যুবকটি দু'জন সঙ্গী বন্দুক এবং প্রচুর কার্তুজ নিয়ে কলকাতা থেকে আসানগঞ্জের ওধারের সেই জঙ্গলে শিকার করতে এসেছে। তার সবচেয়ে বড় 'হবি' নাকি মৃগয়া—বিগ গেম।

তখন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণওলারা বা পরিবেশবাদীরা আজকের মতো এমন মাতামাতি শুরু করেনি। কিছু হইচই হচ্ছে ঠিকই, তবু সব কেমন ঢিলেঢালা। বাঘটাঘ মারলে কেউ দশটা মামলা ঠোকে না বা শিকারির গর্দান নেবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে না।

শোভনা বলেছিল, 'আমাদের জঙ্গলে বড় শিকার তো পাবেন না। ভাগ্যে থাকলে দু-একটা চিতার দেখা পেলেও পেতে পারেন। তবে সেটা আনসার্টেন।' একটু ভেবে বলেছে, 'তবে এ সময় অনেক পাখি পাবেন। হরিণ তো পাবেনই।'

শোভনার বন্ধুরা তার কথায় সায় দিয়েছিল।

হেসে হেসে হিরণ্ময় বলেছেন, 'বাঘটাঘ না পাওয়া গেলে আর কী করা যাবে! পাখি আর হরিণদের বিরুদ্ধেই অভিযানটা চালাব।'

কথায় কথায় জানা গিয়েছিল, হিরণ্ময় তার বন্ধুদের নিয়ে শহরের এক প্রান্তে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের রেস্ট হাউসে উঠেছেন। শোভনা প্রথম আলাপেই তাদের বাড়ির ঠিকানা তাকে দেয়নি। হিরণ্ময়ও তা জানতে চাননি। তবে পরস্পরকে তাদের যে ভাল লেগেছে দু'জনেই ভেতরে ভেতরে তা টের পাচ্ছিল।

যৌবন এমন একটা ম্যাজিক যা দুটি তরুণ তরুণীকে পরস্পরের অনেক কাছাকাছি নিয়ে আসে। শোভনাদের বেলাতেও হুবহু তাই ঘটেছে।

আসানগঞ্জ তো কলকাতা বা বোম্বাইয়ের মতো মেট্রোপলিস নয় যে শহরের বিশাল আর লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে তারা হারিয়ে যাবে, কেউ কাউকে খুঁজে পাবে না। ছোট টাউনের রাস্তায় বেরুলে প্রায়ই তাদের দেখা হয়ে যেত। গোড়ার দিতে চলমান জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু-একটা কথা, চকিত হাসির ঝলক,'আবার দেখা হবে' জাতীয় মধুর প্রতিশ্রুতি। তারপর যত ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল, আগে থেকে সময় ঠিক করে, লোকজনের হাজার জোড়া চোখের আড়ালে তারা চলে যেত পাহাড়ি নদীর ধারে, কিংবা অবিরাম বয়ে-যাওয়া প্রপাতের পাশে বা নিরিবিলি কোনো পার্কে।

এরপরের ইতিহাস খুবই মামুলি—বহুকালের পুরোনো, অথচ চিরনতুন। শোভনাদেব আগে এই ভূপৃষ্ঠে অসংখ্য যুবক যুবতী যে পদ্ধতিতে প্রেম করেছে, পরস্পরকে ভালবেসেছে, তারাও ঠিক তাই তাই করেছে। ওরা সেকেলে প্রেমিক প্রেমিকাদের একালীন জেরক্স কপি।

শোভনা তার সেই বাইশ বছর বয়সে ছিল ভীষণ আবেগপ্রবণ, বড় বেশি ঝোঁকের বশে চলত। তার মাথার ভেতরটা ছিল রঙিন বাষ্পে-ভরা। পৃথিবীর কঠিন মৃত্তিকা থেকে অনেক উঁচুতে দুই অদৃশ্য ডানায়, স্বপ্নের ঘোরে উড়ে বেড়াতে তার ভাল লাগত। হঠাৎ আসানগঞ্জের মতো একটা শান্ত, ম্যাড়মেড়ে শহরে এসে হিরণ্ময় তাকে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। বলা যায়, ভাসার জন্য শোভনা যেন উন্মুখ হয়েই ছিল।

নির্জনে দেখাসাক্ষাৎ, উতরোল প্রেম—সমস্ত কিছুই উল্কাগতিতে একটা অনিবার্য পরিণতির দিকে তখন ছুটছে। আলাপ হওয়ার পর দু'টি সপ্তাহও কাটেনি, একদিন হিরণ্ময় শোভনাদের বাড়ি এসে হাজির। আগেই শোভনার কাছ থেকে ঠিকানা জেনে নিয়েছিলেন।

সেটা ছুটির দিন। বাড়িতে সবাই ছিল। বিকেলে রাজশেখর অমলেন্দু বিমলেন্দু মহামায়া শোভনা মণিকা প্রমীলা সামনের চওড়া বারান্দায় বসে চা খাচ্ছে।

অন্য দিনগুলোতে হয়ে ওঠে না। অমলেন্দু আর বিমলেন্দুর ছেলেমেয়েরা সকাল সাড়ে সাতটার ভেতর স্কুলে চলে যায়। শোভনার কলেজ এগারটায়। অমলেন্দু আর রাজশেখরের অফিস ন'টায়, বিমলেন্দুর দশটায়। ঘড়ি ধরে যে যার মতো খেয়ে আলাদা আলাদা সময়ে তারা বেরোয়, ফেরেও আগে পরে। কিন্তু রবিবারে কারো বেরুবার তাড়া নেই। সেদিন ব্রেকফাস্ট থেকে রাতের খাওয়া, সমস্ত কিছুই একসঙ্গে। শোভনাদের বাড়িতে এটা ছিল বাধ্যতামূলক। সারাটা দিন ফুরফুরে আড্ডার মেজাজে কেটে যেত। সপ্তাহের শেষ দিনে এই পারিবারিক মিলনমেলার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত।

হঠাৎ একটি অভিজাত চেহারার যুবককে —যার পরনে দামি সাফারি স্যুট, চোখেমুখে সপ্রতিভতা— বাড়িতে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন রাজশেখররা। শোভনাও দারুণ হকচকিয়ে গেছে। ঠিকানা নেবার চব্বিশ ঘন্টার ভেতর যে হিরণ্ময় হুট করে এসে পড়বে, সে ভাবতে পারেনি।

হিরণ্ময় বারান্দার কাছাকাছি এসে হাতজোড় করে বিনীত ভঙ্গিতে নিজের নাম জানিয়ে বলেছিলেন,'আগে খবর না দিয়ে হঠাৎ চলে এসে আপনাদের হয়তো খুব অসুবিধায় ফেলে দিলাম।'

প্রাথমিক বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে রাজশেখর বলেছেন, 'না না অসুবিধা কিসের? আসুন—'

হিরন্ময় বলেছেন, 'দয়া করে আমাকে আপনি বলবেন না।'

রাজশেখর মৃদু হেসে বলেছেন, 'ঠিক আছে। এস—'

নিচের বাঁধানো চাতাল থেকে আটটা সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠে এসেছিলেন হিরণ্ময়। তাঁকে ডান পাশের ড্রইংরুমে নিয়ে বসিয়েছিলেন রাজশেখর। অমলেন্দু আর বিমলেন্দুও তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে এসেছিল। বাড়ির মেয়েরা অবশ্য কেউ আসেনি। বারান্দায় বসেই খোলা দরজা দিয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে আগন্তুকটিকে লক্ষ করছিল। অমলেন্দু আর বিমলেন্দুর ছেলেমেয়েরা উঠে গিয়ে বাইরের ঘরের জানালায় উঁকিঝুঁকি মারছিল। হিরণ্ময় সম্পর্কে তাদেরও অপার কৌতূহল।

রাজশেখর হিরণ্ময়ের মুখোমুখি একটা সোফায় বসেছিলেন। অমলেন্দু আর বিমলেন্দু বসেনি, একটু দূরে দাঁড়িয়ে হিরণ্ময়ের দিকে তাকিয়ে ছিল।

রাজশেখর বলেছেন, 'তোমাকে আগে কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না। আমরা চার জেনারেশন আসানগঞ্জে আছি। এখানকার বাসিন্দাদের প্রায় সবাইকে চিনি। তুমি কি নতুন এসেছ?'

হাসিমুখে হিরণ্ময় বলেছেন, 'আমি নতুনই। তবে এই শহরে থাকতে আসিনি। আমাদের বাড়ি কলকাতায়। দুই বন্ধুকে নিয়ে নর্থ বেঙ্গলে বেড়াতে এসেছিলাম। আমার 'হবি' হল শিকার। জলপাইগুড়িতে শুনলাম, আপনাদের এখানকার জঙ্গলে বাঘ টাঘ পাওয়া যায়। শোনামাত্র চলে এলাম। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের রেস্ট হাউসে আছি।'

কিছুই বোধগম্য হচ্ছিল না। বাইরে থেকে যে কেউ এ শহরে আসতেই পারে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের রেস্ট হাউসে ক'দিন কাটিয়েও যেতে পারে, কিন্তু এ বাড়িতে আচমকা সে হাজির হবে কেন? মধ্যবিত্ত পরিবারের পুরনো, সাদামাঠা বাড়িটা এমন কোনো দ্রষ্টব্য স্থান নয় যে এখানে না এলে আসানগঞ্জ ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

রাজশেখর সামান্য ইতস্তত করে বলেছেন, 'ও, আচ্ছা। কিন্তু আমাদের এখানে—'

তাঁর কথার যে অংশটা অনুচ্চারিত থেকে গেছে তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি হিরণ্ময়ের। তিনি বলেছেন, 'সব বলব। তার আগে আমার নিজের সম্বন্ধে আপনাদের জানানো দরকার।'

হঠাৎ এসে হিরণ্ময় এমন চমক দিয়েছিলেন যে তার ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারেননি রাজশেখর। বলেছেন, 'তা—তা বেশ।' পরক্ষণে তাঁর মনে হয়েছে বাড়িতে যখন ছেলেটি এসেই পড়েছে তখন আতিথেয়তায় ত্রুটি রাখা উচিত নয়। অমলেন্দুকে চায়ের ব্যবস্থা করতে বলে তিনি ফের হিরণ্ময়ের দিকে তাকিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, বল—'

হিরণ্ময়েরা ট্র্যাডিশনাল বড়লোক। নানা ধরনের ব্যবসা আছে তাঁদের, যার মধ্যে স্টিভেডরিটাই আসল। শুধু কলকাতা পোর্টেই না, তাঁদের কোম্পানি মাদ্রাজ ভাইজাগ এবং কোচিনেও জাহাজে মাল বোঝাই এবং খালাস করে থাকে। তা ছাড়া কয়েক বছর হল ইন্ডাস্ট্রিতেও হাত দিয়েছেন। রিষড়ায় পেপার মিল, ব্যারাকপুরে ওষুধের কারখানা এবং পানিহাটিতে কাগজের ফ্যাক্টরি বসিয়েছেন তাঁরা।

ফরেন কোলাবরেশনে আরো বড় কিছু করার পরিকল্পনা আছে।

হিরণ্ময়ের মা নেই, অন্য ভাইবোনও না, তিনিই একমাত্র সন্তান। বাবা সতীন্দ্রনাথ লাহিড়ির অফুরন্ত কর্মশক্তি আর সংগঠনের ক্ষমতা। কলকারখানা এবং বিশাল ব্যবসাবাণিজ্য মসৃণভাবে চালানোর জন্য একটা অত্যন্ত সুদক্ষ প্রফেশনাল টিম তিনি তৈরি করেছিলেন। তারাই সমস্ত কিছু চালাত। সবার মাথার ওপর ছিলেন সতীন্দ্রনাথ। কাজটা তাঁর কাছে তীব্র প্যাসনের মতো। প্লেনের গোছা গোছা ওপেন টিকিট কাটা থাকত। মাসে দশ দিনের বেশি কলকাতায় থাকা হত না। অনেকগুলো কোম্পানির স্বার্থে আজ দিল্লি, কাল মাদ্রাজ, পরশু বম্বে—এই করে বেড়াতেন। ভূপৃষ্ঠের তুলনায় মহাকাশেই বেশির ভাগ সময় কেটে যেত তাঁর।

হিরণ্ময় বছর চারেক আগে গ্রাজুয়েশনের পর বিদেশ থেকে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনের কোর্স করে ফিরে এসেছেন। সতীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছেলে বড় দায়িত্ব নিয়ে তাঁর বিরাট বিজনেস এম্পায়ারের কাজকর্ম বুঝে নিতে শুরু করুক। হিরণ্ময় কিন্তু এখনই পায়ে শেকল পরতে রাজি নন। ছিন্নবাধা হয়ে আরো কিছু কাল তিনি উড়তে চান। পারিবারিক বিজনেস আর ইন্ডাস্ট্রি তো রইলই, একদিন অনিবার্য নিয়মে সে সবের ভেতর ঢুকে পড়তে হবে আর একবার ঢুকলে বেরুবার রাস্তা নেই। তার আগে হালকা ফুরফুরে মেজাজে যতদিন সম্ভব স্বাধীনতা উপভোগ করা যাক।

একটি প্রভূত পয়সাওলা সফল বাঙালি পরিবারের খুঁটিনাটি তথ্য জেনে কী লাভ হবে ভেবে পাচ্ছিলেন না রাজশেখর। সব কিছু তাঁর গুলিয়ে যাচ্ছিল।

এর মধ্যে চা বিস্কুট এবং সন্দেশ এসে গেছে। রাজশেখর বলেছিলেন, 'খাও—'

শুধু চায়ের কাপটাই তুলে নিয়েছিলেন হিরণ্ময়। রাজশেখরের চোখের দিয়ে তাকিয়ে বলেছেন, 'আপনারা হয়তো ভাবছেন, আপনাদের বাড়ির ঠিকানা কোথায় পেলাম—'

'হ্যাঁ, তা—'

'শোভনা নিশ্চয়ই আপনার মেয়ে?'

এমন একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না রাজশেখর। একজন অচেনা বহিরাগত হঠাৎ এসে চমকে দিয়েছিল। তার চেয়ে অনেক বেশি চমক লাগল তার মুখে শোভনার নামটা শুনে। বিমূঢ়ের মতো তিনি বলেছেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি ওকে চিনলে কী করে?'

হিরণ্ময় বলেছেন, 'শোভনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। ওর কাছ থেকেই আপনাদের ঠিকানাটা পেয়েছিলাম।'

রাজশেখর উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে থেকেছেন।

হিরণ্ময় এবার বলেছেন, 'আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে গেলাম। আজ উঠছি। পরশু আবার আসব।'

রাজশেখর জিজ্ঞেস করেছেন, 'তুমি যে এলে, অবশ্যই কোনো উদ্দেশ্য ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা তো বললে না।'

'পরশু বলব।'

হিরণ্ময় চলে যাবার পর বাড়ির সবাই শোভনাকে চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরেছিল। কোথায়, কিভাবে হিরণ্ময়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, রাজশেখররা তা জানতে চেয়েছেন। কতটা ঘনিষ্ঠতা হলে একটি যুবক হুট করে বাড়ি চলে আসতে পারে, সে সম্বন্ধেও তাঁদের অনন্ত কৌতূহল ছিল। কিছুটা উদ্বেগও।

তখনও শোভনা আশ্চর্য রকমের সরল। তার মধ্যে বিন্দুমাত্র ঘোরপ্যাঁচ বা গোপনীয়তা ছিল না। অকপটে সে সব বলে গেছে।

কথামতো একদিন পর সন্ধেবেলায় ফের এসেছিলেন হিরণ্ময়। কোনোরকম ধানাই পানাই না করে স্পষ্ট করে বলেছেন, 'আপনাদের কাছে আমার একটা প্রোপোজাল আছে।'

রাজশেখর জিজ্ঞেস করেছেন, 'কী প্রোপোজাল?'

হিরণ্ময় বলেছেন, 'আমি শোভনাকে বিয়ে করতে চাই।'

সারা বাড়ি জুড়ে অপার স্তব্ধতা নেমে আসে। এমন চমকপ্রদ প্রস্তাব নিয়ে এ বাড়িতে আগে কেউ কখনও আসেনি। অনেকক্ষণ রাজশেখররা কথা বলতে ভুলে যান।

হিরণ্ময় ফের বলেছেন, 'আমার ধারণা, শোভনার এ বিয়েতে অমত নেই।'

বিস্ময়ের অতল স্তর ঠেলে একসময় নিজেকে টেনে তোলেন রাজশেখর। বলেন, 'কিন্তু—'

'কী?'

রাজশেখর জানিয়েছেন, হিরণ্ময়দের অগাধ টাকা, তাঁরা অভিজাত, আর রাজশেখররা নেহাতই সাধারণ মধ্যবিত্ত। পার্থক্যটা এতই বেশি যে এমন একটা প্রস্তাব প্রায় অলৌকিক মনে হয়।

হিরণ্ময় তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলেছেন, 'ওটা কোনো প্রবলেমই না। আপনাদের কনসেন্টটাই আসল।'

না, মাথা ঘুরে যায়নি রাজশেখরের। হিরণ্ময়ের প্রস্তাব তাঁকে মহাশূন্যে ভাসিয়ে নিতে পারেনি, পৃথিবীর কঠিন মাটিতে পা রেখে তিনি বলেছেন, 'তার চেয়ে অনেক বেশি ইমপর্টান্ট তোমার বাবার মতামত। আমাদের মতো গরিবের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে তিনি কি রাজি হবেন?'

এই প্রথম থমকে গিয়েছিলেন হিরণ্ময়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে দোলাতে বলেছেন, 'কিছুতেই না।'

রাজশেখর স্তম্ভিত। ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পুরো তিন মিনিট লেগেছে। তারপর বলেছেন, 'তা হলে?'

সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার একটা রাস্তা দেখিয়ে দেন হিরণ্ময়। তিনি বাবাকে কিছু না জানিয়ে এখান থেকে শোভনাকে বিয়ে করে কলকাতায় ফিরে যেতে চান। একবার বাড়িতে নিয়ে তুললে তাঁর বাবার আর কিছুই করার থাকবে না।

রাজশেখর বলেছেন, 'কিন্তু তোমার বাবা আমাদের সম্বন্ধে কী ভাববেন?'

'খুব খারাপ কিছু যাতে না ভাবেন সেটা আমি দেখব।' হিরণ্ময় বলেছেন, 'আই শ্যাল ফেস এভরিথিং।'

তবু দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না রাজশেখর। বলেছেন, 'কিন্তু তোমার সম্বন্ধে—' সবটা না বলে তিনি থেমে গেছেন।

হিরণ্ময় বলেছেন, 'কারেক্ট। আমার সম্বন্ধে আপনারা কিছুই জানেন না। আই অ্যাম আবসোলুটলি আননোন। নিজের সম্পর্কে যা যা বলেছি সেগুলো সত্যি কিনা সেটা আপনাদের যাচাই করে নেওয়া উচিত।'

ছেলেটা দুর্দান্ত থট-রিডার। ঠিক এই কথাগুলোই রাজশেখররা ভেবেছেন। তিনি উত্তর দেবার আগে হিরণ্ময় পকেট থেকে ছোট ভিজিটিং কার্ড এবং তাঁর পোস্টকার্ড সাইজের ফটো বার করে বলেছিলেন, 'আমার নাম ঠিকানা আর ছবি দিয়ে যাচ্ছি। কলকাতায় কাউকে পাঠিয়ে সব খবর নিন। আশা করি দশ দিনের ভেতর সব জানতে পারবেন। ইলেভেনথ ডে'তে আবার আমি আসব।'

অমলেন্দু আর বিমেলেন্দু এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। তাদের ভূমিকাটা ছিল নিতান্তই দর্শকের। অমলেন্দু গলা খাঁকরে এবার বলে উঠেছে, 'আমার কিছু বলার আছে।'

হিরণ্ময় তার দিকে তাকিয়েছেন, 'বলুন না—'

'একটা মিডল-ক্লাস ফ্যামিলির মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছেন কেন?' অমলেন্দু বলে যাচ্ছিল, 'আপনি তো ইচ্ছা করলে সোসাইটির অনেক উঁচু লেভেলের কোনো বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করতে পারেন।'

হেসে হেসে হিরণ্ময় বলেছেন, 'এরকম একটা প্রশ্ন মনে আসা খুবই স্বাভাবিক। তবে কাউকে ভাল লাগাটা সব সময় তো ঠিক অঙ্ক কষে, হিসেব করে হয় না। মন একটা আশ্চর্য মিস্টিরিয়াস ব্যাপার।'

সেদিন হিরণ্ময় চলে যাবার পর গোটা বাড়ি জুড়ে তুমুল আলোড়ন শুরু হয়েছিল। শোভনাদের পরিবার খুবই সাদামাঠা, ম্যাড়মেড়ে, বৈশিষ্ট্যহীন। ঢিমে তালে ছোট মাপের আশা আকাঙ্খা ঝগড়াঝাঁটি সুখদুঃখের ভেতর দিয়ে এখানে দিন কেটে যায়। কিন্তু হিরণ্ময়ের বিয়ের প্রস্তাব যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, এই বংশের দীর্ঘ ইতিহাসে তেমনটা আর কখনও ঘটেনি।

এই বিয়ের ব্যাপার নিয়ে গোটা বাড়ি স্পষ্ট দু ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। বিভাজন রেখার এক ধারে কয়েকজন, অন্য ধারে কয়েকজন। তারা দ্বিধাগ্রস্ত। অমলেন্দু এবং মহামায়ার এ বিয়েতে তেমন সায় ছিল না। অচেনা এক যুবক হঠাৎ এসে অলীক স্বপ্ন দেখাচ্ছে—সন্দেহ হওয়ারই কথা। কে বলতে পারে, হাত-পা বেঁধে শোভনাকে মাঝ সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হবে কি না?

রাজশেখর বিমলেন্দু প্রমীলা এবং মণিকা এই বিয়েটাকে অন্য দিক থেকে ভেবেছে। অযাচিতভাবে একটা সুযোগ যখন হাতের কাছে এসেই পড়েছে সেটাকে সংশয়ের বশে হাতছাড়া করা উচিত হবে না। হাজার দেখাশোনার পর বাছবিচার করে কত মেয়েরই তো বিয়ে দেওয়া হয়। তারা কি সবাই সুখী? পরিতৃপ্ত? হিরণ্ময় মুখের কথা খসানো মাত্র বিয়েটা হচ্ছে না। আগে সাধ্যমতো খোঁজখবর নেওয়া হবে। তারপর ভাগ্য।

শেষ পর্যন্ত মহামায়াদের আপত্তি টেকেনি। বিমলেন্দুকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল। এক সপ্তাহ পরে ফিরে এসে সে জানিয়েছে, হিরণ্ময় যা যা বলেছেন তার প্রতিটি অক্ষর ঠিক। একবর্ণও মিথ্যে তিনি বলেননি। তাঁর বাবা তখন কলকাতাতেই ছিলেন। পাছে ঘুণাক্ষরেও টের পেয়ে বিয়েটা বন্ধ করে দেন সেই ভয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেনি বিমলেন্দু। অবশ্য ব্যবসাবাণিজ্যের বিশাল সাম্রাজ্য যিনি চালান, মফঃস্বল শহরের অতি তুচ্ছ একটি লোকের সঙ্গে তিনি হয়তো দেখাই করতেন না।

বিমলেন্দু ফিরে আসার পর প্রায় নিঃশব্দে ম্যারেজ রেজিস্ট্রার বাড়িতে এনে শোভনার বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল। কোনোরকম মাতামাতি বা হইচই হয়নি, জমকাল অনুষ্ঠানও নয়। চুপিসারে অল্প কিছু আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবকে খাইয়ে দিয়েছিলেন রাজশেখর।

বিয়ের পরদিনই হিরণ্ময়ের সঙ্গে কলকাতায় চলে গিয়েছিল শোভনা।

আসানগঞ্জ থেকে ট্রেনে শিয়ালদা। তারপর ট্যাক্সিতে বাড়ি। গাড়ি থেকে জলজ্যান্ত একটি বৌ সুদ্ধ হিরণ্ময়কে নামতে দেখে গেটের দারোয়ান একেবারে থ হয়ে গেছে। তার গোলাকার চোখের পাতা পড়ছিল না।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করেছেন, 'বড় সাহেব বাড়িতে আছেন?'

শশব্যস্ত দারোয়ান লম্বা স্যালুট ঠুকে বলেছে, 'হ্যাঁ, ছোটে সাব।'

হিরণ্ময় শোভনার দিকে ফিরে বলেছেন, 'আমার চিন্তা ছিল বাবার সঙ্গে আজ দেখা হবে কিনা। কন্টিনিউয়াসলি ক'দিন আর কলকাতায় থাকেন! আজ বম্বে তো কাল ব্যাঙ্গালোর—বিজনেসের ব্যাপারে অনবরত এই করে বেড়াচ্ছেন। যাক, মাথায় টেনসন নিয়ে ওয়েট করতে হবে না। আজই বাবার সঙ্গে কনফ্রনটেশনটা হয়ে যাবে।'

সুখস্বপ্নের ঘোর নিয়ে হিরণ্ময়ের সঙ্গে ট্রেনে উঠেছিল শোভনা। 'প্রিন্স অ্যান্ড আ পপার গার্ল' নামে একটা গল্প বহুকাল আগে পড়েছিল সে, কিংবা ওই নামের সিনেমাও দেখে থাকতে পারে। কাহিনীটা যতদূর মনে আছে, এ জাতীয়। গরিবের চাইতেও গরিব, জঙ্গলে পাতা কুড়িয়ে বেড়ায় এমন একটি দুঃখী মায়ের পরমাসুন্দরী মেয়েকে দেখে এক রাজকুমারের খুব ভাল লেগে যায়। অনেক বাধাবিঘ্নের পর সে তাকে বিয়ে করে। তেমনই রূপকথার মতো অকল্পনীয় এক ঘটনা শোভনার জীবনে ঘটে গেছে।

আসানগঞ্জ থেকে নিবিড় আচ্ছন্নতার মধ্যে ভাসতে ভাসতে সে কলকাতায় এসেছে। কিন্তু হিরণ্ময়দের বাড়িতে পা দিয়েই তার সমস্ত ঘোর কেটে যায়। হিরণ্ময়ের বাবা সতীন্দ্রনাথ লাহিড়ির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে—এই দুর্ভাবনাটা চারপাশ থেকে শোভনাকে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরতে থাকে। টের পাচ্ছিল, শিরদাঁড়া দিয়ে অদৃশ্য হিমবাহ নেমে যাচ্ছে। সারা শরীরে তীব্র শীত লাগার মতো অসহ্য কাঁপুনি। মনে হচ্ছিল, হাত-পায়ের জোড়গুলো ক্রমশ আলগা হয়ে যাচ্ছে।

এলোমেলো, অস্বাভাবিক পা ফেলে হিরণ্ময়ের পাশাপাশি হাঁটছিল শোভনা। যে কোনো মুহূর্তে যেন টলে পড়ে যাবে। মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। যে চঞ্চল তরুণী সারাক্ষণ টগবগ করে ফোটে, হাসিতে খুশিতে নিজেকে ছাপিয়ে উপচে পড়ে তার আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ করেছিলেন হিরণ্ময়। কারণটা আন্দাজ করে নিয়ে বলেছিলেন, 'বি স্টেডি। আমার বাবা ডিফিকাল্ট পারসন। তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় ট্যাক্টফুল হতে হবে। নার্ভাস হয়ো না।' ফের বলেছেন, 'বিয়েটা তো হয়েই গেছে। এত ভয়ের কী আছে?'

হিরণ্ময়ের দিক থেকে চেষ্টার খামতি ছিল না, অন্তত সেই দিনটায়। কিন্তু শোভনা নিজেকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারছিল কই? বিয়ে হয়েছে বলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, এরকম ভাবার

কি কিছু মানে আছে? এ বাড়ি সতীন্দ্রনাথের, তিনি যদি রাস্তা দেখিয়ে দেন? যদি বলেন, 'এক্ষুনি বেরিয়ে যাও?'

বিষম অনিশ্চয়তা এবং ভয় শোভনাকে দ্রুত অতল খাদের কিনারে টেনে নিয়ে গিয়েছিল যেন। রুদ্ধশ্বাসে সে হিরণ্ময়ের সঙ্গে বাড়ির ভেতর ঢুকে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করেছে।

বাড়ির কাজের লোকেরা গেটের দারোয়ানের মতোই শোভনাকে দেখে হকচকিয়ে গেছে। সমারোহ নেই, সানাই বাজেনি, নিমন্ত্রিতদের ভিড়ে বাড়ি গমগম করেনি—গোপনে, আগে থেকে কিছু না জানিয়ে হিরণ্ময় হুট করে বিয়ে করে আসবেন, এ বাড়িতে তা অভাবনীয়।

ভয়ে, আশঙ্কায় মাথার ভেতরটা এমন তালগোল পাকিয়ে গেছে যে কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না শোভনা। প্রতিটি ফ্লোরের সুসজ্জিত হল-ঘর, সোফাসেট, দেওয়ালে দামি দামি পেন্টিং কিংবা এয়ারকুলার, সিলিং থেকে ঝুলে থাকা ঝাড়লণ্ঠন বা মেঝের কার্পেট—দৃশ্যমান সব কিছুই কেমন যেন ঝাপসা। কাজের লোকদের সিলুয়েট ছবির মতো লাগছিল।

তেতলায় একটি বিরাট ঘরে নিজস্ব অফিস আছে সতীন্দ্রনাথের। কলকাতায় থাকলে এখানে বসে সকালের দিকে এবং রাত্তিরে জরুরি ফাইল টাইল দেখেন। ঘরটা প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবল, দেওয়াল-জোড়া ক্যাবিনেট, রিভলভিং চেয়ার ইত্যাদি দিয়ে চমৎকার সাজানো।

দুটো ফ্লোর পেরিয়ে তেতলার হল-ঘরে আসতেই চোখে পড়েছিল, সতীন্দ্রনাথ একগাদা ফাইলের মধ্যে ডুবে আছেন। টেবলের ওধারে বসে থাকার কারণে তাঁর শরীরের ওপরের দিকটা দেখা যাচ্ছিল। তবু আন্দাজ করা গেছে, বাঙালিদের তুলনায় তিনি অনেক বেশি লম্বা, ছ'ফিট দু-ইঞ্চির মতো হাইট। মুখ চৌকোমতো, ভারি চোয়াল, চিবুকের গঠনটা দৃঢ়। বয়স ষাটের কাছাকাছি। সামনের দিকের চুল উঠে যাওয়ায় কপালটা চওড়া হয়ে গেছে। চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা। এক নজরেই টের পাওয়া গেছে, মানুষটি প্রচণ্ড রাশভারী এবং প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

সতীন্দ্রনাথের মুখোমুখি যে দরজা, তার বাইরে পুরো পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পরও যখন দেখা গেল ফাইল থেকে তিনি মুখ তুলছেন না, হিরণ্ময় গলার ভেতর অস্পষ্ট আওয়াজ করে ডেকেছেন, 'বাবা—'

এবার সোজাসুজি তাকিয়েছেন সতীন্দ্রনাথ। নিজের কাজে তিনি এতটাই নিবিষ্ট ছিলেন যে বাইরের হল-ঘরে কারা দাঁড়িয়ে আছে, বুঝতে একটু সময় লেগেছিল। তারপরেই বলে উঠেছেন, 'ও, তুমি—'

তাঁর কণ্ঠস্বর গম্ভীর, ভরাট। শুনলে কেমন যেন অস্বস্তি হয়।

হিরণ্ময় ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, 'ভেতরে আসব?'

সতীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমার আর্জেন্টি ক'টা ফাইল দেখতে হবে। ঠিক আছে, এস। দশ মিনিটের বেশি সময় দিতে পারব না।'

হিরণ্ময় শোভনাকে নিয়ে ঘরের ভেতর চলে গিয়েছিলেন।

সতীন্দ্রনাথ এবার জানতে চেয়েছেন, 'নর্থ বেঙ্গল ভ্রমণের নাম করে বেরিয়েছিলে। আর কোথাও গিয়েছিলে নাকি?'

হিরণ্ময় বলেছেন, 'না।'

'নর্থ বেঙ্গল কেমন লাগল? নিশ্চয়ই এনজয় করেছ?' বলতে বলতে সতীন্দ্রনাথের চোখ এসে পড়েছে শোভনার ওপর। অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছেন। লাল বেনারসি এবং সিঁদুর স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিল। তবু জিজ্ঞেস করেছেন, 'হু ইজ শি?'

ঢোক গিলে হিরণ্ময় বলেছেন, 'শোভনা। আমি ওকে বিয়ে করেছি। মানে ব্যাপারটা হঠাৎ—'

শোভনা চোখ বুজে ফেলেছিল। তার মনে হয়েছে, এবার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে যাবে।

কিন্তু কিছুই ঘটল না। ছেলেকে থামিয়ে দিয়ে উত্তেজনাহীন, ঠাণ্ডা গলায় সতীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মেয়েদের সঙ্গে তোমার রিলেশান তো অন্য ধরনের হয় শুনেছি। এবার অ্যাডভেঞ্চারটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের হয়ে গেল না?'

মুখ নিচু করে নিয়েছিলেন হিরণ্ময়।

ওদিকে তখন শোভনার যা মানসিক অবস্থা, অন্য মেয়েদের সঙ্গে হিরণ্ময়ের অন্য ধরনের সম্পর্ক বলতে সতীন্দ্রনাথ ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন, সেটা লক্ষ করেনি। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি যে রাগে ফেটে পড়েননি, তার পক্ষে তাই ছিল যথেষ্ট।

সতীন্দ্রনাথ ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছেন, 'মেয়েটির সঙ্গে তোমার দেখা হল কোথায়?'

'নর্থ বেঙ্গলে, আসানগঞ্জ বলে একটা শহরে।'

'আসানগঞ্জের নাম আমি জানি। আগে থেকে আলাপ ছিল?'

'না। এবারই—'

'আই সি।'

ছেলেকে আর কোনো প্রশ্ন না করে সতীন্দ্রনাথ সোজা শোভনার দিকে তাকিয়েছেন, 'তোমার নামটা ছাড়া আর কিছুই জানা হয়নি। ঠিক চার মিনিট সময় দিচ্ছি। তার ভেতর তোমাদের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড আর রাজা, মানে আমার ছেলের সঙ্গে কিভাবে তোমার যোগাযোগ হয়েছে বল।'

গলা শুকিয়ে গিয়েছিল শোভনার। বিয়ের পর প্রথম দিন শ্বশুরবাড়িতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে কোনো মেয়েকে তার আগে এ জাতীয় জবানবন্দি দিতে হয়েছে কিনা, কে জানে। এটা সে বুঝতে পারছিল, সতীন্দ্রনাথের সময় অত্যন্ত মূল্যবান। যে সাহসটুকু অবশিষ্ট ছিল, জড়ো করে ঠিক চার মিনিটেই সতীন্দ্রনাথ যা যা জানতে চেয়েছেন, সংক্ষেপে সব জানিয়ে দিয়েছে শোভনা।

সতীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেছেন, 'মাত্র তিন উইক আগে রাজার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে—তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'এত অল্প দিনের পরিচয়ে জীবনের সবচেয়ে ইমপর্টান্ট ডিশিসানটা নিয়ে নিলে?'

শোভনা উত্তর দেয়নি।

সতীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে।'

শোভনা এবারও চুপ। শুধু উৎসুক চোখে সতীন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

সতীন্দ্রনাথ থামেননি, 'স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যে ফাউন্ডেশনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে সেটা হল পারস্পরিক বিশ্বাস। তাছাড়া একজনের প্রতি আরেক জনকে সৎ থাকতে হয়। এই দুটো বিষয়ে তুমি হানড্রেড পারসেন্ট নিশ্চিত তো?'

সতীন্দ্রনাথের প্রশ্নটার মধ্যে গূঢ়, গোপন কোনো সংকেত ছিল বুঝিবা। সেই প্রথম দিন সেটা ঠিক ধরতে পারেনি শোভনা। তবু তার মনে কোথায় যেন চকিতের জন্য একটা ধন্দ দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেছে।

সতীন্দ্রনাথ এবার বলেছেন, 'এনিওয়ে, তোমরা সাফিসিয়েন্টলি গ্রোন আপ—যথেষ্ট অ্যাডাল্ট। নিজেদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার ফাণ্ডামেন্টাল রাইট তোমাদের আছে। বিয়ে করেছ, ইট ইজ অল রাইট। ইচ্ছে করলে এ বাড়িতেই থাকতে পার। নইলে আমার আরো চার পাঁচটা বাড়ি আছে। তার কোনো একটায় তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

মুখ নামিয়ে শোভনা বলেছে, 'আমি এখানেই থাকতে চাই।'

'ঠিক আছে। আরেকটা কথা—' সতীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বিয়েটা তোমরা নিজেরাই করেছ। আমি কিছু জানতাম না, এতে আমার কোনো রোলই নেই। তাই আমার পক্ষে লোকজন ডেকে তোমার জন্যে রিসেপশানের ব্যবস্থা করা— ওই যাকে বৌভাত বলে আর কি—সম্ভব নয়। তোমার মা-বাবা দাদারা হয়তো এক্সপেক্ট করে থাকবেন। তাঁদের এটা জানিয়ে দিও।'

শোভনা নতচোখে দাঁড়িয়ে থেকেছে। বৌভাতের মতো একটা অনুষ্ঠানকে ঘিরে মেয়েদের কত রকমের স্বপ্ন থাকে। তারও ছিল। কিন্তু সতীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন তাতে সেটা বুদ্বুদের মতো ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। বুকের ভেতর তীব্র চাপা একটা কষ্ট হচ্ছিল তার। পাশাপাশি অবশ্য এটুকুই সান্ত্বনা, সতীন্দ্রনাথ তাকে তাড়িয়ে দেননি। জমকাল রিসেপশানের আয়োজন করে, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ডেকে, তাদের বিয়েটাকে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি দিতে তাঁর অনিচ্ছা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। তবে নিজে তাকে মেনে নিয়েছেন, একই বাড়িতে থাকতে বলেছেন, এটাই বা কম কী? কারো সব

ইচ্ছাই তো পূরণ হয় না। হলে অসুখী, অতৃপ্ত মানুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যেত না।

সতীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তোমাকে আরো একটা আনপ্লেজান্ট কথা বলতে হচ্ছে। সেটা সব সময় মনে রাখবে।'

চমকে মুখ তুলেছিল শোভনা, 'কী কথা?'

'তোমাদের বাড়ির লোকেরা এখানে যেন না আসেন। এলে তাঁরা অস্বস্তি বোধ করবেন। আমাদের রি-অ্যাকশনও তাই হবে। না আসাটাই তাঁদের এবং আমাদের পক্ষে ভাল।'

বনেদিয়ানা, সামাজিক স্টেটাস এবং আর্থিক দিক থেকে তারা যে দুই বিপরীত মেরুতে রয়েছে, দু পক্ষের মধ্যে আকাশপাতাল তফাত— সেটা ভদ্র ভাষায় পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন সতীন্দ্রনাথ। তার মানে বাপের বাড়ির সঙ্গে শোভনার সম্পর্কটা চিরতরে ছিন্ন হয়ে গেল। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল তার। সে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে তখন আর ফিরে যাওয়া যায় না। ঝাপসা গলায় বলেছিল, 'ঠিক আছে, বাবাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেব।'

সতীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমার আর একটা বক্তব্য আছে।'

উত্তরটা না দিয়ে নিঃশব্দে তা শোনার জন্য অপেক্ষা করেছিল শোভনা।

সতীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তোমার আত্মীয়স্বজনদের জন্যে আমাদের ফার্মগুলোতে চাকরি দিতে বলবে না। এই অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

শোভনা জানিয়েছে কারো চাকরির জন্য অনুরোধ করবে না।

সতীন্দ্রনাথ এবার হিরণ্ময়ের দিকে তাকিয়ে বলেছেন, 'তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যাও। এ বাড়িতে এসেছে। ওর যেন কোনোরকম অসুবিধে না হয়।'

হিরণ্ময় আর শোভনা বেরিয়ে যাবে, হঠাৎ কী মনে পড়ায় সতীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'শোন—'

শোভনারা থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

সতীন্দ্রনাথ সামান্য মহানুভবতা দেখিয়ে বলেছেন, 'তোমাদের বাড়ির লোকজনকে এখানে আসতে বারণ করেছি বলে এই নয় যে তুমি তাঁদের সঙ্গে দেখা করবে না। ইচ্ছে করলে তুমি আসানগঞ্জে যেতে পার।'

'হ্যাপি ভিলা'র তেতলায় থাকতেন সতীন্দ্রনাথ। দোতলায় হিরণ্ময়। স্বামীর সঙ্গে দোতলায় নেমে এসেছিল শোভনা।

দাম্পত্য জীবন শুরু হয়ে গেল। সেটা খুবই বিচিত্র ধরনের। সংসার বলতে আজন্ম শোভনা যা জেনে বা বুঝে এসেছে তার সঙ্গে এখানকার বিন্দুমাত্র মিল খুঁজে পায়নি সে। বাবা-মা-ভাই-বোন মিলিয়ে একটা নিবিড় ইউনিট, যেখানে সুখেদুঃখে শোকে কি আনন্দে মানসিক দিক থেকে সকলে কাছাকাছি থাকবে। পারিবারিক এই কনসেপ্টটা এখানে অচল। শোভনা না হয় সবে বাইরে থেকে এসেছে। কিন্তু একমাত্র সন্তানের সঙ্গে সতীন্দ্রনাথের সম্পর্কটা ছাড়া ছাড়া, শিথিল। বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো একজন থাকতেন তেতলায়, আরেক জন দোতলায়। একসঙ্গে এক টেবলে বসে খাওয়া তো দূরের কথা, হিরণ্ময়ের সঙ্গে তাঁর বিজনেস-ম্যাগনেট বাবার ক্বচিৎ দেখা হত। একটা মেয়ে যে তাঁদের বাড়িতে পুত্রবধূর পরিচয়ে রয়েছে, তার খোঁজখবরও নিতেন না।

অনেক পরে শোভনার মনে হয়েছে, সতীন্দ্রনাথ মানুষটা বিরাট আকারের মেগালোম্যানিয়াক। নিজের বাইরে আর কিছুই তাঁর চোখে পড়ত না। শোভনার কথা বুঝিবা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। এমনও হতে পারে তিনি হয়তো ভেবেছেন, একটা নগণ্য মিডল-ক্লাস ফ্যামিলির মেয়ে আচমকা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হয়নি—এটাই যথেষ্ট। তার সম্পর্কে অতিরিক্ত কৌতূহলের প্রয়োজন নেই। সতীন্দ্রনাথ শীতল উদাসীনতায় শোভনাকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন।

সতীন্দ্রনাথের ব্যাপারটা বাদ দিলে গোড়ার দিকের কিছুদিন খারাপ কাটেনি। পর্যাপ্ত সুখ, প্রচুর সুখাদ্য, দামি দামি পোশাক, ফরেন কসমেটিকস, সুইচ টিপলে এয়ারকুলারের স্নিগ্ধ আরাম—এসব তো ছিলই। দিনের অনেকটা সময় হিরণ্ময়ের সঙ্গও পাওয়া যেত। বাবার আর ছেলের আচরণ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। একজনের মায়াময় উষ্ণতা, আরেকজনের পাথরের মতো জমাট উপেক্ষা।

তবে এটা ঠিক, বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েকটা মাস প্রায় নিবিড়ভাবেই হিরণ্ময়কে কাছে পেয়েছে

শোভনা। সতীন্দ্রনাথের নিরুত্তাপ উদাসীনতায় তার যতটা কষ্ট হয়েছে তার বহুগুণ আনন্দ তাকে দিয়েছেন হিরণ্ময়। একদিকে কিছুই না পাওয়া, আরেক দিকে অনেকখানি প্রাপ্তির মধ্যে ভারসাম্যটা মোটামুটি বজায় ছিল।

'হ্যাপি ভিলা'য় আসার দু দিন পর থেকে আরেকটা ব্যাপার কিন্তু শুরু হয়েছিল। দিন নেই, রাত নেই, হঠাৎ হঠাৎ কত অচেনা মেয়ের যে ফোন আসত! কিভাবে ওরা শোভনার নামই শুধু নয়, তার সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য জোগাড় করেছিল কে জানে। তার ওপর মেয়েগুলোর প্রচণ্ড রাগ আর ঈর্ষা, সেই পরিমাণ বিদ্রূপ। তীব্র গলায় তারা জানতে চাইত, নর্থ বেঙ্গলের অতি নগণ্য চাকুরের মেয়ে হয়ে হিরণ্ময়ের মতো এক বিজনেস ম্যাগনেটের ছেলেকে কেমন করে গেঁথে ফেলল! সে কি কোনোরকম ব্ল্যাক ম্যাজিক জানে?

এই মেয়েদের কথা হিরণ্ময়কে জিজ্ঞেস করায় তিনি শুধু হেসেছেন, 'কে কী বলল, তা নিয়ে মাথা খারাপ করে কী লাভ?'

কিন্তু উৎপাত ক্রমশ এত বাড়ছিল যে শোভনা অস্থির হয়ে উঠেছে। তার মনে জমাট বেঁধেছে সংশয়। একদিন সে সাহস করে বলেই ফেলেছিল, 'এই মেয়েরা কারা? এদের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কী?'

স্থির চোখে তাকিয়েছিলেন হিরণ্ময়। তাঁর ভেতর থেকে ধীরে ধীরে আরেকটা মানুষ যেন বেরিয়ে এসেছে—কঠোর, হিমশীতল এবং নির্মম। খুব ঠান্ডা গলায় বলেছেন, 'এরা আমার গার্লফ্রেন্ডস।' হিরণ্ময় আরো জানিয়েছিলেন, তাঁর বয়স আটাশ। তিনি অপাপবিদ্ধ সরল বালক নন। নন জিতেন্দ্রিয় শুকদেবও। তাঁর জীবনে গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে এসেছে। এদের যে কেউ একজন শোভনার বদলে স্থায়ীভাবে 'হ্যাপি ভিলা'য় আসতে পারত।

হিরণ্ময়ের পরিবর্তনটা শোভনাকে চমকে দিয়েছে। সে কী উত্তর দেবে ভেবে পায়নি। হঠাৎ মনে পড়েছে, ছেলে সম্পর্কে সতীন্দ্রনাথ প্রথম দিন একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেটা কি নারীঘটিত?

বহুরূপীর মতো ফের বদলে গেছেন হিরণ্ময়। আবার তিনি আগের মানুষ। শোভনার কাঁধে আলতো করে একটা হাত রেখে মধুর হেসে বলেছেন, 'অন্য কেউই আমার কাছে যা পায়নি তুমি তা পেয়েছ। সেটা তোমার ভিকট্রি। ওদের চিন্তা এবার মাথা থেকে বার করে দাও।'

অর্থাৎ হিরণ্ময়ের জীবনে শোভনার আগে অসংখ্য নারী এসেছে কিন্তু তাকে ছাড়া অন্য কাউকে স্ত্রীর মর্যাদা দেননি। তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন, ওই মেয়েরা শুধুই তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী বা শয্যা-সঙ্গিনী কিন্তু আসল জ্যাকপটটা শোভনাই পেয়েছে। তার চুপচাপ থাকাই ভাল।

শোভনা বুঝতে পেরেছিল, হিরণ্ময়কে পুরোপুরি পায়নি, যা পেয়েছে তা হল যৎসামান্য একটা ভগ্নাংশ। আর এটুকু নিয়েই ইহ জীবন তাকে পার করে দিতে হবে।

ইহ জীবন তো মুখের কথা নয় যে বললাম আর পেরিয়ে গেলাম। সেটা বিরাট, লম্বা পাড়ি। শোভনা সেদিন আঁচও করতে পারেনি, তাঁর স্বল্পায়ু দাম্পত্য জীবন খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

সবিতা যখন পেটে, সে সাত মাসের গর্ভবতী, হিরণ্ময় লোক দিয়ে তাকে আসানগঞ্জে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে চলেছে শোভনা, এই সময়টা তার মা-বাবার কাছে থাকাই ভাল। শোভনারও সেই রকমই ইচ্ছা ছিল। আসানগঞ্জে আসার সময় তাকে প্রচুর টাকা দিয়েছিলেন হিরণ্ময়।

কলকাতায় এত বড় বড় ডাক্তার, বিশাল বিশাল নার্সিং হোম, তবু কেন তাকে আসানগঞ্জের মতো মফঃস্বল শহরে পাঠানো হল, এবং এর ভেতর কী ধরনের সূক্ষ্ম চাল রয়েছে, সেদিন তা ধরতে পারেনি শোভনা।

এদিকে যে মেয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে বাচ্চার জন্ম দিতে এসেছে, বাপের বাড়িতে তার খাতিরযত্ন একটু বেশিই হয়ে থাকে। রাজশেখররা সারাক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকতেন।

যথাসময়ে সবিতার জন্ম হল। ভারতীয় ডাকবিভাগ মারফত সুসংবাদটা পাঠানো হয়েছিল হিরণ্ময়কে। হিরণ্ময়ও টেলিগ্রাম করে মেয়ে এবং তার জননীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন কিন্তু নিজে আসানগঞ্জে তাদের দেখতে আসেননি।

সবিতার বয়স যখন দুমাস সেই সময় শোভনা চিঠি লিখে জানিয়েছিল, সে কলকাতায় ফিরে যেতে চায়। এবার হিরণ্ময় নয়, তাঁদের কোনো এমপ্লয়ি উত্তর দিয়েছিল, হিরণ্ময় আমেরিকায় গেছেন, কবে ফিরবেন ঠিক নেই, ফিরলে শোভনার সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। তার আগে যেন শোভনা কলকাতায় চলে না আসেন।

আরো ছমাস কেটে গেছে। কিন্তু হিরণ্ময় আমেরিকা থেকে আদৌ ফিরেছেন কিনা বোঝা যাচ্ছিল না। উৎকণ্ঠিত শোভনা মরিয়া হয়ে বার বার চিঠি লিখেছে কিন্তু হিরণ্ময়ের দিক থেকে সাড়া নেই। রাজশেখর নিজে বার দুই হিরণ্ময়ের সঙ্গে দেখা করতে কলকাতায় গিয়েছিলেন কিন্তু তাকে হিরণ্ময়দের বাড়ি বা অফিসে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তিনি জানতেই পারেননি, তাঁর কোটিপতি জামাই কলকাতায় আছেন কি নেই।

একটি বছর দমবন্ধ-করা অবস্থার মধ্যে কাটানোর পর হঠাৎ একদিন রেজিস্টার্ড পোস্টে শোভনার নামে একটা লম্বা, পুরু খাম এল। সেটা খুলতেই দেখা গেল, হিরণ্ময়ের অ্যাডভোকেট ডিভোর্সের নোটিশ পাঠিয়েছেন। সেই সঙ্গে রয়েছে একটা ফর্ম। শোভনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেটায় যেন সই করে দেয়। অবশ্য হিরণ্ময় কিঞ্চিৎ মহানুভবতা দেখিয়েছেন। ক্ষতিপূরণ হিসেবে সাত লক্ষ টাকার অ্যাকাউন্ট-পেয়ী একটা চেকও পাঠিয়েছেন। তাঁর হয়তো মনে হয়ে থাকবে, দু বছরের বিবাহিত জীবনের দাম হিসেবে এই টাকাটা যথেষ্ট।

বিবাহ বিচ্ছেদের নোটিশটা সারা বাড়িতে মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো কিছু ঘটিয়ে দিয়েছিল যেন। বাবা দাদারা বৌদিরা, এমনকি শান্ত নিরীহ ভালমানুষ মা পর্যন্ত আক্রোশে ফেটে পড়েছিলেন। কিছুতেই ডিভোর্স দেওয়া হবে না, হিরণ্ময় বেশি বাড়াবাড়ি করলে তাকে কোর্টে টেনে তোলা হবে. ইত্যাদি।

ডিভোর্স নোটিশটা আসার পর শোভনার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হয়েছে এইরকম। তার সারা শরীর, শিরাস্নায়ু, মস্তিষ্ক, সমস্ত কিছু অসাড় হয়ে গিয়েছিল। সে যেন একটা জড়পিণ্ডে পরিণত হয়েছে। পরে সাড় ফেরার পর ক্রমশ তার ভেতর থেকে অরেকটি মেয়ে যেন বেরিয়ে এসেছিল—কঠোর, রুক্ষ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কী ভেবেছেন হিরণ্ময়? তার শরীরটাকে ইচ্ছামতো ভোগ করে একটা বাচ্চার জন্ম দিয়ে কুকুরের সামনে মাংসের টুকরো ছুঁড়ে দেবার মতো সাত লাখ টাকা পাঠিয়েছেন। সে কি তাঁর রক্ষিতা? কিছু দাম দিলেই সব চুকেবুকে যাবে? এত সহজে হিরণ্ময় পার পেয়ে যাবেন, কিছুতেই তা হতে দেবে না শোভনা। তার বিশ্বাস, তার সারল্যের সুযোগ নিয়ে চূড়ান্ত ক্ষতিটা যে করেছে তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু সেটা উপযুক্ত সময় নয়। পালটা আঘাত হানার জন্য ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

সাধারণ মধ্যবিত্তের আক্রোশের মধ্যে তেমন বিষ বা ঝাঁঝ থাকে না। ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা কেটে যাবার পর ঠাণ্ডা মাথায় বাবা, দুই দাদা এবং বৌদিরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, বিজনেস-ম্যাগনেটের ছেলের বিরুদ্ধে মামলা করলে সর্বস্বান্ত হতে হবে। তার চেয়ে ক্ষতিপূরণের টাকাটাই নেওয়া হোক। তাতে শোভনার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে না। টাকাটা না নিলে। তাদের ধারণা ডিভোর্সি বোন এবং তার মেয়ের দায়িত্ব এবার থেকে তাদের কাঁধেই চাপবে। কিন্তু শোভনাকে কিছুতেই রাজি করানো যায় নি। যে অর্থের সঙ্গে চরম অসম্মান জড়িত তা কিছুতেই ছোঁবে না সে।

শোভনা জানিয়েছে তার এবং সবিতার ভার কাউকেই নিতে হবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। অনার্স ফাইনালটা দেবার আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। অসমাপ্ত পড়াশোনাটা প্রবল জেদে ফের শুরু করে দিয়েছে শোভনা।

কিন্তু নতুন করে আবার একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। দু মাস আগে পরে রাজশেখর আর মহামায়া হঠাৎ মারা গেলেন। অসন্তুষ্ট হলেও মা-বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, শোভনাকে আগলে আগলে রেখেছেন। তাঁদের মৃত্যুর পর গোটা বাড়ি একেবারে বারুদের স্তূপ হয়ে উঠেছিল। দাদা-বৌদিদের ভয়, দুটি মানুষের দায়িত্ব তো নিতে হচ্ছেই, সেই সঙ্গে বাড়ির ভাগও দিতে হবে।

শোভনা বাড়ি ছেড়ে যাবে না, দাদা-বৌদিরাও থাকতে দেবে না। আবহাওয়া দ্রুত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। এই সময় আসানগঞ্জ হায়ার সেকেণ্ডারি গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেস অনুরাধা তালুকদার তার

পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি শোভনা আর সবিতাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। শোভনা একসময় তাঁর ছাত্রী ছিল।

শুধু আশ্রয়ই নয়, স্কুলের প্রাইমারি সেকশনে একটা চাকরির ব্যবস্থাও করেছিলেন অনুরাধা। শোভনারা পুরো দেড় বছর তাঁর কাছেই ছিল। এর মধ্যে অনার্স নিয়ে পাশ করেছে সে। রেজাল্ট বেশ ভাল হয়েছিল। অনুরাধা এবার তাকে প্রাইমারি সেকশন থেকে উঁচু ক্লাসে পড়ানোর দায়িত্ব দিয়েছেন। মাইনেও অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

অনুরাধাদের বাড়িটা ছোট। দুটো বাড়তি মানুষ এসে পড়ায় সবারই অসুবিধে হচ্ছিল কিন্তু অনুরাধা, তাঁর স্বামী, ছেলেমেয়ে, শ্বশুর শাশুড়ি এত ভাল যে হাসিমুখে সব মেনে নিয়েছিলেন। অবশ্য মাইনে বাড়ার পর বাড়ি ভাড়া করে অন্য জায়গায় উঠে গেছে শোভনারা। সেখানে অনেকগুলো ভাড়াটে। প্রচুর লোকজন। এজমালি কল-পায়খানা। এর চেয়ে আরেকটু ভাল জায়গায় হাত-পা ছড়িয়ে তারা থাকতে পারত। কিন্তু তার জীবনের তখন তিনটি লক্ষ্য— মেয়েকে মানুষ করে তোলা এবং দাদা-বৌদি ও হিরণ্ময়কে চূড়ান্ত আঘাত হানা। দাদারা ভালমুখে চাইলে তার স্বত্ব ওদের নামে অকাতরে লিখে দিত শোভনা। কিন্তু ওরা যা নিষ্ঠুর এবং নোংরা ব্যবহার করেছে তাতে নিজের অধিকার কিছুতেই ছাড়বে না। ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী পৈতৃক সম্পত্তির সমান ভাগ যে ছেলেদের মতো মেয়েদেরও প্রাপ্য, এটা তার জানা ছিল।

মাসে মাসে কিছু টাকা জমিয়ে শোভনা একদিন দাদাদের বিরুদ্ধে মামলা করে দেয়। বোন আর ভাইদের মধ্যে তিক্ততা আগে থেকেই ছিল। এবার সেটা চরম শত্রুতার স্তরে পৌঁছে গেল। রাস্তায় দেখা হলে কেউ কারো সঙ্গে কথা বলত না, দু পক্ষই অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেত।

টাকা আরো নানাভাবে জমাচ্ছিল শোভনা। প্রাইভেট টুইশনি করত, সন্ধেবেলায় একটা কোচিং সেন্টারে গিয়ে পড়াত। এর থেকে যা পেত তার একটা পয়সাও খরচ করত না। ব্যাঙ্কে আলাদা অ্যাকাউন্ট খুলে সে সব জমা রাখত। সবিতাকে একদিন বলেছিল, 'কেন এই টাকাটা জমাচ্ছি জানিস? তোর জন্যে। তোর বাবার সঙ্গে আমার কোনোরকম সম্পর্ক নেই কিন্তু তোর আছে। নিজের অধিকার তোকে ছিনিয়ে নিতে হবে। কিন্তু মুখের কথায় ওরা কিছুই দেবে না। তার জন্যে হয়তো কেস লড়তে হবে। ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে হলে অনেক টাকা চাই। সারা জীবন খেটে তোর জন্যে আমি তা জমিয়ে যাব।' একটু থেমে বলেছে, 'আমার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছে তোর বাবা, তাকে তুই ছাড়িস না।'

সেই অল্প বয়সেই সবিতার শিরাস্নায়ুতে হিরণ্ময় সম্পর্কে প্রবল ঘৃণা আর ক্রোধ ঢুকিয়ে দিতে শুরু করেছিল শোভনা।

একটি তরুণীর পক্ষে একটা মেয়েকে নিয়ে একা একা জীবন কাটানো প্রায় অসম্ভব। শোভনা রাস্তায় বেরুলে ইভ-টিজাররা ফেউয়ের মতো পেছনে লেগে থাকত। শুধু ছেলেছোকরারাই না, অনেক বয়স্ক লুচ্চাও। কেউ তাকে দেখলেই কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে শিস দিত, কেউ অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করত, কেউ বা নোংরা ইঙ্গিত দিত। বেশির ভাগ সময় দেখেও দেখত না সে, শুনেও শুনত না। সারা দিন তার এত ব্যস্ততা যে এসব ব্যাপারে মাথা ঘামালে নিজের আসল কাজটাই হবে না। তার চেয়ে উপেক্ষা করাই ভাল। তবে উৎপাতটা বাড়াবাড়ি রকমের হলে মাঝে মাঝে রুখে দাঁড়াতেই হত।

এ ব্যাপারে একটা তুমুল কাণ্ড ঘটে গেল একদিন। আসানগঞ্জের এস. পি'র ছেলে বিক্রমের নজরে হঠাৎ এসে পড়ল শোভনার ওপর। বাড়ির বাইরে পা রাখলেই মোটর বাইকে সে তার পিছু পিছু চলতে শুরু করত। স্কুলে যাক, টুইশনিতে যাক, কোচিং ক্লাসে যাক—বিক্রম তার পেছনে ছায়ার মতো লেগে থাকত। মাঝে মাঝে বাইকটাকে পাশে নিয়ে এসে শোভনার কানের কাছে ফিসফিস করে যা বলত, তাতে মুখ লাল হয়ে উঠত।

ছোকরা মহা বদমাস, মার্কামারা দুশ্চরিত্র। তার ওপর পুলিশের এস. পি'র ছেলে। কত মেয়ের সে সর্বনাশ করেছে তার ঠিক নেই। ভয়ে কেউ কিছু বলত না, মুখ বুজে সব সয়ে যেত। কিন্তু শোভনার কাছে ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠেছিল। একদিন স্কুলে যাবার পথে প্রকাশ্য দিবালোকে, কয়েক শ মানুষের সামনে বিক্রমের গালে আচমকা এত জোরে চড় মারে যে সে হুড়মুড় করে বাইক থেকে

ছিটকে পড়ে। শোভনা এমন প্রচন্ড আক্রমণ করে বসতে পারে, ভাবতে পারেনি বিক্রম। সে পড়ে যাবার পরও শোভনা ছেড়ে দেয়নি। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জুতো খুলে এলোপাথাড়ি সারা মুখে মেরে গিয়েছিল।

এখানেই ঘটনাটা শেষ হয়নি। স্কুলে গিয়ে অনুরাধা এবং আরো কয়েকজন টিচারকে সঙ্গে নিয়ে সটান থানায় চলে যায় কিন্তু প্রথমে ও. সি এস. পি'র ছেলের বিরুদ্ধে এফ আই আর নিতে চায়নি কিন্তু আসানগঞ্জের সব স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং মাস্টারমশাইদের এনে থানা ঘেরাও করা হবে, এই হুমকি দেবার পর সেটা নিতে বাধ্য হয়।

এই নিয়ে প্রচণ্ড হইচই হয়েছিল আসানগঞ্জে। এস. পি চেয়েছিলেন ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নেওয়া হোক। পুলিশ দিয়ে শোভনাকে ভয়ও দেখানো হয়েছিল। কিন্তু তাকে দমানো যায় নি। সে ছুটে গিয়েছিল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, সবগুলো রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গেও দেখা করেছিল। আসানগঞ্জে একদিন স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধ্‌ও পালন করা হয়। শুধু বিক্রমের বিরুদ্ধেই না, এস. পি সম্পর্কেও মানুষের প্রচুর ক্ষোভ ছিল। বন্ধটা ছিল তারই প্রকাশ। শেষ পর্যন্ত হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে এস. পি'কে অন্য জেলায় ট্রান্সফার করেছিল।

যে তরুণী একদা ছিল ভাবালুতায় ঠাসা, রঙিন ফানুসের মতো যে ভেসে বেড়াত, বিবাহবিচ্ছেদের নোটিশটা পাওয়ার পর মহাশূন্য থেকে ভূপৃষ্ঠে আছড়ে পড়েছিল সে। নিজেকে ক্রমশ গনগনে একটা চুল্লিতে পরিণত করেছে শোভনা। একদিকে দাদারা, আরেক দিকে হাঙরের ঝাঁকের মতো ইভ-টিজাররা, বিক্রম, দূরবর্তী টার্গেট হিরণ্ময়—যুদ্ধের শেষ ছিল না। ঘোষিত অঘোষিত যুদ্ধের কত ফ্রন্ট যে কতদিকে সে খুলেছিল তার হিসেব নেই।

মেয়েকে দিয়ে হিরণ্ময়কে আঘাত হানার সূচনা করে যেতে পারেনি শোভনা। তার আগেই তো ক্যানসারে মৃত্যু হয়। তবে সেই ছোটবেলা থেকে মেয়েকে দিনের পর দিন রণসজ্জায় সাজিয়ে দিয়ে গেছে। ......

সবিতা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই কলকাতায় এসেছে। সে জানে, মা তার মধ্যেই রয়েছে—যে মা সর্বক্ষণ যুদ্ধরত, ক্ষিপ্ত এবং একরোখা; প্রতিহিংসা ছাড়া যে আর কিছু জানত না।

কবে, কখন হিরণ্ময়ের সঙ্গে সংঘাতটা শুরু হবে, এখন তারই প্রতীক্ষায় থাকতে হবে সবিতাকে।

চার

কলকাতায় আসার পর দিন সাতেক কেটে গেছে। এর মধ্যে আসানগঞ্জ থেকে অনুরাধা তার বইপত্র এবং কলেজ নোট টোট, সব পাঠিয়ে দিয়েছেন।

পুরোদমে পড়াশোনা শুরু করেছে সবিতা। এই এক সপ্তাহে একবারও তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরটি থেকে বেরোয়নি। মায়া চারবেলা চা খাবার টাবার নিয়ে এসেছে। ঘরে বসেই খেয়েছে সে।

প্রথম দিনই সবিতা মায়াকে বলে দিয়েছিল, সারাক্ষণ দেহরক্ষীর মতো কাছাকাছি বসে থেকে ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলার দরকার নেই। তেমন বুঝলে নিজেই তাকে ডেকে নেবে। না ডাকলে মায়া ভেতরে আসে না, বাইরের হল-ঘরে কান সজাগ রেখে অপেক্ষা করে।

সবিতার খাটটা যেখানে তার মুখোমুখি দেওয়াল জোড়া-জানালা দিয়ে রেল লাইন, প্রচুর গাছপালা আর পাখিদের ওড়াওড়ি চোখে পড়ে। কিন্তু বাঁ দিকের দেওয়ালেও একজোড়া বড় জানালা রয়েছে। সবিতা তার পড়ার টেবল চেয়ার এধারে নিয়ে এসেছে। এখান থেকে বাড়ির ভেতরের অনেকটা অংশ, যেমন সামনের বাগান, লন, গেট এবং কমপাউণ্ডের বাইরের রাস্তা, রাস্তার ওদিকে উঁচু উঁচু বাড়ির স্কাইলাইন দেখা যায়।

এই ক'দিন হিরণ্ময়ের সঙ্গে মুখোমুখি একবারও দেখা হয়নি। তিনিও সবিতাকে ডাকেননি। আশ্রয় দিয়েছেন বলে যেচে, গদগদ হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হবে, তেমন মেয়ে সে নয়। এই বাড়ির সঙ্গে তার বন্ধনটা খুব শিথিল। বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো সে এখানে পড়ে আছে।

সামনাসামনি না হলেও টেবলে বসে পড়তে পড়তে দু-তিনদিন হিরণ্ময়কে গাড়ি করে বেরুতে দেখেছে সবিতা। একদিন অনেক রাতে ফিরতেও দেখেছিল। গাড়ি থেকে নেমে দুটো কাজের লোকের

কাঁধে ভর দিয়ে টলটলায়মান পায়ে বাড়ির ভেতর এসেছিলেন। বোঝা যাচ্ছিল, মদে এমন চুর হয়ে আছেন যে দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থায় নেই।

সেই চোখ-ধাঁধান রূপসী মহিলাটি, যাঁর নাম মনীষা, তাঁকেও এ ক'দিন দেখা যায় নি। সর্বক্ষণ তো সবিতা পড়ার টেবলে বসে থাকে না। তাকে বাথরুমে যেতে হয়, দুপুরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে হয়, রাতে ঘুমোতে হয়। সেই ফাঁকে তিনি যদি এসে থাকেন, সেটা সবিতার জানা নেই।

এখানে সবই মসৃণ আরামদায়ক এবং সুখকর। বিরক্ত হবার বা অভিযোগ করার মতো কোনো কারণই এই এক সপ্তাহে ঘটেনি।

আজ সকালে চা খেয়ে পড়তে বসেছিল সবিতা। ন'টা বাজতে চলেছে। হঠাৎ মায়ার গলা কানে এল। ভয়ে ভয়ে, প্রায় ফিসফিস করে সে ডাকছে, 'দিদি—দিদি—'

মায়া এ ক'দিনেই জেনে গেছে পড়ার সময় ঘরে ঢুকলে বা কথা বললে সবিতা বিরক্ত হয়। একটু চমকে উঠে মুখ ফেরাতেই তার চোখে পড়ল, হল-ঘরের দিকে দরজার বাইরে শুধু মায়াই নয়. একটি ঝকঝকে চেহারার যুবক দাঁড়িয়ে আছে। বেশ অবাক হল সে।

যুবকটি অল্প হেসে হাতজোড় করে বলল, 'নমস্কার। আমার নাম সঞ্জয় মৌলিক।'

একে আগে দেখেনি সবিতা। হিরণ্ময়, ক'টি কাজের লোক, এবং মনীষা ছাড়া আর কাকেই বা দেখেছে। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে সেও প্রতি নমস্কার জানায়, 'আমাকে কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়ে সঞ্জয়।

কেউ এলে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখাটা অভব্যতা। সামান্য ইতস্তত করে সবিতা বলল, 'ভেতরে আসুন।'

ঘরে ঢুকে সঞ্জয় কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বলল,'আপনি পড়াশোনা করছিলেন। হঠাৎ এসে নিশ্চয়ই ডিসটার্ব করলাম।'

'তেমন কিছু নয়। বসুন—'

সঞ্জয়কে বসতে বলে নিজেও বসল সবিতা। তারপর উৎসুক চোখে আগন্তুকের দিকে তাকাল।

সঞ্জয় বলল, 'আমি লাহিড়ি সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি। উনি আপনাকে এটা দিতে বলেছেন।' প্যান্টের পকেট থেকে একটা লম্বা, পুরু খাম বার করল সে।

হিরণ্ময় লাহিড়ির মতো একজন বিজনেস ম্যাগনেটের প্রাইভেট সেক্রেটারি থাকতেই পারে। কিন্তু তাকে দিয়ে একটা খাম পাঠাবার উদ্দেশ্যটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সবিতা আগেই অবাক হয়েছিল। তার বিস্ময় এবার অনেকটাই বেড়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, 'কী আছে ওটার ভেতর?'

সঞ্জয় বলল,'খুললেই দেখতে পাবেন।'

অর্থাৎ সঞ্জয় এ সম্পর্কে মুখ খুলবে না। হয়তো হিরণ্ময় বারণ করে দিয়েছেন।

সঞ্জয়ের হাত থেকে খামটা নিয়ে টেবলে রাখতে রাখতে সবিতা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি আর কিছু বলবেন?'

সঞ্জয় বলল, 'হ্যাঁ। লাহিড়ি সাহেব বলেছেন, এই শহরের বিশেষ কিছুই আপনি চেনেন না। উনি সবসময় এমন ব্যস্ত থাকেন যে আপনাকে সঙ্গ দিতে পারেন না।'

চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে সবিতার। তীব্র গলায় সে বলে, 'আমাকে সঙ্গদানের দায়িত্বটা কি উনি আপনাকেই দিয়েছেন?'

সঞ্জয়ের মতো সপ্রতিভ যুবক একেবারে হকচকিয়ে যায়, 'না না, আপনাকে বোধহয় বোঝাতে পারিনি। যদি আপনি কোথাও বেরোন, লাহিড়ি সাহেবের ইচ্ছা আমি যেন গিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিই।'

সবিতা একটু নরম হল। বলল, 'উনি তো আমার জন্যে একটা গাড়ি আর ড্রাইভারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নতুন গাইডের আর কী দরকার?'

'ঠিক আছে। এখন তা হলে চলি—'বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় সঞ্জয়।

সবিতার হঠাৎ মনে হয়, তার ব্যবহারটা অকারণে রূঢ়ই হয়ে গেছে। সঞ্জয়ের কোনো দোষ নেই;

তাকে পাঠালে সে আর কী করতে পারে? প্রথম দিনই সবিতা হিরণ্ময়কে জানিয়ে দিয়েছিল, গাড়িটাড়ির প্রয়োজন নেই। কলকাতার রোড ম্যাপ আছে, বাসরুটের চার্টও পাওয়া যায়, ঠিকানা জানা থাকলে খুঁজে বার করা এমন কি শক্ত ব্যাপার? তবু সঞ্জয়কে পাঠিয়েছেন হিরণ্ময়। তার যাতে এতটুকু অসুবিধা না হয় সেই জন্যই কি?

সবিতা বলল, 'কিছু মনে করবেন না। আমার কথায় হয়তো হার্ট হয়েছেন।'

সঞ্জয় উত্তর না দিয়ে একটু হাসল।

সবিতা বলল, 'ধরুন আপনার সাহায্য দরকার হল; তখন আপনাকে কোথায় পাব?'

সঞ্জয় বুঝতে পারে, নিজের ব্যবহারের জন্য সবিতা অনুতপ্ত। সে তাকে খুশি করতে চাইছে। বলল, 'আমি সকাল ন'টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত এ বাড়িতেই থাকি। একতলায় একটা ঘরে আমার অফিস।'

সবিতা বলল, 'কিন্তু একটু আগে বললেন আপনি আপনার লাহিড়ি সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি। সারাদিন উনি তো বাড়িতে থাকেন না। 'অথচ—' বলতে বলতে থেমে গেল।'

সবিতা কী বলতে চায়, বুঝতে পারছিল সঞ্জয়। প্রাইভেট সেক্রেটারিকে সর্বক্ষণ তার নিয়োগকর্তার সঙ্গে ঘুরতে হয়। তা হলে সে বাড়িতে থাকে কী করে?

সঞ্জয় বলল, 'আমি লাহিড়ি সাহেবের পারসোনাল কিছু কাজ করি। সেটা এই বাড়িতে বসেই করতে হয়।' একটু থেমে বলল,'ওঁর অফিসিয়াল কাজকর্মের জন্য আরো দু'জন সেক্রেটারি আছে। তারা লাহিড়ি সাহেবের অফিসে বসে।'

সবিতা বলল, 'ও।'

সঞ্জয় আর দাঁড়াল না, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপর পড়ার টেবলে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। সামনে বইয়ের পাতা খোলা রয়েছে কিন্তু একটি বর্ণও মাথায় ঢুকছে না। মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে তার।

একসময় সঞ্জয়ের দেওয়া সেই খামটার কথা মনে পড়ে সবিতার। টেবল থেকে সেটা তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে মুখটা খুলতেই ভেতর থেকে চওড়া রাবার ব্যাণ্ডে বাঁধা একতাড়া নতুন একশ টাকার নোট আর টাইপ-করা একটা চিরকুট বেরিয়ে পড়ে। সেটায় লেখা আছে : হাত খরচের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পাঠানো হল। এখন থেকে প্রতি মাসের পয়লা তারিখে এই অঙ্কের টাকা দেওয়া হবে।

পাঁচ হাজার টাকা পকেট মানি! সবিতার মনে পড়ল, তার মা মৃত্যুর আগে স্কুল থেকে চার হাজার ন'শ বার টাকা মাইনে পেয়েছিল। হঠাৎ মাথার ভেতর চাকার মতো কিছু ঘুরে যায়।

নিজেকে সামলে নিতে খানিকটা সময় লাগে। পরক্ষণে সবিতার ভেতরকার সেই চাপা আক্রোশটা কেউ যেন খোঁচা দিয়ে উসকে দেয়। আরামের অজস্র উপকরণ আগেই চারপাশে সাজিয়ে রেখেছিলেন হিরণ্ময়। এখন সেটা নতুন করে সবিতার মস্তিষ্কে আলোড়ন তোলে। অঢেল সুখে তাকে ভাসিয়ে দিতে চাইছেন হিরণ্ময়।

হঠাৎ গেট খোলার ধাতব আওয়াজে নিচের দিকে তাকাল সবিতা। একটা নীল রঙের ঝকঝকে মারুতি এসটিম বাইরের রাস্তা থেকে কমপাউণ্ডের ভেতর এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। দরজা খুলে ড্রাইভওয়েতে নামলেন মনীষা।

এই মুহূর্তে ওই মহিলাটির জন্য মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত ছিল না সবিতা। ঠিক সাতদিন পর তাঁকে দেখল সে। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। সেদিন সামান্য কয়েক মিনিটের জন্য মনীষার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দু-চারটে কথাও হয়েছে। তাঁর ব্যবহার চমৎকার, কথাবার্তা কোমল এবং আন্তরিক। পরে অনেক ভেবেছে সবিতা কিন্তু মনীষার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মতো কিছু খুঁজে পায়নি। তবু প্রথম থেকেই মহিলাটিকে একেবারেই সহ্য করতে পারছে না। প্রথম দিন এঁকে দেখার পর থেকেই কেন যেন মনে হয়েছে মায়ের জীবনে যে বিপর্যয় ঘটেছে সে জন্য ইনিই দায়ী। এক এক সময় ভেবেছে, তার এই ধারণাটা হয়তো সম্পূর্ণ কাল্পনিক, নিজেরই মনগড়া। তবু ক্রমশ সেটা বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে।

গোটা পরিবেশে বিদ্যুৎপ্রবাহ বইয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন মনীষা। তেতলার এই টেবল থেকে তাঁকে আর দেখা যাচ্ছে না। চোখদুটো বইয়ের পাতায় আবার ফিরিয়ে আনল সবিতা।

কিন্তু যে উদ্যম নিয়ে সকালে পড়তে বসেছিল সেটা আর অবশিষ্ট নেই। সামনে বইয়ের খোলা পাতায় লাইনের পর লাইন জুড়ে অক্ষরের সমষ্টি অদ্ভুত হিজিবিজি আর দুর্বোধ্য হয়ে গেছে। পড়ায় কিছুতেই মন বসানো যাচ্ছে না।

কতক্ষণ কেটে গেল, সবিতার খেয়াল নেই। হঠাৎ খুব কাছে থেকে তার নাম ধরে কেউ ডেকে উঠল। চমকে ঘুরে তাকাতেই দেখা গেল, মাত্র পাঁচ ফুট দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছেন মনীষা।

সবিতা এতই অবাক, এমনই হতচকিত যে কী বলবে কী করবে, ভেবে পাচ্ছিল না। ধন্দ-ধরা মানুষের মতো সে তাকিয়ে রইল।

মনীষা খুব মিষ্টি করে হাসলেন, 'তোমার পারমিশান না নিয়েই ভেতরে চলে এসেছি কিন্তু।'

মহিলা সরাসরি তার ঘরে চলে আসবেন, সবিতা আদৌ এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। চূড়ান্ত বিস্ময়টা থিতিয়ে যেতে খানিক সময় লাগল। তারপর খুব নিস্পৃহ সুরে বলল, 'ঠিক আছে।' কেউ চলে এলে তাকে বসতে বলাটা ভদ্রতা। মনীষাকে শিষ্টাচার জানানো প্রয়োজন বোধ করল না সে।

মনীষা নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি রাগ করোনি তো?'

উত্তর না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করল সবিতা, 'আমার কাছে কোনো দরকার আছে?'

মনীষার মুখে হাসি লেগেই ছিল। বললেন, 'দরকার না থাকলে কি আসতে নেই?'

এতক্ষণে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়েছে সবিতা। স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে সে, কিছু বলে না।

মনীষা বললেন, 'সেদিন তোমার সঙ্গে ভাল করে আলাপ হয়নি। ভীষণ তাড়া ছিল, তাই চলে গিয়েছিলাম। আজ অনেকটা সময় নিয়ে এসেছি। তোমার সঙ্গে গল্প করব।'

কী ভেবেছেন মহিলা? তিনি গল্প করতে চাইছেন বলে সবিতা আহ্লাদে আটখানার জায়গায় একশ খানা হয়ে যাবে? টের পায়, মনীষা সম্পর্কে যে রাগ, যে অসন্তোষ মস্তিষ্কে চেপে বসে আছে সেটা ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে।

মনীষা এবার বললেন, 'কিছুক্ষণ আগে আমি এ বাড়িতে এসেছি। হিরণের সঙ্গে দেখা করেই তোমার ঘরে এলাম।'

সময় নষ্ট করা ছাড়া এসব কথার মানে নেই। অনাবশ্যক এবং বিরক্তিকর। তবু কতক্ষণ আর চুপ করে থাকা যায়। সবিতা বলল, 'আপনাকে আমি আসতে দেখেছি।'

কী ভেবে সবিতার পড়ার টেবলের দিকে ক' পা এগিয়ে জানালা দিয়ে নিচের দিকে তাকালেন মনীষা। বললেন, 'আরে তাই তো, এখান থেকে তো গেট, ড্রাইভওয়ে সব দেখা যায়। কেউ এলে বা বেরুলে চোখে পড়বেই।' আগের জায়গায় ফিরে এসে বললেন, 'এ ক'দিন খোঁজ নিতে পারিনি। তোমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

অসুবিধের কথাটা প্রথম দিনই জানতে চেয়েছিলেন হিরণ্ময়। তাঁর বাড়িতে সবিতা এসেছে। তিনি জিজ্ঞেস করতেই পারেন। কিন্তু তার স্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে মনীষার এত আগ্রহ কেন? কে তাঁকে এই দায়িত্ব দিয়েছে?

সবিতা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মনীষার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ স্থির হয়ে যায়। সবিস্ময়ে বলেন, 'এ কী!'

প্রথমটা বুঝতে পারেনি সবিতা। বেশ অবাক হয়ে সে লক্ষ করে, মনীষা একদৃষ্টে তার পরনের যে সস্তা প্রিন্টেড শাড়িটা রয়েছে সেদিকে তাকিয়ে আছেন। জিজ্ঞেস করে, 'কী দেখছেন?'

'এটা কী পরে আছ!' বলে কী ভেবে দ্রুত ওয়ার্ডরোবের কাছে গিয়ে সেটার পাল্লা খুলে ফেলেন। পরক্ষণে চলে যান ড্রেসিং টেবলের সামনে, সেটার তাকগুলো দেখে সোজা বাথরুমে। সেখানকার ওয়াল ক্যাবিনেট খুঁটিয়ে দেখার পর ফিরে এসে বলেন, 'এত শাড়ি, বাড়িতে পরার এত ড্রেস, কসমেটিকস কিনে এনেছি। কিন্তু তুমি তো কিছুই ছোঁও নি!'

সবিতা বলল, 'সেদিন আপনাকে বলেছিলাম কিনা মনে পড়ছে না। বলে থাকলে তবু আর এক বার বলি, এত দামি শাড়ি টাড়ি পরার অভ্যাস আমার নেই। আর যে সব কসমেটিকস কিনে দিয়েছেন তার বেশির ভাগই কখনও চোখে দেখিনি।'

মনীষা হাসলেন, 'এক সময় কষ্ট করেছ বলে সারা জীবন কষ্ট করে যাবে, তার কি কোনো মানে

আছে? আমার অনুরোধ তুমি ওগুলো পরো।'

সবিতা ভাবল, তার সম্বন্ধে হিরণ্ময়ের মুখে সবই শুনেছেন মনীষা। তার মতো একটি মেয়ে, জন্মের পর থেকে যে অশেষ দুঃখ অভাব এবং যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে কুড়িটা বছর পার করে দিয়েছে তার প্রতি বুঝিবা সহানুভূতিই বোধ করেন তিনি। সে ভাল থাক, ভাল পোশাক আশাক পরুক, পুরনো গ্লানিকর দিনগুলির স্মৃতি ভুলে সুখে থাক—এ সবই হয়তো চান। তবু এই গায়ে-পড়া শুভাকাঙ্খিণীকে মনের দিক থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না সবিতা। সে বলে, 'আমি ওই শাড়ি টাড়ি পরলে আপনার কী লাভ?'

একটু থমকে গেলেন মনীষা। তারপর হেসে হেসে বললেন, 'লাভ লোকসানের কথা জানি না। তবে আমি খুশি হব।'

'খুশি!'

'হ্যাঁ। কারণ তুমি আমার মেয়ের মতো।'

সবিতা গলার ভেতর অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করল, 'মেয়ের মতো!'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর আচমকা মনীষা বললেন, 'জানো সবিতা, আজ তোমার জন্যে হিরণ আমার কাছে ভীষণ বকুনি খেয়েছে।'

সবিতা হকচকিয়ে যায়, 'আমার জন্যে!'

'হ্যাঁ।'

'কেন বলুন তো?'

মনীষা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ক'দিন হল এসেছ?'

সবিতা বলল, 'সাত দিন।'

'শুনলাম এর ভেতরে একদিনও হিরণ তোমাকে ডেকে একসঙ্গে লাঞ্চ বা ডিনার খায়নি। এমনকি তোমাদের দু'জনের দেখাও হয়নি।'

সবিতা চুপ করে রইল।

মনীষা বললেন, 'দিস ইজ ব্যাড, এক্সট্রিমলি ব্যাড। এটা আমি ওর মুখের ওপর স্পষ্ট বলে দিয়েছি।'

সবিতার মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। সে বলে, 'কেউ যদি আমার সঙ্গে লাঞ্চ বা ডিনার না খান, আমাকে কাছে না ডাকেন, এতে বলার কী আছে?'

'কী বলছ তুমি!' মনীষাকে উত্তেজিত দেখায়, 'এই প্রথম এ বাড়িতে এলে, হিরণের কাছ থেকে অনেক বেশি অ্যাটেনশন, কেয়ার তোমার প্রাপ্য।' একটু ভেবে কণ্ঠস্বর অনেক নামিয়ে বলতে লাগলেন, 'আসলে ভীষণ ব্যস্ত তো। নইলে ওর মধ্যে সিমপ্যাথি, সফটনেস, এই ব্যাপারগুলো যথেষ্টই রয়েছে।'

মহিলা হিরণ্ময়ের মধ্যে যে মায়া মমতা গোপন রয়েছে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে এসেছেন নাকি? এবং সেটা তারই জন্য? এই প্রসঙ্গ নিয়ে আর কথা চালিয়ে যেতে একেবারেই ইচ্ছুক নয় সবিতা। সে বলল, 'দেখুন আমার পরীক্ষার খুব বেশিদিন দেরি নেই। কোর্সের অনেক পড়া রিভাইস করতে বাকি আছে।'

ইঙ্গিতটা পরিষ্কার। মনীষাকে অপ্রস্তুত দেখায়। তিনি বলেন, 'আমি আর ডিসটার্ব করব না। তুমি পড়। দুপুরে কিন্তু আমার আর হিরণের সঙ্গে তুমি খাবে।' সবিতাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

অন্যমনস্কর মতো বই টই নাড়াচাড়া করতে করতে বারটা বেজে গেল। তারপর স্নান সারতে আরো আধ ঘন্টা। শাড়ি পালটে সবিতা যখন চুল আচড়ানো শেষ করেছে সেই সময় মায়া দরজার কাছে থেকে ডাকল, 'দিদি—'

সেদিকে তাকিয়ে সবিতা জিজ্ঞেস করল, 'কী বলছ?'

'ওপরে চলুন। সাহেব আর মেমসাহেব আপনাকে যেতে বললেন।'

'ঠিক আছে।'

হঠাৎ সেই কারেন্সি নোটে ভরা খামটার কথা মনে পড়ে গেল সবিতার। সেটা টেবলেই পড়ে

আছে। কী ভেবে ওটা তুলে নিয়ে ঘরে বাইরে চলে এল সে। মায়া তার সঙ্গে সঙ্গে আসছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি একাই যাব। তুমি এখানেই থাক।'

তেতলায় আসতে দেখা গেল, হল-ঘরের একধারে দুটো সোফায় বসে আছে হিরণ্ময় আর মনীষা। দু'জনেরই স্নান হয়ে গেছে। হিরণ্ময় পরেছেন বাড়িতে পরার পোশাক—স্ট্রাইপ দেওয়া ঢোলা পাজামা আর শার্ট, মনীষার পরনে নরম সিল্কের হাউসকোট।

সবিতা আন্দাজ করে নিল, মনীষা মাঝে মাঝে এসে থাকলেও এ বাড়িতে তাঁর নানা ধরনের কয়েক সেট পোশাক আছে।

হিরণ্ময় এবং মনীষা একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'এস, এস, তোমার জন্যে ওয়েট করছি। —বসো—'

সামান্য দূরের একটা সোফায় বসতে বসতে হিরণ্ময়ের দিকে তাকিয়ে সবিতা বলল, 'আপনি প্রথম যে প্রশ্নটা করবেন তার উত্তরটা আগে দিই। আমি খুব আরামে আছি। কোনোরকম কমপ্লেন নেই।'

কয়েক পলক সবিতার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ শব্দ করে হেসে ওঠেন হিরণ্ময়, 'ভেরি স্মার্ট গার্ল। এই প্রশ্নটা ভবিষ্যতে আর কখনও করব না।'

সবিতা উত্তর দিল না।

হিরণ্ময় আজ নিয়ে মাত্র দু'বার তাকে দেখেছেন। তার মধ্যেই টের পাওয়া গেছে, মেয়েটা কেমন যেন অনমনীয় ধাতুতে তৈরি। এর সঙ্গে কথা বলতে হলে খুব সতর্ক থাকতে হবে। সবিতার মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমার আপত্তি না থাকলে একটা বিষয়ে জানতে চাই।'

সবিতার মসৃণ কপালে সামান্য ভাঁজ পড়েই মিলিয়ে গেল। সে বলল, 'কী জানতে চান?'

'তোমার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?'

'ভাল।'

'সেদিন টিউটরের কথা বলেছিলাম। যদি—'

হিরণ্ময়কে থামিয়ে দিয়ে সবিতা বলল, 'আমার মনে আছে। দরকার হলে জানাব।'

জীবনে বহু ধরনের নারী দেখেছেন হিরণ্ময়। এই একুশ বছর বয়সের তরুণীটি তাদের সবার থেকে আলাদা। স্বল্পভাষী, একটি অতিরিক্ত শব্দও তার মুখ থেকে বেরোয় না।

একটু চুপচাপ।

তারপর হিরণ্ময় বললেন, 'আমার একটা ভুল হয়ে গেছে। ত্রুটিও বলতে পার।' তাঁকে একটু অপ্রতিভ দেখাল।

সবিতা কোনোরকম কৌতূহল দেখাল না, খুব শান্ত চোখে তাকিয়ে রইল।

হিরণ্ময় বললেন, 'ক'দিন হল তুমি এসেছ। একদিনও একসঙ্গে বসে খাওয়া হয়নি। ইন ফ্যাক্ট—'

মনীষাকে দেখিয়ে সবিতা বলল, 'আমাকে যে ঘরে থাকতে দিয়েছেন, কিছুক্ষণ আগে উনি সেখানে গিয়েছিলেন। এ সব ওঁর মুখে শুনেছি। ওঁর কথায় বোধহয় ত্রুটিটা শুধরে নেবার জন্যে আমাকে খেতে ডেকেছেন?'

হিরণ্ময়কে বিব্রত দেখাল, 'না, মানে—'

এই সময় একটা মাঝবয়সী বেয়ারা ট্রলিতে বিয়ারের বোতল, গেলাস ইত্যাদি সাজিয়ে এনে সেন্টার টেবলে রাখল। সেদিকে তাকিয়ে মুখ শক্ত হয়ে ওঠে সবিতার।

'আমি আর নীনা লাঞ্চের আগে একটু বিয়ার খাই, অবশ্য নীনা যদি তখন এ বাড়িতে থাকে—' বোতল থেকে গেলাসে পানীয় ঢালতে গিয়ে হঠাৎ সবিতার মুখের কাঠিন্য লক্ষ করলেন হিরণ্ময়। একটু থমকে গেলেন তিনি। বললেন, 'তুমি খুব সম্ভব ড্রিংক ট্রিংক পছন্দ কর না।'

'না।' ভীষণ ঠান্ডা গলায় সবিতা বলল, 'আমি যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছি সেখানে ড্রিংকটাকে কেউ ভাল চোখে দেখে না। একরকম নিষিদ্ধই বলতে পারেন।'

হিরণ্ময় বললেন, 'এ'দেশের মিডল ক্লাস ফ্যামিলির লোকেরা, বুঝি ড্রিংক করে না?'

ইঙ্গিতটা যে মামার বাড়ি সম্পর্কে, তা ধরতে অসুবিধা হয় না সবিতার। সে বলল, 'নিশ্চয়ই করে। আমার মামারা অত্যন্ত ক্রুয়েল, সেলফিশ, কিন্তু মদটা তারা খায় না।'

'বিয়ার খাওয়াটা খুব বড় ধরনের অপরাধ নয়।'

হিরণ্ময়ের কথাটার ভেতর হয়তো মজা আছে, কিন্তু সবিতা ভাবল, এখানে আসার পর থেকে লোকটাকে সেভাবে আঘাত হানা হয়নি। মা যে সব মারণাস্ত্রে তাকে সাজিয়ে রেখেছে তার একটাও এখন পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারেনি সে। সংঘাতটা ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে সবিতা স্থির করল, আর দেরি করা ঠিক হবে না। মদ্যপানের একটা ছুতো যখন পাওয়া গেছে, শুরুটা করেই ফেলা যাক।

সবিতা বলল, 'মদের টেবলে কারো সঙ্গী হবার অভ্যাস আমার নেই। আপনারা খান। আমি যাচ্ছি—' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় সে।

এর জন্য হিরণ্ময় বা মনীষা কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা হতচকিত।

হিরণ্ময় বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি যখন চাও না, এসব আজ থাক।' যে বেয়ারা বিয়ার দিয়ে গিয়েছিল তাকে ডেকে বোতল, গেলাস নিয়ে যেতে বললেন।

সবিতা অবাক হয়ে গিয়েছিল। হিরণ্ময়ের এই পশ্চাদপসরণ সে ভাবতেও পারেনি। এ বাড়িতে তার অনিচ্ছাকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হবে, এ ছিল তার সুদূর কল্পনারও বাইরে।

হিরণ্ময় বললেন, 'আশা করি, তোমার আর আপত্তি নেই। বসো—'

সবিতা ভেতরে ভেতরে একটু হতাশই হল। সে তো লড়াই-ই চায়। কিন্তু হিরণ্ময় কি আপসের পক্ষপাতী? তার মধ্যে কী পরিমাণ আক্রোশ ঠাসা আছে, সে সম্বন্ধে লোকটা বুঝিবা পুরোপুরি সচেতন নয়। হিরণ্ময় আপাতত পিছিয়ে গেলেও সে তাঁকে ছাড়ছে না। হাতের কাছে যে সুযোগই আসুক সেটা কাজে লাগাতে চেষ্টা করবে।

বেয়ারা পানীয়ের বোতল টোতল নিয়ে গিয়েছিল। সবিতা আবার ধীরে ধীরে বসে পড়ল।

আবহাওয়াটা কেমন যেন অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্য হিরণ্ময় হেসে হেসে বললেন, 'পরিবেশ দূষণমুক্ত হয়ে গেছে। আশা করি এখন তুমি খুশি।'

সবিতা উত্তর দিল না।

হিরণ্ময় বললেন, 'শুনেছি সারাদিন তুমি ঘরেই থাক। এটা কিন্তু ঠিক না। মাঝে মাঝে বেরুলে ফ্রেশ লাগবে।'

কথা চালিয়ে যাবার জন্যই এসব বলা। অনাবশ্যক এবং ক্লান্তিকর। সবিতা এবারও চুপ করে থাকে।

হিরণ্ময়ের হঠাৎ কী মনে পড়ে যায়। বললেন, 'আমার সেক্রেটারিকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম।'

টাকার খামটা হাতেই ছিল সবিতার। সেটা তুলে ধরে সে বলল, 'উনি এটা আমাকে দিয়ে এসেছেন।'

'আমিই তো দিতে বলেছি।' বেশ অবাক হয়েই হিরণ্ময় বললেন, 'তুমি ওটা নিয়ে এলে কেন?'

খামটা সেন্টার টেবলে রেখে সবিতা বলল, 'পাঁচ হাজার টাকা পকেট মানি, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।'

হতবাক হিরণ্ময় তাকিয়ে থাকেন শুধু।

সবিতা থামেনি, 'আমার মা মৃত্যুর আগে কত মাইনে পেত জানেন?'

হিরণ্ময় জবাব দিলেন না।

সবিতা বলল, 'যে টাকাটা একমাসে ওড়াবার জন্যে দিয়েছেন তার চেয়েও কম। তাই দিয়ে আমাদের দু'জন মানুষের সমস্ত খরচ চালাতে হত। খাওয়াদাওয়া, জামাকাপড়, বাড়িভাড়া, যাতায়াতের জন্য রিকশভাড়া—সব।'

মনীষা নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছিলেন। এতগুলো টাকা হাতে তুলে দিলেও ছুঁড়ে ফেলে দেয়, এমন কাউকে আগে কখনও হয়তো দেখেননি। বললেন, 'বুঝতে পারছি তুমি অনেক কষ্ট করেছ। কিন্তু সে সব পুরনো দিনের কথা। এখন একটু আরাম কর। এ বাড়িতে পাঁচ হাজার টাকা খুব বড় অ্যামাউন্ট নয়।'

তীব্র দৃষ্টিতে একবার মনীষার দিকে তাকিয়ে দুই চোখ আবার হিরণ্ময়ের মুখের ওপর নিয়ে আসে

সবিতা। বলে, 'আপনাকে এ ক'দিনে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছি, এখন স্পষ্ট করে বলছি, দয়া করে আমার হ্যাবিট, আমার স্বভাব নষ্ট করে দেবেন না। অতীতটা আমার সমস্ত এক্‌জিসটেন্সের মধ্যে এমনভাবে মিশে আছে যে ওটাকে কোনোভাবেই ভোলা যাবে না। খুব সম্ভব, এ বাড়িতে আমি টোটালি মিসফিট।' বলে একটু হাসল।

হিরণ্ময় এবং মনীষা আন্তরিকভাবে পরিবেশটাকে স্বাভাবিক রাখতে চাইছেন কিন্তু সবিতা যেন প্রতিজ্ঞাই করেছে, ওদের অস্বাচ্ছন্দ্য কিছুতেই কাটতে দেবে না। সে আলাদা রকমের, এই বাড়ির পক্ষে একেবারেই সৃষ্টিছাড়া, প্রতি মুহূর্তে সেটা বুঝিয়ে ছাড়বে।

হিরণ্ময়ের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। একুশ বছরের একটা মেয়ে তাঁর টাকা ফিরিয়ে দিয়েছে, এটা তাঁকে ভেতরে ভেতরে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে, তাঁর সহ্যশক্তি যেন ভেঙেচুরে যাচ্ছে। এমন অপমানিত আগে কখনও হয়েছেন কিনা মনে পড়ছে না। দাঁতে দাঁতে চেপে নিজেকে তিনি সংযত রাখলেন। বললেন, 'তোমার মধ্যে অনেক রকম কমপ্লেক্স রয়েছে দেখছি।'

সবিতা অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'সেটাই তো স্বাভাবিক।'

হিরণ্ময় কী ভাবলেন তিনিই জানেন। স্থির চোখে সবিতাকে লক্ষ করতে করতে বললেন, 'আমি পকেট মানিটা সরলভাবেই তোমাকে দিতে চেয়েছিলাম। এর ভেতর অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।'

'আমার বয়েস বেশি নয়।' সবিতা আগের সুরেই বলতে লাগল, 'কিন্তু জন্মের পর থেকে এখন পর্যন্ত যা দেখেছি, যে সব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আমাকে আসতে হয়েছে, তাতে সারল্য বলে কিছুই আর বোধহয় আমার মধ্যে পড়ে নেই।'

এদিকে মনীষার প্রচেষ্টার শেষ নেই। তিনি ক্রমশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলেন। বুঝতে পারছেন, কোথায় যেন অদৃশ্য একটা ধস নামছে। সেটা ঠেকাবার জন্য হেসে, হালকা গলায় বললেন, 'এই মেয়ে, এত ভারি ভারি কথা শুনলে মাথা ঘুরতে থাকে।'

সবিতা কী বলতে যাচ্ছিল, মনীষা হাত তুলে তাকে থামালেন। বললেন, 'অনেক হয়েছে। একটা বাজতে চলল, এখন খাবার দিতে বলছি।'

হিরণ্ময়ের হঠাৎ যেন খেয়াল হল। বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

মনীষা আর বসলেন না, উঠে কিচেনে চলে গেলেন। হল-ঘরের একধারে বিশাল ডাইনিং টেবল। একটা কাজের লোককে দিয়ে নানা ধরনের সুখাদ্য এনে সেটা সাজিয়ে ফেললেন। সবিতাদের বললেন, 'হাতমুখ ধুয়ে বসে যাও—'

ডাইনিং টেবলের ডানপাশের দেওয়াল ঘেঁষে সাদা ধবধবে বেসিন, সেটার পাশে সুদৃশ্য পেতলের আংটায় ঝোলানো পর পর ক'টা তোয়ালে। তা ছাড়া রয়েছে লিকুইড সোপ।

মুখটুখ ধুয়ে ভাল করে মুছে সবিতা আর হিরণ্ময় খাবার টেবলে এসে বসলেন।

নানা আকারের দামি দামি ক্রকারিতে প্রচুর খাবার। সুগন্ধি সরু চালের ঝরঝরে ভাত, পোলাও, ফিনফিনে পাতলা রুমালি রুটি, স্যালাড, তিন চার রকমের মাছ, মুরগির মাংস, ছানার ডালনা, নিরামিষ তরকারি, মুগের ডাল, চাটনি ছাড়াও গাঢ় বাদামি রঙের দই, তালশাঁস সন্দেশ এবং রসমালাই।

টেবল থেকে চমৎকার সুঘ্রাণ উঠে আসছিল। সবিতার হঠাৎ মনে হল, সে যেন এ বাড়ির একজন অত্যন্ত সম্মানিত অতিথি। এতসব আয়োজন শুধু তাকে খুশি করার জন্য।

মনীষা হাত টাত ধুয়ে এসে কিন্তু বসলেন না, সবিতাকে বললেন, 'তোমাকে আগে কী দেব—ভাত, না পোলাও, না রুটি?'

বোঝাই যাচ্ছে, মহিলা পরিবেশন করে খাওয়াতে চাইছেন। সবিতা বলল, 'আমি খাব আর আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্লেটে খাবার তুলে দেবেন—এতে আমার ভীষণ অস্বস্তি হবে। দরকারমতো আমি নিয়ে নেব।'

হিরণ্ময় বললেন, 'সেই ভাল। নীনা তুমিও বসে পড়।'

মনীষার মুখ একটু গম্ভীর হল। নিজের হাতে সবিতাকে খাওয়াতে পারলেন না বলে তিনি কি ক্ষুব্ধ? ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'ঠিক আছে।'

সবাই যে যার মতো প্লেটে খাবার তুলে নিচ্ছে। সবিতা সাদা ভাত নিল, আর দু চামচ ডাল,

একটা তপসে মাছ ভাজা, দু টুকরো ছানার ডালনা, সামান্য নিরামিষ তরকারি।

মনীষা খেতে খেতে সবিতাকে লক্ষ করছিলেন। একটু আগের ক্ষোভটা তাঁর মনে রইল না। বললেন, 'এ কী, পোলাও নাও—স্যালাড তো ছুঁয়েও দেখলে না!'

সবিতা খোঁচা দিয়ে বলতে পারত, পোলাও খাওয়ার অভ্যাস তার নেই, জীবনে একসঙ্গে এত সুখাদ্য আগে কখনও দেখেনি, কিন্তু কিছুই বলল না। নিস্পৃহ মুখ করে খেয়ে যেতে লাগল।

মনীষা ব্যগ্রভাবে এবার বললেন, 'তোমার জন্যে এখানে ছুটে এসে নিজের হাতে মুরগির মাংস, পাবদার ঝাল আর দই ইলিশ করলাম। তুমি তার একটাও নিলে না। প্লিজ নাও, তুমি না খেলে আমার ভীষণ খারাপ লাগবে।'

মহিলার কথাগুলোর মধ্যে হয়তো যথেষ্ট আন্তরিকতা রয়েছে কিন্তু হঠাৎ সবিতা অনুভব করল তার মস্তিষ্কে আগুনের একটা হলকা খেলে যাচ্ছে। বলল, 'একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতেই পারছি না।'

মনীষা উৎসুক চোখে তাকালেন, 'কী কথা?'

সবিতা বলতে লাগল, 'প্রথম দিন এ বাড়িতে আসার পরই জানতে পারলাম আপনি আমার জন্যে বাজার ঘুরে দামি দামি পোশাক আর কসমেটিকস কিনে এনেছেন। আজ আবার কষ্ট করে এতসব রান্না করেছেন। কিন্তু কেন?'

এতক্ষণ নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছিলেন হিরণ্ময়। এবার বললেন, 'নীনা তোমাকে স্নেহ করে, তাই—'

সবিতা সামান্য ঘুরে হিরণ্ময়ের দিকে তাকায়। বলে, 'আশ্চর্য!'

'মানে?'

'যাকে আগে কখনও দেখেননি, যার সঙ্গে সামান্য পরিচয়ও ছিল না, হঠাৎ তেমন একটা অচেনা মেয়ের জন্য তাঁর এমন স্নেহের বান ডাকল কেন? আমার কাছে ব্যাপারটা মিস্টিরিয়াস।'

হিরণ্ময় বললেন, 'এর ভেতরে মিস্ট্রি কী আছে? তোমাকে ওর ভাল লেগেছে, সে জন্যে—'

সবিতা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'যাদের ভাল লাগে তাদের সবার জন্যেই বুঝি উনি এরকম পরিশ্রম করে থাকেন?'

হিরণ্ময়ের চোখের দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠল। তিনি উত্তর দিলেন না।

সবিতার হাতে একটা অদৃশ্য অস্ত্র যেন উদ্যত হয়েই আছে। সে বলতে লাগল, 'কেউ কাউকে অকারণে স্নেহ করে না। তার পেছনে উদ্দেশ্য বা কারণ, কিছু একটা থাকেই।'

হিরণ্ময় বললেন, 'আজ নিয়ে তোমাকে দু'বার দেখলাম। হিউম্যান নেচার যেটুকু আমার জানা আছে তাতে মনে হয়, কোনো কিছু সহজভাবে তুমি নিতে শেখোনি।'

'আপনার ধারণাটা শতকরা একশ ভাগ ঠিক।' সবিতা তীব্র গলায় বলল, 'সহজ বা স্বাভাবিক হবার মতো সুযোগ জীবনে কখনও পাইনি তো।'

খানিক আগেই নিজের সম্বন্ধে এ জাতীয় কিছু মন্তব্য করেছে সবিতা। অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়ে হিরণ্ময় বললেন, 'স্নেহ মমতার নিজস্ব কিছু পদ্ধতি আছে। আগে থেকে অঙ্ক কষে, কারণ তৈরি করে সেটা হয় না।'

'ওটা স্পনটেনিয়াস। আপনা থেকেই হয়—এই তো?'

'হ্যাঁ।'

সবিতা বলল, 'এবার আমি একটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন করতে চাই।'

হিরণ্ময় হাসলেন, 'দু'দিন আমরা মুখোমুখি বসেছি। যাতে স্বস্তি পাই এমন কথা তুমি কিন্তু খুব বেশি বল নি। তোমার প্রশ্নটা এবার শোনা যাক।'

'যাঁর স্নেহ অযাচিতভাবে পাচ্ছি তার পরিচয় কিন্তু এখনও জানি না। উনি কে?'

হল-ঘরে হঠাৎ নৈঃশব্দ্য নেমে আসে।

তারপর হিরণ্ময় বললেন, 'সেদিনই তো তোমাকে বলেছিলাম নীনা আমার বন্ধু। এর বেশি পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। এই ব্যাপারটা তুমি ভাবনাচিন্তা থেকে বার করে দাও। ফিক্সেশনের মতো মাথায় আটকে রেখ না।' শেষ দিকে তাঁর কণ্ঠস্বর রুক্ষ শোনায়।

বলেই হয়তো হিরণ্ময়ের মনে হল, কথাগুলো খুব রূঢ় হয়ে উঠেছে। ভেতরে ভেতরে হয়তো সামান্য বিব্রত বোধ করেন। তারপর চোখের দৃষ্টি নরম করে সবিতার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'জীবনে ভাল যদি কিছু আসে—মমতা, প্রীতি, সহানুভূতি—প্রশ্ন তুলে তুলে সেগুলো নষ্ট করে দিতে নেই।'

অর্থাৎ মনীষার পরিচয়টা আজও ধোঁয়াটে হয়ে রইল। সবিতা এ নিয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না।

এরপর নীরবে খাওয়া শেষ হল।

পাঁচ

আরো কয়েকটা দিন কেটে যায়।

এর মধ্যে মনীষাকে এ বাড়িতে আর দেখা যায়নি। তবে বার তিনেক হিরণ্ময়কে বেরিয়ে যেতে দেখেছে সবিতা। একদিন তো তাঁর সামনাসামনিই পড়ে গিয়েছিলেন। সারাক্ষণ সে নিজের ঘরেই থাকে। সেদিন সন্ধেবেলা একটানা পড়ার পর মাথাটা যখন ভার লাগছে, কপালের দু পাশের শিরাগুলো দপ দপ করছে, সে বাইরের হল-ঘরে এসে পায়চারি করছিল। এই সময় ফিরে এসেছিলেন হিরণ্ময়। সন্ধের পর যখনই ফেরেন—টলটলায়মান পায়ে, কাজের লোকের কাঁধে ভর দিয়ে, চোখদুটো থাকে আরক্ত, ঢুলুঢুলু। সেই দিনটা ছিল ব্যতিক্রম। হিরণ্ময়ের চোখ ছিল সাদা, বেয়ারাদের সাহায্য ছাড়াই শিরদাঁড়া টান টান করে তিনি হাঁটছিলেন। দোতলায় সবিতার সঙ্গে চোখাচোখি হতে একটু দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তারপর মৃদু হেসে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে সোজা তেতলায় উঠে গেছেন। দু'জনের মধ্যে কোনো কথা হয়নি।

এর মধ্যে বাড়ি থেকে একবারও বেরোয়নি সবিতা। সকাল থেকে অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনাই তার একমাত্র কাজ। ফাঁকে ফাঁকে স্নান, খাওয়া, সামান্য বিশ্রাম।

জানালার ধারে পড়ার টেবলে বসেই বেশির ভাগ সময়টা কাটিয়ে দেয় সবিতা। এ বাড়ির এককোণে সে পড়ে আছে—সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, যোগাযোগহীন। এখানকার কোনো কিছু সম্পর্কেই আপাতদৃষ্টিতে তার আগ্রহ থাকার কথা নয়। সোজা কথায় সে এখানে এসেছে নিরাপত্তার কারণে। ভাল রেজাল্ট করে একটা ভদ্র গোছের চাকরি জুটিয়ে এ বাড়ি থেকে চলে যাবে। ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সেরকমই ভেবে রেখেছে। কিন্তু এখানে আসার উদ্দেশ্য কি শুধু এটুকুই?

একটি ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনের নির্মম পরিণতির ভেতর সবিতার জন্ম। বড় হবার পর একটু বোধবুদ্ধি যখন হল সেই তখন থেকে তার মধ্যে হিরণ্ময় সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা আর আক্রোশের বীজ বুনে দিয়েছিল মা। সেটা ডালপালা ছড়িয়ে বিরাট আকারের একটা বিষবৃক্ষ হয়ে উঠেছে। মায়ের বিবাহিত জীবনের শুরুতে যে মারাত্মক সর্বনাশটা ঘটে গিয়েছিল, তার জন্য এতকাল হিরণ্ময়কে কাল্পনিক একটা কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে কতবার যে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে তার হিসেব নেই। কিন্তু কলকাতায় আসার পর মনীষাকে দেখে মনে হয়েছে হিরণ্ময়ের মতো এই মহিলাও সমান অপরাধী; এঁরও উপযুক্ত সাজা প্রাপ্য।

· যে ক'দিন এ বাড়িতে থাকছে, হিরণ্ময় এবং মনীষার ওপর একের পর এক আঘাত হেনে যাবে সবিতা। দু'জনকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে উসকে দেবার চেষ্টা কম করেনি কিন্তু ওঁরা রুখে দাঁড়াননি। ওঁদের আচরণে পালটা আক্রমণের কোনো লক্ষণই নেই।

হাজার চেষ্টা করেও পড়ার টেবলে বসে বইপত্রে যতটা মনোনিবেশ করা দরকার, কিছুতেই তা পেরে ওঠে না সবিতা। মাঝে মাঝেই সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

হিরণ্ময় জানিয়েছেন, মনীষা তাঁর বন্ধু। কিন্তু ওঁদের সম্পর্কটা দু অক্ষরের এই শব্দটিতে সীমাবদ্ধ রাখা ঠিক নয়। তিনি আরো বলেছেন, মনীষার ব্যাপারে অতিরিক্ত আগ্রহ যেন সবিতা প্রকাশ না করে। যা দেখছে সে ব্যাপারে যেন কোনো অপ্রীতিকর প্রশ্ন না তোলে। তিনি চান স্থিতাবস্থা বজায় থাক। পৃথিবীর আহ্নিক গতি আর বার্ষিক গতি যে মসৃণ নিয়মে চলছে, এটাও তেমনভাবেই চলুক। খোঁচা মেরে মেরে কেউ যেন তাতে বিঘ্ন না ঘটায়।

কিন্তু নিজেকে শান্ত, নিরাসক্ত রাখতে পারছিল না সবিতা। ভেতর থেকে অদৃশ্য কেউ যেন দিগ্‌নির্ণয় যন্ত্রের কাঁটার মতো বার বার মনীষাকে আঙুল তুলে দেখিয়ে যাচ্ছিল।

আজ দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ঘরোয়া পোশাক পালটে, চুল আঁচড়ে বেণী করে নিল সবিতা। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই হল-ঘরে মায়ার সঙ্গে দেখা। মেয়েমানুষটা প্রথম দিন থেকে তার সঙ্গে জুড়ে আছে তো জুড়েই আছে।

মায়া দারুণ অবাক হয়ে উঠে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি কোথাও যাবেন দিদি?' সবিতাকে একদিনও সাজগোজ করে বেরুতে দেখেনি সে, তার বিস্ময়ের কারণ সেটাই।

সবিতা বলল, 'হ্যাঁ।'

কোথায় যাবে সেটা জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না মায়ার। এ ক'দিনেই সে টের পেয়ে গেছে, বাড়তি কৌতূহল সবিতা আদৌ পছন্দ করে না। তবু ঢোক গিলে বলল, 'ফিরতে কী দেরি হবে?'

'ঠিক বলতে পারছি না—'

সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে আসে সবিতা। প্রথম দিন বাড়ির ভেতর ঢুকে যে মাঝবয়সী লোকটাকে দেখা গিয়েছিল সেই অনিল একটা ডাস্ট-ক্লিনার মেশিন চালিয়ে কার্পেটের ধুলো সাফ করছিল। সবিতাকে দেখে মেশিন থামিয়ে দেয়। মায়ার মতো সেও অবাক চোখে তাকায়। কেননা এখানে আসার পর সবিতা একদিনও নিচে নামেনি।

অনিল জিজ্ঞেস করে, 'দিদি আপনি!'

তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সবিতা বলে, 'সঞ্জয়বাবু কোথায় বসেন?'

ডান কোণের শেষ ঘরটা দেখিয়ে অনিল বলে, 'ওখানে—'

লম্বা হল-ঘর পেরিয়ে ওধারে চলে যায় সবিতা।

সঞ্জয়ের ঘরটা মাঝারি মাপের। চেয়ার, গ্লাস-টপ টেবল, দেওয়ালের গায়ে সুদৃশ্য ক্যাবিনেট ইত্যাদি দিয়ে চমৎকার সাজানো।

সঞ্জয় টেবলের ওপরে ঝুঁকে কী লিখছিল। তার হাতের কাছে একধারে টেলিফোন, টেবল ক্যালেন্ডার, পেন হোল্ডারে কয়েকটা কলম, লেখার প্যাড, আর এক পাশে ফাইলের স্তূপ।

দরজার বাইরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সবিতা। একসময় খুব আস্তে ডাকে, 'মিস্টার মল্লিক—'

চমকে সঞ্জয় মুখ তোলে। সবিতাকে তার ঘরের সামনে দেখবে, ব্যাপারটা এমনই অভাবনীয় যে বেশ খানিকটা সময় বিহ্বলের মতো তাকিয়ে থাকে। নিজের চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। হতবুদ্ধি ভাবটা কাটিয়ে একসময় প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে।

সবিতা বলে, 'ভেতরে আসতে পারি?'

সঞ্জয় যেন ঘোরের মধ্যে থেকে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। প্লিজ আসুন—' সবিতা ঘরে ঢুকলে তাকে বসতে বলে নিজেও ধীরে ধীরে বসে পড়ে।

সবিতা কুণ্ঠিত মুখে বলে, 'আপনি কাজ করছিলেন। এ সময় আসা বোধহয় ঠিক হয়নি।'

সঞ্জয় বলল, 'ওটা এমন কিছু জরুরি কাজ নয়। পরে করলেও চলবে।'

সবিতা বলে, 'আপনার কাছে বিশেষ একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি। জানি না সেটা আপনি করতে পারবেন কিনা?'

সঞ্জয় বেশ জোর দিয়েই বলে, 'অবশ্যই পারব। বলুন আমাকে কী করতে হবে?'

সবিতা হেসে ফেলল, 'আমি কী অনুরোধ করব, সেটা রাখা সম্ভব কিনা, না শুনে না বুঝে কথা দিয়ে দিলেন?'

সঞ্জয় থতমত খেয়ে যায়। ঝোঁকের মাথায় কথা দেবার সময় ভাবেনি, সবিতার অনুরোধটা কী ধরনের হতে পারে। আকাশের চাঁদ পেড়ে আনতে বললে তা তো সম্ভব নয়। তাকে এবার বেশ অপ্রস্তুত দেখায়। বলে, 'ঠিক আছে, আগে তা হলে শুনেই নিই।'

সবিতা বলল, 'সেদিন ওপরে আমার ঘরে গিয়ে বলেছিলেন, কখনও কোনো দরকার হলে আমাকে সাহায্য করবেন।'

সঞ্জয় জানায়, তার মনে আছে। লাহিড়ি সাহেব অর্থাৎ হিরণ্ময়ের নির্দেশ সেরকমই।

সবিতা বলল, 'আপনি তো লাহিড়ি সাহেবের সেক্রেটারি, তাঁর সব খবরই আপনাকে রাখতে হয়—তাই তো?'

সঞ্জয় এবার বেশ সতর্ক হয়ে যায়। সবিতার চোখের দিকে তাকিয়ে রীতিমত ভেবে ভেবে বলে, 'সব না হলেও অনেকটাই জানি। কেন বলুন তো?'

সবিতা বলল, 'লাহিড়ি সাহেবের বান্ধবী মনীষাদেবীর বাড়ির ঠিকানা, আমার ধারণা, আপনার জানা আছে।'

হঠাৎ যেন শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল সঞ্জয়ের। দম-আটকানো গলায় সে বলল, 'হ্যাঁ, জানি। কিন্তু—'

তার কথা শেষ হতে দিল না সবিতা। জিজ্ঞেস করল, 'তিনি কোথায় থাকেন?'

'অনেক দূরে— নর্থ ক্যালকাটায়।'

'কাইগুলি ওঁদের রাস্তার নাম আর বাড়ির নম্বরটা বলুন।'

সবিতা যেন ধাক্কা দিতে দিতে তাকে গভীর খাদের কিনারে নিয়ে এসেছে। সন্ত্রস্ত, হতচকিত সঞ্জয় শুকনো গলায় বলল, 'দেখুন ওটা লাহিড়ি সাহেবের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। উনি যদি জানতে পারেন ঠিকানাটা আমার কাছ থেকে জেনেছেন, তা হলে—' বলতে বলতে চুপ করে গেল।

সঞ্জয়ের ইঙ্গিতটা পরিষ্কার। সবিতা বলল, 'জানতে পারবেন না। আপনি বিপন্ন হবেন, এমন কিছু কি আমি করতে পারি?'

আশ্বাস সত্ত্বেও সঞ্জয়ের সংশয় পুরোপুরি কাটে না। উদ্বিগ্ন মুখে সে জিজ্ঞেস করে, 'রাগ না করলে একটা কথা জানতে চাইব—'

'কী?'

'মনীষাদেবীর ঠিকানা চাইছেন কেন? আপনি কি ওঁদের বাড়ি যেতে চান?'

'নিশ্চয়ই।'

সঞ্জয় চমকে উঠল, 'উনি তো প্রায়ই এ বাড়িতে আসেন। এখানেই ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন।'

সবিতা বলল, 'এখানে দেখা করলে যদি কাজ হত, ওঁদের বাড়ি যাব কেন?'

'আমার একটা কথা রাখবেন মিস লাহিড়ি?'

সঞ্জয় কী বলতে পারে, আঁচ করে নিয়েছে সবিতা। সে কোনো প্রশ্ন করল না। তার চোখ দুটো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল শুধু।

সঞ্জয় ভয়ে ভয়ে এবার বলতে লাগল, 'দয়া করে আপনি মনীষাদেবীর বাড়ি যাবেন না।'

'কেন বলুন তো?'

'তা হলে লাহিড়িসাহেব ভীষণ অসন্তুষ্ট হবেন।'

খুব ঠান্ডা গলায় সবিতা বলল, 'এ নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। ঠিকানাটা লিখে দিন।'

মুখ নিচু করে ঠিকানাটা লিখে সবিতাকে দিতে দিতে সঞ্জয় বলল, 'দয়া করে আমাকে কিন্তু আপনার সঙ্গে যেতে বলবেন না।'

'কক্ষনো না।'

সঞ্জয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে সবিতা যখন বাইরের লনের কাছে চলে এসেছে সেই সময় একটা লোক ছুটতে ছুটতে সামনে এসে দাঁড়ায়। হাতজোড় করে বিনীত ভঙ্গিতে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলে, 'আমার নাম রাম সিং। আপকো ডেরাইভার। আপনি কি বাহার যাবেন মেমসাব?'

সবিতা বলল, 'হ্যাঁ।'

সবিতা বুঝতে পারে, একেই তার যাতায়াতের জন্য ঠিক করেছেন হিরণ্ময়। রাম সিংকে আগে না দেখলেও সে নিশ্চয়ই তাকে দেখেছে। কখন সবিতা নিচে নামবে, কখন বেরুতে চাইবে, সে জন্য সারাক্ষণ নিচে অপেক্ষা করে।

রাম সিং বলল, 'আপনি থোড়েসে এখানে দাঁড়ান মেমসাব। আমি গাড়ি নিয়ে আসছি।'

'গাড়ির দরকার নেই।' সবিতা মিথ্যে করেই বলল, 'আমি কাছেই যাব।'

রাম সিং তবু নাছোড়বান্দা। সে বলল, ' যেখানেই যান, আমি পৌঁছে দিচ্ছি। ব্রিফ আপকে লিয়ে এক গাড়ি মজুত আছে। আপনি না চড়লে বড়ে সাব আমার ওপর গুস্সা করবেন।'

'তোমার ভয় নেই। বড় সাহেবকে আমি বুঝিয়ে বলব।' সবিতা আর দাঁড়ায় না, সোজা গেটের দিকে এগিয়ে যায়।

ছয়

সাউথ-এন্ড পার্ক পেছনে ফেলে বড় রাস্তায় এসে একে ওকে জিজ্ঞেস করে, দুটো মিনি বাস পালটে শ্যামবাজার পৌঁছে যায় সবিতা।

কলকাতার এই অঞ্চলটায় আগে কখনও মায়ের সঙ্গে এসেছে কিনা মনে করতে পারল না সে। সাউথের তুলনায় উত্তর দিকটা অনেক বেশি ঘিঞ্জি। ভাঙাচোরা, খানাখন্দে বোঝাই রাস্তা, ফুটপাথগুলো হকারদের দখলে, চারদিকে থিকথিকে পোকার মতো মানুষের ভিড়। ফুসফুসে টানার মতো পর্যাপ্ত বাতাসের একান্ত অভাব। আবর্জনার পাহাড়, দুর্গন্ধ, হাজার হাজার গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা পোড়া গ্যাসোলিনের বিষাক্ত কালো ধোঁয়া—সব মিলিয়ে জায়গাটা প্রায় নরকের খাস তালুক।

শ্যামবাজারের পাঁচ রাস্তার ক্রসিং থেকে অভয় সরকার রোডের সাতাশ নম্বর বাড়িটা খুঁজে বার করতে দশ মিনিটও লাগল না সবিতার।

বাড়িটা দোতলা, কম করে ষাট সত্তর বছরের পুরনো। তবে খুব অল্প দিন আগে ওটার রং করা হয়েছে। বাতাসে এখনও টাটকা পেন্টের গন্ধ ভেসে বেড়ায়।

সামনের দিকে এক ফালি জায়গা রেলিং দিয়ে ঘেরা। একধারে লোহার ছোট গেট। গেটটা খুলে সিঁড়ির পাঁচটা ধাপ ওপরে উঠে কলিং বেল বাজাল সবিতা। তার মধ্যে কোনোরকম আড়ষ্টতা বা দ্বিধার ভাব নেই। একটা অনমনীয় জেদ তাকে শ্যামবাজার পর্যন্ত টেনে এনেছে। সাউথ-এন্ড পার্কে মনীষা যান ঠিকই কিন্তু সেখানে অনেক অসুবিধা আছে। তাঁকে সে এমন কিছু প্রশ্ন করতে চায়, হিরণ্ময়ের সামনে সেটা সম্ভব নয়। প্রতি মুহূর্তে হিরণ্ময় তাকে বাধা দিয়ে যাবেন।

তাই একটা গোপন সাক্ষাৎকার খুবই জরুরি যেখানে সে আর মনীষা ছাড়া অন্য কেউ থাকবে না। মুখোমুখি বসে নিজের অস্ত্রভাণ্ডার থেকে একটার পর একটা তীর ছুঁড়ে যাবে। এই শরবর্ষণ থেকে কতক্ষণ মনীষা নিজেকে বাঁচাতে পারেন সেটাই এখন দেখার।

অবশ্য সবিতার এই আসার ব্যাপারটা গোপন থাকবে না। মনীষা ঠিকই হিরণ্ময়কে জানিয়ে দেবেন। তার ফলাফল কী হতে পারে? পরিণতি যাই ঘটুক, সমস্ত কিছুর জন্য সবিতা প্রস্তুত।

সামনের দরজা খুলে মনীষা যে আগন্তুকটিকে দেখলেন, তার কথা এই মুহূর্তে কল্পনাও করেনি। যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি বিস্ময়কর। মনীষা খুব সম্ভব খেয়ে দেয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় চোখ দুটো লালচে, ফোলা ফোলা। তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত শরীরে শিহরণ খেলে গেল যেন। বললেন, 'তুমি!'

সবিতা তাঁর চোখে চোখ রেখে বললেন, 'আগে খবর না দিয়ে এসেছি। আমার মনে হয়েছে, এভাবেই আসা উচিত।'

মনীষার চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়। তিনি উত্তর দেন না।

সবিতার মুখে হাসির মতো কিছু ফুটে ওঠে। সে বলে, 'বুঝতে পারছি আমি এখানে অবাঞ্ছিত। তবু ভেতরে যেতে পারি কি? আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

মনীষা এবার সামান্য ব্যস্ত হলেন, 'এস।' সবিতা বাড়ির মধ্যে ঢুকলে তিনি সদর দরজা বন্ধ করে দিলেন। দরজার পর থেকে বাঁধানো, চৌকো চাতাল। সেটা ঘিরে অনেকগুলো ঘর। চাতালের ওধারে কোণের দিকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি।

সবিতা জিজ্ঞেস করল, 'বাড়িতে আপনি ছাড়া আর কে কে আছে?'

এরকম একটা প্রশ্ন বুঝিবা আশা করেননি মনীষা। একটু অবাক হয়ে বললেন, 'দু'জন কাজের মেয়ে।'

'আর কেউ থাকে না?'

'আমার এক ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ে ক্লাস টুয়েলভে পড়ে, ছেলে টেনে। তারা এখন স্কুলে।' মনীষা বললেন, 'এসব জানতে চাইছ কেন?'

সবিতা বলল, 'আমি আপনার সঙ্গে এমন কোথাও বসতে চাই যেখানে হুট করে কেউ এসে হাজির হবে না।'

দ্বিধান্বিতের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন মনীষা। তারপর বলেন, 'ঠিক আছে, আমার ঘরেই যাওয়া যাক।' সবিতাকে সঙ্গে করে চাতাল পেরিয়ে ওধারের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে দোতালার একটা ঘরে চলে এলেন তিনি।

ঘরখানা বিরাট মাপের। মাঝখানে মেহগনি কাঠের কারুকাজ-করা সাবেক ফ্যাশনের প্রকাণ্ড খাটে ধবধবে বিছানা। অন্য আসবাবগুলোও তাই, দুষ্প্রাপ্য মেহগনি দিয়ে অন্তত ষাট সত্তর বছর আগের তৈরি। আলমারি, ওয়ার্ডরোব, চেয়ার, কুশন, ড্রেসিং টেবল, খাটের পাশের সাইড টেবল, দেওয়ালের দীপাধার, এমন কি টেলিফোন রাখার স্ট্যান্ড, সমস্ত কিছুতেই প্রাচীনত্বের ছাপ মারা। সিলিং থেকে চার ব্লেডের দুটো সেকেলে ফ্যান ঝুলছে। অবশ্য এক দেওয়ালে একটা নতুন এয়ার-কন্ডিশনারও চোখে পড়ে।

সারা ঘরটা মৃদু সুগন্ধে ভরে আছে। খুব সম্ভব তিন চার ঘন্টা আগে সেন্ট টেন্ট ছড়ানো হয়েছিল। তার রেশটা এখনও থেকে গেছে।

মনীষা একটা গদি-মোড়া চেয়ারে সবিতাকে বসতে বলে নিজের খাটের ধারে পা মুড়ে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এ বাড়ির ঠিকানা তুমি কোথায় পেলে?'

সবিতা বলল, 'সামান্য বুদ্ধি থাকলে কারো ঠিকানা জানতে পারাটা কি খুব ডিফিক্যাল্ট ব্যাপার?'

তার উত্তরে খুশি হলেন না মনীষা। একটু জেদি গলায় জানতে চাইলেন, 'কে দিয়েছে এখানকার হদিস?' একটু থেমে বললেন, 'কলকাতা শহরের বিশেষ কিছুই তুমি চেনো না। কেউ পৌঁছে না দিয়ে গেলে কিংবা ভাল করে রাস্তা বুঝিয়ে না দিলে এখানে আসা তোমার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব হত না। লোকটা কে?'

সবিতা খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল,'আপনার সঙ্গে দেখা করাটা আমার কাছে সবচেয়ে জরুরি। আপনার পক্ষেও সেটা কম ইমপর্টান্ট নয়। কোথায়, কিভাবে, কার কাছে এ বাড়ির ঠিকনা পেয়েছি তা নিয়ে অত ভাবাভাবির দরকার নেই।'

ভেতরে ভেতরে একটু থমকে গেলেন মনীষা। তারপর বললেন, 'তুমি যে আমার কাছে এসেছ হিরণ জানে?'

'না।'

'ওকে জানিয়ে আসা উচিত ছিল।'

'প্রয়োজন মনে করি নি।'

'হিরণ জানতে পারলে কিন্তু রাগ করবে।'

'হয়তো করবেন। তাতে আমার কিছু যায় আসে না।'

কী বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন মনীষা। সবিতা তাঁকে লক্ষ করছিল। সাউথ-এন্ড পার্কে দুবার তাঁকে দেখেছে। সেখানে তাঁর আচরণে এবং কথাবার্তায় মমতা, সহানুভূতি এবং গভীর আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে। কিন্তু শ্যামবাজারের এই বাড়িতে সবিতাকে দেখার পর থেকে তিনি কেমন যেন সন্দিগ্ধ, দ্বিধাগ্রস্ত, চাপা উৎকণ্ঠায় কুঁকড়ে আছেন।

অনেকটা সময় নৈঃশব্দের ভেতরে কেটে যায়।

তারপর মনীষা কিছুটা সাহস জড়ো করে বলেন, 'এবার বল আমার কাছে কী জন্যে এসেছ?'

সবিতা সোজা মহিলার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হিরণ্ময় লাহিড়ির সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ?'

'তা জেনে কী হবে?'

'সেটা আমি বুঝব।'

চোখ দুটো অন্যদিকে সরিয়ে মনীষা বললেন,'একুশ বছর আগে।'

সবিতা বলল, 'তার মানে আমার জন্মের সময়।'

মনীষা জবাব দিলেন না।

সবিতা বলল, 'আমার মা তখন মামাবাড়িতে। আর সেই সুযোগটা আপনি পুরো কাজে লাগিয়েছিলেন।'

তীব্র গতিতে মনীষার মুখটা ফের সবিতার দিকে ঘুরে গেল। বললেন, 'কী বলতে চাইছ তুমি?'

মনীষার দিকে আঙুল বাড়িয়ে কর্কশ গলায় সবিতা বলল, 'আমার মায়ের ম্যারেড লাইফ আপনার জন্যে রুইনড হয়ে গেছে। আমাদের সুখ, আমাদের বেঁচে থাকার চার্ম, আমাদের ভবিষ্যৎ, সব আপনি ধ্বংস করে দিয়েছেন।'

একটা অল্প বয়সের মেয়ে তাঁর বাড়িতে এসে এমন আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কথা বলতে পারে, ভাবা যায় না। অপমানে মুখ লাল হয়ে ওঠে মনীষার। কানের ভেতর থেকে লু-বাতাসের মতো তপ্ত ভাপ বেরিয়ে আসতে থাকে। মেয়েটা তার মায়ের বিবাহবিচ্ছেদের জন্য সরাসরি তাঁকেই দায়ী করছে। সবিতার সীমাহীন স্পর্ধা, তার দুঃসাহসের মুখোমুখি বসে কী করবেন, কিছুই স্থির করে উঠতে পারেন না মনীষা। ঘাড়ধাক্কা দিয়ে এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বার করে দেবেন কি? অথবা দুই গালে ঠাস করে সজোরে চড় কষিয়ে দেবেন? এই ক্ষিপ্ত বদরাগী উদ্ধত মেয়েটার জন্য কী করতে চাননি তিনি? সে যাতে যাবতীয় অভিমান আর আক্রোশ ভুলে যায়, হিরণ্ময়ের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা স্বাভাবিক এবং মধুর হয়ে ওঠে, সেটাই তাঁর একান্ত কাম্য ছিল। অথচ সবিতা তার মা এবং তার নিজের সমস্ত দুঃখকষ্টের জন্য তাঁকেই দোষারোপ করে বসল!

বিপর্যস্ত, অপমানিত মনীষা সবিতা সম্পর্কে যা ভাবলেন তার কিছুই করতে পারলেন না। বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর দুহাতে মুখ ঢেকে বসে রইলেন। আর কোনাকুনি ড্রেসিং টেবলে আটকানো বিশাল বেলজিয়ান গ্লাসের ঝকঝকে আয়নায় একটি বিধ্বস্ত, সুন্দরী মহিলার প্রতিচ্ছবি দেখতে লাগল সবিতা।

একসময় মুখ থেকে হাত সরিয়ে ধরা ধরা, ভাঙা গলায় মনীষা বললেন, 'বিশ্বাস কর সবিতা, তোমার মা-বাবার ডিভোর্সের ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই। কারো সংসার ভাঙাটাকে আমি অপরাধ মনে করি।'

সবিতা রুক্ষ স্বরে বলল, 'আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

মনীষা ব্যাকুলভাবে বলেন, আমার স্বামী তখন জীবিত। তিনি ছিলেন খুবই সুপুরুষ—তা ছাড়া উদার, হৃদয়বান। গ্রেট সোল বলতে যা বোঝা যায় তা-ই। আমাদের মধ্যে পারফেক্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল। সবাই বলত, এমন সুখী পেয়ার নাকি হয় না। বিয়ের পর একটি মেয়ে যা যা চায় সবই আমি পেয়েছিলাম।'

সবিতা ভুরু কুঁচকে বলে, 'আপনি কী বলতে চাইছেন?'

'বলতে চাইছি, একজন সুখী মানুষ কেন অন্যের ক্ষতি করতে যাবে?'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনার স্বামী বেঁচে নেই।'

'না।' বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়েন মনীষা, 'এগার বছর আগে তিনি মারা গেছেন।'

একটু চুপচাপ।

তারপর সবিতা জিজ্ঞেস করে, 'আপনার বাড়ি শ্যামবাজারে, হিরণ্ময় লাহিড়ির সাউথ-এণ্ড পার্কে। মাঝে মাঝে দু-চারদিন আপনি ওখানে গিয়ে থাকেন। আপনাদের সম্পর্কটা কী?'

খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে আসছিলেন মনীষা। সবিতার প্রশ্নটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখটা আবার ভেঙেচুরে যেতে থাকে। শিরদাঁড়া বেঁকে দুমড়ে যাচ্ছে।

খাটের কোণে একটা বিধ্বস্ত মানুষের অবয়ব দেখতে দেখতে হয়তো একটু অস্বস্তি বোধ করে সবিতা। জানতে চায়, 'কী হল আপনার?'

প্রথমটা উত্তর দেন না মনীষা। মুহ্যমানের মতো বসেই থাকেন। অনেকক্ষণ পর কোনো এক অতল স্তর থেকে নিজেকে যেন তুলে নিয়ে আসেন। ঝাপসা গলায় বলেন, 'হিরণের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এক কথায় জানানো যায়। কিন্তু—'

'কী?'

'তার আগে একটা লম্বা ইতিহাস তোমাকে শুনতে হবে। নইলে এই রিলেশানটা ঠিক বুঝতে পারবে না।'

'আপনি বলুন।'

মনীষার স্বামী প্রিয়ব্রত মিত্র ছিলেন হিরণ্ময়দের একটা কোম্পানির অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার। কলেজে দু'জনে একসঙ্গে পড়েছেন।

মাঝে মাঝে শ্যামবাজারের এই বাড়িতে আসতেন হিরণ্ময়। অনেকগুলো কোম্পানির মালিক, প্রচুর প্রপার্টি, ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা—কিন্তু সামান্য অহমিকাও ছিল না। ভদ্র, প্রাণবন্ত, মিশুক, আমুদে এই মানুষটিকে দেখলে মন ভাল হয়ে যেত। তিনি যেন সঙ্গে করে খানিকটা টাটকা হাওয়া নিয়ে আসতেন। ওঁকে খুব ভাল লাগত মনীষাদের। তাঁরা হিরণ্ময়কে শ্রদ্ধা করতেন। কোনো সপ্তাহে হিরণ্ময় না আসতে পারলে তাঁদের মন খারাপ হয়ে যেত।

এর পাশাপাশি সমান্তরালভাবে একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার ঘটছিল। তখনও হিরণ্ময়ের বাবা সতীন্দ্রনাথ বেঁচে আছেন। এতগুলো প্রতিষ্ঠানের মালিকের একমাত্র ছেলে মনীষাদের বাড়ি নিয়মিত আসেন, এটা অনেকের পছন্দ হচ্ছিল না। এদের ভেতর বেশির ভাগই ছিল মেয়েরা। পরিচয় গোপন রেখে তারা প্রায়ই ফোন করত, কেউ কেউ বেনামে চিঠিও লিখত। শুভাকাঙ্খীর মতো তাদের একটাই পরামর্শ, হিরণ্ময়ের সঙ্গ তাঁরা যেন ত্যাগ করেন। লোকটা লম্পট, দুশ্চরিত্র, বন্ধুর ছদ্মবেশে মেলামেশা করে কত মেয়ের যে সর্বনাশ করেছে তার হিসেব নেই। লোকটার আপাত সরল, নিষ্পাপ মুখোশের তলায় যে আসল মুখটা লুকিয়ে আছে তা সাঙ্ঘাতিক। মনীষা দারুণ রূপসী, তাঁর শারীরিক আকর্ষণ তীব্র। যে কোনো মুহূর্তে তাঁর ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তিনি যেন বিষাক্ত রোগ-জীবাণুর মতো হিরণ্ময়কে দূরে সরিয়ে রাখেন।

পরিচয়হীন হিতাকাঙ্ক্ষীদের সতর্কবাণী গ্রাহ্য করেননি মনীষারা। তাঁদের মনে হয়েছে এইসব ফোন এবং চিঠির পেছনে একটাই কারণ— সেটা হল ঈর্ষা।

দেখতে দেখতে ক'টা বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে নর্থ বেঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে দুম করে শোভনাকে বিয়ে করে আনলেন হিরণ্ময়। কিন্তু তাঁদের ক্ষণস্থায়ী দাম্পত্য জীবনের আয়ু দু বছরের বেশি হবে না। কেনই বা সধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি মেয়েকে তিনি বিয়ে করে আনলেন এবং কেনই বা হঠাৎ শোভনার সঙ্গে চিরতরে সম্পর্কটা ছিন্ন করলেন, মনীষাদের কাছে এটা এখনও একটা জটিল ধাঁধা হয়ে আছে। হিরণ্ময়কে তাঁরা অনেক বুঝিয়েছেন, একটা মেয়ের জীবন এভাবে নষ্ট করে দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু ও নিয়ে কোনো অনুরোধ বা পরামর্শ তিনি শুনতে চান নি।

এর মধ্যে মনীষার জীবনে দুটো বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে। ছেলেমেয়ের জন্ম এবং স্বামীর মৃত্যু। প্রিয়ব্রত ছিলেন সুস্থ, প্রাণবন্ত, তরতাজা একটি মানুষ। দারুণ স্বাস্থ্য তাঁর। ভেতরে ভেতরে যে বিষপোকা তাঁকে শেষ করে এনেছে, ঘুণাক্ষরেও আগে টের পাওয়া যায় নি।

হঠাৎ স্বাস্থ্য ভাঙতে শুরু করল প্রিয়ব্রতর। শরীরের সব শাঁস শুকিয়ে হাত-পা দড়ির মতো হয়ে যেতে লাগল। চোখের কোণে কালি, গাল তোবড়ানো, চামড়ার তলা থেকে মোটা মোটা শিরাগুলো ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে অকালবৃদ্ধ প্রিয়ব্রতর দিকে তাকিয়ে সবাই চমকে উঠত। কলকাতায় নাম-করা ডাক্তার এমন কেউ নেই যাঁকে দেখানো হয়নি। দিনে তিন চারটে ইঞ্জেকশন, সাত সাতটা ট্যাবলেট আর ক্যাপসিউল—কিন্তু কিছুতেই শরীরের ক্ষয় ঠেকানো যাচ্ছিল না। হাড়ের ওপর খসখসে, ঢিলে চামড়ার খোলস জড়ানো প্রিয়ব্রত তখন আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতেন না, দিনরাত শুয়ে থাকতেন।

শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল তাঁর লিভারে ক্যানসার। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। এরপর আর মাত্র দুটি মাস বেঁচে ছিলেন প্রিয়ব্রত। বলতে দ্বিধা নেই, মনীষার এই বিপদের দিনে সারাক্ষণ পাশে থেকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন হিরণ্ময়, সাহস জুগিয়েছেন।

মনীষাদের পরিবারটি খুবই বনেদি। দেড় শ বছর ধরে তাঁরা উত্তর কলকাতায় আছেন। একসময়

দশ বারটা বাড়ি ছিল, ব্যাঙ্কে অজস্র টাকা। সোনাদানা জুয়েলারি যে কত ছিল তার হিসেব নেই। মনীষার শ্বশুর পর্যন্ত এই বংশের কেউ কখনও সিকি পয়সাও রোজগার করেননি। রেসে মদে মেয়েমানুষে এবং হাজার রকমের বদখেয়ালে দশ হাতে পূর্বপুরুষের সব সঞ্চয় উড়িয়ে দিয়েছেন। টাকাপয়সা; গয়নাগাটি তো গেছেই, শ্যামবাজারের এই বাড়িটা ছাড়া অন্য বাড়িগুলোও হাতছাড়া হয়েছে। শ্বশুর মারা যাবার আগে বেশ কিছু দেনা রেখে গিয়েছিলেন।

যে বংশের টাকা ওড়াবার একটা ধারাবাহিক ট্র্যাডিশন রয়েছে সেখানে প্রিয়ব্রত ছিলেন আশ্চর্য রকমের ব্যাতিক্রম। তিনি সুস্থ সংযত ভদ্র জীবনের পক্ষপাতী। ছাত্র হিসেবে ছিলেন অসাধারণ। ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে হিরণ্ময়দের এক ফার্মে চাকরি নিয়েছিলেন। ইচ্ছা করলে পিতৃঋণ শোধ না করলেও পারতেন। কিন্তু সন্তান হিসেবে সেটা অনুচিত মনে হয়েছে। মাইনের টাকা থেকে একটা অংশ বাঁচিয়ে তিনি বাবার ধার মিটিয়ে দিচ্ছিলেন কিন্তু সবটা পারেননি। অর্ধেকের মতো বাকি থেকে গেছে।

স্বামীর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা এবং সামান্য গয়না ছাড়া হাতে আর কিছুই নেই। এ দিয়ে ক'টা দিন আর চলবে! প্রিয়ব্রতর মৃত্যুর পর একেবারে মাঝ সমুদ্রে গিয়ে পড়েছিলেন মনীষা। হিরণ্ময়কে ব্যাকুলভাবে অনুরোধ করেছিলেন,ওঁদের ফার্মে যে কোনো একটা কাজ যেন তাঁকে দেন। হিরন্ময় তাঁকে চাকরি দেন নি। শুধু বলেছেন, 'এত চিন্তা করছেন কেন? আমি তো আছি। চাকরি করতে হবে না। আপনাদের সমস্ত দায়িত্ব আমার।'

দ্বিধান্বিতভাবে মনীষা বলেছেন, 'কিন্তু—'

হিরণ্ময় বলেছেন, 'প্রিয়ব্রত আমাকে সত্যিকারের বন্ধু বলে মনে করত। সে নেই। দয়া করে আমার কর্তব্যটা করতে দিন।'

এরপর মনীষার শ্বশুরের বাকি ঋণ শোধ করে দিয়েছেন হিরণ্ময়। তাঁর দুই ছেলেমেয়েকে বিখ্যাত একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করেছেন। অদের জন্য দুটো করে প্রাইভেট টিউটর রেখেছেন। এছাড়া ছেলের ক্রিকেট ট্রেনিং এবং মেয়ের নাচ শেখার ব্যবস্থা করেছেন। একটা গাড়ি মনীষাদের বাড়ির সামনে সব সময় ড্রাইভার সুদ্ধ মজুত থাকে। এর যাবতীয় খরচও হিরণ্ময়ের। মনীষাদের জন্য আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো অভাব রাখেননি তিনি।

প্রথম দিকে হিরণ্ময়কে ঈশ্বরের মতো মনে হত মনীষার। কিন্তু মহানুভবতা এবং সহৃদয়তার পেছনে যে সুদুরপ্রসারী একটা পরিকল্পনা রয়েছে সেটা যখন বোঝা গেল তখন অজগরের প্যাঁচের মতো শত পাকে তিনি জড়িয়ে গেছেন। তাঁর আর বেরুবার রাস্তা নেই।

কথা শেষ করে আচ্ছন্নের মতো বসে থাকেন মনীষা।

পলকহীন তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল সবিতা। সামনের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, 'রাস্তা নেই মানে?'

সবিতাকে একবার দেখে ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে নিলেন মনীষা। বললেন, 'তুমি আমার মেয়ের মতো। তবু তোমাকে আমি বলব। কারণ, আমার সমন্ধে তোমার ধারণাটা স্পষ্ট হওয়া দরকার।'

সবিতা উত্তর দিল না।

মনীষা বলতে লাগলেন, 'আমার স্বামীর মৃত্যুর এক বছর পর থেকে হিরণ এ বাড়িতে আসা একেবারে বন্ধ করে দেয়। আমাকেই সাউথ-এন্ড পার্কের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করতে হয়।'

সবিতার গলার ভেতর থেকে তার অজান্তে আধফোটা একটা শব্দ বেরিয়ে আসে। কী যে বলতে চায়, নিজের কাছেই সেটা পরিষ্কার নয়।

মনীষা বললেন, 'আমাকে যখন হিরণের দরকার হয়, ফোন করে চলে যেতে বলে। সপ্তাহে দিন দুই আমাকে সাউথ-এন্ড পার্কে কাটাতে হয়। এই দুটো দিন আমি ওর শয্যাসঙ্গিনী।'

ঘরের ভেতর কিছুক্ষণের জন্য পাথরের মতো নিরেট স্তব্ধতা নেমে আসে। দুটি অসমবয়সী নারী মুখোমুখি নিঝুম বসে থাকে। তাদের নিশ্বাসপতন যেন বন্ধ হয়ে গেছে।

একসময় মনীষা ফের বলেন, 'এতেও যদি তুমি সন্তুষ্ট না হও আরও স্পষ্ট করে বলছি, আমি হিরণের মিস্ট্রেস—রক্ষিতা।' বলতে বলতে আত্মগ্লানিতে তাঁর স্বর বুজে আসে।

নারীত্বের সবটুকু মর্যাদা যে খুইয়ে বসেছে তাকে দেখতে দেখতে হয়তো একটু করুণাই হয় সবিতার।

কাকে আঘাত হানতে এসেছিল সে? অপমানিত মনীষার অনেক আগেই তো একরকম মৃত্যু ঘটে গেছে।

সবিতা জিজ্ঞেস করে, 'ওই রকম একটা ডিবচার, শয়তানকে দিনের পর দিন আপনি সহ্য করছেন কী করে?'

খাটের কোণে বসে-থাকা ধ্বস্ত মহিলাটি ঝাপসা গলায় বলে ওঠেন, 'না করে উপায় কী? আমার ছেলেমেয়ে, সংসার —এদের বাঁচাব কী করে?'

'এই অসম্মান মেনে না নিয়ে অন্য কোথাও একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে তো পারতেন। তাতে আরামে না থাকতে পারেন, মাথা নিচু করতে হত না।'

'চাকরির চেষ্টা যে করিনি তা নয়। কিন্তু হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করার আগেই রূপের জোরে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে পড়াও বন্ধ। ওই বিদ্যায় চাকরি হয় না। বাপের বাড়ি গিয়ে যে উঠব তারও উপায় নেই। মা-বাবা অনেক আগেই মারা গেছেন। এক ভাই আছে, তার অবস্থা ভাল নয়। সেখানে যাবার কথা ভাবতে পারিনি।'

একটু চিন্তা করে সবিতা জিজ্ঞেস করল, 'হিরণ্ময় লাহিড়ির সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কী, আপনার ছেলেমেয়েরা তা জানে?

বিমর্ষ হাসেন মনীষা, 'ছেলেমেয়ে দু'জনেই যথেষ্ট বড় হয়েছে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারে।'

'কখনও কিছু বলে?'

'না। হয়তো এটাকেই মেনে নিয়েছে। আমার মতো ওরাও নিরুপায়।'

'পাড়ার লোকজন?'

'কেউ তো ঘাস খায় না। সবই জানে। আগে হলে এখানে টিকতে পারতাম না। চোখের সামনে একটা নোংরা দৃষ্টান্ত থাকুক, কে আর তা সহ্য করে? কিন্তু সময় বদলে গেছে। কেউ অন্যের ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। নিজেদের নিয়ে সবাই ব্যস্ত। তবে—' বলতে বলতে থেমে গেলেন মনীষা।

অকপটে নিজের গ্লানিকর জীবনের কথা এভাবে যে মনীষা বলে যাবেন, ভাবতে পারেনি সবিতা। শুনতে শুনতে মহিলার প্রতি এক ধরনের সহানুভূতিই বোধ করে সে। অনুভব করে, যে প্রবল বিদ্বেষ নিয়ে এখানে ও এসেছিল তার ঝাঁঝ অনেকটা কমে গেছে। জিজ্ঞেস করে,'তবে কী?'

মনীষা বললেন, 'রাস্তায় বেরুলে লোকজনের তাকানো দেখলে বুঝতে পারি, ওরা আমাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে।' একটু চুপ করে থেকে বিমর্ষ সুরে বললেন, 'ঘৃণা ছাড়া আর কী-ই বা ওদের কাছ থেকে আশা করতে পারি?'

সবিতার হঠাৎ মনে হয়, তার মায়ের সঙ্গে মনীষার স্পষ্ট একটা মিল রয়েছে। দু'জনের জীবনই তছনছ করে দিয়েছেন হিরণ্ময়। মাকে তবু বিয়ে করে অল্প দিনের জন্য হলেও সামাজিক মর্যাদা দিয়েছিলেন কিন্তু মনীষা সেদিক থেকে কিছুই পাননি। একটা অন্ধকার শ্বাসরোধকারী সুড়ঙ্গের মধ্যে তিনি এই মহিলাকে ছুঁড়ে দিয়েছেন। নোংরা, কুৎসিত, দুর্বিষহ অবস্থা থেকে তাঁর মুক্তি নেই।

একটা চিন্তা সবিতার মস্তিষ্কে হঠাৎ এলোপাথাড়ি তীব্র ঘন্টাধ্বনির মতো বেজে যায়। ওই লোকটা— হিরণ্ময় লাহিড়ি, একজন কী নিপুণ হননকারী! দুটি মহিলাকে তিনি একটু একটু করে হত্যা করেছেন। মা তো মরেই গেছে। মনীষা বেঁচে আছেন ঠিকই, কিন্তু একে কি বাঁচা বলে!

সবিতা নরম গলায় বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

মনীষা বললেন, 'একটা কেন? তুমি তো হাজার প্রশ্ন নিয়ে এসেছ। একের পর এক করে যাও। আমি সব প্রশ্নের উত্তর দেব।'

'আপনার সঙ্গে হিরণ্ময় লাহিড়ির সম্পর্কটা ওঁর বাড়ির কাজের লোকজনেরা জানে না?'

'তুমি তো যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। এটা কি একটা প্রশ্ন হল? কাজের লোকগুলো কি অবোধ শিশু যে জানতে পারবে না? সবাই সব জানে, আবার কিছুই জানে না।'

'মানে?'

'মনিবের চাকরবাকরদের বোবা কালা আর অন্ধ হয়ে থাকতে হয়। কিছু জানলেও মুখ দেখে বুঝবার উপায় নেই।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর মনীষা বললেন, 'আর কিছু জানতে চাও?'

'চাই।' আস্তে মাথা নাড়ে সবিতা।

উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকেন মনীষা।

সবিতা দ্বিধান্বিতভাবে এবার বলল, 'আপনাকে যে কথাটা এখন বলব সেটা হয়তো একটু এমব্যারাসিং, কিন্তু না বললেই নয়।'

মনীষা সামান্য হাসলেন, 'আমার যা জীবন তাতে এমব্যারাসিং বলে কিছু নেই। তুমি বল।'

সবিতা বলল, 'আপনার স্বামী নেই, হিরণ্ময় লাহিড়িরও ডির্ভোস হয়ে স্ত্রী মারা গেছে। আপনারা সম্পর্কটা সামাজিক দিক থেকে সম্মানজনক করে নিলেন না কেন?'

স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন মনীষা। তারপর খুব আস্তে বলেন, 'তুমি কি বিয়ের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ। বাধা তো কিছু ছিল না।'

'না, ছিল না।'

'তা হলে?'

মনীষার চোখেমুখে যন্ত্রণার ছাপ ফুটে ওঠে। ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল তাঁর। একসময় রুদ্ধস্বরে বললেন, 'হিরণকে আমি অনেকবার বলেছি। কিন্তু—'

ব্যগ্রভাবে সবিতা জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু কী?'

'বিয়ে করতে সে রাজি নয়। কেনই বা করবে?' বলতে বলতে হঠাৎ মনীষার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর চোখের ভেতর থেকে আগুনের হলকা বেরিয়ে আসতে থাকে।

সবিতা হকচকিয়ে যায়। অসহায়, ম্রিয়মাণ, ভেঙে-পড়া মহিলাটির এমন আকস্মিক পরিবুর্তন সে কল্পনাও করেনি। কী বলবে, ভেবে না পেয়ে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে।

মনীষা থামেননি, 'আমার মতো আরো পাঁচটা মিস্ট্রেস আছে তার। এক জায়গায় আটকে থাকবে কেন?'

সবিতার শরীর এফোঁড় ওফোঁড় করে অসহ্য তপ্ত প্রবাহ যেন ছুটে যায়। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে, 'এরা কারা? আপনি চেনেন?'

'চিনি। দেখেছিও।'

'এদের নাম ঠিকানা দিন।'

মনীষা আচমকা একটু কৌতুক বোধ করেন। বিচিত্র একটু হেসে বলেন, 'কী হবে? ওদের সঙ্গে দেখা করবে নাকি?'

'করতেও পারি।'

'কেন?'

'হিরণ্ময় লাহিড়ির নোংরা খেলাটা একটা জায়গায় থামানো তো দরকার। আপনি কী বলেন?'

মনীষা ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কলকাতায় আসার এটাও কি একটা কারণ?'

সবিতা বলল, 'লোকটা ভাল নয়, এটাই এতদিন জানা ছিল। কিন্তু এখন জানলাম, এত বড় স্কাউন্ড্রেল পৃথিবীতে খুব বেশি একটা জন্মায়নি। কিছু তো একটা করা উচিত। কী হল, ওই মহিলাদের নামটাম লিখে দিন—'

মনীষা এবার বেশ ভয় পেয়ে গেলেন, 'হিরণ জানতে পারলে—'

'পারবে না। নিশ্চিত থাকুন, আমি অন্তত ওঁকে কিছু বলব না। বললে আপনার ক্ষতি হয়ে যাবে, সেটুকু না বোঝার কারণ নেই।' সবিতা বলতে লাগল, 'যদি কখনও আমাকে জিজ্ঞেস করেন উত্তর দেব না।'

'আমার মতো ক'টি মহিলাকে বাঁচাতে নিজের ক্ষতি করতে চাইছ কেন? জীবনে অনেক কষ্ট করেছ। আমি বলি, এসবের মধ্যে থেকো না।'

'আমি যে পরিবেশ যে অবস্থা থেকে এসেছি তাতে কিছুই গ্রাহ্য করি না।'

মনীষা কী বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁর দুই ছেলেমেয়ে স্কুল থেকে ফিরে এল। দু'জনেই মায়ের মতো সুন্দর। একটি অচেনা তরুণীকে মায়ের ঘরে দেখে তারা বেশ অবাকই হল।

মনীষা পরিচয় করিয়ে দিলেন। ছেলের নাম রাহুল, ডাক-নাম তুতান। মেয়ে গার্গী, তার ডাক নাম ঝিলম। ওরা একই কো-এড স্কুলে পড়ে, স্কুল বাসে একসঙ্গে যাতায়াত করে।

মনীষা সবিতার নাম জানিয়ে দিয়ে তুতান আর ঝিলমকে বললেন, 'এ তোমাদের একজন দিদি। এখন স্কুলের ড্রেস চেঞ্জ করে খেয়ে এস। তারপর দিদির সঙ্গে ভাল করে আলাপ করো।'

সবিতা বলল, 'অনেকক্ষণ এসেছি। আজ আর থাকতে পারছি না। আর এক দিন এসে তুতান আর ঝিলমের সঙ্গে গল্প করে যাব।'

মিষ্টি হেসে, মাথা সামান্য হেলিয়ে দুই ভাইবোন চলে গেল।

যে উদ্দেশ্যে এখানে আসা তা হয়ে গেছে। সবিতা বলল, 'এখন আমি যাব।'

মেয়েটাকে হঠাৎ কেমন যেন ভাল লেগে যায় মনীষার। বলেন, 'আর একটু থাকো না।'

'না, পরীক্ষা এসে গেছে। প্রচুর কোশ্চেনের অ্যানসার ভাল করে রিভাইস করা হয়নি।' সবিতা বলতে লাগল, 'সারা দুপুর এখানে কেটে গেল। ফিরে গিয়ে বইটই নিয়ে বসতে হবে।'

মনীষা খাট থেকে নেমে একটা কাগজে কিছু লিখে সবিতাকে দিতে দিতে বললেন, 'তুমি যে নাম ঠিকানাগুলো চেয়েছ, সেগুলো এটায় রয়েছে। ওদের ফোন নাম্বারও দিয়েছি।'

কাগজটা ভাঁজ করে নিজের ব্যাগে পুরে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সবিতা।

মনীষা এক পলক সবিতার দিকে তাকিয়ে অন্য দিকে চোখ সরিয়ে নিলেন। দ্বিধান্বিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি সত্যি সত্যিই এই মহিলাদের সঙ্গে দেখা করবে?' তাঁকে বেশ বিচলিত দেখাচ্ছিল।

'আপাতত নামঠিকানাগুলো আমার কাছে থাক। ওগুলো দিয়ে কী করব, পরে ভেবে দেখা যাবে।' বলতে বলতে মুখটা শক্ত হয়ে উঠল সবিতার, 'তবে কাজে যাতে লাগাতে পারি সেই চেষ্টাই করব।'

মনীষা উত্তর দিলেন না।

সবিতা আর দাঁড়াল না, দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মনীষাও তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চাপা গলায় মনীষা জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার সব কথা তো শুনলে। খুব ঘেন্না হচ্ছে তো?'

চকিতে মুখ ফিরিয়ে তাকায় সবিতা। আস্তে, প্রায় নিঃশব্দে বলে ওঠে, 'যখন এ বাড়িতে এসেছিলাম তা-ই হচ্ছিল। সমস্ত জানার পর এখন কষ্ট হচ্ছে।' একটু থেমে বলল, 'যে ভিকটিম, যে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে তাকে ঘৃণা করব, এতটা নিচু স্তরের জীব আমি নই।'

একতলায় বাইরের দিকের দরজাটা খুলে দিয়ে মনীষা মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার একটা অনুরোধ রাখবে সবিতা?'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন একটা আকুলতা ছিল যাতে বেশ অবাকই হল সবিতা। সতর্কভাবে বলল, 'রাখার মতো যদি হয়, ভেবে দেখব।'

মনীষা বললেন, 'তোমার মায়ের সঙ্গে হিরণ যা-ই করে থাক, তোমার সম্বন্ধে ও কিন্তু খুব সফ্ট।'

'আমার কিছু আরামের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বলে বোধহয় আপনার এরকম ধারণা হয়েছে, তাই না?'

'না না, এটা আমি ফিল করেছি।'

সবিতা বলল, 'সে যাক, আপনার অনুরোধটা কিন্তু এখনও শোনা হয়নি।'

মনীষা একটু থতমত খেয়ে বললেন, 'পরীক্ষার যখন দেরি নেই তখন নিজের পড়াশোনা নিয়েই থাকো। হিরণের অন্য ব্যাপারগুলো নিয়ে সময় নষ্ট করলে তোমারই ক্ষতি।'

হিরণ্ময়কে সে আঘাত হানুক, মহিলা কি তা চাইছেন না? ওই লোকটার জন্য তাঁর গ্লানি লজ্জা আর অসম্মানের শেষ নেই। তবু ওঁর কাছ থেকেই অজস্র টাকা পাচ্ছেন, পাচ্ছেন নিরাপত্তা, পার্থিব যাবতীয় সুখ এবং আরামের অঢেল উপকরণ। হিরণ্ময়কে ঘা মারলে তাঁদের পরিবারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে, এই জন্যই কি পরীক্ষার অছিলা খাড়া করে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে চাইছেন মনীষা?

তীব্র গলায় সবিতা বলল, 'আমাকে দেখে হিরণ্ময় লাহিড়ির স্নেহ উথলে উঠেছে, এই কারণে

তাঁর অন্যায়গুলোর দিকে চোখ বুজে থাকতে হবে, এটাই বুঝি আপনার অনুরোধ?'

মনীষা কী উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই দ্রুত বড় রাস্তার দিকে চলে গেল সবিতা। হতচকিত মহিলাটির দিকে একবার ফিরেও তাকাল না।

সাত

সাউথ-এণ্ড পার্কে সবিতা যখন ফিরে এল, শরতের বিকেল ফুরিয়ে আসছে। সূর্য ডুবে গেছে ঠিকই, পশ্চিম আকাশের ভাসমান সাদা মেঘপুঞ্জের গায়ে দিনের শেষ রক্তাভাটুকু এখনও লেগে আছে।

বিশাল গেটের একটা পাল্লা খোলা ছিল। সেখানে প্রকাণ্ড চেহারার ইউনিফর্ম-পরা দারোয়ান অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে টান টান দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, 'আইয়ে দিদিজি—'

ভেতরে ঢুকতেই সবিতার চোখে পড়ল, বাড়ির আবহাওয়াটা আজ কেমন যেন অন্যরকম। কাজের লোকেরা তটস্থ ভঙ্গিতে এধারে ওধারে প্রায় নিঃশব্দে চলাফেরা করছে, কথা বলছে নিচু গলায়।

নুড়ির ড্রাইভওয়ে দিয়ে কয়েক পা এগুতেই সবিতার চোখে পড়ল, একটা পুরনো আমলের স্টুডিবেকার গাড়ি একধারে দাঁড়িয়ে আছে। এতদিনে এ বাড়ির সব গাড়িই চেনা হয়ে গেছে তার। স্টুডিবেকারটা আগে কখনও দেখেনি। খুব সম্ভব, ওই আমিরি গাড়িটায় করে এমন কেউ এসেছেন যাঁর জন্য বাড়ির পরিবেশ এতটা বদলে গেছে।

যিনিই এসে থাকুন তাঁর জন্য খুব একটা কৌতূহল বোধ করল না সবিতা। নিজেকে নিস্পৃহ রেখে ড্রাইভওয়ের মাঝামাঝি যখন সে চলে এসেছে সেই সময় মূল বাড়িটার কাচের দরজা ঠেলে প্রথমে যিনি বাইরে এলেন তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি হলেও এখনও যথেষ্ট সুপুরুষ। লম্বাটে ভরাট মুখ, টকটকে রং, চওড়া কপাল, ব্যাক ব্রাশ-করা চুল, চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা, পরনে দামি শার্ট এবং ট্রাউজার্স, সব মিলিয়ে তাঁর চেহারায় দুর্লভ বনেদিআনার ছাপ রয়েছে।

দেখামাত্রই চিনতে পারল সবিতা— আনন্দগোপাল বসু। এই সময়ের নাম-করা এক জননেতা। খবরের কাগজে এঁর ছবি ফি সপ্তাহে দু-একবার বেরোয়, তাঁর ভাষণও বড় হেডলাইন দিয়ে ছাপা হয়। টিভির পর্দাতেও প্রায়ই এঁকে দেখা যায়। হয় ইন্টারভিউ দিচ্ছেন, নইলে বিশাল কোনো জনসভায় তাঁর ভাষণের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

আনন্দগোপালের ঠিক পেছনেই রয়েছেন হিরণ্ময়, তারপর সঞ্জয় এবং দু তিনজন কাজের লোক। হিরণ্ময়কে আনন্দগোপালের সঙ্গে হেসে হেসে খুব বিগলিত ভঙ্গিতে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে।

কাচের দরজার পর শ্বেত পাথরের সিঁড়িগুলো ভেঙে নিচের ড্রাইভওয়েতে চলে এলেন হিরণ্ময়রা।

সবিতাকে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, একটু থমকে দাঁড়ালেন হিরণ্ময়। বললেন, 'মিনিট পনের পর তেতলায় গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করো।'

আস্তে মাথা হেলিয়ে সিঁড়িগুলোর দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সবিতা। ওপরে উঠে কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে নিজের অজান্তেই হয়তো একবার পেছনে ফিরে তাকায়। চোখে পড়ে, বিখ্যাত বিজনেস ম্যাগনেট এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হিরণ্ময় লাহিড়ি নিজের হাতে স্টুডিবেকারের দরজা খুলে একপাশে বশংবদ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন। আনন্দগোপাল গাড়িতে উঠলে দরজটা বন্ধ করে হাতজোড় করে পিঠ ঝুঁকিয়ে কী বলতে লাগলেন; তা অবশ্য শোনা গেল না।

সঞ্জয় নিচে নেমে গিয়েছিল। সে আনন্দগোপালদের কাছাকাছি যায়নি, একটু দূরে অপেক্ষা করছে।

সবিতা আর দাঁড়াল না। ভেতর দিকে এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে দেখল, হল-ঘরে মায়া বসে আছে। এই মেয়েমানুষটির দায়িত্ববোধের তুলনা নেই। হল-ঘর ছেড়ে পারতপক্ষে সে অন্য কোথাও যায় না।

সবিতাকে দেখে শশব্যস্ত মায়া দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। সবিতা তার দিকে ফিরেও তাকায় না, সোজা নিজের ঘরে ঢুকে কাঁধ থেকে ব্যাগটা বিছানায় ছুঁড়ে বাথরুমে গিয়ে বেসিনের কল খুলে চোখেমুখে অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দেয়। তারপর ভাল করে মুখ মুছে এসে একটা চেয়ারে বসে পড়ে। এমনিতে সবিতা স্বল্পভাষী, কিন্তু আজ সারা দুপুর একটানা মনীষার সঙ্গে যখন কথা বলছিল, চাপা উত্তেজনায় স্নায়ুগুলো ছিল টান টান। এখন ভীষণ ক্লান্তি লাগছে। হাত-পায়ের জোড়গুলো যেন আলগা

হয়ে যাচ্ছে তার। কপালের দু পাশের রগ দুটো টিপ টিপ করছে।

চোখের ওপর হাত দুটো আড়াআড়ি রেখে মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে দিল সবিতা। কতক্ষণ বসে ছিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ নিচু গলার ডাক কানে এল, 'দিদি—'

চোখ থেকে হাত সরাতেই সবিতা দেখতে পায়, দরজার কাছে মায়া দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই সে জিজ্ঞেস করল, 'শরীর খারাপ লাগছে?'

সবিতা বলল, 'না তো।'

মায়া একটু চুপ করে থেকে বলল, 'অনেক দূর গিয়েছিলেন বুঝি?'

সবিতা সোজা হয়ে বসল। লক্ষ করল, মায়ার ধূর্ত চোখ দুটোয় অনন্ত কৌতূহল। সে কোথায় গিয়েছিল, জানার জন্য মেয়েমানুষটা ভেতরে ভেতরে ছটফট করছে। রুক্ষ গলায় সবিতা বলল, 'যেখানেই গিয়ে থাকি, তোমার কিছু দরকার আছে?'

মায়া খুব সম্ভব পালটা প্রশ্ন আশা করেনি। মুহূর্তে কুঁকড়ে গেল সে, 'না। এমনি শুদোচিলুম। চা আনব দিদি?'

সবিতার মনে হল, গরম চা শারীরিক ক্লান্তি কাটিয়ে স্নায়ুমণ্ডলীকে চাঙ্গা করে তুলতে পারে। বলল, 'ঠিক আছে, নিয়ে এস।'

কিছুক্ষণ পর চা খেয়ে তেতলায় গেল সবিতা। আগে যে দুবার এখানে এসেছে হল-ঘরে বসে হিরণ্ময় আর মনীষার সঙ্গে কথা বলেছিল। কিন্তু আজ কাউকে দেখা যাচ্ছে না, হল-ঘর একেবারে ফাঁকা।

হিরণ্ময় কেন দেখা করতে বলেছেন, আগে এ নিয়ে কিছু ভাবেনি সবিতা। সে যে শ্যামবাজার গিয়েছিল, এই খবরটা কি তাঁর কাছে পৌঁছে গেছে? একটু অস্বস্তি বোধ করল সে, পরক্ষণেই নিজেকে শক্ত করে নিল। চরম সংঘাতের জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে সবিতা। মনীষার সঙ্গে দেখা করার পর আরো ক'টি মারণাস্ত্র তার হাতে এসে গেছে। যা হবার হোক—সবিতার মনোভাব এখন এতটাই বেপরোয়া।

এধারে ওধারে তাকাচ্ছিল সে। হিরণ্ময় কি এখনও ওপরে আসেননি? নিচেই থেকে গেছেন? ফিরে যাবে কিনা যখন ভাবছে, হিরণ্ময়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'এখানে এস—'

এবার চোখে পড়ল। ডান দিকের ঘরে বিশাল খাটে বালিশে হাতের ভর রেখে কাত হয়ে আছেন হিরণ্ময়। সবিতা পায়ে পায়ে সেখানে চলে এল।

এই ঘরটা সবিতার ঘরের প্রায় দ্বিগুণ। কার্পেট, এয়ারকুলার, ওয়ার্ডরোব এবং অন্যান্য দামি ক্যাবিনেট দিয়ে সাজানো। একটা সোফা দেখিয়ে সবিতাকে বসতে বলে হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করলেন, 'শুনলাম দুপুরে বেরিয়ে গিয়েছিলে। গাড়ি নাও নি কেন?'

সবিতা বলল, 'আপনাকে সেদিনই বলেছিলাম, আমার গাড়ির দরকার নেই। ভুলে গেছেন বোধহয়।'

'না, মনে আছে। তবু জানতে চাইলাম একটা কারণে—'

'কারণটা কী?'

'যদি এর ভেতর গাড়ি চড়া সম্পর্কে তোমার ডিশিসানটা পালটে গিয়ে থাকে।'

'ওটা পালটানোর কোনো সম্ভাবনা আছে বলে আমি মনে করি না।'

একটু চুপচাপ।

তারপর একদৃষ্টে সবিতাকে লক্ষ করতে করতে হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে—লাইব্রেরিতে?'

প্রশ্নটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সবিতার প্রতিক্রিয়া হল তীব্র। লোকটা কি সব জেনেও না জানার ভান করছে? সরীসৃপ যেমন ধীরে ধীরে বুকে হেঁটে শিকারের দিকে এগোয়, সেইভাবেই খুব সম্ভব হিরণ্ময় তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ভীষণ ঠাণ্ডা গলায় সবিতা বলল, 'আপনার বাড়িতে থাকতে হলে কোথায় গেলাম, কার সঙ্গে দেখা করলাম—এ সবের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে?'

আস্তে আস্তে উঠে বসলেন হিরণ্ময়। মাথা নেড়ে বললেন, 'না। এমনিই জানতে চেয়েছিলাম। অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।'

কথাগুলো আদৌ বিশ্বাসযোগ্য কিনা বোঝা যাচ্ছে না। স্থির চোখে হিরণ্ময়ের দিকে তাকিয়ে রইল সবিতা।

কী ভেবে হিরণ্ময় এবার বলেন, 'একটা কথা আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।'

সবিতা এবারও উত্তর দেয় না। তার চোখ দুটো শুধু একটু বেশি মাত্রায় সতর্ক হয়ে ওঠে।

হিরণ্ময় বলতে লাগলেন, 'ক'দিন হল তুমি এখানে এসেছ। তোমার সঙ্গে আমি কি কোনোরকম খারাপ ব্যবহার করেছি?'

সবিতা বলল, 'একেবারেই না। এখন পর্যন্ত আমার এক্সপেক্টেশনের চাইতে অনেক বেশি ভাল ব্যবহার আপনার কাছ থেকে পেয়েছি।'

'তা হলে?'

'কী?'

'আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ কেন?'

সবিতা একটা ব্যাপারে এখন মোটামুটি নিশ্চিত, মনীষার সঙ্গে দেখা করার খবরটা হিরণ্ময় পাননি। পেলে তাঁর আচরণ অন্যরকম হত। সে বেশ অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল, 'কষ্ট দিচ্ছি মানে?'

হিরণ্ময় বললেন, 'তোমাকে ক'টা শাড়ি টাড়ি কিনে দিয়েছিলাম, তার একটাও পরো নি; গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। তাতে চড়ো নি। পকেট মানি দিয়েছিলাম; ফেরত দিয়েছ। আমার খুব দুঃখ হচ্ছে সবিতা।'

সবিতা বলল, 'আপনাকে তো আগেই জানিয়েছি, এত আরামে আমি অভ্যস্ত নই।'

হিরণ্ময়ের মনে হল, অনভ্যাসটাই একমাত্র কারণ নয়। আচমকা তিনি বলে উঠলেন, 'তুমি আমাকে ঘৃণা কর?'

লোকটা কি একজন সুচতুর থট-রিডার? কারো মুখ দেখে চট করে তার মনের কথা পড়ে নিতে পারে? সবিতার শরীরের সব রক্ত লাফ দিয়ে মাথায় উঠে আসে। হিরণ্ময় সুযোগ যখন হাতে তুলে দিয়েছেন, একটা আঘাত হানা যেতেই পারে। এই লোকটার ব্যাপারে তার হাতে অদৃশ্য অস্ত্র সারাক্ষণ উদ্যত হয়েই থাকে।

ধারাল গলায় সবিতা বলল, 'আপনাকে শ্রদ্ধা করার মতো কোনো দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই।'

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকেন হিরণ্ময়। মুখ দেখে বোঝা যায়, তাঁর মধ্যে তুমুল আলোড়ন চলছে। একসময় ক্লান্ত গলায় বলেন, 'তুমি বোধহয় তোমার মায়ের বিষয়ে ইঙ্গিত দিচ্ছ?'

'ঠিক তাই। আপনি মায়ের জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছেন।' সবিতার কণ্ঠস্বর ক্রমশ উঁচুতে উঠতে থাকে, 'এটা আমি এক মুহূর্তের জন্যে ভুলতে পারি না।'

হিরণ্ময়ের দিক থেকে চোখ সরায়নি সবিতা। টিভিতে একবার দু'জন তলোয়ারবাজের মধ্যে ফেন্সিংয়ের লড়াই দেখেছিল সে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর ভেতর তুলনায় যে দুর্বল, আত্মরক্ষার জন্য সে ক্রমাগত পিছু হটছিল। হিরণ্ময়ের অবস্থা এখন অনেকটা সেইরকম। কোণঠাসা অবস্থা থেকে তিনি ক্লান্ত গলায় বলে ওঠেন, 'শোভনার ব্যাপারে এখন আর কিছু করার নেই।'

এ জাতীয় কথা হিরণ্ময় কি আগেও বলেছেন? নাকি মনীষার মুখ থেকে শোনা গেছে? ঠিক মনে করতে পারল না সবিতা। মায়ের প্রতি জঘন্য আচরণের জন্য হিরণ্ময়ের কি কোনোরকম অনুশোচনা বা অপরাধবোধ আছে? মুখ দেখে সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আক্রমণের ঝোঁকে সবিতা বলতে লাগল, 'আমার মা ছিল সরল, নিষ্পাপ, লাইভলি একটি মেয়ে। তাকে নিয়ে এরকম একটা নোংরা খেলা খেললেন কেন?'

মুখ নামিয়ে হিরণ্ময় বললেন, 'এ ব্যাপারে আমাকে আর কিছু বলো না সবিতা—প্লিজ।'

'আমার মা ছাড়াও আপনি—' বলতে গিয়ে চুপ করে গেল সবিতা। মনীষার কথাটা মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে আসছিল। হঠাৎ মনে হল, একদিনের পক্ষে ধাক্কাটা ভালই দেওয়া হয়েছে। হাতে বহু অস্ত্র মজুদ আছে। যুদ্ধটা আজই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। সেগুলো প্রয়োগ করার অনেক সময় পাওয়া

যাবে।

জোরাল শক খাওয়ার মতো একটা প্রতিক্রিয়া হয় হিরণ্ময়ের। চকিতে মুখ তুলে বলেন, 'তোমার মা ছাড়াও কী?'

'না, কিছু নয়।'

'নিশ্চয়ই কিছু।'

'যদি তাই হয়, আপাতত সে বিষয়ে কোনো আলোচনা করতে চাই না।'

'কবে করতে চাও?'

'যদি তেমন দরকার হয়, আপনাকে জানাব।'

'ঠিক আছে।'

'আমাকে আর কিছু বলবেন?'

'না। তুমি এখন যেতে পার।'

সবিতা উঠে পড়ল।

আট

নিজের ঘরে ফিরে এসে চুপচাপ খানিকক্ষণ শুয়ে থাকে সবিতা। এটুকু বোঝা যাচ্ছে, মায়ের ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চান না হিরণ্ময়। নানাভাবে তাকে খুশি করে একটা আপস করে নেওয়াই হয়তো তাঁর একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু সেটা কিছুতেই হতে দেবে না সবিতা। জ্ঞানবুদ্ধি হবার পর থেকেই মা তার ভেতরটা বারুদে বোঝাই করে দিয়েছে। বিস্ফোরণ না ঘটিয়ে সে ছাড়বে না।

সন্ধে নেমে গিয়েছিল। চারপাশের বাড়িগুলোতে এবং রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। সবিতার ঘরটাই শুধু অন্ধকার।

দরজার বাইরে থেকে মায়া জিজ্ঞেস করল, 'দিদি কি ঘুমিয়ে পড়েছেন?'

আস্তে আস্তে উঠে বসে সবিতা। বলে, 'না, কেন?'

'সঞ্জয়বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

সবিতা একটু অবাক হল। সঞ্জয়ের সঙ্গে আজ দু বার দেখা হয়েছে। দুপুরে একতলায় তার ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলেছে সে। বিকেলে শ্যামবাজার থেকে ফেরার পর ড্রাইভওয়েতে আরেক বার তাকে দেখা গেছে। তখন আনন্দগোপাল আর হিরণ্ময় সেখানে ছিলেন। তাই কথা হয়নি। হঠাৎ কী এমন ঘটল যাতে আজই আবার সঞ্জয় দেখা করতে চাইছে!

সবিতা পরনের শাড়িটা পায়ের পাতার দিকে টেনেটুনে, গোছগাছ করে নিতে নিতে বলল, 'ঘরের আলো জ্বেলে ওঁকে আসতে বল—'

নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকে আলোগুলো জ্বেলে বেরিয়ে গেল মায়া। একটু পরেই সঞ্জয় এল। হাতজোড় করে কুণ্ঠিত মুখে বলল, 'আপনি রেস্ট নিচ্ছিলেন। আমি এসে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে সবিতা বলল, 'বসুন—' সঞ্জয় বসার পর জিজ্ঞেস করল, 'আমার কাছে কিছু দরকার আছে?'

'হ্যাঁ, মিস লাহিড়ি।'

'সব শুনব। তার আগে একটা কথা জানতে চাইছি। খুব সম্ভব সেদিন বলেছিলেন, পাঁচটা পর্যন্ত এ বাড়িতে থাকেন। ওয়াল ক্লকে দেখুন সাড়ে ছ'টা বাজতে চলেছে।'

'আমার ডিউটি আওয়ার্স বেড়ে গেছে। এখন থেকে আমাকে রাত ন'টা পর্যন্ত থাকতে হবে।'

সামান্য ঔৎসুক্য বোধ করে সবিতা, 'হঠাৎ কাজের প্রেসার বেড়ে গেছে বুঝি?'

'হ্যাঁ। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, লাহিড়ি সাহেব নেক্সট ইলেকশানে কনটেস্ট করছেন।'

'ইলেকশানে!'

হতবাক সবিতার দিকে তাকিয়ে সঞ্জয় বলে, 'আপনি কিছু শোনেননি?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে সবিতা, 'না তো।'

'লাহিড়ি সাহেব আপনাকে এত বড় খবরটা দেননি!'

'না।'

বাবা নির্বাচনে নামছে আর মেয়ে তা জানে না, এমন বিস্ময়কর ব্যাপার আগে কখনও শোনেনি সঞ্জয়। সে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে।

একটু চুপচাপ।

হতবুদ্ধি ভাবটা অনেকখানি কাটিয়ে উঠে একসময় সঞ্জয় বলে, 'আজ আনন্দগোপালবাবুকে দেখলেন তো?'

সবিতা বলল, 'হ্যাঁ।'

'ওঁদের পার্টির টিকেট পেয়েছেন লাহিড়ি সাহেব। ইলেকশানের বিষয়েই আজ কথা বলতে এসেছিলেন আনন্দগোপালবাবু।'

'ও।'

'নির্বাচনের ব্যাপারে লাহিড়ি সাহেব আমাকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন। নানা লোকের সঙ্গে ফোনে কথা বলছি, অনেক জায়গায় চিঠি লিখতে হচ্ছে। বেশি সময় না থেকে উপায় কী?' সঞ্জয় বলতে লাগল, 'লাহিড়ি সাহেব অবশ্য টাকাপয়সার ব্যাপারে খুব কনসিডারেট। এক্সট্রা কাজের জন্যে তিনি আমার অ্যালাওয়েন্স অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন।'

হিরণ্ময় কখনও রাজনীতি করেছেন কিংবা এ সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে, এমন কথা আগে কখনও শোনেনি সবিতা। এমন কি এ বাড়িতে এসেও তা টের পায়নি। কাগজে মাঝে মাঝে বিজনেস ম্যাগনেট আর ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হিসেবে তাঁর সম্বন্ধে লেখা চোখে পড়েছে কিন্তু সেগুলোতে রাজনীতির নামগন্ধ নেই।

সবিতা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

সঞ্জয় থামেনি, 'লাহিড়ি সাহেব ইলেকশানে জিতলে মিনিস্টার হয়ে যাবেন।'

পারিবারিক ব্যবসা, কলকারখানা এবং মেয়েমানুষ ছাড়া যাঁর অন্য কোনো দিকে নজর নেই, হঠাৎ তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য এত আগ্রহী হয়ে উঠলেন কেন, কে জানে। সবিতা জিজ্ঞেস করল, 'মিনিস্টার হবেন, কী করে জানলেন?'

সঞ্জয় জানাল, যে পার্টি হিরণ্ময়কে নির্বাচন প্রার্থী হিসেবে এবার দাঁড় করাচ্ছে তাদের ফাণ্ডে কয়েক বছর ধরে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে আসছেন। তাঁরই টাকায় অন্যেরা এম. এল. এ হবে, মন্ত্রী হবে, এটা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। এবার তিনি ডোনেশন দেবেন না বলে বেঁকে বসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে জিতিয়ে তাঁকে মন্ত্রী করা হবে, এই শর্তে টাকা দিতে রাজি হয়েছেন।

তথ্যগুলো এতই চমকপ্রদ যে অনেকক্ষণ অবাক বিস্ময়ে চুপ করে থাকে সবিতা।

সঞ্জয় বলল, 'আপনি লাহিড়ি সাহেবের মেয়ে বলে ইনফরমেশনটা দিলাম। কাইণ্ডলি অন্য কারো সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করবেন না।'

তার কথার উত্তর না দিয়ে সবিতা বলল, 'আমার খুব অদ্ভুত লাগছে সঞ্জয়বাবু—'

'কেন বলুন তো?'

'সঞ্জয়বাবু, আমি যতদূর জানি সোসাইটির জন্যে আপনাদের লাহিড়ি সাহেবের এক কানাকড়িও স্যাক্রিফাইস নেই। সাধারণ মানুষের উপকার হয় এমন কোনো কাজ তিনি কখনও করেননি। এই লোক ইলেকশানে জিতবে? লোকে তাকে ভোট দেবে, না দেওয়া উচিত?'

সঞ্জয় হকচকিয়ে যায়। তার মনে হয়, নির্বাচনের ব্যাপারে হিরণ্ময় সম্পর্কে একটু বেশিই বলে ফেলেছে। দ্রুত নিজেকে সামলে নিল সে। চোখের কোণ দিয়ে সতর্কভাবে সবিতাকে লক্ষ করতে করতে বলল, 'মিস লাহিড়ি, দয়া করে এ নিয়ে আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।'

সবিতা বলল, 'ঠিক আছে করব না।'

কাঁচুমাচু মুখে সঞ্জয় বলল, 'ইলেকশানের খবর আমার কাছে যে পেয়েছেন, লাহিড়ি সাহেব যেন জানতে না পারেন।'

'নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি ওঁকে বলব না। কিন্তু—'

'কী?'

'যে জন্যে আপনি এসেছেন সেটা কিন্তু এখনও বলেননি—'

ঢোক গিলে সঞ্জয় জিজ্ঞেস করে, 'দুপুরে শ্যামবাজারে যে গেলেন, বাড়িটা খুঁজে পেয়েছিলেন?'

সবিতা সোজা সঞ্জয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'মনীষা দেবীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কিনা, এটাই বোধহয় জানতে চাইছেন?'

মুখ নামিয়ে সঞ্জয় বলে, 'মানে—'

সবিতা বলল, 'দেখা হয়েছে কিন্তু আমরা কী কথা বলেছি তা আপনাকে জানাব না।'

সঞ্জয় চকিত হয়ে ওঠে, 'না না, জানতে চাইছি না। আমি শুধু বলছিলাম লাহিড়ি সাহেব যদি টের পান আমার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে—'

মুখ শক্ত হয়ে ওঠে সবিতার। রুক্ষ গলায় সে বলে, 'দুপুরেই তো বলেছি আপনার নাম আমি গোপন রাখব। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?'

'হচ্ছে হচ্ছে, তবু মুখ ফসকে অনেক সময় বেরিয়ে যায় তো। আচ্ছা—আমি যাই—' বলতে বলতে উঠে পড়ে সঞ্জয়।

আর তখনই কিছু মনে পড়ে যায় সবিতার। সে বলে, 'আরেকটু বসুন—'

নিঃশব্দে বসে পড়ে সঞ্জয়।

সবিতা তার ব্যাগ থেকে সেই কাগজের টুকরোটা বার করে। পাঁচ মহিলার ঠিকানা এতে লিখে দিয়েছেন মনীষা। ঠিকানাগুলোর ওপর চোখ রেখে সে বলে, 'একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।'

সঞ্জয় বলে, 'নিশ্চয়ই। কী করতে হবে বলুন—'

'আমি ভবানীপুরে হরিশ মুখার্জি রোডে যেতে চাই। কত নম্বর বাস ওখানে যায়।'

'আজই যাবেন?'

'না। দু-চারদিন পর।'

ভবানীপুর রুটে যে সব বাস যায় সেগুলোর নম্বর বলল সঞ্জয়। কাগজে টুকে নিয়ে সবিতা বলে, 'আরো চার জায়গার বাস রুটের নম্বর চাই—'

'বলুন কোন কোন জায়গা—'

'বেলেঘাটা, বেহালা, কুদঘাট আর আলিপুর।'

বাসের নম্বরগুলো জানিয়ে দিতে দিতে ভেতরে ভেতরে চকিত হয়ে ওঠে সঞ্জয়। বলে, 'মিস লাহিড়ি, যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

সবিতা বলল, 'করুন।'

'ওই পাঁচটা জায়গায় আপনি কেন যাচ্ছেন?'

'আপনার কৌতূহলটা বড় বেশি সঞ্জয়বাবু।'

'কৌতূহল নয়—'

'তবে?'

'দুশ্চিন্তা—ভয়—'

'মানে?'

সঞ্জয় বলতে লাগল, 'মিস লাহিড়ি, আপনার সম্পর্কে আমি সব জানি। কলকাতায় আসার আগে যে চিঠিটা লাহিড়ি সাহেবকে লিখেছিলেন তার জবাব আমিই টাইপ করে দিয়েছিলাম। আপনার সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। আমাকে শুভাকাঙ্ক্ষী মনে করতে পারেন।'

সবিতা বলল, 'ধন্যবাদ। দুশ্চিন্তা আর ভয়ের কথা কী যেন বলছিলেন—'

'আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি ভবানীপুর বেহালা টেংরায় যাবেন না।'

'যেতে বারণ করছেন কেন?'

সঞ্জয় বলল, 'আপনি কাদের সঙ্গে দেখা করবেন, আমি হয়তো অনুমান করতে পারছি।'

একটু অবাক হয়ে সবিতা বলল, 'বলুন' তো কাদের সঙ্গে?'

'শিখা বাগচি, কণিকা দত্ত, সুনীলা মজুমদার, সুলেখা ভৌমিক আর দীপ্তি চ্যাটার্জি।' সঞ্জয় জিজ্ঞেস করল, 'কি, ঠিক বলেছি?'

পদবিসুদ্ধ নামগুলো একেবারে নির্ভুল। একটু তলিয়ে ভাবতেই বিস্ময়টা থিতিয়ে যায় সবিতার। সঞ্জয় হিরণ্ময়ের একান্ত সচিব—প্রাইভেট সেক্রেটারি। তার পক্ষে মনিবের জীবনের অন্ধকার দিকের সুগোপন তথ্যগুলি জেনে ফেলা অসম্ভব নয়। মাথা সামান্য হেলিয়ে সবিতা বলে, 'হ্যাঁ, ঠিক।'

সঞ্জয় বলল, 'কী দরকার ওই মহিলাদের সঙ্গে দেখা করে? তাতে তিক্ততা বাড়বে। জীবনে অনেক স্ট্রাগল করেছেন। মানুষের লড়াই করার একটা লিমিট থাকে। হোল লাইফ হাতে বন্দুক নিয়ে কাটানো যায় না।' সে বলে যায়, হিরণ্ময় সবিতার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেননি, অসীম স্নেহে তাকে কাছে টেনে নিতে চাইছেন। অশান্তি বিরোধ আর উত্তেজনার মধ্যে না গিয়ে এখন থেকে জীবনটা আরামে স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে দিক সবিতা।

ঠিক এইরকম পরামর্শই দিয়েছিলেন মনীষা। কিন্তু ওঁরা তো জানেন না, কলকাতায় এসে সুখের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিলে মাকেই অপমান করা হবে। মা তার ভেতর এমন একটা আগুনের চুল্লি জ্বালিয়ে দিয়েছে যা কোনোদিনই নিভবে না।

সবিতা বলল, 'আপনার অ্যাডভাইস আমার মনে থাকবে। আজ দুপুর থেকে একটা বইয়ের পাতাও ওল্টাতে পারিনি। পরীক্ষা এসে গেছে। এখন পড়তে না বসলেই নয়। আচ্ছা নমস্কার।' বলে হাতজোড় করল।

ইঙ্গিতটা এত স্পষ্ট যে আর বসে থাকা যায় না। দ্রুত উঠে পড়ে সঞ্জয়।

নয়

আরো তিন চারটে দিন কেটে যায়।

ছাত্রী হিসেবে সবিতা দারুণ মনোযোগী। পড়াশোনার সময় আর কোনো দিকে তার লক্ষ থাকে না। কিন্তু মনীষার সঙ্গে দেখা করে আসার পর থেকে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। বইয়ের পাতা চোখের সামনে খোলা থাকে ঠিকই কিন্তু কয়েক লাইন পড়ার পর বাকি কালির অক্ষর কেমন যেন হিজিবিজি হয়ে যায়। অদৃশ্য ঘুণপোকার মতো একটা চিন্তা তার মস্তিষ্কে দাঁত বসাতে থাকে।

আসানগঞ্জে ট্রেনে ওঠার সময় হিরণ্ময় সম্পর্কে তার যা ধারণা ছিল, কলকাতায় এসে সেটা হাজার গুণ খারাপ হয়ে গেছে। এমন একটা লম্পট নির্লজ্জ এবং দু-কানকাটা লোকের রক্ত তার শিরায় বইছে, ভাবলেই সমস্ত শরীর ঘৃণায় কুঁকড়ে যায়, পেটের ভেতরে পাক দিতে দিতে বমি উঠে আসে।

পুরনো আমলের কলকাতার বাবুদের নিয়ে চমকপ্রদ একটা কেচ্ছার বই কিছুদিন আগে তার হাতে এসেছিল। এই সব নষ্ট বাবুর দল নাকি ঘরে বিয়ে-করা বউ থাকা সত্ত্বেও বাইরে দু-একটা করে বাঈজি টাইজি রাখত। কিন্তু হিরণ্ময়ের মতো একসঙ্গে ছ'টা রক্ষিতা পোষার নজির সেকালেও ছিল কিনা সন্দেহ।

লোকটার জীবনচরিত পচা দুর্গন্ধে ভরা। প্রকাশ্যে সবার চোখের সামনে যে লুচ্চামি করে, তার মুখের ওপর তারই লাম্পট্যের দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে কতটা ক্ষতি করা যাবে, সবিতা বুঝে উঠতে পারে না।

মনীষা যে পাঁচ মহিলার তালিকা দিয়েছেন তাদের কাছে যাওয়া ঠিক হবে কি? সঞ্জয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারণ করেছে বলেই নয়, কলকাতার পাঁচ জায়গায় ছোটাছুটি করে হয়তো জানা যাবে, হিরণ্ময় মনীষা মিত্রের মতো এই মহিলাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়েছেন।

ক'দিন দ্বিধায় কাটানোর পর সবিতা স্থির করে ফেলে সে ওদের সঙ্গে দেখা করবে। হিরণ্ময়কে ধরাশায়ী করার মতো আরো কিছু মারণাস্ত্র হয়তো এদের হাতেই আছে।

আজ সকালে স্নান সেরে, চা খেয়ে, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল সবিতা। সঙ্গে রয়েছে পাঁচ মহিলার নাম-ঠিকানার তালিকাটা। মোটামুটি একটা কর্মসূচি ছকে নিয়েছে সে। একদিনে এত বড় শহরের পাঁচ জায়গায় তো যাওয়া সম্ভব নয়। আজ সবিতা যাবে আলিপুরে।

হল-ঘরে আসতেই মায়াকে দেখা গেল। তার চোখেমুখে সেই চিরস্থায়ী কৌতূহল। কিন্তু সবিতা

কোথায় যাচ্ছে তা জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না। শুধু বলল, 'দিদি আপনার ফিরতে দেরি হবে?'

সবিতার মাথায় আলিপুরের চিন্তাটা ঘুরছিল। সে বলল, 'না। দুপুরের মধ্যেই ফিরে আসব।'

মায়া আর কিছু জানতে চাইল না।

হল-ঘর পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হইচই কানে এল সবিতার। নিচে এসে দেখল, পাঁচ ছ'টি অচেনা যুবকের সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলছে সঞ্জয়।

ওদিকে সামনের ঘাসের লনে ক'টা মজুর বাঁশের খুঁটি পুঁতে শামিয়ানা খাটানোর তোড়জোড় করছে। একধারে ডাঁই করে রাখা আছে কিছু চেয়ার টেবল।

কখন এত লোকজন এসেছে, শামিয়ানার সরঞ্জাম আনা হয়েছে, টের পায়নি সবিতা। আসলে আজ সে পড়ার টেবলে বসেনি। ঘুম থেকে ওঠার পরই স্নান করতে বাথরুমে ঢুকে গিয়েছিল। তারপর তাড়াহুড়ো করে চা খেয়েছে, শাড়ি পালটেছে। পড়তে বসলে নিশ্চয়ই সব দেখতে পেত।

এ সময় সবিতা বেরিয়ে যাবে, ভাবতে পারেনি সঞ্জয়। যাদের সঙ্গে কথা বলছিল সেই যুবকদের দাঁড়াতে বলে সে কাছে এগিয়ে এসে উৎসুক চোখে তাকাল। তার মুখচোখ দেখে মনে হল, কিছু একটা আন্দাজ করতে চাইছে।

সঞ্জয়ের মনোভাব অনুমান করে সবিতা অল্প হাসল, 'আপনি যা ভাবছেন ঠিক তা-ই। আমি এখন আলিপুর যাচ্ছি। পরে অন্য মহিলাদের কাছে যাব।'

কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল সঞ্জয়। তার চোখে ভয়ের ছাপ ফুটে বেরিয়েছে।

সবিতা বলল, 'নার্ভাস হবেন না।'

নিঃশব্দে কাচের দরজা ঠেলে সবিতার পাশাপাশি বাইরে শ্বেত পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নিচের ড্রাইভওয়েতে চলে এল সঞ্জয়।

সবিতা জিজ্ঞেস করল, 'বাড়িতে অনেকগুলো ছেলে দেখলাম, লনে প্যান্ডেল করা হচ্ছে—কী ব্যাপার?'

'ইলেকশানের তো দেরি নেই। এখন থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। তাই—'

সবিতা এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করল না। শুধু বলল, 'আর আসবেন না। আপনার জন্যে ছেলেরা অপেক্ষা করছে।'

সঞ্জয় দাঁড়িয়ে পড়ল। আর সবিতা গেট পেরিয়ে রাস্তায় চলে গেল।

আলিপুর রুটে কোন কোন বাস যায় তার নম্বর সেদিন বলে দিয়েছিল সঞ্জয়। নম্বর মিলিয়ে তেমন একটা বাস ধরে যে বাড়িটায় এসে সবিতা পৌঁছুল সেটা বিশাল এক হাই-রাইজ। নাম 'মুনলাইট অ্যাপার্টমেন্ট'। এ ধরনের বাড়িতে আগে কখনও ঢোকেনি সবিতা। ভয় ঠিক নয়, এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করছিল সে। কিন্তু ফিরে যাবার জন্য তো আসেনি। নিজের ভেতরকার অদম্য জেদ যেন ধাক্কা মারতে মারতে তাকে ভেতরে নিয়ে গেল।

ইউনিফর্ম-পরা সিকিউরিটির লোকজনদের জিজ্ঞেস করে লিফটে চড়ে দশতলার এগার নম্বর অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে বেল বাজানোর মিনিট খানেক পর একটা বেয়ারা দরজা খুলে জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চান?'

সবিতা বলল, 'সুনীলা মজুমদারের সঙ্গে দেখা করব।'

'আপনার কি এখন আসার কথা ছিল?'

'না।'

'কোনো দরকার আছে?'

'সেটা আমি ওঁকেই বলব।'

কী ভেবে বেয়ারাটা বুঝিবা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, 'আচ্ছা আসুন—' সে সবিতাকে যে ড্রইংরুমে নিয়ে এল হিন্দি বা বলিউডের ফিল্মেই তেমনটা দেখা যায়।

'বসুন। আমি মেমসাহেবকে খবর দিচ্ছি।' বলে বেয়ারাটা ভেতরে অদৃশ্য হল।

বেশ কিছুক্ষণ পর যিনি ড্রইংরুমে এলেন তাঁর দিকে তাকিয়ে চোখ ঝলসে গেল সবিতার। মনীষা মিত্রের চেহারাও দৃষ্টি ধাঁধিয়ে দেবার মতো। কিন্তু এই মহিলাটির রূপ তাঁর চেয়ে অনেক বেশি উগ্র।

গায়ের রং পালিশ-করা ব্রোঞ্জের মতো। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ডাই-করা চুল কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা। ম্যানিকিউওর করা নখ। মুখ ডিম্বাকৃতি। চোখের নীলাভ মণিদুটো সামান্য ঢুলু ঢুলু, নেশার আমেজের মতো কী যেন তাতে মাখানো।

মহিলার পরনে দামি হাউস কোট, পায়ে হালকা স্লিপার। 'সেক্স' বলে একটা শব্দ আছে , সেটা তাঁর দিকে তাকানো মাত্র মনে পড়ে যায়।

মহিলা বললেন, 'তোমাকে তো চিনতে পারলাম না।'

সবিতা বলল, 'চেনার কারণ নেই। আগে কখনও আমাদের দেখা হয়নি। সে যাক, আমি কি সুনীলা মজুমদারের সঙ্গে কথা বলছি?'

'রাইট। তোমার নামটা কিন্তু এখনও আমার জানা হয়নি।'

'সবিতা লাহিড়ি।'

সুনীলার মসৃণ কপালে সামান্য একটু ভাঁজ পড়েই মিলিয়ে যায়। 'লাহিড়ি, লাহিড়ি'—বার দুই পদবিটা আস্তে উচ্চারণ করার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোথায় থাকো?'

সবিতা বলল, 'সাউথ-এণ্ড পার্কে।'

'হিরণ্ময় লাহিড়িদের বাড়িতে কি?'

'হ্যাঁ।'

সুনীলা আগ্রহের সুরে বললেন, 'তোমার কথা হিরুর মুখে শুনেছি। তুমি ওর মেয়ে, রিসেন্টলি আসানগঞ্জ থেকে এসেছ।'

মনীষা হিরণ্ময়কে বলেন হিরণ, এই মহিলা বলে হিরু। উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে রইল সবিতা।

সুনীলার ঠোঁটে হাসির মতো কিছু খেলে গেল। বললেন, 'তুমি এসেছ, আমার খুব ভাল লাগছে। কিন্তু এ বাড়ির ঠিকানা কে দিলে? হিরু?'

মুখ শক্ত হয়ে উঠল সবিতার। হিরণ্ময়ের পক্ষে তাকে এখানকার ঠিকানা দেওয়া যে সম্ভব নয়, সেটা জেনে বুঝেও কেমন ভালমানুষের মতো মুখ করে জিজ্ঞেস করলেন সুনীলা।

সবিতা বলল, 'না।'

'তা হলে কার কাছে পেলে?'

মনীষাও সেদিন এই প্রশ্নটা করেছিলেন। সবিতা তাঁকে যা বলেছিল, সুনীলাকেও তাই বলল। অর্থাৎ ইচ্ছা আর জেদ থাকলে কাউকে খুঁজে বার করা কঠিন কিছু নয়।

সুনীলা বললেন, 'এক্সপার্ট গোয়েন্দাদের মতো একজন অচেনা মহিলাকে যখন খোঁজাখুঁজি করে বার করেছ, নিশ্চয়ই জরুরি কোনো কাজ আছে।'

'হ্যাঁ। ঠিকই ধরেছেন।'

'তার আগে বল কী খাবে—চা? কফি?'

'না, না—'

'তা হলে এক কাপ হট চকোলেট খাও।'

বিরক্ত, ঝাঁঝাল গলায় সবিতা বলল, 'আমি এখানে খেতে আসিনি।'

চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল সুনীলার। ধীরে ধীরে বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার কাজের কথাটা শোনা যাক।'

'এই অ্যাপার্টমেন্টে আর কে কে আছে?'

'তুমি তো এ সব জানার জন্যে আসোনি। আননেসেসারি কথা না বাড়িয়ে আসল ব্যাপারটা বল।'

সোজা সুনীলার চোখের দিকে তাকিয়ে সবিতা জিজ্ঞেস করল, 'হিরণ্ময় লাহিড়ির সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কী?'

সুনীলার চোখের নীলাভ মণিতে আগুনের ঝলক দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'উই আর জাস্ট ফ্রেন্ডস।'

হিরণ্ময়ের সঙ্গে ঠিক এ জাতীয় সম্পর্কের কথাটা মনীষাও বলেছিলেন। সবিতা বলল, 'জাস্ট ফ্রেন্ডস?'

সুনীলা ঠান্ডা গলায় বললেন, 'প্রতিটি মানুষেরই প্রাইভেট লাইফ থাকে, সে ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করতে নেই। অতিরিক্ত কৌতূহল খুব খারাপ জিনিস।' একটু থেমে বললেন, 'তোমার সম্বন্ধে আমি কিছু কিছু শুনেছি। ভাল করে লেখাপড়া কর। দুর্দান্ত একটা রেজাল্ট চাই। ফ্রম নাউ অন এনজয় লাইফ অ্যানিউ।'

সবিতা কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন সুনীলা, 'স্যরি, আমি আর বসতে পারছি না। আমাকে এখনই বেরুতে হবে।'

ইঙ্গিতটা পরিষ্কার। যে অস্বস্তিকর প্রসঙ্গটা উঠেছে তা নিয়ে সুনীলা আর কথা বলতে চান না। অগত্যা সবিতাকেও উঠে পড়তে হয়।

দরজা পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এলেন সুনীলা। চাপা গলায় বললেন, 'এখানে যে এসেছিলে, তোমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে হিরুকে তা জানাব না। একটা রিকোয়েস্ট করছি।'

'কী?'

'এখানে আর কখনও এস না।'

দুপুরের অনেক আগেই সাউথ-এণ্ড পার্কে ফিরে এল সবিতা। এর মধ্যে সামনের লনে শামিয়ানা খাড়া হয়ে গেছে। তার তলায় চেয়ার টেবল পেতে সকালবেলার সেই যুবকরা খুব মন দিয়ে কী সব কাগজপত্র দেখছে। তবে সঞ্জয়কে এখন আশেপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

সবিতা অন্যমনস্কর মতো বাড়ির ভেতর ঢুকে সোজা নিজের ঘরে চলে এল। কাঁধের ব্যাগটা পড়ার টেবলে রেখে ধীরে ধীরে বিছানায় শরীর এলিয়ে দেয় সে।

আজ আলিপুরে যাওয়াটা পুরোপুরি ব্যর্থ, তা বলা যাবে না। সুনীলা মজুমদারের সঙ্গে হিরণ্ময়ের সম্পর্কটা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন মনীষা। সোজাসুজি না বললেও সেটা ঘুরিয়ে মোটামুটি স্বীকার করে নিয়েছেন মহিলা।

সুনীলাকে অবশ্য নিজের চোখে দেখতে পাওয়া গেছে। আলিপুর অভিযানের সাফল্য এটুকুই। নইলে ওঁর সম্পর্কে আর কিছুই জানা গেল না। চতুর মহিলাটি তার প্রশ্নের উত্তর কৌশলে এড়িয়ে গেছেন। হিমশৈলের ওপর দিকের সামান্য অংশই চোখে পড়েছে সবিতার। বেশির ভাগটাই গোপন রয়ে গেল।

দশ

নির্বাচনের কাজ পুরোদমেই শুরু হয়ে গেছে। প্রথম দিকে চার পাঁচ জন যুবককে গোছা গোছা কাগজপত্রের ওপর ঘাড় গুঁজে বসে থাকতে দেখা যেত। এখন প্রায় সারাদিনই আরো অনেক ছেলেমেয়ে অনবরত জিপে করে আসছে, যাচ্ছে। এক ধারে আর্টিস্ট আনিয়ে ফেস্টুন লেখানো চলছে। কখনও মাটাডোর ভ্যান বোঝাই করে আনা হচ্ছে হিরণ্ময়ের রঙিন ছবিওলা বিরাট বিরাট পোস্টার। তার পুরো নির্বাচনকেন্দ্র এসব দিয়ে ছেয়ে ফেলা হবে।

গোটা বাড়ি জুড়ে আজকাল সর্বক্ষণ ব্যস্ততা, হইচইতে চারদিক সরগরম হয়ে থাকে।

ক'দিন ধরে হিরণ্ময় বাড়ি থেকে প্রায় বেরুচ্ছেনই না, অনেকটা সময় শামিয়ানার তলায় নির্বাচন কর্মীদের মধ্যে তাঁকে বসে থাকতে দেখা যায়। সঞ্জয়েরও ছোটাছুটির শেষ নেই, একবার সে শামিয়ানার তলায় আসছে, পরক্ষণে নিজের একতলার সেই ঘরটায় ছুটে যাচ্ছে।

দোতলায় পড়ার টেবলে বসে ইদানীং রোজই এক দৃশ্য দেখে যায় সবিতা। এ সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তার মাথায় ফিক্সেশানের মতো আটকে ছ'টি মহিলা। তাদের দু'জনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। এখনও চারজন বাকি।

আজ দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে বেরিয়ে পড়ল সবিতা।

শামিয়ানার নিচে নির্বাচন কর্মীদের হাত নেড়ে নেড়ে কিছু বোঝাচ্ছিলেন হিরণ্ময়। ড্রাইভওয়ে দিয়ে সবিতাকে গেটের দিকে যেতে দেখে একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালেন, কিন্তু কিছু বললেন না। তাঁর ভুরু দুটো সামান্য কুঁচকে গেল শুধু।

বড় রাস্তায় এসে বেলেঘাটা রুটের মিনিবাস ধরল সবিতা। আজ সে কণিকা দত্তর সঙ্গে দেখা করবে।

কনডাক্টরকে আগেই বলে রেখেছিল। সে সবিতাকে নির্দিষ্ট স্টপেজে নামিয়ে দিল। বেলেঘাটা মেন রোড থেকে একটা সিনেমা হলের পাশ দিয়ে মিনিটখানেক হাঁটলেই অভয় হালদার লেন। সেখানে কণিকা দত্তদের ছিমছাম একতলা বাড়িটা খুঁজে বার করতে অসুবিধা হল না।

সদর দরজার গায়েই কলিং বেল। সেটা টেপার পর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। দরজা খুলে সামনাসামনি যিনি দাঁড়ালেন তাঁর বয়স চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। গায়ের রং একটু চাপা হলেও মেদহীন চেহারা, ভরাট মুখ, ঈষৎ পুরু রক্তাভ ঠোঁট, চিবুকে মসুর ডালের মতো একটা তিল, নিটোল বাহু, মসৃণ ত্বক, দুই চোখের গভীর দৃষ্টি—সব মিলিয়ে তাঁর মধ্যে কোথায় যেন তীব্র আকর্ষণ রয়েছে। যৌন আবেদন বলে একটা কথা আছে, ওঁকে দেখামাত্র তা মনে পড়ে যায়।

মহিলা ভুরু সামান্য তুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

তিনি কে, মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছিল সবিতা। তবু বলল, 'আমি কণিকা দত্তের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

মহিলা বললেন, 'আমিই কণিকা। ভেতরে এস।'

বাড়িটা ইংরেজি 'এল' শেপের। উঠোনের আধাআধি বাঁধানো। বাকি অর্ধেকটা কাঁচা। সেখানে ক'টা ফুলের গাছ চোখে পড়ল। উঠোনের ওধারের দুটো ঘরে দু-তিনজনকে দেখা গেল। তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধাও রয়েছেন। ওঁরা সবাই উৎসুক চোখে সবিতাকে লক্ষ করছেন।

বাইরের দরজা বন্ধ করে কণিকা সবিতাকে সঙ্গে করে কোণের দিকের একটা ঘরে চলে এলেন। এটা ড্রইংরুম, সোফা টোফা দিয়ে ফিটফাট সাজানো।

কণিকা বললেন, 'বসো—'

একটা সোফায় বসে পড়ল সবিতা। দু'দিন আকাশ খুব মেঘলা ছিল। আজ মেঘ কেটে গিয়ে চড়া রোদ উঠেছে। সেই সাউথ-এণ্ড পার্ক থেকে এতটা রাস্তা আসতে কপালে দানা দানা ঘাম জমেছে সবিতার। ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে কপাল মুছতে মুছতে সে বলল, 'এক গেলাস জল খাব।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

কণিকা জল নিয়ে এসে মুখোমুখি বসলেন।

এক নিঃশ্বাসে গেলাস শেষ করে সবিতা অনেকখানি আরাম বোধ করে। তারপর নিজের নামঠিকানা জানিয়ে বলে, 'আপনার কাছে বিশেষ একটা দরকারে এসেছি। আশা করি আমাকে সাহায্য করবেন।'

'তুমি সাউথ-এণ্ড পার্কের যে ঠিকানাটা বললে সেটা আমি চিনি। বাড়িটা বিজনেসম্যান হিরণ্ময় লাহিড়ির।'

'হ্যাঁ।'

'উনি তোমার কেউ হন?'

বোঝা যাচ্ছে তার সম্বন্ধে হিরণ্ময় কণিকাকে কিছু জানাননি। সবিতা বলল, 'আপনি কি জানেন, অনেকদিন আগে হিরণ্ময় লাহিড়ি নর্থ বেঙ্গলে শোভনা নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করে দেড় দু' বছরের মাথায় ডিভোর্স করেছেন?'

কণিকার কোনো প্রতিক্রিয়া হল কিনা, বাইরে থেকে বোঝা গেল না। খুব শান্ত গলায় তিনি বললেন, 'না, জানি না।'

'আমি সেই শোভনার মেয়ে। কয়েকদিন হল সাউথ-এণ্ড পার্কে এসেছি।'

'ও।' বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন কণিকা। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার কথা তোমাকে কে বলেছে? এখানকার ঠিকানাই বা কার কাছে পেয়েছ?'

সবিতা বলল, 'যিনি দিয়েছেন তাঁকে প্রমিস করেছি, তাঁর নামটা গোপন রাখব। দয়া করে তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইবেন না।'

'ঠিক আছে। আমার কাছে কী সাহায্য চাও, এবার বল।'

'হিরণ্ময় লাহিড়ি কিভাবে আপনার কতটা ক্ষতি করেছে সেটা জানতে চাই।'

কণিকা চমকে উঠলেন, 'ক্ষতি যে করেছেন, তোমাকে কে বললে?'

সবিতা বলল, 'আমি তো আগেই জানিয়েছি, নাম বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হিরণ্ময় লাহিড়ি আমার মায়ের মতো অনেক মহিলার জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে আপনিও রয়েছেন।'

কণিকার সারা মুখ বিষাদে ছেয়ে যেতে লাগল। চোখ নামিয়ে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'আমাদের সংসারটা উনি চালান। তার জন্যে কিছু দাম তো দিতেই হয় সবিতা—'

সবিতা কী বলতে যাচ্ছিল, কণিকা তাকে থামিয়ে দিলেন, 'প্লিজ স্টপ। মেয়ের বয়সী কারো সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করতে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করি—'

'করুন।'

'নিজের বাবাকে তুমি খুব ঘৃণা কর, তাই না?'

'আপনি তো হিরণ্ময় লাহিড়িকে খুব ভাল করেই চেনেন। তাঁকে শ্রদ্ধা করার কারণ আছে কি?'

কণিকা উত্তর দিলেন না।

যে উদ্দেশ্যে আসা তা জানা হয়ে গেছে। 'আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করে গেলাম। আচ্ছা চলি—' বলতে বলতে উঠে পড়ল সবিতা।

এগার

বিকেলে সাউথ-এণ্ড পার্কে ফিরে এল সবিতা। নির্বাচনের কাজ এখনও পুরোদমে চলছে। দুপুরে বেরুবার সময় হিরণ্ময়কে শামিয়ানার তলায় দেখেছিল সে। এখন তাঁকে কোথাও দেখা গেল না।

ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠতেই চোখে পড়ল, সঞ্জয় ভীষণ ব্যস্তভাবে কতকগুলো ছাপা পোস্টার নিয়ে কাচের দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসছে। সবিতাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। হয়তো কিছু বলত কিন্তু তার আগেই পাশ দিয়ে হল-ঘরে চলে গেল সবিতা। এখন আর কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

নিজের ঘরে এসে চোখেমুখে জল দিয়ে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসল সবিতা। নিচে নির্বাচন কর্মীদের ছোটাছুটি চলছে। এ বাড়ির কমপাউণ্ডের বাইরের রাস্তায় বেশ কিছু লোকজন চোখে পড়ছে। মাঝে মাঝে এ পাড়ায় নতুন মডেলের অনেক গাড়ি দেখা যায়। আজও দেখা গেল। ঝকঝকে গাড়িগুলো নিঃশব্দে, প্রায় ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে যেন। ক্বচিৎ দু-একটা ট্যাক্সি প্রচণ্ড জোরে হর্ন দিতে দিতে সাউণ্ড-এণ্ড পার্কের শান্তিভঙ্গ করতে করতে ভেতরে ঢুকে পড়ছে।

এখনও চারদিকে প্রচুর রোদ। পরিষ্কার নীলাকাশে পেঁজা তুলোর মতো ছন্নছাড়া মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। মনীষা সুনীলা আর কণিকা —তিনজন মহিলার কথাই ভাবছিল সবিতা। একমাত্র মনীষা ছাড়া বাকি দু'জন অকপটে তাঁদের জীবনের সব কথা খুলে বলেননি। তবে ওঁদের সঙ্গে হিরণ্ময়ের সম্পর্ক কী, তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। বাকি ক'জনের সঙ্গে দেখা করার কথা আগেই ঠিক করে রেখেছিল সবিতা। এখন মনে হচ্ছে, তার কী কোনো প্রয়োজন আছে? ওঁদের ইতিহাস আলাদা কিছু হবে না। কেউ হয়তো মনীষার মতো হিরণ্ময়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অনুপুঙ্খ বিবরণ শুনিয়ে দেবেন। কেউ কণিকার মতো ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়ে চুপ করে যাবেন। কেউ আবার তার সঙ্গে দেখা নাও করতে পারেন।

যা জানার তা তো হয়েই গেছে। কিন্তু হিরণ্ময়ের ওপর এই মারণাস্ত্রগুলো প্রয়োগ করবে কিভাবে? তার পদ্ধতিটাই বা কী? সবিতা এসব যখন ভাবছে বাইরের হল-ঘরে জুতোর আওয়াজ পাওয়া গেল। সেই সঙ্গে হিরণ্ময়ের গলা ভেসে আসে। তিনি মায়াকে বলেছেন, 'মায়া তুমি নিচে চলে যাও। নজর রেখ, কেউ যেন এখন দোতলায় না আসে।'

মায়া বলে, 'আচ্ছা—'

সবিতা ভাল করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘরে এসে ঢুকলেন হিরণ্ময়। তাঁকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

সচকিত সবিতা উঠে দাঁড়ায়। বেশ ক'দিন সে বাড়িতে আছে কিন্তু আগে আর কখনও তার

ঘরে আসেন নি হিরণ্ময়। দু বার তাকে তেতলায় ডেকে নিয়ে গিয়ে কথা বলেছেন। হঠাৎ কী এমন ঘটেছে যাতে তাঁকে এখানে আসতে হল।

হিরণ্ময় তীব্র গলায় বললেন, 'কলকাতায় এসে প্রথম দিন তুমি আমাকে বলেছিলে, তোমার মায়ের মৃত্যুর পর আসানগঞ্জে একা একা সেফ ফিল করছ না। নিরাপত্তার জন্যে তুমি আমার কাছে চলে এসেছ। তোমার মায়ের সেরকম ইচ্ছা ছিল। ঠিক বলছি?'

সবিতা লক্ষ করল, হিরণ্ময়ের চোখ দুটো লালচে, কথা বলতে বলতে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে, দুই হাত মুঠো পাকিয়ে যাচ্ছে। হিরণ্ময়ের এমন উগ্র চেহারা আগে দেখা যায়নি। ভেতরে ভেতরে একটু ভয় পেয়ে গেল সে, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলছেন।'

'তোমাকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে এ বাড়িতে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি। তোমার যাতে কোনোরকম কষ্ট বা অসুবিধা না হয় তার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আমি কি মিথ্যে বলছি?'

ঠেলতে ঠেলতে কোন অদৃশ্য, বিপজ্জনক খাদের কিনারায় হিরণ্ময় তাকে নিয়ে চলেছেন, বুঝতে পারছে না সবিতা। সে বলল, 'না। কিন্তু এসব আপনি আগেও বলেছেন।'

তার কথার উত্তর না দিয়ে হিরণ্ময় বললেন, 'আমার আচরণ সম্পর্কে তোমার কোনো অভিযোগ আছে?'

'একেবারেই না।'

'তুমি এখানে নিরাপদ বোধ কর না?'

'নিশ্চয়ই করি।'

দাঁতে দাঁত ঘষে চাপা কর্কশ গলায় হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হলে এসব করে বেড়াচ্ছ কেন?'

ইঙ্গিতটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারল সবিতা। তবু বলল, 'এসব বলতে?'

'আজ তুমি বেলেঘাটায় গিয়ে কণিকা দত্তর সঙ্গে দেখা করেছ?' বলে সোজা সবিতার চোখের দিকে তাকালেন হিরণ্ময়।

হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন মুহূর্তের জন্য থমকে গেল সবিতার। মহিলা কি খবরটা হিরণ্ময়কে এর মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন? প্রাথমিক ভয়টা কাটিয়ে উঠতে খানিকটা সময় লাগল তার। হিরণ্ময়ের দিক থেকে যে কোনো আক্রমণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে বলল, 'আপনাকে কে বলল?'

'অবান্তর প্রশ্ন। গিয়েছিলে কিনা?'

'গিয়েছিলাম।'

চোখ দুটো ক্রমশ আরো লাল হয়ে উঠছে হিরণ্ময়ের। জিজ্ঞেস করলেন, 'কণিকার কথা কার কাছে শুনেছ? ওখানকার ঠিকানা কে দিয়েছে?'

সবিতা মনস্থির করে ফেলেছে। কোনোভাবেই নার্ভাস হওয়া চলবে না। বলল, 'সেটা জানাতে আমি বাধ্য নই।'

মেয়েটা যে সাহসী এবং কিছুটা বেপরোয়া ধরনের, সেটা আগেই টের পেয়েছিলেন হিরণ্ময় কিন্তু তার স্পর্ধা যে এতটা মাত্রাছাড়া, সে যে মুখের ওপর ওভাবে বলতে পারে, ভাবতে পারেন নি। কিছুক্ষণ হতবাক তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তুমি না বললেও আমি ঠিক জেনে নেব।'

সবিতা উত্তর দিল না।

হিরণ্ময় বললেন, 'আর কার কার সঙ্গে তুমি দেখা করেছ?'

সবিতা বলল, 'মনীষা মিত্র আর সুনীলা মজুমদার।'

শরীরের সব রক্ত উঠে এসে চোখেমুখে জমা হতে লাগল। মনে হল, চোখদুটো ফেটে পড়বে।

সংঘাত যখন শুরু হয়ে গেছে তখন আর পিছিয়ে আসা যায় না। নিজেকে একটা দুর্ভেদ্য ঢাল বানিয়ে ফেলবে সবিতা। বলল, 'আমি ভবানীপুরের শিখা বাগচি, বেহালার সুলেখা ভৌমিক আর কুলঘাটের দীপ্তি চ্যাটার্জির সঙ্গে দু-একদিনের ভেতর দেখা করার কথা ভাবছি।' এঁদের সঙ্গে দেখা যে করবে না তা আগেই ঠিক করছে সে। হিরণ্ময়ের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য কথাটা বলল।

হিরণ্ময় বললেন, 'তোমার মতলবটা কী? এদের সঙ্গে দেখা করবে কেন?' তাঁর কণ্ঠস্বর চাপা গজরানির মতো শোনায়।

'মতলব একটাই।' সবিতা বলতে লাগল, 'আমার মায়ের মতো এই মহিলাদের কতটা ক্ষতি করেছেন ডিটেলে তা জানা।'

হিরণ্ময়ের মনে হল, এই মেয়েটাকে ধমকে শাসিয়ে নোয়ানো যাবে না। কৌশলটা তিনি পালটে ফেললেন। গলার স্বর নরম করে বললেন, 'আফটার অল আমি তোমার বাবা। ও সব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে তো কোনো লাভ নেই।'

'বাবা হতে হলে রোল মডেল হতে হয়, সেটা কি আপনি জানেন?'

'রোল মডেল— মানে?'

'মানে যাঁকে দেখে তাঁর ছেলেমেয়েরা জীবনের ভাল ভাল জিনিসগুলো শিখতে পারবে। তাঁর আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলবে।'

হিরণ্ময় একদৃষ্টে সবিতাকে লক্ষ করতে লাগলেন।

সবিতা থামেনি, 'শ্রদ্ধা করার মতো বা ভালবাসার মতো কোন মহৎ দৃষ্টান্ত আপনি আমার সামনে তুলে ধরেছেন?'

হিরণ্ময় এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। বললেন,' একটা কথা তুমি ভেবে দেখেছ?'

'কী?'

'অন্য সময় হলে ও সব নিয়ে ততটা দুশ্চিন্তা ছিল না। কিন্তু ইলেকশানের মুখে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে—মানে—'

বিদ্যুৎচমকের মতো একটা ভাবনা সবিতার মাথায় খেলে যায়। হিরণ্ময় জানেন না, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রটা তিনি নিজের অজান্তেই তার হাতে তুলে দিয়েছেন।

হিরণ্ময় উৎসুক সুরে বললেন, 'কী হল, কিছু বলছ না যে? যা বললাম শোননি?'

সবিতা বলল, 'শুনব না কেন?'

'প্লিজ ওই ব্যাপারটা তুমি ভুলে যাও। সামনে পরীক্ষা, মনটা লেখাপড়ায় কনসেনট্রেট কর।'

সবিতা উত্তর দিল না।

বার

সেই যে হিরণ্ময় তার ঘরে প্রথমে এসেছিলেন তারপর দুটো দিন পার হয়ে গেছে। এর ভেতর চরম আঘাতটা কিভাবে হানবে তা স্থির করে ফেলেছে সবিতা।

আজ সকালে উঠে মুখটুখ ধুয়ে চিঠি লিখতে বসল সে। একটা দুটো নয়— পর পর অনেকগুলো। যাঁদের উদ্দেশ্যে এই সব চিঠি তাঁরা হলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ কমিশনার এবং বাংলা ইংরেজি কাগজের কয়েকজন সম্পাদক।

শুরুতে নিজের পরিচয় জানিয়ে, বিশদভাবে হিরণ্ময়ের লাম্পট্যের বিবরণ দিয়ে সবিতা লিখেছে এই ধরনের দুশ্চরিত্র মানুষ নির্বাচনে জিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করুক, তা কোনো মতেই কাম্য নয়। হিরণ্ময় লাহিড়িকে সে এ ব্যাপারে সব দিক থেকেই বাধা দেবে। এ জন্য তার বিপদের সম্ভাবনা আছে।

মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশ কমিশনারের চিঠিতে সবিতা লিখল, সত্যিই যদি তার জীবন বিপন্ন হয়, ওঁরা যেন অনুগ্রহ করে এ নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেন। সম্পাদকদের কাছে তার আর্জি, এই চিঠি যেন কাগজে ছাপা হয়।

লেখার পর চিঠিগুলো আলাদা আলাদা খামে পুরে, স্ট্যাম্প লাগিয়ে, মুখগুলো আঠা ছাড়াও সেলোটেপ দিয়ে আটকে পলিথিনের ব্যাগে ভরে ফেলল। তারপর মায়াকে দিয়ে একতলা থেকে সঞ্জয়কে ডাকিয়ে আনল। তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে বন্ধু মনে করতে পারি কি?'

সঞ্জয় হকচকিয়ে যায়। ব্যস্তভাবে বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'সেদিন মনীষা মিত্রের ঠিকানা দিয়েছিলেন। আমি কাউকে আপনার কথা বলিনি।'

'জানি। লাহিড়ি সাহেব টের পেলে এতদিনে আমার সর্বনাশ হয়ে যেত।'

সবিতা বলল, 'আপনাকে আজ একটা কাজের দায়িত্ব দিতে চাই। সেটা গোপন রাখতে হবে।

আশা করি, আমার বিশ্বাসের মর্যাদা আপনি রাখবেন।'

সঞ্জয় বলল,'বিশ্বাসভঙ্গ করব না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন, কিন্তু দায়িত্বটা কী?'

পলিথিনের ব্যাগটা সঞ্জয়কে দিয়ে সবিতা বলল, 'এর ভেতর ন'টা চিঠি আছে। আমার যদি কোনো বিপদ হয় এগুলো লেটার বক্সে ফেলে দেবেন।'

উদ্বিগ্ন মুখে সঞ্জয় বলে, 'বিপদ! কিসের বিপদ!'

সবিতা বলল, 'দয়া করে এ নিয়ে আমাকে কোনো প্রশ্ন করবেন না। বিপদ যে ঘটবেই, তা বলছি না। তবে তার সম্ভাবনা আছে। যদি কিছু ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারবেন।'

বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইল সঞ্জয়।

সবিতা এবার বলে, 'আনন্দগোপাল বসুর ঠিকানা আর ফোন নাম্বারটা আমাকে দিতে পারেন?'

'আনন্দগোপাল বসু—মানে যিনি পলিটিক্যাল লিডার?'

'হ্যাঁ।'

'আমার ডায়েরিতে লেখা আছে। এখনই দরকার?'

'পেলে ভাল হয়।'

'নিয়ে আসছি।' সঞ্জয় উঠে পড়ল।

সবিতা বলল, 'চিঠিগুলো সাবধানে রাখবেন। কারো চোখে যেন না পড়ে।'

'পড়বে না।'

কিছুক্ষণ পর সঞ্জয় আনন্দগোপালের ফোন নম্বর টম্বর দিয়ে গেল।

সবিতার ঘরে একটা কালার টিভি আর টেলিফোন রয়েছে। কলকাতায় আসার পর কাউকে ফোন করেনি সে। কাকেই বা করবে? এই শহরে তার জানাশোনা তো কেউ নেই। তবে রোজ সন্ধেয় আর রাত্তিরে দু বার টিভিটা চালিয়ে খবর শোনে সে।

আজ প্রথম ফোন করল সবিতা। আনন্দগোপালের নম্বরটা ডায়াল করতেই ওধার থেকে ভারি কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কাকে চান?'

সবিতা বলল,'আপনি আমাকে চিনবেন না। আপনার সঙ্গে দেখা করা বিশেষ দরকার। কখন গেলে আপনার অসুবিধা হবে না?'

'আমি খুব ব্যস্ত থাকি। ফোনে কি কাজটা সারা যায় না?'

সবিতা বলল, 'না স্যার। যা বলার আমি সামনাসামনি বলতে চাই।'

হয়তো সামান্য কৌতূহল বোধ করেন আনন্দগোপাল। বলেন, 'ঠিক আছে, কাল সকাল ন'টায় আমাদের বাড়ি এলে দেখা হবে। দশ মিনিটের বেশি সময় দিতে পারব না।'

'দশ মিনিটই যথেষ্ট। তবে আমার একটা বিশেষ অনুরোধ আছে।'

'কী অনুরোধ?'

'আমরা আলাদাভাবে কথা বলব। তখন অন্য কেউ যেন না থাকে।'

'ঠিক আছে।'

পরদিন ঠিক ন'টায় দেশপ্রিয় পার্কের কাছে অবিনাশ ঘোষাল রোডে আনন্দগোপালদের বাড়ি পৌঁছে গেল সবিতা।

ভেতরে ঢুকলেই বিশাল একটা ঘর। সেখানে প্রচুর লোকজন বসে আছে। বোঝা যায়, এরা আনন্দগোপালের দর্শনপ্রার্থী, হয়তো কোনো অনুগ্রহের জন্য এসেছে। সবিতা শুনেছে, বড় রাজনৈতিক নেতাদের চারপাশে সারাক্ষণ মানুষের ভিড় লেগে থাকে। নিজের চোখে এই প্রথম সে এ ধরনের জমায়েত দেখল।

ঘরটার ওধারে একটা খোলা দরজা। তার ফাঁক দিয়ে ভেতর দিকে অন্য একটা ঘরের কিছুটা অংশ চোখে পড়ে। সেখানে কেউ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

সবিতা এধারে ওধারে তাকাতে লাগল কিন্তু কোথাও আনন্দগোপালকে দেখা যাচ্ছে না। সে কী করবে যখন ঠিক করতে পারছে না সেই সময় একটি ঝকঝকে চেহারার যুবক তার কাছে চলে আসে।

জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি সবিতা লাহিড়ি?'

সবিতা বলল, 'হ্যাঁ। আপনি?'

'আমি স্যারের পি. এ। একটু অপেক্ষা করুন। স্যারের সঙ্গে একজন কথা বলছে। সে বেরুলেই আপনাকে ওঁর কাছে নিয়ে যাব।'

সবিতা বুঝতে পারে, ব্যক্তিগত সহকারীকে তার আসার কথা জানিয়ে রেখেছেন আনন্দগোপাল। সে বলল,'ঠিক আছে।'

একটু পরেই ভেতরের ঘর থেকে মাঝবয়সী, টাকমাথা একটা লোক বেরিয়ে এল। আনন্দগোপালের পি. এ যুবকটি সবিতাকে বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে—'

ভেতরের ঘরে যেতে দেখা গেল, একটা বড় সেক্রেটারিয়েট টেবলের ওপাশে আনন্দগোপাল বসে আছেন। তাঁর মুখোমুখি ক'টা চেয়ার সাজানো রয়েছে।

পি. এ বলল, 'স্যার, ইনি সবিতা লাহিড়ি—'

সবিতাকে বসতে বলে আনন্দগোপাল যুবকটিকে বললেন, 'তুমি বাইরে যাও।'

পি. এ চলে গেল। আনন্দগোপাল জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মুখটা চেনা লাগছে। কোথায় যেন দেখেছি।' বলতে বলতে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে যায়, 'হিরণ্ময় লাহিড়ির বাড়িতে কি?'

আনন্দগোপালের স্মৃতিশক্তি সবিতাকে অবাক করে দেয়। মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকে দেখেছেন ভদ্রলোক কিন্তু ঠিক মনে করে রেখেছেন। সে বলল, 'হ্যাঁ।'

'হিরণ্ময়ও লাহিড়ি, তুমিও লাহিড়ি। তোমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে?'

'আছে। আমি—আমি ওঁর মেয়ে।'

হতবাক আনন্দগোপাল অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন, 'মেয়ে! হিরণ্ময় বিবাহিত, আমি জানতাম না।'

সবিতা জানায়, বহুকাল আগে হিরণ্ময়ের সঙ্গে তার মায়ের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু তার জন্মের পরই দু'জনের ডিভোর্স হয়ে যায়। এত কাল সে নর্থ বেঙ্গলের আসানগঞ্জে থাকত। মায়ের মৃত্যুর পর কিছুদিন হল সাউথ এণ্ড পার্কে এসে আছে।

আনন্দগোপাল হিরণ্ময়ের বিবাহিত জীবন সম্পর্কে কোনোরকম ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন না। বললেন, 'তা আমার কাছে কী জন্যে এসেছ?'

'আপনাদের পার্টি থেকে হিরণ্ময় লাহিড়িকে ইলেকশানের টিকেট দেওয়া হয়েছে।'

'সে তো সবাই জানে।'

'কিন্তু লোকটার চরিত্র কেমন আপনি জানেন কি?'

আনন্দগোপাল চমকে ওঠেন, 'চরিত্র বলতে?'

সবিতা বলে, 'লোকটা লম্পট, আমার মা ছাড়াও অনেক মহিলার জীবন রুইন করে দিয়েছে।'

আনন্দগোপাল বলেন, 'নিজের বাবা সম্পর্কে বাইরের একজন লোকের কাছে কী বলছ, বুঝতে পারছ!'

'যা বলছি তার হানড্রেড পারসেন্ট সত্যি। আপনি প্রমাণ চাইলে দিতে পারি। যে লোক নিজের সন্তানের কাছে রোল মডেল হতে পারে না সে হাজার হাজার মানুষের প্রতিনিধি হয় কী করে?'

'তুমি কী চাইছ বল তো?'

'হিরণ্ময় লাহিড়ি যাতে ইলেকশানে কনটেস্ট করতে না পারে, আপনি তার ব্যবস্থা করুন।'

হতচকিত আনন্দগোপাল বলেন,' তা কী করে সম্ভব! এর মধ্যে ভোটের প্রচার শুরু হয়ে গেছে।'

'এই লোকটার জন্যে আপনাদের পার্টির ইমেজ কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে।'

আনন্দগোপাল কী উত্তর দেবেন, ভেবে পেলেন না।

সবিতা বলতে লাগল,'আপনারা যদি হিরণ্ময় লাহিড়িকে ইলেকশান থেকে না সরিয়ে দেন, আমি প্রেসের কাছে তাঁর সম্বন্ধে সমস্ত কিছু খুলে বলব। অন্য কেউ বললে এটাকে বেসলেস কুৎসা হিসেবে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু মেয়ে যদি বাবার বিরুদ্ধে বলে তার ইমপর্টান্স আলাদা। আপনাকে ডিসটার্ব করলাম। সে জন্যে ক্ষমা চাইছি। আচ্ছা, চলি।'

আনন্দগোপাল পোড়-খাওয়া রাজনৈতিক নেতা। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ নিয়ে তাঁর কাজ। কিন্তু এমন মেয়ে জীবনে আর একটিও দেখেননি। বিহ্বলের মতো তিনি তাকিয়ে রইলেন।

বাড়ি ফিরে দোতলায় উঠতেই মায়া ছুটে এল। ভয়ার্ত সুরে বলল, 'সাহেব আপনাকে তিন চারবার খোঁজ করেছেন। এক্ষুনি ওপরে যান।'

সবিতা নিজের ঘরে গেল না। সিঁড়ি দিয়ে সোজা তেতলায় চলে এল।

হল-ঘরের একটা সোফায় বসে ছিলেন হিরণ্ময়। তাঁর মুখ এখন থম থম করছে, যেন বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। সবিতাকে তিনি বসতে বললেন না। দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আনন্দগোপালবাবুর বাড়ি গিয়েছিলে?'

খবরটা যে হিরণ্ময়ের কাছে পৌঁছে গেছে তা বোঝাই যাচ্ছে। হয়তো আনন্দগোপালই ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন। সবিতা বলল, 'হ্যাঁ। এইমাত্র সেখান থেকে আসছি।'

'কেন গিয়েছিলে?'

'সেটা ওঁকেই জানিয়ে এসেছি। আমার ধারণা তিনি আপনাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন।'

কিছুক্ষণ আরক্ত চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন হিরণ্ময়। তারপর কর্কশ গলায় বললেন, 'আমার সর্বনাশ করার জন্যেই কি তুমি এতকাল পর কলকাতায় এসেছ?'

সবিতা উত্তর দিল না।

হিরণ্ময় এবার বললেন, 'তুমি জানো না কেউ আমাকে আঘাত দিলে আমি কতটা নিষ্ঠুর হতে পারি।'

সবিতা বলল, 'আমার বেলায় সে ঝুঁকি নিতে গেলে ভুল করবেন। যদি আমার কিছু ক্ষতি হয় মিডিয়া থেকে প্রশাসন পর্যন্ত সবাই জেনে যাবে। তার ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি।'

হিরণ্ময় হকচকিয়ে গেলেন, 'কী ব্যবস্থা করেছ?'

'সেটা এই মুহূর্তে জানানো সম্ভব নয়।'

দিন তিনেক পর সন্ধেবেলায় টিভি'র সংবাদ পাঠিকা জানালেন, আসন্ন নির্বাচন থেকে অনিবার্য কারণে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন হিরণ্ময় লাহিড়ি।

পরদিন দেখা গেল, ডেকরেটরের লোকেরা এসে বাড়ির সামনের সেই শামিয়ানার ছাউনি খুলে, চারপাশের খুঁটিগুলো তুলে ফেলছে।

ছেলেবেলা থেকে ধীরে ধীরে, সযত্নে সবিতার মা তাকে রণসজ্জায় সাজিয়ে দিয়েছে। হিরণ্ময়ের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধটায় সে জিতেছে ঠিকই কিন্তু ভবিষ্যতে কী হবে, জানে না। তবে এটা সবিতার জানা আছে, মায়ের কাছ থেকে পাওয়া মারণাস্ত্রগুলোকে সব সময় শান দিয়ে রাখতে হবে।

অভিযান

সবে আশ্বিনের শুরু। এবার পুজো পড়েছে এ মাসের শেষের দিকে। শরৎকালের রোদে আশ্চর্য এক মায়াবী আলো মাখানো থাকে। বিশেষ করে বিকেলের দিকটায়।

আজকের দিনটা শেষ হতে এখনও বেশ কিছুক্ষণ বাকি। আকাশ থেকে গলানো গিনির মতো রোদের ঢল নেমে এসে চারদিক ভাসিয়ে দিচ্ছে। মাথার ওপর যেদিকে তাকানো যাক, ধবধবে সাদা মেঘ যেন স্ফটিকের পাহাড়। ঝির ঝির করে বয়ে যাচ্ছে ফুরফুরে জলকণাহীন অদৃশ্য বাতাস। ঠিক এই সময় কলকাতার উত্তর দিকের একটা টাউনশিপের সামনে অটো থেকে নামলেন শরদিন্দু চৌধুরি। তাঁর হাতে মাঝারি ধরনের পুরনো চামড়ার সুটকেস। তা ছাড়া কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা নানা জিনিসে ঠাসা কাপড়ের ব্যাগ।

উত্তরে দক্ষিণে পুবে—যেদিকেই যাওয়া যাক, শহর কোথাও থেমে নেই। 'ইতি'র পর 'পুনশ্চ'র মতো ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছে। 'পপুলেশন এক্সপ্লোসন' বা 'জন-বিস্ফোরণ' যেভাবে ঘটে চলেছে তাতে না বেড়ে উপায়ই বা কী।

এই টাউনশিপটার নাম 'বিকাশ'। তিনদিকে ছিরিছাঁদহীন মানুষের বসতি—বেশির ভাগই বস্তি, বাহান্ন পাকওলা সরু সরু গলি। একতলা দোতলা বা তেতলা বাড়িটাড়িও প্রচুর। কিন্তু সেগুলো বহুকালের পুরনো।

বস্তিগুলোর যত্রতত্র ছোটখাট মোটর সারাইয়ের কারখানা, গ্যারাজ, চায়ের দোকান, ধোপাখানা, মুদির দোকান, তেলেভাজার দোকান, সস্তা চোলাইয়ের ঠেক, টিনের ছাউনির তলায় রেশন শপ। গলিগুলোর মোড়ে মোড়ে হয় শীতলা কি শিবমন্দির। তা ছাড়া দু পা হাঁটলেই একটা করে ক্লাব যেগুলো আসলে দিশি মদ খাওয়ার আখড়া। অবশ্য ক্লাবের ছোকরারা এলাকার লোকজনের গলা টিপে চাঁদা আদায় করে দুর্গাপুজো কালীপুজো থেকে শিবরাত্রি পর্যন্ত সমস্ত কিছু বিপুল উৎসাহে পালন করে থাকে। পুজোটা এখানকার সবচেয়ে বড় ইন্ডাস্ট্রি। রাস্তায় রাস্তায় আবর্জনার ডাঁই, দুর্গন্ধে বাতাস বিষাক্ত হয়ে আছে। সর্বক্ষণ এই আঞ্চলটায় মারদাঙ্গা, বোমাবাজি লেগেই রয়েছে। সব মিলিয়ে পরিবেশটা নরকের কাছাকাছি।

এর পাশে 'বিকাশ' বিরাট এক চমক। প্ল্যানড টাউনশিপ বলতে যা বোঝা যায় তা-ই। রাস্তাগুলো পরিচ্ছন্ন এবং সোজা। ফুটপাথে হকার নেই। আধুনিক আর্কিটেকচারের চোখ-ধাঁধানো বাগানওলা সব বাড়ি। বড় রাস্তার ক্রসিংয়ে ক্রসিংয়ে রয়েছে উঁচু উঁচু সার্কল, যেগুলোর মাঝখানে ফোয়ারা। বাতাস এখানে পরিষ্কার, দূষণের ছিটেফোঁটাও নেই।

এবার শরদিন্দু চৌধুরির দিকে তাকানো যাক। সত্তরের ওপর বয়স হলেও সতেজ চেহারা। শরীরে সময়ের ছাপ নিশ্চয়ই পড়েছে কিন্তু তাঁকে এতটুকু নুইয়ে ফেলতে পারেনি। বয়স বাড়লে দেহমনে যখন ক্ষয় শুরু হয়, কোনো কিছুতেই তেমন আগ্রহ থাকে না, কিন্তু শরদিন্দু অন্য ধাতের মানুষ। সব ব্যাপারেই তাঁর বিপুল উৎসাহ, অফুরন্ত উদ্যম।

শরদিন্দুকে নিয়ে আগেও দু-একটা লেখা লিখেছি। কিন্তু তাঁর জীবনে এত অফুরন্ত উপকরণ যে আরো অনেক কিছু লেখা যেতে পারে।

দেশভাগের আগে শরদিন্দুরা থাকতেন ঢাকা জেলার নগণ্য এক শহর বাজিতপুরে। দুধর্ষ ছাত্র ছিলেন, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ.'তে ফার্স্ট ক্লাস। তখন ইংরেজ আমল। ইচ্ছা করলে বড় চাকরি করতে পারতেন। ব্যক্তিগত পার্থিব সুখের চেয়ে আদর্শবাদ ছিল তাঁর কাছে অনেক বেশি মূল্যবান। নিজেদের শহরে ফিরে এসে স্কুলে কাজ নিলেন। উদ্দেশ্য, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের জন্য সত্যিকারের মানুষ তৈরি করবেন। বিয়ে করেন নি। একান্নবর্তী পরিবারে ভাইবোন-মা-বাবার সঙ্গে থাকতেন। তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিল পড়ানো। ছাত্র আর স্কুল ছাড়া অন্য কোনো দিকে নজর ছিল না।

দেশভাগের পর তখনকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে যখন শরণার্থীদের ঢল নামল সীমান্তের এপারে, শরদিন্দুদেরও চলে আসতে হয়েছিল। তবে তাঁরা রিফিউজি ক্যাম্প বা কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নেন নি। সোজা চলে গিয়েছিলেন পাটনায়। সেখানে তাঁর দুই ভাই আগেই চলে এসেছিল।

তারা রেলে চাকরি করত। অপশন দিয়ে এপারে আসে।

পাটনায় এসে মেয়েদের একটা স্কুলে কাজ নিয়েছিলেন শরদিন্দু। সেখান থেকে রিটায়ারমেন্টের পর হঠাৎ তাঁর ইচ্ছা হল বাজিতপুরে তাঁর যে ছাত্ররা ছিল তারা কে কোথায় আছে, কী করছে, নিজে গিয়ে দেখে আসবেন। একদা যে কিশোর বা সদ্য যুবকদের অসীম যত্নে, বিপুল পরিশ্রমে মানুষ করে তুলেছিলেন তাদের নতুন করে আবিষ্কার করবেন।

পার্টিশানের পর ছাত্ররা কে কোথায় ছিটকে পড়েছিল, ভারতবর্ষের কে কোন প্রান্তে চলে গেছে তার হদিস পাওয়া খুবই কঠিন কাজ। বিশেষ করে পাটনায় বসে। কলকাতায় থাকলে যোগাযোগ করার অনেক সুবিধা হত। কিন্তু তিনি হতাশ হয়ে পড়েন নি। শরদিন্দুর মধ্যে প্রচণ্ড একগুঁয়েমি রয়েছে। কিছু একটা মাথায় চাপলে তার শেষ না দেখে ছাড়েন না। পাটনাতে বসেই একে ওকে চিঠি লিখে তিনি তাঁর কয়েকজন পুরনো ছাত্রের ঠিকানা জোগাড় করেছেন। তারপর একদিন বেরিয়ে পড়েছেন। কলকাতায় আসার পর দু'জন ছাত্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল—দিব্যেশ এবং বিমল। এখানে আরো একজন ছাত্রের খোঁজ পান তিনি, যাঁর হদিস পাটনায় পাওয়া যায় নি। এঁর নাম সুরজিৎ মজুমদার। সুরজিৎ একজন নাম-করা ডাক্তার। তিনি থাকেন 'বিকাশ'-এ। আজ তাঁর কাছেই এসেছেন শরদিন্দু। আসার আগে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন। চিঠির উত্তরও পেয়ে গেছেন। সুরজিৎ লিখেছেন, স্যার কিছুদিন এসে তাঁদের কাছে কাটিয়ে গেলে তাঁরা কৃতার্থ বোধ করবেন। আজ যে ডাক্তার হিসেবে নাম করেছেন, সামাজিক দিক থেকেও তাঁর বিপুল প্রতিষ্ঠা, সবই শরদিন্দুর কারণে। পূর্ব বাংলার বাজিতপুর হাই স্কুলে পড়ার সময় জীবনের ভিতটা তিনিই শক্ত করে গড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে সুরজিতের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

অটো থেকে নেমে হাতের সুটকেসটা নিচে নামিয়ে রেখে পকেট থেকে ভাঁজ-করা একটা কাগজ বার করলেন শরদিন্দু। সুরজিতের ঠিকানা ওটায় লেখা আছে।

কিন্তু ভাঁজ খোলার আগেই মাঝবয়সী একজন শরদিন্দুর কাছে এগিয়ে এলেন। অ্যাভারেজ বা গড়পড়তা বাঙালির তুলনায় তাঁর হাইটটা বেশ ভালই। প্রায় পাঁচ ফুট আট ন ইঞ্চি। লম্বাটে মুখ, দামি চশমার ভেতর উজ্জ্বল চোখ, চওড়া কপাল, ব্যাক ব্রাশ-করা কাঁচাপাকা চুল, দৃঢ় চিবুক। গায়ের রং বাদামি। এই বয়সেও চামড়ায় সামান্য ভাঁজ পড়েনি। টান টান, মসৃণ ত্বক। পরনে ট্রাউজার্স আর বুশ শার্ট, পায়ে পালিশ-করা চকচকে চপ্পল। হাতে সোনার ব্যান্ডে নতুন মডেলের ঘড়ি। সফল, প্রতিষ্ঠিত মানুষদের চেহারায় অদ্ভুত একটা দীপ্তি থাকে। এঁর মধ্যে সেটা একটু বেশি মাত্রায় রয়েছে।

একটু অবাক হয়ে আগন্তুকের দিকে তাকালেন শরদিন্দু। জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে কিছু বলবেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, আপনি কি শরদিন্দু চৌধুরি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি—'

'স্যার, আমি সুরজিৎ—'বলে ঝুঁকে শরদিন্দুকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন সুরজিৎ।

দ্রুত প্রাক্তন ছাত্রটিকে দু হাতে টেনে তুলে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরলেন শরদিন্দু,'কত ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। তোর চেহারা একেবারে বদলে গেছে। চিনতে পারি নি।'

সুরজিৎ বললেন, 'আপনার চেহারাও আগের মতো নেই। তবে চিনতে অসুবিধা হয় নি।'

'হ্যাঁ, অনেকে বলে আমি খুব একটা পালটাই নি।'

'ঠিকই বলে।'

শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'তা তুই এখানে কোত্থেকে?'

সুরজিৎ বললেন, 'আপনি চিঠিতে লিখেছেন, বিকেলে আসবেন। তাই এসে দাঁড়িয়ে আছি।'

'কতক্ষণ?'

'আধ ঘণ্টার মতো।'

'বলিস কী রে!' রীতিমতো অবাক হয়ে শরদিন্দু বললেন, 'শুনেছি, তুই একজন ভেরি বিজি ডাক্তার। আমার জন্যে এতটা সময় নষ্ট করলি!'

সুরজিৎ বললেন, 'স্যার, আধ ঘণ্টা কেন, আপনার জন্যে আমি সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারি।'

আদরের ভঙ্গিতে সুরজিতের পিঠে আলতো একটা চাপড় মেরে শরদিন্দু বললেন, 'পাজিটা। খুব

ফ্ল্যাটারি করতে শিখেছ।'

সুরজিৎ শরদিন্দুর সুটকেসটা তুলে নিয়ে বলল, 'চলুন স্যার—'

বিব্রতভাবে শরদিন্দু বললেন, 'আরে আরে, এ কী করছিস! এত বড় ডাক্তার হয়ে স্কুল মাস্টারের সুটকেস বইছিস! তোর পেশেন্টরা দেখলে কী বলবে? দে ওটা—'

সুরজিৎ দিলেন না। বললেন, 'পেশেন্টরা বুঝতে পারবে যার সুটকেস আমি বইছি তিনি কত বড় মাপের মানুষ—'

শরদিন্দু হেসে হেসে বললেন, 'বাঁদর কোথাকার!' স্কুলে তাঁর ছাত্রদের সস্নেহে যা বলতেন—পাজি উল্লুক গাধা ইত্যাদি—সেই অভ্যাসটা এখনও ছাড়তে পারেন নি। সুরজিতের হাত থেকে সুটকেসটা নেবার জন্য তিনি আর জোর করলেন না।

খনিক দূরে রাস্তার ধার ঘেঁষে একটা ঝকঝকে মারুতি এসটিম দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়িটার কাছে এসে দরজা খুলে দিয়ে সুরজিৎ বললেন, 'উঠুন স্যার—'

শরদিন্দু বললেন,'এ গাড়ি তোর?'

সুরজিৎ অল্প হাসলেন, 'আপনার আর্শীবাদে স্যার—'

শরদিন্দু মজার গলায় বললেন, 'পশারটা তা হলে ভালই জমিয়েছিস!'

সুরজিৎ উত্তর দিলেন না। একটু হাসলেন।

শরদিন্দু ব্যাক-সিটে উঠে পড়লেন। সুরজিৎ স্যুটকেসটা তাঁর পাশে রেখে দরজা বন্ধ করে ফ্রন্ট-সিটে উঠে স্টার্ট দিলেন। গাড়ি চলতে শুরু করল।

কবে, কোন কিশোর বয়সে পূর্ব বাংলার নগণ্য এক শহরের স্কুলে কয়েকটা বছর পড়েছিলেন সুরজিৎ। কিন্তু তা ভুলে যান নি তিনি। কৃতজ্ঞতায় ভক্তিতে এখনও তিনি আপ্লুত। একজন অত্যন্ত কৃতী মানুষ, তাঁর এককালের ছাত্র, রাস্তায় এসে তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে থাকবেন, তাঁর সুটকেস বইবেন, নিজে ড্রাইভ করে তাঁকে বাড়ি নিয়ে যাবেন, এতটা ভাবতে পারেন নি শরদিন্দু। এত সম্মান তিনি আশাও করেন নি। খুশিতে তাঁর মন ভরে যাচ্ছিল। শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর বাড়ি এখান থেকে কতদূরে?'

সুরজিৎ বললেন,'কাছেই। গাড়িতে ম্যাক্সিমাম মিনিট চার পাঁচ।'

'হেঁটে গেলে?'

'কুড়ি বাইশ মিনিট।'

শরদিন্দু বললেন, 'এইটুকু রাস্তার জন্যে গাড়ি নিয়ে এসেছিস? হেঁটেই তো যাওয়া যেত।'

সুরজিৎ জানেন, তাঁর এই প্রাক্তন মাস্টার মশাইটি একজন ভূপর্যটক। ছেলেবেলায় তাঁকে মাইলের পর মাইল হাঁটতে দেখেছেন। তা ছাড়া, পূর্ব বাংলায় সেই আমলে বাজিতপুরের মতো অখ্যাত এক শহরে এবং তার চারপাশে তেমন গাড়ি ঘোড়াই বা কোথায়? হাঁটা ছাড়া তখন উপায়ই বা কী।

সুরজিৎ বললেন, 'এই বয়সেও হাঁটার অভ্যাসটা আছে নাকি স্যার? ছোটবেলায় দেখেছি রোজ পাঁচ-সাত মাইল হাঁটাটা আপনার কাছে কোনো ব্যাপারই ছিল না।'

শরদিন্দু পেছনের সিট থেকে বললেন, 'ওটা আছে বলে এখনও ফিট আছি, নইলে অথর্ব হয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে হত। অবশ্য—'

'কী?'

'আগের মতো পাঁচ সাত মাইল পারি না। দু-তিন মাইল রেগুলার হাঁটি। তাই আমার সুগার নেই, প্রেসার নেই। এভরিথিং পারফেক্টলি নর্মাল।'

করুণ মুখ করে সুরজিৎ বললেন, 'আপনার কথা শুনে খুব ঈর্ষা হচ্ছে। আমি ও দুটোই ধরিয়ে ফেলেছি। হাই প্রেসার, অ্যাবনর্মালি হাই।'

শরদিন্দু ধমকে উঠলেন, 'নিজে বড় ডাক্তার হয়ে কথাটা বলতে তোর লজ্জা হল না!'

সুরজিৎ উত্তর দিলেন না।

শরদিন্দু এবার বললেন, 'নিশ্চয়ই ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ টাইজ করিস না?'

সুরজিৎ বললেন, 'না স্যার, ওটা আর হয়ে ওঠে না। সকাল থেকে শুধু পেশেন্ট আর পেশেন্ট।

তা ছাড়া রয়েছে নার্সিং হোম। এতটুকু সময় নেই, ফিজিক্যাল এক্সারসাইজটা করব কখন?'

শরদিন্দু কী বলতে যাচ্ছিলেন, গাড়িটা একটা বাড়ির গেটের সামনে এসে থামে।

উর্দি-পরা দারোয়ান শশব্যস্তে প্রকাণ্ড লোহার গেট খুলে দিতেই সুরজিৎ গাড়িটা ভেতরে নুড়ি-বিছানো ড্রাইভওয়েতে নিয়ে এলেন। তারপর নেমে এসে পেছনের দরজা খুলে সসম্ভ্রমে বলেন, 'আসুন স্যার। আমরা এসে গেছি।'

শরদিন্দু নামলেন। সুরজিৎ তাঁর সুটকেসটা হাতে নিয়ে বললেন, 'ওই যে ওদিকে—'কোত্থেকে একটা বেয়ারা ছুটে এসে সুরজিতের হাত থেকে সুটকেসটা নিতে যাচ্ছিল, তিনি দিলেন না। তাদের সাহেব যে বৃদ্ধের সুটকেস বইছেন তিনি যে সামান্য মানুষ নন, সেটা বুঝতে পারছিল সে। অবাক বিস্ময়ে শরদিন্দুর দিকে তাকিয়ে রইল।

দ্রুত চারপাশ দেখে নিলেন শরদিন্দু। বাড়িটা বিশাল কমপাউণ্ড জুড়ে। উঁচু কম্পাউন্ড ওয়াল দিয়ে চৌহদ্দিটা ঘেরা। ড্রাইভওয়ের ধার ঘেঁষে সমান মাপের ঝাউয়ের লাইন। রাস্তাটার বাঁ পাশে নানা ধরনের ফুল আর দুষ্প্রাপ্য অর্কিডের বাগান। আর এক ধারে সবুজ কার্পেটের মতো ঘাসের লন।

এরই মাঝে তেতলা মূল বাড়িটার চোখ-ধাঁধানো আর্কিটেকচার। ড্রাইভওয়ে থেকে সবুজ পাথরের দশটা সিঁড়ি ভেঙে সুরজিতের পাশাপাশি বিরাট চৌকো চত্বরে উঠে এলেন শরদিন্দু। চত্বরটার শেষ মাথায় গ্রিল আর কাচ দিয়ে তৈরি ছ'পাল্লার দরজা। সেটা খোলাই রয়েছে।

ভেতরে ঢুকে ক'পা গেলে চমৎকার সাজান হল-ঘর। দেখেই বোঝা যায় ড্রইংরুম। সেটাকে ঘিরে অনেকগুলো বেডরুম।

ড্রইংরুমের এক ধার দিয়ে ওপরে ওঠার বাঁকওলা সিঁড়ি। সুরজিৎ শরদিন্দুকে সঙ্গে নিয়ে তেতলায় উঠে এলেন।

একতলার মতো দোতলা এবং তেতলাতেও একই রকমের হল-ঘর, বেডরুম, ইত্যাদি।

হল-ঘরের সোফায় শরদিন্দুকে বসিয়ে সুরজিৎ ব্যস্তভাবে ডাকতে লাগলেন, 'কৃষ্ণা—কৃষ্ণা—স্যার এসে গেছেন। তাড়াতাড়ি এস।'

ডান পাশের একটা ঘর থেকে মাঝবয়সী দারুণ সুন্দরী এক মহিলা বেরিয়ে এলেন। এই বয়সেও তাঁর ত্বকে গোলাপি আভা। পানপাতার মতো মুখ, সরু চিবুক, ঘন পালকে-ঘেরা ভাসা ভাসা টানা চোখ, নিটোল গলা, পিঠময় অজস্র ঘন চুল। ভুরু দুটো তুলিতে টানা। পরনে মোটামুটি দামি শাড়ি আর ব্লাউজ, পায়ে হালকা স্লিপার। এক হাতে কয়েক গাছা সোনার চুড়ি, আর এক হাতে একটা মাত্র কাঁকন. নাকে হীরের নাকছবি, গলায় লকেট-ওলা চেইন, ডান হাতের মাঝখানের আঙুলটায় হীরে-বসান আংটি। কপালের মাঝখানে সিঁদুরের মস্ত টিপ। দেখেই বোঝা যায়, সাজসজ্জার দিকে তাঁর বিশেষ নজর নেই, সাধারণভাবে থাকতেই তিনি পছন্দ করেন।

সুরজিৎ শরদিন্দুকে বললেন, 'আমার স্ত্রী কৃষ্ণা।' কৃষ্ণাকে বললেন, 'স্যারের কথা তো তুমি জানই।'

কৃষ্ণা শরদিন্দুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। আশীর্বাদের ভঙ্গিতে তাঁর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'বসো—' নম্র, শান্ত মহিলাটিকে খুব ভাল লেগে গেল শরদিন্দুর। উগ্র সাজগোজ, উৎকট আধুনিকতা, এসব তাঁর দু চোখের বিষ। কৃষ্ণা মুখোমুখি একটা সোফায় বসলেন। বললেন, 'আপনি আসবেন, ক'দিন ধরে আমরা সে জন্যে অপেক্ষা করছি। আপনার ছাত্রের কাছে আপনার কথা কত যে শুনেছি তার ঠিক নেই।'

সুরজিৎ একটা সোফায় বসে পড়েছিলেন। বললেন, 'তোমার সঙ্গে যে আমার বিয়েটা হওয়া সম্ভব হয়েছে, সেটা স্যারের দয়ায়।'

কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে থাকেন শরদিন্দু। তারপর বলেন, 'কী বলছিস রে, আমি কি তোর বিয়ের ঘটকালি করেছিলাম?'

'ঠিক তা নয় স্যার—'

'তা হলে?'

'কৃষ্ণার বাবা একজন বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। ওদের প্রচুর টাকা।'

'ব্যাপারটা কিছুই বোধগম্য হল না। সব ধাঁধার মতো লাগছে। বাজিতপুর ছাড়ার পর এই প্রথম

তোর প্রথম সঙ্গে দেখা হল। তা হলে আমার দয়ায় তোর বিয়েটা হল কী করে?'

সুরজিৎ সমস্ত বুঝিয়ে বললেন। স্কুল পড়ার সময় শরদিন্দু গড়ে পিটে তাঁর ছাত্র জীবনের ভিতটা দারুণ ভাবে তৈরি করে দিয়েছিলেন। তারই জেরে দেশভাগের পর সর্বস্ব খুইয়ে সীমান্তের এপারে এসে কৃতী ছাত্র হিসেবে সকলের নজরে পড়েছেন। মেডিকেল কলেজ থেকে চোখ ধাঁধান রেজাল্ট করে বেরিয়েছেন। তাঁর আগে দশ বার বছরের ভেতর এমন রেজাল্ট নাকি আর কেউ করে নি।

সে বারের সফল ছাত্রদের একটা অনুষ্ঠান করে সম্মান জানান হয়েছিল, দেওয়া হয়েছিল দামি দামি পুরস্কার। সেই অনুষ্ঠানে কৃষ্ণার বাবা শিল্পপতি নবকিশোর চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সভাপতি। সুরজিতের সঙ্গে আলাপ করে তাঁর খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। একটি উদ্বাস্তু যুবক শুধুমাত্র নিজের মেধা এবং পরিশ্রমে এত বড় কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে, এতে তিনি মুগ্ধ। তিনি সুরজিৎকে পরে দেখা করতে বলেছিলেন। সুরজিৎ কয়েক দিন পর তাঁর বাড়িতে গেলে সাগ্রহে বলেছিলেন, উচ্চতর শিক্ষা বা মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে সুরজিৎ যদি গবেষণা করতে চান, তিনি তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। সোজাসুজি না হলেও আর্থিক সহায়তার কথাই নবকিশোর বলতে চেয়েছেন।

সুরজিতের আত্মসম্মান বোধ খুবই প্রবল। তিনি বিনীতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, সাহায্যের প্রয়োজন নেই। স্কলারশিপের টাকায় তিনি এম.ডি হয়েছিলেন। বিদেশে যাবার সুযোগও এসে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয় নি। নবকিশোর কিন্তু হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও সুরজিতের দিকে নজর রেখেছিলেন। ফোনে যোগাযোগ রাখতেন; মাঝে মাঝেই তাঁদের বাড়িতে যাবার জন্য অনুরোধ করতেন। সুরজিতের নম্র ব্যবহারে এবং কথাবার্তায় তিনি এতটাই সন্তুষ্ট যে তাঁকে নিয়ে মনে মনে দূরপ্রসারী একটা পরিকল্পনা করেছিলেন। পরে নিজের একমাত্র মেয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে তিনি সুরজিতের বিয়ে দেন।

সুরজিৎ বললেন, 'মাস্টার মশাই যদি দেশের স্কুলে আমার ফাউণ্ডেশনটা তৈরি করে না দিতেন, ডাক্তারি পড়াও হত না, ভাল রেজাল্টও করতে পারতাম না। তোমার বাবার সঙ্গে কোনোদিন দেখাও হত না—'

পুরনো ছাত্রের কথা শুনতে শুনতে খুব মজা লাগছিল শরদিন্দুর। তিনি হেসে বললেন, 'আর কৃষ্ণার সঙ্গে তোর বিয়েও হত না—তাই তো?'

সুরজিৎ হাসতে লাগলেন। কৃষ্ণা একটু গম্ভীর ধরনের মানুষ, তাঁর মুখেও হাসি ফুটে ওঠে।

সুরজিৎকে শরদিন্দু বললেন, 'আমার চিঠির যে জবাব দিয়েছিলি তাতে তোদের বাড়ির খবর বিশেষ কিছুই লিখিস নি। তোর মা-বাবা ভাইবোনেরা কে কেমন আছে, কোথায় আছে—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে সুরজিৎ বললেন, 'সব বলব। এতটা রাস্তা এসেছেন, নিশ্চয়ই টায়ার্ড। আগে একটু চা খান—' কৃষ্ণাকে বললেন, 'পশুপতিকে চায়ের ব্যবস্থা করতে বল।' পশুপতি এ বাড়ির রান্নার লোক।

কৃষ্ণা উঠে গেলেন।

শরদিন্দু বললেন, 'চা আসুক। ততক্ষণ শোনা যাক।'

সুরজিৎ বলতে লাগলেন, তাঁর দুই ভাই, দুই বোন। এক ভাই ব্যাঙ্ক অফিসার, বাঙ্গালোরে আছে। আর এক ভাই ও এন জি সি'র ইঞ্জিনিয়ার, এখন বরোদায় পোস্টেড। বড় বোন থাকে দিল্লিতে, তার স্বামী চাটার্ড অ্যাকাউনটেন্ট। ছোট বোন কলকাতারই একটা কলেজে পড়ায়, কলেজ হস্টেলে থাকে। অবিবাহিত। বিয়ে করবে কিনা, এখনও মনস্থির করে উঠতে পারে নি। তবে ভাইবোনেরা সবাই তাকে বুঝিয়ে যাচ্ছে, বিয়েটা মেয়েদের জীবনে খুবই জরুরি। কম বয়সে রক্তের যখন জোর থাকে, পৃথিবীকে তোয়াক্কা না করে হয়তো একা একা কাটিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু শেষ জীবনের নিঃসঙ্গতা দুর্বিষহ, ইত্যাদি।

শরদিন্দু বললেন, 'বাঃ, তোরা সবাই দাঁড়িয়ে গেছিস। শুনে খুব খুশি হলাম।'

কৃষ্ণা ফিরে এলেন। তাঁর সঙ্গে মাঝবয়সী একটি লোক। পরনে পরিষ্কার ধুতি, হাফ শার্ট। তার হাতে বড় ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম, সন্দেশ, প্যাটিস, সিঙাড়া এবং কাজু বাদাম।

লোকটা যে পশুপতি, বুঝতে পারলেন শরদিন্দু। পশুপতি তাঁর সামনে সেন্টার টেবলে ট্রে নামিয়ে রেখে এক পাশে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল।

কৃষ্ণা পশুপতিকে বললেন, 'তুমি এখন যাও। পরে এসে কাপ প্লেট নিয়ে যেও।'

পশুপতি চলে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে শরদিন্দু বললেন, 'শুধু চিনি, লিকার আর দুধ ছাড়া সব নিয়ে যাও।'

কৃষ্ণা এবং সুরজিৎ একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'স্যার, একটু কিছু খাবেন না?'

শরদিন্দু বললেন, 'বিকেলে এক কাপ চা ছাড়া আমি আর কিছু খাই না। সেভেনটি সেভেন পেরিয়েছি। এই বয়সে অত খেতে নেই।'

অগত্যা খাবারসুদ্ধ ট্রে নিয়ে চলে যায় পশুপতি। কৃষ্ণা নিজের হাতে তিন কাপ চা তৈরি করলেন। এক কাপ দিলেন শরদিন্দুকে, এক কাপ সুরজিৎকে, বাকি কাপটা নিজে নিলেন।

চায়ে চুমুক দিয়ে শরদিন্দু বললেন, 'তোর মা-বাবার কথা বল। দেশে তোদের সামান্য জমিজমা ছিল। কী কষ্টে দিন কেটেছে তা তো জানি। পার্টিশানের পর সেই কষ্ট নিশ্চয়ই শতগুণ বেড়ে গিয়েছিল।'

'হ্যাঁ। সে যে কী স্ট্র্যাগল, বলে বোঝান যাবে না। আমরা দাঁড়াবার আগেই মা বাবা মারা গেল।'

'তোদের সুদিন তা হলে কেউ দেখে যেতে পারে নি।'

'না স্যার—'

'বড় আক্ষেপের কথা। ওরা বেঁচে থাকলে কী সুখীই না হত।'

বিশাল ড্রইংরুমের আবহাওয়া ক্রমশ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে থাকে। একসময় শরদিন্দু বললেন, 'দ্যাখ আমি ফেটালিস্ট নই। কিন্তু কখনও কখনও মনে হয়, ভাগ্য বলে কিছু আছে। তোর মা-বাবার অদৃষ্টে সুখ ছিল না। সে যাক, এত বড় বাড়িতে তোকে আর কৃষ্ণাকে ছাড়া অন্য কাউকে তো দেখছি না। ছেলেমেয়েরা কোথায়?'

সুরজিৎ বললেন, 'আমাদের দুই ছেলে। বড় দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিকসে পড়ে। ওখানেই হস্টেলে থাকে।'

'দিল্লিতে কেন? টাকা হয়েছে, সেটা দেখাবার জন্যে ওখানে পাঠিয়েছিস?'

'না স্যার, আপনি কলকাতার অবস্থা জানেন না। এখানে লেখাপড়ার পরিবেশটাই নষ্ট হয়ে গেছে। খালি পলিটিকস।'

উত্তর না দিয়ে সুরজিতের দিকে তাকিয়ে রইলেন শরদিন্দু।

সুরজিৎ বলতে লাগলেন, 'যাদের সামান্য ক্ষমতা আছে, মানে আর্থিক ক্ষমতার কথা বলছি, তারা কেউ হায়ার এডুকেশনের জন্যে ছেলেমেয়েদের এখানে রাখছে না। দিল্লি পুণে বাঙ্গালোর পাঠিয়ে দিচ্ছে।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন শরদিন্দু। বললেন, 'অথচ এক সময় কলকাতাতেই ভাল ভাল ছেলেরা বাইরে থেকে পড়তে আসত। সমস্ত ব্যাপারেই বেঙ্গল পিছিয়ে পড়ছে।' খানিক থেমে আবার বললেন, 'দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিকসে যখন পড়ছে তখন তোদের বড় ছেলে স্টুডেন্ট হিসেবে নিশ্চয়ই ব্রিলিয়ান্ট।'

সুরজিৎ বললেন, 'সেটা স্যার আপনাদের আশীর্বাদ। স্কুল লেভেল থেকেই ও ভাল রেজাল্ট করে আসছে।'

'এবার ছোট ছেলের কথা বল—'

'ও ক্লাস টুয়েলভে পড়ে।'

'আজ ছুটির দিন। তাকে তো দেখছি না।'

এতক্ষণ চুপচাপ স্বামীর সঙ্গে তাঁর প্রাক্তন শিক্ষকের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলেন কৃষ্ণা। এবার বললেন, 'ওর ম্যাথসের টিউটর এসেছেন, তাঁর কাছে অঙ্ক করছে।'

শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'ও লেখাপড়ায় কেমন? তোমাদের বড় ছেলের মতো?'

কৃষ্ণা মাথা নাড়ে, 'না স্যার। ওর বাবার ইচ্ছে এক ছেলে তার মতো ডাক্তার হোক। কিন্তু সে জন্যে ভাল রেজাল্ট করা চাই। হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা সামনেই। তার পাশাপাশি জয়েন্ট এনট্রান্সের জন্যও প্রিপারেশন চলছে। জয়েন্ট এনট্রান্সে ভাল রেজাল্ট করতে না পারলে ও তো মেডিকেলে চান্সই পাবে না।'

শরদিন্দু আর কোনো প্রশ্ন করলেন না।

ড্রইংরুমের একধারে টেলিফোন রয়েছে। হঠাৎ সেটা বেজে ওঠে। ফোনটার সঙ্গে রয়েছে কর্ডলেস সেট। কৃষ্ণা কর্ডলেসটা এনে সুরজিৎকে দিলেন। ওধার থেকে কারো প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'আমার যেতে একটু দেরি হবে। ধর সন্ধের পর, অ্যাট অ্যাবাউট সেভেন ও'ক্লক।..........হ্যাঁ, আমার একজন মাস্টার মশাই এসেছেন। মা-বাবাকে বাদ দিলে তাঁকেই আমি সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করি। এই প্রথম আমাদের বাড়ি এলেন তো........হ্যাঁ হ্যাঁ, পেশেন্টকে অক্সিজেন দাও।.........ঠিক আছে।'

কথা শেষ হলে ফোনের বোতাম টিপে নামিয়ে রাখলেন সুরজিৎ।

শরদিন্দু কৌতূহল বোধ করছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কার সঙ্গে কথা বলছিলি রে?'

'একজন জুনিয়র ডাক্তার। আমাকে অ্যাসিস্ট করে।'

'আমার জন্যে কোথায় যেতে দেরি করবি?'

'নার্সিং হোমে।'

'যে পেশেন্টকে অক্সিজেন দেবার কথা বললি তার কেসটা কি সিরিয়াস?'

'হ্যাঁ। অনেক দিন ধরে ভুগছে। মাঝে মাঝেই অক্সিজেন দিতে হয়।'

'যদি মনে হয় পেশেন্টকে অ্যাটেন্ড করা দরকার, চলে যা। আমি বৌমার সঙ্গে গল্প করি।'

সুরজিৎ বললেন, 'চিন্তা করবেন না। অক্সিজেন দিলেই পেশেন্ট সামলে উঠতে পারবে। তারপর তো আমি যাচ্ছিই।' স্ত্রীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যারের ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে রেখেছ তো?'

কৃষ্ণা বললেন, 'হ্যাঁ।'

সুরজিৎ বললেন, 'চলুন স্যার, আগে আপনার ঘরে নিয়ে যাই। তারপর আমাদের বাড়িটা দেখাব।'

তেতলার ডান পাশের শেষ ঘরটায় শরদিন্দুর থাকার ব্যাবস্থা হয়েছে। ঘরটা পূর্বমুখী। খাটে ধবধবে বিছানা। আরামের সবরকম উপকরণ এখানে মজুদ।

সুরজিৎ নিজের হাতে শরদিন্দুর সুটকেস এবং কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে শরদিন্দুকে সঙ্গে করে ঘরটায় এলেন। কৃষ্ণাও এসেছেন।

মালপত্র নামিয়ে রেখে সুরজিৎ বললেন, 'দেখুন স্যার, মোটামুটি সবই আছে। যদি পরে মনে হয়, আরো কিছু দরকার—বলবেন।'

শরদিন্দু বললেন, 'আর কিছু দরকার হবে না। তুই তো আমাকে মোটামুটি জানিস। এত আরামে থাকার অভ্যাস আমার নেই।'

সুরজিৎ একটু হাসলেন, 'আপনি কি একটু রেস্ট নিয়ে বাড়িটা দেখবেন?'

শরদিন্দুর অফুরন্ত এনার্জি। বললেন, 'মোটেও না। আমার ছাত্র এরকম একটা বাড়ি করেছে। সেটা ঘুরে ঘুরে না দেখা পর্যন্ত রেস্টের কোনো প্রশ্নই নেই।'

একতলা থেকে তেতলার ছাদ পর্যন্ত শরদিন্দুকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন সুরজিৎ। সবগুলো বেডরুম আর ড্রইংরুমে দামি দামি টাইলস বসান। প্রতিটি ঘরে এয়ার-কুলার। একতলায় সুরজিতের চেম্বার। বাড়িতে বসে সকালে তিনি আটটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত পেশেন্ট দেখেন। রোগী এলেই দেখা হয় না; এ জন্য পেশেন্টকে অনেক আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করাতে হয়।

বাড়িটার দোতলায় ড্রইংরুম বেডরুম্ ছাড়াও রয়েছে কিচেন, ডাইনিং হল ইত্যাদি। ছাদে ঠাকুর ঘর। দেবদেবীর প্রতি অপার বিশ্বাস কৃষ্ণার। দামি দামি সিংহাসন তৈরি করিয়ে রাধাকৃষ্ণ, মহাদেব, দুর্গা, কালী থেকে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, শিরডি সাঁইবাবা থেকে বাবা লোকনাথ পর্যন্ত অনেকের ছবি পর পর বসানো। ফুল মালা এবং চন্দন দিয়ে প্রতিটি ছবি চমৎকার সাজানো।

একতলা থেকে ওঁরা তেতলার ছাদে চলে এসেছিলেন। দেবদেবীর ছবিগুলো দেখতে দেখতে মজার গলায় শরদিন্দু বললেন, 'এ যে দেখছি ঠাকুর দেবতার কলোনি। প্রায় সব মেজর দেবতা আর মহাপুরুষদেরই তো বাড়িতে এনে হাজির করেছিস। বাকি যাঁরা আছেন তাঁদেরও নিয়ে আয়।'

সুরজিৎ বললেন, 'ঈশ্বরে অসীম ভক্তি কৃষ্ণার। ওর বিশ্বাস, আমাদের যা কিছু হয়েছে, সবই এই সব দেবতার কৃপায়।'

'আমিও একজন থেয়িস্ট—ঈশ্বরবিশ্বাসী। বিশ্বাস করি, সুপার ন্যাচারাল কোনো পাওয়ার নিশ্চয়ই আছে। তবে কৃষ্ণার মতো অতটা ভক্তি নেই। জানেন স্যার, আপনার বৌমা কী প্ল্যান করেছে?'

'কী?'

'দীক্ষা নেবে।'

এমন অদ্ভুত কথা যেন আগে শোনেন নি শরদিন্দু। বললেন, 'দীক্ষা!'

সুরজিৎ হেসে বললেন, 'হ্যাঁ স্যার, আমাকেও খুব তাতাচ্ছে। বলছে দীক্ষা না নিলে নাকি লাইফের একটা বড় দিক ইনকমপ্লিট থেকে যায়।'

শরদিন্দু হাসলেন, 'চল, এবার নিচে যাওয়া যাক।'

খানিকক্ষণ আগে সূর্য ডুবে গেছে। চারদিকে সন্ধে নেমে এসেছে। আশেপাশের বাড়িগুলোতে এবং রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে।

তেতলায় নেমে আসতে দেখা গেল, একটি আঠার উনিশ বছরের যুবক হাতে বইয়ের ব্যাগ নিয়ে বাঁ দিকের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে ড্রইংরুমের দিকে আসছে।

ছেলেটার গায়ের রং টকটকে ফর্সা। শরীরে এত মেদ জমেছে, যেন ফেটে পড়বে। এই বয়সেই থুতনির তলায় এবং গালে পুরু চর্বি। পরনে বিরাট ঘেরের ট্রাউজার্স আর টি শার্ট। সুরজিৎ শরদিন্দুর সঙ্গে ছেলেটির পরিচয় করিয়ে দিলেন। সে সুরজিতের ছোট ছেলে, তাঁর ডাকনাম সন্তু।

সুরজিৎ সন্তুকে বললেন, 'আমার স্কুল লাইফের মাস্টার মশাই। এঁর কথা আগেই শুনেছিস। প্রণাম কর।'

সন্তু প্রণাম করল।

সে যে সুরজিতের ছোট ছেলে সেটা আন্দাজ করে নিয়েছিলেন শরদিন্দু। কিন্তু তার চেহারা এমন বেঢপ ধরনের মোটা, ভাবতে পারেন নি। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার হাতে বইয়ের ব্যাগ। কোথাও যাচ্ছ কি?'

সন্তু বলল, 'হ্যাঁ। ফিজিকসের টিচারের কাছে পড়তে যাচ্ছি।'

সুরজিৎ জানালেন, যে প্রাইভেট টিউটরের কাছে সন্তু ফিজিকস পড়ে তিনি এ বাড়িতেই আসেন। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টে পা ভাঙার কারণে কিছুদিন হল আসতে পারছেন না। তাই সন্তুকে তাঁর কাছে পড়তে যেতে হচ্ছে। পায়ের প্লাস্টার কাটা হলে আবার তিনি নিয়মিত এখানে এসে পড়িয়ে যাবেন।

শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছুক্ষণ আগে ম্যাথসের টিচার এসে অঙ্ক কষিয়ে গেলেন। এখন ছুটছে ফিজিকসের টিউটরের কাছে। সব সাবজেক্টের জন্যেই ওর মাস্টার রেখেছিস নাকি?'

সন্তু বার বার ড্রইংরুমের বড় ওয়াল ক্লকটার দিকে তাকাচ্ছিল। বোঝা গেল, তার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সুরজিৎ বললেন, 'স্যার, সাড়ে ছ'টায় সন্তুর টিচারের বাড়ি পৌঁছে যাবার কথা। এখন ছ'টা বাইশ। ও কি যাবে?'

ব্যস্তভাবে শরদিন্দু বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' সন্তুকে বললেন, 'তুমি যাও। তোমাদের বাড়িতে ক'দিন তো থাকছি। পরে তোমার সঙ্গে অনেক গল্প করা যাবে।'

মাথা সামান্য হেলিয়ে সন্তু তার মেদ বোঝাই শরীর টানতে টানতে নিচে নেমে গেল। এই বয়সে এত ভারি হয়ে গেছে। দেখে ভীষণ কষ্ট হল শরদিন্দুর।

সুরজিৎ বললেন, 'অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে ওপর নিচ করেছেন। আগে একটু বসুন—'

সমতল জায়গায় দু-তিন মাইল একটানা হাঁটলে এতটুকু কষ্ট হয় না। কিন্তু সিঁড়ি ভাঙলে আজকাল শরদিন্দুর বেশ হাঁফ ধরে যায়। বললেন, 'একটু বসতে পারলে ভাল হয়।'

সবাই ড্রইংরুমের সোফায় গিয়ে বসলেন।

সুরজিৎ বললেন, 'আর এক কাপ চা খাবেন স্যার?'

শরদিন্দু বললেন, 'নট এ ব্যাড আইডিয়া।'

পশুপতিকে দিয়ে চা করিয়ে আনানো হল। কাপে চুমুক দিতে দিতে পুরনো কথার খেই ধরে সুরজিৎ বললেন, 'টিচারের কথা হচ্ছিল না? এখন স্যার, প্রতিটি সাবজেক্টে টিউটর না দিলে ভাল রেজাল্ট করা মুশকিল।'

শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'সব সাবজেক্টের টিচার দিয়েছিস?'

'না দিয়ে উপায় কী?' নিরুপায় ভঙ্গিতে বললেন সুরজিৎ।

শরদিন্দু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্কুলগুলোতে কী হয়? মাস্টাররা ঠিকমতো পড়ায় না?'

সুরজিৎ বললেন, 'ভাল করে পড়ালে কি এত টিউটর রাখতে হয়? বড় বড় অনেক নাম-করা স্কুলে খোঁজ নিয়ে দেখবেন, সিলেবাসই কমপ্লিট করতে পারে না। দু-চারটে একসেপশন অবশ্য থাকতে পারে। বলে দেওয়া হয় বাড়িতে পড়ে নিও।'

একটু চুপচাপ।

তারপর শরদিন্দু আবার বললেন, 'তুইও তো বাজিতপুর হাইস্কুলে পড়েছিস। ক'টা প্রাইভেট টিউটর তোর ছিল?''

'স্যার, আপনার মতো মাস্টার মশাই কি একালে আছে? স্কুল ছুটির পর ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিতেন, কে পড়ায় ফাঁকি দিচ্ছে, কে কোন সাবজেক্টটা পারছে না—'

সুরজিৎ যা বলেছেন তার প্রতিটি শব্দ নির্ভুল। বাজিতপুর হাই স্কুলে প্রতিটি ক্লাসেই এমনভাবে পড়িয়ে দেওয়া হত, যে বাড়িতে এসে একবার টেক্সট বুকে চোখ বুলিয়ে নিলেই স্থায়ীভাবে সেটা মাথায় ঢুকে যেত। কিন্তু তাতেও নিশ্চিন্ত ছিলেন না শরদিন্দু। স্কুল ছুটির পর নিজেদের বাড়ি গিয়ে টিফিন খেয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করতেন। তাঁর পুরনো র‍্যালে কোম্পানির একটা সাইকেল ছিল। বিশ্রামের পর সেটায় চেপে তিনি সারা বাজিতপুরে তাঁর ছাত্রদের বাড়িতে টহল দিয়ে বেড়াতেন। কারো ফাঁকি দেবার উপায় ছিল না। বাংলা থেকে ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, প্রতিটি সাবজেক্ট তিনি পড়াতে পারতেন। এখন তো স্পেশালাইজেশনের যুগ। যে অঙ্ক কষায় সে বাংলা পড়ায় না। যে ইতিহাস পড়ায় সে ইংরেজির ধার ঘেঁষতে চায় না। সেদিক থেকে শরদিন্দু এবং তাঁর সেকালের অনেক মাস্টারমশাই পুরোপুরি ব্যতিক্রম। শিক্ষক কুলের এই প্রজাতিটি এ আমলে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

সুরজিৎ আবার বললেন, 'তা ছাড়া স্যার, দিনকাল একেবারে বদলে গেছে। দুর্দান্ত কেরিয়ার ছাড়া এখন আর কোনো ছেলেমেয়ে বা তাদের মা-বাবারা অন্য কিছু ভাবে না। সেটাই তাদের লাইফের একমাত্র গোল, একমাত্র ডেস্টিনেশন।'

শরদিন্দু বুঝতে পারছিলেন, কেরিয়ার-সর্বস্ব এ আমলের ছেলেমেয়েদের ইচ্ছা বা স্বপ্নপূরণের প্রথম সিঁড়ি হল ভাল রেজাল্ট। তার জন্য চাই গণ্ডা গণ্ডা প্রাইভেট টিউটর। আগে ইউনিভার্সিটিতে চোখ ধাঁধান রেজাল্ট করে অনেকে স্কুল মাস্টারি বা কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়েছে, কেউ বড় বড় চাকরি কিংবা প্রফেসন ছেড়ে দেশ স্বাধীন করার জন্য জেলে গেছে। কারো উদ্দেশ্য ছিল, একটি সুশিক্ষিত জাতিকে গড়ে তোলা, আরেক দলের ধ্যানজ্ঞান দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করা। সেই সব আদর্শবাদকে গলা ধাক্কা দিয়ে ভারতবর্ষের সীমানা পার করে দেওয়া হয়েছে। সময়ের যা ধর্ম, ছেলেদের কেরিয়ারিস্ট বানানো ছাড়া আর কিছু চিন্তা করে না সুরজিৎ। তাঁরই এক কালের ছাত্র স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে কী আর বলবেন শরদিন্দু! মনে মনে বিষণ্ণ বোধ করতে থাকেন।

পুরনো আদর্শবাদী মাস্টার মশাইয়ের মনোভাব হয়তো কিছুটা আন্দাজ করতে পারছিলেন সুরজিৎ। মনে মনে সামান্য অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। প্রসঙ্গটা পালটাবার জন্য বললেন, 'স্যার, আমাদের বাড়িটা তো দেখলেন। কেমন লাগল?'

শরদিন্দু খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন, 'চমৎকার। তা হ্যাঁ রে, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'নিশ্চয়ই।'

'তোর শ্বশুর তো ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। তাঁর প্রচুর পয়সা। বাড়ি তৈরির সময় জামাইকে কত টাকা দিয়েছে?'

শিরদাঁড়া টান টান হয়ে গেল সুরজিতের। দৃঢ় গলায় বললেন, 'একটা পয়সাও না। অবশ্য শ্বশুর মশাই দিতে চেয়েছিলেন। আমি নিই নি। আপনার বৌমা পাশে বসে আছে, তাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

জিজ্ঞেস করার আগেই কৃষ্ণা জানালেন, 'সত্যিই স্যার, আপনার ছাত্র বাবার কাছ থেকে কোনো রকম সাহায্য নেয় নি।'

তারিফের সুরে শরদিন্দু বললেন, 'গুড, ভেরি গুড।'

সুরজিৎ বললেন, 'বাজিতপুর স্কুলে পড়ার সময় আপনি প্রায়ই একটা কথা বলতেন। প্রত্যেকের আত্মসম্মান বোধ থাকা দরকার। কখনও পারতপক্ষে কারো কাছে হাত পাতা উচিত নয়। সেটা আমি মনে রেখেছি। বাকি জীবনেও ভুলব না।'

শরদিন্দু বললেন, 'তা হলে বলতে হবে, ডাক্তারিতে তোর দারুণ পশার।'

'সেটা আপনার আশীর্বাদ।' বলে হাসলেন সুরজিৎ। এমন হাসি সফল মানুষেরাই হাসতে পারে।

কথায় কথায় সাতটা বেজে গিয়েছিল। সেদিকে নজর ছিল সুরজিতের। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'স্যার, আমাকে এবার নার্সিং হোমে যেতে হবে।'

হঠাৎ সেই রোগীটির কথা মনে পড়ে যায় শরদিন্দুর, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর সেই পেশেন্টটা রয়েছে, যাকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। যা যা, চলে যা—'

সুরজিৎ বললেন, 'যা দরকার হবে, আপনার বৌমাকে বলবেন।'

'ঠিক আছে, তুই এখন বেড়িয়ে পড়।'

সুরজিৎ সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

দুই

সুরজিৎ চলে যাবার পর কৃষ্ণা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলেন কী ধরনের খাবার শরদিন্দুর পছন্দ, বেড-টি খান কিনা, খেলে ক'টার সময়, ইত্যাদি।

ভোরে বেড-টির দরকার নেই শরদিন্দুর। সূর্যোদয়ের আগেই তিনি বেরিয়ে পড়েন। মর্নিং ওয়াক সেরে ফিরে আসার পর একটা বিস্কুট আর এক কাপ চা। ব্রেকফাস্ট বলতে হাতে গড়া দুখানা আটার রুটি কিংবা দু স্লাইস সেঁকা পাউরুটি, দুধ। কলা থাকলে ভাল। দুপুরে ভাত ডাল তরকারি মাছের ঝোল আর টক দই। রাতেও তা-ই। তবে দই বাদ। বিকেলে চা বিস্কুট। রান্নায় ঝাল মশলা তেল যত কম হয় ততই ভাল।

কৃষ্ণার সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়ে নিজের ঘরে গেলেন শরদিন্দু। সুটকেস খুলে লুঙ্গি, হাফহাতা পাঞ্জাবি, তোয়ালে, টুথ ব্রাশ, সেভিং সেট ইত্যাদি বার করে অ্যাটাচড় বাথরুম থেকে স্নান টান সেরে বাইরের পোশাক পালটে ফেললেন। শীতকালটা বাদে বছরের অন্য মাসগুলোতে দুবেলা স্নান করা তাঁর বরাবরের অভ্যাস।

এ ঘরে একদিকের দেওয়াল ঘেঁষে বুক-সমান হাইটের র‍্যাকে প্রচুর বই। একটা বই সেখান থেকে বার করে নিয়ে খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে পড়তে লাগলেন শরদিন্দু। পৃথিবীর নানা জাতীয় স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বিষয়ে বিচিত্র সব তথ্য বইটার পাতায় পাতায়। নাম ম্যামালস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। সব রকম বই পড়তে ভালবাসেন তিনি।

কতক্ষণ বইটার ভেতর মগ্ন হয়ে ছিলেন, খেয়াল নেই শরদিন্দুর। একসময় কারো গলা কানে এল, 'স্যার—'

চমকে মুখ তুলতেই শরদিন্দু দেখতে পেলেন, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন সুরজিৎ। তাঁর পরনে ঘরে পরার পাজামা-পাঞ্জাবি। দেখেই বোঝা যায়, বাড়ি ফিরে স্নান টান সেরে পোশাক বদলেছেন তিনি। বইটা খাটে নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে নিচে নেমে শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'নার্সিং হোম থেকে কখন ফিরলি?'

সুরজিৎ বললেন, 'এই কিছুক্ষণ আগে। খেতে চলুন স্যার।'

শরদিন্দু আগেই লক্ষ করেছেন, এ বাড়ির প্রতিটি বেডরুমে এবং ড্রইংরুমে ওয়াল ক্লক রয়েছে। সামনের দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, দশটা বেজে সাঁইত্রিশ। বললেন, 'সন্তু পড়ে ফিরে এসেছে?'

'হ্যাঁ।'

ডাইনিং রুমে এসে দেখা গেল সন্তু এবং কৃষ্ণা অপেক্ষা করছেন। বিশাল খাবার টেবলের মাঝখানে নানা আকারের সুদৃশ্য পাত্রে স্যালাড ভাত রুটি পরটা মাছ মাংস ডাল এবং নিরামিষ তরকারি সাজানো রয়েছে।

সন্তুর পাশে বসে পড়লেন শরদিন্দু। তাঁদের মুখোমুখি কৃষ্ণা আর সুরজিৎ। ডাইনিং রুমের গা ঘেঁষে কিচেন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে পশুপতি এবং অন্য একটি কাজের লোক। কিছু দরকার হলে ওদের ডাকা হবে।

কৃষ্ণা সবার প্লেটে প্লেটে চামচ দিয়ে দিয়ে খাবার তুলে দিলেন। শরদিন্দু নিলেন রুটি, তরকারি, সামান্য স্যালাড এবং ডাল। লক্ষ করলেন, সুরজিৎ রুটিই নিলেন। সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে স্যালাড, ডাল, সবজি আর দু টুকরো চিকেন। কৃষ্ণা নিলেন তিন চামচ ভাত, মাছ, ডাল আর নানারকম আনাজের একটা তরকারি। কিন্তু ভাত রুটি বা সবজির ধার কাছ দিয়েও গেল না সন্তু। তাকে দেওয়া হল ভয়সা ঘিয়ে ভাজা মোটা মোটা চারখানা পরটা আর প্রচুর পরিমাণে মুরগির মাংস। শরদিন্দু খেতে খেতে সন্তুর দিকে নজর রাখছিলেন। ছেলেটা গোগ্রাসে পরটা মাংস খেয়ে চলেছে। হঠাৎ তিনি সুরজিৎকে বললেন, 'তুই না একজন নাম-করা ডাক্তার?'

শরদিন্দুর বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যাতে হকচকিয়ে গেলেন সুরজিৎ। উত্তর না দিয়ে তিনি তাঁর প্রাক্তন মাস্টারমশাইটির দিকে তাকালেন।

শরদিন্দু বলতে লাগলেন, 'নিজের ছেলেটার দিকে ভাল করে তাকাস না বোধহয়—'

সুরজিৎ বিমূঢ়ের মতো জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন স্যার, কী হয়েছে?'

'ওর বয়েস আর কত? ম্যাক্সিমাম আঠার উনিশ। এখন তো পাতলা বেতের মতো চেহারা হওয়া উচিত। কিন্তু কী বিশ্রী বদখত শেপ করে ফেলেছে! কত ওয়েট ওর?' প্রশ্নটা করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুরজিতের দিকে তাকালেন।

সুরজিৎ বিব্রতভাবে বললেন, 'এই মানে, অনেকদিন ওয়েট নেওয়া হয় নি। তাই—' বলতে বলতে চুপ করে গেলেন।

শরদিন্দু বললেন, 'মিনিমাম আশি পঁচাশি কিলো।'

সুরজিৎ উত্তর দিলেন না।

শরদিন্দু থামেন নি, 'একটা আঠার উনিশ বছরের ছেলের এত ওয়েট, শরীরে এত ফ্যাট-ভাবা যায়! সে কিনা তেল মশলা দেওয়া মাংস দিয়ে পরটা খাচ্ছে! আর ডাক্তার হয়ে তুই বসে বসে দেখছিস!' একটু ভেবে জিজ্ঞেস করলেন, 'রোজই সন্তু এসব খায় নাকি?'

কৃষ্ণা এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন। এবার বললেন, 'লুচি পরটা মাংস বিরিয়ানি ছাড়া আর কিছু খেতে চায় না যে—'

শরদিন্দু বললেন, 'খেতে চায় না বলে তোমরাও মুখ বুজে তা মেনে নাও! কী সর্বনাশ হচ্ছে বুঝতে পারছ না! এত ফ্যাট জমলে ব্রেনটা ডাল হয়ে যাবে যে—' সুরজিৎকে বললেন, 'কী রে, ঠিক বলছি তো?'

সুরজিৎ চুপ।

শরদিন্দু এবার সন্তুকে বললেন, 'আজ তোমার মা দিয়ে ফেলেছে। মুখের গ্রাস তো কেড়ে নেওয়া যায় না। বাট দিস ইজ লাস্ট। কাল থেকে দু বেলা শুধু আটার রুটি আর গ্রিন ভেজিটেবলস—ঝিঙে পটল লাউ উচ্ছে, এই সব। সঙ্গে টক দই। শরীরটা ফিট রাখতে হবে তো।'

'সন্তু ঘাড় গোঁজ করে বসে থাকে। শরদিন্দু তার জন্য যে খাদ্যতালিকা তৈরি করে দিয়েছেন তাতে বেজায় অসন্তুষ্ট সে। তার মুখচোখ দেখে তা-ই মনে হল।

শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'এত যে তেল ঘি-ওলা খাবার খাচ্ছ, ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ কর?'

কৃষ্ণা বললেন, 'মাল্টি জিমে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। একদিন দু'দিন গিয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। অবশ্য পড়ার এত প্রেসার যে সময় পায় না।'

'সকালে ক'টায় ওঠে?'

'সাড়ে ছ'টা, পৌনে সাতটা—'

'ব্যাড, ভেরি ব্যাড। একজন ছাত্রের সান-রাইজের আগে ওঠা উচিত।' সুরজিতের দিকে ফিরে বললেন, 'কী রে, তোরাও তো স্কুলে পড়েছিস। কখন তোদের ঘুম ভাঙত?'

সুরজিৎ একটু হেসে বললেন, 'আপনি তো ছাত্রদের গার্জেনদের কাছে খবর নিতেন, কে কখন

উঠছে। কেউ দেরিতে উঠলে রেহাই আছে? সবার সামনে কান টেনে লম্বা করে দিতেন।'

'নিজের ছেলের বেলায় সেটা অ্যাপ্লাই করতে পার না? বাবা হয়েছ বলে তার পরকাল নষ্ট করার কোনো রাইট তোমার নেই।'

একটু চুপচাপ।

তারপর শরদিন্দু সন্তুকে বললেন, 'আমার মর্নিং ওয়াকের হ্যাবিট আছে। সকাল সকাল উঠে আমার সঙ্গে হাঁটতে বেরুবে। খানিকটা হাঁটাহাঁটি করলেও শরীর সুস্থ থাকে।'

সন্তু উত্তর দেয় না। প্রাতঃভ্রমণের কথায় সে যে খুব একটা অনুপ্রাণিত হয়েছে, তা মনে হল না। শরদিন্দু খুবই একরোখা টাইপের। কিছু একটা মাথায় ঢুকলে সেটার শেষ না দেখে ছাড়েন না। বললেন, 'তোমার ঘরটা আমাকে দেখিয়ে দিও। ভোরবেলা আমিই তোমাকে জাগিয়ে দেব।'

ঢোক গিলে কৃষ্ণা বললেন, 'যদি রাগ না করেন, একটা কথা বলব স্যার?'

শরদিন্দু হেসে বললেন, 'ছেলের হয়ে নিশ্চয়ই কিছু সাফাই গাইবে। ঠিক আছে রাগ করব না, তুমি বল।'

'সাতটায় সন্তুর বাংলার টিউটর আসে।'

'বাব্বা, সকাল হতে না হতেই টিউটর লাগিয়ে রেখেছ। সে যাক গে, আমরা তো বেরুব সাড়ে পাঁচটায়। সাড়ে ছ'টার ভেতর ফিরে আসব। সন্তুর টিউটর এসে অন্য দিনের মতো তাকে বাড়িতেই পেয়ে যাবে।'

'তা হলে কোনো অসুবিধা নেই।'

খাওয়া দাওয়ায় কড়া বিধিনিষেধ, মর্নিং ওয়াক, দুটোই সন্তুর পক্ষে ভীষণ অরুচিকর ব্যাপার। কিন্তু একটা ছেলের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে দেখে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবেন, এমন মানুষ শরদিন্দু নন। টেনে হেঁচড়ে তিনি তাকে কাল সকালে ঘর থেকে বার করবেনই।

খাওয়া যখন শেষ হয়ে এসেছে, সেই সময় কৃষ্ণা পশুপতিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ মিষ্টি কী আছে?'

শেষ পাতে সুইট ডিশ থাকাটা এ বাড়ির রেওয়াজ। পশুপতি বলল, 'সন্দেশ আছে। পুডিং করেছিলাম।'

কৃষ্ণা শরদিন্দুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'পুডিং দিতে বলি?'

শরদিন্দু আস্তে মাথা নাড়লেন। অন্যদের সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বললেও তাঁর চোখ কিন্তু সন্তুর দিকেই রয়েছে। বাঁ হাতটা তার পিঠে রেখে সস্নেহে এবার বললেন, 'আমার ওপর খুব রাগ হচ্ছে তো? আমি কিন্তু তোমার ভালর জন্যেই বলছি।'

সন্তুর কাছ থেকে উত্তর পাওয়া গেল না।

শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'ডায়েট হেলথ এসব নিয়ে অনেক আলোচনা হল। এবার তোমার পড়াশোনা নিয়ে একটু কথা হোক। মাধ্যমিকে কিরকম রেজাল্ট হয়েছিল?'

সন্তু এবার আরাম বোধ করল। বলল, 'খুব একটা ভাল না। সিক্সটি পারসেন্ট পেয়েছিলাম।'

'মাধ্যমিকেও নিশ্চয়ই হাফ ডজন টিউটর ছিল?'

'হ্যাঁ। প্রত্যেক সাবজেক্টে একজন করে।'

'তবু সিক্সটি পারসেন্ট? ভেরি ব্যাড।'

সন্তুর মুখটা কালো হয়ে গেল। সুরজিৎ এবং কৃষ্ণা খুবই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগলেন। সুরজিৎ বললেন, 'পরীক্ষার আগে সন্তুর শরীরটা খারাপ হয়েছিল। তাই—'

সুরজিৎ যে ঠিক বলছেন না, ছেলের রেজাল্ট ভাল না হওয়ার একটা মিথ্যে অজুহাত তৈরি করে প্রাক্তন মাস্টারমশাইয়ের সামনে পেশ করছেন, তা বোঝা যাচ্ছে। ছেলেমেয়েদের দোষত্রুটি আড়াল করার ঝোঁকটা অনেক মা-বাবার মধ্যেই দেখেছেন শরদিন্দু। নিজের ছাত্র সুরজিতের কাছে তিনি তা আদৌ আশা করেন নি।

সন্তুর দিকে ফিরে শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'দেখ, মাধ্যমিকের পর উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাসটা অনেক বেশি কঠিন হয়ে যায়। হায়ার সেকেণ্ডারি আর জয়েন্ট এনট্রান্স তো একেবারে গায়ে গায়ে।

কিরকম রেজাল্ট এক্সপেক্ট করছ?'

সন্তু চুপ করে রইল।

শরদিন্দু বললেন, 'জয়েন্ট এনট্রান্সটা আরো বেশি টাফ। ব্রিলিয়ান্ট সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তোমাকে কমপিট করতে হবে। সেখানে যদি ভাল ফল না হয়, তোমার মা-বাবার আশাপূরণ হবে না।'

সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'মানে?'

'মেডিকেলে চান্স পাবে না।' শরদিন্দু বলতে লাগলেন, 'তোমার মা-বাবার, পার্টিকুলারলি বাবার ইচ্ছা, তুমি ডাক্তার হও। বড় ছেলে ইকনমিস্ট হতে দিল্লি গেছে। ছোট ছেলে অন্তত তার প্রফেসনে আসুক।'

সন্তু আবছাভাবে কী বলল, বোঝা গেল না। শরদিন্দু একটু চিন্তা করে বললেন, 'আমি তো কয়েক দিন তোমাদের এখানে আছি। তোমার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে, দেখতে চাই। যদি চাও হেল্পও করব। রাজি?' বলে সুরজিতের দিকে তাকালেন, 'কী রে, তোদের আপত্তি নেই তো?'

সুরজিতের চোখেমুখে আলো ফুটে ওঠে। দারুণ উৎসাহের সুরে বলেন, 'আপত্তি! কী বলছেন স্যার? আপনি সন্তুর পড়াশোনা দেখবেন, এ তো ওর সৌভাগ্য। ওর টিউটররা ভাল, তবে খুব প্রফেসনাল। নিজে তো সময় পাই না, ছেলেটা কী পড়ছে ঠিক বুঝতে পারি না।'

শরদিন্দু বললেন, 'সময় করে নেওয়া উচিত। শুধু রোগীর নাড়ি টিপে পয়সা রোজগার করলেই হয় না। নিজের সন্তানের প্রতি দায়িত্ব থাকা সব মা-বাবারই উচিত। অন্যেরা ছেলেকে তোমার মনের মতো করে গড়ে তুলবে, তা হয় না।'

তিন

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে, বাসি লুঙ্গিটুঙ্গি ছেড়ে সন্তুর ঘরের সামনে এসে দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দিতে দিতে শরদিন্দু ডাকেন, 'সন্তু—সন্তু—'

ভেতর থেকে কোনো সাড়া নেই।

বারকয়েক ডাকাডাকির পরও যখন সন্তুর ঘুম ভাঙান গেল না, শরদিন্দু আর চেষ্টা করলেন না। সন্তুর পাশের ঘর সুরজিৎ এবং কৃষ্ণার। ওদের ঘরের দরজাও বন্ধ। তার মানে ভোরে ওঠার অভ্যাস নেই সুরজিৎদের।

শরদিন্দু আর অপেক্ষা করলেন না। ড্রইংরুম পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে লাগলেন। সুরজিৎরা না জাগলেও বাড়ির কাজের লোকেদের ঘুম এর মধ্যে ভেঙে গেছে। তাদের কেউ বাসন মাজছে, কেউ সন্তু আর সুরজিৎদের ঘর দুটো বাদে অন্য বেডরুম বা ড্রইংরুম ধোওয়া মোছা করছে। ভোর থেকেই ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে।

একতলায় এসে একটু থমকে দাঁড়ালেন শরদিন্দু। সুরজিতের চেম্বারের সামনে খানিকটা জায়গা কাচের বুক-সমান হাইটের পার্টিশান দিয়ে ঘেরা। সেখানে অনেকগুলো সোফা টোফা রয়েছে। একধারে আধখানা বৃত্তের আকারের টেবিলের ওধারে গদিমোড়া রিভলভিং চেয়ারে একটি সুশ্রী তরুণী বসে কী সব কাগজপত্র দেখছে। মেয়েটিকে কাল দেখেন নি শরদিন্দু। এত সকালে সে এখানে কী করছে? খুব কৌতূহল হচ্ছিল তাঁর। পায়ে পায়ে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নামটা কী মা?'

মেয়েটি মুখ নিচু করে কাজ করছিল। চমকে মুখ তুলে শরদিন্দুকে দেখে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'করবী—'

'তুমি কি এ বাড়িতে থাক?'

'না। তবে এই পাড়াতেই আমাদের বাড়ি।'

'এত ভোরে একা একা বসে কী করছ?'

করবী জানায়, সে সুরজিতের সেক্রেটারি। বাড়িতে তিনি যে পেশেন্টদের দেখেন, আগে আসার ভিত্তিতে তাদের নাম নম্বর দিয়ে পর পর টুকে রাখে। এবং নম্বর অনুযায়ী একে একে সুরজিতের চেম্বারে পাঠায়।

সুরজিৎ সাড়ে আটটা থেকে পেশেন্ট দেখতে শুরু করেন। তার অনেক আগে থেকেই রোগীদের ভিড় শুরু হয়ে যায়। কাছের পেশেন্টরা তো আছেই, দূর দূর অঞ্চল, এমন কি বাংলাদেশ আর নেপাল থেকেও প্রচুর পেশেন্ট আসে। তবে দিনে পঁচিশটির বেশি রোগী দেখেন না সুরজিৎ।

করবী যে ভোর হতে না হতেই এ বাড়িতে চলে আসে, তার কারণ আগেই তাকে নামগুলো রেকর্ড করে রাখতে হয়।

একটু অবাক হয়ে শরদিন্দু জিজ্ঞেস করেন, 'কিন্তু কোনো পেশেন্ট তো দেখতে পাচ্ছি না। চারদিক ফাঁকা।'

করবী বলল, 'বাড়ির বাইরে তারা নিশ্চয়ই ওয়েট করছে। গেট খোলা হবে সাড়ে ছ'টায়। তখন ওরা ভেতরে এসে নাম লেখাবে।'

শরদিন্দু কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই করবী ফের বলে ওঠে, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

করবী খুবই ঝকঝকে, সপ্রতিভ। কিন্তু এখনকার বহু মেয়ের মতো উগ্র নয়। বেশ ভদ্র আর বিনয়ী। তাকে বেশ ভাল লেগে গেল শরদিন্দুর। বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করবে।'

'আপনি কি স্যারের মাস্টারমশাই? ইস্ট বেঙ্গলে থাকতে উনি আপনার কাছে পড়েছেন?'

শরদিন্দু বুঝতে পারছিলেন, তাঁর কথা করবীকে বলেছেন সুরজিৎ। এটাও জানা গেল, সুরজিৎকে মেয়েটা স্যার বলে। একটু হেসে তিনি বললেন, 'তোমার অনুমানশক্তি হানড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট। ও আমার ছাত্র ছিল।'

'স্যার সেদিন বলছিলেন, আপনি আসবেন।'

'হ্যাঁ। ক'দিনই বা আর বাঁচব। পুরনো ছাত্রদের দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল। তাই পালা করে এক একজনের বাড়িতে হানা দিচ্ছি। তোমার স্যারের কাছেও চলে এলাম।'

'খুব ভাল করেছেন।'

'তুমি কাজ কর। আমি একটু হেঁটে আসি। মর্নিং ওয়াকটা না হলে মনে হয় দিনের একটা বড় কাজ বাদ পড়ে গেল। আমি তো এখন আছিই। পরে আবার দেখা হবে।'

শরদিন্দু আর দাঁড়ালেন না। বাইরে বেরিয়ে দেখলেন, গেটের এধারে উর্দি-পরা দারোয়ান একটা উঁচু টুলের উপর বসে আছে। তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে নিখুঁত স্যালুট হাঁকাল। খুব সম্ভব তাঁর প্রাতঃভ্রমণের কথা বলা ছিল। সে তাড়াতাড়ি গেট খুলে দিল।

কাল লক্ষ করেন নি শরদিন্দু। আজ চোখে পড়ল, ডান পাশে বাউন্ডারি ওয়ালের গা ঘেঁষে একটা নিচু শেডের তলায় ক'টা সিমেন্টের বেঞ্চ রয়েছে। সেখানে নানা বয়সের দশ বার জন পুরুষ এবং মহিলা বসে আছে। এরা যে সুরজিতের পেশেন্ট, আন্দাজ করে নিয়ে কী ভেবে ওদের দিকে এগিয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কখন এসেছেন?'

সবাই জানায়, সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে। আগে না এলে তো ডাক্তার সুরজিৎ মজুমদারকে দেখানো যাবে না। তাই এত তাড়াতাড়ি আসা।

হঠাৎ বিধানচন্দ্র রায়ের কথা মনে পড়ে যায়। তিনি তখন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিটি দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাঁর নানা কর্মসূচিতে ঠাসা। প্রচণ্ড ব্যস্ত মানুষ। তবু তারই মধ্যে সকালের দিকে রোজ এক দেড় ঘন্টা তিনি পেশেন্ট দেখতেন। অন্য ডাক্তাররা যাদের জবাব দিয়ে দিয়েছে, আরোগ্যের কোনোরকম সম্ভাবনা নেই, তেমন রোগীরাই তাঁকে দেখাতে আসত। এই পেশেন্টদের কাছ থেকে তিনি একটি পয়সাও ফি নিতেন না।

সুরজিৎও বোধ হয় তা-ই। পুরনো ছাত্রের জন্য মনে মনে গর্ববোধ করতে লাগলেন শরদিন্দু। সূর্য এখনও ওঠেনি। পুবদিকের আকাশে সবে আলো ফুটতে শুরু করেছে। তিনি বললেন, 'আপনারা ওয়েট করুন। আমি চলি—'

শরদিন্দু পা বাড়াতে যাবেন, একটি পেশেন্ট বলে উঠল, 'ডাক্তার মজুমদারের সঙ্গে দেখা করাটা বিরাট প্রবলেম। বাড়িতে দু'শ টাকা ফিজ নেন। কিন্তু এত ভিড় হয় যে শেষ পর্যন্ত ওঁর পেশেন্ট দেখার টাইম পার হয়ে যায়। দু'দিন ঘুরে গেছি। আজ তাই অন্ধকার থাকতে থাকতে চলে এসেছি। আশা করি, নিরাশ হয়ে ফিরতে হবে না।'

আর দাঁড়ালেন না শরদিন্দু। আচমকা বড় রকমের শক পেলে যেমন হয় তাঁর অবস্থা অনেকটা সেইরকম। বাড়িতে দু'শ টাকা ভিজিট নেয় সুরজিৎ! তিনি ভেবেছিলেন, কত মহানুভব তাঁর ছাত্র! বিনে পয়সায় রোগী দেখে। অথচ পূর্ব বাংলায় কিভাবে ওরা থাকত, তা তো ভুলে যান নি শরদিন্দু। ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়ার ঘর, মেঝে মাটির, টিনের চাল। রাতে কেরোসিনের কুপি কি রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলত। কিছু জমিজমা ছিল ওদের। জমি থেকে বছরের ধানটা পাওয়া যেত। কিন্তু সংসার চালাতে আরো অনেক কিছু লাগে। তেল নুন মশলা জামা কাপড় ওষুধ বিষুধ ছেলেমেয়েদের স্কুলের মাইনে। ওর বাবা উমাপতি মজুমদার কোর্টে ছোটখাট কী কাজ করত। কোনোরকমে দিন চলে যেত। আর এখন? দু'শ টাকা ভিজিট দিয়েও রোগীরা সহজে তার দেখা পায় না।

এই গরিব দেশে দু'শ টাকা ভিজিট। ভাবা যায়! মনটা খারাপ হয়ে গেল শরদিন্দুর। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা সম্ভাবনা শরদিন্দুর মস্তিষ্কে খোঁচা দিয়ে যায়। সন্তুকে সুরজিৎ যে ডাক্তার করতে চান তার একটাই উদ্দেশ্য। নিজের বিপুল পশারের উত্তরাধিকার তিনি তাকে দিয়ে যেতে চান।

'বিকাশ' নামে এই উপনগরীর রাস্তাগুলোতে এই মুহূর্তে লোকজন প্রায় চোখেই পড়ছে না। এখনও এখানকার ঘুম ভাঙেনি। নির্জন পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শরদিন্দু যেখানে পৌঁছালেন তার পরেই এ অঞ্চলের পুরনো অংশ। সেখানে সরু সরু গলির দুধারে ঘিঞ্জি বাড়িঘর।

শরদিন্দু নতুন কোথাও গেলে চারপাশ ভাল করে খুঁটিয়ে দেখেন। এটা তাঁর বহুকালের অভ্যাস। কী ভেবে তিনি পুরনো অঞ্চলটায় ঢুকে পড়লেন। 'বিকাশ'-এর ঘুম না ভাঙলেও এখানকার বাসিন্দারা বেশির ভাগই উঠে পড়েছে। মুদি দোকান, চায়ের দোকান, তেলেভাজার দোকান, মুড়ি চিঁড়ে খই মুড়কির দোকান — সবই খুলে গেছে। অন্য দোকানগুলোও খুলতে শুরু করেছে। চারদিকে প্রচুর মানুষজন। এখানে যারা থাকে তারা যে কষ্ট করে বেঁচে আছে সেটা তাদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। রোগা রোগা, ক্ষয়াটে চেহারা, সারা গায়ে অপুষ্টির ছাপ, পুরুষদের কারো পরনে লুঙ্গি বা পাজামার ওপর সস্তা ছিটের হাফশার্ট বা তালিমারা জামা। মেয়েমানুষগুলোর চেহারাও রোগাটে। অনেকেরই অল্প বয়সে চোখ বসে গেছে। হাতের শিরা বেরিয়ে পড়েছে। সারা শরীরে রক্তহীনতার চিহ্ন। পরনে আধময়লা রঙিন মিল বা তাঁতের শাড়ি।

রোদ উঠে গিয়েছিল। জলের কলগুলোর সামনে লম্বা লাইন পড়ে গেছে। এখানে খুব সম্ভব সাবেক কয়লা-উনুনে রান্নাবান্না হয়। চারপাশে ধোঁয়া দেখে তাই মনে হচ্ছে।

সরু সরু গলি ধরে লক্ষ্যহীনের মতো হাঁটছিলেন শরদিন্দু। হঠাৎ একটা প্রায় ধসে-পড়া, শ্যাওলা-ধরা একতলা বাড়ি থেকে কান্নাকাটির আওয়াজ ভেসে আসে। বাড়িটার চারপাশে একসময় ইট গেঁথে বাউন্ডারি ওয়াল তোলা হয়েছে। সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। সামনের দিকে সদর দরজা, তার দুটো পাল্লাই ভাঙা।

বাড়িটার সামনে এবং ভেতরের উঠোনে ছোটখাট একটা ভিড়। মনে হয়, আশেপাশের বাড়ির লোকজন জমা হয়েছে। তাদের চোখেমুখে উৎকণ্ঠা। শরদিন্দু থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। কী এমন হতে পারে, বোঝা যাচ্ছে না। তবে মনে হচ্ছে, কিছু একটা বিপদ ঘটেছে। তিনি এমন একজন মানুষ, কাউকে বিপন্ন হতে দেখলে কিংবা কারো কোনো সমস্যা হলে তিনি উদাসীন থাকতে পারেন না। অনেকে আছে, সারাক্ষণ গা বাঁচিয়ে চলে। চারপাশে যাই ঘটুক না, ফিরেও তাকায় না। নিজের বা নিজের পরিবারের বাইরে অন্য কোনো দিকে তাদের নজর নেই। এই সব আত্মসর্বস্ব মানুষদের তালিকায় শরদিন্দু একেবারেই পড়েন না।

পায়ে পায়ে বাড়িটার ভেতর চলে এলেন তিনি। সদর দরজার মুখোমুখি একটা ঘরে তক্তপোষের ওপর নোংরা বিছানায় শুয়ে আছে মধ্যবয়সী, প্রায় কঙ্কালসার একটি লোক। তার চোখ দুটো বোজা। গালে অনেকদিনের না-কামানো খাপচা খাপচা দাড়ি। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, বেঁচে নেই।

লোকটাকে ঘিরে তিন চারটি ছেলেমেয়ে। তাদের বয়স সাত আট থেকে পনের ষোলর মধ্যে। আর রয়েছে চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছরের ভীষণ শীর্ণ চেহারার একটি মহিলা। তার হাতে শাঁখা আর লাল কড় ছাড়া অন্য কিছু নেই। বোঝা যাচ্ছে, এরা বিছানায় পড়ে থাকা লোকটার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে। সবাই একটানা কেঁদে চলেছে।

ঘরের দরজার মুখে পাড়ার যে উদ্বিগ্ন মানুষজন ভিড় করে আছে তারা কেউ কথা বলছে না। শরদিন্দুর মতো বয়স্ক, প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একটি মানুষকে দেখে ভিড়টা সরে সরে তাঁকে পথ করে দেয়। ঘরের ভেতর ঢুকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?'

যে লোকগুলো ভিড় করে আছে তারা যা জানায় তা এইরকম। বিছানায় যে শুয়ে রয়েছে তার নাম ধীরেন সাহা। অনেকদিন ধরে সে কঠিন কোনো অসুখে ভুগছে। স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালে তাকে নিয়ে গিয়ে বহুবার দেখানো হয়েছে কিন্তু কিছুই হয়নি। কাল ভোর রাতে ভীষণ শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছিল ধীরেনের। আজ সকাল থেকে সাড়াশব্দ করছে না। স্ত্রী ছেলেমেয়ের ধারণা, খুব সম্ভব তার মৃত্যু হয়েছে। তাই ভোর থেকে শোকার্ত পরিবার একটানা কেঁদে চলেছে। কান্না শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসেছে। শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, মারা যে গেছে সেটা ধরে নিচ্ছ কেন? ডাক্তার এসে বলে গেছে?'

একজন বলল, 'না। তবে নড়াচড়া করছে না। কথাও বলছে না। তাই—'

শরদিন্দু আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ ধীরেনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সোজা খাটের কাছে গিয়ে তার একটা হাত তুলে নিয়ে নাড়ি টিপে ধরে থাকলেন। প্রথমটা মনে হল, নাড়ির স্পন্দন থেমে গেছে। অনেকক্ষণ পর তির তির করে সেটা কেঁপে উঠল। তার মানে ধীরেন সাহা মারা যায় নি। শরদিন্দু ধীরেনের নাড়িতে আঙুল রেখে বললেন, 'এ তো বেঁচে আছে। এক্ষুনি ডাক্তার দেখানো দরকার।'

ধীরেনের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের কান্না মুহূর্তে থেমে যায়।

শরদিন্দু বললেন, 'কাছাকাছি কোনো ডাক্তার আছে?'

ধীরেনের স্ত্রী নিচু গলায় বলল, 'আছে। কিন্তু—' বলতে বলতে চুপ করে যায়।

ঘরের ভেতর হঠাৎ স্তব্ধতা নেমে আসে।

শরদিন্দুর যা বরাবরের স্বভাব, ধমকের সুরে বললেন, 'আছে যখন, কেউ গিয়ে ডেকে নিয়ে এস। লোকটা বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে নাকি?'

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন জানায়, ডাক্তার ডাকার মতো পয়সা নেই ধীরেনদের। সে একটা কারখানায় কাজ করত। বছরখানেক আগে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। অফিস থেকে সামান্য কিছু টাকাপয়সা তারা পেয়েছিল। কারখানায় তালা পড়ার পর নানা জায়গায় কাজের চেষ্টা করেছে ধীরেন কিন্তু কিছু পাওয়া যায় নি। হাতের টাকা ভেঙে ভেঙে অগত্যা পেট চালাতে হয়েছে। তার ওপর এই কঠিন অসুখ। এখন কী করে যে দিন চলছে, সেটা ওরাই জানে।

শরদিন্দু দ্রুত কিছু ভেবে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা কয়েকজন ধীরেনকে নিয়ে আমার সঙ্গে যেতে পারবে? আমি বড় ডাক্তার দেখিয়ে দিচ্ছি।'

একজন বয়স্ক লোক জিজ্ঞেস করে, 'কোন ডাক্তারবাবু?'

সুরজিতের নাম করলেন শরদিন্দু। শুনে সবাই চমকে ওঠে, 'অত বড় ডাক্তারের পয়সা ধীরেনের বৌ কোত্থেকে দেবে? তা ছাড়া রুগী নিয়ে গেলেই তো উনি দেখেন না। ভোর রাত্তিরে থেকে লাইন দিতে হয়।'

শরদিন্দু বললেন, 'ওসব নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না। দড়ির খাটিয়া টাটিয়া থাকলে ধীরেনকে তার ওপর শুইয়ে ধরাধরি করে নিয়ে চল। বাকিটা আমি দেখব।'

একজন অচেনা বৃদ্ধ মানুষ সুরজিৎ মজুমদারের মতো নাম-করা ডাক্তারকে দিয়ে ধীরেনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন, শুনেও বিশ্বাস করতে পারছিল না কেউ। ভিড় করে যারা দাঁড়িয়ে আছে, নিজেদের মধ্যে তারা চাপা গলায় ফিসফিস করে পরামর্শ করতে থাকে। বুড়ো লোকটার কথায় যাওয়া ঠিক হবে কিনা, তারা ভেবে উঠতে পারে না। আসলে তারা ভীষণ ধন্দে পড়ে গেছে।

শরদিন্দু চড়া গলায় এবার বললেন, 'কী গুজগুজ করছ? যা বলছি তাই কর। ফেলে রাখলে রোগী এমনিতেই মরে যাবে।'

তাঁর বলার ভঙ্গিতে এমন এক কর্তৃত্ব ছিল যাতে কেউ আর কিছু বলার সাহস পায় না। দু-চারজন দৌড়ে গিয়ে কোত্থেকে ফিতের খাটিয়া জোগাড় করে আনে। শরদিন্দুর কথামতো ধীরেনকে তার ওপর শুইয়ে, খাটিয়াটা কাঁধে তুলে তারা ওঁর পিছু পিছু চলতে থাকে। শুধু খাটিয়া বাহকেরাই

না, ধীরেনের স্ত্রী ছেলেমেয়ে এবং বস্তির আরো অনেকে সঙ্গে সঙ্গে আসে। শরদিন্দু বিরক্ত গলায় বলেন, 'এত লোক আসতে হবে না। যাদের দরকার নেই তারা ফিরে যাও।' কিন্তু কেউ পিছু ছাড়ে না। বস্তির বাসিন্দাদের অপার কৌতূহল, সুরজিৎ মজুমদারকে দিয়ে শরদিন্দু আদৌ ধীরেনের চিকিৎসা করাতে পারবেন কিনা সেটাই তারা দেখতে চায়।

বেলা বাড়তে শুরু করেছিল। সূর্য পুব দিকের গাছপালার আড়াল থেকে অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে।

একসময় ধীরেনকে নিয়ে সুরজিতের বাড়ির সামনে পৌঁছে যান শরদিন্দু। এখন গেটটা খোলা রয়েছে। শেডের নিচে সেই পেশেন্টরাও নেই। বোঝা যাচ্ছে, আগে আসার ভিত্তিতে গুনে গুনে পঁচিশ জনকে ভেতরে ঢোকানো হয়েছে।

গেটের কেতাদুরস্ত দারোয়ান যথারীতি শরদিন্দুকে লম্বা স্যালুট করে।

শরদিন্দু বস্তির বাসিন্দাদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে ধীরেন, তার স্ত্রী ছেলেমেয়ে এবং খাটিয়া বাহকদের নিয়ে ভেতরে এসে সুরজিতের চেম্বারের সামনে চলে আসেন।

ডান পাশের সোফাগুলোতে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে পেশেন্টরা। সুরজিতের সেক্রেটারি করবীকে তার টেবলে বসে কী সব নোট টোট লিখতে দেখা যাচ্ছে।

এখানে যেসব পেশেন্ট আসে তারা বেশির ভাগই পয়সাওলা। তাদের চেহারায় সচ্ছলতার একটা পালিশ থাকে। নোংরা খাটিয়ায় শুয়ে এখানে কোনো রোগী আসবে, ভাবাই যায় না। অন্য পেশেন্টরা হকচকিয়ে যায়। করবী খানিকক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ শক খাওয়ার মতো উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এ কে স্যার?'

শরদিন্দু বলেন, 'দেখতেই তো পাচ্ছ, একজন পেশেন্ট। সুরজিৎ নিচে নেমেছে?'

'হ্যাঁ, এই মাত্র।'

'চেম্বারে একাই আছে?'

'হ্যাঁ। ফার্স্ট পেশেন্টকে এবার ওঁর কাছে পাঠাব।'

আর কোনো প্রশ্ন না করে সোজা দরজা ঠেলে চেম্বারের ভেতর ঢুকে গেলেন শরদিন্দু।

সুরজিৎ একটা বড় টেবিলের ওধারে বসে আছেন। একটি ত্রিশ বত্রিশ বছরের মহিলা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে কিছু টাইপ-করা কাগজপত্রের দিকে আঙুল বাড়িয়ে কী দেখাচ্ছিলেন। মহিলার পরনে শাড়ির ওপর সাদা অ্যাপ্রন। গলায় স্টেথোস্কোপ। শরদিন্দু মনে হল, ইনি একজন জুনিয়র ডাক্তার এবং সুরজিতের সহকারিণী। চেম্বারের ভেতরেই এক ধারে সরু ডিভানের মতো উঁচু একটা বেড। ওখানে রোগীদের শুইয়ে পরীক্ষা করা হয়।

শরদিন্দুকে এ সময় তাঁর চেম্বারে দেখে ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন সুরজিৎ। উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনো দরকার আছে স্যার?'

শরদিন্দু আস্তে মাথা নেড়ে জানালেন, মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে পাশের বস্তিতে গিয়ে একটি মরণাপন্ন রোগীকে দেখতে পান। ওরা এতই গরিব যে চিকিৎসা করানোর ক্ষমতা নেই। তাই তাকে নিয়ে এসেছেন। তাঁর ছাত্র এত বড় ডাক্তার, আর পয়সা নেই বলে লোকটা বেঘোরে মারা যাবে, তা তো আর হতে পারে না। এখন ওর মরা-বাঁচা সম্পূর্ণভাবে সুরজিতের ওপর নির্ভর করছে।

সুরজিৎকে বিব্রত দেখাল। তিনি বললেন, 'স্যার, আমাদের একটা সিস্টেম আছে। সকালের দিকে পঁচিশ জনকে আমি দেখি। তাদের নাম রেকর্ড করা হয়ে গেছে। এর মধ্যে নতুন একজন পেশেন্টকে দেখতে গেলে সিস্টেমটা গোলমাল হয়ে যাবে। আগে যে পেশেন্টরা এসেছে তারা অসন্তুষ্ট হবে।'

শরদিন্দুর স্বভাবটা হল এইরকম। কেউ, বিশেষ করে ছাত্ররা, তাঁর কথামতো না চললে খুব রেগে যান। তাঁর ধারণা এখনও ওঁরা কিশোর বয়সের ছাত্রই রয়ে গেছেন। ওঁদের কারো কারো বয়স যে পঞ্চাশ পেরিয়েছে, জীবনে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত, লোকে তাঁদের সম্মানের চোখে দেখে—এ সব শরদিন্দুর একেবারেই খেয়াল থাকে না। তিনি ধমকের সুরে বলেন, 'সিস্টেম বড় না একটা পেশেন্টের লাইফ অ্যান্ড ডেথের প্রশ্নটা বড়? তা ছাড়া—'

কোনো প্রশ্ন না করে অবুঝ, গোঁয়ারমার্কা প্রাক্তন শিক্ষকটির দিকে তাকিয়ে থাকেন সুরজিৎ। আগের কথার খেই ধরে শরদিন্দু বলেন, 'তা ছাড়া তোর যে পেশেন্টরা বসে আছে তাদের চেয়ে আমি

যাকে নিয়ে এসেছি তার কেসটা অনেক বেশি ক্রিটিকাল।'

সুরজিৎ একটা ঢোক গিলে বললেন, 'স্যার, এটা আমার প্রফেসন—'

শরদিন্দু কড়া গলায় বললেন, 'তোর কাছে প্রফেসনটাই দেখছি সব চেয়ে বড়। কে মরল বাঁচল, সেদিকে বুঝি নজর দিতে নেই? লোকটার চিকিৎসা না করলে সেটা কিন্তু মারাত্মক অন্যায় হবে, আর আমি তা মেনে নিতে পারব না।'

সুরজিৎ তবু ইতস্তত করতে থাকেন।

শরদিন্দু কড়া গলায় এবার বললেন, 'এখনও দাঁড়িয়ে রইলি যে—'

সুরজিৎ বুঝতে পারলেন, তাঁর এই প্রাক্তন মাস্টার মশাইকে কোনোভাবেই এড়ানো যাবে না। জিজ্ঞেস করলেন, 'পেশেন্টকে কোথায় রেখেছেন?'

শরদিন্দু বললেন, 'তোর চেম্বারের বাইরে মেঝের ওপর একটা খাটিয়ায় পড়ে আছে।'

সুরজিৎ তাঁর সহকারিণীকে বললেন, 'সোমা, তুমি স্যারের পেশেন্টকে আগে ভেতরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা কর। ওকে দেখে পরে অন্য পেশেন্ট অ্যাটেন্ড করব।'

সোমা বাইরে বেরিয়ে গেল। তাঁর কথামতো যে লোকগুলো ধীরেন সাহাকে কাঁধে চাপিয়ে এনেছিল, তারাই ধরাধরি করে তাকে চেম্বারের ভেতরে নিয়ে এল। সুরজিৎ ধীরেনকে বেডের ওপরে শুইয়ে দিয়ে লোকগুলোকে বাইরে চলে যেতে বললেন। শরদিন্দু অবশ্য থেকে গেলেন।

সুরজিৎ খুব যত্ন করেই ধীরেনকে দেখতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে সোমাকে রোগের ব্যাপারে কী সব নোট দিয়ে যাচ্ছেন। সোমা সেগুলো সুরজিতের প্রেসক্রিপশন শিটে লিখে রাখছেন। লেখা হয়ে গেলে সুরজিৎ তাঁর চেয়ারে বসে প্রেসক্রিপশন শিটটা সোমার হাত থেকে নিয়ে আরো কিছু লিখতে লিখতে শরদিন্দুকে বললেন, 'খুব কমপ্লিকেটেড কেস স্যার। ব্রনকিয়াল প্রবলেম, লিভারেও মনে হচ্ছে গোলমাল, তা ছাড়া ম্যালনিউট্রিশন তো আছেই। ব্লাড, এক্সরে থেকে শুরু করে অনেক রকম টেস্ট করাতে হবে।'

শরদিন্দু বললেন, 'যা করার তোকেই করতে হবে। আর্থিক অবস্থা ওদের শোচনীয়। চাকরি নেই, হাতের পয়সা সব শেষ। দু টাকার ওষুধ যদি কিনতে বলিস পারবে না।'

সুরজিৎ বললেন, 'ওষুধের জন্যে চিন্তা করতে হবে না। নানা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ডাক্তারদের ওষুধের শ্যাম্পল দিয়ে যায়। তার থেকে আমি দিয়ে দেব। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'টেস্টগুলো করতে তো অনেক টাকা লাগবে।'

'ওদের আর্থিক অবস্থার কথা তোকে জানানোর পরও তুই টাকার কথা বলছিস! ঠিক আছে, যা লাগে আমিই না হয় দিয়ে দেব।'

এবার লজ্জা পেয়ে গেলেন সুরজিৎ। বললেন, 'না না, আপনি কেন দেবেন? আমি দুটো নার্সিং হোমের সঙ্গে অ্যাটাচড। কাছাকাছি যেটা আছে সেখানে চিঠি লিখে দিচ্ছি। ওরা সব করে দেবে।'

সুরজিৎ চিঠি লিখে ধীরেন সাহার জন্য প্রচুর ওষুধ দিলেন। কখন কোনটা খেতে হবে, তা তো প্রেসক্রিপশনে লিখলেনই, শরদিন্দুকেও মুখে বলে দিলেন।

ওষুধ টোষুধ নিয়ে শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'টেস্টগুলো হয়ে গেলে ওরা রিপোর্ট নিয়ে তোর সঙ্গে কিন্তু দেখা করবে। পেশেন্টকেও নিয়ে আসবে।'

সুরজিৎ বললেন, 'ঠিক আছে।'

শরদিন্দু বললেন, 'এবার তোর পয়সাওলা পেশেন্টদের দ্যাখ। আমরা যাচ্ছি।'

ধীরেনদের চলে যেতেও বলতে পারতেন শরদিন্দু। কিন্তু ওদের সঙ্গে ফের বস্তিতে এলেন। ধীরেনের স্ত্রীকে ওষুধ এবং প্রেসক্রিপশন দিয়ে সব ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। শুধু তাই না, পকেটে শ দেড়েকের মতো টাকা ছিল। পুরোটাই ধীরেনের স্ত্রীকে দিয়ে বললেন, 'এগুলো এখন রাখ। আমি আবার আসব। তখন আরো কিছু টাকা দেব। টেস্টগুলো হয়ে গেলে নিজে এসে ধীরেনকে আবার ডাক্তার সুরজিৎ মজুমদারের কাছে নিয়ে যাব।'

ধীরেন সাহার স্ত্রী ঝুঁকে দেবদূতের মতো মানুষটির পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে যখন উঠে দাঁড়াল তার দু চোখ বেয়ে অপার কৃতজ্ঞতায় সমানে জল ঝরে যাচ্ছে। কিছু একটা বলতে চেষ্টা

করল সে কিন্তু ঠোঁট দুটো আবেগে থর থর কাঁপল শুধু, গলায় স্বর ফুটল না।

ধীরেনের স্ত্রীর মাথায় হাত ঠেকিয়ে শরদিন্দু বললেন, 'আজ চলি।'

চার

সেই যে সুরজিৎদের বাড়ি শরদিন্দু এসেছিলেন, তারপর এক সপ্তাহ কেটে গেছে। এর মধ্যে ধীরেন সাহার সব রকম টেস্ট হয়ে গেছে। আরো দুবার তাকে এনে সুরজিৎকে দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি। লোকটা ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছে। সুরজিতদের কাছে আসার সময় হাজার তিনেক টাকা সঙ্গে এনেছিলেন। আগেই ধীরেনের স্ত্রী মায়াকে শ দেড়েক দিয়েছিলেন। পরে আরো চার শ টাকা দিয়েছেন। মোট কথা, একটা মুমূর্ষু মানুষকে যে ভাল করে তুলতে পেরেছেন, এ জন্য শরদিন্দু খুব খুশি। তাঁর প্রতি ধীরেনদের গোটা পরিবারের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। যে ঘিঞ্জি নোংরা অঞ্চলটায় ওরা থাকে সেখানকার বাসিন্দাদের কাছে শরদিন্দু যেন ঈশ্বরপ্রেরিত কেউ।

এদিকে এই সাত দিনে সন্তুর প্রাইভেট টিউটররা পড়িয়ে চলে গেলে তাকে নিয়ে রাতের দিকে বসেছেন শরদিন্দু।

ফিজিকসের যে চ্যাপ্টারই তিনি ধরেন—হিট, ইলেকট্রিকিসিটি, ম্যাগনেটিজম, কোনো কিছু সম্বন্ধে সন্তুর পরিষ্কার ধারণা নেই। অঙ্ক কষতে দিয়েও দেখেছেন, বেশির ভাগই পারে না। ত্রিগোনোমেট্রি, ক্যালকুলাস, অ্যালজেব্রা, স্ট্যাটিকস, ডাইনামিকস, ইত্যাদি সম্পর্কে যে প্রশ্ন দেন, হাতে কলম নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। ফিজিকসের হিট, ইলেকট্রিসিটির কিছু কিছু থিওরি ঝাড়া মুখস্থ করেছে সে, কিন্তু একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেই স্রেফ বোবা হয়ে যায়।

শরদিন্দু জিজ্ঞেস করছেন, 'তোমার বাবা ফিজিকস আর ম্যাথসের জন্য যে দুটো টিউটর রেখেছেন তারা মাসে কত করে মাইনে নেয়?'

সন্তু বলেছে, 'এক হাজার টাকা করে।'

'বাংলা ইংরেজি কেমিস্ট্রির জন্যেও তো মাস্টার আছে। তারা কত করে নেয়?'

সন্তু জানায় অন্য মাস্টার মশাইরা কেউ পাঁচ শ কেউ সাত'শ, এই হিসেবে নিয়ে থাকেন। মনে মনে শরদিন্দু যোগ করে দেখলেন, সুরজিৎ ছোট ছেলের প্রাইভেট টুইশনের জন্য প্রতি মাসে সাড়ে চার হাজার টাকারও বেশি খরচ করে থাকেন। যাঁর বাড়ির চেম্বারে এসে দেখানোর ভিজিট দুশ তাঁর পক্ষে প্রাইভেট টিউটর রেখে সাড়ে চার হাজার টাকা খরচ করা কোনো ব্যাপারই না। যদিও ভারতবর্ষের শতকরা ষাট ভাগ লোক মাসে এই টাকাটা রোজগারের কথা ভাবতেই পাবে না।

শরদিন্দু বলেছেন, 'স্বয়ং মা সরস্বতীকে গুলে খাইয়ে দিলেও তুমি অঙ্কে ফিজিকসে কেমিস্ট্রিতে ফর্টিপাইভ পারসেন্টের বেশি মার্কস পাবে না।'

সন্তু চুপ করে থাকে, উত্তর দেয় না।

শরদিন্দু বলেছেন, 'অঙ্ক টঙ্কর হাল তো দেখলাম। বাংলা ইংরেজির অবস্থা এবার দেখা যাক।'

সন্তু অঙ্ক টঙ্কর ব্যাপারে ভীষণ ম্রিয়মাণ হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলা আর ইংরেজির কথায় তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

শরদিন্দু নানা প্রশ্ন করে বুঝতে পেরেছেন, দুটো ভাষার ওপরই ছেলেটার যথেষ্ট দখল। কঠিন সাবজেক্টের ওপর বাংলা এবং ইংরেজিতে দু-তিনটে 'এসে' লিখতে দিয়েছিলেন। চমৎকার লিখেছে সন্তু।

শরদিন্দু বলেছেন, 'তুমি তো হানড্রেড পারসেন্ট আর্টসের ছাত্র। তোমার বাবা তোমাকে সায়েন্সে দিয়েছে কেন?'

সন্তু বলেছে, 'স্যার, বাবাকে আমি বলেছিলাম, সায়েন্স আমার মাথায় ঢোকে না। কিন্তু কিছুতেই শুনল না।'

একদিন রাতে খাবার টেবলে বসে খেতে খেতে শরদিন্দু সুরজিৎকে বলেছেন, 'ছেলেটার এমন সর্বনাশ করছিস কেন?'

প্রাক্তন মাস্টার মশাইয়ের প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে সুরজিৎ চমকে উঠেছেন, 'সর্বনাশ মানে!'

'তুই আমাকে সন্তুর পড়াটিড়াগুলো একটু দেখিয়ে দিতে বলেছিলি তো?'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম। আপনার কাছে পড়বে, এ তো ওর পরম সৌভাগ্য।'

শরদিন্দু বলেছেন, 'ও সব ভাল ভাল কথা থাক। যা বলছি খুব মন দিয়ে শোন।'

সুরজিৎ খানিকটা উৎকণ্ঠা নিয়ে তাঁর প্রাক্তন শিক্ষকটির দিকে তাকিয়ে থাকেন।

শরদিন্দু থামেন নি, 'সন্তুকে সায়েন্স পড়তে দিয়েছিস কেন?'

'না হলে জয়েন্ট এনট্রান্সে বসবে কী করে? ডাক্তারি পড়তে হলে ওটা তো মাস্ট।'

'কিন্তু ছেলেটির সায়েন্সের ওপর ইন্টারেস্ট আছে কিনা, কখনও ভেবে দেখেছিস?'

'স্যার, আমি তো ওর জন্যে ম্যাথস ফিজিকস কেমিস্ট্রি টেমিস্ট্রির বেস্ট অ্যাভেলেবল টিচার দিয়েছি।'

'তা আমি জানি। একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আমাকে টিচার হিসাবে তোর কেমন মনে হয়?'

সুরজিৎ বলেছেন, 'স্যার, আপনার মতো একজন মাস্টার মশাই পেলে যে কোনো ছাত্রের জীবন ধন্য হয়ে যাবে।'

'ফ্ল্যাটারির দরকার নেই। ছেলেদের মানসিক গঠন টঠন কেমন, তারা কী চায়, কোন দিকে গেলে তাদের ভবিষ্যৎ ভালভাবে গড়ে উঠতে পারে, সেটা আমি বুঝতে পারি।'

সুরজিৎ উত্তর না দিয়ে শরদিন্দুকে লক্ষ করতে থাকেন। শরদিন্দু একটানা বলে যান; 'এই ক'দিনে যা দেখলাম, স্বয়ং সত্যেন বোস মেঘনাদ সাহা জ্ঞানচন্দ্র ঘোষেরা বেঁচে থাকলে আর তিনজন মিলে সন্তুর দায়িত্ব নিলেও ওকে দিয়ে ভাল রেজাল্ট করাতে পারবেন না।'

সুরজিৎ চুপ।

শরদিন্দু বলেছেন, 'আমি কী বলি, মন দিয়ে শোন। সন্তুকে আর্টস পড়া। ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করবে।'

সুরজিৎ বলেছেন, 'সেটা এখন আর কী করে সম্ভব? এইচ এসের ফাইনাল তো বেশি দেরিও নেই। তা ছাড়া আর্টস পড়ে কী হবে?'

'আর্টসেও প্রচুর ওপেনিং আছে। মাস কমিউনিকেশন বা জার্নালিজমে যেতে পারে। রিসার্চ করতে বিদেশে যেতে পারে। বাইরে ভাল রেজাল্ট করে পড়ানোর সুযোগ পেলে যেমন সম্মান তেমনি পয়সা।'

'স্যার, আমার ওকে নিয়ে অন্যরকম স্বপ্ন ছিল।'

'ডাক্তার বানানো—তাই তো?'

'হ্যাঁ। মানে, আপনার আশীর্বাদে আমার মোটামুটি পশার হয়েছে। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে সন্তুটা যদি মেডিকেল কলেজ থেকে বেরিয়ে আসতে পারত, আমার পেশেন্টগুলো সব ও পেয়ে যেত।'

'বুঝেছি।'

শরদিন্দুর বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যাতে মনে মনে গুটিয়ে গেছেন সুরজিৎ। তবে কোনো প্রশ্ন করেন নি।

শরদিন্দু বলেছেন, 'সন্তুকে তোর মতো আর একটা টাকা তৈরির রোবট বানাতে চাস— এই তো? কিন্তু আমি বলছি, ওর পক্ষে ডিজাস্টার হবে। ডাক্তার ও হতে পারবে বলে মনে হয় না।'

সুরজিৎ এ সব পছন্দ করছিলেন না। অল্প বয়সে দেশে থাকতে অসীম যত্নে লেখাপড়া শিখিয়ে শরদিন্দু তাঁর ভবিষ্যতের ভিত তৈরি করে দিয়েছিলেন, এ জন্য সুরজিৎ যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। কিন্তু এখন তিনি একজন প্রবীণ মানুষ, প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক। সন্তুর কিসে ভাল, কিসে মন্দ, সে বিচারবুদ্ধি তাঁর যথেষ্টই আছে। কিন্তু শরদিন্দুর ধারণা, তিনি এখনও পূর্ব বাংলার কিশোরটিই থেকে গেছেন।

হঠাৎ মাস্টার মশাইটির একটি বড় ত্রুটির দিকে নজর গেছে সুরজিতের। এক সময় পড়িয়েছেন বলে পুরনো ছাত্রদের পারিবারিক বা ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি বড় বেশি নাক গলান। সেদিন আচমকা বস্তি থেকে একটা ভিখিরি টাইপের রোগীকে এনে হাজির করলেন। নেহাত তাঁর সম্মান রক্ষার জন্য সবরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করে লোকটাকে সুস্থ করে তুলেছেন। কিন্তু এতে তাঁর প্রফেসনের যে ক্ষতি হয়, সেদিকে একেবারেই লক্ষ নেই। আজ আবার সন্তুর পড়াশোনা নিয়ে জোর করে নিজের মতামত চাপিয়ে দিতে চাইছেন। এগুলো খুবই বিরক্তিকর, কিন্তু বলার উপায় নেই। মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে।

নিজেকে যতটা সম্ভব সংযত রেখে সুরজিৎ বলেছেন, 'হায়ার সেকেণ্ডারির ফাইনাল তো এসে গেছে। সন্তু এটা অ্যাপিয়ার করুক। রেজাল্ট কিরকম হয় আগে দেখি। তারপর না হয় ফিউচারের কথা ভাবা যাবে।'

শরদিন্দু খুব জোর দিয়ে বলেছেন, 'ভাবাভাবি না, যা বললাম তাই করবি। ওকে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি.এ. তে ভর্তি করে দিবি।'

সুরজিৎ বলতে যাচ্ছিলেন, সন্তুর ব্যাপারে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই শরদিন্দুর। পরক্ষণেই খেয়াল হয়েছে, পিতৃতুল্য একগুঁয়ে এই মানুষটির ওপর এতটা রূঢ় আচরণ উচিত হবে না। তা ছাড়া উনি আর ক'দিনই বা এখানে থাকবেন? বড় জোর আরো মাসখানেক। সন্তুর পরীক্ষার এখনও ছ'সাত মাস বাকি, রেজাল্ট বেরুবে তারও তিনমাস বাদে। তখন সুরজিৎ তাঁর ছেলেকে নিয়ে কী করবেন তাও জানতে পারবেন না শরদিন্দু। বহু বছর পর উনি তাঁদের কাছে এসেছেন। ওঁর মতের বিরুদ্ধে কথা বলে কষ্ট দেবার মানে হয় না।

সুরজিৎ শান্ত গলায় বলেছেন, 'আপনি খুব ভাল সাজেশান দিয়েছেন স্যার। যা বললেন তাই হবে।'

'ভেরি গুড। ইংরেজি নিয়ে পড়লে সন্তু কিরকম শাইন করে দেখিস।'

সুরজিৎ যে তাঁর কথায় খুশি হয়েছেন তাতে খুবই সন্তুষ্ট শরদিন্দু।

পাঁচ

সেই যে ধীরেন সাহাকে সেদিন সকাল বেলায় শরদিন্দু তাঁর চেম্বারে নিয়ে এসেছিলেন সে জন্য মুখে সেভাবে কিছু না বললেও খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন সুরজিৎ। তারপর সন্তুর পড়াশোনার ব্যাপারে যেভাবে জোর করছিলেন তাতে তিনি আদৌ খুশি হন নি।

কিন্তু সুরজিতের অস্বস্তিটা কিছুদিনের মধ্যে হঠাৎ আরো কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিলেন শরদিন্দু। ধীরেন সাহার খবরটা 'বিকাশ'-এর গা-ঘেঁষা সেই ঘিঞ্জি এলাকাটায় মুখে মুখে ছড়িয়ে গিয়েছিল। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক হঠাৎ ঈশ্বরপ্রেরিত দূতের মতো এ অঞ্চলে চলে এসেছেন, থাকেন ডাক্তার সুরজিৎ মজুমদারের বাড়িতে। সুরজিতের ওপর তাঁর এমনই প্রভাব যে তিনি কিছু বললে সুরজিৎ না বলতে পারেন না। মুখ বুজে তা পালন করেন।

শরদিন্দুর চিরকালের অভ্যাস, ভোরের দিকে এবং বিকেলে নিয়মিত কয়েক মাইল হাঁটা। 'বিকাশ' উপনগরীতে আসার পর তিনি যে রোজ একই দিকে যান তা নয়। যখন যেদিকে ইচ্ছা হয়, ঘুরে আসেন।

'বিকাশ'-এর পাশের ঘিঞ্জি এলাকার বাসিন্দারা শরদিন্দুর গতিবিধির ওপর লক্ষ রাখে। তাদের অঞ্চলটায় কঠিন, দুরারোগ্য অসুখে ভুগছে এমন লোকের সংখ্যা অনেক। হাসাপাতাল বা হেলথ সেন্টারগুলোতে গিয়ে বিশেষ কাজ হয় না। দিনের পর দিন ছোটাছুটিই সার। বেশির ভাগই কোনোরকমে ধুঁকে ধুঁকে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছে। প্রায় বিনা চিকিৎসায় এরা মৃত্যুর দিন গুনছে। শরদিন্দু হঠাৎ 'বিকাশ'-এ এসে পড়ায় অসীম নৈরাশ্যের মধ্যেও তারা যেন আলোর রেখা দেখতে পেয়েছে।

প্রাতঃভ্রমণে শরদিন্দু যখনই বেরোন, রাস্তার ঘিঞ্জি অঞ্চলের অনেকেই তাঁর জন্য অপেক্ষা করে। যেদিকেই তিনি যান না, খুঁজে খুঁজে ঠিক গিয়ে হাজির হয়। শরদিন্দুর দু'পা জড়িয়ে ধরে কেউ বলে, 'বাবু আমার বাবা মরতে বসেছে। বড় ডাক্তারবাবুকে দিয়ে তাকে একবার দেখিয়ে দিন। উনি দেখলেই বাবা ভাল হয়ে যাবে।'

কেউ বলে, 'আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিন বাবু, নইলে সংসার ভেসে যাবে।'

প্রতিদিন যত লোক শরদিন্দুকে ধরে, তাদের একসঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় না। যাদের রোগ বেশি কঠিন, প্রায় মৃত্যুর মুখে যারা চলে এসেছে, তেমন দু-তিন জনকে সঙ্গে করে সুরজিতের চেম্বারে নিয়ে আসেন।

সুরজিৎ খেপে গেলেও বাইরে তা প্রকাশ করেন না। গম্ভীর গলায় শুধু বলেন, 'স্যার, রোজ এই সব পেশেন্ট আনলে আমার ভীষণ অসুবিধা হয়।' শুধু রোগীদের দেখাই তো না, শরদিন্দু যাদের আনেন তাদের নানারকম প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট এবং ওষুধের ব্যবস্থা করে দিতে হয়। পুরনো মাস্টার

মশাইটি তাঁর চেম্বারটাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ের স্তরে নামিয়ে আনতে শুরু করেছেন।

শরদিন্দু ছাত্রের কাঁধে একটা হাত রেখে বলেন, 'লোকটা ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। তোর মতো একজন ধন্বন্তরি কাছাকাছি থাকতে ও মরে যাবে?'

'কিন্তু স্যার—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বল।'

'এ সব রোগীদের জন্যে চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি আছে, গভর্নমেন্ট হসপিটাল আর হেলথ সেন্টার আছে। ওরা সেখানে যেতে পারে।'

শরদিন্দু বলেন, 'কোনো জায়গাতেই যেতে বাকি রাখেনি। কিন্তু রোগ সারে নি। তাই তো তোর কাছে ছুটে এসেছে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও শরদিন্দুর আনা রোগী দেখতে হয় সুরজিৎকে। এবং তাদের সুস্থ হয়ে ওঠার ব্যবস্থা করতে হয়। প্রতিদিন এরকম জুলুম সহ্য করতে হবে জানলে কখনই শরদিন্দুকে তাঁর বাড়িতে আসতে বলতেন না। কোনো না কোনো অজুহাতে এড়িয়ে যেতেন। কম বয়সে তাঁর কাছে পড়েছেন, সেই কৃতজ্ঞতায় সাদরে সসম্ভ্রমে বাড়িতে নিয়ে এসে এখন বিপাকের শেষ নেই সুরজিতের।

একদিন সুরজিৎ বললেন, 'স্যার, যে পারছে আপনাকে ধরে চলে আসছে। আমার একার পক্ষে এত পেশেন্ট সারিয়ে তোলা কি সম্ভব?'

শরদিন্দু বলেন, 'জানি জানি, একেবারেই সম্ভব নয়। কিন্তু যে ক'জনকে পারিস সারিয়ে তোল। ডাক্তার হয়েছিস, এটা তোর প্রফেসন তো নিশ্চয়ই। কিন্তু ডাক্তারদের কিছু সোশাল সারভিসও দিতে হয়।'

সুরজিৎ এরপর আর কিছু বলেন না। কবে শরদিন্দু চলে যাবেন, মনে মনে তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

ছয়

শরদিন্দু সেই যে এসেছিলেন, তারপর মাসখানেক কেটে গেছে।

প্রতিটি সাবজেক্টে টিউটর থাকলেও সন্তু রোজই কিছুক্ষণ তাঁর কাছে পড়ে যায় সন্তু। বড় যত্ন করে পড়ান শরদিন্দু। অঙ্ক, ফিজিক্যাল সায়েন্স, কেমিস্ট্রি এমন জলের মতো তিনি বোঝান যে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তার ভয় অনেকটা কমে গেছে। শুধু সায়েন্স সাবজেক্ট আর অঙ্কই নয়, ইংরেজি বাংলায় যে অ্যানসার লিখে দেন, আগে কেউ সেভাবে লেখেন নি।

শরদিন্দুকে যত দেখছে ততই ভাল লাগছে সন্তুর। একজন মাস্টারমশাই সব সাবজেক্ট এত চমৎকার পড়াতে পারেন, এটা সে ভাবতেই পারে না। বছরখানেক আগে থেকে ওঁর কাছে যদি পড়তে পারত, হায়ার সেকেন্ডারিতে নিশ্চয়ই দুর্দান্ত রেজাল্ট করার সম্ভাবনা ছিল।

শরদিন্দুকে তার ভাল লেগেছে অন্য আরো একটা কারণে। অঙ্ক টঙ্ক আগের থেকে অনেক বেশি পারলেও তার ঝোঁক আর্টস পড়ার দিকে। সুরজিৎ এতটাই রাশভারী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যে সেটা তাঁকে কোনোদিনই জানাতে পারেনি সন্তু। মুখ বুজে বাবার ইচ্ছাটাই তাকে মেনে নিতে হয়েছে। সুরজিৎকে সে ভয় পায়।

অথচ তার মনের কথাটাই সেদিন খাবার টেবলে সোজাসুজি সুরজিৎকে জানিয়ে দিয়েছেন শরদিন্দু। শুধু জানানই নি, তাকে ইংরেজি অনার্স নিয়ে বি.এ. তে ভর্তি করার জন্য বার বার চাপ দিয়েছেন। সন্তু লক্ষ করেছে, শরদিন্দুর কথার ওপর জোর দিয়ে নিজের মত জাহির করেন না সুরজিৎ। শুধু পুরনো মাস্টারমশাইকে বিনীতভাবে জানিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা সন্তু ডাক্তার হোক।

শরদিন্দুর কাছে পড়ার সময় একদিন সন্তু জিজ্ঞেস করেছে, 'দাদু, আপনি আমাদের এখানে কতদিন থাকবেন?'

শরদিন্দু মজার গলায় বলেছেন, 'কেন, আমি পোঁটলাপুঁটলি গুছিয়ে আজই চলে যাই, এটাই কি তুই চাস?' এতদিনে সন্তুকে তুই করে বলতে শুরু করেছেন তিনি।

সন্তু দুই হাত আর মাথা নেড়ে শশব্যস্তে বলেছে, 'না না, আপনার যতদিন ইচ্ছা থাকুন—'

শরদিন্দু একটু চিন্তা করে বলেছেন, 'মাসখানেক কাটিয়ে দিলাম। আর বেশি থাকা কি ভাল দেখায়?

তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'তোর বাবা মনে মনে আমার ওপর ভীষণ রেগে যাচ্ছে।'

রীতিমত অবাক হয়ে সন্তু বলেছে, 'রেগে যাবে কেন? বাবা তো আপনাকে খুব সম্মান করে। বাবার আজকের সাকসেসের পেছনে আপনার কতটা কনট্রিবিউশন সেটা আপনি আসার আগে কতবার শুনেছি।'

শরদিন্দু বলেছেন, 'সে সব ঠিক আছে। কিন্তু রোজ দু-চারটে করে গরিব পেশেন্ট আনছি। তাদের বিনা পয়সায় তোর বাবাকে ট্রিটমেন্ট করতে হচ্ছে। তাতে কি সে আমার ওপর খুশি থাকতে পারে? ওর মুখচোখ দেখে আমি তা বুঝতে পারি।'

সন্তু চুপ করে থেকেছে।

শরদিন্দু ফের বলেছেন, 'টাকা তো কম রোজগার করে না সুরজিৎ। টিচার, পলিটিশিয়ান, ডাক্তার— এদের আইডিয়ালিস্ট হতে হয়। আমাদের কান্ট্রিতে পভার্টি লাইনের নিচে প্রায় ফিফটি পারসেন্ট মানুষ। তাদের কথা ভাবা উচিত। নইলে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। খালি টাকার পেছনে ছুটব, এটা কখনই হতে পারে না।'

সন্তু এবার বলেছে, 'আপনি জানেন না দাদু, আপনার ওল্ড স্টুডেন্টটি আপনার আইডিয়ালিজমের একটা ফোঁটাও পায়নি। টাকা ছাড়া আর কোনো দিকে বাবার নজর নেই।'

এই এক মাসে শরদিন্দুও তা আন্দাজ করেছেন। আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছেন তিনি। মুখে কিছু বলেন নি।

একটু চুপচাপ।

সন্তু খানিকক্ষণ ভেবে বলেছে, 'একটা রিকোয়েস্ট করব দাদু?'

উৎসুক চোখে কৈশোর পেরুনো ছেলেটির দিকে তাকিয়ে শরদিন্দু জিজ্ঞেস করেছেন, 'কী রিকোয়েস্ট রে?'

'আমার হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট বেরুনো পর্যন্ত আপনি এখানে থেকে যান।'

'ওরে বাবা, সে তো মিনিমাম সাত আট মাস। এতদিন পুরনো ছাত্রের বাড়ি কি থাকা যায়, না সেটা ভাল দেখায়? তা ছাড়া—'

'কী?'

শরদিন্দু বলেছেন, 'তোদের এখান থেকে আমার আর এক ছাত্রের বাড়ি যাবার কথা আছে। তাকে জানিয়েও দিয়েছি। ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে।'

সন্তু বলেছে, 'ওঁদের চিঠি লিখে দিন, এখন নয়, পরে যাবেন।' তার কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা ফুটে বেরিয়েছে।

সন্তুর যেমন তাঁকে ভাল লেগেছে, শরদিন্দুরও তেমনি ছেলেটাকে খুব পছন্দ হয়েছে। সস্নেহে তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলেছেন, 'আমাকে ধরে রাখতে চাইছিস কেন?'

সন্তু বলেছে, 'দাদু, আপনি চলে গেলে বাবা আমাকে জোর করে জয়েন্ট এনট্রান্সে বসিয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করার চেষ্টা করবে।'

'ও, এই জন্যে? তুই চাইছিস তোকে ইংলিশ অনার্সে ভর্তি করিয়ে আমি যাই?'

সন্তু আস্তে মাথা নেড়েছে।

শরদিন্দু বলেছেন, 'এটা রিয়েলি একটা সমস্যা বটে। দেখি তোর বাবা ক'দিন আমাকে থাকতে দেয়—'

এই এক মাসে দৈনন্দিন রুটিনে কোনোরকম হেরফের ঘটেনি শরদিন্দুর। প্রাতঃভ্রমণ আর বিকেলে বেড়ানো তো আছেই। সেই সঙ্গে যেটুকু যোগ হয়েছে তা হল গরিব পেশেন্ট জুটিয়ে এনে সকালে সুরজিৎকে দিয়ে দেখানো আর রাত্রে সন্তুকে পড়ানো।

আজ বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন তিনি। এক একদিন এক এক দিকে যান। আজ হাঁটতে হাঁটতে দক্ষিণ দিকে চলে এলেন। এধারেই স্যাটেলাইট টাউন 'বিকাশ'কে ছুঁয়ে চওড়া হাইওয়ে কলকাতার

দিকে চলে গেছে।

রাস্তাটায় সারাক্ষণ প্রচণ্ড ব্যস্ততা। দিনরাত ট্রাফিকের ভিড়। বাস মিনিবাস অটো টেম্পো ট্রাক ইত্যাদি স্রোতের মতো লাইন দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাচ্ছে। গাড়িটাড়ি বাদ দিয়ে রয়েছে মানুষের ভিড়।

পশ্চিম বাংলার অন্য সব বড় রাস্তার দুধারে জবরদখল করে সারিবদ্ধ দোকান চোখে পড়ে। এই হাইওয়েটা সে দিক থেকে মুক্ত। বাঁধানো ফুটপাথ না থাকলেও দু'পাশে অনেকটা করে ফাঁকা জায়গা। আর আছে বড় বড় ঝাড়ালো গাছ— কৃষ্ণচূড়া শিশু রেন-ট্রি ইত্যাদি। এই সব বনস্পতি যেন রাস্তাটার অলঙ্কার।

বিকেলবেলায় ঝির ঝির করে হাওয়া দিচ্ছে। সেই হাওয়া গায়ে মেখে অন্যমনস্কের মতো হাঁটছিলেন শরদিন্দু। চলাফেরার মতো জায়গা ছেড়ে রাস্তার পাশে নতুন নতুন সব বাড়ি, ঝকঝকে সব দোকানপাট। পোশাক টিভি ঘড়ি ইত্যাদি দোকানগুলোতে চমৎকার করে সাজান শো-উইণ্ডো। বাড়িগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই হাই-রাইজ।

অন্যমনস্কর মতো হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কাছাকাছি কোত্থেকে যেন বহু মানুষের চিৎকার কানে এল শরদিন্দুর। চমকে এধারে ওধারে তাকাতে তাঁর চোখে পড়ল, রাস্তার ওপারে খানিকটা কোনাকুনি, একটা বিশাল পাঁচতলা বাড়ির সমানে বহু মানুষের ভিড়। একসঙ্গে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তারা একটানা কী বলে যাচ্ছে, এতদূর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে লোকগুলো যে ভীষণ ক্ষিপ্ত, সেটা আন্দাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে না। এত মানুষ ওখানে জড়ো হয়েছে কেন? কী হতে পারে? রীতিমত কৌতূহল বোধ করলেন শরদিন্দু। হাঁটা থামিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ লক্ষ করলেন। তাঁর নিজের কোনো প্রয়োজন নেই। তবু কী ভেবে রাস্তা পেরিয়ে বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলেন।

কাছাকাছি যেতেই দেখা গেল, বাড়িটা একটা নার্সিং হোম। না 'ইউনিভার্সাল কিওর হাউস'। প্রায় তিন চার শ লোক সেটাকে ঘিরে আছে। সবাই উত্তেজিত এবং মারমুখী। নার্সিং হোমের গেট ভেতর থেকে বন্ধ। জনতা এমনভাবে হামলা চালাচ্ছে, যে কোনো মুহূর্তে গেটটা ভেঙে পড়বে।

একটা লোককে শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে এখানে?'

উত্তর না দিয়ে লোকটা বলল, 'মানুষের লাইফ নিয়ে এই শালাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেব।'

কিছুই বোধগম্য হল না।

আরো কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করে শরদিন্দু জানতে পারলেন, এই নার্সিং হোমটায় রোগী ভর্তি হলে তার আর নিস্তার নেই। নানাভাবে তাদের পরিবারের রক্ত শোষণ করে তবে ছাড়া হয়। লোকগুলোর বক্তব্য, নার্সিং হোম দাতব্য চিকিৎসালয় বা সরকারি হাসপাতাল নয়। লাভ তারা নিশ্চয়ই করবে। কিন্তু তার তো সীমা থাকা উচিত। এই নার্সিং হোমটার লোভ একেবারে মাত্রাছাড়া। বহুদিন ধরেই এদের ওপর ক্ষোভ জমা হচ্ছিল। আজ একটা ঘটনায় তা প্রচণ্ডভাবে ফেটে পড়েছে।

শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘটনাটা কী?'

একটি মধ্যবয়সী লোক বলল, 'এখানে পেশেন্ট ভর্তি হলে দরকার না থাকলেও দশবার এই টেস্ট সেই টেস্ট করা হয়। এখানকার প্যাথোলজিক্যাল টেস্টের চার্জও অন্য জায়গার তুলনায় অনেক বেশি। তাছাড়া ছুতোয় নাতায় ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। হার্ট পেশেন্ট হলে তো কথাই নেই। এটা কর, সেটা কর, পেসমেকার বসাও। পেশেন্ট সেরে গেলেও সহজে তাকে ছাড়তে চায় না। যত বেশিদিন পারে, আটকে রাখে।'

লোকটা আজকের বিশেষ ঘটনাটি না বলে তাঁর পুঞ্জীভূত ক্ষোভের কথা জানিয়ে যাচ্ছে। শরদিন্দু বাধা দিলেন না। তিনি অনুমান করলেন, শেষ পর্যন্ত সে নিশ্চয়ই আজকের প্রসঙ্গে চলে আসবে। তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন।

লোকটা বলতে লাগল, 'চিকিৎসা করাতে এসে এরা কত জনকে পথে বসিয়ে দিয়েছে ভাবতে পারবেন না।' হঠাৎ তার মনে একটা প্রশ্ন দেখা দিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শরদিন্দুকে লক্ষ করে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি এই এরিয়ায় নতুন এসেছেন?'

শরদিন্দু আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ। মাসখানেক হল এসেছি।'

'তাই হবে। এখানকার বাসিন্দা হলে নার্সিং হোমটা সম্পর্কে সব জানতে পারতেন।'

লোকটা বলল, 'এখানে কোথায় থাকেন?'

'বিকাশ'-এ। আমার এক আত্মীয় ওখানে বাড়ি করেছে। তার কাছে উঠেছি।' ইচ্ছা করেই সুরজিতের নামটা করলেন না শরদিন্দু।

লোকটার এবার যেন মনে পড়ে গেল, আসল প্রশ্নটারই উত্তর দেওয়া হয়নি। সে বলল, 'কিছুদিন আগে অনাথ চ্যাটার্জি বলে একজন পেশেন্ট এখানে ভর্তি হয়েছিল। সবে রিটায়ার করেছে। দুই ছেলে, এক মেয়ে। এক ছেলে একটা প্রাইভেট ফার্মে ছোটখাট চাকরি করে। আর এক ছেলে কলেজে পড়ে। মেয়েটার বিয়ে হয়নি। পেনসনের কিছু টাকা, প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুইটির টাকা ব্যাঙ্ক আর পোস্ট অফিসে রেখে মান্থলি ইন্টারেস্ট পায়। মোটামুটি এর ওপরেই ফ্যামিলিটা টিকে আছে। হঠাৎ অনাথবাবুর মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হওয়ায় এখানে ভর্তি হয়। তারপর সিটি স্ক্যান, এম আর আই থেকে কত টেস্ট যে করেছে তার ঠিক নেই। উনি এখন মোটামুটি সুস্থ। বাড়ির লোকেরা অনাথবাবুকে রিলিজ করে দেবার জন্যে নার্সিং হোম অথরিটির হাতেপায়ে ধরছে কিন্তু আরো কিছুদিন অবজারভেশনের ছুতোয় ওঁকে ওরা কেবিনে রেখে দিয়েছে। এদিকে জমানো টাকার অনেকটাই খরচ হয়ে গেছে নার্সিং হোমের বিল মেটাতে। মেয়ের বিয়ে আছে, সংসার চালানোর খরচ রয়েছে। বার বার অ্যাপিল করা সত্ত্বেও নার্সিং হোম অনাথবাবুকে ছাড়ছে না।'

শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন ছাড়ছে না? ওরা কি তার কোনো কারণ দেখিয়েছে?'

'হ্যাঁ। ওরা বলছে, এখনও নাকি অনাথবাবু পুরোপুরি সুস্থ নয়। তাকে রিলিজ করে দেবার পর আবার যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাতে নাকি নার্সিং হোমের ভীষণ বদনাম হয়ে যাবে। আসলে যতদিন ধরে রাখতে পারবে ততই বেশি করে দোহন করার মওকা।'

শরদিন্দু উত্তর না দিয়ে শুনতে লাগলেন।

লোকটা বলে যাচ্ছে, 'অনাথবাবু বড় রাস্তার উলটো দিকে পুরনো যে টাউনশিপ রয়েছে সেখানে থাকে। সব জানার পর ওখানকার লোকজন নার্সিং হোমে চড়াও হয়েছে। অথচ সুরজিৎ মজুমদারের মতো এত বড় একজন ডাক্তার এর সঙ্গে যুক্ত। তাঁকেও বার বার অনাথবাবুদের আর্থিক অবস্থার কথা জানিয়ে ছেড়ে দেবার জন্য রিকোয়েস্ট করা হয়েছিল। উনি কিছুই করেন নি।'

সুরজিতের নাম শুনে চকিত হয়ে ওঠেন শরদিন্দু। 'সুরজিৎ মজুমদার এর সঙ্গে অ্যাটাচড?'

'হ্যাঁ।' তীক্ষ্ণ চোখে লোকটা শরদিন্দুর দিকে তাকায়, 'আপনি তাঁকে চেনেন নাকি?'

উত্তর দিতে গিয়েও থমকে যান শরদিন্দু। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলেন, 'না। এখানে আসার পর ওঁর নাম শুনেছি।'

'ডাক্তার হিসেবে ওঁর তুলনা নেই। কিন্তু টাকা-পয়সার ব্যাপারে একেবারে রক্তচোষা। পয়সা ছাড়া লোকটা কিছু বোঝে না।'

'ডাক্তার মজুমদার কি এখন এই নার্সিং হোমে আছেন?'

লোকটা বলল, 'হ্যাঁ। সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত তিনি এখানে থাকেন।'

দেখা যাচ্ছে, লোকটা সুরজিতের নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখে। তার কথা শুনে শরদিন্দুর মন দুটো কারণে খুব খারাপ হয়ে যায়। প্রথমত, আর্থিক ব্যাপারে সুরজিৎ সম্পর্কে এখানকার মানুষের ধারণা জঘন্য। দ্বিতীয়ত, এখন তিনি নার্সিং হোমেই আছেন। জনতা যেরকম উত্তেজিত হয়ে আছে, গেটটা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে পারলে সুরজিতের ক্ষতি করে দিতে পারে।

কী করবেন, ভেবে উঠতে পারছিলেন না শরদিন্দু। অনাথবাবু নামে যে পেশেন্টটিকে নিয়ে এই তুলকালাম কাণ্ড, তার চিকিৎসার ব্যাপারে সুরজিৎ কতটা জড়িত, কে জানে। তিনি যে নার্সিং হোমে ঢুকে সুরজিতের সঙ্গে কথা বলবেন তারও উপায় নেই। যে লোকটি এতক্ষণ আজকের এই হামলার কারণটা জানাচ্ছিল তাকেও আর দেখা যাচ্ছে না, ক্রুদ্ধ জনতার মধ্যে সে মিশে গেছে। লোকটা থাকলেও তার কাছ থেকে অনাথবাবুর দুর্গতির ব্যাপারে সুরজিতের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা খুঁটিয়ে জেনে নিতে পারতেন। ওদিকে জনতার রোষ এবং উত্তেজনা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। বহুক্ষণ চিৎকার এবং খিস্তিখেউড়ের পর এখন রাস্তা থেকে ইটের টুকরো, খোয়া যা পাচ্ছে তাই তুলে নার্সিং হোমের দিকে ছুঁড়তে শুরু করেছে। ফলে জানালার কাচ ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। আর কী কী ক্ষতি হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না। ভিড়ের ভেতর থেকে একটা দল প্রথম থেকেই নার্সিং হোমের গেট ভাঙার চেষ্টা করছিল।

তাদের ক্রমাগত ধাক্কায় শেষ পর্যন্ত একটা পাল্লার কবজা খুলে যায় এবং সেটা একদিকে কাত হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে মারমুখী লোকজন ভেতরে ঢুকতে শুরু করে। তাঁর প্রাক্তন ছাত্রীটির নিরাপত্তার কী হবে, ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন শরদিন্দু।

নার্সিং হোমে সাধারণ কর্মচারী ছাড়াও ডাক্তার, নার্সরা রয়েছে। জনতার যা মতিগতি, তারা কাউকে রেহাই দেবে বলে মনে হয় না। আজকাল গণপিটুনি বলে একটা শব্দ আকছার শোনা যায়। সেটা শুরু করলে তার ফলাফল কী হবে ভাবতেও সাহস হয় না। তাছাড়া চিকিৎসার জন্য দামি দামি যন্ত্রপাতি আছে। সেগুলো আস্ত থাকবে কিনা, কে জানে। এই নার্সিং হোম চোখের সামনে একেবারে ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাবে।

শরদিন্দুর মনে হল, ভেতর থেকে কেউ যেন ধাক্কা মারতে মারতে তাঁকে নার্সিং হোমটার দিকে নিয়ে চলেছে। তাঁর একার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। তবু একটা চেষ্টা করা দরকার।

কিন্তু গেটের কাছাকাছি পৌঁছুবার আগে দুটো বড় বড় কালো ভ্যান বোঝাই আর্মড কনস্টেবল এবং ইনস্পেক্টর র‍্যাঙ্কের একজন অফিসার এসে হাজির। খুব সম্ভব নার্সিং হোম থেকে থানায় খবর দেওয়া হয়েছিল।

ভ্যান দুটো গেটের সামনে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে অফিসার আর আর্মড পুলিশের বাহিনী দৌড়ে নার্সিং হোমের ভেতর ঢুকে পড়ে।

এখন আর ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না। শরদিন্দু থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। পুলিশ যখন এসে পড়েছে, জনতা মারদাঙ্গাটা অন্তত করতে পারবে না। নার্সিং হোমের প্রপার্টিও রক্ষা পাবে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে দেখা গেল, জনতাকে পুলিশ বাইরে বার করে দিয়েছে। তবে তারা এলাকা ছেড়ে চলে গেল না। গলা ফাটিয়ে নার্সিং হোম অথরিটির বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে লাগল।

উদ্বিগ্নভাবে এধারে ওধারে তাকাতে তাকাতে সেই লোকটাকে আবার দেখতে পেলেন শরদিন্দু। তার উত্তেজিত মুখচোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, সেও ভেতরে ঢুকেছিল কিন্তু পুলিশ তাকে কিছু করতে দেয় নি।

লোকটার কাছে গিয়ে শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'নার্সিং হোমে কী হল?'

লোকটা প্রথমে শরদিন্দুকে ভাল করে লক্ষ করে নি। চমকে উঠে, 'কে?' বলেই চিনতে পারল, 'ও আপনি। পুলিশ অনাথবাবুর বাড়ির লোকজন আর বাইরের দু-চারজনকে রেখে অন্যদের বার করে দিল। নার্সিং হোমের মালিকদের সঙ্গে পুলিশের সামনে অনাথবাবুর রিলিজের ব্যাপারে কথা বলে একটা ডিশিসান নেওয়া হবে। এর পরেও যদি ওঁকে না ছাড়ে, আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব।'

প্রায় ঘন্টাখানেক পর রোগা চেহারার একটি বয়স্ক লোককে নিয়ে সাত আটজনের একটা দল বেরিয়ে এল। তাদের পেছনে পুলিশ অফিসার তাঁর বাহিনীর সঙ্গে এসে সেই কালো ভ্যান দুটোয় উঠলেন।

লোকটা এতক্ষণ উত্তেজনায় টগবগ করছিল। রোগা লোকটিকে দেখিয়ে বলল, 'ওই যে অনাথবাবু! যাক, শেষ পর্যন্ত ওঁকে তা হলে ছাড়ল। আজ আমরা হামলা না করলে আরো কিছুদিন আটকে রেখে বহু টাকা খিঁচত—' বলে লম্বা লম্বা পা ফেলে অনাথবাবুদের দিকে চলে গেল।

শরদিন্দু দাঁড়িয়েই রইলেন। নার্সিং হোমের কাছেই সাইকেল রিকশার স্ট্যান্ড। অনাথবাবুরা সেখান থেকে রিকশায় উঠল। পুলিশ ভ্যান দুটোও চলে গেল।

শরদিন্দু একবার ভাবলেন, ভেতরে গিয়ে সুরজিতের খোঁজ নেবেন কিনা। নার্সিং হোমের দিকে পা বাড়াতে যাবেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন সুরজিৎ তাঁর নতুন মডেলের মারুতি এসটিমে করে গেট পেরিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে ডান দিকে চলে গেলেন। গাড়িটা স্পিড তুলে মুহূর্তে একটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুরজিৎ শরদিন্দুকে দেখতে পান নি। তিনিও সুরজিৎকে ডাকেন নি। একটা ব্যাপারে অন্তত নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, প্রাক্তন ছাত্রটির কোনোরকম ক্ষতি হয় নি।

আর বেড়াতে ইচ্ছা করছিল না শরদিন্দুর। তিনি ঘুরে 'বিকাশ'-এর দিকে হাঁটতে লাগলেন।

রাতে আজও ডিনার টেবলে অন্য দিনের মতো সবাই খেতে বসেছিল।

গোড়ার দিকে সুরজিৎ তাঁর পুরনো মাস্টার মশাইয়ের সম্বন্ধে যতটা আন্তরিক ছিলেন এখন আর তেমনটা নেই। মুখ ফুটে অবশ্য কিছু বলেন না, কিন্তু যেদিন থেকে শরদিন্দু বস্তির গরিব পেশেন্ট আনতে শুরু করেছেন, তখন থেকেই অনেকখানি নিস্পৃহ হয়ে পড়েছেন। তার ওপর সন্তুর পড়াশোনার ব্যাপারে জোর করে নিজের মতামত চাপাতে চাইছেন। এতে সুরজিৎ একেবারেই খুশি নন।

খেতে খেতে এলোমেলো কথা হচ্ছিল। হঠাৎ শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই কি ইউনিভার্সাল কিওর হাউস'-এর সঙ্গে অ্যাটাচড?'

একটু চমকে উঠলেন সুরজিৎ, 'হ্যাঁ। আপনি জানলেন কী করে?'

'আজ বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে ওদিকে গিয়েছিলাম।'

উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে শরদিন্দুর দিকে তাকিয়ে থাকেন সুরজিৎ।

শরদিন্দু বলতে লাগলেন, 'ওখানে অনাথবাবু নামে একজন পেশেন্টকে নিয়ে তখন হুলস্থুল কাণ্ড চলছে। বহু লোক জড়ো হয়েছে। সবাই ভীষণ এক্সাইটেড। ওদেরই একজনের কাছে শুনলাম, তুই ওই নার্সিং হোমের সঙ্গে আছিস।'

সুরজিৎ এবারও চুপ। আগের মতোই পলকহীন শরদিন্দুকে দেখতে লাগলেন।

শরদিন্দু থামেন নি, 'অনাথবাবু নাকি সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও ওকে ছাড়া হচ্ছে না। বেশি টাকা আদায়ের ফন্দি। জনতা এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল যে হাতের কাছে যা পাচ্ছিল নার্সিং হোমের দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগল। তারপর গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকেও পড়ল।'

আস্তে ঘাড় কাত করে সুরজিৎ বললেন, 'হ্যাঁ, একটা খুব বাজে ব্যাপার ঘটে গেছে।'

'তোর জন্য আমার ভীষণ চিন্তা হচ্ছিল।'

'কী ভেবেছিলেন আপনি, লোকগুলো আমাকে অ্যাটাক করবে?'

'এগ্‌জ্যাক্টলি তাই।'

সুরজিৎ বললেন, 'অনাথবাবু আমার পেশেন্ট নয়। আমি তাকে আটকেও রাখি নি। আমার ওপর হামলা করবে কেন?'

শরদিন্দু সুরজিতের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মানুষ উত্তেজিত হয়ে উঠলে কী করে বসবে তার কী কিছু ঠিক আছে? সামনে যাকে পায় তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।'

সুরজিৎ সায় দিয়ে বললেন, 'তা অবশ্য ঠিক।'

শরদিন্দু এবার বললেন, 'তুই কি জানিস, তোর ওপর এখানকার মানুষের ভীষণ ক্ষোভ।'

সুরজিৎ চমকে ওঠেন, 'আপনাকে কে বলল?'

'যারা এখানে হামলা চালাচ্ছিল তাদের একজন।'

'আমার ওপর ক্ষোভের কারণটা কী?'

শরদিন্দু সেই লোকটার মুখে যা শুনেছিলেন হুবহু তা-ই বলে গেলেন। নার্সিং হোমটা অতিরিক্ত লাভের জন্য নাকি প্রয়োজন না থাকলেও পেশেন্টদের নানারকম টেস্ট করায়। যতদিন রাখা উচিত, তার চেয়েও বেশিদিন নানা অছিলায় আটকে রাখে। এ ব্যাপারে এক শ্রেণীর ডাক্তারদের নাকি মদত থাকে।

সুরজিৎ উত্তর দিলেন না।

শরদিন্দু বলেন, 'তোর মতো একজন এত বড় ডাক্তার থাকতে পেশেন্টদের শোষণ করা হচ্ছে, লোকের অভিযোগ এটাই। ক্ষোভের কারণ সে জন্যে।'

সুরজিৎ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'স্যার, চারপাশে যত বড় বড় নার্সিং হোম আছে, সেই তুলনায় 'ইউনিভার্সাল কিওর হাউস'-এর চার্জ কিন্তু কম।'

শরদিন্দু লক্ষ করলেন, তাঁর কথার সঠিক উত্তরটা এড়িয়ে গেলেন সুরজিৎ। যা বললেন নার্সিং হোমের পক্ষে সেটা সাফাই গাওয়ার মতো শোনাল। সুরজিৎ ফের বললেন, 'স্যার, নার্সিং হোম তো চ্যারিটেবল হসপিটাল নয়। প্রফিট না করলে টাকা ইনভেস্ট করবে কেন?'

শরদিন্দু বললেন, 'নিশ্চয়ই প্রফিট করবে। কিন্তু কতটা? পেশেন্টের হয়তো রোগ সেরে গেল কিন্তু শোনা যায় নার্সিং হোমের বিল মিটিয়ে বাড়ি ফিরে অনেকেরই খাবার পয়সা থাকে না।'

সুরজিৎ বললেন, 'এটা বোধ হয় ঠিক নয় স্যার। লোকে অনেক সময় বাড়িয়ে বলে।'

কৈফিয়ৎটা তেমন বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না শরদিন্দুর। এত লোক উত্তেজিত হয়ে হানা দিয়েছে, সেটা নিশ্চয়ই অকারণে নয়। বহুদিনের পুঞ্জীভূত রাগ এবং ক্ষোভ কাল ফেটে পড়েছিল। বিশেষ করে ওই নার্সিং হোমটা সম্পর্কে শরদিন্দুর মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে। চিকিৎসাটা ওদের কাছে বিজনেস ছাড়া কিছু নয়। একমাত্র লক্ষ্য টাকা।

শরদিন্দু বললেন, 'এটা নিশ্চয়ই মানবি, আমার ছাত্রদের সম্বন্ধে যদি কেউ খারাপ কথা বলে সেটা আমার পক্ষে ভীষণ মর্মান্তিক।'

শরদিন্দু কোন দিক থেকে আক্রমণ হানতে চাইছেন, বুঝতে না পেরে খুব সতর্ক ভঙ্গিতে সুরজিৎ বলেন, 'সে তো জানিই। আপনি আমাদের নিজের সন্তানের মতো ভালবাসেন।'

শরদিন্দুকে আপাত দৃষ্টিতে খুশি দেখাল। বললেন, 'তা হলে আমার একটা কথা রাখবি?'

'কী কথা?'

'তুই ওই নার্সিং হোমটা ছেড়ে দে।'

সুরজিৎ বললেন, 'তা কী করে সম্ভব? এটা আমার প্রফেসন স্যার।'

শরদিন্দু জোর দিয়ে বললেন, 'বিরাট প্রপার্টি করেছিস। দুটো লেটেস্ট মডেলের গাড়ি। নিজের বাড়ির চেম্বারে পেশেন্ট দেখলে দুশ টাকা করে ফীজ নিস। রোগীর বাড়িতে গেলে টাকার অঙ্কটা নিশ্চয়ই ডাবল কি ট্রিপল। আমার ধারণা, ব্যাঙ্কেও প্রচুর জমিয়েছিস। আর কত টাকা চারজনের একটা ফ্যামিলির পক্ষে দরকার?'

সুরজিৎ চুপ।

শরদিন্দু বলতে লাগলেন, 'ভবিষ্যৎ যখন সুরক্ষিত, ছেলেদের পড়াশোনা চালানোর খরচ সম্পর্কে যখন কোনোরকম দুশ্চিন্তা নেই তখন টাকার পেছনে ছোটার কোনো মানে হয় না। সুরজিৎ বললেন, 'স্যার, আপনি পুরনো ধ্যানধারণা নিয়েই রয়েছেন। আজকের সোসাইটিতে যার যত টাকা তার তত খাতির, তত প্রতিষ্ঠা। আগেকার দিন আর নেই।'

'তার মানে টাকার জন্যে সব কিছু করা যায়?'

সুরজিৎ জবাব দিলেন না।

শরদিন্দু এবার বললেন, 'আমাদের গরিব দেশে তুই চেম্বারে দুশ টাকা নিস। ইজ ইট নট টু মাচ?'

সুরজিৎ অল্প হেসে বললেন, 'স্যার, আমি যদি টাকাটা পঞ্চাশে নামাই, এক উইকের ভেতর আমার পশার ওয়ান ফোর্থে নেমে যাবে।'

'মানে?'

'লোকে ভাববে আমার ডিমান্ড কমে গেছে। ডাক্তারিটা আমি আর ভাল পারছি না।'

খানিকক্ষণ অবাক হয়ে থাকেন শরদিন্দু। তারপর বললেন, 'তুই যা বলছিস তার তো একটাই অর্থ। যার ফীজ যত বেশি সে তত বড় ডাক্তার।'

সুরজিৎ জবাব দিলেন না।

শরদিন্দু বলতে লাগলেন, 'ঠিক আছে নিজের ফীজ যা ঠিক করেছিস তাতেই স্টিক করে থাক। তবে খুব সাধারণ মানুষ, যাদের উইকার সেকশন বলা হয়, তাদের কথাও একটু ভাব।'

সুরজিৎ বললেন, 'স্যার, আপনি যে ক'দিন আছেন যে পেশেন্টই নিয়ে আসুন, বিনা পয়সায় দেখে দেব।'

স্থির দৃষ্টিতে প্রাক্তন ছাত্রটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন শরদিন্দু। সুরজিতের কথাগুলোর মধ্যে পরিষ্কার একটা ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি বললেন, 'আমি এখান থেকে চলে গেলে গরিব পেশেন্ট দেখা বন্ধ করে দিবি— তাই তো?'

সুরজিৎ চুপ করে থাকেন।

শরদিন্দু এর আগেও সোশাল সারভিসের কথা বলেছেন। কিন্তু পূর্ব বাংলার দরিদ্র পরিবারের সুরজিতের সঙ্গে আজকের ডাক্তার সুরজিৎ মজুমদারের আকাশ পাতাল তফাৎ। আদর্শবাদ, সামাজিক দায়িত্ববোধ— এ সবের সঙ্গে তাঁর সামান্যতম সম্পর্কও নেই।

শরদিন্দু বললেন, 'আমি এসে তোকে বোধ হয় খুব অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছি, তাই না? এখানে

আমার আর থাকা খুব সম্ভব ঠিক হবে না।

'না না, আপনি যে ক'দিন ইচ্ছে থাকুন।' শুষ্ক স্বরে বললেন সুরজিৎ কিন্তু তাঁর বলার মধ্যে আগের সেই আন্তরিকতা নেই। ভদ্রতার খাতিরে বলতে হয়, তাই বলা।

সুরজিতের মনোভাব স্পষ্ট আন্দাজ করতে পারছিলেন শরদিন্দু। তিনি এখানে থাকুন, এটা ওঁর মনঃপূত নয়। হেসে হেসে বললেন, 'আমি এখানে থাকলে কিন্তু সোশাল কমিটমেন্টের কথা বার বার বলে যাব। ওই নার্সিং হোমটা ছাড়তে বলব। তা ছাড়া সন্তুর ব্যাপারটা তো আছেই।'

সুরজিতের মুখে ফিকে একটু হাসি ফুটে ওঠে।

সাত

পুরনো ছাত্রের বাড়িতে থাকা যে আর উচিত হবে না, এটা বুঝতে পারছিলেন শরদিন্দু। কিন্তু সন্তু তাঁকে প্রায় আঁকড়ে ধরে আছে। ছেলেটার কেমন একটা ধারণা হয়েছে, শরদিন্দু এখানে থাকলে নিজের পছন্দমতো পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে। ডাক্তারি পড়ার জন্য সুরজিৎ তার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারবেন না। কিন্তু নার্সিং হোমের সেই ঘটনাটার পর চার দিনও কাটল না। শরদিন্দুকে চলে যেতে হল। কিংবা বলা যায়, তিনি নিজেই চলে গেলেন।

আজ সকালের দিকে বাড়ির চেম্বারে রোগী দেখা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ঘড়িতে দশটা বেজে সাতাশ, এই সময় ইনকাম ট্যাক্স রেইড হল। কুড়ি পঁচিশ জনের বিশাল এক বাহিনী সারা বাড়ির দখল নিয়ে নিল। এদের মধ্যে রয়েছেন বেশ ক'জন সিনিয়র এবং জুনিয়র অফিসার।

যে রোগীটিকে শরদিন্দু দেখছিলেন, তার পরও দু'জন পেশেন্ট অপেক্ষা করছে। নিজের সেক্রেটারি করবীকে ডেকে বললেন, 'যারা এখনও আছে তাদের চলে যেতে বল। কাল ওদের দেখব।'

রোগীরা চলে গেল।

এদিকে শরদিন্দু আজ জনতিনেক বিনা পয়সার পেশেন্ট নিয়ে এসেছিলেন। তাদের প্রথম দিকে দেখানো হয়ে গেছে। তারপর সন্তুকে নিয়ে নিজের ঘরে পড়াতে বসেছেন। ফাউন্ডেশন ডে বলে সন্তুর স্কুল আজ ছুটি।

রেইডের খবর পেয়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে একতলায় নেমে এলেন শরদিন্দু। সুরজিৎও তাঁর চেম্বার থেকে বাইরে চলে এসেছেন।

রেইড পার্টির সবচেয়ে সিনিয়র অফিসারটি নিজের আইডেনটিটি কার্ড বার করে সুরজিৎকে দেখিয়ে কী উদ্দেশ্যে এসেছেন, জানালেন।

অসন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ সুরজিৎ গলার স্বর উঁচুতে তুলে বললেন, 'এ সবের মানে কী? আমি একজন নাম-করা মেডিকেল প্র্যাকটিশনার। বহু লোক আমাকে শ্রদ্ধা করে। আপনারা আমাকে এভাবে হ্যারাস করতে পারেন না।'

বিনীতভাবে অফিসারটি বললেন, 'এটা আমাদের ডিউটি। প্লিজ রাগ করবেন না। দয়া করে আমাদের কাজে বাধা দেবেন না। আর একটা কথা—'

উত্তর না দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে তাকিয়ে রইলেন সুরজিৎ।

অফিসারটি বলতে লাগলেন, 'আমাদের কাজ যতক্ষণ চলবে, কেউ বাড়ি থেকে বেরুতে পারবেন না।'

সুরজিৎ বললেন, 'কিন্তু আমার বাইরে পেশেন্ট আছে। তাদের অ্যাটেন্ড করতে হবে।'

'পেশেন্টদের জানিয়ে দিন, আপনি ঘন্টা তিন চারেক বাদে যাবেন।'

'তার মানে আপনারা আমাকে এতটা সময় আটকে রাখতে চাইছেন?'

অফিসারটি দারুণ ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। শান্ত, উত্তেজনাহীন। হাতজোড় করে বললেন, 'প্লিজ, ওভাবে ভাববেন না স্যার। আমি যা চাইছি তা হল আপনার সহযোগিতা।'

কেউ রাগ করলে বা উত্তেজিত হলে মেজাজ চড়ানো যায়। কিন্তু যে গলার স্বর একটা বিশেষ উচ্চতার বেশি ওপরে তোলে না, সব সময় হাসিমুখ, তাকে কী আর বলা যায়। ভেতরে ভেতরে সুরজিৎ ফুঁসতে লাগলেন। একধারে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন শরদিন্দু। এই অবস্থায় তাঁর কী

বলা বা করা উচিত, স্থির করে উঠতে পারছিলেন না।

অফিসার সুরজিৎকে বললেন, 'কাজ শুরু করে দিচ্ছি। দেরি করলে আপনারও বেরুতে দেরি হয়ে যাবে।'

সারা বাড়ি তোলপাড় করে আড়াই ঘন্টা ধরে তল্লাশি চলল। এমন প্রচুর নগদ টাকা, এন এস সি, কোম্পানি শেয়ার এবং প্রপার্টির ডকুমেন্ট পাওয়া গেল, যেগুলো ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নে দেখানো হয় নি। সব গোপন রেখেছিলেন সুরজিৎ।

অফিসাররা যা যা পেয়েছেন তার দুটো তালিকা তৈরি করে সিনিয়র অফিসারটি বললেন, 'নগদ টাকা, এন এস সি আর অন্য ডকুমেন্টগুলো স্ক্রুটিনির জন্য নিয়ে যাব। আমরা এই জিনিসগুলোই যে নিয়ে যাচ্ছি তার জন্যে নিরপেক্ষ সাক্ষী দরকার।' তিনি তাঁর এক জুনিয়রকে পাঠিয়ে এই রাস্তারই অন্য দুই বাড়ি থেকে দু'জন বয়স্ক ভদ্রলোককে ডাকিয়ে আনালেন। ওঁরা হলেন নরেশনাথ বটব্যাল আর শোভনদেব মৈত্র। নরেশনাথ অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক, শোভনদেব রিটায়ার্ড গভর্নমেন্ট অফিসার।

সিনিয়র অফিসারটি সবিনয়ে তাঁদের বললেন, 'স্যার, আপনাদের কো-অপারেশন খুব দরকার। দয়া করে যে এসেছেন, সে জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ।'

নরেশনাথ এবং শোভনদেব জানতে চাইলেন, সমস্ত রকম সহযোগিতা করতেই তাঁরা রাজি। যে সব টাকা এবং ডকুমেন্ট তাঁরা নিয়ে যেতে চাইছেন, সিনিয়র অফিসার প্রথমে সেগুলো নরেশনাথদের ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে তাঁদের তৈরি তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে বললেন। মেলানো হয়ে গেলে দু'জনেই জানালেন, কোথাও গরমিল নেই, সব ঠিক আছে।

সিনিয়র অফিসার বললেন, 'আমরা যে লিস্টের বাইরে বাড়তি কিছু নিচ্ছি না সে জন্যে আপনাদের উইটনেস হতে অনুরোধ করছি।'

নরেশনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করতে হবে আমাদের?'

'লিস্ট দুটোয় আপনাদের নাম ঠিকানা লিখে দিতে হবে।'

নরেশনাথরা লিখে দিলেন। এবং তাঁদের সামনেই সুরজিৎকে দিয়ে সই করানো হল। তারপর পুরো টিমটা চলে গেল।

নীরব দর্শক হিসেবে একধারে দাঁড়িয়ে সব দেখে গেলেন শরদিন্দু। একটি কথাও বললেন না। অদ্ভুত বিষাদে তাঁর মন ভরে যেতে লাগল।

প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেলে যেমন হয়, বাড়িটার সেই রকম লণ্ডভণ্ড অবস্থা। আবহাওয়া ভীষণ থমথমে। সবাই চুপচাপ। কাজের লোকেরা নিঃশব্দে পা টিপে টিপে হাঁটছে। মুখে কারো কথা নেই।

তারই মধ্যে নিঃশব্দে কোনোরকমে দুপুরের খাওয়া শেষ হল।

তিনটে থেকে কলকাতার একটা চেম্বারে বসেন সুরজিৎ। তারপর দুটো নার্সিং হোম অ্যাটেন্ড করেন। আজ ফোন করে বাইরের সব কর্মসূচি বাতিল করে দিলেন। রেইডের ফলে যে প্রচণ্ড ধাক্কাটা লেগেছে সেটা সামলে ওঠার জন্য সময় চাই।

ওদিকে খাওয়া দাওয়ার পর নিজের ঘরে গিয়ে সুটকেস টুটকেস গুছিয়ে নিয়ে ড্রইং রুমে এসে শরদিন্দু ডাকলেন, 'সুরজিৎ—'

সুরজিৎ তাঁর বেড রুম থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর চুল উস্কখুস্ক, চোখ লালচে। অবাক হয়ে শরদিন্দুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কী স্যার, আপনার হাতে সুটকেস!'

শরদিন্দু বললেন, 'আমি চলে যাচ্ছি।'

'ভেবেছিলাম, আরো কয়েকদিন থেকে যাবেন।'

'না। আর থাকা উচিত হবে না।'

ওদের কথাবার্তার মধ্যে কৃষ্ণা এসে ড্রইংরুমের দরজায় দাঁড়ালেন। তাঁকেও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। শরদিন্দু বললেন, 'এত বড় ডাক্তার হয়েছিস। তোকে নিয়ে গর্ব বোধ করতাম। ভাবতাম, মানুষের মতো মানুষ হয়েছিস। কিন্তু অন্যরকম ধারণা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি—'

'স্যার—স্যার—' কিছু একটা বলতে চেষ্টা করলেন সুরজিৎ। কিন্তু গলায় স্বর ফুটল না। শরদিন্দু প্রাক্তন ছাত্রের দিকে ফিরেও তাকালেন না। সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নিচে নামতে লাগলেন।

বনের বাতাস

বম্বে সিটি থেকে কুড়ি মাইল দূরে জুহু-তারা রোডের এই বিশাল মালটি স্টোরিড বাড়িটার নাম 'আইল্যাণ্ড'। এরই বার তলার একটা ফ্ল্যাটে ড্রেসিং টেবলের সামনে আরামদায়ক নরম কুশনের ওপর বসে ছিল জয়া।

মাটি থেকে প্রায় দেড় শ ফুট উচ্চতায় জয়া যেখানে বসে আছে সেখান থেকে ডাইনে নিচের দিকে তাকালে কাল ফিতের মতো অ্যাসফাল্টের ঝকঝকে মসৃণ রাস্তা। রাস্তাটার এপারে বা ওপারে, চারদিকে বিরাট বিরাট অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। আর আছে ফরেন কোলাবরেশনে তৈরি প্রকাণ্ড ফ্যাশনেবল সব হোটেল। বছরের বার মাসই হোটেলগুলোতে বিদেশি টুরিস্ট, বিশেষ করে বাহেরিন দুবাই কি কুয়েতের জোব্বাজুব্বি পরা কোটিপতি আরবরা ভিড় করে থাকে। সামনের দিকে অ্যাপার্টমেন্ট হাউসগুলোর ফাঁক দিয়ে জুহু ফ্লাইং ক্লাবের উঁচু টাওয়ারটা আকাশে মাথা তুলে রয়েছে।

'আইল্যাণ্ড'-এর পেছন দিকে অগুনতি নারকেল গাছ সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে। নারকেল গাছের ঘেরের পর থেকে জুহু বীচ শুরু হয়েছে। বাদামি বালির এই বেলাভূমি যেখানে শেষ হয়েছে তার বর্ডার থেকে যতদূর চোখ যায়— আরব সাগর। একখানা ঝকমকে নীল আয়নার মতো দিগন্তের ফ্রেমে আটকে আছে যেন।

এখন দুপুর। সময়টাও ডিসেম্বরের শেষাশেষি অর্থাৎ শীতকাল। কিন্তু সমুদ্রের পাড়ে বম্বে শহরে তেমন একটা ঠাণ্ডা পড়ে না। আবহাওয়া অনেকটা বাংলা দেশের ফাল্গুন মাসের মতো। না শীত, না গরম।

এখন, এই দুপুর বেলাতেই জুহু বীচে লোকের ভিড় জমতে শুরু করেছে। কেউ কেউ সমুদ্রে নেমেও পড়েছে। তারপর ঢেউয়ের টানে ভাসতে ভাসতে অনেক দূরে চলে গেছে। বীচ থেকে তাদের কাল কাল ফুটকির মতো দেখায়।

কিছুক্ষণ ধরে সমুদ্রের দিক থেকে জোর হাওয়া দিচ্ছে। ফলে বীচের নারকেল বনে ঘোড়া ছোটাবার মতো একটানা সাঁই সাঁই শব্দ হয়ে যাচ্ছে।

দশ মিনিট পনের মিনিট পর পর আরো একটা শব্দ কানে আসছে। জুহুর পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্ট। সেখান থেকে ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইনসের ওয়েস্ট-বাউণ্ড প্লেনগুলো বিরাট বিরাট বাজপাখিব মতো বাতাস চিরে চিরে কোনাকুনি আরব সাগর পার হয়ে চলে যাচ্ছে।

জুহু বীচের লোকজন, দূরে গভীর নীল সমুদ্র, বাতাসের শব্দ, চারদিকের অ্যাপার্টমেন্ট হাউস, ফ্লাইং ক্লাবের টাওয়ার, প্লেনের আওয়াজ—কোনো দিকেই কিন্তু লক্ষ্য নেই জয়ার। ড্রেসিং টেবলের ডিমের মতো আয়নাটার দিকে তাকিয়ে দুই ভুরুর মাঝখানে ধবধবে ফরসা কপালে গোলাপি রঙের বিন্দির টিপ পরছিল সে।

জয়ার বয়স তিরিশের কাছাকাছি। কিন্তু ঠিক অতটা দেখায় না। গায়ের রং এই বয়সেও আশ্বিনের রৌদ্রঝলকের মতো। ঈষৎ লম্বাটে মুখ। ভরাট গাল দু দিক থেকে ক্রমশ ঢালু হয়ে সরু চিবুকের দিকে নেমে এসেছে। চোখ খুব একটা বড় নয় জয়ার, তবে তাতে লম্বা টান রয়েছে। মণি দুটো কুচকুচে কাল। পাখির মেলে-দেওয়া ডানার মতো ভুরু। গোল মসৃণ গলা। এই বয়সেও কণ্ঠা বা কাঁধের হাড় ফুটে বেরোয় নি, কোমল মাংসে সব কিছু ঢাকা। প্রচুর চুল তার মাথায়। 'মড' মেয়েদের মতো সেগুলো ঘাড় পর্যন্ত ছেঁটে ফেলে নি সে।

আজ দুর্দান্ত সেজেছে জয়া। মেরুন রঙের দামি সিফনের শাড়ি এবং ওই রঙেরই ব্লাউজ। গলায় পরেছে মুক্তোর একটা হার, ডান হাতের মাঝখানের আঙুলে মুক্তোর আংটি, কানে মুক্তোর কানফুল। বাঁ হাতে সোনার ব্যাণ্ডে ফুলের কুঁড়ির মতো ছোট্ট গোল ঘড়ি।

চড়া রং-চং বা উগ্র ধরনের সাজপোশাক একেবারেই পছন্দ করে না জয়া। সে অত্যন্ত শান্ত, মৃদু স্বভাবের মেয়ে। তার সাজসজ্জায় সবসময় একটা স্নিগ্ধ রুচির ছাপ থাকে। কিন্তু আজ সে শুধু মেরুন রঙের শাড়িই পরে নি, ঠোঁটে নখেও গাঢ় রং লাগিয়াছে, পোশাকে দামি পারফিউম ঢেলেছে অনেকটা। এমন কি সকালে ভিলে পার্লের দিকে গিয়ে চীনা হেয়ার ড্রেসারকে দিয়ে নকশা করে চুলও

বাঁধিয়ে এনেছে। এ-সব সে করেছে অজয়ের জন্য। অজয় জমকাল সাজ এবং রংচং খুব পছন্দ করে। কিন্তু অজয়ের কথা এখন নয়, পরে।

জয়া মাঝারি ধরনের একটা ট্র্যাভেল এজেন্সিতে মোটামুটি ভাল চাকরিই করে। নিজের হাতে সাজবে বলে আজ সে অফিসে যায় নি। তা ছাড়া বিকেলে অজয়ের সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে। যেখানে তারা যাবে সেখানে শান্ত পবিত্র মন নিয়েই যাওয়া উচিত। অফিসে নানা ধরনের লোকের সঙ্গে সারাদিন চেঁচামেচি করে রাজ্যের ক্লান্তি আর উত্তেজনা নিয়ে সেখানে যাওয়া ঠিক নয়।

কপালের মাঝখানে টিপটা নিখুঁত করে আঁকা হয়ে গিয়েছিল। বিন্দির লম্বাটে কৌটোটা ড্রেসিং টেবলের একধারে রেখে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল জয়া। তারপর ঘুরে ফিরে প্রকাণ্ড আয়নায় নিজেকে অনেক বার করে দেখল। নাঃ, কোথাও কোন খুঁত নেই। শুধু ক'টা চুল সিঁথির দু ধার থেকে কপালের ওপর উড়ে এসেছিল। সরু দাঁতের চিরুনি দিয়ে সেগুলো সরিয়ে দিতে দিতে জয়া অনুভব করল তার বুকের ভেতরটা ভীষণ কাঁপছে। এখনই না, আজ ভোরবেলা ঘুমভাঙার পর থেকেই কাঁপুনিটা শুরু হয়েছিল। আর এই কাঁপুনি নিয়েই চীনাদের বিউটি পারলার থেকে সে চুল বাঁধিয়ে এনেছে, স্নান করেছে, গ্যাসের উনুনে যা হোক কিছু রান্না করে নিজে খেয়েছে, বাবাকে খাইয়েছে। তারপর নিজের হাতে নিজেকে সাজিয়েছে। অথচ জয়ার যা বয়স এবং জীবনে যে সব ঘটনা বা দুর্ঘটনার ভেতর দিয়ে তার তিরিশটা বছর কেটেছে তাতে এই কাঁপুনি মানায় না। কিভাবে সে এতগুলো বছর কাটিয়ে এল সে কথা পরে।

শুধু এবারই না, গত দু বছরে আজ নিয়ে মোট তিনবার এভাবে সেজেছে জয়া। আর যতবার সেজেছে ততবারই বুকের ভেতর যেন ঝড় ভেঙে পড়েছে।

উড়ন্ত চুলগুলো পরিপাটি করে সিঁথির দু ধারে সরিয়ে দিয়ে চিরুনিটা ব্রাশে আটকে রাখল জয়া। তারপর কবজি উলটে ঘড়িটা একবার দেখে নিল। এখন একটা বেজে পঁচিশ। ঠিক তিনটেয় চার্চগেট স্টেশনের বাইরে ওভারব্রিজের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে অজয়। তার মানে হাতে এখন দেড় ঘন্টার মতো সময় রয়েছে। খুবই অল্প সময়। চার্চগেট এখান থেকে কম দূর তো নয় ; কুড়ি মাইলেরও বেশি হবে। তিনটের ভেতর পৌঁছুতে হলে আর দেরি করা যায় না।

জয়া তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সামনেই প্যাসেজ। প্যাসেজের এ পাশে জয়ার ঘরের পর আরো দুটো ঘর। একটা তার বাবা শিবনাথের, অন্যটা হল লিভিং-কাম-ডাইনিং রুম। একেবারে শেষ মাথায় কিচেন, স্টোর, বাথরুম ইত্যাদি। অবশ্য প্রতিটি ঘরের গায়েও অ্যাটাচড বাথ রয়েছে।

বারো শ স্কোয়ার ফুটের মোজেক-করা টাইলস-বসানো এই ছিমছাম ফ্ল্যাটে মাত্র তিনজন মানুষ থাকে—জয়া, তার বাবা এবং তাদের কাজের লোক এক মধ্যবয়সী বিধবা মারাঠি মেয়েমানুষ। তার নাম তারা।

তারা আজ বাড়িতে নেই। দিন তিনেকের ছুটি নিয়ে কাল বিকেলে ঘাটকোপারে তার এক ভাইয়ের বাড়ি গেছে। ফিরতে ফিরতে পরশু।

তারা না থাকাতে একরকম ভালই হয়েছে। হঠাৎ এত সেজেটেজে জয়াকে বেরুতে দেখলে প্রথমটা অবাক হয়ে যেত তারা, তারপর হইচই বাধিয়ে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলত। সব ব্যাপারেই তার বড় বেশি কৌতূহল। অথচ অজয়ের সঙ্গে আজ জয়া যেখানে যাচ্ছে সেটা আপাতত সে গোপনই রাখতে চায়। তার ইচ্ছা নয়, একেবারে গোড়াতেই সব জানাজানি হয়ে যাক। পরে সময়মতো সবাইকে সে নিজেই জানিয়ে দেবে।

অবশ্য শিবনাথ আজ বাড়িতেই আছেন। জয়ার এত সাজটাজ চোখে পড়লে তিনিও নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যাবেন ; এর আগেও দুবার হয়েছেন। জন্মের পর থেকে তিরিশটা বছর বাবার ছায়ায় ছায়ায় কেটে গেল জয়ার। মুখের দিকে একপলক তাকালেই শিবনাথ তার মনের কথা ধরে ফেলতে পারেন। তার চলাফেরা, তাকানো কিংবা সাজপোশাকে এতটুকু হেরফের দেখলেই বুঝতে পারেন নতুন কিছু ঘটেছে। তবে যত অবাকই হোন, শিবনাথ কখনও কোনো প্রশ্ন করেন না। কোনো বিষয়েই তাঁর বিশেষ কৌতূহল নেই, থাকলেও প্রকাশ করেন না। করলে কোনো কোনো সময় খুবই অস্বস্তিতে পড়তে হত জয়াকে।

বাবার মতো আরো একজন তার চোখ মুখের দিকে তাকিয়েই মনের কথা বুঝে ফেলতে পারেন; তিনি সাধনা মাসি। কিন্তু সাধনার কথা এখন নয়।

প্যাসেজ ধরে ক'পা এগুতেই ভায়োলিনের সুর শুনতে পেল জয়া। কোমল নিখাদে সুরটা বেজে যাচ্ছে। আরেকটু যেতেই চোখে পড়ল, শিবনাথের ঘরের দরজাটা খোলা। ওধারে সমুদ্রের দিকে মুখ করে একটা ডিভানে বসে আছেন তিনি। খানিকটা কোনাকুনি বসার জন্য বোঝা যাচ্ছে বাঁ হাতে বুকের কাছে একটা ভায়োলিন আটকে ডান হাত দিয়ে আস্তে আস্তে ছড় টেনে যাচ্ছেন।

শিবনাথ গান-বাজনার জগতের মানুষ। যৌবনে তিনি ছিলেন নামকরা প্লে-ব্যাক সিঙ্গার। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে তাঁর গান ছাড়া কোনো হিন্দি ফিল্মিমের কথা ভাবা যেত না। আজকাল তিনি অবশ্য গান-টান করেন না ; শিবনাথ এখন একজন মিউজিক হ্যাণ্ড মাত্র। ফিল্মের গানে, বিশেষ করে হিন্দি ফিল্মের গান চড়া সুরের অগুনতি বাজনা শোনা যায়। শিবনাথ সেই বাজনার দলে ভায়োলিন বাজান।

এই বোম্বাই শহরে রোজ গণ্ডা গণ্ডা ফিল্মের গান রেকর্ড হচ্ছে। সেদিক থেকে মিউজিক কমপোজারদের কাছে শিবনাথের ভীষণ ডিম্যাণ্ড। ফিল্ম কোম্পানিগুলো মিউজিক হ্যাণ্ডদের ভাল পয়সা টয়সাও দিয়ে থাকে। কিন্তু টাকা পয়সা সম্পর্কে বিশেষ আকর্ষণ নেই শিবনাথের। মিউজিক কমপোজাররা তিন দিন তাগাদা দিলে তবে একদিন তিনি বাজাতে যান। যেদিন বাজাবেন বলে কথা দেন সেদিন ভোর বেলাতেই বেরিয়ে পড়েন। তারাদেও-এর কাছে গান রেকর্ডিং-এর যে স্টুডিও আছে সারাদিন সেখানে কাটিয়ে রাত্তিরে ফিরে আসেন। যেদিন বাজনা-টাজনা থাকে না সেদিন জুহুর এই ফ্ল্যাট থেকে বেরোন না।

এমনিতেই গান রেকর্ডিং-এর তিন চার দিন আগে মিউজিক হ্যাণ্ডদের নোটেশান দিয়ে দেওয়া হয়। তারা বাড়িতে বসে সেই নোটেশান মিলিয়ে সুর তুলে নেয়। শিবনাথও তাই করে থাকেন। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি ভায়োলিনে ছড় টেনে কোমল নিখাদে যা বাজিয়ে যাচ্ছেন তা কোনো ফিল্মের গানের সুর না। এই সুরটা জয়ার অনেক কালের চেনা। তার ছেলেবেলায় মা যখন তাদের ছেড়ে চলে যায় তারপর থেকে কোনো নির্জন দুপুরে কিংবা মধ্যরাতে শিবনাথ এই সুরটা বাজিয়ে আসছেন। কিন্তু মায়ের কথাও এখন নয়; পরে। তবে এটুকু বলা যায়, ওই সুরটার সঙ্গে আশ্চর্য এক বিষাদ যেন মাখানো।

শিবনাথের ঘরের সামনে এসে কখন যে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, জয়ার খেয়াল নেই। ভায়োলিনের সুরটা শুনতে শুনতে আগেও যা হয়েছে এখন তাই হল ; বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে ঢেউ উঠতে লাগল। একবার সে ভাবল, আজ আর বেরুবে না। পরক্ষণেই অজয়ের মুখ মনে পড়ে গেল তার, অনেক আশা নিয়ে চার্চগেট স্টেশনের কাছে সে অপেক্ষা করবে।

দ্বিধান্বিতের মতো আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আধফোটা গলায় জয়া ডাকল, 'বাবা—'

শিবনাথ শুনতে পেয়েছিলেন। ভায়োলিনে ছড় টানা থামিয়ে তিনি ঘুরে বসলেন।

শিবনাথের বয়স ষাটের কাছাকাছি। মেদহীন ধারাল চেহারা। গায়ের রং কালোও না, আবার ফরসাও না। লম্বাটে মুখ, ভাসা ভাসা বিষণ্ণ চোখ। বড় বড় কাঁচাপাকা চুল অবহেলায় এলোমেলো হয়ে আছে। নাকটা সটান নেমে এসেছে কপাল থেকে। সাধারণ ভারতীয়দের তুলনায় তিনি বেশ লম্বাই ; হাইট পাঁচ ফুট দশ এগার হবে। তাঁকে ঘিরে একই সঙ্গে বিষাদ এবং আকর্ষণ যেন মাখানো রয়েছে।

শিবনাথ বললেন, 'কিছু বলবি?' বলতে বলতেই তাঁর চোখ এসে পড়ল জয়ার ওপর। ধীরে ধীরে সেই চোখে কালো মণির তলা থেকে বিস্ময় উঠে আসতে লাগল যেন।

ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল জয়ার। সে তাড়াহুড়ো করে কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল। তার আগেই শিবনাথ হঠাৎ আবার বলে উঠলেন, 'এই মেরুন শাড়িটা তোকে তো বেশি পরতে দেখি নি। এর আগে দুবার মোটে পরেছিলি, তাই না?'

জয়া চমকে উঠল। শিবনাথ যা বলেছেন তা-ই। এর আগে মাত্র দুবারই এই শাড়িটা পরেছে সে। অজয়ের সঙ্গে আজ যেখানে যাবার কথা, শাড়িটা পরে আগেও দু বার সেখানে গেছে। শিফনের

এই শাড়িটা অজয়ই তাকে এক জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল। অন্য দুবারের মতো সে জয়াকে বার বার অনুরোধ করেছে, আজ যেন এই শাড়িটা পরে তার কাছে যায়।

কিন্তু শিবনাথ যে ব্যাপারটা আগেও লক্ষ করেছেন, জয়া টের পায় নি। সে কী উত্তর দেবে, প্রথমটা ভেবে পেল না। আসলে শিবনাথ হঠাৎ শাড়িটা সম্পর্কে এ রকম একটা প্রশ্ন করবেন, এটা তার ধারণার মধ্যে ছিল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জড়ানো গলায় জয়া বলল, 'হ্যাঁ।'

শিবনাথ এবার দূরমনস্কর মতো বললেন, 'আজ তোকে ঠিক চন্দ্রার মতো দেখাচ্ছে। সাজলে টাজলে তাকে ঠিক এইরকম দেখাত।'

জয়া এবার হকচকিয়ে গেল। চন্দ্রা তার মায়ের নাম। কত কাল পর মায়ের নাম শুনল, জয়া বলতে পারবে না। এ বাড়িতে তার কথা কেউ ভুলেও উচ্চারণ করে না। কেউ বলতে শিবনাথ আর জয়া। অবশ্য সাধনা মাসিও রয়েছেন। প্রত্যেক উইক-এণ্ডে তিনি আসেন। কিন্তু তাঁর মুখেও কয়েক বছরের মধ্যে মায়ের নাম শুনেছে কিনা, জয়া মনে করতে পারল না। তবে এটা সে অনুভব করল, এত বছর বাদেও বাবা মাকে একেবারে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি।

শিবনাথ বললেন, 'তুই কি বেরুচ্ছিস?'

আস্তে মাথা নাড়ল জয়া, 'হ্যাঁ।'

জয়া যে আজ অফিস যায় নি, সেটা আগেই লক্ষ করেছিলেন শিবনাথ। একবার জানতে চেয়েছিলেন তার শরীর খারাপ হয়েছে কিনা। জয়া বলেছিল, তার শরীর ভালই আছে। তখন আর কোনো প্রশ্ন করেন নি শিবনাথ। হয়তো ভেবেছিলেন রোজ একই ধরনের কাজ করে একঘেয়ে লেগেছে, তাই আজ ছুটি নিয়েছে জয়া। মাঝে মধ্যে এক-আধদিন হঠাৎ ছুটি নিয়ে বসে জয়া, তা ছাড়া রবিবারগুলো তো রয়েছেই। ছুটির দিনে পারতপক্ষে সে ফ্ল্যাট থেকে বেয়োয় না, কিন্তু হঠাৎ তাকে সেজেগুজে বেরুতে দেখে সম্ভবত অবাক হয়ে গেছেন শিবনাথ। বললেন, 'কতদূর যাবি?'

এমনিতেই শিবনাথ জয়ার চলাফেরা সম্পর্কে কখনও কোনো প্রশ্ন করেন না। কিন্তু আজ তাঁর কী হয়েছে কে জানে। জয়া বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছিল না। চোখ নামিয়ে জড়ানো গলায় মিথ্যেই বলল, 'এই কাছাকাছিই যাব। গোরেগাঁও-এর দিকে।' সে যে প্রপার বম্বেতে চার্চগেট যাচ্ছে সেটা গোপন রাখল। শিবনাথের কাছে কখনও কোনো কথা লুকোয় না জয়া। কিন্তু অজয়ের ব্যাপারটা নিয়ে কিছুদিন ধরে বাবার সঙ্গে তার লুকোচুরি চলছে।

শিবনাথ আবার বললেন, 'গোরেগাঁওতে কে আছে রে?'

'আমার এক কলিগ—নীতা মেহেরা। আজ ওর ফার্স্ট ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি।'

স্থির চোখে জয়ার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে শিবনাথ বললেন, 'তোকে নেমন্তন্ন করেছে?'

জয়া বলল, 'হ্যাঁ।'

শিবনাথ এবার বললেন, 'কই, প্রেজেন্টেশন নিয়ে যাচ্ছিস না তো?'

জয়া কোনো রকমে বলতে পারল, 'লিঙ্কিং রোড মার্কেট থেকে কিছু কিনে নিয়ে যাব।'

একটু ভেবে শিবনাথ বললেন, 'সঙ্গে টাকা নিয়েছিস?'

'নিয়েছি।'

একটু চুপচাপ। তারপর শিবনাথ আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ফিরতে দেরি হবে তোর?'

অজয় কতক্ষণ আটকে রাখবে, জয়া জানে না। সে আন্দাজে বলল, 'খুব একটা দেরি হবে না। সাড়ে ন'টা দশটার মধ্যেই ফিরে আসব।' একটু থেমে আবার বলল, 'তোমার জন্যে চা করে রান্নাঘরে ফ্লাস্কে রেখে গেছি, বিকেলে মনে করে খেয়ে নিও। শুধু চা খাবে না, বিস্কুট দিয়ে খেও। ফ্লাস্কের পাশেই বিস্কুটের কৌটোটা আছে।'

'আচ্ছা।'

'আর সাতটার সময় ওষুধ খেয়ে নেবে।'

শিবনাথের হাই ব্লাডপ্রেসার; একবার মাইল্ড একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে ঘাড়ের কাছে নিওরালজিক পেইনও আছে। নার্ভের এই যন্ত্রণাটা প্রায়ই তাঁকে ভীষণ কষ্ট দেয়। সেজন্য নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়। প্রত্যেক সপ্তাহে ডাক্তার এসে প্রেসার মাপেন। কিন্তু জয়া মনে করে ওষুধ না দিলে

তিনি খাবেন না। সে যদি ডাক্তারকে খবর না দেয়, প্রেসার চেক-আপ বন্ধ থাকবে। শুধু ওষুধই না, জয়া তাড়া না দিলে কিছুই তিনি খান না। কাজের দিনে দুপুরবেলা সে বাড়ি থাকে না। অফিসে বেরুবার সময় বার বার সে বাবাকে দুপুরে খেয়ে নেবার কথা বলে যায়। তারাকেও বলে যায়, শিবনাথকে খাবার জন্য তাগাদা দিতে। তবু একেক দিন অফিস থেকে ফিরে জয়া দেখে বাবার খাবার পড়ে আছে। আসলে শিবনাথ নিজের খাওয়া দাওয়া সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে ভয়ানক উদাসীন।

শিবনাথ বললেন, 'ঠিক আছে, খেয়ে নেব।'

জয়া বলল, 'ভুলে যেও না কিন্তু—'

'না—না, ভুলব না।'

একটু চুপ। তারপর শিবনাথই আবার বললেন, 'নেমন্তন্ন যখন, রাত্তিরে তুই খেয়ে আসছিস তো?'

সেই রকমই কথা আছে। অজয়ের সঙ্গে সেই কাজটা চুকিয়ে রাত্তিরে কোথাও খেয়ে জুহুতে ফিরে আসবে জয়া। অজয় কোথায় খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে, কোনো হোটেলে কিংবা ওদের বাড়িতে, সেটা অবশ্য তার সঙ্গে দেখা না হলে বলতে পারবে না জয়া। আস্তে করে জড়ানো গলায় সে বলল, 'হ্যাঁ, ওরা খেয়ে আসার কথা বলেছে।'

শিবনাথ বিষণ্ণ একটু হাসলেন, 'আজ আর তা হলে একসঙ্গে বসে খাওয়া হল না।'

জয়া চমকে উঠল। অফিসে চাকরি নেবার পর দুপুরে শিবনাথের সঙ্গে খেতে বসার সময় পায় না সে। তা ছাড়া মাসের মধ্যে পনের যোল দিনই শিবনাথকে গান রেকর্ডিং-এর জন্য স্টুডিওতে কাটাতে হয়। কাজেই ছুটির দিন ছাড়া দুপুরগুলো পুরোপুরি অনিশ্চিত । তবে সকালে বা রাত্রে তারা একসঙ্গে বসে খায়। কিন্তু আজই প্রথম শিবনাথ আর জয়া একসঙ্গে বসে খাবে না।

জয়া জোরে শ্বাস টানল। তারপর আবছা গলায় বলল, 'ওবেলা তোমার খাবার তৈরি করে রেখেছি। রাত্তিরে ফিরে এসে গরম করে দেব।'

শিবনাথ উত্তর দিলেন না।

জয়া আবার কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই শিবনাথ ধীরে ধীরে বললেন,'বেরুতে যখন হবে তখন আর দেরি করিস না।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল জয়ার। সে যে কাজে যাচ্ছে তার আগে সব ছেলেমেয়েই মা-বাবাকে প্রণাম করে। জয়ার একবার ইচ্ছা হল, শিবনাথের পায়ে হাত রেখে আশীর্বাদ চেয়ে নেয়। পরক্ষণেই ভাবল, প্রণাম করতে গেলে বাবা নিশ্চয়ই টের পেয়ে যাবেন। দ্বিধান্বিতের মতো অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে জয়া বলল, 'আমি যাচ্ছি। তুমি দরজাটা বন্ধ করে দাও'—

'আচ্ছা—'

প্যাসেজের শেষ মাথায় বাইরে বেরুবার দরজা। জয়া সেদিকে এগিয়ে এল। শিবনাথও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন। জয়া বেরিয়ে যাবার পর তিনি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বাহিরে লম্বা করিডোর। তার দুপাশে দুটো করে ফ্ল্যাট। জয়াদের ফ্ল্যাটের গায়েই যে ফ্ল্যাটটা সেখানে থাকে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের একজন পাইলট, তার গাবদা গোবদা চেহারার কালো কুটকুটে জাঁহাবাজ স্ত্রী এবং এক গাদা বাচ্চাকাচ্চা। পাইলটটির নাম মাইকেল ফ্লেচার। ওরা কেরেলি কৃশ্চান।

জয়াদের মুখোমুখি যে দুটো ফ্ল্যাট, তার একটাতে থাকে একজন জু—নাম সলোমন আব্রাহাম। দ্বিতীয়টি একজন ইজিপ্সিয়ান বেলি ড্যান্সারের, তার নাম টিয়ারা। টিয়ারা অবশ্য সারা বছর এখানে থাকে না। কায়রো, প্যারিস, লণ্ডন, বেইরুট, টোকিও, ম্যানিলা—গোটা ওয়ার্লড-এর নাইট ক্লাব আর ক্যাসিনোতে মিডল-ইস্টের উত্তেজক বেলি-ড্যান্স দেখিয়ে মাত্র এক মাসের জন্য বম্বের কোনো নাম-করা ফাইভস্টার হোটেলে নাচের কনট্রাক্ট নিয়ে আসে। একমাস সে ইণ্ডিয়ায় থাকে। মাত্র তিরিশটা দিনের জন্য টিয়ারা এই দামি ফ্ল্যাটটা কিনে রেখেছে।

জয়াদের ইলেভেনথ ফ্লোরের মতো এই বিশাল মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং-এর প্রতিটি ফ্লোরেই চারটে করে ফ্ল্যাট। আর প্রতিটি ফ্ল্যাটেই নানা দেশের, নানা জাতের, নানা চেহারার মানুষ। সব মিলিয়ে এ বাড়ির পরিবেশ পুরোপুরি কসমোপলিটান।

করিডোরের এপাশে বা ওপাশে সবগুলো ফ্ল্যাটেরই দরজা বন্ধ। এই দুপুরবেলায় কাউকে দেখাও

যাচ্ছে না। করিডোরটা একেবারে ফাঁকা।

এ একরকম ভালই হয়েছে। এখন বেরুবার মুখে কারো সঙ্গে দেখা হোক, জয়া তা চায় না। বম্বের এই কসমোপলিটান আবহওয়ায় কেউ কারো সম্পর্কেই তেমন কৌতূহল প্রকাশ করে না। তবু বলা যায় না, দেখা হলে পাইলটের জাঁহাবাজ বউ বা ইহুদি সলোমান আব্রাহামের স্ত্রী হয়তো তার এত সাজটাজের কারণ জিজ্ঞেস করতে পারে। তাতে জয়া বিব্রতই হবে।

ডান দিকে করিডোরের শেষ মাথায় লিফট বক্স। জয়া সেখানে গিয়ে বোতাম টিপতেই অটোমেটিক লিফট ঝিঁঝির ডাকের মতো একটানা শব্দ করে ওপরে উঠে এল। সে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

কিছুক্ষণ পর নিচে নেমে বাড়ির সামনের দিকের বিরাট কমপাউণ্ডে এসে জয়া কী ভেবে একবার ওপরে তাকাল। এই দুপুরবেলায় বিরাট বাইশ তলা বাড়িটার কোনো তলাতেই কাউকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু বার তলার ব্যালকনিতে একটি মানুষ রেলিং-এর ওপর দিয়ে ঝুঁকে নিচে তারই দিকে তাকিয়ে আছেন। মাটি থেকে দেড়শ ফুট উচ্চতায় শিবনাথের চোখ মুখ নাক কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবু মনে হচ্ছে তাঁর ঝুঁকে থাকা, দাঁড়ানো বা তাকাবার ভঙ্গি বড় বেশি বিষণ্ণ আর ক্লান্ত। বাবাকে এভাবে আর কখনও দাঁড়াতে দেখে নি জয়া। তবে কি তিনি সব টের পেয়ে গেছেন? জয়ার বুকের ভেতর সেই কাঁপুনিটা স্রোতের মতো যেন ছোটাছুটি করতে লাগল। পলকের জন্য সে ভাবল, ফ্ল্যাটে ফিরে যায়। পরক্ষণেই মনে পড়ল অনেক আশা নিয়ে অজয় চার্চগেট স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। দু দুবার তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে জয়া ; আর কষ্ট দেবার মানে হয় না।

অদ্ভুত এক দ্বিধার মধ্যে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল জয়া। তারপর আস্তে আস্তে মুখ নামিয়ে এলোমেলো পা ফেলে কমপাউণ্ডের বাইরে অ্যাসফাল্টের ঝকঝকে রাস্তায় চলে এল।

অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন বাসের আশায় দাঁড়িয়ে থাকলে তিনটের সময় চার্চগেটে অজয়কে ধরা যাবে না। সামনেই ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠতে উঠতে জয়া বলল, 'সান্তাক্রুজ স্টেশন।'

সান্তাক্রুজে আসতেই সাবার্বন লাইনের একটা ট্রেন পাওয়া গেল। রোজ অফিস করতে হয়। তাই মাসের গোড়াতেই রেলের মান্থলি টিকিট কেটে রাখে জয়া। কাজেই লাইন দিয়ে টিকিট কাটার ঝামেলা নেই। কিন্তু সাবার্বন লাইনে কোনো স্টেশনেই ট্রেন আধ মিনিটের বেশি থামে না। তাড়াহুড়ো করে জয়া একটা ফাস্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়ল।

এই দুপুরবেলায় ট্রেনে বিশেষ ভিড়টিড় থাকে না ; বিশেষ করে ফার্স্ট ক্লাসে। জানালার ধার ঘেঁষে জয়া বসতে না বসতেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

দুধারে হাজার হাজার ফ্যাশনেবল বাড়ি ; মাঝে মাঝে কুড়ি তলা বাইশ তলা হাই-রাইজ বিল্ডিং। ক্বচিৎ আরব সাগর খানিকটা ঢুকে এসে কোথাও খাড়ি তৈরি করেছে। খাড়ি ঘিরে ঝোপ ঝাড়, একটুখানি মাটি, ফাঁকা আকাশে পাখি। সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো এটুকু পার হলেই আবার বাড়ির পর বাড়ি—একটানা, ধারাবাহিক কংক্রিটের জঙ্গল। তার ভেতর দিয়ে ওয়েস্টার্ন রেলের মেরুন রঙের সাবার্বন ট্রেন বল্লমের ফলার মতো ছুটে যাচ্ছে।

দু পাশে বম্বে শহরের ঠাসবুনন দম-আটকানো দৃশ্যাবলীর কিছুই প্রায় দেখছিল না জয়া। ট্রেন চার্চগেটের দিকে যত এগুচ্ছে সেই কাঁপুনিটা দ্রুত বেড়েই চলেছে। এস্রাজে এলোপাথাড়ি ছড় টানার মতো বুকের ভেতর কিছু একটা অনবরত ঘটে যাচ্ছে। আর চোখের সামনে ব্যালকনির ওপর থেকে ঝুঁকে-থাকা শিবনাথের করুণ ক্লান্ত বিষণ্ণ ভঙ্গিটা বার বার ফুটে উঠছে। বাবার এই ছবি তার মাথায় ফিক্সেশনের মতো আটকে যাচ্ছে।

এক সময় জয়ার অজান্তে সাবার্বন ট্রেন চার্চগেটে পৌঁছে গেল।

দুই

চার্চগেট স্টেশনের বিশাল সাত তলা বাড়িটার গায়ে মডার্ন আর্কিটেকচারের ছাপ রয়েছে। যেদিকেই তাকানো যাক—ম্যাগাজিন স্টল, শো-উইণ্ডো, শপিং আর্কেড, রেস্তোরাঁ—সব দারুণ ভাবে সাজানো। ফ্লোর আয়নার মতো ঝকঝকে এবং পরিষ্কার। এখানে ওখানে নিওন আলোয় নানা কোম্পানি এবং

তাদের প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন। কালো বোর্ডে ইলেকট্রনিক ট্রেনের টাইম টেবল মুহূর্তে মহূর্তে ফুটে উঠছে।

ট্রেন থেকে নেমে মানুষের স্রোতে ভাসতে ভাসতে সামনের দিকে এগিয়ে চলল জয়া। দূরে স্টেশনের প্রকাণ্ড গোল ঘড়িতে এখন তিনটে বাজতে পাঁচ। তার মানে ঠিক সময়েই সে পৌঁছে গেছে।

ষাট সত্তর ফুট উঁচু শেডের তলায় লম্বা প্ল্যাটফর্ম। তারপর সারি সারি গেট, সেখানে টিকেট কালেক্টাররা দাঁড়িয়ে আছে।

গেটে মান্থলি টিকেট দেখিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে জয়া স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এল।

চার্চগেটের বাঁদিকে সাবওয়ে, তার ওপারে ওয়েস্টার্ন রেলের গথিক স্ট্রাকচারের বিশাল বাড়ি। সামনের দিকে ওভার-ব্রিজ। ব্রিজের ওধারে ব্রাবোর্ন ষ্টেডিয়াম, কোনাকুনি তাকালে এরোস সিনেমা। ডান দিকে রাস্তাটা সোজা মেরিন ড্রাইভে চলে গেছে।

এধারে ওধারে তাকিয়ে কোথাও অজয়কে দেখতে পেল না জয়া।

কথা ছিল অজয় তিনটের মধ্যে এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে। জয়ার মতো সে-ও আজ অফিসে ক্যাজুয়াল লিভ নিয়েছে। যা অন্যমনস্ক ধরনের ছেলে অজয়, এখানে আসতে ভুলে গেল নাকি? জয়া পায়ে পায়ে ওভার-ব্রিজের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অজয়ের জন্য এখন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

ওভার-ব্রিজের তলা দিয়ে রাস্তাটা ডাইনে গেছে মেরিন ড্রাইভে, বাঁয়ে ফ্লোরা ফাউন্টেনের দিকে। দু দিকেই হাজার হাজার ট্যাক্সি আর প্রাইভেট কার ঢলের মতো ছুটে যাচ্ছে। গাড়ি-মানুষ, ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামের আর্কেডে ঝকঝকে শপিং সেণ্টার, ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসের নানারকম অফিস, কাছে দূরে অগুনতি হাই-রাইজ বিল্ডিং ইত্যাদি দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে পুরো একটি ঘন্টা কেটে গেল। ঘড়িতে যখন কাঁটায় কাঁটায় চারটে, সেই সময় জয়া একবার ভাবল স্টেশনের টেলিফোন বুথ থেকে অজয়দের কোলাবার ফ্ল্যাটে ফোন করে নেবে কিনা। স্টেশনের দিকে সে পা বাড়াতে যাবে, আচমকা অজয়ের গলা শোনা গেল, 'জয়া—'

চমকে ঘাড় ফেরাতেই জয়া দেখতে পেল, ওভার-ব্রিজের সিঁড়িগুলো যেখানে উঠে বাঁক ঘুরেছে তার মাথায় দাঁড়িয়ে আছে অজয়। তার মানে রাস্তার ওপার থেকে ব্রিজ পেরিয়ে সে এসেছে।

অজয়ের বয়স ছত্রিশ সাঁইত্রিশ। ছ ফুটের মতো হাইট। টান টান এরিয়ান চেহারা তার। খাড়া নাক, লম্বাটে চোখ, ঘন ভুরু, ছড়ানো কাঁধ, চওড়া নিভাঁজ কপাল। মাথার চুল অগোছাল, গায়ের রং পালিশ-করা ব্রোঞ্জের মতো। অজয়ের চোখেমুখে এবং তাকানোর মধ্যে এক ধরনের সরল নিষ্পাপ ছেলেমানুষি রয়েছে।

তার পরনে এই মুহূর্তে ফ্লেয়ারের প্যান্ট আর বুশ শার্ট। শার্টের গোটা দুই বোতাম নেই, ভেতরকার গেঞ্জি তাই অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। পায়ে ফোম বসানো চার ইঞ্চি সোলের চপ্পল।

চোখাচোখি হতেই অপরাধীর মতো মুখ করে একটু হাসল অজয়। তারপর দারুণ জোরে হাত নেড়ে একসঙ্গে তিনটে করে সিঁড়ি টপকে প্রায় উড়তে উড়তেই নিচে নেমে এল। জয়া কিছু বলার আগেই বলে উঠল, 'সরি—এক্সট্রিমলি সরি। কতক্ষণ ওয়েট করছ?'

জয়া গম্ভীর মুখ করে বলল, 'পুরো একটি ঘন্টা।'

ঘাড় চুলকে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে অজয় বলল, 'ক্ষমা, মেমসাহেব—ক্ষমা। এবারই লাস্ট। আর কোনোদিন এরকম রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখব না। নেভার—'

'কতবার এই প্রমিসটা করলে?'

'বোধহয় এক শ সাতাত্তর বার। নাকি দুশ সাতাত্তর? সে যাক গে, দিস ইজ লাস্ট।' বলেই মুখটা দারুণ কাঁচুমাচু করে হাত কচলাতে লাগল। একটুক্ষণ বাদে জয়ার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে আস্তে করে আবার বলল, 'আশা করি ক্ষমা পাব।'

অজয়ের কাছে বেশিক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকা যায় না। জয়া হেসে ফেলল, 'ইয়ার্কি হচ্ছে?'

অজয় টান হয়ে দাঁড়িয়ে তালুতে জিভ ঠেকিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করল। তারপর চোখ কুঁচকে মজাদার ভঙ্গি করে হাসতে হাসতে বলল, 'গুড লাক, মেমসাহেব ক্ষমা করেছে।'

কয়েক পলক অজয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল জয়া। তারপর বলল, 'তোমার আসতে এত দেরি হল কেন?'

'কী করব! অফিসে যেতে হয়েছিল—'

'আজ ক্যাজুয়াল লিভ নেবে বলেছিলে।'

'নিয়েছিলাম। কিন্তু একটা এমার্জেন্সি কাজের জন্য অফিস থেকে ডেকে পাঠালে। কোনো রকমে কাজটা সেরে ছুটতে ছুটতে আসছি।' বলতে বলতেই অজয়ের চোখ জয়ার ওপর আটকে গেল। এতক্ষণ সে যেন তাকে লক্ষ করে নি। পলকহীন বেশ কিছুটা সময় তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর মুগ্ধ চাপা গলায় বলল, 'দুর্দান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। লাইক আ প্রিন্সেস।'

চোখ নামিয়ে আধফোটা গলায় জয়া বলল, 'ফ্ল্যাটারি!'

'মোটেই না। যা সত্যি তাই বলছি।'

জয়া উত্তর দিল না। অজয়ের মুগ্ধতা তার খুব ভাল লাগছিল।

একটু পরে অজয় আবার বলল, 'আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে। বেঞ্জামিন সাহেব আমাদের জন্যে ওয়েট করছেন।' বলেই কবজি উলটে ঘড়ি দেখে দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'চারটে পনের। ভীষণ দেরি হয়ে গেছে। চল চল—'

অজয়ের সঙ্গে এলোমেলো হালকা কথাবার্তায় সেই ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিল জয়া। বেঞ্জামিন সাহেবের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুকের তলায় সেই পুরনো কাঁপুনিটা আবার শুরু হয়ে গেল।

এদিকে কথাটা বলেই হাঁটতে শুরু করেছিল অজয়। জয়াও দাঁড়িয়ে থাকে নি, অজয়ের পাশাপাশি সে-ও অন্যমনস্কের মতো পা ফেলে যাচ্ছিল।

জয়া জানে, এখন তারা সোজা মেরিন লাইনসে বেঞ্জামিন সাহেবের বাড়ি যাচ্ছে। বাড়িটা এখান থেকে খুব বেশি দূরে না। হেঁটে গেলে দশ বার মিনিটের রাস্তা। আগেও অজয়ের সঙ্গে কয়েক বার সেখানে গেছে জয়া। মেরিন লাইনসের সেই বাড়ি বা বেঞ্জামিন সাহেব, কেউ তার অচেনা নয়।

চার্চগেট স্টেশনের বাঁ দিকে সাবওয়ে। সিঁড়ি বেয়ে জয়া আর অজয় মাটির তলায় নেমে গেল। পাতালের রাস্তা পেরিয়ে ওপারে গিয়ে উঠতে ছ মিনিটও লাগল না।

ওপরে উঠলেই বাঁয়ে ওয়েস্টার্ন রেলের হেড কোয়ার্টার। তার পেছন দিক দিয়ে ক্রশ ময়দানকে ডাইনে রেখে অ্যাসফাল্টের চকচকে সটান যে রাস্তাটা মেরিন লাইনসে চলে গেছে, জয়া আর অজয় কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে চলে এল।

অজয় সমানে একটানা কথা বলে যাচ্ছিল। জয়া কিছু শুনছিল, বেশির ভাগই কানে ঢুকছিল না। চুপচাপ অজয়ের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সে শুধু অনুভব করেছিল, সেই কাঁপুনিটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বড় বড় এলোপাথাড়ি ঢেউয়ের মতো কী যেন বুকের ভেতরটা বার বার তোলপাড় করে দিচ্ছিল।

যখন তারা ধোবি তালাও-এ মেট্রো সিনেমার কাছাকাছি চলে এসেছে সেই সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল অজয়। জয়ার দিকে ফিরে বলল, 'একটা ঝামেলা হয়ে গেছে।'

জয়া কিছুটা অবাকই হল, এবং উদ্বিগ্নও। বলল, 'কী হয়েছে?'

'তিন জন উইটনেস লাগবে। তাদের কথা একেবারে ভুলে গেছি।'

জয়া উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে রইল।

অজয় এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, 'একবার আমার অফিসে যেতে হবে।'

জয়া জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'উইটনেস হবার জন্যে লোক দরকার হবে না? চল, তিনজনকে ধরে নিয়ে আসি।'

জয়া চমকে উঠল, 'না—না—' অজয় একটা বিদেশি এয়ার লাইনসে কাজ করে। তার কলিগদের প্রায় সবাইকেই চেনে জয়া। অজয়ের সঙ্গে যা সে করতে চলেছে সেই ব্যাপারটা শুধু শিবনাথই না, তার চেনা লোকজনেরাও জানুক, এটা আপাতত জয়া চায় না।

অজয় বলল, 'কী হল? যাবে না কেন?'

জয়া চুপ করে রইল।

জয়ার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই তার মনোভাব চট করে বুঝে নিল অজয়। বলল, 'ঠিক আছে।' একটু থেমে কী ভেবে আবার বলল, 'তা হলে চল, ক্রফোর্ড মার্কেটের কাছে একবার যাই।'

'সেখানে কী?'

'স্টেট গর্ভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীদের একটা হোস্টেল আছে। ওখানে চান্স নেব। এখন এই অফিস আওয়ার্সের ভেতর কাউকে পাব কিনা জানি না। তবে অনেকেই তো ক্যাজুয়াল লিভ টিভ নেয়। কাউকে পেলে উইটনেস হবার জন্যে ধরে নিয়ে আসব।'

জয়া ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল, 'ওদের ভেতর কেউ জানাশোনা বেরিয়ে পড়বে না তো?'

অজয় চোখ কুঁচকে রগড়ের একটা ভঙ্গি করল, 'বেরিয়ে পড়লে স্ট্রেট ভি-টি স্টেশনে চলে যাব। কলকাতা-দিল্লি-মাদ্রাজ-বাঙ্গালোর, কত জায়গা থেকে লোক এসে নামছে ওখানে। যাদের সব চাইতে অচেনা মনে হবে তেমন তিনজনকে সিলেক্ট করে নেব। আর যদি—'

জয়া বলল, 'ইয়ার্কি হচ্ছে!'

অজয় তার কথা শুনেও শুনল না। বলে যেতে লাগল, 'ইণ্ডিয়ান উইটনেসে আপত্তি থাকলে বল। ভি-টিতে না গিয়ে সোজা সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে চলে যাই। একজন আমেরিকান, একজন ফিলিপিনো, একজন নরওয়েজিয়ান —তিন কন্টিনেন্টের তিনজন উইটনেস পাকড়ে আনি। আশা করি ওরা কেউ তোমার জানাশোনা হবে না।'

জয়া মৃদু স্বরে আরেক বার বলল, 'আবার ইয়ার্কি!'

অজয় মজা করে একটু হাসল। তারপর বলল, 'তাড়াতাড়ি চল। এমনিতেই ঢের দেরি হয়ে গেছে। উইটনেস যোগাড় করতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে। তারপর মেরিন লাইনসে গিয়ে বেঞ্জামিন সাহেবকে পাব যে, এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। ওল্ড ম্যান কতক্ষণ আর আমাদের জন্যে ওয়েট করবে!' একটু থেমে আবার বলল, 'এবারও যদি ব্যাপারটা না হয় তা হলে থার্ড অ্যাটেমপ্টটাও আনসাকসেসফুল হয়ে যাবে। না কি বল!'

জয়া উত্তর দিল না।

অজয়রা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে ডান দিকের বিশাল রাস্তাটা ধরে মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই ক্রফোর্ড মার্কেট, মার্কেট টাওয়ারের ছুঁচলো চুড়োটা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মেট্রো সিনেমা পেছনে রেখে সেদিকে হাঁটতে লাগল ওরা।

ক্রফোর্ড মার্কেটের পেছনে গর্ভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীজ হোস্টেলের বাড়িটা প্রকাণ্ড। নিচে সুপারিনটেণ্ডেন্টের অফিসে খোঁজ নিতে জানা গেল চারজন অফিসে যায় নি। তারা ক্যাজুয়াল লিভ নিয়েছে এবং তেতলায় আছে।

অজয়রা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখতে পেল, সামনে দিয়ে লম্বা করিডোর এ মাথা থেকে ও মাথায় চলে গেছে। সেটার গা ঘেঁষে সারিবদ্ধ ঘর।

করিডোর ধরে হাঁটতে হাঁটতে অজয়দের চোখে পড়ল, প্রায় সব ঘরই তালা-বন্ধ। একেবারে শেষ মাথায় এসে একটা ঘর খোলা পাওয়া গেল। সেখানে চারজন যুবক দাবার ছক সাজিয়ে তার ওপর ঝুঁকে আছে।

পায়ের শব্দে খেলোয়াড়রা দরজার দিকে তাকাল। অচেনা একটি যুবক এবং তার সঙ্গে দারুণ সুন্দর একটি মেয়েকে দেখে অবাক হয়ে গেল। বিস্ময়টা খানিকটা থিতিয়ে এলে এক দাবা খেলোয়াড় বলল, 'কাকে চাইছেন?'

অজয় তক্ষুনি হাতজোড় করে বলল, 'আপনাদের। আমরা আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী।'

ওরা চারজন হকচকিয়ে গেল। তারপর প্রায় একই সঙ্গে একই সুরে কোরাসে বলে উঠল, 'কী সাহায্য?'

'বলছি। তার আগে আমাদের যদি ভেতরে যাবার পারমিশান দ্যান—মানে এভাবে দাঁড়িয়ে তো কথা হয় না।'

চার দাবাড়ু সন্দিগ্ধভাবে এক পলক কিছু ভেবে নিল। তারপর খুবই ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আসুন, আসুন—'

জয়াকে নিয়ে অজয় ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। ঘরটা বেশ বড়সড়ই। ব্যাচেলারদের ডেন যে রকম হয়—শার্ট-ট্রাউজার্স-বই-শেভিং বক্স-আয়না-চিরুনি-খবরের কাগজ-সিনেমা ম্যাগাজিন—সব চারদিকে

ছড়ানো-ছিটানো। চারপাশের দেওয়াল ঘেঁষে হাসপাতাল বেডের মতো চারটে 'কট'।

একটা 'কটে' জয়াদের বসতে বলে চার দাবা খেলোয়াড় দারুণ কৌতূহলের গলায় বলল, 'এবার বলুন—'

অজয় হাতজোড় করেই ছিল। বলল, 'তার আগে নিজেদের ইনট্রোডিউস করে নিই। তাতে কথা বলতে সুবিধা হবে। আমি অজয় আর এ হল জয়া —আপনারা—'

দাবা খেলোয়াড়রাও তাদের পরিচয় দিল। চারজনের মধ্যে যে সব চাইতে লম্বা তার নাম অমল মাত্রে। মাথায় যে সব চাইতে খাটো সে মধু জরিওলা। গোলগাল টকটকে ফর্সা চেহারার যুবকটির নাম নবীন শিবদাসানি। আর পাতলা ছিপছিপে মেয়েলি ধাঁচের চোখমুখ যে ছেলেটির, তার নাম রমেশ পুনেকর। তার মানে ওদের দুজন মারাঠি, একজন গুজরাতি, একজন সিন্ধি। মহারাষ্ট্র গভর্নমেন্টে ওরা কাজ করে। কেউ ল্যাণ্ড এ্যান্ড ল্যাণ্ড রেভেনিউতে, কেউ রিলিফে, কেউ হাউসিং-এ, কেউ বা হোম পাবলিসিটিতে।

পরিচয় টরিচয় হয়ে গেলে অজয় বলল, 'জয়া আর আমি লাইফে সেটেলড হতে চাই। এ ব্যাপারে আপনাদের হেল্প ভীষণ দরকার।'

ওরা চারজন হকচকিয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে খানিকক্ষণ মুখ চাওয়াচাওয়ি করে নিল। তারপর মধু অজয়কে বলল, 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

কোনোরকম ধানাই পানাই না করে অজয় এবার সোজাসুজি বলল, 'আমরা বিয়ে করতে বেরিয়েছি। মেরিন লাইনসের এক বাড়িতে ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ওয়েট করছেন। কিন্তু তাড়াহুড়োতে উইটনেস আনতে ভুলে গেছি। আপনারা যদি দয়া করে সাক্ষী হন, আমরা বিয়ে করার একটা চান্স পেতে পারি।' একটু থেমে আবার বলল 'অনেকদিন ধরে এই ভদ্রমহিলার পেছনে ঘুরছি কিন্তু বিয়েটা কিছুতেই হয়ে উঠছে না। আজকের চান্সটা যদি মিস করি, আবার কতদিন এঁর পেছনে এনডিওরেন্স সাইক্লিং চালিয়ে যেতে হবে কে জানে। ধৈর্য আর পারসিভিয়ারেন্সের পরীক্ষা দিতে দিতে পাঁচটা বছর কেটে গেল। এখন বলুন, আপনাদের সহানুভূতি আর সাহায্য কি পাব না?'

জয়া চোখ নিচু করে চুপচাপ বসে ছিল। লজ্জায় তার মুখ আর কানের লতি লাল হয়ে উঠেছে। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় সে ভাবতেই পারে নি এভাবে বিয়ের সাক্ষী যোগাড় করতে হবে। তার ওপর অজয় যা বলছে তাতে কারো দিকে মুখ তুলে তাকানো পর্যন্ত যাচ্ছে না। গলগল করে ঘামতে শুরু করেছিল জয়া, টের পাচ্ছিল জামা টামা ভিজে সপসপে হয়ে যাচ্ছে।

এদিকে রমেশ মধু নবীন এবং অমল কয়েক সেকেণ্ড বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকার পর হুল্লোড় বাধিয়ে দিল। সমস্বরে চেঁচামেচি জুড়ে দিয়ে বলল, 'এমন একটা ব্যাপারে হেল্প করব না মানে, নিশ্চয়ই করব। এ তো আমাদের সেক্রেড ডিউটি। আপনারা আমাদের বন্ধু ভাবতে পারেন।' উৎসাহে তাদের চোখমুখ চকচক করছিল। আসলে এরকম একটা প্রস্তাব নিয়ে কেউ আসতে পারে তা ছিল ওদের কাছে অভাবনীয়। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে উত্তেজনা যেমন রয়েছে, তেমন রয়েছে দারুণ একটা মজা।

অমল ভীষণ আমুদে ছেলে। জয়া যে এ ঘরে রয়েছে এবং মাত্র দশ মিনিট আগেই তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে সেটা বোধহয় ভুলে গিয়েই এক পাক নেচে নিল সে।

অজয় বলল,'দুঃসময়ে আপনারা হেল্প করছেন, ডেফিনিটলি আপনারা আমাদের ফ্রেন্ড। আপনাদের কাছে গ্রেটফুল হয়ে থাকব।'

মধুরা কোরাসে চেঁচিয়ে উঠল,'নট অ্যাট অল।'

চেহারা দেখে যতই আন্দাজ করা যায়, অমলই ওদের মধ্যে বয়সে সবার বড়। হুল্লোড় একটু কমলে হঠাৎ সন্দিগ্ধ গলায় সে বলল,'কিন্তু—' টের পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে একটা খটকা দেখা দিয়েছে।

অজয় একটু উদ্বিগ্ন হল। অমলের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল,'কী?'

'পরে পুলিশের ঝামেলা হবে না তো?'

অজয় কয়েক পলক তাকিয়েই থাকল। তারপর হেসে হেসে বলল,'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এটা একেবারেই জেনুইন কেস। থানা কাছে থাকলে ও-সি'কেই সাক্ষী যোগাড় করে দেবার জন্যে রিকোয়েস্ট করতাম। আপনাদের হোস্টেলটা আগে পেয়ে গেলাম, তাই ঢুকে পড়েছি।' এক দমে কথাগুলো বলে

একটু থামল সে। পরক্ষণেই আবার শুরু করল,'আমার নাম অজয় শর্মা, বাবা লেট মনোহর শর্মা, হোম অ্যাড্রেস ইউ. পি, ডিস্ট্রিক্ট শাহারানপুর, টাউন শাহারানপুর, লোকাল অ্যাড্রেস 'সি-গাল' কোলাবা, বম্বে। কাজ করি একটা ফরেন এয়ারলাইনসে। আর এ হল জয়া ব্যানার্জি , বাবার নাম শিবনাথ ব্যানার্জি কাজ করে একটা ট্রাভেল এজেন্সিতে—' নিজের এবং জয়ার সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য দিয়ে অজয় বলতে লাগল.' টেলিফোন করে জয়া আর আমার অফিস থেকে সত্যি বললাম না মিথ্যে—জেনে নিন।'

অমল একটু লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। সে বলল,'না না, ফোন করার দরকার নেই। আপনার কথাই বিশ্বাস করলাম। তবে কি জানেন, এরকম ব্যাপারে পরে ট্রাবলও তো হয়—'

অজয় বলল,'গ্যারান্টি দিতে পারি আমাদের কেসটা একেবারে সাচ্চা—পুরোপুরি ট্রাবল-ফ্রি। যদি চান তো কাগজে লিখে দিচ্ছি।'

অমল দু হাত নেড়ে বলতে লাগল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে—'

অজয় থামেনি। সমানে সে বলে যাচ্ছে,'আমরা কেউ কাউকে ফুঁসলে আনিনি। আমাদের ভাল করে দেখুন—ফোঁসলাবার বয়েসটা অনেক আগেই পার হয়ে এসেছি।'

তাকে থামাবার জন্য মধু ওধার থেকে বলে উঠল ' দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আপনাদের জন্যে ওয়েট করছেন, বললেন না?'

অজয় ব্যস্ত হয়ে পড়ল,'আরে তাই তো, প্লিজ আপনারা রেডি হয়ে নিন—'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে অমলরা চারজন পোশাক টোশাক বদলে ফিটফাট হয়ে অজয়দের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় আসতেই চোখে পড়ল, ক্রাফোর্ড মার্কেটের টাওয়ার ক্লকে কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা বেজেছে। অজয় চোখেমুখে এবং গলার স্বরে হতাশা ফুটিয়ে বলল,'গুড হেভেনস, বেঞ্জামিন সাহেবকে কি আর পাওয়া যাবে! কতক্ষণ আর বিয়ের আসর সাজিয়ে তিনি বসে থাকবেন! আমার এই চান্সটাও গেল। চলুন চলুন, ট্যাক্সি ধরা যাক—'

ক্রাফোর্ড মার্কেটের উলটোদিকে ফ্রুট জুস আর ফালুদা সরবতের প্রকাণ্ড দোকানটার কাছ থেকে অজয়রা দুটো ট্যাক্সি ধরল। একটা ট্যাক্সিতে অজয় জয়া আর মধু উঠল। অন্যটায় অমল নবীন এবং রমেশ। ঠিক হল, অজয়দের ট্যাক্সি আগে আগে যাবে। অমলদেরটা তার পেছনে আসবে। কেন না অমলরা বেঞ্জামিন সাহেবের ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিস চেনে না। ওরা উঠবার পর ট্যাক্সি দুটো সোজা ধোবি তালাও-এ মেট্রো সিনেমার দিকে দৌড় লাগাল।

খানিকটা যাবার পর আচমকা অজয় চেঁচিয়ে উঠল, 'এই রোখকে, রোখকে—'

ট্যাক্সি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে গেল। দেখাদেখি পেছনের ট্যাক্সিটাও থেমে গেছে। আর তার মধ্যেই দরজা খুলে নেমে পডল অজয়।

জয়া উৎকণ্ঠিতের মতো জিজ্ঞেস করল,'কী হল?'

অমলরা হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে অজয়ের নেমে পড়ার কারণটা জানতে চাইল।

অজয় বলল,'বিয়ে করতে যাচ্ছি। আফটার অল একটা শুভ কাজ। এই সব অকেশানে ফুলটুল তো দরকার হয়। যদিও সিগনেচার বসিয়ে বিয়ে তবু ফুলের মালাটালা থাকলে একটা অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট হয়। আপনারা একটু ওয়েট করুন। আমি ক্রাফোর্ড মার্কেটে যাব আর আসব।'

মিনিট পনেরর মধ্যে দুটো বিরাট ফুলের প্যাকেট নিয়ে ফিরে এল অজয়। মধুদের উদ্দেশে বলল, 'ফুল কিনে মার্কেটে বুথ থেকে ফোন করে একটা রেস্তোরাঁয় টেবল 'বুক' করে এসেছি। আপনারা আমাদের গেস্ট। রাত্তিরে সবাই একসঙ্গে খাব।'

অমল বিব্রতভাবে বলল,'আবার খাওয়ার ঝামেলা করলেন কেন? বেশ যাচ্ছিলাম। হুই হুই করে সাক্ষি দিয়ে চলে আসতাম।'

অজয় বলল, 'আমাদের লাইফে এত বড় একটা অকেশান ঘটতে চলেছে। আপনাদের হেল্প ছাড়া কিছুতেই তা সম্ভব হত না। না খাইয়ে আপনাদের ছাড়তে পারি!' একটু থেমে তক্ষুনি আবার বলতে লাগল,'খাওয়াটা এমন কোনো ব্যাপার নয়। আসলে সবাই মিলে আনন্দ করা—এই আর কি।'

অমল আর কিছুই বলল না। তবে পেছনের ট্যাক্সি থেকে অমলের দিকে তাকিয়ে নবীন বলে

উঠল,'বিয়ের নেমন্তন্ন খাব, আমাদের কিছু একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়া উচিত।

অমল উত্তর দেবার আগেই দারুণ জোরে মাথা এবং হাত টাত নেড়ে অজয় বলল, 'প্লীজ না, কোনোরকম ফর্মালিটি করবেন না—' বলেই কাউকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সামনের ট্যাক্সিটায় উঠে পড়ল। ট্যাক্সিওয়ালাকে বলল, 'মেরিন লাইনস—'

তিন

চার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ট্যাক্সি দুটো মেরিন লাইনসে যে তেতলা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল তার চেহারায় প্রাচীন কালের গন্ধ মাখানো। বহুকাল আগের ইংরেজি বইতে নাইনটিনথ সেঞ্চুরির ইংল্যান্ডের যে-সব ক্যাসেলের ছবি দেখা যায়,বাড়িটা অবিকল তেমনি। অথচ তার চারদিকে মডার্ন আর্কিটেকচারের অগুনতি স্কাইস্ক্রেপার ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে। এই সিটিতে পুরনো বাড়িঘর ভেঙে যেখানে হাই-রাইজ বিল্ডিং তৈরির উন্মাদ প্রতিযোগিতা চলছে সেখানে এরকম একটা বাড়ি কিভাবে এখনও টিকে আছে, সেটাই আশ্চর্য।

ট্যাক্সি থেকে সবাইকে নামিয়ে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে অজয় বলল, 'আসুন—'

বাড়িটার নিচের তলায় তিন চারটে দোকান। তার মধ্যে একটা হল পুরনো রেকর্ডের, একটা পুরনো বাদ্যযন্ত্রের, একটা পুরনো ক্রকারির, আর একটা কিউরিও শপ। এ সবের পাশ দিয়ে ভেতরে যাবার সরু প্যাসেজ। রাস্তা থেকে দেখা যায়, প্যাসেজের শেষ মাথায় ওপরে ওঠার কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির কাছে অল্প পাওয়ারের একটা আলো টিমটিম করে জ্বলছে।

অজয়রা ভেতরে ঢুকে পড়ল। তারপর চওড়া চওড়া কাঠের সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এল। দোতলার একটা দিক জুড়ে কোনো একটা কোম্পানির গো-ডাউন। অন্যদিকে এক চীনা ডেন্টিস্টের চেম্বার আর এলাহাবাদী হেকিমখানার মাঝখানে বেঞ্জামিন সাহেবের ম্যারেজ রেজিস্টেশন অফিস। দরজার ওপর রং জ্বলে যাওয়া একটা সাইনবোর্ডে লেখা আছে: 'গুড লাক ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন সেন্টার, মেরিন লাইনস, বম্বে।'

দরজা খোলাই ছিল। অজয় সঙ্গীদের দিকে ফিরে নিশ্চিন্ত হবার ভঙ্গিতে বলল,'যাক, বেঞ্জামিন সাহেব তাহলে চলে যান নি। বলেই সামনে তাকাল, 'মে উই কাম ইন—'

ভেতর থেকে ভারি ধরনের বয়স্ক গলা ভেসে এল,'কাম ইন প্লিজ।'

আগে আগে অজয়, আর তার পেছনে অন্য সবাই ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ঘরটা প্রকাণ্ড। মেঝেতে বড় বড় চৌকো চৌকো সাদা পাথর বসানো। মাঝখানে পঞ্চাশ ষাট স্কোয়ার ফুট জায়গা জুড়ে পঁচিশ তিরিশ বছর কি তারও আগে একটা কার্পেট পাতা হয়েছিল। সেটার আদি রং কী ছিল, এখন আর বুঝবার উপায় নেই। জায়গায় জায়গায় কার্পেটটা ছিঁড়ে মেঝের পাথর দেখা যাচ্ছে। এই ছেঁড়া কার্পেটের ওপর বার্মা টিকের একটা বড় টেবল, কারুকার্য-করা খানকতক চেয়ার পাতা রয়েছে। মাথার এপর বড় বড় ব্লেডওলা নাইনটিন থার্টি মডেলের পাখা ঝড়াং ঝড়াং করে ঘুরে যাচ্ছিল। দেয়ালের গা ঘেঁষে ভারি ভারি তিন চারটে আলমারি। বেঞ্জামিন সাহেব তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে রেজিস্ট্রেশন ম্যারেজের পুরুতের কাজ করে যাচ্ছেন। এর মধ্যে কয়েক হাজার বিয়ে দিয়েছেন তিনি। তার যাবতীয় রেকর্ড এই সব আলমারিতে ঠাসা রয়েছে। বাঁ দিকে প্রকাণ্ড দুটো গরাদহীন জানালা। জানালা দুটোতে একদা খড়খড়ির পাল্লা বসানো ছিল। অনেক জায়গায় খড়খড়ি ভেঙে গেছে।

এ ঘরের কার্পেট, চেয়ার টেবল, দরজা জানলা, আলমারি—সব কিছুর মধ্যে নাইনটিনথ সেঞ্চুরির একটা আবহাওয়া যেন অনড় হয়ে আছে।

এ ঘরের যেদিকে জানালা সেটা পশ্চিম দিক। এখন সোয়া পাঁচটার মতো বাজে। বাইরে প্রচুর রোদের ছড়াছড়ি, আর আছে অজস্র হাওয়া। জানালা দিয়ে হু হু করে বাতাস আর আলো ঘরে ঢুকে পড়েছে।

বেঞ্জামিন সাহেব টেবলের ওধারে বসে ছিলেন। অজয়দের দেখে উঠে দাঁড়ালেন। 'গুড আফটারনুন অজয়, জয়া—'

অজয় বলল, 'গুড আফটারনুন আঙ্কল—

বেঞ্জামিন সাহেবকে তারা আঙ্কল বলে।

জয়া ক্যাসেলের মতো এই বাড়িটায় ঢোকার পর থেকেই অনুভব করছিল, বুকের ভেতরকার সেই কাঁপুনিটা দশগুণ বেড়ে গেছে। একটানা ঢাকের বাজনার মতো কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে স্নায়ুতে। আর বার বার বাবার মুখটা ফুটে উঠছে তার চোখের সামনে। আবছা গলায় সে কোনো রকমে বলতে পারল, 'গুড আফটারনুন আঙ্কল।'

বেঞ্জামিন সাহেবের বয়স সত্তর বাহাত্তর। চুল সাদা ধবধবে, নাকের তলায় চৌকো পাকা গোঁফ। টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো নাক, বড় বড় চোখে মজা আর ছেলেমানুষি যেন মাখানো রয়েছে। গায়ের রং একসময় টকটকে ছিল এখন চামড়া কুঁচকে সোনরে জালি জালি মতো হয়ে গেছে।

পরনে ঢোলা ট্রাউজার্স, কাঁধের ওপর যার ফিতে বাঁধা। ট্রাউজার্সের তলায় ডাবল-কাফ দেওয়া শার্ট গোঁজা রয়েছে। চোখে পুরু লেন্সের রোল্ডগোল্ড ফ্রেমের গোল চশমা; কালো কারে বাঁধা পকেট ঘড়ি। গোটা চেহারার মধ্যে ঠাকুরদা সুলভ একটা ব্যাপার আছে। আচমকা তাঁকে দেখলে আইনস্টাইনের কথা মনে পড়ে যায়।

বেঞ্জামিন সাহেব গোয়াঞ্চি পিদ্রু অর্থাৎ গোয়ার খ্রিস্টান। এই বম্বে শহরে নিজেদের সমাজে যত বিয়ে হয় তিনি তাতে পুরুতগিরি করেন। শুধু তাই নয়, অন্য সমাজের এবং অন্য ধর্মমতের ছেলেমেয়েদের বিয়ের জন্যও গর্ভমেন্টের পারমিশন নিয়ে এই ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিস খুলেছেন। মোট কথা, যে কোনো সমাজের বিয়েতেই পুরুতগিরি করা তাঁর জীবিকা।

বেঞ্জামিন সাহেব এবার অমলদের দিকে তাকালেন, 'এরা?'

অজয় বলল, 'আমাদের বিয়ের উইটনেস' বলে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

বেঞ্জামিন সাহেব সস্নেহে সবাইকে বললেন, 'বসো তোমরা—'

অজয়রা বসলে তিনিও টেবলের ওধারে তাঁর চেয়ারটিতে সবার মুখোমুখি বসলেন। তারপর অজয়কে বললেন,'ইউ আর লেট বাই টু আওয়ার্স। আমি আর কিছুক্ষণ দেখে চলে যাচ্ছিলাম—'

অজয় কাচুমাচু মুখে দেরি করে আসার কারণটা জানাল। বিশেষ করে সাক্ষী যোগাড় করার ব্যাপারটা যে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল তার ওপর জোর দিল এবং কিভাবে অমলদের নিয়ে এসেছে তার নিখুঁত একটা বিবরণও দিয়ে গেল।

বেঞ্জামিন হাসতে হাসতে বললেন,' তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। তুমি যেরকম ফরগেটফুল, শেষ পর্যন্ত আজকের বিয়ের ডেটটা মনে রাখতে পেরেছ, তাই যথেষ্ট।'

অজয় হাসল। বাকি সবাই দেখাদেখি হেসে ফেলল। কিন্তু জয়া কারো কথাই শুনছিল না, দূরমনস্কের মতো জানালার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে ছিল সে। বাবার মুখ তার চোখের কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে যেন ফুটে উঠছিল।

বেঞ্জামিন সাহেব এবার অজয়কে জিজ্ঞেস করলেন,'এবার সব ঠিক আছে তো? অন্য দু বারের মতো হবে না?'

অজয় বলল,'আমার দিক থেকে এভরিথিং ইজ অলরাইট, আমি তো পাঁচ বছর ধরেই রেডি হয়ে বসে আছি। আপনি জয়াকে জিজ্ঞেস করুন।'

বেঞ্জামিন সাহেব আস্তে করে ডাকলেন,'জয়া, মাই চাইল্ড—'

জানালার বাইরে দু-আড়াই শ গজের মধ্যে মেরিন লাইনসের নতুন ফ্লাই-ওভার। তার ওপারে চৌপাট্টি বীচের একটুকরো বাদামি অংশ এবং তার ওপর দিগন্ত পর্যন্ত একটানা গাঢ় নীল আরব সাগর। অরেক দিকে ছবির মতো সাজানো মালাবার আর কামবালা হিলের অগুনতি হাই-রাইজ বিল্ডিং। এই বিকেলবেলায় চৌপাট্টির দিকে হাজার হাজার সাগরপাখি উড়ছিল। ফ্লাইওভার আর মেরিন ড্রাইভের রাস্তা দিয়ে পোকার মতো কত যে প্রাইভেট কার কি ট্যাক্সি ছোটাছুটি করছিল! আবছাভাবে সেসব দেখতে দেখতে চমকে উঠল জয়া। দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল,'আমাকে কিছু বললেন আঙ্কল?'

বেঞ্জামিন সায়েব জোরে জোরে মাথা নাড়লেন,'ইয়েস মাই চাইল্ড। আশা করি এবার তুমি মনঃস্থির

করে এসেছ।'

জয়া কিছু বলল না। তার হৃৎপিণ্ডের ভেতর সেই অদৃশ্য ঢাকের বাজনাটা সমানে চলছিলই। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে তো ঘুরছেই। তা ছাড়া আরব সাগর থেকে উঠে আসা বিকেলের অফুরন্ত আরামদায়ক বাতাসও রয়েছে। তবু জয়া ঘেমে নেয়ে উঠছিল।

বেঞ্জামিন সাহেব আপন মনে বলে যেতে লাগলেন, 'এতদিনে দ্বিধাটা যে কাটিয়ে উঠতে পেরেছ, তাতে আমি খুশি। প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি, তোমরা সুখী হও।' শেষদিকে তাঁর গলা আবেগে ভারি হয়ে এল। মুখচোখ দেখে এই মুহূর্তে তাঁকে বড় আন্তরিক আর শুভাকাঙ্ক্ষী মনে হচ্ছে। বেঞ্জামিন সাহেব সত্যি সত্যিই জয়া এবং অজয়কে স্নেহ করেন।

একটু চুপচাপ।

তারপর বেঞ্জামিন সাহেব মজা করে বললেন, 'যাক, থার্ড অ্যাটেমপ্টে বিয়েটা তা হলে ঘটল। বেটার লেট দ্যান নেভার।'

অজয় দ্রুত একবার জয়াকে দেখে নিয়ে কী ভাবল। তারপর খুব আস্তে করে বলল, 'এখনও ভরসা নেই। আগে সই টইগুলো হয়ে যাক। তখন বুঝব, ব্যাপরটা সত্যি সত্যি ঘটল।'

বেঞ্জামিন সাহেব খুব সম্ভব শুনতে পাননি। তিনি হেসে হেসে বলতে লাগলেন, 'ফার্স্ট বিয়ের নোটিশ দিয়েছিলে তোমরা নাইনটিন সেভেনটি ওয়ানে, আর এই থার্ড নোটিশ দিলে সেভেনটি সিক্সে। একটা বিয়ে হতে পুরো পাঁচটি বছর লেগে গেল।'

অজয় বলল, 'এরকম আর কিছু ক্লায়েন্ট জুটলে আপনার প্রফেশানে লালবাতি জ্বেলে দিতে হবে।'

বেঞ্জামিন সাহেব প্রাণ খুলে কিছুক্ষণ হেসে নিলেন, 'যা বলেছ।' তারপর বললেন, 'এবার তবে ফর্মালিটিগুলো সেরে ফেলি।' বলে উঠে গিয়ে একটা আলমারি খুলে ছাপানো ফর্ম, জয়াদের বিয়ের নোটিশ টোটিশ, সব নিয়ে এলেন।

জয়া শূন্য চোখে এক পলক কাগজগুলো দেখল। অনুভব করল, জামার ভেতর স্রোতের মতো ঘাম নামছে। আর বাবার চেহারা ক্রমশ বড় হয়ে হয়ে মেরিন লাইনসের এই পুরনো আমলের ঘর, বেঞ্জামিন সাহেব, অজয়, অমলরা চারজন, দূরে চৌপাট্টি বীচ, আরো দূরে আরব সাগর বা মালাবার হিল—সব কিছু আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। তাঁকে ছাড়িয়ে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না জয়া। হঠাৎ দু হাতে মুখ ঢেকে ঝাপসা গলায় সে বলে উঠল, 'আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন—'

চোখের পলকে গোটা ঘরখানায় অদ্ভুত স্তব্ধতা নেমে এল আর এরই মধ্যে টেবিলের ওপর মাথা রেখে চাপা অস্পষ্ট শব্দ করে কাঁদতে লাগল জয়া। এর আগে আরো দুবার এভাবে কেঁদেছে সে।

এমন দৃশ্য বা ঘটনা অজয় এবং বেঞ্জামিন সাহেবের কাছে নতুন নয়। জয়ার কান্নার শব্দ শুনতে শুনতে কিছুক্ষণ বিষণ্ণ মুখে বসে রইলেন বেঞ্জামিন সাহেব। তারপর আস্তে আস্তে উঠে জয়ার কাছে চলে এলেন। তার মাথায় সস্নেহে একটা হাত রেখে বড় কোমল স্বরে ডাকলেন, 'মাই চাইল্ড—'

জয়া জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল, 'আমি পারব না, আমি পারব না—'

'লাস্ট মোমেন্টে এসে বার বার তুমি পিছিয়ে যাচ্ছ কেন? কোথায় তোমার বাধা?'

জয়া উত্তর দিল না, কেঁদেই যেতে লাগল।

বেঞ্জামিন সাহেব আবার বললেন, 'অজয়ের কথাটা ভেবে দেখ। কত আশা নিয়ে ছেলেটা একেক বার আসছে। ওকে বার বার দুঃখ দেওয়াটা কি ঠিক হবে?'

জয়া এবারও কিছু বলল না, উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে যেতে লাগল। বেঞ্জামিন সাহেব খুব কোমল স্বরে বলতে লাগলেন, 'জয়া, মাই চাইল্ড—আমার কথা শোন। মুখটা তোল—'

জয়া মুখ তুলল না।

এক ধারে অমলরা চুপচাপ বিমূঢ়ের মতো বসে আছে। হুল্লোড় বাধিয়ে তারা সাক্ষি দিতে এসেছিল। কিন্তু ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে আসার পর বিয়ের কনে যে এভাবে কান্না জুড়ে দেবে এটা তারা আগে ভাবতে পারে নি।

জয়ার ঠিক পাশেই বসে ছিল অজয়। তার চোখেমুখে পলকের জন্য দুঃখ, ক্লান্তি এবং হতাশা

মাখানো একটা ছায়া পড়েই মিলিয়ে গেল। আস্তে করে সে বেঞ্জামিন সাহেবকে বলল, 'জয়াকে আর কিছু বলবেন না আঙ্কল।' তারপর কপালে একটা আঙুল ঠেকিয়ে মজার ভঙ্গি করে বলল, 'ব্যাড লাক। এবারও বিয়েটা করে উঠতে পারলাম না। কিন্তু আমিও ছাড়ছি না। আরো দু বছর, চার বছর, আট বছর—যতদিন লাগে ওয়েট করব। এনডিওরেন্স কাকে বলে, দেখিয়ে ছাড়ব।'

বেঞ্জামিন সাহেব কিছু বললেন না। দুঃখিতভাবে একবার মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

অজয় বলল, 'আপনাকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি আঙ্কল। আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি—'

বেঞ্জামিন সাহেব বললেন, 'ডাজ নট ম্যাটার। শুভ কাজটা হলে আমি খুব খুশি হতাম অজয়।'

অজয় হাসল, 'আমি জানি। আপনি আমাদের স্নেহ করেন কিন্তু কী আর করা যাবে! যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলব—'

'কী?' বেঞ্জামিন সাহেব মুখ তুলে তাকালেন।

অজয় একটু ভাবল। তারপর ঠোঁট কামড়ে কুণ্ঠিতভাবে বলল 'আপনার ফীজ—'

জোরে জোরে প্রবলভাবে হাত এবং মাথা নাড়তে লাগলেন বেঞ্জামিন সাহেব, 'নো নো, কিছুতেই না। যে কাজ করি নি তার জন্যে কিছুতেই আমি পয়সা নিতে পারব না।'

অজয় বলল, 'কিন্তু এটা আপনার প্রফেশান।'

'এর আগেও বলেছি তোমাদের ব্যাপারে প্রফেশানের কথা ভাবি না।'

কথাটা ঠিক। আগের দুবারও শেষ মুহূর্তে সই-সাবুদের সময় ঠিক এইভাবেই কেঁদেছিল জয়া। কাজেই বিয়েটা আর হয়ে ওঠে নি। ফলে অনেক জোরজার করা সত্ত্বেও বেঞ্জামিন সাহেব তাঁর পুরুতগিরির ফী'টা নেন নি।

অজয় বলল, 'দেখুন, বার বার এসে আপনাকে বিরক্ত করব অথচ কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। আপনিও ফীজ নিচ্ছেন না। আমার এত খারাপ লাগছে।'

'নাথিং নাথিং। ওটা নিয়ে তুমি ভেব না।'

একটু চুপচাপ। তারপর বেঞ্জামিন সাহেব আবার বলতে লাগলেন, 'কত বছর ধরে বিয়ের পর বিয়ে দিয়ে আসছি। আমার ক্রেডিটে কম করে দশ বার হাজার বিয়ে রয়েছে। তোমাদের হিন্দু মাইথোলজিতে প্রজাপতি আছে না? আমি হলাম সেই প্রজাপতি। আমার কাছে প্রেমিক প্রেমিকাদের একবারের বেশি দুবার আসতে হয় না। এলেই বিয়ে। শুধু বিয়েই না, যারা আমার কাছ থেকে ম্যারেজ সার্টিফিকেট নিয়ে গেছে তারা সবাই হ্যাপি কাপল। আমার এতগুলো বছরের ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কেরিয়ারে একটাই শুধু আপসোস—তোমাদের বিয়েটা দিতে পারলাম না। তিন তিন বার তোমরা নোটিশ দিলে। তিন বারই ফেইলিওর। তবে আমি হাল ছাড়ছি না। গ্রেভ ইয়ার্ডে যাবার আগে তোমাদের বিয়েটা আমি নিশ্চয়ই দিয়ে যাব। তার জন্যে এক শ বছরও যদি বাঁচতে হয়—বাঁচব। এমন একটা ডিসক্রেডিট নিয়ে আমি মরতে চাই না।'

অজয় হাসল, 'আমার মতো আপনিও তা হলে এনডিওরেন্স টেস্ট দিতে চান?'

'রাইট।' বেঞ্জামিন সাহেব মাথা নাড়লেন।

আরো কিছুক্ষণ এলোমেলো কথার পর অজয় বলল, 'অনেকক্ষণ এসেছি। এবার আমরা উঠব আঙ্কল। তার আগে বিয়ের নোটিশটা রিনিউ করে নিন।'

বেঞ্জামিন সাহেব রেকর্ড বই বার করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার কবে বিয়ে করতে আসছ, বল। তারিখটা লিখে নিই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল অজয়। তারপর বলল, 'একটা তারিখ দিয়ে কী হবে। জানেনই তো, আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা পুরোপুরি আনসার্টেন। এক কাজ করুন আঙ্কল, প্রত্যেক মাসের সাত তারিখে একটা করে ডেট রেখে যান। জয়ার করুণা কবে পাব জানি না। তবে আমি লাক ট্রাই করে যাব। এ মাসে না হলে ও মাসে, নইলে তার পরের মাসে। দেখি কবে কপাল খোলে!' বলে রগড়ের ভঙ্গিতে হাসতে লাগল।

বেঞ্জামিন সাহেবও হাসতে লাগলেন। রেকর্ডের খাতায় প্রতি মাসে একটা করে নোটিশের তারিখ

বসাতে বললেন, 'গুড আইডিয়া। গড ব্লেস ইউ মাই চাইল্ড। আমারও শুভেচ্ছা রইল। প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি এবার এলে যেন তোমরা হাসিমুখে ফিরতে পার; আর যেন নতুন করে নোটিশ রিনিউ করতে না হয়।' আগেও দু-বার এই কথাই বলেছেন তিনি।

অজয় গম্ভীর স্বরে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ—' আসার সময় ক্রফোর্ড মার্কেট থেকে দুটো ফুলের প্যাকেট কিনে এনেছিল। সে দুটো একধারে ছোট কাশ্মিরি টেবলের ওপর পড়ে আছে। ফুলের প্যাকেট তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল অজয়।

দেখাদেখি আর সবাই উঠে পড়েছে। এমন কি জয়াও। এখন আর সে কাঁদছে না। তবে চোখ দুটো ফোলা এবং লালচে। সারা মুখে আশ্চর্য এক দুঃখ আর বিষাদ ছড়িয়ে আছে। ঝাপসা গলায় জয়া বলল, 'চলি আঙ্কল—'

বেঞ্জামিন সাহেব বললেন, 'এস। গড ব্লেস ইউ।'

মেরিন লাইনসের পুরনো ক্যাসেলের মতো বাড়িটা থেকে অজয়রা বাইরে বেরিয়ে এল।

চার

এখন ছ'টার মতো বাজে। বম্বে শহরে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত হয় দেরিতে। এখনও তাই দিনটা ফুরিয়ে যায় নি। পশ্চিম দিকে আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে অনেক দূরে আরব সাগরে নেমেছে ঠিক সেইখানে সূর্যটা প্রকাণ্ড সোনার থালার মতো স্থির হয়ে আছে। তবে রোদের জোর আর নেই, আরামদায়ক নরম সোনালি আলোয় চারদিক ভেসে যাচ্ছে।

বাইরে এসে অজয় অমলদের বলল, 'শুধু শুধু আপনাদের কষ্ট দিলাম। কোনো কাজই হল না। আই অ্যাম সরি, এক্সট্রিমলি সরি—'

অমলরা চারজন একই সঙ্গে বলে উঠল, 'আরে না না, কষ্টের কী আছে। বরং শুভ কাজ না হওয়াতে হই-হুল্লোড়টা করা গেল না।'

অজয় হাসল, কিছু বলল না।

অমল এবার বলল, 'এবার আমারা তা হলে চলি।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে অজয় ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'সে কি, যাবেন মানে! রাত্রে না খাইয়ে আপনাদের ছাড়ছে কে? হোটেল 'বুক' করা রয়েছে না?'

অমল বলল, 'ক্ষমা করবেন, আপনার এই অনুরোধটা কিছুতেই রাখতে পারব না। বিয়েটা হয়ে গেলে নিশ্চয়ই খেতাম।'

অজয় হাসতে হাসতে বলল, 'আমর ভরসা আছে, বিয়েটা আজ হোক, কাল হোক আর দশ বছর বাদেই হোক, একদিন না একদিন হবেই। তখন খাওয়াতে তো হবেই। টেবল যখন বুক করেই ফেলেছি তখন খাওয়াটা না হয় অ্যাডভান্সই হয়ে যাক। একটা কাজ তো এগিয়ে থাক।'

অমলরা সামন্য হেসে বলল, 'প্লিজ, ওটা পারব না। আচ্ছা চলি—' একটু থেমে কী ভেবে আবার বলল, 'উইটনেসের জন্যে আপনাদের ভাবতে হবে না। যখন দরকার হবে আমাদের খবর দেবেন। সাক্ষি দিয়ে যাব। কবে বিয়েটা হয় আমাদেরও দেখবার ইচ্ছে। এনডিওরেন্স টেস্টে আমরাও নাম লেখাতে চাই।'

'অবশ্যই, অবশ্যই। আপনাদের সঙ্গে কনট্যাক্ট রাখব। যে কোনো দিন আপনাদের হেল্প দরকার হয়ে যাবে।'

অমলরা হাসতে হাসতে ক্রফোর্ড মার্কেটের দিকে চলে গেল।

এখন, সন্ধের আগে আগে এই সময়টায় অফিস ছুটি হয়ে গেছে। কাছের এবং দূরের সব রাস্তায়, নতুন ফ্লাইওভারে ঢলের মতো প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি, বাস, স্টেশন ওয়াগন ছুটে চলেছে। আর আছে অগুনতি মানুষ। হাজার হাজার মানুষ স্রোতের মতো চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

মুখ নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল জয়া। বুঝতে পারছিল অজয় যদিও বেঞ্জামিন সাহেব বা অমলদের সঙ্গে মজা করে, রগড় করে বিয়ের ব্যাপারটাকে হালকা করে নিয়েছে, তবু ভেতরে ভেতরে খুবই কষ্ট পেয়েছে। আমুদে স্বভাব বলে বাইরে থেকে দেখে তার দুঃখটা ঠিক টের পাওয়া যায় না।

কিন্তু জয়া তাকে সাত আট বছর ধরে চেনে। অজয়ের চাউনি, হাসি বা কথা বলার বিশেষ ভঙ্গি দেখে সে বলে দিতে পারে কখন তার দুঃখ আর কখনই বা আনন্দ।

জয়া নিজেও কম কষ্ট পাচ্ছে না। সে চায় বিয়েটা হয়ে যাক। সে জন্য বার বার মেরিন লাইনসের পুরনো ক্যাসলের মতো ওই বাড়িটায় ছুটে আসছে। কিন্তু নিজের ভেতরকার সেই পাহাড়ের মতো বাধাটা কিছুতেই পেরুতে পারছে না।

অজয় বলল, 'এখন কী করবে বল—'

জয়া ধীরে ধীরে মুখ তুলল। আবছা গলায় বলল, 'কী করব?'

'রাস্তায় স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। চল, কোথাও গিয়ে বসি—'

'কোথায় যাবে?'

একটু ভেবে অজয় বলল, 'আমার ফ্ল্যাটেই চল না।'

জয়া চমকে উঠল, 'তোমার ফ্ল্যাটে!'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়ল অজয়, 'গেলে আমার চামড়া বাঁচত।'

'মানে!'

'ভেরি সিম্পল। ভেবেছিলাম থার্ড অ্যাটেমপ্টে সাকসেসফুল হবই। বিয়েটা এবার হয়ে যাবে। কিন্তু এবারও হোপলেস ব্যাপার।' দুই হাতের তালু চিত করে দিয়ে একটা ভঙ্গি করল অজয়। বলতে লাগল, 'আসার সময় মাকে বলে এসেছিলাম, আজ থেকে তোমার ছেলের নাম আর আনম্যারেডদের লিস্টে থাকছে না। দস্তুরমতো একজন রেসপনসিবল ম্যারেড ম্যান হয়ে সে ফিরে আসবে।' মা হেসে বললেন, 'এর আগেও তো দুবার এই কথা বলেছিলি।' আমি বললাম, 'এবার তুমি দেখে নিও। ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে তোমার ছেলের বৌকে নিয়ে স্ট্রেট তোমার কাছে চলে আসব। এখন আমার অবস্থাটা কনসিডার কর জয়া।'

জয়া চুপ করে রইল।

অজয় আবার বলল, 'একা ফিরে গেলে মা শুধু হেসেই যাবে আর বলবে, 'তেত্রিশ বছর বয়স হল। একটা মেয়ের পেছনে সাত আট বছর ধরে ঘুরছিস। তবু বিয়েটা করে উঠতে পারলি না! কী ছেলে রে তুই!' তখন আমি কী বলব বল তো। তুমি সঙ্গে গেলে মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমাকে সেভ করতে পারবে।'

অজয়ের মাকে জয়া চেনে। অনেক বার সে ওদের কোলাবার ফ্ল্যাটে গেছে। ভারি ভালমানুষ তিনি। ভীষণ হাসিখুশি আর স্নেহপ্রবণ। কথা যত বলেন, তার চাইতে হাসেন ঢের বেশি। ছেলের মতোই তাঁর স্বভাবটা আমুদে। কথায় কথায় রগড় করতে, মজা করতে ভালবাসেন। জয়া গেলে কী করবেন, কী খাওয়াবেন, ভেবে পান না। ছোটাছুটি করে এটা ওটা এনে, নিজের কাছে জয়াকে বসিয়ে অনবরত তাড়া দিতে থাকেন, 'খা রে মেয়ে, খা—'

কিন্তু এই স্নেহময়ী মহিলাটির কাছে যেতে আজ আর সাহস হল না জয়ার। নিজেকে ভয়ানক অপরাধী মনে হচ্ছিল। ভয়ে ভয়ে সে বলল, 'না, আজ তোমাদের বাড়ি যাব না।'

জয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে অজয় হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, 'আজ যাওয়াটা অবশ্য তোমার পক্ষে একটু ডিফিকাল্ট। ঠিক আছে, আমি একাই মাকে ফেস করব। স্ট্রেট সারেণ্ডার করে বলব, এবারও হল না মা।'

জয়া আবার মুখ নামিয়ে নিয়েছিল। সে কিছু বলল না।

অজয় বলল, 'মায়ের কাছে যখন যাবে না তখন চল চৌপাট্টি বীচে গিয়ে একটু বসি।'

নিঃশব্দে অজয়ের পাশাপাশি হাঁটতে লাগল জয়া। নতুন ফ্লাইওভারের তলা দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা মেরিন ড্রাইভে এসে পড়ল। বাঁ দিকে তারাপোরওয়ালা অ্যাকুয়েরিয়াম, তারপর পার্শি আর হিন্দু জিমখানা, ওয়াংখেড় স্টেডিয়াম। তারও পর একই মাপের এবং প্রায় একই চেহারার অগুনতি বাড়ি কাতার দিয়ে পর পর দাঁড়িয়ে আছে। দূরে নরিম্যান পয়েন্টে আর ব্যাক বে রিক্লেমেশনে বিরাট বিরাট সব হাই-রাইজ বিল্ডিং। ডান দিকে মেরিন ড্রাইভ আধখানা বৃত্তের মতো বেঁকে মালাবার হিলসে উঠে গেছে। সেখানে হ্যাঙ্গিং গার্ডেনে বাচ্চাদের জন্য প্রকাণ্ড জুতোর মতো চেহারার একটি বাড়ি দেখা

যাচ্ছে। পার্কটাকে ঘিরে যেদিকে যতদূর চোখ যায় শুধু স্কাইস্ক্রেপার আর স্কাইস্ক্রেপার। সামনের দিকে অফুরন্ত আরব সাগর।

অজয় আর জয়া বাঁ দিকের ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে চৌপাট্টি বীচের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। চারপাশে এখন মানুষ আর মানুষ। সামনের রাস্তায় টপ স্পিডে ছুটে যাচ্ছে হাজার হাজার প্রাইভেট কার আর ট্যাক্সি।

অজয় হঠাৎ বলল, 'একটা দারুণ ঝামেলা হয়ে গেছে জয়া—'

জয়া আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'দাদাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম এবার আমার বিয়েটা হয়ে যাচ্ছে। দাদা অ্যাডভান্স টেলিগ্রাম করে কনগ্র্যাচুলেট করেছে। জানিয়েছে বৌদি আর বাচ্চাদের নিয়ে শিগগিরই বম্বে চলে আসছে। অনেক দিন আমাদের বাড়িতে বড় রকমের কোনো আনন্দটানন্দ হয় নি। দাদা ঠিক করেছে এখানে এসে তোমার অনারে দারুণ একটা ফাংশান করবে। এদিকে শালা আমাদের বিয়েটাই হয়ে উঠল না।' বলে হাতজোড় করে বলল, 'সরি ফর দ্য ল্যাংগুয়েজ।'

অজয়দের বাড়ির সবাইকেই চেনে জয়া। ওরা দু ভাই। অজয় আর বিজয়। বাবা নেই। বিজয় ইণ্ডিয়ান আর্মির মেজর ; এখন রয়েছে সাদার্ন কম্যাণ্ডে। ওদের হেড কোয়ার্টার মাদ্রাজ। বিজয় বিয়ে করেছে একটি তামিল মেয়েকে। মাদ্রাজেই ওদের আলাপ, তারপর প্রেম, অবশেষে বিয়ে। বিজয়ের স্ত্রী মোহিনী ভরতনাট্যমের নামকরা আর্টিস্ট। ওদের দুটি বাচ্চা—একটি ছেলে, একটি মেয়ে।

বিজয় আর মোহিনীকে দুবার মোটে দেখেছে জয়া। আর্মিতে ছুটিছাটা কম; তাই হুটহাট মাদ্রাজ থেকে ওরা চলে আসতে পারে না। তা ছাড়া মোহিনীরও প্রায়ই নাচের প্রোগ্রাম থাকে।

যে দুবার জয়া ওদের দেখেছে, তাতেই ভীষণ ভাল লেগে গেছে। বিজয় খুবই হুল্লোড়বাজ। সারাক্ষণ হইচই বাধিয়ে সবাইকে মাতিয়ে রাখতে ভালবাসে। এদিক থেকে অজয়ের সঙ্গে তার স্বভাবের প্রচুর মিল। মোহিনী বিজয়ের মতো হইচই করতে পারে না। তবে ভারি সরল আর প্রাণবন্ত মেয়ে সে। সাউথ ইণ্ডিয়ায় এত নাম তার, কিন্তু একটুও দেমাক নেই। দেখতেও চমৎকার। রংটা কালো হলেও খাড়া নাক, লম্বা টানা চোখ, কোঁচকানো কোঁচকানো অজস্র চুল, মেদহীন শরীর, সরু কোমর, তার তলায় বিশাল অববাহিকা, সটান নিভাঁজ হাত, লম্বা, মসৃণ আঙুল। রংটা ছাড়া দ্রাবিড়িয়ানদের কিছুই পায় নি সে; তার চেহারার বাদবাকি সব কিছুই এরিয়ান।

অজয় আবার বলে উঠল, 'দাদা এলে মহা ফ্যাসাদ হয়ে যাবে। ও যা ছেলে, একটা কিছু কাণ্ড না করে ছাড়বে না।'

চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছিল জয়া। সে উত্তর দিল না; তবে বুকের ভেতর এক ধরনের অস্থিরতা আর নার্ভাসনেস অনুভব করতে লাগল। বিজয় দারুণ আনপ্রেডিক্টেবল; কী যে করে বসবে কে জানে।

এক সময় ওরা চৌপাট্টি বীচের কাছে এসে রাস্তা পেরিয়ে ওপারে বাদামি বালির বেলাভূমিতে নেমে গেল।

বীচে এখন প্রচুর ভিড়। অফিস ছুটির পর গাদা গাদা লোক এখানে এসে বসে আছে। আর আছে নানা দেশের টুরিস্ট—কালো কুচকুচে আফ্রিকান, কুতকুতে চোখওলা জাপানী কি কোরিয়ান, জোব্বাজুব্বি-পরা আরব, গাবদা গোবদা রাশিয়ান, ধারাল চেহারার স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, ব্রোঞ্জের মূর্তির মতো স্প্যানিশ ইত্যাদি ইত্যাদি। থিকথিকে ভিড়ের ভেতর ছুঁচের মতো ফোঁড় তুলে তুলে ভেলপুরিওলা, বেলুনওলারা, মশলাদার চাটওলারা এধারে ওধারে ছোটাছুটি করছিল।

জয়া আর অজয় একটু নিরিবিলি দেখে একেবারে জলের ধার ঘেঁষে গিয়ে বসল।

সূর্যটা এর মধ্যে ডুবে গেছে। তবে এখনও ভাল করে সন্ধে নামে নি। আবছা ফিকে অন্ধকার উলঙ্গ বাহার শাড়ির মতো চারদিকের সব কিছুকে জড়িয়ে আছে। সামনে আরব সাগরে সিলুয়েট ছবির মতো কয়েকটা স্টিমবোট আর মোটর লঞ্চ ভেসে বেড়াচ্ছিল। হাজার হাজার সি-গাল ডানায় বাতাস চিরে চিরে সারা দিন পর এই সন্ধেবেলায় পাড়ের দিকে ফিরে আসছে। পেছনে মেরিন ড্রাইভ আর চৌপাট্টি ড্রাইভের রাস্তায় মার্কারি ল্যাম্পগুলো জ্বলে উঠেছে। উঁচু উঁচু হাই-রাইজ বিল্ডিং-এর মাথায় নানা রঙের নিওন আলোয় নাম-করা সব কোম্পানি আর এয়ার লাইনসের বিজ্ঞাপন ফুটে

উঠতে শুরু করেছে।

জয়া অন্যমনস্কর মতো বালির ওপর আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি কাটছিল। আচমকা অজয় বলে উঠল, 'আচ্ছা তোমার কত বয়েস হল?'

এমন একটা প্রশ্নের কথা এই মুহূর্তে ভাবে নি জয়া। সে হকচকিয়ে গেল, 'আমার বয়েস দিয়ে কী হবে?'

'আরে বলই না! একজ্যাক্ট এজটা বলবে কিন্তু—'

একটু চুপ করে থেকে জয়া বলল, 'তিরিশ চলছে।'

'তিরিশেও তুমি অ্যাডাল্ট হলে না।'

'মানে?'

'এই বয়েসে বম্বের সিক্সটি পারসেন্ট মেয়ে মিনিমাম দুটো বিয়ে আর দুটো ডাইভোর্স করে ফেলে। আর তুমি তিন বার অ্যাটেম্পট নিয়ে একটা বিয়েই করে উঠতে পারলে না। নাবালিকা।'

অস্পষ্ট গলায় জয়া কী একটা বলল, বোঝা গেল না।

অজয় বলল, 'তোমার মতো ভীরু মেয়ে আমি আর কখনও দেখিনি।' একটু থেমে বলল, 'ভয়টা কিসের বল তো?'

জয়া এবার উত্তর দিল না। সে জানে এটা ঠিক ভয় না, অদৃশ্য অথচ প্রচণ্ড শক্তিমান এক দ্বিধা তার মধ্যে সর্বক্ষণ কাজ করে যায়। তার মাথায় ফিক্সেশানের মতো শিবনাথ যেন আটকে আছেন। বাবার কাছে কোনো কিছুই গোপন নেই জয়ার। শুধু অজয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কে কথাটা শিবনাথকে সে জানায় নি। দু একবার অজয়কে অবশ্য তাদের ফ্ল্যাটে নিয়ে গেছে জয়া ; বাবার সঙ্গে আলাপও করিয়ে দিয়েছে। তার বেশি কিছু না। শিবনাথ হয়তো ধরে নিয়েছেন অজয় তার বন্ধুই। কিন্তু দু'জনের বন্ধুত্ব কতটা গভীর, অজয় এবং জয়া পরস্পরের কতটা কাছাকাছি চলে এসেছে, সেটা নিশ্চয়ই তিনি টের পান নি। অজয়ের যত কাছেই সে চলে আসুক তবু জয়া টের পায়, অনুভব করে—বাবার কাছে থেকে এক ইঞ্চিও দূরে সরে যেতে পারে নি। সে যেন দেখতে পায় তার চারদিকে, যতদূর চোখ যায়, বাবার দীর্ঘ ছায়া স্থির হয়ে পড়ে আছে। শিবনাথের ছায়ার মধ্যেই উনত্রিশটা বছর পার করে তিরিশও শেষ করতে চলেছে। বাবা যেন অদৃশ্য দাগ টেনে টেনে তার চলাফেরার সীমানা ঠিক করে দিয়েছেন। জয়ার সাধ্য নেই সীমানা পেরিয়ে বাইরে পা বাড়ায়। ছোট ছেলেরা সুতোয় ঢিল বেঁধে আঙুলে জড়িয়ে যেভাবে ঘোরায় জয়াও ঠিক সেই ভাবে শিবনাথকে ঘিরে সেই কোন ছেলেবেলা থেকে অনবরত ঘুরে চলেছে। আস্তে করে সে বলল, 'ভয় না।'

অজয় বলল, 'তা হলে বার বার এরকম করছ কেন?'

'আজ না, তোমাকে আরেক দিন বলব।' শিবনাথকে ঘিরে তার দ্বিধার কথাটা আগে কখনও অজয়কে বলে নি জয়া। অজয়ও জোর করে জানতে চায় নি। কোনো ব্যাপারেই তার অশোভন কৌতূহল নেই।

অজয় কিছুক্ষণ জয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'কবে বলবে?'

'শিগগিরই একদিন।'

'ও.কে—'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর হঠাৎ অজয় বলে উঠল, 'ফ্র্যাঙ্কলি একটা কথার উত্তর দেবে? আমি কিছু মনে করব না।'

'কী?' ভয়ে ভয়ে মুখ তুলল জয়া।

'এই বিয়ের ব্যাপারে তোমার নিজের কি কোনো আপত্তি আছে? আই মীন, প্রথম দিকে হয়তো ইমপালসের মাথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল। পরে ভেবে দেখেছ—'

জয়া হকচকিয়ে গেল। অজয়ের কথা শেষ হবার আগেই তার একটা হাত ধরে গভীর আবেগের গলায় বলল, 'না না, প্লিজ না। আমাকে ভুল বুঝো না। তোমাকে আমি চাই। এ বিয়ে হবে না, এমন কথা আমি ভাবতে পারি না।'

অজয় উত্তর দিল না। সময় কেটে যেতে লাগল।

এদিকে অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। চৌপাট্টি বীচের ভিড় ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে যাচ্ছে। মেরিন ড্রাইভে এখন আর গাড়ির স্রোত নেই। মাঝে মাঝে দুএকটা সত্তর মাইল স্পিড তুলে ছুটে যাচ্ছে। আরব সাগরের হুহু হাওয়া ছাড়া চারদিকের শব্দ ঝিমিয়ে পড়েছে। ওধারে অনেক দূরে সমুদ্রের তলা থেকে রুপোর থালার মতো গোল চাঁদ উঠে এসেছিল। টুনি লাইটের মতো অসংখ্য তারা দিয়ে এখন আকাশের সারা গা সাজানো।

কতক্ষণ বসে ছিল, ওদের খেয়াল নেই। একসময় জয়া বলে উঠল, 'চল, এবার যাওয়া যাক।'

অজয় উঠতে উঠতে বলল, 'হ্যাঁ, চল—'

চৌপাট্টি বীচ পেছনে রেখে মেরিন ড্রাইভের আয়নার মতো ঝকঝকে রাস্তা পেরিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা চার্চগেট স্টেশনের কাছে এসে পড়ল।

অজয় বলল, 'চল, তোমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে যাই।'

জয়া বলল, 'কিছু দরকার নেই। আমি চলে যাচ্ছি। রাত হয়ে গেছে, তুমি বাড়ি যাও—'

অজয়রা প্রপার বম্বেতেই থাকে। হেঁটে গেলে এখান থেকে পনের কুড়ি মিনিটের রাস্তা। অজয় কিন্তু শুনল না, জয়ার সঙ্গে স্টেশনের ভেতর ঢুকে পড়ল। আর ঢুকেই হঠাৎ কী মনে পড়তে ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'একেবারে ভুলে গেছি। এক্ষুনি একটা ফোন করতে হবে।'

জয়া জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

'এসই না—'

স্টেশনের ভেতরে অনেকগুলো পাবলিক টেলিফোনের বুথ। এখন সেখানে ভিড়টিড় নেই। একটা বুথে ঢুকে ডায়াল করে অজয় বলতে লাগল, 'যে টেবলটা 'বুক' করেছিলাম কাইণ্ডলি ক্যানসেল করে দেবেন। এক্সকিউজ মি ফর দ্য ইনকনভেনিয়েন্স।'

জয়া বুঝতে পারছিল, বিয়ের পর হোটেলে গিয়ে খাওয়া দাওয়ার যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, অজয় সেটা নাকচ করে দিল। জয়ার মন গভীর বিষাদে ছেয়ে যেতে লাগল। মনে হল, কান্নার মতো কী একটা যেন তার গলার কাছে উঠে এসে ডেলা পাকিয়ে যাচ্ছে।

বুথ থেকে বেরিয়ে হোটেলের বিষয়ে একটা কথাও বলল না অজয়। প্ল্যাটফর্ম টিকিট কিনে জয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল।

এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। জয়া একটা ফার্স্ট ক্লাস কমপার্টমেন্টে উঠে জানালার ধারে এসে বসল। অজয় বাইরে প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সে রগড়ের ভঙ্গিতে বলল, 'সবাই বিয়ে করে বউ নিয়ে বাড়ি ফেরে। আমাকে শালা ল্যাং ল্যাং করে একাই ফিরতে হবে।' বলেই জিভ কাটল, 'খারাপ ল্যাঙ্গুয়েজের জন্যে ক্ষমা চাইছি—'

তার কথা শেষ হতে না হতেই গার্ডের হুইসিল শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক ট্রেন স্টার্ট নিয়ে দৌড় শুরু করল।

পাঁচ

জুহু-তারা রোডে তাদের সেই মাল্টি-স্টোরিড অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে জয়া যখন ফিরে এল, দশটা বেজে গেছে। নিচে লিফট বক্সের কাছে আসতেই সে দেখতে পেল, বুড়ো আব্রাহাম সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। এক্স-মাসে বড় বড় কনফেকশানারদের শো-উইণ্ডোতে সান্তাক্লসের যে মূর্তি সাজানো থাকে, দাড়িটা বাদ দিলে আব্রাহাম সাহেবের চেহারা অবিকল সেই রকম। বুড়ো মানুষটা জাতে ইহুদি। জয়াদের উলটোদিকের ফ্ল্যাটটা ওঁর। আব্রাহাম সাহেব, তাঁর স্ত্রী এবং মারাঠি এক বাঈ ছাড়া ওঁদের ফ্ল্যাটে আর কেউ থাকে না। সেকেণ্ড গ্রেট ওয়ারের পর নতুন ইজরাইল স্টেট যখন হল তখন থেকেই ইণ্ডিয়ার জু'রা সেখানে চলে যাচ্ছিল। গত দশ বার বছরের মধ্যে আব্রাহাম সাহেবের ছেলেমেয়ে এবং আত্মীয়স্বজনরা ইণ্ডিয়া ছেড়ে ইজরাইল চলে গেছে। তেল আভিভে আব্রাহাম সাহেবের ছেলেদের এখন মস্ত বিজনেস। বার বার মা-বাবাকে নিয়ে যাবার জন্য তারা তাগাদা দিয়েছে, এখনও দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আব্রাহাম সাহেব বা তাঁর স্ত্রী দু একবার বেড়াতে গেলেও সেখানে থাকেননি। ছেলেদের যুক্তি হল, এতকাল আমাদের হোমল্যাণ্ড ছিল না, তাই দেশে দেশে নোম্যাডদের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি।

এখন আমাদের নিজস্ব একটি দেশ হয়েছে ; স্বদেশ ছেড়ে হা-ঘরের মতো পরের মাটিতে পড়ে থাকব কেন? আব্রাহাম সাহেবের হিসেব অন্যরকম। তিনি মনে করেন, ইণ্ডিয়ায় আট দশ জেনারেশন ধরে তাঁরা আছেন। এখানেই তাঁদের জন্মকর্ম, সব কিছু। জন্মভূমি ছেড়ে তাঁরা যাবেনই বা কেন? তিনি ইণ্ডিয়া ছেড়ে যান নি। মনেপ্রাণে আব্রাহাম সাহেব ভারতীয়।

যৌবনে এই বম্বে শহরে কাপড়ের ব্যবসা করতেন তিনি। প্রচুর পয়সা করেছিলেন। তার বেশির ভাগটা দিয়ে বড় বড় কোম্পানির শেয়ার কিনেছেন আর ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করেছেন। বছরের শেষে মোটা ডিভিডেণ্ড এবং ইন্টারেস্ট পান। এখন আর ব্যবসা করেন না। সুদের টাকায়, খুব ভালভাবেই চলে যায়। শখ বলতে সপ্তাহে একদিন মহালছমীতে গিয়ে রেস খেলা। তবে একটা লিমিট আছে, উইকে পাঁচ শ টাকা। দ্বিতীয় হবিটি হল, খবরের কাগজে নিয়মিত চিঠি লিখে যাওয়া। চিঠিগুলোর বিষয়বস্তু হল, ভারতের, বিশেষ করে বম্বে শহরের উন্নতি। কোথায় রাস্তা চওড়া করতে গিয়ে দুষ্প্রাপ্য একটি গাছ কাটা হয়েছে, অমনি একখানা চিঠি লিখে ফেললেন। কোথায় ল্যাভাটরি নেই, কোথায় কোন ঝোপড়পট্টিতে হেলথ সেন্টার দরকার, মাড আইল্যাণ্ডের পাখিদের কারা মেরে ফেলছে, সবুজ গাছপালা কেটে কোথায় উঁচু উঁচু কংক্রিটের জঙ্গল উঠছে—এসব ব্যাপারে নিয়ম করে প্রতিদিন অন্তত একখানা চিঠি তাঁর লেখা চাই। বম্বে মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন যে সিটিজেন্স কমিটি করেছে তিনি তার ভাইস প্রেসিডেন্ট।

এই বিশাল মেট্রোপোলিসে কেউ কারো দিকে ফিরেও তাকায় না। যে যার নিজেকে নিয়েই আছে। কিন্তু আব্রাহাম সাহেব আলাদা ধাঁচের মানুষ। এই মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিংয়ের প্রতিটি ফ্ল্যাটে ঘুরে ঘুরে তিনি সকলের খোঁজ নেন। সবার সম্বন্ধেই তাঁর অঢেল স্নেহ আর আন্তরিকতা।

আব্রাহাম সাহেব বললেন, 'আরে জয়া যে, এত রাত্তিরে!'

বম্বে শহরে দশটা খুব একটা বেশি রাত না। কিন্তু আব্রাহাম সাহেব জানেন, জয়া এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকে না। সাতটা, বড় জোড় সাড়ে সাতটার মধ্যে ফিরে আসে।

জয়া কিছুটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল। বলল, 'আমার একটা নেমন্তন্ন ছিল।'

'ও, আচ্ছা—' বলেই বোতাম টিপে অটোমেটিক লিফটটা নিচে নামিয়ে আনলেন। তারপর বললেন, 'এস—'

দু'জনে ভেতরে ঢুকে পড়ল। দরজা বন্ধ করে আবার বোতাম টিপলেন আব্রাহাম সাহেব। একটানা ঝিল্লিস্বর তুলে লিফ্ট উঠতে লাগল।

জয়া জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এত রাতে কোত্থেকে ফিরলেন আঙ্কল?'

আব্রাহাম সংক্ষেপে জানালেন, আসছে শনিবারে রেসে কোন ঘোড়াটার ওপর বাজি ধরবেন সে সম্পর্কে কয়েকজন পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে কনফারেন্স করতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে লোকাল সিটিজেনদের নিয়ে একটা মিটিং করেছেন। কারণ জুহু অঞ্চলের গাছপালা কেটে যেভাবে বাড়ি বানানো হচ্ছে তাতে দুচার বছরের মধ্যেই জায়গাটা মনুষ্যবাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে। যেভাবেই হোক এটা বন্ধ করতেই হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

জয়া অল্প হাসল। বলল, 'সারা দিন তা হলে অনেক প্রবলেম নিয়ে কাটিয়েছেন।'

আব্রাহামও হাসলেন, 'এ তো রোজ লেগেই আছে। তবে প্রবলেমের এখনও শেষ হয় নি। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় শুনে গিয়েছিলাম আজ রাত্তিরে ফ্লেচার ফিরবে। তার মানেটা বুঝতেই পারছ—'

ফ্লেচার হল ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের সেই পাইলটটি। জয়া চমকে উঠে বলল, 'তার মানে আজ রাতের ঘুমটা গেল।'

আব্রাহাম উত্তর না দিয়ে হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে দিলেন। একটু পর লিফটটা ইলেভেনথ ফ্লোরে পৌঁছে গেল।

দরজা খুলে বাইরে আসতেই দেখা গেল, সামনের প্যাসেজে বেহেড মাতাল লম্বা হয়ে পড়ে আছে। আব্রাহাম বললেন, 'ফ্লেচার এসে গেছে দেখছি।'

পায়ের শব্দে কোনোরকমে ঘাড় ফেরাল ফ্লেচার; তারপর হাত আর হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করল। প্রথম বার পারল না, হুড়মুড় করে পড়ে গেল। চার পাঁচ বারের চেষ্টায় শরীরটাকে

শেষ পর্যন্ত প্যাসেজ থেকে টেনে তুলল।

ফ্লেচারের বয়স চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। মাঝারি হাইট, লম্বাটে মুখ, চুল মাথার চামড়া ঘেঁষে ছোট ছোট করে ছাঁটা। গায়ের রং কুচকুচে কালো, তার ওপর চকচকে পালিশ লাগানো যেন। চোখ দুটো এই মুহূর্তে টকটকে লাল এবং নেশার ভারে আধবোজা। প্রাণপণে সে অবশ্য চোখ মেলে রাখতে চাইছে।

জড়ানো গলায় আব্রাহামের উদ্দেশে ফ্লেচার বলল, 'তুমি এসে গেছ আঙ্কল! বাঁচলাম। তোমার জন্যেই পাক্কা এক ঘন্টা ওয়েট করছি। এবার ওই দজ্জাল, জাঁহাবাজ, গাটার স্নাইপ, নরকের নেড়ী কুত্তী মাগীটার হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর—' এই বাছা বাছা বিশেষণগুলো যার সম্বন্ধে ফ্লেচার ছুঁড়ে দিল সে তার স্ত্রী।

ব্যাপারটা পুরনো। বছর দশেক হল জয়ারা জুহু-তারা রোডের এই বাড়িটায় উঠে এসেছে। আর তখন থেকেই এটা দেখে আসছে।

মানুষ হিসেবে ফ্লেচার খারাপ নয়। ভদ্র, ফুর্তিবাজ, সরল এবং রীতিমত প্রাণখোলা। কোনো রকম ঝামেলা বা প্যাঁচট্যাচের মধ্যে নেই। কিন্তু মদটা, বিশেষ করে এখানকার কান্ট্রি লিকার ঠার্‌রার কথা যদি একবার মনে পড়ে যায়, আর যদি প্লেন নিয়ে কোথাও উড়বার ব্যাপার না থাকে, তাকে কিছুতেই আটকানো যাবে না। সোজা সে চলে যাবে ডাণ্ডা কি মাহিমের জেলে পাড়ায়। সেখানে গলা পর্যন্ত ঠাররা গিলে বেহুঁশ হয়ে নর্দমা কি রাস্তার ধারে পড়ে থাকবে। নেশাটা ফিকে হয়ে এলে আবার গলা পর্যন্ত বোঝাই করবে। একটানা দু তিন দিন এরকম চালাবার পর তৃতীয় কি চতুর্থ দিন টলতে টলতে বাড়ি ফিরবে। এবং দরজায় টোকা দিলেই শুরু হবে দুর্দান্ত পারিবারিক নাটক। ফ্লেচারের দুর্ধর্ষ বউ এলসা একই সঙ্গে গলা এবং হাত-পা চালিয়ে ফ্লেচারের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে করতে নাক মুখ বা হাত-পায়ের কিছু একটা ভেঙেচুরে থেঁতলে তবে ঘরে ঢুকতে দেবে।

প্রথম প্রথম এ রকমটাই হত। তারপর কি করে যেন ফ্লেচার টের পেয়ে গেছে এই বাড়িতে একমাত্র আব্রাহামকেই একটু আধটু শ্রদ্ধাভক্তি করে এলসা এবং তাঁর কথা শোনে। তাই দু চার দিন বাদে মদে চুর হয়ে ফিরে সে আর কলিং বেলে আঙুল ঠেকায় না, সোজা গিয়ে আব্রাহামকে ডাকে। আব্রাহাম তাঁর ফ্ল্যাটে না থাকলে প্যাসেজে ঘাড়মুখ গুঁজে অপেক্ষা করতে থাকে। তিনি ফিরে এলে এলসাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফ্লেচারকে ঘরে ঢুকিয়ে দেন। অবশ্য তাঁর সামনে এলসা কিছুই বলে না; শুধু শরীরের সব রক্ত তার চোখে জমা হতে থাকে। দাঁতে দাঁত চেপে স্বামীকে দেখতে দেখতে আচমকা ছোঁ মেরে চুলের ঝুঁটি ধরে তাকে ফ্ল্যাটের ভেতর টানতে টানতে নিয়ে যায় এলসা।

ব্যাপারটা কিন্তু ওখানেই শেষ হয় না। আব্রাহামের সম্মানে কিছু না করলেও ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে গাঁক গাঁক করে ইংরেজি এবং মালয়ালম ভাষায় জবরদস্ত খিস্তিগুলো এক নিশ্বাসে আউড়ে যায় এলসা। দুধের বোতল কিংবা স্টিলের টোস্টার দিয়ে ফ্লেচারের হাত-পায়ের জোড় আলগা করবার পর ড্রপ সিন পড়ে। আব্রাহাম থাকলে পারিবারিক কেলেঙ্কারিটা আর বাইরে হতে পারে না, ফ্লেচারের পক্ষে এটুকুই নীট লাভ।

আব্রাহাম বললেন, 'আবার ঠাররা গিলে এসেছ!'

ফ্লেচার অনেক কষ্টে হাতড়ে হাতড়ে নিজের কানদুটো খুঁজে বার করে সমানে মলতে থাকে, আর বলে, 'দিস ইজ লাস্ট আঙ্কল। আর কখনো খাব না। যীশুর দিব্যি—' এই প্রতিজ্ঞাটা দশ বছর ধরে করে আসছে সে।

'এর মধ্যে আবার পুওর যীশু বেচারাকে টানাটানি কেন? ওঠ—'

এর পর কী কী হবে জয়া সবই জানে। সে আর দাঁড়াল না। সোজা নিজেদের ফ্ল্যাটের কাছে এসে দেখল—দরজাটা খোলাই রয়েছে। তার মনে পড়ল, দুপুরে বেরুবার সময় বাবা ভেতর থেকে, দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তবে কি ঘাটকোপার থেকে তারা ফিরে এসেছে? ভেতরে গিয়ে হয়তো ...ার দরজা বন্ধ করে নি সে। অন্য কেউও এসে থাকতে পারে, বা কোনো কারণে শিবনাথ দরজা ...ল আর বন্ধ করেন নি। বাবা যা অন্যমনস্ক মানুষ!

জয়া ভেতরে ঢুকে আস্তে করে দরজায় ছিটকিনি আটকে দিল। তারপর প্যাসেজ ধরে সামনের

দিকে যেতে যেতে শিবনাথের ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাবার ঘরে আলো জ্বলছে। জয়া দেখতে পেল, ওধারের ব্যালকনিতে পাশাপাশি দুটো বেতের চেয়ারে বসে আছেন শিবনাথ এবং একজন মহিলা। সমুদ্রের দিকে তাঁদের মুখ ফেরানো। তবু পেছন থেকে এক পলক দেখেই বাবার পার্শ্ববর্তিনীকে চিনতে পারে জয়া। সাধনা মাসি—সাধনা পুনেকর। এমন বসার ভঙ্গি সাধনা মাসি ছাড়া আর কারো হতে পারে না। দরজটা কেন খোলা রয়েছে এতক্ষণে বোঝা গেল।

জয়া মনে মনে একবার ভাবল আজ বুধবার; সাধনা মাসির আজ আসার কথা নয়। তিনি আসেন উইক-এণ্ডে অর্থাৎ শনিবারে। শনিবার রাতটা এবং রবিবার গোটা দিন কাটিয়ে সোমবার ভোরে ডেকান কুইন ধরে সোজা পুনায় চলে যান। হঠাৎ কী এমন হল যাতে সপ্তাহের মাঝখানে বুধবার তাঁকে চলে আসতে হয়েছে!

শিবনাথ বা সাধনা, কেউ কথা বলেছেন না। জুহু বীচের ওপারে বিপুল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। সেই কবে থেকে, জয়ার মনেও পড়ে না, এভাবে দু'জনকে নিঃশব্দে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখে আসছে। এমন করে ওরা যখন বসে থাকেন, জয়া ডাকে না। কিন্তু কেন আজ সাধনা চলে এলেন সেটা জানার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল। খানিকটা দুশ্চিন্তাও। এক পলক দ্বিধা করল জয়া। তারপর ডকল, 'সাধনা মাসি—'

শিবনাথ আর সাধনা দু'জনেই এধারে মুখ ফেরালেন। সাধনা বললেন, 'ও, তুই এসে গেছিস?' বলতে বলতে উঠে জয়ার কাছে চলে এলেন।

শিবনাথও আর বসে থাকলেন না; তিনিও উঠে এলেন।

সাধনা বললেন, 'তোর জন্যেই বসে ছিলাম। কেমন আছিস?'

সাধনার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। রং ফরসাও না, কালোও না, দুয়ের মাঝামাঝি। ডিমের মতো লম্বাটে মুখ। ঠোঁট ঈষৎ ভারি, বড় বড় গভীর চোখ। শরীরে বয়সের ভার পড়েছে। চুলের ফাঁকে ফাঁকে রুপোর তার। পরনে হালকা রঙের এমব্রয়ডারি কাজ-করা শাড়ি আর সাদা ব্লাউজ। হাতে সোনার ব্যাণ্ডে চৌকো মতো বড় একখানা ঘড়ি ছাড়া আর কোনো গয়না টয়না নেই। তাঁকে ঘিরে যা রয়েছে তা হল এক ধরনের ব্যক্তিত্ব। মেয়েরা বিরাট চাকরি টাকরি করলে খানিকটা পুরুষলি ভাব এসে যায়। কিন্তু জয়া জানে বাইরে রুক্ষতার কিছু ছাপ পড়লেও সাধনা মাসির ভেতরটা আশ্চর্য নরম। জয়া বলল, 'ভাল আছি। তুমি কখন এলে?'

সাধনা বললেন 'সাড়ে সাতটা আটটার সময়।'

'আজ হঠাৎ চলে এলে! শরীর খারাপ হয় নি তো?'

'আরে সে সব কিছু নয়। ইয়ার এণ্ডিং হয়ে এল। অনেকগুলো ক্যাজুয়েল লিভ পাওনা আছে। একঘেয়ে অফিস আর ভাল লাগছিল না; চলে এলাম।'

'খুব ভাল করেছ।' বলেই শিবনাথের দিকে ফিরল জয়া, 'তুমি ওষুধটোষুধ ঠিকমতো খেয়েছিলে?'

শিবনাথ বললেন, 'একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। সাধনা এসে তাড়া দিয়ে খাইয়ে ছাড়ল।' বলে হাসলেন।

শিবনাথের স্বভাব জয়া যতটুকু জানে, সাধনা তার চাইতে এক চুল কম জানে না। বরং হয়তো বেশিই জানে। ছেলেবেলায় মা তাদের ছেড়ে চলে যাবার পর সাধনা মাসিই তাড়া দিয়ে বাবাকে খাওয়াত, বেড়াতে নিয়ে যেত, ডাক্তারের কাছে পাঠাত। তখন তারা থাকত সায়নে; পাশাপাশি বাড়িতে। পরে অবশ্য বড় হয়ে বাবার সব দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে জয়া। শিবনাথের স্বভাব তার অনেক আগে থেকেই জানেন সাধনা।

জয়া বলল, 'তাড়া না দিলে কোন কাজটা তুমি কর?' বলতে বলতে আচমকা লক্ষ করল, সাধনা তার মেরুন রঙের শাড়ি এবং সাজসজ্জার দিকে তাকিয়ে আছেন। ভেতরে ভেতরে সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

শিবনাথ হাসলেন, 'তা যা বলেছিস—' দুপুরবেলা জয়া যখন বেরিয়ে যায় তখন তাঁকে অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। এখন কিন্তু সেই বিষাদটা আর নেই। চোখেমুখে খুশির মতো কিছু একটা ফুটে

উঠেছে। জয়া জানে, সাধনা এখানে এলেই তিনি উজ্জ্বল হয়ে উঠেন।

শিবনাথ আবার বললেন, 'মনে করে প্রেজেন্টেশন কিনে নিয়ে গিয়েছিলি তো?'

বন্ধুর বিবাহ-বার্ষিকীতে উপহার দেওয়া হয়েছে কিনা, জানতে চাইছেন শিবনাথ। জয়া বিব্রত হয়ে পড়ল। দ্বিধান্বিতের মতো একটু চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যাঁ।' বলেই দেখল, সাধনা তাকে লক্ষ করছেন।

শিবনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী দিলি বন্ধুকে?'

কী উত্তর দেবে, চট করে মনে করতে পারল না জয়া। বেশ খানিকক্ষণ এধার ওধার হাতড়ে আনাড়িরা যেভাবে মিথ্যে বলে সেইরকম বলল, 'বন্ধুকে একটা লেডিজ ব্যাগ দিয়েছি আর তার হাজব্যাণ্ডকে সিগারেট কেস।' বলতে বলতে অনিবার্যভাবে তার চোখ সাধনার দিকে চলে গেল। তিনি আগের মতোই তাকিয়ে আছেন।

শিবনাথ এবার বললেন, 'পেট ভরে খেয়েছিস তো?'

কোনো রকমে মাথা নাড়ল জয়া, 'হ্যাঁ—' আজ রাতটা তাকে উপোস দিয়েই কাটাতে হবে। উপায় নেই।

'যা, ঘরে গিয়ে জামা কাপড় বদলে ফ্যাল।'

জয়া আর দাঁড়াল না। তাড়াতাড়ি বড় বড় পা ফেলে নিজের ঘরে চলে এল। তারপর ওয়ার্ডরোব থেকে ঘরে পরার শাড়ি জামাটামা বার করে বাথরুমে চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদে পোশাক বদলে ফিরে এসে দেখল, সাধনা তাঁর খাটে বসে আছেন। এ ঘরে দুটো সিঙ্গল-বেড খাট রয়েছে। একটা জয়ার, অন্যটা সাধনার। উইক-এণ্ডে সাধনা এখানে এসে ওই খাটটায় ঘুমোন। শিবনাথ তাঁর জন্য ওটা কিনে এনেছেন।

যে শাড়িটাড়ি পরে জয়া বেরিয়েছিল সেগুলো এখন তার হাতে ঝোলান রয়েছে। সাধনা শাড়িটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, 'তোর এই কাপড়টা তো আগে দেখি নি। কবে কিনলি?'

জয়ার ক'টা শাড়ি, ক'টা জামা, ক'জোড়া জুতো, সব জানেন সাধনা। শিবনাথের কাছে ইচ্ছে করলে তবু গোপন করা যায়, কিন্তু সাধনার চোখে ধুলো ছিটানো অসম্ভব। অজয় এই শাড়িটা দেবার পর কী কষ্ট করে যে লুকিয়ে রেখেছে, জয়াই শুধু জানে। কাঁপা গলায় সে বলল, 'গেল মাসে কিনেছি।'

'কই, আমাকে দেখাস নি তো!'

'ভুলে গিয়েছিলাম।'

'কিন্তু তুই তো এরকম ক্যাটকেটে চড়া পছন্দ করিস না!'

'একটা পরতে ইচ্ছে হয় না?' বলে আর দাঁড়াল না জয়া। আসলে সাধনার দিকে তাকাতে পারছিল না সে। প্রতি মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল, ধরা পড়ে যাচ্ছে। সোজা ওয়ার্ডরোবটার সামনে এসে পাল্লা খুলে একটা হ্যাঙ্গারে শাড়ি টাড়িগুলো ঝুলিয়ে রাখল জয়া। সারাদিন পরে থাকার ফলে জামাকাপড় কুঁচকে মুচকে গেছে। আজ আর হল না; কাল এক সময় ওগুলো ইস্তিরি করে রাখতে হবে। ওয়ার্ডরোবের পাল্লা বন্ধ করতে করতে জয়া আবার বলল, 'তোমরা খেয়ে নিয়েছ তো সাধনা মাসি?'

সাধনা বললেন, 'না। তোর বাবার সঙ্গে বসে বসে কথা বলছিলাম—'

'এত রাত হয়ে গেছে, এখনও খেয়ে নাও নি? যাও যাও—' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল জয়ার। সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'আমি বাবার মতো রান্না করে রেখেছিলাম। গ্যাসে ভাত বসিয়ে দিচ্ছি। ঘরে ডিম, দুধ টুধ আছে—'

সাধনা বললেন, 'তোকে অত ভাবতে হবে না। আমি এসে ভাতটাত করে নিয়েছি।' একটু থেমে আবার বললেন, 'চল—'

জয়া ঘুরে দাঁড়াল। অবাক হয়ে বলল, 'কোথায় যাব?'

'কোথায় আবার, খেতে—' সাধনা উঠে দাঁড়ালেন।

জয়া চমকে উঠল, 'আমি তো খেয়ে এসেছি।'

স্থির চোখে জয়ার মুখের দিকে তাকালেন সাধনা। বললেন, 'তোকে কতদিন দেখছি বল তো?'

জয়া উত্তর দিল না। মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

সাধনা আবার বললেন, 'খাওয়া হয়েছে কি হয় নি, তোর মুখ দেখলে আমি বুঝতে পারি।

আয়—'

জয়া বুঝল, খাওয়ার ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেছে। নিজেকে বাঁচাবার জন্য কত আর মিথ্যে বানানো যায়! চুপচাপ সাধনার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। প্যাসেজ দিয়ে যেতে যেতে সাধনা শিবনাথকে ডাকলেন, 'খেতে এস—'

ফ্ল্যাটের শেষ মাথায় ডাইনিং স্পেস। একটা মাঝারি টেবল ঘিরে ছ'টা ফ্যাশনেবল চেয়ার বসানো রয়েছে। একধারে ফ্রিজ, আরেক ধারে আলমারিতে দামি দামি নানা রকম ক্রকারি।

জয়ারা সোজা সেখানে চলে এল। জয়াকে বসতে বলে গ্যাস জ্বালিয়ে ক্ষিপ্র হাতে খাবার গরম করে প্লেটে প্লেটে সাজিয়ে ফেললেন সাধনা। এখানে এলে কাউকে তিনি কিছু করতে দ্যান না; এমন কি তারা থাকলে তাকেও না।

এরই মধ্যে শিবনাথ এলেন। চেয়ার টেনে বসতে বসতে জয়াকে খাবার টেবলে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'এ কি, তুই! বন্ধুর বাড়ি থেকে খেয়ে আসিস নি তা হলে?'

জয়া হকচকিয়ে গিয়েছিল। আবার নতুন করে একটা মিথ্যের জন্য যখন সে হাতড়ে বেড়াচ্ছে সেই সময় সাধনাই বাঁচিয়ে দিলেন। বললেন, 'তোমারই তো মেয়ে। জান না, কাছে বসিয়ে না খাওয়ালে খাওয়া হয় না। কী খেয়ে এসেছে; পেট ভরে নি।'

শিবনাথ আর কিছু জানতে চাইলেন না।

জয়া আর বিশনাথের সামনে খাবার দিয়ে নিজেও খেতে বসে গেলেন সাধনা।

শিবনাথ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই পাশের ফ্ল্যাটে এলসার চিৎকার শোনা গেল। সেই সঙ্গে কাপ-প্লেট এবং কাঁচের গেলাস আর বোতল ভাঙার শব্দ শোনা যেতে লাগল। এই কেরেলি মেয়েমানুষটির গলার শক্তি এত বেশি যে মাল্টি-স্টোরিড বাড়িটার ভিত পর্যন্ত কাঁপতে থাকে। অর্থাৎ ফ্ল্যাটে ঢোকাবার পর এলসা তার স্বামীটির হাড়-মাংস একটু এধার ওধার করে দিচ্ছে।

শান্ত গলায় সাধনা বললেন, 'ফ্লেচার বুঝি ক'দিন বাদে ফিরল?' ফ্লেচারের ব্যাপারটা সাধনা জানেন।

শিবনাথ বললেন, 'দেখিনি, তবে 'অপারেশান-এলসা'র আওয়াজ শুনে তাই মনে হচ্ছে।' এলসার এই মারধোর এবং গাঁক গাঁক করে চিৎকারকে এ বাড়ির সবাই বলে 'অপারেশান-এলসা'

সাধনা বললেন, 'ঘন্টাখানকে এখন তা হলে এলসার চেঁচামেচি শোনা ছাড়া আর কিচ্ছু করার নেই।'

ছয়

খাওয়া দাওয়ার পর শিবনাথ তাঁর ঘরে-চলে গেলেন। সাধনা আর জয়াও সঙ্গে সঙ্গে গেল। রাত্রে ঘুম থেকে উঠে দুবার জল খাওয়া শিবনাথের অভ্যাস। তা ছাড়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট আছে তাঁর। ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝেই নাক বুজে যায়। নাকের প্যাসেজ পরিষ্কার করার জন্যে স্প্রে করে ওষুধ দিতে হয়।

শিবনাথের খাটের পাশে ছোট টেবলে দু গেলাস জল আর নাকের ওষুধ রেখে সাধনাকে নিয়ে জয়া তার ঘরে চলে এল। এসেই দরজা ভেজিয়ে সাধনা পোশাক বদলে একটা ঢোলা হাউস কোট পরে নিলেন। জয়াও একটা হাউস কোট পরল। রাত্রিবেলা ঘুমোবার পক্ষে এই পোশাকটা অরামদায়ক।

সাধনা যে কাপড়চোপড়গুলো ছেড়েছিলেন সেগুলি একধারে গুছিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাল অফিসে যাবি তো?'

জয়া বলল, 'যেতেই হবে। কাজের খুব প্রেসার আছে। ম্যানেজারকে অনেক ধরে টরে আজকের দিনটা ছুটি নিয়েছিলাম। লিভ এক্সটেন্ড করা যাবে না।'

ড্রেসিং টেবলের ওপর একটা মিউজিক্যাল টেবল ক্লক গিটারের মতো শব্দ করে বেজে যাচ্ছিল। এক পলক ঘড়িটা দেখে নিয়ে সাধনা বললেন, 'তা হলে আর দেরি না করে শুয়ে পড়। সাড়ে বারটা বাজতে চলল।' বলে আলো নিভিয়ে নিজের খাটে চলে গেলেন।

জয়া কিন্তু তক্ষুনি শুয়ে পড়ল না। অন্ধকারে নিজের খাটের একধারে বসে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ক'দিনের ছুটি নিয়ে এসেছ সাধনা মাসি?'

'এক দিনের। কাল থাকব, পরশু ভোরে চলে যাব।' সাধনা বললেন।

একটু ভেবে জয়া বলল, 'পরশু দিনটাও ছুটি নিয়ে নিলে না কেন? শনি রবি তোমাদের অফ ডে। একসঙ্গে টানা চার দিন থেকে সোমবার চলে গেলে পারতে।'

সাধনা বললেন, 'তা হলে তো ভালই হত। ছুটি নেবার সময় এটা ভেবে দেখি নি।'

'এক কাজ কর না—'

'কী?'

'কাল পুনায় তোমার অফিসে ফোন করে পরশু দিনটা ছুটি নিয়ে নাও। নইলে পরশু ভোরে উঠে পুনায় যাবে, আবার তার পরের দিন বম্বে ফিরবে। শুধু শুধু ছোটাছুটি।'

সাধনা বললেন, 'ঠিক আছে, কাল একটা ফোনই করে দেব।' বলতে বলতে শুয়ে পড়লেন।

জয়া কিছু বলল না। টান টান হয়ে শুয়ে পায়ের দিক থেকে পাতলা চাদরটা গায়ের ওপর টেনে দিল। এই ডিসেম্বর মাসে বম্বে শহরে রাতের দিকে একটা কিছু গায়ে না জড়ালে শীত শীত করে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ সাধনা ডাকলেন, 'জয়া—'

তাঁর গলায় দূরাগত সংকেতের মতো এমন কিছু ছিল যাতে চমকে উঠল জয়া। আস্তে করে বলল, 'কী বলছ?'

'একটা সত্যি কথা বলবি?'

'কী?'

'সন্ধেবেলা আমি আসতেই তোর বাবা বলল, তুই নাকি খুব সেজেটেজে কোন এক বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্নে গেছিস—'

সাধনা যে এই বিষয়টা কোনো একসময় তুলবেন সেটা তাঁকে দেখার পর থেকেই আবছাভাবে মনে হয়েছিল। জয়ার স্নায়ুগুলো টানটান হয়ে গেল। ঈষৎ কাঁপা গলায় যে বলল, 'বন্ধুর ম্যারেজ অ্যানিভারসারি ছিল। তাই—'

জয়াকে থামিয়ে দিয়ে সাধনা বললেন, 'ওসব আমি শুনেছি।' একটু থেমে কী চিন্তা করে আবার বললেন, 'আসলে কোথায় গিয়েছিলি, তাই বল—'

জয়া উত্তর দিল না।

সাধনা বললেন, 'কি রে, কথা বলছিস না যে—'

জয়া স্পষ্ট গলায় বলল, 'বললাম তো—'

সাধনা বললেন, 'ওটা সত্যি না।' তাঁর কণ্ঠস্বর অনুচ্চ কিন্তু দৃঢ়।

জয়া চুপ করে থাকল।

আচমকা বালিশের ওপর মুখ তুলে সাধনা বললেন, 'তুই কি কাউকে ভালবেসেছিস?'

ঝড়ো বাতাসের মতো কিছু একটা জয়ার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে দিতে থাকে। শ্বাসরুদ্ধের মতো সে বলল, 'আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করো না সাধনা মাসী। পরে তোমাকে আমি সব বলব।'

'কবে বলবি?'

'আমাকে একটু সময় দাও।'

'বেশ। কিন্তু মুখ ফুটে জানতে চাইব না, তুই নিজের থেকে বলবি।'

'আচ্ছা।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সাধনা একসময় বললেন, 'তোর মা এখনও ফোনটোন করে?'

বাবার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর মা একজন নাম-করা পোলো খেলোয়াড়কে বিয়ে করেছে। ভদ্রলোক পাঞ্জাবি হিন্দু; নাম কর্নাল সিং। বম্বেতে বিরাট ইমপোর্ট এক্সপোর্টের বিজনেস ওঁদের; আর আছে অঢেল পয়সা। ব্যবসার কাজে বছরের দু তিন মাস ইওরোপ আমেরিকায় ঘুরে বেড়াতে হয় ওঁদের। জয়া যেখানে কাজ করে তারা কর্নাল সিংদের ট্রাভেল এজেন্ট। মাঝে মাঝেই এসব ব্যাপারে মা বা কর্নাল সিং নিজে জয়াকে ফোন করেন। তবে বেশির ভাগ সময় শুধু তার সঙ্গে কথা বলার জন্য ওঁরা ফোন করেন। অনেক সময় নিজেরাও হুট করে তার অফিসে চলে আসেন। মানুষ হিসেবে কর্নাল সিং চমৎকার। যাটের মতো বয়স হয়েছে তবু ভয়ানক স্মার্ট, যুবকদের মতো টগবগে। সত্যিকারের স্পোর্টসম্যান বলতে যা বোঝা

যায়. তিনি তাই। স্ত্রীর প্রথম পক্ষের মেয়ে হলেও জয়াকে তিনি খুবই স্নেহ করেন।

জয়া বলল. 'করে।'

'কী বলে?'

'তেমন কিছু না।'

সাধনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। হাতের পাতা থেকে মুখ নামিয়ে ওপাশ ফিরে শুতে শুতে বললেন, 'এবার ঘুমো'। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর গভীর শ্বাস টানার শব্দ শোনা যেতে লাগল। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

জয়া কিন্তু ঘুমোতে পারছিল না। এক ধরনের অস্থিরতা চারদিক থেকে তাকে যেন ঘিরে ফেলছিল। এতদিন সে যা গোপন রাখতে চেয়েছে, সাধনা মাসি তা ধরে ফেলেছেন। খুব সম্ভব বাবাও। অজয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কটা তাঁরা হয়তো জানেন না। তবে জয়া কোথাও কিছু একটা করছে কিংবা মনের দিক থেকে জড়িয়ে পড়েছে, সেটা নিশ্চয়ই টের পেয়েছেন। ওঁদের কাছে সব কথা কি এখনই খুলে বলা দরকার? জয়া বুঝতে পারল না।

তাদের কুড়িতলা বিশাল বাড়িটা এখন একেবারে নিঝুম। খানিকক্ষণ আগেও পাশের ফ্ল্যাটে এলসার গাঁক গাঁক চিৎকার আর কাপ-প্লেট ভাঙার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। সে-সব এখন থেমে গেছে। তুলকালাম যুদ্ধের পর ওখানে এই মুহূর্তে হয়তো সন্ধির খসড়া লেখা হচ্ছে। ওয়ারের পরই তো ট্রিটি।

নিচে জুহু-তারা রোডে এই সময়টা দু-চারটে মাতাল হল্লা বাধায়। দেড়শ ফুট উচ্চতায় তাদের চিৎকার চেঁচামেচি পৌঁছয় না। তবে ক্বচিৎ এক-আধটা প্রাইভেট কার বা ট্যাক্সির ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাওয়া কিংবা ওয়েস্ট-বাউণ্ড প্লেনের বাতাস চিরে চিরে আরব সাগর পার হওয়ার শব্দ ছাড়া আর সব কিছুই গভীর ঘুমে ডুবে আছে।

খানিকক্ষণ একভাবে শুয়ে থাকার পর পাশ ফিরল জয়া। ঘরে অন্ধকার রয়েছে ঠিকই, তবে তেমন গাঢ় নয়। শুয়ে শুয়েই চোখে পড়ছে, আরব সাগরের মাথায় ঝকঝকে নীলাকাশের ঠিক মাঝমধ্যিখানে রুপোর থালার মতো গোল চাঁদ স্থির হয়ে আছে। এটা পূর্ণিমা পক্ষ। গলানো রুপোর মতো জ্যোৎস্নায় বাইরের সব কিছু ভেসে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকল জয়া। তারপর নিজের অজান্তেই একসময় উঠে পড়ল। কখন যে সমুদ্রের দিকের ব্যালকনিতে সে এসে দাঁড়াল, নিজেই জানে না।

এই মধ্যরাতে বাতাসে খুব জোর নেই। ঝিরঝির স্রোতের মতো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। জুহু বীচের ধার ঘেঁষে যে নারকেলগাছগুলো সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে, তাদের পাতায় পাতায় মায়াবী আলোর মতো [illegible] মাখানো রয়েছে। রুপোর দানার মতো বীচের বালি ঝিকঝিক করছে, আর সমুদ্রের হাজার হাজার ঢেউয়ের মাথায় অনবরত ফসফরাস জ্বলছে। সব মিলিয়ে আশ্চর্য অলৌকিক এক ল্যাণ্ডস্কেপ।

আকাশ, সমুদ্র বা জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এলোমেলো ভাবে আজকের সারাদিনের নানা ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছিল জয়ার। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ না; আচমকা সামনের সব দৃশ্য বা শব্দ এবং আজকের দিনটা চোখের সামনে থেকে মুছে গেল যেন। একটা জোরাল উজান স্রোত প্রবল আকর্ষণে তাকে পেছনে টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

জয়া শুনেছে তার জন্মের বছর দুই তিন আগে শিবনাথ একটা হিন্দি ছবিতে প্লে-ব্যাক করার জন্য কলকাতা থেকে বম্বেতে এসেছিলেন। সেটা ফর্টি-ফাইভের শেষের দিকে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সবে থেমেছে।

শিবনাথ তখন ছিলেন কলকাতার দুর্দান্ত জনপ্রিয় সিঙ্গার। তাঁর অগুনতি ফ্যান, দারুণ পপুলারিটি। শিবনাথ নামটা খুব মর্ডান নয়, তাই ওটা বদলে 'তাপসকুমার' নামে তিনি গাইতেন। কলকাতায় তখন বাংলা ছবি মানেই তাপসকুমারের প্লে-ব্যাক। বাজারে তাঁর রেকর্ড বেরুলে দু দিনেই স্টক শেষ হয়ে যায়।

বম্বে এসে একটা ছবিতে প্লে-ব্যাক করেই তিনি মাত করে দিয়েছিলেন। তারপর নানা ফিল্মে গাইবার জন্য প্রচুর করে কনট্রাক্ট আসতে লাগল। বম্বেতে ছবি হয় কলকাতার পাঁচগুণ। এখানে স্কোপ বেশি, টাকা অঢেল, সুযোগ সুবিধা এবং পাবলিসিটি প্রচুর। এখানকার একটা ছবি হিট করলে রাতারাতি

গোটা ইণ্ডিয়ায় নাম ছড়িয়ে যায়। সারা দেশের কাছে নিজের দাম কতটা, দু দিনেই টের পাওয়া যায়। হোল ইণ্ডিয়া তাকে মাথায় করে নাচুক, তার রেকর্ডে বাজার ছেয়ে যাক, তার গান হোল কানট্রিতে অনবরত বাজতে থাকুক—কোন আর্টিস্ট এটা না চায়? শিবনাথ সেই যে বম্বে এসে ছিলেন, আর ফিরে গেলেন না।

কলকাতায় ফেরার মতো তেমন কোনো চার্মও ছিল না। মা ছেলেবেলাতেই মারা গেছেন। তারপর বাবা আবার বিয়ে করেছিলেন। বাবা মানুষটা এমনিতে খারাপ ছিলেন না, কিন্তু দু নম্বর স্ত্রীটি আসার পর তাঁর চালচলন, বিশেষ করে শিবনাথের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার যেন কেমন হয়ে গেল। তারপর সৎমায়ের যখন ছেলেমেয়ে হতে শুরু করল, একেবারেই বদলে গেলেন। শিবনাথের তখন সর্বক্ষণ মনে হত সৎমা আর বাবার সংসারে তিনি অবাঞ্ছিত; সেকেণ্ড ক্লাস সিটিজেনের মতো পড়ে আছেন। খেতে বসে মনে হত, তাঁকে নেমন্তন্ন করা হয় নি, অথচ জোর করে পাত পেড়ে বসে গেছেন।

দু-চার বছর ঘাড়মুখ গুঁজে সৎমা আর বাবার ফ্যামিলিতে কাটিয়ে দেবার পর আর পারা গেল না। ছেলেবেলা থেকেই শিবনাথের মধ্যে দুটি জিনিস একটু বেশি পরিমাণেই আছে। প্রথমটা সেন্টিমেন্ট, দ্বিতীয়টা আত্মসম্মানবোধ। কাজেই একদিন বাড়ি ছাড়তে হল। বেশ কিছুদিন রাস্তায়, ফুটপাথে, লোকের বাড়ির রোয়াকে, পার্কে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত এক নাম-করা ব্যারিস্টারের রক্ষিতার কাছে আশ্রয় পেয়েছিলেন শিবনাথ।

মেয়েমানুষটির নাম ছিল বিজলী। চেহারার সঙ্গে নামের মিল হাজারে একটা হয় কিনা সন্দেহ। বিজলীর বেলায় কিন্তু হয়েছিল। আগুনের মতো গায়ের রং তার; নাকমুখ যেন কেটে বসানো। বয়স ছিল তিরিশ বত্রিশ; শরীরে অল্পস্বল্প মেদ জমতে শুরু করেছিল। এই সামান্য মেদ ছিল তার এক্সট্রা আকর্ষণ। তবে তার চোখ ছিল দেখবার মতো। একেবারে কান পর্যন্ত টানা। ফোলা ফোলা পাতাদুটোর নিচে ঘন কালো পালক বসানো। থুতনিতে ছিল একটা আলগা খাঁজ; গালে একটা লালচে তিল।

সারাদিন সেজেগুজে পরী হয়ে থাকতে ভালবাসত বিজলী। পরনে থাকত মুগা আর জরির কাজ-করা চওড়া পাড় তাঁতের শাড়ি আর নরম তসরের ব্লাউজ। হাতে থাকত গোছা গোছা সলিড সোনার চুড়ি; গলায় সরু চেনে পান্না-বসানো পানপাতার মতো লকেট। নাকে হীরের নাকছাবি, হাতে হীরের আংটি। সেকালের ফ্যাশন ছিল পাতা কেটে চুল বাঁধা। সেইভাবেই সে চুল বাঁধত।

দু রকমের নেশা ছিল বিজলীর। সারাদিনে খুসবুওলা জর্দা দিয়ে কম করে বিশ খিলি পান খেত সে। সন্ধের পর তার বাবু হাইকোর্টের বারিস্টার শোভাময় গিলে-করা কলিদার পাঞ্জাবি পরে, কাঁচি ধুতি লুটিয়ে, ঝকমকে পাম্প-শু থেকে জেল্লা ছুটিয়ে, গা থেকে আতরের গন্ধ উড়িয়ে পুরো কার্তিকটি হয়ে যখন আসতেন তখন আলমারি থেকে বেরুত হুইস্কির বোতল। শোভাময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মদ খেত বিজলী।

রাত্তিরে নেশার ঘোরে বিজলীর চোখদুটো হয়ে থাকত ঢুলুঢুলু। কিন্তু দিনের বেলা পেটে যখন মদ পড়ত না তখন সে দুটো বাজপাখির চোখের মতো দেখাত। যেমন উগ্র তেমনি ধারাল।

দারুণ মেজাজ ছিল বিজলীর। একই সঙ্গে সে খামখেয়ালী এবং রাগী। মেজাজ চড়লে হাতের কাছে যা পেত তাই ছুঁড়ে মারত। ব্যরিস্টার শোভাময় পাকড়াশির মুখে এবং ঘাড়ের কাছে নাকি অনেকগুলো কাটা দাগ ছিল; ওগুলো বিজলীর হাতের কাজ।

বিজলী নামে ব্যারিস্টারের এই মেয়েমানুষটির বাড়িতে চাকরের মতো ফুট-ফরমাস খাটতে হত শিবনাথকে। আরো একটি কাজ ছিল তাঁর। দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে জামাকাপড় খুলে সম্পূর্ণ ন্যাংটো হয়ে সে শুত আর তখন শিবনাথকে তার সারা গা টিপে দিতে হত। যতক্ষণ না বিজলীর ঘুম আসছে শিবনাথের থামা চলত না। ফুট-ফরমাস খাটা বা শরীর টেপার ব্যাপারে একটু এদিক ওদিক হবার জো ছিল না। পান থেকে চুন খসলেই ফুলদানি কি হাত পাখা ছুঁড়ে মারত বিজলী।

যে শিবনাথের মধ্যে আত্মসম্মান এবং সেন্টিমেন্ট এত প্রবল, তার পক্ষে বিজলীর মতো একটি বড়লোকের রক্ষিতার কাছে একটা দিনও টিকে থাকা মুশকিল। তবু শিবনাথ তার কাছে প্রায় আট দশটা বছর কাটিয়েছে। তার একমাত্র কারণ বিজলীর গান।

বিকেল হলেই শীত-গ্রীষ্ম বার মাস গা'টি ধুয়ে, পাতা কেটে চুল বেঁধে, সেজেগুজে, গায়ে বিলিতি

সেন্ট ঢেলে হারমোনিয়াম নিয়ে বসত বিজলী। নানা রকমের গান গাইতে সে। ভোলা ময়রা, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির গান। এসব ছাড়া পদাবলী কীর্তন, ভজন, পুরনো আমলের দাশু রায়ের গান। তার ওপর সিনেমা-থিয়েটারের গান তো ছিলই। সারাদিন হাইকোর্টে গলা ফাটিয়ে সন্ধেবেলা বিজলীর কাছে এসে তার গলায় কোকিলের ডাক বুলবুলির শিস শুনবেন বলে অনেক কাল আগে ওস্তাদ রেখে তাকে গান শিখিয়েছিলেন শোভাময়। পরে ওস্তাদ অবশ্য ছিল না। তবে গানের রেওয়াজটা চালিয়েই যেত বিজলি।

ভারী মিষ্টি আর মন-ভুলানো ভরাট গলা ছিল তার; আশ্চর্য মোহ আর জাদু যেন মাখানো থাকত তাতে। বিজলী যখন গাইত তার গলা থেকে দানা দানা সুর ঝরতে থাকত। চোখ আর্ধেক বুজে খুব মগ্ন হয়ে সে গাইত। তার গানের সময় শোভাময় ছাড়া আর কারো কাছাকাছি থাকার হুকুম ছিল না। কিন্তু যখন সে গান ধরত, অস্থির হয়ে উঠতেন শিবনাথ। জাদুকরীর মতো বিজলীর গান তাঁর রক্তমাংস ধরে টান দিয়ে নিয়ে যেত। বেড়ালের মতো নিঃশব্দে পা টিপে টিপে শিবনাথ বিজলির গান-বাজনার ঘরের একটা জানালার পাশে থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকত।

সেন্টিমেন্ট আর আত্মমর্যাদার পাশাপাশি আরো একটি ঘুমন্ত ব্যাপার ছিল শিবনাথের মধ্যে। সেটা গান। ছেলেবেলা থেকেই গান শোনার কান ছিল তাঁর। আরেকটা আশ্চর্য ক্ষমতাও ছিল। কোন সুর একবার শুনলেই তিনি চট করে গলায় তুলে নিতে পারতেন। বিজলীর কাছে আসার পর সে যেন শিবনাথের ভেতরকার কোনো একটা বন্ধ লোহার কৌটো খুলে গানের ভ্রমরটাকে ফুসলে বার করে এনেছিল। শুধু তাই না, ক্রমাগত নিজের অজান্তে সেটাকে উস্কে যাচ্ছিল।

একদিন কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন শিবনাথ। সেদিন গাইতে গাইতে হঠাৎ বাইরে পানের পিক ফেলতে এসেছিল বিজলী। রোজই পিকদান নিয়ে গাইতে বসত সে; সেদিন কী কারণে যেন ভুলে গিয়েছিল।

বাইরে এসে জানালার কাছে থামের আড়ালে শিবনাথকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল বিজলীর; চোখের তারা আগুনের ফুলকির মতো জ্বলে উঠেছিল। হাতের সামনেই ছিল ছোট একটা ফুলের টব। সেটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারতে গিয়ে কী ভেবে আর মারে নি। আস্তে আস্তে নামিয়ে রেখে পিক ফেলে রাগী কর্কশ গলায় বলেছিল, 'এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস?'

বানিয়ে মিথ্যে বলতে পারতেন না শিবনাথ। ভয়ে ভয়ে বলেছিলেন, 'গান শুনছিলাম।'

বিজলী এবার খেপে গিয়েছিল, 'শুয়ারের বাচ্চা, হারামী কাঁহাকা, গান শুনছিলি! জানিস না, ব্যারিস্টার সাহেব ছাড়া আমি কাউকে গান শোনাই না?'

মুখ নিচু করে শিবনাথ বলেছিলেন, 'জানি।'

'জেনেশুনেও এত সাহস হল তোর কী করে?'

শিবনাথ চুপ।

বিজলী চড়া গলায় চেঁচিয়ে যাচ্ছিল, 'ব্যারিস্টার সাহেব আমাকে এই বাড়ি করে দিয়েছে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দ্যায় মাসে মাসে, গয়না দ্যায়, হীরেমুক্তো দ্যায়, মদের বোতল দ্যায়। তবে আমার গান শুনতে পায়। আর তুই একটা পা-টেপা চাকর হয়ে আমার গান শুনিস! জুতিয়ে তোর পিঠের ছাল আমি ছাড়িয়ে নেব রে হারামজাদার বাচ্চা—দাঁড়া ঘোড়ার লেজের চাবুকটা নিয়ে আসি।'

বিজলী ঘুরে ঘরের দিকে যাচ্ছিল, সেই সময় হঠাৎ মরিয়ার মতো বলে উঠেছিলেন শিবনাথ, 'ব্যারিস্টার সাহেব যে জন্যে গান শোনে, আমি সেজন্যে শুনি না।'

কপালের মসৃণ চামড়ায় ভাঁজ পড়ে যাচ্ছিল বিজলীর। চোখের মণি জ্বলছিলই। রাগে বুক তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল। তবে ভেতরে ভেতরে একটু থতিয়ে গিয়েছিল সে। বলেছিল, 'কী জন্যে গান শুনিস?'

'শেখার জন্যে।' মুখ না তুলেই শিবনাথ উত্তর দিয়েছিলেন।

কয়েক পলক স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে বিজলী জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুই গান জানিস?'

'না। হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতে পারি না।'

'তবে?'

'গান শুনলে গলায় তুলে নিতে পারি।'

'মিথ্যে কথা।' একটু ভেবে বিজলী এবার জানতে চেয়েছিল, 'কদ্দিন লুকিয়ে লুকিয়ে আমার গান শুনছিস?'

শিবনাথ বলেছিলেন, 'অনেকদিন।'

'আমার ক'টা গান তুলেছিস?'

আচমকা বিজলী দৌড়ে এসে তার একটা হাত ধরে টানতে টানতে গানবাজনার ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'যে ক'টা গান তুলেছিস, সব শুনব। যদি গাইতে না পারিস, প্যান্ট খুলে ন্যাংটো করে গায়ে রেড়ির তেল মাখিয়ে চাবকাব। তারপর লাথি মারতে মারতে বাড়ির বাইরে করে দেব।'

শিবনাথ এ কথার কী উত্তর দেবে, সে চুপ করে ছিল। বিজলী তাকে বসিয়ে নিজে তার মুখোমুখি বসে গম্ভীর রুক্ষ গলায় বলেছিল, 'এবার আরম্ভ কর।'

শ্বাসরুদ্ধের মতো কয়েক সেকেণ্ড বসে ছিলেন শিবনাথ। তারপর চোখ বুজে একটার পর একটা গান গেয়ে গেছেন।

শুনতে শুনতে বিজলীর কপালের ভাঁজ মুছে গিয়েছিল, ভুরু স্বাভাবিক হয়েছিল, চোখের দৃষ্টি ক্রমশ মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। অবাক বিস্ময়ে সে শুধু শিবনাথকে দেখেই যাচ্ছিল, দেখেই যাচ্ছিল।

গান শেষ হলে কোমল গলায় বিজলী বলেছিল, 'তুই তো চমৎকার গাস। গান শিখবি?'

শিবনাথ চোখ মেলেছিলেন, 'কে শেখাবে?'

'আমি শেখাব।'

সত্যিসত্যিই গান শেখাতে শুরু করেছিল বিজলী। এবং সেদিন থেকেই।

তার যা কিছু জানা ছিল, টপ্পা-ঠুংরি-গজল-পুরাতনী-ভক্তিগীতি—কয়েক বছরের মধ্যে সব ঢেলে দিয়েছিল শিবনাথকে। হারমোনিয়াম, সেতার বা অন্য কোনো রকম মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাতে জানতেন না শিবনাথ। বিজলী হাতে ধরে চার পাঁচ রকমের বাজনা তাঁকে শিখিয়েছিল। বাজনার সঙ্গে গলা মিলিয়ে কী করে গাইতে হয় তার তালিমও দিয়েছিল।

এমনিতে বিজলী ছিল ভয়ানক রকমের মেজাজী, রাগী আর খামখেয়ালী। কিন্তু গান শেখাবার সময় তার বড় যত্ন, বড় মমতা। গানবাজনার জন্য তার ছিল তীব্র অথচ পবিত্র একটি প্যাসন।

গানের জনাই খুব সম্ভব শিবনাথের ওপর বিজলীর মায়া পড়ে গিয়েছিল। তিনি যাতে এই লাইনে দাঁড়াতে পারেন সেজন্য সে শোভাময়কে খুব ধরেছিল।

বিজলীর বাবু শোভাময় গান বাজনা দারুণ ভালবাসতেন। ভূপাল থেকে, ইন্দোর থেকে, লখনৌ কি পুনা থেকে বড় বড় ক্ল্যাসিক্যাল আর্টিস্ট আনিয়ে সেকালের কলকাতায় যে গানের আসর বসানো হত, তিনি ছিলেন তার একজন বড় পেট্রন। ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকই না, লাইট মিউজিকও তিনি পছন্দ করতেন। উচ্চাঙ্গই হোক, আধুনিকই হোক, গান বাজনার সব ব্যাপারেই ছিল তাঁর অফুরন্ত উৎসাহ। তখনকার দিনে লাইট মিউজিকের যে জলসাটলসা হত তিনি তার কোনোটার প্রেসিডেন্ট, কোনোটার সেক্রেটারি।

খুবই বড় মনের মানুষ ছিলেন শোভাময়। তার ওপর বেজায় ফুর্তিবাজ। এক চোখ টিপে শিবনাথের সামনেই তিনি বিজলীকে বলেছিলেন, 'কী ব্যাপার গো চাঁদবদনী, ওই ছোকরাকে নিয়ে যেভাবে লেগেছ, আমার বোধ হয় স্ট্রোক হয়ে যাবে।'

কপাল কুঁচকে বিজলী জিজ্ঞেস করেছিল, 'মানে?'

'মানেটা জলের মতো। ছোকরাকে এতদিন গান শেখালে, এখন আমাকে বলছ তার জন্যে রেডিওতে জলসায় চান্স করে দিতে। এর পর বলবে রেকর্ড কোম্পানিকে দিয়ে ডিস্ক বার করতে। যেভাবে ওর দিকে তোমার টান বাড়ছে, একদিন হয়তো দেখব মেন লাইন থেকে আমাকে হটিয়ে ছোকরা ইন করে গেছে। বুড়ো বয়েসে এই দাগাটা দেবে চন্দ্রমুখী!' বলে আদরের ভঙ্গিতে বিজলীর নাকের ডগায় আলতো করে টুসকি মেরেছিলেন।

বিজলীর চোখের তারায় আগুনের ফুলকি দেখা দিয়েছিল। ধাঁ করে পাশের টেবল থেকে একটা পেতলের ফুলদানি তুলে নিয়েছিল সে।

চোখের পলকে ঘরের কোণে সরে গিয়েছিলেন শোভাময়। ততক্ষণে বিজলী টিপ করে ফুলদানিটা ছুঁড়ে মেরেছিল। ক্রিকেট মাঠের পাকা ফিল্ডারের মতো সেটা লুফে নিয়েছিলেন শোভাময়। বার চোদ্দ বছর ধরে বিজলীকে তিনি রেখেছেন। এত কাল বিজলী ফুলদানি টুলদানি ছুঁড়ে এসেছে এবং তিনিও

লুফে এসেছেন। প্রথম দিকে নিশ্চয়ই আনাড়ি ছিলেন; ক্যাচ লুফে লুফে শেষ পর্যন্ত ওস্তাদ ফিল্ডার হয়ে গিয়েছিলেন।

ফুলদানিটা হাতের ভেতর ঘোরাতে ঘোরাতে জিভের ডগায় চুকচুক করে একটু শব্দ করেছিলেন শোভাময়। বলেছিলেন, 'আরেকটু হলেই আমার মাথাটা ফাটত।'

নিশানায় লাগাতে না পেরে বিজলী খেপে গিয়েছিল। সট করে টেবল থেকে এবার একটা অ্যাশ-ট্রে তুলে নিয়েছিল সে। ছুঁড়বার আগেই শোভাময় দু হাত জোড় করে বলেছিলেন, 'আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। ক্ষমা—ক্ষমা—'

বিজলী অ্যাশ-ট্রেটা নামিয়ে রেখে হেসে ফেলেছিল, 'ঠিক আছে, ক্ষমা করলাম।' সত্যিসত্যিই শোভাময়কে গভীরভাবে ভালবাসত সে। রুচিটাও ছিল তার অত্যন্ত মার্জিত। নোংরা ঠাট্টা-ইয়ার্কি একেবারেই পছন্দ করত না। তা ছাড়া, পলকে যেমন তার মেজাজ চড়ে যেত তেমনি চোখের পাতা পড়তে না পড়তেই আবার সেটা জলও হয়ে যেত।

'বাঁচালে বাবা—' ঘরের কোণ থেকে সরে এসে বিজলীর কাঁধে একটা হাত রেখে সোফায় গিয়ে বসেছিলেন শোভাময়।

বিজলী বলেছিল, 'খুব তো সোহাগ হচ্ছে। শিবের কী হবে?'

শোভাময় রগড় করে বলেছিলেন, 'চন্দ্রাননে, তুমি যখন হুকুম করেছ, সব হবে।' শিবনাথের দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'দারুণ একখানা লাক করে এসেছিলি রে হারামজাদা। লাইফে যদি কোনোদিন সত্যি সত্যি দাঁড়াতে পারিস এই মহিলাটিকে মনে রাখিস।' রক্ষিতা হলেও বিজলীকে যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন শোভাময়।

বিজলীর কথাতেই জলসায় আর রেডিওতে শিবনাথের গাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন শোভাময়। বিজলীর কাছ থেকে খাঁটি জিনিসই পেয়েছিলেন শিবনাথ। তার ওপর ছিল তাঁর নিজস্ব রেওয়াজি গলা। দু এক বছরের মধ্যেই নাম ছড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর। ভাল পয়সাও আসছিল। এতে তিনি যত খুশি, তার দশগুণ আনন্দ পেয়েছিল বিজলী। নিজের তৈরি প্রোডাক্ট বাজারে চড়া দামে বিকোতে দেখলে কার না আনন্দ হয়।

নাম বা পয়সা আসতে শুরু করলেও বিজলীকে ছেড়ে যান নি শিবনাথ; তার কাছে থাকতেন। বিজলী ছিল তাঁর গানের গুরু। খুব ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েছিলেন। মায়ের মুখ ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ত না শিবনাথের। বাড়িতে মা-বাবার বিয়ের সময়কার পুরনো হলদেটে একটা ফোটো ছিল। সেটাই তাঁর শেষ স্মৃতি। দু নম্বর বিয়ের পর ফোটোটা বাবা কোথায় সরিয়ে ফেলেছিল, কে জানে। সারা বাড়ি তোলপাড় করেও সেটা খুঁজে পান নি শিবনাথ। পরে বিজলীর কাছে আসার পর মায়ের কথা মনে করতে গেলেই বিজলীর মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠত।

গানের স্কোপ পাবার দু তিন বছরের মধ্যেই বাজারে রেকর্ড বেরিয়ে গিয়েছিল শিবনাথের। তারও এক বছর পর সিনেমায় প্লে-ব্যাক করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু সিনেমা হলে বসে নায়কের গলায় তাঁর গান শুনে যেতে পারে নি বিজলী। ছবিটা রিলিজ করার দু মাস আগে দশ দিনের জ্বরে মারা গিয়েছিল।

মায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না শিবনাথের। তখন তাঁর বয়স মোটে চার কি পাঁচ। বিজলীর মৃত্যুর পর সেই প্রথম তিনি অনুভব করেছিলেন, এতদিনে মাতৃহীন হয়েছেন।

অবুঝ শিশুর মতো বিজলীর মৃতদেহ জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলেন শিবনাথ। বিজলীর ক্লাসের মেয়েমানুষদের আপনজন বলতে কেউ থাকে না। শ্মশানে গিয়ে পেটের ছেলের মতো তার মুখাগ্নি করেছিলেন শিবনাথ। পুরো তের দিন গলায় ধড়া নিয়ে অশৌচের সাজ পরে হবিষ্যি থেকে শুরু করে পুরুত ডাকিয়ে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত করিয়েছিলেন। সন্তানের যা যা করণীয়, কিছুই তিনি বাদ দেন নি। বদমেজাজ, রাগ, গালাগাল, হাতের সামনে যা কিছু পেয়ে ছুঁড়ে মারা, মদ্যপান, যত্ন, মমতা, মায়া—টুকরো টুকরো এইসব স্মৃতি দিয়ে বানানো বিজলীর একটি পোর্ট্রেট আজীবন বুকের ভেতর আঁকা হয়ে আছে শিবনাথের।

শোভাময়ও বিজলীর মৃত্যুতে খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। তার মৃতদেহের পাশে স্তব্ধ হয়ে তিনি বসে

থেকেছেন; চোখ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়েছে। হৃদয়বান ফুর্তিবাজ মানুষটি একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন।

শ্রাদ্ধ চুকে যাবার পর এ বাড়িতে আর ভাল লাগছিল না শিবনাথের। যদিও বাড়িটা বিজলীর নামে, আসলে মালিক শোভাময়ই। রক্ষিতার মৃত্যুর পর তার আশ্রিতের পক্ষে তারই বাবুর বাড়িতে থাকাটা ভাল দেখায় না। অবশ্যই শোভাময় মানুষ হিসেবে চমৎকার এবং শিবনাথের শুভাকাঙ্ক্ষী। তবু অস্বস্তি হচ্ছিল তাঁর। একদিন সোজা শোভাময়ের কাছে গিয়ে মুখ নিচু করে তিনি বলেছিলেন, 'এবার আমি কী করব?' বিজলীর বাড়িতে থাকবেন কিনা, তাঁর কথায় তারই ইঙ্গিত ছিল।

শোভাময় বলেছিলেন 'বিজলী তোকে খুব ভালবাসত। ইচ্ছে করলে তুই এ বাড়িতে থাকতে পারিস। আমার আপত্তি নেই।

শিবনাথ চুপ করে ছিলেন।

শোভাময় জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী হল রে?'

শিবনাথ এবার বলেছিলেন, 'মা নেই। আমার এখানে খুব খারাপ লাগছে। অনুমতি করুন, আমি চলে যাই।' সেই প্রথম বিজলী সম্পর্কে 'মা' শব্দটা উচ্চারণ করেছিলেন।

স্থির চোখে এক পলক শিবনাথের দিকে তাকিয়ে থেকে শোভাময় বলেছিলেন, 'তোর যা ভাল মনে হয়—কর।'

পরের দিনই নিজের যা কিছু ছিল সব একটা স্যুটকেসে পুরে মির্জাপুর স্ট্রিটের এক মেসে চলে এসেছিলেন শিবনাথ। সেখানে বছর দুই কাটবার পর বোম্বাইয়ের এক ফিল্ম কোম্পানি তাঁর সঙ্গে কনট্রাক্ট করেছিল। ঠিক হয়েছিল, শিবনাথ বোম্বাইতে গিয়ে প্লে-ব্যাক করে আসবেন। কিন্তু প্লে-ব্যাক করতে এসে বোম্বাই থেকে তাঁর আর ফেরা হয় নি। এখানেই থেকে যেতে হয়েছিল।

বোম্বাইতে শিবনাথ উঠেছিলেন দাদার রেল স্টেশনের কাছে এক হোটেলে। তাঁর গাওয়া প্রথম হিন্দি ছবির গান হিট করার পর কনট্রাক্টের পর কনট্রাক্ট আসতে শুরু করেছিল। বাজারে তাঁর ফিল্মি গানের রেকর্ড তো বেরুচ্ছিলই; রঙিন পপ ম্যাগাজিনগুলোতে তাঁর ইন্টারভিউ আর ছবিও ছাপা হচ্ছিল। বোম্বাইতে, শুধু বোম্বাইতে কেন, কয়েক বছরের মধ্যে সারা ইণ্ডিয়ায় তিনি সব চাইতে পপুলার গায়ক হয়ে গিয়েছিলেন।

ততদিনে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। বম্বেকে অনেক আগে থেকেই বলা হত 'ওয়েস্টার্ন সিটি অফ ইণ্ডিয়া।' ইণ্ডিপেনডেন্সের পর সেখানে পুরোপুরি পশ্চিমী হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। ইংরেজি তখন থেকে ওখানকার লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা। 'মড' পোশাক, ফ্রি মিক্সিং, গাদা গাদা বিয়ার শপ, যুবক যুবতীদের ড্রাগ অ্যাডিকশান—সব মিলিয়ে বম্বে যেন ভারতবর্ষের কোনো অংশ নয়; অতি দ্রুত এই শহর চালচলন এবং চরিত্রে ইওরোপ বা আমেরিকার একটি মেট্রোপোলিস হয়ে উঠতে শুরু করেছিল।

এখানকার সব কিছুই যখন ওয়েস্টার্ন তখন গান বাজনাতেও তার ইনফ্লুয়েন্স তো পড়বেই। সেই সময় থেকে বোম্বাইতে পপ সিঙ্গারদের নিয়ে জলসা বসানো হত। এইসব জলসাতে দারুণ জনপ্রিয় ছিলেন শিবনাথ। এমনিতেই তিনি দুর্দান্ত সুপুরুষ; ইংরেজিতে যাকে বলে 'ম্যানলি', ঠিক তাই। তার ওপর অডিয়েন্সকে কী করে চার্ম করে রাখতে হয় সেই ম্যাজিকটা তাঁর হাতের মুঠোয় ছিল। শিবনাথ করতেন কি, সেই আমলের সব চাইতে মড পোশাক—অর্থাৎ বাট ইঞ্চি ঘেরের ট্রাউজার্স, আর নামাবলী কিংবা খবরের কাগজের ছাপ মারা বুকখোলা অদ্ভুত ডিজাইনের শার্ট, আট ইঞ্চি সোলের জুতো, প্রকাণ্ড গোল চশমা পরে, হাতে মাইক নিয়ে ডায়াসের ওপর কখনও লাফিয়ে, কখনও নেচে, কখনও প্রায় ডিগবাজি খেয়ে গাইতেন। গাইতে গাইতে অডিয়েন্সের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলতেন, 'হাই—কাম অন, জয়েন মি প্লিজ—' মুহূর্তে গোটা 'শো' তাঁর হাতের মুঠোয় চলে আসত। কাগজগুলো তাঁর সম্বন্ধে লিখত, 'মিউজিক ওয়ার্ল্ডের বেস্ট শো-ম্যান।'

শিবনাথ যখন হলের দিকে আঙুল বাড়িয়ে তাঁর সঙ্গে গাইবার জন্য ডাকতেন, কেউ উঠে আসত না। তবে অনবরত হাততালি দিয়ে তাঁর শো-ম্যানশিপকে তারিফ করে যেত।

এইরকম এক গানের ফাংশানে চন্দ্রার সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল শিবনাথের। গাইতে গাইতে যখন তিনি অডিয়েন্সের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলেছিলেন, 'এনিবডি, প্লিজ জয়েন মি—' আচমকা সামনের দিকের একটা সীট থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল চন্দ্রা। দারুণ 'মড' মেয়ে সে। পরনে শার্ট আর

ট্রাউজার্স, চোখে অদ্ভুত চেহারার কালার গ্লাস। খুব সহজভাবে ডায়াসে উঠে এসে আরেকটা মাইক নিয়ে শিবনাথের পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে করে বলেছিল, 'থ্যাঙ্ক ইউ ফর গিভিং মি অ্যান অপরচুনিটি টু সিং অ্যাণ্ড ডান্স উইথ ইউ।'

শিবনাথ বলেছিলেন, 'ইট'স প্লেজার টু হ্যাভ ইউ অ্যাজ আ পার্টনার। ইয়াং লেডি, ইউর নেম প্লিজ—'

'চন্দ্রা মালকানি—'

'ফাইন।' বলেই মাইকটা মুখের কাছে এনে শিবনাথ বলেছিলেন, 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, লেট মি ইনট্রোডিউস ইউ টু মাই বিউটিফুল পার্টনার। শী ইজ চন্দ্রা মালকানি। থ্যাঙ্ক ইউ এভরিবডি। লেট'স স্টার্ট—'বম্বেতে থাকতে থাকতে ইংরেজিটা জলের মতো বলতে শিখেছিলেন তিনি।

এরপর শুরু হয়েছিল গান ; সেই সঙ্গে নাচের ভঙ্গিতে শরীর দোলানো। মিউজিক হ্যাণ্ডরা ডায়াসের পেছনে দাঁড়িয়ে নাচ এবং গানের সঙ্গে তাল লিয়ে বঙ্গো, ম্যাণ্ডোলিন, ব্যাঞ্জো ইত্যাদি চড়া সুরে বাজিয়ে যাচ্ছিল।

চন্দ্রার গলা খুব একটা ভাল ছিল না। তবে ফ্লোর ড্যান্সটা সে চমৎকার জানত। ভাল গাইতে না পারলেও সেটা সে পুষিয়ে দিচ্ছিল সারা শরীরে ওয়েস্টার্ন ড্যান্সের মুদ্রা ফুটিয়ে।

এভাবে অডিয়েন্সের ভেতর থেকে কাউকে পার্টনার করে শিবনাথের আগে আর কেউ বম্বে সিটিতে ফাংশান করে নি। দর্শকরা থেকে থেকেই হুল্লোড় বাধিয়ে মাতালের মতো চিৎকার করছিল আর হাততালি দিয়ে যাচ্ছিল। ফাংশানের পর অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে যুবক যুবতীরা তাঁকে মাছির মতো ছেঁকে ধরেছিল। ফুলের তোড়ায় তোড়ায় তারা শিবনাথকে একেবারে ঢেকে দিয়েছিল।

শুধু শিবনাথই নন, তাঁর পার্টনার হিসেবে চন্দ্রাকেও প্রচুর অটোগ্রাফ দিতে হয়েছে। ফুলের তোড়া আর কনগ্র্যাচুলেশানস সে-ও কম পায় নি। তখন চন্দ্রার বয়স কুড়ি বাইশ। আচমকা একটি অল্প বয়সের মেয়ে এত অভিনন্দন টভিনন্দন পেয়ে একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিল। তার ভালও লাগছিল খুব। ভিড় একটু কমলে শিবনাথকে বলেছিল,'এ সব আপনার জন্যে। আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ।' তার চোখেমুখে এবং কণ্ঠস্বরে কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছিল।

শিবনাথ বলেছিলেন, 'আমার জন্যে কিচ্ছু না। আপনার ক্রেডিটেই পেয়েছেন। ব্রিলিয়ান্ট পারফর্মেন্স হয়েছে আপনার।'

'থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজকের কথা আমি কোনোদিন ভুলব না। ইট'স এ মেমোরেবল নাইট ফর মি।'

'আমার পক্ষেও।'

চন্দ্রা এবার বলেছিল, 'আবার কবে দেখা হবে?'

শিবনাথ বলেছিলেন, 'এনি ডে—'

'আপনি কোথায় থাকেন?'

শিবনাথ তাঁর হোটেলের ঠিকানা দিয়েছিলেন, এবং ফোন নাম্বারও।

চন্দ্রা বলেছিল, 'আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। আপনাকে কি নামিয়ে দিয়ে যাব?'

শিবনাথ বলেছিলেন, 'ধন্যবাদ। তার দরকার নেই।' আসলে নতুন ধরনের একটা স্টান্ট বা চমক দেবার জন্য তিনি চন্দ্রাকে ডায়াসে ডেকে নিয়েছিলেন। ফাংশানের পর তার সম্বন্ধে তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। প্রফেশনাল ইন্টারেস্ট আর কেরিয়ার ছাড়া তখন আর কিছু বুঝতেন না শিবনাথ। তা ছাড়া চন্দ্রার গাড়িতে যে লিফট নেন নি তার একটা কারণও ছিল। ফাংশানের অর্গানাইজারদের সঙ্গে আগে থেকেই কথা হয়েছিল; তারা, তাঁকে হোটেলে পৌঁছে দেবে।

চন্দ্রা বলেছিল, 'আচ্ছা, গুড নাইট—'

'গুড নাইট।'

দিন কয়েক বাদে বম্বের পপ ম্যাগজিনগুলোতে আর খবরের কাগজে গান বাজনার জন্য নির্দিষ্ট পাতায় সেদিনের সেই ফাংশানের উচ্ছ্বসিত রিপোর্ট বেরিয়েছিল। সেই সঙ্গে শিবনাথ এবং চন্দ্রার ছবি। কখন কাগজের ফোটোগ্রাফাররা ছবি তুলেছিল টের পাওয়া যায়নি। মোট কথা, সেদিনের ফাংশানটা বম্বে সিটিতে ঢেউ তুলে দিয়েছিল।

ছবি আর রিপোর্ট বেরুবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছিল। একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠবার পর হোটেলে নিজের ঘরের জানালার ধারে বসে শিবনাথ চা খাচ্ছেন, একটা লেটেস্ট মডেলের ইমপোর্টেড আমেরিকান গাড়ি এসে সামনের রাস্তায় পার্ক করেছিল। দরজা খুলে যে নেমে এসেছিল সেই মুহূর্তে তার কথা ভাবছিলেন না শিবনাথ। আসলে সেদিন ফাংশানের পর হোটেলে ফিরে আসতে আসতে চন্দ্রা মালকানিকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। তারপর আর তার কথা মনে পড়ে নি।

চন্দ্রার হাতে ছিল বেশ বড় আকারের ফ্যাশনেবল লেডিজ হ্যাণ্ডব্যাগ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে তেতলার জানালায় শিবনাথকে দেখে সে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'হাই—'

চন্দ্রা ঠিকানা নিয়েছিল ঠিকই কিন্তু সত্যি সত্যিই যে হোটেল পর্যন্ত চলে আসবে, এতটা ভাবতে পারেন নি শিবনাথ। তিনি অবাক হয়েছিলেন, এবং খুশিও। মানুষ হিসেবে যে যতই প্রফেশানাল হোক, সকালবেলা ঘুম ভাঙার পর আচমকা একটা সুন্দরী মড মেয়েকে দেখলে কে আর খুশি না হয়। শিবনাথ ওপর থেকে হাত নেড়েছিলেন, 'হাই—'

চন্দ্রা এবার বলেছিল, 'রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখবেন নাকি? ওপরে যেতে বলবেন না?'

শিবনাথ লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলেন, 'আসুন আসুন। ওই যে ডান দিকে এনট্রান্স। ভেতরে ঢুকেই 'রিসেপশান' দেখতে পাবেন ; তার পাশ দিয়ে স্টেয়ার—'

দু মিনিটের মধ্যে চন্দ্রা তেতলায় শিবনাথের ঘরে চলে এসেছিল। শিবনাথ বলেছিলেন, 'ওয়েলকাম টু গরিবখানা—'

শিবনাথের ঘরটা বেশ বড়ই। চারদিকে রেকর্ডের স্তূপ। এ ছাড়া রয়েছে রেকর্ড প্লেয়ার, অডিও সিস্টেম টেপ রেকর্ডার। তা ছাড়া রয়েছে তানপুরা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি ইত্যাদি। শার্ট-ট্রাউজার্স-টাই-মোজা—সব এলোমেলো ছড়িয়ে রয়েছে। এরই মধ্যে একধারে একটা সিঙ্গল বেড কট, আরেক পাশে গোটা দুই সোফা। আরেক কোণে একটা ওয়ার্ডরোব ; তার পাল্লা হাঁ হয়ে ছিল। ওয়ার্ডরোবের পাশে ড্রেসিং টেবল। তার ওপর নানা রকম কসমেটিকসের সঙ্গে শেভিং বক্স।

সোফায় বসতে বসতে চন্দ্রা বলেছিল, 'তিন চার দিন ধরে ভাবছিলাম আপনার হোটেলে চলে আসব। একটা না একটা প্রবলেম এসে যাচ্ছিল। আজ সকালে উঠে ঠিক করে ফেললাম, আপনাকে একটা সারপ্রাইজ দেবই। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।'

শিবনাথ বললেন, 'মোস্ট প্লেজান্ট সারপ্রাইজ। আমার খুব ভাল লাগছে।'

'বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বলছেন। হাইপারবোল।'

'একেবারেই না। ইট'স প্লেন ট্রুথ। এর চাইতে সত্যি কথা আমি আমার লাইফে আর কখনও বলি নি।'

'আপনাকে নিয়ে আর পারা যায় না।'

একটু চুপ। তারপর চন্দ্রা আবার বলেছিল, 'জানেন, আপনি কী কাণ্ড করে বসেছেন?'

'কী?' চন্দ্রার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন শিবনাথ।

হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে খবরের কাগজ আর পপ ম্যাগাজিনের গাদা গাদা ক্লিপিং বার করে দেখিয়েছিল চন্দ্রা। সেদিনের ফাংশানের রিপোর্ট এবং শিবনাথ আর চন্দ্রার ছবি সেই ক্লিপিংগুলোতে ছিল। চন্দ্রা বলেছিল, 'আপনার সঙ্গে আমার ছবি বেরুবার পর রোজ কত ফোন যে আসছে! আই ফীল প্রাউড।'

শিবনাথ আর কী বলবেন, অল্প হেসেছিলেন।

এর পর এলোমেলো একটানা কথা বলে গিয়েছিল চন্দ্রা। সে সবের বিশেষ কোনো মানে হয় না। মুগ্ধ 'ফ্যানে'দের কথায় যা থাকে তা হল বীয়ারের ফেনার মতো উচ্ছ্বাস।

ঘণ্টা দুই বকবকানির পর সেদিন চলে গিয়েছিল চন্দ্রা। যাবার সময় বলেছিল, 'আমি কিন্তু দুমদাম আপনার হোটেলে চলে আসব।'

শিবনাথ বলেছিলেন, 'মোস্ট ওয়েলকাম।'

'আরেকটা কথা।'

'বলুন।'

'আই লাইক টু কাম ক্লোজ। 'আপনি' 'টাপনি' করে বলতে ভীষণ খারাপ লাগছে। এখন থেকে

আমরা 'তুমি' করে বলব। ও.কে?'

শিবনাথ মনে মনে ভেবেছিলেন, মেয়েটা ফেঁসেছে। হেসে হেসে বলেছিলেন, 'অ্যাজ ইউ লাইক।'

সেই ফাংশানের পর বম্বে শহরে মিউজিক্যাল সয়রীর হুজুগ পড়ে গিয়েছিল। এ শহর কোনো চমকের জন্য যেন সব সময় ঘাড়ের রগ টান করে বসে আছে। তেমন কিছু ঘটলে তাই নিয়ে উন্মাদের মতো মাতামাতি শুরু হয়ে যায়।

যেহেতু শিবনাথ একটা সেনসেশন এনেছেন সে জন্য যত ফাংশান হত, সবগুলোতেই অর্গানাইজাররা তাঁকে টেনে নিয়ে যেত। আর অনিবার্যভাবেই প্রত্যেকটা ফাংশানে চন্দ্রাকে দেখা যেত। শিবনাথ যখন মাইক হাতে নিয়ে গাইতে গাইতে অডিয়েন্সের দিকে হাত বাড়িয়ে বলতেন, 'কাম অন এনিবডি অর এভরিবডি, অ্যাণ্ড প্লিজ জয়েন মি—'তখন কেউ উঠবার আগেই চন্দ্রা চোখের পলকে ডায়াসে চলে আসত। তারপর দর্শকদের উন্মত্ত চিৎকার আর হুল্লোড়ের মধ্যে ফাংশান শেষ হত। তারও পর ম্যাগাজিনে আর খবরের কাগজে ছবি আর রিপোর্ট বেরুত। এইভাবে শিবনাথ আর চন্দ্রা গানের ফাংশনে 'মোস্ট পপুলার পেয়ার' হয়ে উঠেছিল।

গানের আসরে তো দেখা হচ্ছিলই। তা ছাড়া চন্দ্রা প্রায় রোজই শিবনাথের কাছে চলে আসত। যেদিন তাঁর প্লে-ব্যাক রেকর্ডিং থাকত সেদিন তারদেও-এর স্কোরিং-এ চলে যেত। শিবনাথের প্রায় সারাক্ষণের সঙ্গিনী হয়ে উঠেছিল চন্দ্রা এবং দু'জনে পরস্পরের অনেক কাছাকাছিও চলে এসেছিল।

ততদিনে চন্দ্রাদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জেনে গিয়েছেন শিবনাথ। ওর বাবা একজন মাল্টি মিলিওনেয়ার। বম্বের অনেক কোম্পানিতে তাঁর শেয়ার ছিল। তা ছাড়া ছিল বিরাট এক্সপোর্ট বিজনেস। ইণ্ডিয়া থেকে সে আমলে আফ্রিকায় যত রেডিমেড গারমেন্ট যেত তার সিকি ভাগ পাঠাত চন্দ্রারা। তখনও দেশ ভাগ হয়নি। করাচিতে ওদের তিন পুরুষের শিপিং বিজনেসও ছিল।

চন্দ্রারা দুই ভাই, দুই বোন। ভাইবোনদের মধ্যে চন্দ্রা সবার ছোট। মহালছমীতে পুরনো আমলের প্রাসাদের মতো গথিক স্ট্রাকচারের বিরাট একটা বাড়ি ছিল ওদের ; আর মালাবার হিলসে ছিল ফ্যাশনেবল বাংলো। গাড়ি ছিল গণ্ডা গণ্ডা। শাড়ি বা সালোয়ার কামিজ পালটাবার মতো নতুন নতুন গাড়ি নিয়ে শিবনাথের হোটেলে আসত সে।

একদিন শিবনাথের গান রেকর্ডিং ছিল না, গানের ফাংশানও ছিল না। ভেবেছিলেন গোটা দিনটা ঘুমিয়ে টুমিয়ে অলস মেজাজে কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু দুপুরবেলা হঠাৎ চন্দ্রা এল এবং একরকম জোরজার করে শিবনাথকে তার গাড়িতে তুলে সোজা ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে সমুদ্রের ধারে এসে থামল। জলের পাড় ঘেঁষে পাশাপাশি বসে চন্দ্রা বলেছিল, 'আমি ডিসিসান নিয়েছি।'

'কিসের ডিসিসান?' শিবনাথ চন্দ্রার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে চন্দ্রা বলেছিল, 'তোমাকে ছাড়া আমার একদম ভাল লাগছে না। আই অ্যাম ফিলিং অ্যাবসোলিউটলি লোনলি।'

'কী চাও তুমি?'

'বুঝতে পারছ না?'

শিবনাথ উত্তর না দিয়ে তাকিয়েই ছিলেন। চন্দ্রা তাঁর নাকে আলতো করে একটা টুসকি মেরে বলেছিল, 'বিয়ে করতে।'

শিবনাথ হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, 'তোমাদের বাড়িতে এ বিয়ে মেনে নেবে?'

'বিয়ে তো করব আমরা। কে মানবে আর কে মানবে না, তা নিয়ে আমার হেড-এক নেই। তবে মা-বাবাকে ব্যাপারটা জানাতে হবে। দ্যাটস কার্টসি।' বলে একটু থেমে চন্দ্রা পরক্ষণে আবার শুরু করেছিল, 'তুমি নিশ্চয়ই খুশি হয়েছ?'

দ্বিধার ভঙ্গিতে শিবনাথ বলেছিলেন, 'কিন্তু—'

'বল—'

'এটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।'

'কেন?'

'তোমরা এত বড়লোক, আর আমি সেই তুলনায় এত—'

শিবনাথ তাঁর কথা শেষ করতে পারেন নি। তার আগেই চন্দ্রা বলে উঠেছিল, 'এত গরিব যে

এ বিয়ে ইমপসিবল, তাই তো? এই রটন ডায়লগটা ফিল্মে শুনে শুনে কান পচে গেছে। ওটা নিয়ে ডোন্ট সোয়েট ইওর ব্রেন। কাল বিকেলে কী করছ?'

পরের দিনও শিবনাথের গান রেকর্ডিং বা ফাংশান ছিল না। বলেছিলেন, 'কিছু না।'

'ফাইন। কাল কোনো প্রোগ্রাম রেখ না।'

'কেন?'

'তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব।'

'কোথায়?'

'কালই দেখতে পাবে।'

পরের দিন চন্দ্রা মালাবার হিলে তাদের প্রকাণ্ড ফ্যাশনেবল বাংলোয় শিবনাথকে নিয়ে গিয়েছিল। সবুজ কার্পেটের মতো লনে গার্ডেন আমব্রেলার তলায় বসে তার মাল্টিমিলিওনেয়ার বাবা চম্পালাল মালকানি, মা প্রেমাবতী মালকানি, দুই দাদা ময়ূর আর মাধব এবং এক দিদি মৃদুলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তারপর চম্পালালের দিকে ফিরে বলেছিল, 'আমরা তোমার ব্লেসিং চাই বাবা। উই ওয়ান্ট টু ম্যারি।'

চন্দ্রাদের বাংলোর তলা থেকে আরব সাগর শুরু হয়েছে। সমুদ্রের জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে আসছিল। তবু চম্পালালের সামনে বসে গলগল করে ঘেমে যাচ্ছিলেন শিবনাথ। নার্ভাসনেস!

চম্পলাল কিন্তু উত্তেজিত হন নি। আরামদায়ক বেতের সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে অত্যন্ত সহৃদয় ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে। তবু একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। গান গেয়ে এভারেজ মান্থলি তোমার কত হয়?'

অস্পষ্ট গলায় শিবনাথ বলেছিলেন, 'আট হাজারের মতো।

'আই সী, আই সী। তা হলে তোমাকে পরামর্শ দেব, ডোন্ট ইনভাইট সাফারিং। আমার মেয়ে, আই মীন চন্দ্রা, মাসে কসমেটিকস আর শাড়ি স্ল্যাকসই কেনে দশ হাজার টাকার। অনেস্টলি বলছি, তোমার নাম দেখে, গ্ল্যামার দেখে হুইমসের মাথায় বিয়ে করতে চাইছে। পরে তুমি বিপদে পড়ে যাবে। আই নো মাই ডটার প্রেটি ওয়েল।' বলেই চম্পালাল মালকানি চন্দ্রার দিকে ফিরেছিলেন, 'ডোন্ট ইনভাইট সরো চন্দ্রা—'

চন্দ্রা জেদের গলায় বলেছিল, 'মোটেও আমি হুইমসের মাথায় বিয়েটা করতে যাচ্ছি না।'

'ভাল করে ভেবে দেখ।'

'আই অ্যাম সাফিসিয়েন্টলি গ্রোন-আপ। অনেক ভেবেই ডিসিসান নিয়েছি।'

চম্পালাল বুঝেছিলেন, এ বিয়ে আটকানো যাবে না। একটু ভেবে বলেছিলেন, 'শিবনাথের যা ইনকাম তাতে সংসার চলে না। বিয়ের পর আমাকে কত সাবসিডি দিতে হবে?'

শুনে কান ঝাঁ ঝাঁ করতে শুরু করেছিল শিবনাথের। একবার ভেবেছিলেন উঠে চলে যান, কিন্তু পেরেক ঠুকে কেউ যেন তার পা দুটো লনের মাটিতে আটকে দিয়েছিল।

চন্দ্রাই সেদিন শিবনাথের সম্মান বাঁচিয়ে দিয়েছে, 'বিয়ের পর তোমার পয়সা নেব কেন?'

'গুড, ইয়াং লেডি। আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইওর স্পিরিট। তবে আজকের এই কথাটা যেন মনে থাকে।'

'ডেফিনিটলি থাকবে।'

এর কয়েকদিন বাদে বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল। মালাবার হিলে চম্পালাল মালকানির সঙ্গে আলাপ হবার পরও শিবনাথ আপত্তি যে করেন নি, তা নয়। কিন্তু আপত্তিটা তেমন জোরাল ছিল না। আসলে চন্দ্রার মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ ছিল, সব কিছু আচ্ছন্ন করে দেবার মতো এমন একটা প্রবল ক্ষমতা, তা অগ্রাহ্য করা যায় না। আরব সাগরের একরোখা দমকা বাতাসের মতো একদিন সে এসেছিল তাঁর কাছে, তারপর শুকনো পাতার মতো তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তবে গোপনে। মনে মনে শিবনাথ এটাই তো চেয়েছিলেন। তাঁর যেটুকু আপত্তি তা সংস্কার মাত্র; জন্মের পর থেকে গরিব বা মধ্যবিত্তের রক্তে ওটা থেকেই যায়।

বিয়ের পর হোটেল ছেড়ে চন্দ্রাকে নিয়ে সামনের একটা বড় ফ্ল্যাটে চলে এসেছিলেন শিবনাথ। এই সময়টা তাঁর জীবনের গোল্ডেন পিরিয়ড। নাম, পয়সা, গ্ল্যামার—সব হু হু করে বেড়ে যাচ্ছিল।

সেই সঙ্গে আরো একটা ঘটনা ঘটেছিল।

তাঁদের বাড়ির উলটো দিকে, ঠিক মুখোমুখি, ছিল টানা একটা বস্তি ; বম্বেতে বলে 'চাওল'। তখন প্রায় রোজই গান রেকর্ডিং-এর জন্য সকালে উঠে তারদেওতে যেতে হত শিবনাথকে। ফিল্ম কোম্পানির গাড়িতে উঠতে গিয়ে রোজই দেখতেন 'চাওলে'র সদর দরজায় পাতলা ছিপছিপে সুশ্রী চেহারার একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে লক্ষ করেছে। মেয়েটির চোখে বিস্ময়, মুগ্ধতা, শ্রদ্ধা ইত্যাদি ইত্যাদি। রোজই শিবনাথের মনে হত, মেয়েটি তাঁকে কিছু বলতে চায়।

একদিন গাড়িতে উঠতে গিয়েও উঠলেন না শিবনাথ। রাস্তা পেরিয়ে 'চাওলে'র দরজায় চলে এলেন। বললেন, 'আমাকে কিছু বলবেন?'

মেয়েটি একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিল। তবে খুশিও হয়েছিল খুব ; সেটা বোঝা গিয়েছিল তার চোখমুখের ঝকমকানি দেখে। মেয়েটি লাজুক হেসে বলেছিল, 'আপনার গান আমার ভীষণ ভালো লাগে। আলাপ করতে ইচ্ছে হয় কিন্তু সাহস পাই না।'

শিবনাথ বলেছিলেন, 'আপনার কী নাম?'

'সাধনা—সাধনা পূনেকর! আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন।'

'ঠিক আছে।' শিবনাথ হেসেছিলেন, 'তোমরা এ বাড়িতে থাক?'

'হ্যাঁ।' সাধনা আস্তে মাথা হেলিয়েছিল।

'আজ আমি খুব ব্যস্ত। এখুনি বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। কালও বেরুতে হবে। পরশু দিন বিকেলে আমার কোনো কাজ নেই। ইচ্ছে হলে আমাদের ওখানে আসতে পার। অনেক গল্প করা যাবে। তেতলায় উঠে ছ'নম্বর ফ্ল্যাট।'

'আমি জানি।'

কথামতোই এসেছিল সাধনা। কলিং বেল টিপতে শিবনাথই দরজা খুলে তাকে ভেতরে নিয়ে একটা সোফা দেখিয়ে বলেছিলেন, 'বোসো—'

জড়সড় হয়ে বসে পড়েছিল সাধনা। চন্দ্রাকে ডেকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন শিবনাথ।

সেই যে এসেছিল, তারপর থেকে সাধনা প্রায়ই আসত। শিবনাথ কবে কী রেকর্ড করেছেন, কোন কোন ফাংশানে গেয়ে সেনসেসন এনেছেন, সব তার মুখস্থ। শিবনাথের দুর্দান্ত ফ্যান সে। তার সম্পর্কেও অনেক কথা জেনেছিলেন শিবনাথ। ওরা মারাঠি ব্রাহ্মণ ; সামনের ওই 'চাওলে' থাকে। বাবা নেই, মা আছে। আর আছে ছোট ছোট পাঁচটি ভাইবোন। সাধনা সবার বড়। গত বছর বি.এ পাস করেছে। সংসারটাকে বাঁচাবার জন্য তাকে চাকরি নিতে হয়েছে। টাটাদের কী একটা ফার্মে তখন স্টেনোগ্রাফার-কাম-টাইপিস্টের কাজ করত সাধনা। তার মাথায় বিরাট দায়িত্ব।

এভাবে বছরখানেক চলবার পর জয়ার জন্ম। চন্দ্রার ইচ্ছা ছিল না ছেলেমেয়ে হোক। ডাক্তারের কাছে গিয়ে অ্যাবরশন করিয়ে নিতে চেয়েছিল। কেননা ছেলে মেয়ে মানেই 'ফিগার' নষ্ট হয়ে যাওয়া। অনেক স্বাধীনতা কাটছাঁট হওয়া। তখন হুটহাট যেখানে সেখানে বেরুনো যায় না। একটা অদৃশ্য খাঁচার ভেতর নিজেকে গুটিয়ে আনতে হয়।

শিবনাথ কিন্তু আবরশনে রাজি হন নি। গাদা গাদা কাচ্চাবাচ্চায় বাড়ি বোঝাই হয়ে যাক, কখনই সেটা তাঁর কাম্য ছিল না। তাই বলে একটা কি দুটি ছেলেমেয়ে হবে না, এটাও শিবনাথ ভাবতে পারেন নি। তাঁরই জন্য জয়া অপরিণত ভ্রূণে ডাক্তারের ছুরিতে নষ্ট না হয়ে গিয়ে পৃথিবীর আলো দেখতে পেয়েছিল। বাবার কাছে এই কারণে সে গভীর কৃতজ্ঞ।

স্বামীর জেদের ফলে জয়াকে জন্ম দিলেও নিজের স্বাধীনতা খোয়াতে চায়নি চন্দ্রা। সে ছিল বম্বের হাই সোসাইটির অত্যন্ত 'মড' মেয়ে। তার ক্লাব ছিল, শিবনাথের সঙ্গে ফাংশান ছিল, 'ফিগার' স্কুলে যাওয়া ছিল, বন্ধুবান্ধব নিয়ে হই-হুল্লোড় ছিল। শিবনাথের সঙ্গে বিয়ে হবার পর তারও নতুন নতুন অনেক 'ফ্যান' বেড়ে গিয়েছিল। জননী হবার দাম হিসেবে এ সব ছাড়তে সে কোনো কারণেই রাজি ছিল না। নার্সিং হোম থেকে ফিরে একটু সুস্থ হয়েই সে তার জীবনের পুরনো রুটিনে ফিরে গিয়েছিল।

জয়ার জন্য আয়া ছিল ঠিকই। পয়সা দিয়ে যত্ন যতটা কেনা যায় তার সব ব্যবস্থাই ছিল। শুধু ছিল না মাতৃস্নেহ। তবে অযাচিতভাবে জন্মের পর থেকে একজনের মমতা সে পেয়েছে। সেই মানুষটি হল সাধনা।

ততদিনে সাধনার সঙ্গে এ বাড়ির সম্পর্ক আরো গভীর হয়েছে। রোজ একবার করে শিবনাথদের ফ্ল্যাটে তার আসা চাই। স্বামীর দুর্দান্ত ফ্যান এই ছিপছিপে গরিব স্ট্রাগলিং মেয়েটা সম্পর্কে চন্দ্রার দুশ্চিন্তা বা আশঙ্কা কিছুই ছিল না। নানাভাবে চারদিকে নিজেকে সে এত ছড়িয়ে দিয়েছিল যে সাধনাকে নিয়ে ভাবার জন্য দিনে পাঁচ মিনিটও সময় থাকত না। সাধনা সম্পর্কে যদি তার কোনো মনোভাব থেকে থাকে সেটা হল অবজ্ঞা। দেখা হলে 'কি, কেমন আছ' বা 'বসো'—এই রকম দু একটা কথা বলত চন্দ্রা। বেশির ভাগ দিন আবার তাও বলত না। কিন্তু জয়া হবার পর এই সাধনা সম্বন্ধেই তার আগ্রহ দারুণ বেড়ে গিয়েছিল। প্রায় রোজই সে সাধনাকে বলত, আজ তার ফ্লোর শো আছে কিংবা পার্টি অথবা মাড আইল্যাণ্ডে পিকনিক। সাধনা তো কাছেই থাকে। সে যেন এসে জয়াকে মাঝে মাঝে দেখে যায়। অফিস আর বাড়ির কিছু কাজকর্ম ছাড়া দিনের অনেকখানি সময় সাধনার কেটে যেত জয়ার কাছে। অবশ্য শিবনাথও তাঁর নানারকম ব্যস্ততার মধ্যে সময় পেলেই মেয়েকে নিয়ে থাকতেন।

এ সব জয়ার জানার কথা নয়। সে শুনেছে শিবনাথের কাছে। শিবনাথ জয়ার কাছে তাঁর জীবনের কোনো কিছুই গোপন করেননি।

ছ সাত বছর বয়স থেকে সব কথা অবশ্য মনে আছে জয়ার। চন্দ্রা আগের মতোই ক্লাব-পার্টি, হই-হল্লোড় আর সেনসেসনের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছিল। ততদিনে জয়া স্কুলে যেতে শুরু করেছে।

সাড়ে আটটার মধ্যে বাড়ির কাছে স্কুল বাস এসে যেত। কাজেই সাড়ে ছ'টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে স্নানটান সেরে ব্রেকফাস্ট করে রেডি হয়ে থাকতে হত।

বম্বে শহরে সূর্যোদয় হয় সাতটায়। সাড়ে ছ'টায় এখানে অন্ধকার থাকে। জয়ার মনে পড়ে না, চন্দ্রা ক'দিন তাকে ঘুম থেকে তুলে স্কুলের জন্য রেডি করে দিয়েছে। আগের দিন 'লেট নাইট' করার জের হিসেবে তখন সে ঘুমোচ্ছে। ন'টার আগে তার ঘুম ভাঙত না। শিবনাথ কিন্তু ঘড়িতে ছ'টা বাজলেই নিজে উঠে জয়ার ঘুম ভাঙিয়ে চাকর বাকরদের তুলে স্নানের জল গরম করিয়ে দিতেন। স্নান সারতে সারতে রোদ উঠে যেত। রোদ উঠলেই উলটো দিকের 'চাওল' থেকে সাধনা মাসি চলে আসত। ততদিনে তাকে 'মাসি' বলতে শুরু করেছে জয়া। সাধনা এসেই ক্ষিপ্র হাতে তাকে স্কুল ড্রেস পরিয়ে, চুল আঁচড়ে, রিবন বেঁধে, ব্রেকফাস্ট খাইয়ে পুরোপুরি রেডি করে দৌড়ুতে দৌড়ুতে চলে যেত। তাকে আবার তৈরি হয়ে ট্রেন ধরে অফিসে ছুটতে হবে।

বিকেলবেলা স্কুল থেকে ফিরে ভীষণ খারাপ লাগত জয়ার। তখন মা বা বাবা, কেউ বাড়িতে নেই। বাবা গান রেকর্ডিং-এ, মিউজিক ডিরেক্টরদের বাড়ি কিংবা অন্য কোনো কাজে বেরিয়ে গেছেন। মা হয়তো বাবার সঙ্গে গেছে। তবে বেশির ভাগ দিন অন্য বন্ধুদের সঙ্গেও বেরিয়ে যেত। বাড়িতে চাকর-বাকররা থাকলেও নিজেকে ভয়ানক একলা মনে হত জয়ার। তবে খুব বেশিক্ষণ না। সন্ধেবেলা গ্যালপিং ট্রেনে বাড়ি গিয়েই তার কাছে ছুটে আসত সাধনা মাসি। তার পড়া দেখিয়ে দেবার জন্য টিউটর ছিল। সন্ধেবেলা তিনি পড়াতে আসতেন। ঘন্টাখানেকের বেশি থাকতেন না। পড়াশোনা হয়ে গেলে খানিকক্ষণ গল্পটল্প করে তাকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে চলে যেত সাধনা।

মায়ের সঙ্গে জয়ার সম্পর্কটা ছিল অদ্ভুত। তার সঙ্গে দেখা হত খুব কমই। সকালবেলা যখন সে স্কুলে যাচ্ছে, মা তখন ঘুমন্ত। আবার জয়া যখন ঘুমোচ্ছে, মা তখন বাড়ি ফিরত। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা হয়ে গেলে দারুণ মিষ্টি হেসে বলত, 'হাউ আর ইউ সুইটি?' কিংবা 'কেমন পড়াশোনা হচ্ছে তোমার?' ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনো কোনো দিন তার জন্য প্রকাণ্ড একটা জাপানি ডল, কিংবা মস্ত একটা চকোলেট বা প্যাস্ট্রি নিয়ে আসত চন্দ্রা। ইচ্ছা হলে এক-আধদিন তাকে গাড়িতে করে মেরিন ড্রাইভ, জুহু বীচ বা গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ার কাছে বেড়াতে নিয়ে যেত। নিজের মায়ের মতো নয়, চন্দ্রার ব্যবহারটা ছিল অনেকটা বন্ধুর মায়ের মতো।

এইভাবেই চলে যাচ্ছিল। আচমকা একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। শিবনাথের গলার ভেতরে কিছুদিন থেকেই মাংসের একটা গ্রোথ হচ্ছিল। প্রথম প্রথম সেটা ছিল সর্ষের মতো ছোট; কয়েক মাসের মধ্যে সেটা বড় হয়ে হয়ে মার্বেল গুলির মতো হয়ে উঠল। ভীষণ যন্ত্রণা হত; খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। স্পেশালিস্টদের দেখাতে তাঁরা ভয় পেয়ে গেলেন। জানালেন, ম্যালিগনান্ট গ্রোথ হলে খুবই বিপদের কথা। বায়োপ্সি করিয়ে অবশ্য খারাপ রিপোর্ট পাওয়া গেল না। তবে স্পেশালিস্টরা জানালেন, অপারেশন

করাতেই হবে। মাংসের গুলিটা কেটে বাদ দিতে পারলে শিবনাথ আবার আগের মতো গাইতে পারবেন।

নার্সিং হোমে অপারেশন করা হল। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর দেখা গেল, ভোকাল কর্ডে এমন একটা গোলমাল হয়ে গেছে যে শিবনাথ আর গাইতে পারছেন না। কথা তিনি অবশ্য বলতে পারলেন। তবে কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক হয়ে গেল। কেমন যেন কর্কশ আর চাপা। স্পেশালিস্টদের কাছে ছোটাছুটি করেও কিছু হল না। এই সময়টা শিবনাথকে ভাঙাচোরা বিধ্বস্ত মানুষের মতো দেখাত। দিনরাত তিনি কাঁদতেন।

প্রথম দিকে শিবনাথের জন্য চন্দ্রার খুবই সহানুভূতি ছিল। ক্লাব এবং বন্ধুবান্ধব ছেড়ে সব সময় স্বামীর কাছে কাছেই থাকত সে। কিন্তু যেই জানা গেল শিবনাথ আর গাইতে পারবেন না, তার ব্যবহার এবং চালচলন দ্রুত বদলে যেতে লাগল। ক্লাব, হই-হুলোড় বাড়িয়ে দিল সে। রাতে ফেরার ঠিক থাকত না। দু-এক রাত হয়তো আসতই না।

এই সময়টা স্কুলে যেত না জয়া। সর্বক্ষণ বাবার কাছে থাকত। আরেকটি মানুষও গভীর সহানুভূতি নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। বাবার অপারেশনের সময় অফিস থেকে লম্বা ছুটি নিয়েছিল সাধনা। তারপর ছুটি বাড়িয়ে প্রায় সারাদিনই এ বাড়িতে থাকত। করুণ বিষণ্ণ চোখে বাবাকে লক্ষ করত আর বলত, 'অত ভেঙে পড়বেন না।'

শিবনাথ বলতেন, 'আই অ্যাম ফিনিশড। আমি শেষ হয়ে গেছি সাধনা।' তাঁর চোখ বেয়ে বড় বড় ফোঁটায় জল গড়াতে থাকত। শুধু কাঁদতেনই না তিনি, কারো সঙ্গে কথা টথাও বলতেন না, খেতেন না, এমন কি বাড়ি থেকে বেরুতেন না পর্যন্ত। গভীর ঘন বিষাদ তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরতে শুরু করেছিল যেন।

দিনের বেলাটা নিজের অফিসের জন্য তাড়াহুড়োয় পেরে উঠত না সাধনা মাসি। কিন্তু রাত্তিরে জোর করে কাছে বসে শিবনাথকে সে খাইয়ে যেত।

আবছাভাবে আরো একটা কথা মনে পড়ে জয়ার। মায়ের সঙ্গে ক্বচিৎ কখনও সাধনা মাসির দেখা হয়ে গেলে সে বলত, 'চন্দ্রাদি, আপনি কেন এমন করছেন? এই সময়টা শিবনাথদার কাছে আপনার থাকা দরকার। হী নীডস ইওর কোম্পানি।'

চন্দ্রা সাধনার নাকে আলতো করে টুসকি মেরে বলত, 'শিবনাথের জন্যে তোর খুব সিমপ্যাথি দেখছি।' শেষের দিকে সাধনা মাসিকে 'তুই' করেই বলত সে।

সাধনা বলত, 'মানুষের দুঃখের দিনে সিমপ্যাথি হওয়াই তো স্বাভাবিক।'

'তা হলে এক কাজ কর।'

'কী?'

'আমার হয়ে শিবনাথের ভাবনাটা তুই-ই ভাব।'

এ কথার কী আর উত্তর হয় ; সাধনা চুপ করে থাকত।

মনে পড়ে, এই সময়টা বাবার গানের রেকর্ডিং একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ফাংশান থেকে আর ডাক আসত না। পপ ম্যাগাজিন বা খবরের কাগজের মিউজিক পেজে আর তাঁর ছবি ছাপা হত না। আগে রেকর্ড কোম্পানির লোক, ফিল্মের লোক, ফাংশানের অর্গানাইজাররা, ফ্যানেরা সারাক্ষণ শিবনাথের গায়ে মাছির মতো আটকে থাকত। তা ছাড়া রোজ কোনো না কোনো পপ ম্যাগাজিন থেকে তাঁর ইন্টারভিউ নিতে লোক আসত। তিন মিনিট পর পর টেলিফোন বেজে উঠত। অপারেশনের পর যেই জানাজানি হয়ে গেল তিনি আর গাইতে পারবেন না, লোকজন আসা বন্ধ হয়ে গেল। টেলিফোনটা একেবারে বোবা হয়ে রইল। কোনো ম্যাজিসিয়ান যেন কয়েক পলকের মধ্যে রবার দিয়ে পেন্সিলের দাগ তুলে দেবার মতো তাঁর চারপাশ থেকে হই-চই, ভিড়, গ্ল্যামার—সব কিছু উধাও করে দিল। একজন শুধু তাঁকে ছেড়ে গেল না ; সে সাধনা মাসি।

সেই ছেলেবেলাতেও জয়া টের পেয়েছিল, আগের মতো বাবার হাতে টাকা আসছে না। পুরনো রেকর্ড বিক্রি থেকে কিছু রয়ালটি আসত। আর আসত ব্যাঙ্কে জমানো টাকার কিছু ইন্টারেস্ট। আস্তে আস্তে বাড়ির চাকর-বাকর কমে একজনে এসে ঠেকল। একটা ঝকঝকে নতুন মডেলের আমেরিকান গাড়ি কেনা হয়েছিল ; সেটা বিক্রি হয়ে গেল। মানুষের স্মৃতি থেকে, গ্ল্যামারের ঝালর বসানো ঝকঝকে মঞ্চ থেকে এক ধাক্কায় শিবনাথকে কেউ যেন অন্ধকার সুড়ঙ্গের দিকে ছুঁড়ে দিল। তিনি মুছে যেতে লাগলেন।

এই সময়কার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে জয়ার। একদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে সে অবাক হয়ে গেল। শিবনাথের ঘরের দরজা আটকানো। বাবার গান বন্ধ হবার পর স্কুল থেকে ফিরে রোজই জয়া একই ছবি দেখত; বাবা ড্রইংরুমের জানলার পাশে চুপচাপ বসে আছেন। সেই দিনটাই শুধু ছিল অন্য রকম।

বাড়ির একমাত্র গোয়াঞ্চি চাকর গোমেজ জানিয়েছিল, শোবার ঘরে সাহেব আর মেমসাহেব রয়েছেন। অর্থাৎ বাবা আর মা। এ সময়টা মা কোনোদিন বাড়িতে থাকত না। তা ছাড়া, বেশ কিছুদিন ধরে জয়া বুঝতে পারছিল মায়ের সঙ্গে বাবার সম্পর্কটা ঠিক আগের মতো নেই। অনেক দিন দু জনকে কথা বলতে দেখেনি সে। হঠাৎ বিকেলবেলায় দরজা বন্ধ করে ওঁরা কী করতে পারেন?

সেই বয়সেই অনেক কিছু শিখে গিয়েছিল জয়া। সে বুঝেছিল, মা-বাবার বন্ধ ঘরের দরজায় টোকা দেওয়া ঠিক হবে না। সোজা নিজের পড়ার ঘরে চলে গিয়েছিল সে। সেখানেই ছোট একটা ওয়ার্ডরোবে তার জামা-টামা থাকত। স্কুলের ব্যাগ রেখে ড্রেস বদলে বাথরুম থেকে মুখটুখ ধুয়ে এসেছিল। গোমেজ খাবার এনে দিলে চুপচাপ খেয়ে ড্রইংরুমে বাবা যেখানে ছবি হয়ে বসে থাকতেন সেখানে গিয়ে বসেছিল।

আরো কিছুক্ষণ বাদে শোবার ঘরের দরজা খুলে মা-বাবা বেরিয়ে এসেছিলেন। জয়া লক্ষ করেছিল, বাবার মুখটা একেবারে রক্তশূন্য। একটা ভাঙাচোরা বিধ্বস্ত মানুষের মতো দেখাচ্ছিল তাঁকে। অনেকদিন ভুগবার পর যেমন হয় তেমনি দুর্বল, এলোমেলো পায়ে টলতে টলতেই তিনি ড্রইংরুমের একটা সোফায় এসে বসেছিলেন।

মাকেও খুব একটা সুস্থ স্বাভাবিক মনে হয়নি জয়ার। গলগল করে ঘামছিল সে, তার পা-ও ঠিকমতো পড়ছিল না। মনে হচ্ছিল, অদৃশ্য বক্সিং রিং-এ অনেকক্ষণ রক্তাক্ত যুদ্ধের পর দুই ক্ষতবিক্ষত প্রতিদ্বন্দ্বী যেন বেরিয়ে এসেছে।

মা ড্রইংরুমের ভেতরে আসে নি। বাইরের চওড়া প্যাসেজ থেকে বলেছিল, 'তুমি কখন স্কুল থেকে ফিরলে সুইটি?'

জয়া একবার বাবাকে, একবার মাকে দেখতে দেখতে আবছা গলায় বলেছিল, 'অনেকক্ষণ।'

'পড়া পেরেছ?'

'পেরেছি।'

'গুড।' বলে একটু থেমে মা আবার বলেছিল, 'আমি এখন বেরুচ্ছি। আজ আর ফিরব না। কাল তোমার স্কুল আছে?'

জয়া মাথা হেলিয়ে দিয়েছিল—আছে।

'কাল তুমি স্কুলে যেও না। আমি সকালবেলা এসে তোমাকে নিয়ে এক জায়গায় বেড়াতে যাব। বলে আর দাঁড়ায় নি মা; বড় বড় পা ফেলে বেরিয়ে গিয়েছিল।

চন্দ্রা হঠাৎ হঠাৎ এক-আধদিন তাকে সিনেমা কি চিলড্রেন্স শো অথবা স্কেটিং রিংকে নিয়ে যেত। সারাদিন খুব হইচই করে, বাইরে কোথাও খেয়ে সন্ধেবেলা ফিরে আসত। কিন্তু জয়ার মনে হয়েছিল, পরের দিন স্কুল কামাই করিয়ে মা যে তাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইছে, সেটা শুধু বেড়াবার জন্যই না; তার মধ্যে অন্য কিছু আছে।

বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ডেকেছিলেন, 'জয়া—'

শিবনাথের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে উঠেছে জয়া; সে বাবার দিকে তাকিয়েছিল। শিবনাথ বলেছিলেন, 'চল, আমরা একটু ঘুরে আসি।'

গলায় মাংসের গুলির মতো সেই গ্রোথটা হবার পর থেকে বাবা কখনও তাকে নিয়ে কোথাও বেরোন নি। জয়া অবাক হয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে এক ধরনের ভয় তার বুকের ভেতর থেকে লম্বা পা ফেলে যেন উঠে আসতে শুরু করেছিল। মা আর বাবার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে।

একটু পর শিবনাথ তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। রাস্তায় একটা ট্যাক্সিতে উঠে শিবনাথ বলেছিলেন, ' তোর সঙ্গে একটা খুব দরকারী কথা আছে জয়া—'

জয়া জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী কথা বাবা—'

'গাড়িতে না; কোথাও এক জায়গায় বসে বলব।'

প্রথমে তাঁরা এসেছিলেন জুহু বীচে। জলের ধার ঘেঁষে পাশাপাশি অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও কিছু বলতে পারেন নি শিবনাথ। তখন সন্ধে হয়ে আসছে। চারদিকে লোক গিসগিস করছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে সাগরপাখিরা অদ্ভুত টুই টুই শব্দ করে মাথার ওপর উড়ে বেড়াচ্ছিল।

জয়া দম বন্ধ করে শিবনাথের দিকে তাকিয়ে ছিল। এক সময় কাঁপা গলায় সে জিজ্ঞেস করেছে, 'কী বলবে বাবা?'

আচমকা উঠে পড়েছিলেন শিবনাথ,'না, এখানে না। চল আর কোথাও যাই—'

জয়াকে নিয়ে আরেকটা ট্যাক্সি ধরে শিবনাথ এবার এসেছিলেন ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে, সেখান থেকে হাজি আলিতে, তারপর নরিম্যান পয়েন্ট ছুঁয়ে গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ায়। কিন্তু কোথাও নিজের কথাটা বলতে পারেন নি। সব জায়গাতেই কয়েক মিনিট বসে থেকে হঠাৎ তিনি উঠে পড়েছেন। তারপর বেশ রাত করেই ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছেন। যত সময় কাটছিল ততই তাঁকে বড় বেশি অস্থির, উদ্‌ভ্রান্ত আর অসুস্থ দেখাচ্ছিল। বাবার এরকম অসুস্থতা আগে কখনও দেখে নি জয়া। তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল।

ফ্ল্যাটে ফেরার পর জয়া দেখেছিল, সাধনা মাসি বসে আছে। অফিস ছুটির পর তাদের 'চাওলে' ফিরে পোশাক বদলে কিছু খেয়েই চলে আসত সাধনা। তার কথা সেদিন কারো মনে ছিল না।

এত রাতে জয়া আর শিবনাথকে ফিরতে দেখে সাধনা খুবই অবাক হয়ে গেছে।

এমন ঘটনা আগে আর কখনও ঘটে নি। সে বলেছিল,'কোথায় গিয়েছিলেন আপনারা?'

শিবনাথ বলেছিলেন,'জয়াকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে টেড়িয়ে এলাম। তুমি কখন এসেছ?'

'অফিস ছুটির পরে যেমন আসি।'

'সেই থেকে বসে আছ?'

সাধনা উত্তর দেয় নি।

শিবনাথ একটু ভেবে বলেছিলেন,'যাক, ভালই হল। তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।'

জয়া চমকে উঠেছিল। শিবনাথের কথাটা যে কী, সে জানে না। তবে বাবা তাকে যা বলতে গিয়েও বলতে পারেন নি সেই কথাই কি সাধনা মাসিকে বলবেন? সাধনাও তার মতোই জিজ্ঞেস করেছিল,'কী কথা?'

'পরে বলব। অনেক রাত হয়ে গেছে। জয়াকে আগে খাইয়ে দাও। ও শুয়ে পড়ুক।' শিবনাথ যে কোনো কাজের কথা, বিশেষ করে তাঁর এবং জয়ার ব্যাপারে, অসংকোচে সাধনা মাসিকে বলতে পারতেন। কেননা তদ্দিনে সাধনার ওপর অনেক বিষয়েই নির্ভর করতে শুরু করছিলেন তিনি।

জয়া বুঝতে পারছিল, বাবা তার সামনে সাধনা মাসিকে কিছু বলবে না। কিন্তু কথাটা জানার জন্য ভেতরে ভেতরে ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেছিল সে।

মা বাবার শোবার ঘরের একপাশে জয়ার জন্য ছোট একটি 'কট' ছিল। জয়াকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে তার 'কটে' শুইয়ে গায়ে চাদর টেনে বেশি পাওয়ারের লাইট নিভিয়ে জিরো পাওয়ারের একটা নীল আলো জ্বালিয়ে ড্রইংরুমে চলে গিয়েছিল সাধনা। সেখানে শিবনাথ তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

এদিকে জয়া ঘুমোতে পারছিল না। সাধনা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠে পড়েছিল। খুব আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে দরজার কাছে চলে এসেছিল। মাঝখানে একটা প্যাসেজ। ড্রইংরুমটা তার কোনাকুনি একটা জায়গায়। শোবার ঘরের দরজার কাছ থেকে সেটার ভেতর পর্যন্ত দেখা যায়। বাবা আর সাধনা মাসি তখন মুখোমুখি বসে।

বাবা ভাঙা ভাঙা, চাপা গলায় কী যেন বলেছিলেন সাধনা মাসিকে। জয়া শুনতে পায় নি। তবে সাধনা মাসি প্রায় শিউরে উঠেছিল, 'না না, এ আপনি কী বলছেন?'

বাবার গলা এবার কিছুটা স্পষ্ট শুনিয়েছিল, 'এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই সাধনা।'

'আপনি চন্দ্রাদিকে ভাল করে বুঝিয়ে বলুন।'

'বলেছি। কিন্তু আমারও তো আত্মসম্মান বলে একটা কথা আছে। আই অ্যাম শ্যাটারড, আই অ্যাম ফিনিশড।' বলে বাবা দু হাতে মুখ ঢেকে বালকের মতো কেঁদে উঠেছিলেন।

সাধনা মাসি ওধার থেকে উঠে এসেছিল। বাবার কাঁধে একটা হাত রেখে গভীর গলায় বলেছিলেন, 'কাঁদবেন না।'

দূর থেকে জয়া দেখতে পেয়েছিল সাধনা মাসির চোখও ধীরে ধীরে জলে ভরে যাচ্ছে।

আরো কিছুক্ষণ পর একরকম জোরজার করেই বাবাকে খাইয়ে চলে গিয়েছিল সাধনা। অনেক রাতে বাবা শুতে এসেছিলেন। তার আগেই অবশ্য জয়া তার 'কটে' গিয়ে শুয়ে পড়েছে। কিন্তু কিছুতেই ঘুমোতে পারছিল না। সে বুঝতে পারছিল, মায়ের সম্বন্ধেই সাধনা মাসির সঙ্গে কথা বলছিলেন বাবা। কী বলছিলেন তিনি? কাঁদছিলেনই বা কেন? জয়ার বুকের ভেতর তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল।

মা নেই। বাবা বিরাট ডবল-বেড খাটে আবছা নীলাভ অন্ধকারে অনেকক্ষণ সিলুয়েট একটা ছবির মতো বসে ছিলেন। তারপর হঠাৎ জয়ার 'কটে'র দিকে তাকিয়ে খুব নরম গলায় ডেকেছিলেন, 'জয়া—'.

বাবা কি টের পেয়ে গেছেন, জয়া এখনও ঘুমোয় নি? সাড়া দেবে কি না, প্রথমটা সে ঠিক করতে পারে না। তারপর আস্তে করে বলেছিল, 'কী বলছ?'

'এখনও ঘুমোস নি?'

'ঘুম পাচ্ছে না।'

বাবা চুপ করে থেকেছেন কয়েক পলক। তারপর বলেছেন, 'জেগে আছিস, ভালই হয়েছে। আমার খাটে আয়।'

জয়া বাবার কাছে চলে গিয়েছিল। বাবা বলেছিলেন, 'তোর সঙ্গে আমার দরকারী কথা আছে।'

জয়া বলছিল, 'বিকেলবেলাতেও তো তাই বললে। তারপর কত জায়গায় নিয়ে গেলে কিন্তু তোমার দরকারী কথাটা শোনালে না।'

'তখন বলতে পারিনি। চারদিকে লোকজন ছিল, আলো ছিল, তুই আমার মুখ দেখতে পাচ্ছিলি। নিজের মুখ দেখিয়ে সেই কথাটা আমি কিছুতেই বলতে পারব না।' বাবা উঠে গিয়ে জিরো পাওয়ারের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। ঘর গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাবা এবার বলেছিলেন,' তোর মায়ের সঙ্গে আমার কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে। এখন তুই তা বুঝবি না; বড় হলে বুঝতে পারবি। আমরা ঠিক করেছি একসঙ্গে থাকব না। তোর মা তোর মামাবাড়ি চলে যাবে।'

শ্বাস আটকে যাচ্ছিল জয়ার। দুর্বল, ভাঙা গলায় সে জিজ্ঞেস করেছিল,'মা কি আর কোনোদিন এখানে আসবে না?'

'বোধ হয় না।'

'তুমি এই কথাগুলো সাধনা মাসিকে তখন বলছিলে?'

'তুই শুনেছিস?' গলার স্বর শুনেই বোঝা গিয়েছিল বাবা চমকে উঠেছেন।

আস্তে করে নিঃশ্বাস ফেলে জয়া বলেছিল, 'সবটা শুনি নি।'

একটু চুপ। তারপর বাবা বলেছিলেন, 'তুই ইচ্ছে করলে আমার কাছে থাকতে পারিস। ইচ্ছে করলে তোর মায়ের কাছেও থাকতে পারিস। কার কাছে থাকবি?'

বাবাকে সেই মুহূর্তে ভয়ানক দুঃখী এবং অসহায় মনে হয়েছিল জয়ার। হঠাৎ চোখের গভীর থেকে স্রোতের মতো কিছু উথলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। দু হাতে শিবনাথকে জড়িয়ে ধরে তাঁর কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠেছিল সে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে জড়ানো গলায় বলেছিল,'আমি তোমার কাছেই থাকব বাবা।'

গভীর আবেগে জয়াকে বুকের ভেতরে টেনে নিয়েছিলেন শিবনাথ। জয়া টের পেয়েছিল, তার মাথায়-কপালে-ঘাড়ে-বুকে সারা রাত বাবার চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে গেছে। মনে আছে, সেদিন থেকে ছেলেবেলাটা বাবার বুকের ভেতর ঘুমিয়ে কেটে গেছে তার।

পরের দিন একা আরামদায়ক বিরাট জাপানি গাড়ি করে সকালবেলাতেই মা এসেছিল। এসে আর অপেক্ষা করে নি বা বাবার সঙ্গে কোনো কথা টথা বলে নি। চটপট জয়াকে ভাল দামি পোশাক পরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর সারা সকাল গোটা বম্বে শহর ঘুরে বেড়িয়েছে। অনেকরকম পোশাক, পুতুল, খেলার জিনিস কিনে দিয়েছিল। তারপর দুপুরবেলা ওরা এসেছিল গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার কাছে একটা বিশাল এয়ার-কন্ডিশানড হোটেলে। সেখানে লাঞ্চ খেতে খেতে চন্দ্রা বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে একটা

কথা আছে জয়া।'

জয়া টেবিল থেকে মুখ তুলে বলেছিল, 'জানি।'

চোখ ঈষৎ কুঁচকে চন্দ্রা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী জান?'

ভয়ে ভয়ে জয়া বলেছিল,'বাবা আর তুমি এক জায়গায় থাকবে না।'

চন্দ্রা স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'নিশ্চই তোমার বাবা বলেছে?'

'হ্যাঁ।'

'ভালই হয়েছে। আমাকে আর বুঝিয়ে বলতে হল না। বড়দের ব্যাপার তোমার বোঝার দরকার নেই। তোমার বাবা যা বলেছে তাই ঠিক। এখন থেকে আমরা দু জায়গায় থাকব। প্রবলেমটা তোমাকে নিয়ে। তুমি কার কাছে থাকবে?'

জয়ার খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মায়ের দিকে সে তাকায় নি; মুখ নিচু করে চুপচাপ বসে ছিল।

চন্দ্রা বলেছিল,'কী হল, কথা বলছ না কেন?'

জয়া এবার আস্তে করে বলেছিল,'আমি বাবার কাছে থাকব।'

এই উত্তরটা আশা করে নি চন্দ্রা। বলেছিল, 'ভাল করে ভেবে বল।'

'আমি বাবার কাছে থাকব।'

'অবস্টিনেট গার্ল। সব বাচ্চাই তাদের মায়ের কাছে থাকতে চায়। তোমার নেচার একেবারে আলাদা।'

'আমি বাবার কাছে থাকব।'

'ঠিক আছে।' মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল চন্দ্রার। সে বলেছিল,' তোমার কপালে দুঃখ আছে। অ্যান্ড ইউ আর ইনভাইটিং ইট।'

লাঞ্চের পর জয়াকে সায়নে পৌঁছে দিয়ে চলে গিয়েছিল মা। এর কিছুদিন বাদে বাবার সঙ্গে আইনসম্মত সেপারেশন হয়ে গেছে মায়ের। এবং তারও কয়েক মাস পর খবর পাওয়া গিয়েছিল মা আবার বিয়ে করেছে।

ডাইভোর্স হবার আগে এবং দ্বিতীয় বিয়ের পর মাঝে মাঝে জয়াকে দেখতে সায়নের ফ্ল্যাটে চলে আসত চন্দ্রা। শিবনাথের কাছে বলে কিছুক্ষণের জন্য তাকে কোনোদিন বেড়াতে নিয়ে যেত। দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে জয়ার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল মা।

চন্দ্রার দু নম্বর স্বামী কর্নাল সিং মানুষ হিসেবে চমৎকার। বিরাট খেলোয়াড়, সারা দেশ জুড়ে তখন তাঁর নাম। কাগজে প্রায়ই ছবি বেরোয়। তা ছাড়া ইমপোর্ট এক্সপোর্টের বিজনেসে অঢেল টাকা।

স্ত্রীর প্রথম স্বামীর মেয়ের জন্য কর্নাল সিং এক ধরনের স্নেহ অনুভব করতেন। চন্দ্রা জয়াকে নিয়ে গেলেই প্রচুর দামি দামি জামা, নাম করা কনফেসনারদের দোকান থেকে প্যাস্ট্রি কি কেক, ডলস হাউস থেকে বিদেশি খেলনা কিনে দিতেন। জয়ার মনে আছে, পাছে বাবা দুঃখ পান সেজন্য চন্দ্রার সঙ্গে কোনোদিন তিনি ফ্ল্যাটে আসেন নি। সত্যিকারের ভদ্রলোক কর্নাল সিং এবং পায়ের তলা থেকে মাথা পর্যন্ত রিয়েল স্পোর্টসম্যান। তবু তাঁর কাছে গিয়ে খুবই আড়স্ট হয়ে যেত জয়া; ভেতরে ভেতরে এক ধরনের আক্রোশ অনুভব করত।

বাবার কোনো অন্যায় ছিল না। তিনি কখনও মায়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন নি। তবু কেন বাবাকে ছেড়ে আবার বিয়ে করেছিল সে? সেদিন তা বুঝতে পারে নি জয়া; পরে বড় হয়ে বুঝেছে।

মা বাবাকে ঠিক ভালবাসেনি। যা তাকে আকর্ষণ করেছিল তা হল বাবার নাম, গ্ল্যামার। কিন্তু যেই বাবাকে গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড থেকে সরে আসতে হল, মায়ের আর ইলিউসন রইল না। মা তাঁকে ছেড়ে ঝুঁকল গ্ল্যামারওলা স্পোর্টসম্যান কর্নাল সিংয়ের দিকে।

এদিকে আরেকটা ব্যাপার ঘটছিল। গান বন্ধ হবার পর গাঢ় গভীর বিষাদ বাবার স্থায়ী সঙ্গী হয়ে গিয়েছিল। মায়ের দ্বিতীয় বিয়ের পর আর তাঁর দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। রোজগারের দিকটাও দ্রুত খারাপ হয়ে আসছিল। মানুষের স্মৃতি খুব ঠুনকো জিনিস। বাবাকে চটপট সবাই ভুলে যাচ্ছিল। তিনি বিস্মৃতির মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর রেকর্ড আর ক'খানা বিক্রি হত। রয়ালটি দিনের পর দিন কমে আসতে লাগল। ব্যাঙ্কের ইন্টারেস্টই তখন ভরসা।

মা চলে গেলেও সাধনা কিন্তু তাদের ছেড়ে যায় নি। বড় ডানা মেলে সে যেন জয়া আর শিবনাথকে আগলে রাখতে চাইছিল। রোজই এসে সে বাবাকে বলত, 'এরকম করলে আপনি বেশিদিন বাঁচবেন না। সারাদিন ঘাড়মুখ গুজে মন খারাপ করে বাড়িতে বসে না থেকে কিছু একটা করুন।'

শিবনাথ ক্লান্ত গলায় বলতেন, 'কী করব?'

'যা হোক কিছু। আপনার লাইফ এভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।'

'আমি যে গান ছাড়া আর কিছুই শিখি নি।'

'আর কিছুই না?'

সেই মুহূর্তে শিবনাথের হয়তো বিজলীর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। বিজলী ভাল সরোদ, ভায়োলিন আর সেতার বাজাতে পারত। তার কাছে গানই শুধু শেখেন নি শিবনাথ, বাজনার তালিমও নিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন,'একটু আধটু বাজনা জানি।'

খুবই উৎসুক হয়ে উঠেছিল সাধনা,'আপনি বাজনা জানেন,অথচ চুপচাপ বসে আছেন! এমন করে নিজেকে শেষ করে ফেলার কোনো মানে হয়! মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট যাঁরা বাজান তাঁদের দাম আর্টিস্টদের চাইতে কম না কি? যে বাজনা আপনার পছন্দ আজই কিনে আনবেন।'

বাঁচবার একটা রাস্তা পেয়ে গিয়েছিলেন শিবনাথ। আর সাধনাই দুঃখের দিনে সেটা তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছিল।

দিনকয়েক বাদেই একটা ভায়োলিন কিনে এনেছিলেন শিবনাথ। দিনরাত তাই নিয়ে রেওয়াজ শুরু করেছিলেন। কয়েক মাসের মধ্যে হাত তৈরিও হয়ে গিয়েছিল।

মাঝখানে ফিল্মের লোকেদের সঙ্গে , অর্কেস্ট্রা কমপোজারদের সঙ্গে, মিউজিক ডিরেক্টরদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। সাধনাই শিবনাথকে তাড়া দিয়ে দিয়ে তাদের ফোন করাল। তারপর একদিন মিউজিক হ্যান্ড হয়ে আবার তিনি গানের ওয়ার্ল্ডে ফিরে এলেন। বিষাদময়তার ফাঁদ থেকে এই ভাবে তিনি অনেকখানি বেরিয়ে আসতে পারলেন।

কয়েকটা বছর কেটে গেল। এর মধ্যে কবে যে সাধনা মাসি বাবাকে 'তুমি' বলতে শুরু করেছে, জয়ার মনে পড়ে না। তখন সে ক্লাস এইট কি নাইনে পড়ে। আগেকার অভ্যাসমতো বাবার কাছেই শুত সে। হঠাৎ একদিন রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর জয়া যখন ঘুমোতে যাচ্ছে, সাধনা বলেছিল,'আজ থেকে তুমি আর বাবার কাছে শোবে না। তোমার জন্য আলাদা বিছানা করে দিয়েছি।'

জয়া অবাক হয়ে গিয়েছিল, 'কেন?'

'তুমি বড় হয়ে গেছ।'

অন্য ঘরে নয়, বাবার ঘরেরই আরেক দিকে জয়ার জন্য খাট পেতে দেওয়া হয়েছিল। সাধনা গোমেজকে দিয়ে কখন যে তার আলাদা শোবার ব্যবস্থা করেছে, জয়া আগে জানতে পারে নি। সাধনা মাসির চোখ সব দিকে।

সাধনা যেমন তাদের আগলে আগলে রাখছিল তেমনি নিজেদের সংসারটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। ভাইবোনদের স্কুলে পাঠিয়ে পড়াশোনা শেখাচ্ছিল। ওর মধ্যেই প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে লোন নিয়ে একটি বোনের বিয়ে দিয়েছিল। এক বোনের ব্যবস্থা হলেও তখনও তার প্রচুর দায়দায়িত্ব। দায়িত্বপালনের জন্য অনেক টাকা দরকার। তাই নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এখানে ওখানে ভাল চাকরির দরখাস্ত করে যাচ্ছিল সে।

জয়ার মনে পড়ে, যে বছর সে স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট পেল সেই বছরই সাধনা পুনার কাছে চান্দেলিতে একটা বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটে পাবলিক রিলেশনস অফিসারের বড় চাকরি পেয়ে গেল। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা পাবার পরই শিবনাথের কাছে দৌড়ে এসেছিল সে বলেছিল। 'আমি কী করব?'

বাবা তার হাত থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা নিয়ে দেখতে দেখতে বলেছিলেন, 'বেশ ভাল চাকরি। তুমি ওটা নিয়ে নাও—'

কিন্তু—

'কী?'

'চাকরিটা নিলে আমাকে চান্দলিতে গিয়ে থাকতে হবে।'

জয়া কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে লক্ষ করছিল, বাবার মুখে একটা ছায়া পড়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল। তারপর অল্প হেসে তিনি বলেছিলেন, 'তা তো হবেই। সারা জীবন স্ট্রাগল করেছ। চাকরিটা নিলে সব দিক থেকেই ভাল হবে। এটা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।'

'কিন্তু আমি চলে গেলে—' এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল সাধনা।

বাবা গভীর গলায় এবার বলেছিলেন, 'তুমি আমাদের কথা ভাবছ তো?'

আস্তে করে ঘাড় হেলিয়ে দিয়েছিল সাধনা।

বাবা বলেছিলেন, 'আমাদের জন্যে তুমি অনেক করেছ। তোমার ঋণ কখনও শোধ করা যাবে না। আমাদের কথা ভেবে যদি চাকরিটা না নাও, আমাদের অপরাধের শেষ থাকবে না।'

মাসখানেক পর সাধনা তাদের গোটা ফ্যামিলি নিয়ে চান্দেলিতে চলে গিয়েছিল। পুনা ওখান থেকে কয়েক মাইলের মধ্যে। অনবরত সেখানে বাস যাতায়াত করছে। বম্বে থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে ভাইবোনদের পুনার কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল সে।

চলে যাবার আগে জয়াকে আড়ালে ডেকে সাধনা বলেছিল, 'আমি চলে যাচ্ছি। তুমি বড় হয়েছ; বাবাকে সব সময় দেখাশোনা করো। বাবার মতো দুঃখী মানুষ খুব বেশি নেই।'

সেই থেকে শিবনাথের খাওয়া দাওয়া ঘুম বিশ্রাম কিংবা কাজকর্ম, সবদিকে জয়া সর্বক্ষণ নজর রেখে আসছে।

দেখতে দেখতে আরো ক'টা বছর কেটে গেল। এর মধ্যে জয়া বি.এ পাস করে একটা ট্র্যাভেল এজেন্সিতে চাকরি নিয়েছে। বম্বে সিটির চারদিক ঘিরে তখন বিরাট বিরাট মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিং উঠতে শুরু করেছে। ওনারশিপ ফ্ল্যাট কেনার হুজুগ পড়ে গিয়েছিল। জমির যা দাম আর কনস্ট্রাকশনের যা খরচ তাতে মাল্টিমিলিওনেয়ার ছাড়া এ শহরে নিজস্ব বাড়ি করা অসম্ভব ব্যাপার। জয়া আর সাধনার সঙ্গে পরামর্শ করে শিবনাথ ব্যাঙ্কের সব টাকা তুলে এবং কিছু ধার-টার করে জুহুর ফ্ল্যাটটা কিনেছিলেন। আর খানিকটা ধার শোধের জন্যই জয়াকে চাকরি নিতে হয়েছিল। তা ছাড়া বাবা গান রেকর্ডিং-এ বেরিয়ে গেলে একা একা ভাল লাগত না। চাকরিটা সময় কাটাবার পক্ষে টনিকের মতো।

সায়ন থেকে জুহুর ফ্ল্যাটে উঠে আসার সময় গোমেজ চাকরি ছেড়ে দিয়ে তাদের দেশে চলে গিয়েছিল। তারপর থেকে মধ্যবয়সী মারাঠি বিধবা, তারা জয়াদের বাড়িতে কাজ করছে।

চাকরি নেবার পর জয়ার কাজ বেড়ে গিয়েছিল প্রচুর। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত তার প্রোগ্রাম এইরকম। ঘুম থেকে উঠেই নিজের হাতে চা করে, রুটি সেঁকে, ছানা বানিয়ে বাবাকে খাওয়াত। এর মধ্যে শিবনাথের একটা মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। তাই তাঁর খাওয়া দাওয়া খুবই ধরা বাঁধা। মাখন, ঘি, ডিম ইত্যাদি তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তাঁর জন্য বরাদ্দ ফ্যাট-ফ্রি ডায়েট। নিজের হাতে বাবার জন্য খাবার তৈরি করে না দিলে খুঁতখুঁতুনি লাগত জয়ার।

শিবনাথকে ব্রেকফাস্ট করিয়ে হার্টের জন্য ওষুধ খাইয়ে নিজে কিছু খেয়ে নিত। ততক্ষণে সান্তাক্রুজের বাজার থেকে মাছ-আনাজ কিনে ফিরে এসেছে তারা। গ্যাসের উনুনে ডবল রিফাইনড বাদাম তেলে চটপট বাবার জন্য লাইট মাছের ঝোল, খানিকটা গ্রিন ভেজিটেবল সেদ্ধ, একটু স্যালাড, একটু ডাল, নিরামিষ একটা তরকারি রেঁধে জয়া এক ছুটে বাথরুমে গিয়ে ঢুকত। বাবারটা বাদ দিলে তার আর নিজের জন্য তারাই রাঁধত।

স্নানটান সেরে শাড়িটাড়ি পরে দ্রুত নাকেমুখে গুঁজে অফিস বেরুবার আগে বাবার ঘরে আসত সে এবং তারাকেও ডেকে আনত। শিবনাথ কখন ক'টার সময় কোন ওষুধ খাবেন, সব পর পর হাতের কাছে সাজিয়ে রেখে দিত। দুপুরবেলা কখন ভাত খাবেন, বিকেলে কখন চা এবং ফল, সন্ধেবেলায় সেঁকা পাঁপড় আর ব্ল্যাক কফি—সব পাখি পড়ানোর মতো বাবা এবং তারাকে বলে যেত। তারাকে বলার কারণ, খাবার জন্য সে বাবাকে তাড়া লাগাবে।

গান রেকর্ডিং থাকলে শিবনাথ সকালে স্টুডিওতে বেরিয়ে যেতেন। সেদিন ভোরবেলা উঠে রান্নাবান্না সেরে টিফিন ক্যারিয়ারে তাঁর খাবার সাজিয়ে দিত জয়া। ওষুধগুলো খাওয়ার সময় লিখে একেকটা মোড়ক বানিয়ে পকেটে পুরে দিত।

সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরে একটু জিরিয়ে আবার বাবার জন্য খাবার তৈরি করত জয়া। দিনের

বেলা তাড়াহুড়োয় হয়ে উঠত না; তবে রাত্তিরে ডাইনিং টেবলে মুখোমুখি বসে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করে খেত দু'জনে। অফিসে কী কী ঘটেছে, কোন অফিসার কী বলেছে, কলিগরা কী করেছে, ক্লায়েন্টদের কার কিরকম ব্যবহার, খুঁটিনাটি সব বলে যেত জয়া। শিবনাথও সারাদিন বাড়িতে কী করেছেন, জুহু বীচে কোন কোন দেশের টুরিস্ট সেদিন বেশি এসেছে, ওয়েস্ট-বাউন্ড প্লেন সেদিন ক'টা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি যাবতীয় খবর দিতেন। যেদিন গানের রেকর্ডিং থাকত সেদিন স্টুডিওতে কী কী হয়েছে, তাঁর পুরনো দিনের গানের কথা মনে করে কোন মিউজিক ডিরেক্টর তাঁকে সহানুভূতি জানিয়েছেন, বীয়ার খাওয়ার জন্য কে জোরজার করেছিল অথচ তিনি খান নি, ইত্যাদি বলে যেতেন। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে বাবাকে রাত জাগতে দিত না জয়া। তাঁকে তাঁর ঘরে শুইয়ে গায়ের ওপর চাদর টেনে লাইট নিভিয়ে নিজের ঘরে চলে আসত। জুহুর ফ্ল্যাটে আসার পর তাদের আলাদা ঘর হয়েছিল।

বাবার চলাফেরা, হাসি, কথা বলার সময় কণ্ঠস্বরে ছোটবড় ঢেউ, নিশ্বাস পতন—সব জয়ার চেনা। তার মধ্যে কোথাও একটু হেরফের হলেই সে বুঝতে পারত হয় বাবার শরীর খারাপ হয়েছে, নইলে মন খারাপ। কোনো কোনোদিন রাত্তিরে বাবাকে শুইয়ে দিয়ে আসার পর জয়া নিজের ঘরে এসে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। আচমকা বিষন্ন করুণ একটা সুর তার স্নায়ুতে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। ধড়মড় করে উঠে জয়া দৌড়ে গেছে পাশের ঘরে। চোখে পড়েছে সমুদ্রের দিকে মুখ করে বুকের কাছে ভায়োলিন আটকে আস্তে আস্তে ছড় টেনে যাচ্ছেন শিবনাথ। সুরের ভেতর থেকে দুঃখ যেন ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। জয়া জানত, এখনও জানে, মাকে ভুলতে পারেন নি বাবা। মধ্যরাতে কিংবা নিঝুম দুপুরেও তিনি এইভাবে কোমল নিখাদে ভায়োলিন বাজিয়ে স্মৃতি খুঁড়ে খুঁড়ে তাঁর বেদনাকে বার করে আনতেন।

জয়া খুব সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে শিবনাথের পেছনে গিয়ে ডাকত, 'বাবা—'

চমকে বাজনা থামিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয়াকে বুকের ভেতর টেনে নিতেন শিবনাথ। একটু পর দু'জনেই টের পেত, তারা কাঁদছে। চন্দ্রাকে ভুলে যেতে পারেননি শিবনাথ।

জয়া যেমন বাবার সব কিছুই জানে, শিবনাথের কাছেও জয়ার সব কিছুই জলের মতো স্বচ্ছ।

ওদিকে সাধনা দূরে চলে গেলেও সম্পর্কটা ছিঁড়ে যায় নি। সাধনাদের অফিসে পাঁচ দিন ওয়ার্কিং ডে। শনি আর রবি ছুটি। চান্দেলিতে যাবার পর শুক্রবার বিকেলে অফিস ছুটি হলে এক সেকেন্ডও দেরি করে না সাধনা। দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে লং ডিসট্যান্স রুটের বাস ধরে বম্বে চলে আসে। শনি রবি দু দিন জয়াদের সঙ্গে কাটিয়ে সোমবার ভোরে শেয়ার ট্যাক্সিতে কি ডেকান কুইনে চান্দেলিতে ফিরে যায়। বছরের পর বছর এভাবেই চলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে জয়াকে তার সঙ্গে ছুটি কাটাবার জন্য যেতে বলে সাধনা। দু একবার জয়া গেছেও কিন্তু একটা রাত কাটতে না কাটতেই বম্বে ফিরে এসেছে। শিবনাথ তার ওপর বড় বেশি নির্ভরশীল। তাঁকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকতে তার ভাল লাগে না। বাবার ছায়ায় ছায়ায় সেই ছেলেবেলা থেকে সে বেড়ে উঠেছে। শিবনাথের কাছে কাছে থাকাটা জয়ার পক্ষে একটা অভ্যাসের মতো। অভ্যাস কি রাতারাতি বদলানো যায়? আসলে বাবাকে ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না জয়া। শিবনাথ ফিক্সেশানের মতো তার মাথায় আটকে গেছে।

চান্দেলি থেকে বম্বে, বম্বে থেকে চান্দেলি—প্রতি উইক-এন্ডে ছোটাছুটি করতে করতে কবে যে আগেকার ছিপছিপে পাতলা গড়ন ভেঙেচুরে সাধনার চেহারা ভারিক্কি হয়ে উঠেছে, কবে যে একটি দুটি করে মাথার সিকিভাগ চুল রুপোর তার হয়ে গেছে, চোখে বাইফোকাল লেন্সের পুরু চশমা উঠেছে, টের পাওয়া যায় নি। তবে জীবনের লম্বা দৌড় শেষ করে আনার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক দায় দায়িত্বও তার শেষ হয়েছে। চান্দেলিতে যাবার পর মা মারা গিয়েছিলেন। তারপর এই ক'বছরে ভাইদের মানুষ করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। চাকরি বাকরি নিয়ে তাদের কেউ কলকাতায়, কেউ দিল্লিতে, কেউ বা বাঙ্গালোরে। বোনেরাও বিয়ে হয়ে দূরে দূরে চলে গেছে। সাধনার কাছে এখন কেউ নেই। সে একেবারে একা। সংসারের জন্য জীবনের সব চাইতে সেরা ফলবান অংশটা তার নষ্ট হয়ে গেছে। উইক-এন্ডে চান্দেলি থেকে এক বার করে বোম্বাই ছুটে আসা ছাড়া তার আর কোনো আকর্ষণ নেই।

এইভাবেই চাকার মতো গড়িয়ে গড়িয়ে সময় কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ বছর দুই তিন আগে সেই ঘটনাটা ঘটল।

ট্র্যাভেল এজেন্সিতে একটা বড় কাজ হল, ক্লায়েন্টদের জন্য প্লেনের সিট বুক করা। এর জন্য নানা এয়ার লাইনসের সঙ্গে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হয়। বড় বড় অফিসার থেকে শুরু করে বুকিং ক্লার্ক পর্যন্ত সবার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা না রাখলে নিজের কাজটি বার করে আনা যায় না। অবশ্য এয়ার লাইনসগুলোও ট্র্যাভেল এজেন্সির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলে। এতে তাদেরও স্বার্থ রয়েছে। ট্র্যাভেল এজেন্সিগুলো খদ্দের যোগাড় করে আনলে তাদের টিকিট বিক্রি বাড়ে। আসলে স্বার্থটা পারস্পরিক।

একদিন দুপুরবেলা দুবাইয়ের একটা টিকিটের জন্য অজয়দের এয়ার লাইনসে ফোন করেছিল জয়া। তখন অবশ্য অজয়ের সঙ্গে তার আলাপ হয়নি, এমন কি তাকে দেখে নি পর্যন্ত।

অজয়দের এয়ার লাইনসে ডেপুটি কমার্শিয়াল ম্যানেজার ছিলেন মিস্টার রেখি। রেখির সঙ্গে জয়ার পরিচয় ছিল, তার গলার স্বর শুনলেই চিনতে পারত। কিন্তু সেদিন ফোন করতে গিয়ে অন্য গলা ভেসে এসেছিল। জয়া একটু অবাক হয়ে বলেছিল, 'আমি কমার্শিয়াল ম্যানেজার মিস্টার রেখিকে চাইছি।'

ওধার থেকে সেই গলাটি আবার শোনা গিয়েছিল, 'আমিই ডেপুটি কমার্শিয়াল ম্যানেজার। তবে রেখি নই।'

'আপনি?'

'আমি অজয়—অজয় শর্মা। মিস্টার রেখির জায়গায় এসেছি।'

দশ বার দিন আগেও রেখি সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে জয়ার। তখনও জানতে পারে নি মিস্টার রেখি এখান থেকে চলে যাবেন। একটু অবাক হয়েই সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'রেখি সাহেব কি ছুটিতে গেছেন?'

অজয় বলেছিল, 'হ্যাঁ ছুটির পর উনি আমাদের ক্যালকাটা অফিসে জয়েন করবেন। রেখি সাহেবের সঙ্গে কি আপনার পার্সোনাল কোনো দরকার ছিল?'

জয়া তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, 'না না, অ্যাবসোলুটলি অফিসিয়াল।'

'তা হলে আমাকে বলতে পারেন।'

জয়া তার ট্রাভেল এজেন্সির নাম করে দরকারের কথাটা জানিয়েছিল। অজয় দু মিনিটের মধ্যেই তাদের মিডল ইস্টের দিকের ফ্লাইটে ডুবাইয়ের একটা সিট কনফার্ম করে জয়াকে জানিয়ে বলেছিল, 'আপনাদের যখন যা দরকার হবে, আমাকে অনুগ্রহ করে জানাবেন। আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যাট ইওর সারভিস।'

'ধন্যবাদ।'

এর দু দিন বাদেই আবার ফোন করতে হয়েছিল। বাহেরিন আর কুয়েতের জন্য চারটে চারটে মোট আটটা সিট দরকার। সিটের ব্যবস্থা করে অজয় বলেছিল, 'আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, খুব সম্ভব দু দিন আগে আপনিই ফোন করেছিলেন।'

জয়া বলেছিল, 'একদিন গলা শুনেই মনে করে রেখেছেন?'

'ওটা আমার একটা এক্সট্রা কোয়ালিফিকেশন বলতে পারেন। আমার কান দুটো খুব সেনসিটিভ। যাক গে, নিজের সার্টিফিকেট নিজে আর না-ই দিলাম। কিন্তু যাঁর সঙ্গে দু দিন এত কথা বলছি তাঁর নামটা কিন্তু এখনও জানতে পারি নি।'

ভদ্রলোক একটু বেশি কথা বলে তবু ভালই লাগছিল জয়ার। সে বলেছিল, 'আমার নাম জয়া ব্যানার্জি।'

'আপনি বাঙালি!' অজয়ের গলায় চমক খেলে গিয়েছিল যেন।

'হ্যাঁ।' একটু চুপ করে থেকে দ্বিধান্বিত ভাবে উত্তর দিয়েছিল জয়া। যদিও বাঙালি বাপের মেয়ে সে, সেই মুহূর্তে সিন্ধি মায়ের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

এতক্ষণ ইংরেজিতেই কথা হচ্ছিল। এবার পরিষ্কার বাংলায় অজয় বলেছিল, 'আগে জানলে বাংলাতেই কথা বলা যেত। ফরেন্ ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে কি সুখ হয়?'

জয়া অবাক হয়ে বলেছিল, 'আপনি কি বাঙালি?'

'ফিফটি পারসেন্ট বলতে পারেন। আমার বাবা-মা ইউ. পির লোক। তবে আমার জন্ম কলকাতায়।

এখানেই পড়াশোনা করেছি, বড় হয়েছি। নানা ফার্মে চাকরি করে এখন যে এয়ার লাইনসে কাজ করি তার ক্যালকাটা ব্রাঞ্চে চাকরি পেয়েছি। একটানা পাঁচ বছর কাজ করার পর অথরিটি এবার আমাকে বম্বেতে ট্রান্সফার করেছে। বাংলাটা আমি যে কোনো বাঙালির মতোই বলতে পারি।'

এরপর থেকে কাজের মধ্যে একটু ফাঁক পেলেই অজয় ফোন করত। তখনও কেউ কাউকে দেখেনি। তবে কথায় বার্তায় অজয়কে বেশ স্মার্ট, ঝকঝকে, আমুদে আর প্রাণবন্ত মনে হত জয়ার।

দু তিন মাস বাদে একদিন কথায় কথায় অজয় বলেছিল, 'আমরা কি চিরকাল টেলিফোনেই গল্প করে যাব? কোনো দিন দেখাটেখা হবে না?'

অজয় সম্পর্কে দারুণ কৌতূহল ছিল জয়ার, তাকে দেখতেও ইচ্ছে করত। কিন্তু সে কথা একটি মেয়ের পক্ষে বলাটা ভাল দেখায় না। কিন্তু অজয় যখন নিজের থেকে দেখা করতে চাইল, জয়া খুশি হয়ে উঠেছিল এবং উত্তেজনাও অনুভব করেছিল। রাস্তা দিয়ে চলতে ফিরতে কত যুবকই তো তাকিয়ে থাকত, হয়তো আলাপও করতে চাইত। কলেজে পড়ার সময় সিনিয়ার ক্লাসের ছেলেরা এবং দু একজন অল্প বয়সের ছোকরা অধ্যাপক তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে জয়ার কোনো উৎসাহ ছিল না। বাবা যেন চারদিকে শক্ত একটা ফ্রেম তৈরি করে তার ভেতর জয়াকে পুরে দিয়েছিল। সেই ফ্রেমটা ভেঙে সে বেরিয়ে আসতে পারেনি। অথচ যে অজয়কে জয়া তখন পর্যন্ত চোখে দেখেনি তারই জন্য অদ্ভুত এক আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করেছিল। নিচু গলায় সে তাকে বলেছিল, 'আপনি চাইলেই দেখা হবে। আমার কোনো আপত্তি নেই।'

অজয় খুশিতে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'আমার মতো লাকি লোক এই মুহূর্তে ওয়ার্ল্ডে আর একজনও নেই।'

অজয়ের বালকের মতো উচ্ছ্বাস দেখে হেসে ফেলেছিল জয়া, 'তাই নাকি! ফ্ল্যাটারি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।'

'একেবারেই না ম্যাডাম। ইটস ট্রু। এখন আসল কাজের কথায় আসা যাক। কোথায় কখন আপনার সঙ্গে দেখা হবে?'

'আপনিই বলুন।'

'ছুটির পর আপনার অফিসে চলে যাব? দয়া করে একটু ওয়েট করবেন?'

'প্লিজ এখানে আসবেন না—'

জয়ার মনোভাব খানিকটা আন্দাজ করে অজয় বলেছিল, 'আপনার সঙ্গে আমাকে দেখলে কলিগরা জ্বালিয়ে মারবে, তাই না?'

জয়া চমকে উঠেছিল। ঠিক এই কথাটিই সে ভেবেছে। কিন্তু অজয় কি করে টের পেল? খড়ি পেতে কারা যেন ভূ-ভারতের খবর বলে দেয়, অজয় কি তেমন কোনো বিদ্যা জানে! আধফোটা গলায় সে বলেছিল, 'মানে—'

'ঠিক আছে, আর বলতে হবে না। এক কাজ করুন। ছুটির পর গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার ঠিক নিচে ওয়েট করবেন। ভাল কথা, আপনি কি রঙের শাড়ি পরেছেন আজ?'

'মেরুন রঙের। কেন বলুন তো?'

'বা, আপনাকে চিনে বার করতে হবে না? মেরুন শাড়ি হবে আপনার আইডেন্টিটি কার্ড।'

জয়া মজা করে বলেছিল, 'আপনার কি ধারণা, গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার তলায় আপনাকে রিসিভ করার জন্য মেরুন শাড়ি পরে শুধু একটি মেয়েই ওয়েট করবে? আরো কিছু মেয়েও তো ওই রঙের শাড়ি পরে আসতে পারে।'

অজয় বলেছিল, 'হোল বম্বে সিটির সব মেয়ে যদি মেরুন শাড়ি পরে আসে, আমি আসল মেয়েটিকেই খুঁজে নেব।'

সত্যিসত্যিই গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ায় এসে জয়াকে বার করে ফেলেছিল অজয়। এখানেই সমুদ্রের পার ধরে গল্প করতে করতে দু'জনে খানিকক্ষণ হেঁটে বেরিয়েছিল।

সেদিনের সেই বিকেল বেলাটা ছিল চমৎকার। মাথার ওপর নীল ছাতার মতো প্রকাণ্ড আকাশ, নিচে নীল আয়নার মতো সমুদ্র। চারপাশে অসংখ্য মানুষ। পেছনে তাজমহল হোটেলের বিশাল বাড়ি;

তার গায়ে নতুন ইন্টার-কন্টিনেন্টাল অ্যানেক্স। সামনে সমুদ্রের পাড় থেকে একটার পর একটা মোটর বোট টুরিস্টে বোঝাই হয়ে তীরের মতো এলিফ্যান্টা কেভের দিকে ছুটে যাচ্ছিল।

বেড়াবার পর একটা রেস্তোরাঁয় ওরা চা খেয়েছিল। চা খাওয়া, গল্প করা আর বেড়াবার ফাঁকে কখন যে দেড় দু ঘন্টার মতো সময় কেটে গেছে, টের পাওয়া যায় নি। যখন জয়ার খেয়াল হল, পৌনে সাতটা বাজে। সেই মুহূর্তে বাবার মুখ মনে পড়ে গিয়েছিল তার। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েছিল জয়া। এর আগে অফিস ছুটি হলে এক সেকেন্ডও আর দেরি করত না সে। একরকম ছুটতে ছুটতে চার্চগেট স্টেশনে গিয়ে সান্তাক্রুজের ট্রেন ধরত। জয়া বলেছিল, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে। এবার আমাকে ফিরতে হবে।'

এত তাড়াতাড়ি জয়া চলে যাবে, অজয় ভাবে নি। সে বলেছিল, 'এখনই?'

'হ্যাঁ।'

'এখনও ভাল করে সন্ধে হয় নি। এত তাড়া কিসের? বসুন না আরেকটু।'

জয়া সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়েছিল, তার পক্ষে আর থাকা সম্ভব নয়।

অজয় জয়াকে আটকায় নি। চার্চগেট পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এসে ট্রেনে তুলে দিয়ে গিয়েছিল।

জুহুতে ফেরার পর শিবনাথ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কি রে, তোর আজ এত দেরি হল? রোজ ছ'টা সাড়ে ছ'টার ভেতর চলে আসিস। আজ আটটা বেজে গেছে। আমার ভীষণ ভাবনা হচ্ছিল।'

জয়া বাবার দিকে তাকাতে পারছিল না। মুখ নিচু করে কোনোরকমে জড়ানো গলায় বলেছিল, 'অফিসে বেশি কাজ ছিল। সারতে সারতে দেরি হয়ে গেল।' বলেই সোজা নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল। শিবনাথের কাছে সেই তার প্রথম মিথ্যে বলা।

বাবার সঙ্গে অজয়ের ব্যাপারে সেই যে লুকোচুরিটা শুরু হয়েছিল সেটা আর থামল না। কেননা অজয় তারপর থেকে প্রায় রোজই অফিস ছুটির পর কিংবা দুপুরে লাঞ্চের সময় তাকে বাইরে কোথাও—হয়তো কুপারেজ মাঠের কাছে কিংবা ওভালে অথবা ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামের সামনের দিকে বিশেষ কোনো জায়গায় দাঁড়াতে বলত। জয়া গিয়ে দাঁড়ালে দু মিনিটের মধ্যে অজয় এসে তাকে সঙ্গে করে কোনো রেস্তোরাঁয় চলে যেত। এক আধদিন অফিস পালিয়ে তারা যেত এলিফ্যান্টা কেভে, বোরিভিলির ন্যাশনাল পার্কে কিংবা আরে মিল্ক কলোনির বাগানে বা মালাবার হিলসের হ্যাঙ্গিং গার্ডেনে। কিন্তু যতই গল্প করুক, যতই ঘুরুক, সেই প্রথম দিনটার মতো আর কখনও বাড়ি ফিরতে দেরি করেনি জয়া। সাড়ে ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে রোজই ফিরে এসেছে।

সুতোয় পাথরকুচি বেঁধে আঙুলে জড়িয়ে ঘোরালে যেমন একটি বৃত্ত তৈরি হয় জয়া যেন অনেকটা সেই রকম। সে ঘুরছে ঠিকই কিন্তু অদৃশ্য আঙুলের টান ছিঁড়ে কিছুতেই বেরিয়ে যেতে পারছিল না।

বারকয়েক দেখা হওয়ার পর অজয় আর জয়া পরস্পরের অনেক কাছে চলে এসেছিল। অজয় খুবই খোলামেলা ছেলে। তার কোনো কিছুই গোপন নেই। প্রথম দিনই গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার কাছে যখন দেখা হয়েছিল, আধ ঘন্টার মধ্যে নিজের লাইফ হিস্ট্রি, ঠাকুরদা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত তিন জেনারেশনের পারিবারিক ইতিহাস গলগল করে বলে ফেলেছিল। আলাপটা আরেকটু গাঢ় হতে ওদের কোলাবার ফ্ল্যাটে মাঝে মাঝে জয়াকে নিয়ে যেতে শুরু করেছিল। জয়া অবশ্য প্রথম দিকে যেতে চাইত না; খুব সঙ্কোচ হত। কিন্তু অজয় জোরজার করে নিয়ে যেত। পরে অবশ্য সঙ্কোচটা কেটে গেছে জয়ার।

অজয়ের বাবা নেই। কোলাবায় অফিসের দেওয়া ফ্ল্যাটে মাকে নিয়ে থাকে সে। অজয়ের মা মানুষটি এক কথায় চমৎকার। ছোটখাট গোলগাল জাপানি পুতুলের মতো; খুবই স্নেহপ্রবণ। অনেককাল কলকাতায় থাকার জন্য জলের মতো বাংলা বলতে পারেন। জয়া গেলে তিনি ভারি খুশি হন; তাঁর দু চোখে যেন স্নেহ চলকাতে থাকে। জয়াকে নিজের কাছে বসিয়ে ঘরে তৈরি নানারকম খাবার খাওয়াতে খাওয়াতে প্রচুর গল্প করে যান। তাঁর গল্পের বেশির ভাগ জুড়েই থাকে তাঁর দুই ছেলে। ছোট ছেলে অজয়ের কাছে বার মাস তাঁকে পড়ে থাকতে হয়। বড় ছেলে বিজয়, তার বউ এবং নাতি-নাতনীরা তাদের কাছে যাবার জন্য মাদ্রাজ থেকে প্রতি সপ্তাহে একবার করে ট্রাঙ্ক কল করে কিন্তু অজয়কে একলা ফেলে কোথাও কি যাবার জো আছে? তিনি না থাকলে অজয়ের ঠিকমতো খাওয়াই হবে না।

যা অন্যমনস্ক খামখেয়ালী অগোছালো ছেলে! কোনো দিকেই হুঁশ নেই। সর্বক্ষণ এটা হারাচ্ছে, ওটা হারাচ্ছে। ওকে রেখে কোথাও গিয়ে শান্তি নেই।

মাকে নিয়ে অজয় আর দাদা বিজয়ের মধ্যে দারুণ খুনসুটি। অজয় নাকি দাদাকে বলে, 'যতক্ষণ না বিয়ে করছি ততক্ষণ তুমি মায়ের ভাগ পাচ্ছ না। এখন মায়ের পুরোটা আমার ভাগে। বিয়ের পর তোমার ফিফটি, আমার ফিফটি।'

অনেক বলে বলেও বা জোরাজুরি করেও অজয়ের মা ছেলের বিয়ে দিতে পারেন নি। ঘরে একটা বউ আনতে পারলে তার জিম্মায় অজয়কে রেখে একটু আধটু তিনি বেরুতে পারেন। তা না, ছেলেটা তাঁকে একেবারে খাঁচায় আটকে ফেলেছে। অবশ্য এই খাঁচাটা যে তাঁর খুব অপছন্দ নয়, বরং বেশ আনন্দদায়ক, সেটা তাঁর চোখমুখ দেখেই টের পাওয়া যায়। মাঝে মধ্যে এক আধ দিন তিনি জানিয়েছেন অজয়কে বিয়ের কথা বলে বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু কথাটা সে কানেই তোলে না। অজয়ের মা আবার বলেছেন, বড় ছেলে তো নিজেদের জাতের মেয়ে বিয়ে করে নি, পছন্দ করে মাদ্রাজী মেয়ে বিয়ে করেছে। আজকাল আর জাতের বাছাবাছি নেই। অজয়ও যদি তার মনোমতো কোনো মেয়েকে বিয়ে করে, তিনি আপত্তি করবেন না।

কথাটার মধ্যে যে ইঙ্গিত আছে, জয়া তা বুঝেছে কিন্তু এর উত্তর দেবার কথা তার নয়।

শুধু নিজের কথাই বলেন না অজয়ের মা। জয়ার সম্বন্ধেও অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছেন। জয়া ভাসা ভাসা ভাবে তাকে জানিয়েছে জুহুর এক ওনারশিপ ফ্ল্যাটে সে তার বাবার সঙ্গে থাকে। তার কোনো ভাই বোন নেই। মায়ের সঙ্গে বাবার বনিবনা হয় নি বলে অনেকদিন আগেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। ব্যস, এইটুকুই। এর বেশি আর কিছু বলে নি। অজয়ের মা-ই না, অজয়ও জয়ার সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানতে পারে নি।

এভাবে বেশ কিছুদিন কাটার পর অজয় একদিন হাজি আলির কাছে সমুদ্রের পাড়ে বসে বলেছিল, 'অফিসে ফ্রেঞ্চ লিভ নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কি চৌপাট্টির বীচে মুখোমুখি ঘন্টার পর ঘন্টা সময় কাটাতে আর ভাল লাগছে না। আফটার অল আমাদের বয়স হচ্ছে। উই আর এজিং, কলেজ গোয়িং ছেলেমেয়ে নই।'

জয়া চুপ করে ছিল। তারও এভাবে সময় কাটাতে ভাল লাগছিল না। কিন্তু করেই বা কী?

অজয় এবার বলেছিল, 'ভাবছি দু একদিনের মধ্যে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করব।'

জয়া চমকে উঠেছিল, 'কেন?'

'বা রে, ভদ্রলোকের একটা পারমিসান নিতে হবে না?' অজয় এবার বেশ মজা করেই হেসে হেসে বলেছিল।

জয়া বুঝতে পেরে শিউরে ওঠার মতো করেই বলেছিল, 'না না, প্লিজ তুমি বাবার কাছে যেও না।'

'কেন!' অজয় খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল।

'বাবাকে আমি কিছু জানাতে চাই না।'

'তা হলে ফাইনাল ব্যাপারটা হবে কী করে? আফটার অল উনি তোমার ফাদার। তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে যতই যা করো, তিনি ফাইনাল হুইসিলটি না বাজালে লাইফের নতুন চ্যাপ্টারটা কিছুতেই স্টার্ট করতে পারবে না।'

দু হাতে মুখ ঢেকে আবছা গলায় জয়া বলেছিল, 'আমার রিকোয়েস্ট, তুমি বাবার কাছে যেও না।'

একটু চুপ করে থেকে অজয় এবার বলেছিল, 'এদিকে আমার মা-ও এ ব্যাপারটায় ভীষণ প্রেসার দিচ্ছেন।'

মুখ থেকে দ্রুত হাত সরিয়ে সোজা হয়ে বসেছিল জয়া। বলেছিল, 'আমাদের কথা মা জেনে ফেলেছেন নাকি? তুমি বলেছ?'

'বলার দরকার হয়নি। ফাদার এবং মাদারেরা আমাদের চাইতে পঁচিশ তিরিশ বছর আগে ওয়ার্ল্ডে এসেছে। অতগুলো বছরের এক্সট্রা সারপ্লাস এক্সপিরিয়েন্স ওদের; ছেলেমেয়ের মুখের দিকে একবার

তাকিয়েই সব টের পেয়ে যায়।'

জয়া উত্তর দেয়নি।

অজয় বলেছিল, 'তোমার বাবাকে জানানো চলবে না। তা হলে এখন কী করা উচিত?'

জয়া বলেছিল, 'আমি বুঝতে পারছি না।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর অজয় হঠাৎ বলে উঠেছিল, 'তোমার কি ধারণা, আমার সঙ্গে বিয়ে হলে তোমার বাবা আপত্তি করবেন? আই মীন তোমরা বাঙালি, আমরা ইউ. পির লোক—'

'না না বাবার সে রকম কোনো প্রেজুডিস নেই। নিজেও তো তিনি অন্য জাতের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। আমার মা সিন্ধি।'

'তা হলে অসুবিধাটা কী?'

অসুবিধাটা যে কী, জয়া তা জানে, কিন্তু পরিষ্কার করে বলা যায় না। সে শুধু বলেছিল, 'আছে।'

অজয় বেশ খানিকক্ষণ পর বলেছিল, 'একটা কাজ করলে কেমন হয়?'

'কী?'

'ধর আমরা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে এখন বিয়েটা করে রাখলাম। পরে তুমি যখন বলবে, তোমার বাবাকে জানাব।'

'বিয়ে করলেই তো আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যেতে চাইবে।'

'নেভার। তুমি যখন বলবে তখনই নিয়ে যাব। তার আগে আমার দিক থেকে কোনো প্রেসার দেওয়া হবে না। ওয়ার্ড অফ অনার।'

জয়া এবার একটু রগড়ের গলায় বলেছিল, 'বিয়ে করবে অথচ বউ কাছে থাকবে না, তেমন বিয়ে করে কী লাভ?'

অজয় তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'পুরুষদের একটা সিক্রেট তোমাকে বলে দিই।'

'কী?'

'সেন্স অফ পজেসান। যতক্ষণ না সে তার ডিয়ারেস্টকে বা প্রিয়তম মানুষটিকে দখল করতে পারছে ততক্ষণ তার পিস নেই। বিয়েটা হয়ে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হব। তারপর যখন তোমার ইচ্ছে হবে আমার কাছে এস। ম্যারেড লাইফের মজাটা না হয় কিছুদিনের জন্য ডিলেডই হবে।'

জয়ার দ্বিধা কাটে নি। সে বলেছিল, 'আমাকে কয়েক দিন ভাবতে দাও।'

'অল রাইট।'

এর পর আরো কয়েক মাস কেটে গেছে। শেষ পর্যন্ত অজয়ের কথাই মেনে নিয়েছে জয়া। আপাতত তারা বিয়েটা করে রাখবে। পরে একটা আবহাওয়া তৈরি করে শিবনাথকে সব জানানো হবে। সেই অনুযায়ী ওরা মেরিন লাইনসে গিয়ে আব্রাহাম সাহেবের কাছে বিয়ের নোটিশ দিয়ে এসেছে। কিন্তু বিয়ের তারিখে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন ফর্মে সই করতে গিয়ে তার হাত কেঁপে গিয়েছিল। বিয়েটা হয়নি। তারপর আবার তারা নোটিশ দিয়েছিল, সেবারও ফর্মে সই দিতে পারেনি জয়া। শেষ মুহূর্তে তার এই দ্বিধার কারণ বার বার জানতে চেয়েছে অজয়। জয়া বলেছে, পরে এক সময় জানাবে। অজয় আমুদে প্রাণবান ছেলে তো বটেই, খুব ভদ্র এবং মার্জিত; জানার জন্য সে কখনও জোর করে নি। কবে জয়া বলবে সে জন্য অপেক্ষা করে আছে।

আজ তৃতীয় বার বিয়ে করতে গিয়ে ফিরে এসেছে জয়া। সে জানে না, নিজের ভেতরকার দ্বিধা পেরিয়ে কোনোদিন ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন ফর্মে সই করতে পারবে কিনা।

কতক্ষণ সমুদ্রের দিকের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিল, জয়ার খেয়াল নেই। হঠাৎ সাগরপাখিদের চিৎকারে চমকেউঠল সে। দেখল, হাজার হাজার সি-গল গলানো রুপোর মতো টলটলে তরল জ্যোৎস্না ডানায় মেখে সমুদ্রের দিকে উড়ে চলেছে।

এখন কত রাত, কে জানে। জুহুর বিশাল বেলাভূমি থেকে শুরু করে চারদিকের বিরাট বিরাট স্কাইস্ক্রেপার, নারকেল বন, অ্যাসফাল্টে মোড়া রাস্তা, ফ্লাইং ক্লাবের টাওয়ার—সব যেন ঘুমের আরকে ডুবে আছে।

জয়া আস্তে আস্তে তার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

সাত

পরের দিন যখন ঘুম ভাঙল, সবে রোদ উঠতে শুরু করেছে। পেঁজা তুলোর মতো আকাশের ছড়ানো ছিটানো মেঘ আর বীচের নারকেল গাছগুলো সোনার জলে আঁকা কোনো জাপানি ছবির মতো দেখাচ্ছে।

জয়া তার বিছানায় উঠে বসল। পরক্ষণেই তার চোখ গেল উলটোদিকের 'কট'টায়। সাধনা সেখানে নেই। তার মানে আগেই তাঁর ঘুম ভেঙে গেছে।

এ ঘরেই ড্রেসিং টেবলের কাছে জয়ার টুথ ব্রাশ আর পেস্টের টিউব থাকে। খানিকক্ষণ বিছানায় বসে থাকার পর টিউব থেকে ব্রাশে পেস্ট নিয়ে পেছনের ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল সে। সকালবেলা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজতে তার খুব ভাল লাগে।

এর মধ্যেই তাদের এই বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটার ঘুম ভেঙে গেছে। ওধারে জুহু বীচে এখন প্রচুর লোকজন। এই সব স্বাস্থ্যান্বেষীরা বাদামি বালির ওপর মাইলের পর মাইল হেঁটে ভোরের সামুদ্রিক বাতাস থেকে টাটকা ওজোন টেনে নিচ্ছে।

দাঁত মাজতে মাজতে হঠাৎ জয়ার চোখে পড়ল শিবনাথ আর সাধনা 'বীচের' ওপর দিয়ে পাশাপাশি হাঁটছেন। তার মনে পড়ল সাধনা মাসি চান্দেলি থেকে এখানে এলে বাবার সঙ্গে খুব বেশি কথা বলেন না বা বাবাও প্রগলভ হয়ে ওঠেন না। বেশির ভাগ সময়ই বাবার ঘরের ব্যালকনিতে সমুদ্রের দিকে মুখ করে দু জনে চুপচাপ বসে থাকেন। তখন মনে হয়, ওঁরা যেন অপার্থিব কোনো কিছুর মধ্যে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। নইলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে জুহুর নরম বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকেন।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাবা আর সাধনা মাসিকে দেখল জয়া। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমে চলে গেল। তার এখন অনেক কাজ। সাধনা মাসি আছেন, তাই রান্নাবান্নাটা তাকে করতে হবে না। কিন্তু রান্নার ব্যাপারে সাধনা মাসিকে এটা ওটা এগিয়ে তো দিতে হবে।

স্নান করে বাইরে বেরিয়ে জয়া দেখে সাধনা মাসি আর বাবা বীচ থেকে ফিরে এসেছেন। বাবার জন্য গ্যাসের উনুনে রুটি সেঁকে, ছানা তৈরি করে ফেলেছেন সাধনা মাসি। জয়া এবং নিজের জন্য ডিমের পোচ আর টোস্ট করে এখন পট থেকে কাপে কাপে চা ঢালছেন।

ডাইনিং টেবলে বসেই তিন জন ব্রেকফাস্ট সেরে নিল। তারপর বাবাকে ওষুধ খাইয়ে সাধনা মাসি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রান্না হবে রে?'

জয়া বলল, 'ফ্রিজে মাছ আছে। আর সবজি টবজি অনেক রয়েছে। তুমি যা ভাল হয় করো।'

'তুই মাছ আর সবজি কেটে কুটে দে। আমি ভাত চড়িয়ে দিই।'

'আচ্ছা।'

এই ফ্ল্যাটের কোথায় কী আছে, সাধনা জানেন। তিনি চাল ডাল বার করে ধুয়ে টুয়ে দুটো গ্যাসের উনুনে বসিয়ে দিলেন। মাছটাছ কেটে সাধনার হাতের কাছে রেখে একটা ছুরি দিয়ে আলু-পটল-পেঁয়াজ কাটতে লাগল জয়া।

বাবার কাছে ছাড়া অন্য সময়টা চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না সাধনা। ডাল-ভাত বসিয়েই একফালি কাপড় দিয়ে তিনি ডাইনিং স্পেসের দরজা জানালা মুছে ফেললেন। তারপর ধরলেন ফ্রিজটা। উইক-এন্ডে একবার এসে এই ফ্ল্যাটের প্রতিটি ঘর এবং যাবতীয় জিনিসপত্র বড় যত্ন এবং মমতায় ঝেড়েপুঁছে আয়নার মতো ঝকঝকে করে দিয়ে যান।

আনাজ কাটতে কাটতে সাধনাকে দেখে যাচ্ছিল জয়া। এই মহিলাটিকে তার ভারি আশ্চর্য লাগে। কত বছর ধরে শীত নেই গ্রীষ্ম নেই, চান্দেলি থেকে প্রতিটি উইক-এন্ডে তিনি এখানে আসছেন। দু দিনের মতো থাকেন সাধনা মাসি। এর মধ্যে রান্না করে, ঘর গুছিয়ে, ফ্রিজ মুছে, জয়া এবং শিবনাথকে খাইয়ে নিজের হাতে বিচিত্র এক টুকরো সংসার গড়ে তোলেন। এটুকুর জন্য তাঁর বড় মায়া, বড় টান। শুধু এটুকুর জন্যই বছরের পর বছর তিনি চান্দেলি থেকে ছুটে আসছেন।

একেক সময় জয়ার মনে হয়েছে, বাবার সঙ্গে কবেই তো মায়ের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। সাধনা মাসিরও তো কেউ নেই। পরস্পরকে ওঁরা ভালবাসেন, যদিও বাইরের দিকে তার প্রকাশ নেই। সাধনা মাসি যদি চিরকালের জন্য তাদের কাছে চলে আসত, বড় ভাল হত। কিন্তু সমস্ত দায়দায়িত্ব পালন করার পর চুলে যখন অদৃশ্য মেক-আপ ম্যান রুপোলি ব্রাশ টেনে দিয়েছে তখনও সাধনা মাসি বোধ

হয় সে কথা আর বলতে পারেন নি। এতকাল বলা হয় নি বলেই হয়তো আর বলতে পারছেন না। বাবার দিক থেকেও কোথায় যেন কী একটা আটকে আছে। খুব সম্ভব 'বলব বলব' করেও তিনি সাধনা মাসিকে কিছু বলেন নি। ফলে সাধনা মাসি সপ্তাহে দু দিন জুহুতে এসে সংসারের মায়াবী খেলা খেলে যাচ্ছেন। এটাই যেন একটা নিয়ম বা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

সাধনার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নিজের কথা মনে পড়ে গেল জয়ার। তার বিয়েটা বিরাট এক দ্বিধার মাঝখানে আটকে আছে। যদি ওটা হয়ে যায়ও, অজয়দের বাড়িতে গিয়ে সে থাকতে পারবে না। সাধনা মাসির মতোই কয়েক ঘন্টার জন্য গিয়ে একটু মায়াবী খেলা খেলে আসতে হবে, হঠাৎ জয়ার মনটা ভারি বিষাদে ছেয়ে যেতে লাগল।

ফ্রিজ মোছা হয়ে গেলে আঁচলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সাধনা মাসি জয়ার মুখোমুখি একটা চেয়ারে এসে বসলেন। বললেন, 'আজ তোকে অফিসে যেতেই হবে?'

জয়া জিজ্ঞেস করল, 'কেন বল তো?'

'আমি থেকে যাচ্ছি। তুই ছুটি নিয়ে বাড়িতে থাকলে ভাল লাগত।'

পলকের জন্য অজয়ের মুখটা মনে পড়ে গেল জয়ার। কাল রাত্তিরে করুণ মুখ করে সে তাকে চার্চগেট স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। এক বার দু-বার না, তিন তিন বার ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে বিয়ের কাগজপত্র সই না করেই ফিরে এসেছে। আজ অজয়ের সঙ্গে দেখা করে জয়া তাঁর অসহায়তার কথা বোঝাতে চেষ্টা করবে। যদি সম্ভব হয়, একবার কোলাবায় গিয়ে অজয়ের মায়ের সঙ্গেও দেখা করে আসবে। তিনি সব ব্যাপারটা জানেন। তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে আসা দরকার। তা ছাড়া অফিসেও প্রচুর কাজ পড়ে আছে। এই সময়টা প্রচুর টুরিস্ট আসে বম্বেতে। তাছাড়া এখানকার লোকদেরও বাইরে যাওয়ার হুজুগ পড়ে যায়। দিন দিন তাদের ক্লায়েন্ট বাড়ছেই। ফলে এত কাজের প্রেসারের মধ্যে অফিস কামাই করা কোনোমতেই সম্ভব না। জয়া বলল, 'না মাসি, আজ ছুটি নেওয়া যাবে না। কাল অনেক কষ্ট করে ম্যানেজ করেছিলাম।'

'তা হলে আর কী করা, অফিসেই যা। তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস।'

'আচ্ছা।'

'সেই কথাটা মনে আছে তো?'

'কোনটা?'

'কাল রাত্তিরে কী বলেছিলি?'

জয়ার মনে পড়ে গেল। সে কাউকে ভালবাসে কিনা, এই কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলেন সাধনা মাসি। জয়া বলল, 'বলেছি তো তোমাকে বলব—' এই ব্যাপারটা নিয়েও অজয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

সাধনা মাসি বললেন, 'ঠিক আছে, দেখা যাবে।'

জয়া একটু ভেবে বলল, 'তুমি কিন্তু তোমার অফিসে ছুটির জন্য ফোন করবে।'

'মনে আছে। দশটা বাজুক, অফিস খুললে তবে তো ফোন করব। এখন আর কাকে পাব।'

আজ আর শিবনাথের জন্য ব্যস্ত না হলেও জয়ার চলবে। সাধনা মাসি আছেন; তিনিই বাবার দিকটা দেখবেন। উইক এন্ডে সাধনা মাসি চান্দেলি থেকে এলে বাবার সম্বন্ধে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে যায় জয়া।

আরো এক ঘন্টা বাদে খেয়েদেয়ে অফিসে বেরিয়ে পড়ল জয়া। তাদের ফ্ল্যাটের সামনে প্যাসেজ ধরে লিফট বক্সের সামনে আসতেই দেখা গেল পাইলট ফ্লেচার, তার গাবদা গোবদা রক্ষাকালী মার্কা বউ এলসা, এবং পর পর দুই ইঞ্চি করে ছোট কালো কালো একগাদা ছেলেমেয়ে দারুণ সেজে দাঁড়িয়ে আছে। সাজগোজটা সব চাইতে বেশি করেছে এলসা। পুরু কালো ঠোঁটে লাল টকটকে লিপস্টিক, গালে রুজ, কপালে সোহাগ বিন্দি, পরনে গাঢ় খয়েরি রঙের চক্কর বক্কর লাগানো ম্যাক্সি, আট ইঞ্চি হিলের জুতো, মাথায় রুমাল। স্বামীর সঙ্গে দারুণ হেসে হেসে কথা বলছিল সে। এরাই যে কাল মাঝরাত পর্যন্ত তাদের ফ্ল্যাটে একটা মহাযুদ্ধের মহড়া দিয়েছিল তা যেন ভাবা যায় না।

অবশ্য জয়া মোটেই অবাক হয় নি। জুহুর এই অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে আসার পর থেকে দশ বছর ধরে একই দৃশ্য দেখে আসছে সে। আগের রাত্তিরে যদি এলসারা মারপিট করে, পরের দিন যত কাজই

থাক, ফ্লেচার অফিসে যাবে না, বাচ্চারা স্কুল কামাই করবে এবং বাড়িতে উনুন ধরবে না। সকালবেলা তাদের গোটা ফ্যামিলি তাদের ওয়ার্ডরোব থেকে সব চাইতে দামি আর জমকাল পোশাক বার করে সেজেগুজে বেরিয়ে পড়বে। সারাদিন বাইরে হই হই করে, হোটেলে খেয়ে, বেড়িয়ে, সিনেমা দেখে ফিরে আসবে মধ্যরাতে। বেশ কয়েকটা দিন ফ্লেচার আর এলসাকে দেখে মনে হবে তারা যেন টিন-এজার প্রেমিক প্রেমিকা। তারপর দুম করে একদিন আবার গলা পর্যন্ত ঠাররা বা কাজু-ফেনি গিলে আরক্ত চোখে টলতে টলতে ফ্ল্যাটের সামনের প্যাসেজে এসে শুয়ে থাকবে ফ্লেচার। তখন আবার যুদ্ধের ব্যান্ড বেজে উঠবে। লড়াই-এর পর ট্রিটি, তারপর চুটিয়ে ক'দিন প্রেম। সাইকেলের চাকা যেমন ঘুরে যায় তেমনি ওদের ঝগড়া, আর প্রেমও একটার পেছনে আরেকটা ঘুরে ঘুরে আসে। দশ বছর ধরে এই প্রোগ্রামের হেরফের হতে দেখে নি জয়া। লাইফে যারা একই কনসার্ট বছরের পর বছর বাজিয়ে যেতে পারে তারা নিঃসন্দেহে সুখী। বেশ আছে ফ্লেচাররা।

একই বাড়িতে পাশাপাশি দশ বছর আছে জয়ারা। ফ্লেচারদের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা না হলেও সম্পর্কটা মোটামুটি খারাপ নয়। দেখা হলে ওরা হেসে কথা বলে, জয়া আর শিবনাথ সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়। বিজয়া দশমীর দিন জয়ারা যেমন ওদের ফ্ল্যাটে মিষ্টি পাঠায়, ওরাও তেমনি এক্স-মাসে কেকের বাক্স দিয়ে যায়।

জয়াকে দেখে এলসা হাসল, 'অফিসে যাচ্ছ?'

জয়াও হাসল, 'হ্যাঁ।'

'কাজকর্ম কিরকম চলছে?'

'ভীষণ প্রেসার।'

'অত কাজ করে কী হবে? চাকরি ছেড়ে দিয়ে এবার একটা বিয়ে করে ফেল। ইটস হাই টাইম।'

দমকা বাতাস জয়ার বুকের ভেতর এলোমেলো ঢেউ তুলে দিয়ে গেল যেন। সে উত্তর দিল না। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?'

'প্রথমে মাড আইল্যান্ডে। ওখান থেকে ফিরে হোটেলে খেয়ে এধারে ওধারে ঘুরব। সন্ধেবেলা 'এরস' সিনেমায় হলিউডের একটা হাসির ছবি দেখে রাত্তিরে কোথাও ডিনার চুকিয়ে বাড়ি ফিরব।'

ফ্লেচার এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি। এবার মুখ খুলল, 'তুমি তো জানই কাল রাত্তিরে ফ্ল্যাটে গোলমাল করে ফেলেছিলাম। আজ তোমার আন্টিকে তাই ঘুষ দিতে হচ্ছে।' জয়া ফ্লেচার আর এলসাকে আঙ্কল আন্টি বলে।

'ঘুষ!' ঝট করে স্বামীর দিকে ঘুরে গেল এলসা। হাত বাড়িয়ে তার চুলের ঝুঁটি ধরতে যাচ্ছিল। তার আগেই এক্সপার্ট ক্যারাটে খেলোয়াড়ের মতো চোখের পলকে মাথাটা সরিয়ে নিয়েছে ফ্লেচার। অবশ্য মারদাঙ্গা করার জন্য আজ এলসা তার চুল ধরতে চায় নি। এটা তার ভালবাসার প্রকাশ।

লিফট বক্সের পাশের দেওয়ালে একেবারে সেঁটে গিয়ে হাতজোড় করে ফ্লেচার বলল, 'সরি, এক্সট্রিমলি স্যরি—পারডন—'

এই সময় পাশাপাশি দুটো লিফট নিচতলা থেকে ওপরে উঠে এল। একটা বাক্সে ফ্লেচার, এলসা আর জয়া ঢুকল। আরেকটা বাক্সে ঢুকল ফ্লেচারের বাচ্চারা।

এক মিনিটের মধ্যে লিফট দুটো গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে এল। রাস্তায় এসে দুটো ট্যাক্সি নিল ফ্লেচাররা। জয়া যেদিকে যাবে একেবারে তার উল্টোদিকে যাবে ফ্লেচাররা। তবু ফ্লেচার বলল, 'উঠে এস। তোমাকে সান্তাক্রুজ স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে যাই।'

জয়া দু হাত নেড়ে বলল, ' না না আঙ্কল, আপনারা চলে যান। আমার জন্য অতটা ঘুরে যেতে হবে না।'

আরো দু একবার বলার পরও জয়া যখন ট্যাক্সিতে উঠতে রাজি হল না তখন ফ্লেচার বলল, 'ঠিক আছে, তা হলে আমরা চলি। পাশাপাশি থাকি অথচ অনেক দিন কিন্তু তুমি আমাদের ফ্ল্যাটে আসো নি।'

'আপনারাও তো আমাদের ওখানে আসেন নি।'

'ঠিক আছে, কালই তোমাদের ওখানে যাব। অনেক গল্প করব। তারপর কিন্তু আমাদের ফ্ল্যাটে

তোমার রিটার্ন ভিজিট দেওয়া চাই।'

'নিশ্চয়ই।'

ফ্লেচাররা চলে গেল। জয়া রাস্তা পেরিয়ে বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়াল।

আট

কাঁটায় কাঁটায় দশটায় অফিসে পৌঁছে গেল জয়া। দোতলায় পুরু কাঁচের দেওয়াল-ঘেরা যে ঘরটায় সে বসে সেখান থেকে ফিরোজ শা মেটা রোডের অনেকটা দেখা যায়। তার ঘরের ডান পাশ থেকে কাঁচের ওয়ালে ঘেরা অন্যান্য কলিগদের ঘর। সামনের দিক নিয়ে লম্বা করিডোর যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে পাশাপাশি ম্যানেজার এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেম্বার। তার পাশে কনফারেন্স রুম। সেটার গা ঘেঁষে কোম্পনির তিন জন ডাইরেক্টরের তিনটে চেম্বার।

কাল ছুটি নিয়েছিল জয়া। আজ তার ঘরে ঢুকে সে দেখল, টেবিলের ওপর অনেকগুলো ফাইল জমা হয়ে রয়েছে। এগুলো কালকের ফাইল। এরপর আজকের ফাইল আসবে। তার মানে একটা সেকেন্ড আর গড়িমসি করে কাটানো যাবে না।

জয়ার ঘরটা চমৎকার সাজোনো। পেছনের দেওয়ালের একধারে এয়ারকুলার বসানো, মাঝখানে কাঠের সুদৃশ্য ওয়াল-ক্যালেন্ডার। আধখানা বৃত্তের মতো গ্লাস-টপ টেবল তার, ফোমে মোড়া চেয়ার। পিন কুশন, অ্যাশ-ট্রে, পেন-স্ট্যান্ড, টেবল-ক্যালেন্ডার, টেলিফোন, সব ঝকঝকে। ঘরের সামনের প্যাসেজে একটা টুলের ওপর সাদা ধবধবে ইউনিফর্ম পরা বেয়ারা বসে ছিল। জয়া তার চেয়ারে বসতেই ওয়াটার কুলার থেকে এক গেলাস জল এনে টেবলে ঢাকা দিয়ে রেখে গেল।

জয়া দু মিনিট চুপচাপ বসে থাকল। তারপর জলটা খেয়ে নিয়ে ফাইল খুলে বসল।

নিচে ফিরোজ শা মেটা রোডে এখন হাজার হাজার প্রাইভেট কার আর ট্যাক্সি স্রোতের মতো ছুটে যাচ্ছে। আর যাচ্ছে ফুটপাথের ওপর দিয়ে অগুনতি মানুষের অগোছালো মিছিল। কাঁচের দেওয়াল বলে বাইরের শব্দ প্রায় আসছেই না। নিচের রাস্তাটা তখন সাইলেন্ট যুগের কোনো ছবির অংশ যেন।

ঘাড় গুঁজে কতক্ষণ কাজ করেছিল, খেয়াল নেই। এক সময় মুখ তুলে রাস্তাটার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল জয়া। একটা প্রকান্ড ইমপোর্টেড আমেরিকান গাড়ি তাদের অফিসের সামনে এসে পার্ক করল এবং দরজা খুলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এল তার মা চন্দ্রা। এক সময়ে সে ছিল চন্দ্রা মালকানি, পরে চন্দ্রা ব্যানার্জি, এখন চন্দ্রা সিং। মায়ের সঙ্গে যে ভদ্রলোকটি বেরিয়ে এলেন তাঁকেও চেনে জয়া। তিনি মায়ের দু নম্বর স্বামী গলফ প্লেয়ার কর্নালি সিং। জয়া জানে, ওরা তার কাছেই আসছে। নিশ্চয়ই বাইরে কোথাও যাবে, সেই জন্য এয়ার টিকিটের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

দু মিনিটের মধ্যেই ওরা জয়ার ঘরে এসে পড়ল। কর্নালি সিং-এর বয়স পঞ্চাশের ওপরে কিন্তু এখনও তাঁর চেহারা বেতের মতো টান টান। মায়ের বয়সও পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই, কিংবা বয়সের ওই মাইল স্টোনটা সে পেরিয়ে গিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এই বয়সেও ফিগারটাকে তেইশ চব্বিশ বছরের কোনো যুবতীর মতো টাটকা এবং তাজা রেখেছে।

ঘরে ঢুকেই সারা মুখ জুড়ে হেসে কর্নালি সিং দারুণ মিষ্টি করে বললেন, 'হাউ আর ইউ মাই ডিয়ার ইয়াং লেডি—'

ওদের দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল জয়া। মায়ের দ্বিতীয় স্বামীকে কারো ভাল লাগার কথা নয়! কিন্তু কর্নালি সিংকে মনে মনে পছন্দ করে জয়া। সে বলল, 'ফাইন! প্লিজ বি সিটেড—'

ওরা বসলে জয়াও বসল। তারপর বলল, 'কেমন আছেন আপনারা?'

'ফার্স্ট ক্লাস।'

'এবার অনেক দিন পরে এলেন।'

'হ্যাঁ, নানা কাজে এমন জড়িয়ে ছিলাম যে আসতে পারি নি।'

চন্দ্রা জিজ্ঞেস করল, 'তোর বাবার কী খবর?'

জয়া বলল, 'নাথিং নিউ। যেমন চলছিল তেমনই চলছে।'

জয়া আর শিবনাথের মোটামুটি সব খবরই রাখে চন্দ্রা। সে বলল, 'তোর বাবা সং রেকর্ডিং-এ রেগুলার বাজায়?'

'হ্যাঁ।'

'সেই মেয়েটা, আই মিন সাধনা রেগুলার চান্দেলি থেকে উইক-এন্ডে আসে?'

জয়া সংক্ষেপে বলল, 'হ্যাঁ।' সাধনা যে এখন বম্বেতেই তাদের ফ্ল্যাটে আছেন, সেই কথাটা বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত বলল না।

চন্দ্রা বলল, 'আই হ্যাভ নেভার সিন সাচ আ টাইপ ইন মাই হোল লাইফ।'

জয়া উত্তর দিল না।

চন্দ্রা আবার বলল, 'কী সুখ সে পায় এতে? তোর বাবাও বা কেমন! হাউ হি টলারেটস দ্যাট ওম্যান? ওদের রিলেশানটা যে কী, আমি বুঝতে পারি না। ইটস আ মিস্ট্রি টু মি।'

কর্নাল সিং খুবই ভদ্র মানুষ, সত্যিকার স্পোর্টসম্যান। এসব ব্যাপার তিনি এড়িয়েই যেতে চান। তিনি বললেন, 'আঃ চন্দ্রা, জয়াকে এসব বলে কী হবে? আর ওর বাবার সঙ্গে সেই ভদ্রমহিলার কী সম্পর্ক, তা নিয়ে তুমি কেন ভাবছ? তোমার কাছে তো ওটা ক্লোজড চ্যাপ্টার।' বলেই জয়ার দিকে ফিরলেন, 'তোমার মায়ের কথায় কিছু মনে করো না জয়া।'

জয়া অল্প হাসল, কিছু বলল না।

কর্নাল সিং আবার বললেন, 'আগে দরকারী ব্যাপারটা সেরে নিই, তারপর গল্প করা যাবে।'

জয়া উন্মুখ হল।

কর্নাল সিং বললেন, 'নেক্সট মান্থের ফার্স্ট উইকে, ধর চার তারিখের মধ্যে নিউ ইয়র্কের দুটো টিকিট চাই। জাম্বো প্লেনের সিট বুক করবে।'

জয়া জিজ্ঞেস করল 'কোন এয়ার লাইনসে চাইছেন?'

'আই হ্যাভ নো চয়েস। এটা তোমার ওপরেই ছেড়ে দিলাম। তুমি যে এয়ার লাইনসে অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দেবে আমরা তাতেই যাব।'

'ঠিক আছে।'

'কবে জানাবে?'

'কাল পরশুর মধ্যে।' জয়া ডাইরিতে কর্নাল সিং আর চন্দ্রার নামটা টুকে নিল। তারপর বলল, 'এবার ক'দিন বাইরে থাকছেন?'

কর্নাল সিং বললেন, 'লম্বা ট্যুর। কম করে মাস তিনেক থাকতে হবে। আমেরিকা থেকে কানাডা যাব। সেখান থেকে ইওরোপের দু একটা কানট্রি হয়ে ফিরব। যাক, কাজের কথা হয়ে গেল। এবার তোমার কথা বল।'

বেয়ারাকে দিয়ে কর্নাল সিংদের জন্য কফি আনিয়ে জয়া বলল, 'আমার আবার কী কথা। সকালবেলা উঠে ট্রেন ধরে অফিসে আসছি, সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরছি। এইভাবে লাইফ কেটে যাচ্ছে।'

'নো নো, দিস ইজ নো গুড।' পোলো খেলোয়াড় কর্নাল সিং জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, 'তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, এভাবে একটা মেয়ের লাইফ চলতে পারে না।'

জয়া উত্তর দিল না।

কর্নাল সিং বলতে লাগলেন, 'তোমার সম্বন্ধে চন্দ্রা আর আমি অনেক ভেবেছি। এক কাজ কর না—'

জয়া মুখ তুলল, 'কী?'

'আজ ছুটি নিয়ে আমাদের সঙ্গে চল। কোথাও গিয়ে খানিকক্ষণ বসা যাক। অ্যান্ড লেট আস ডিসকাস দা ম্যাটার—'

'কাল ক্যাজুয়াল লিভ নিয়েছিলাম। আজ ভীষণ কাজের চাপ রয়েছে। কিছুতেই পারব না।'

'একেবারেই ইমপসিবল?'

'হ্যাঁ।'

একটু ভেবে কর্নাল সিং বললেন, 'তা হলে তোমাকে ডিসটার্ব করা ঠিক হবে না। ওনলি আই

শ্যাল টেক টেন মিনিটস ফ্রম ইওর ভ্যালুয়েবল টাইম।'

জয়া অপেক্ষা করতে লাগল।

কর্নাল সিং বললেন, 'তোমার একটা বিয়ে হওয়া দরকার। ইউ শুড হ্যাভ এ লাইফ পার্টনার।' জয়ার সম্পর্কে তাঁর এক ধরনের স্নেহ আছে। স্নেহটা বেশ আন্তরিকই। হয়তো স্ত্রীর প্রথম পক্ষের মেয়ের সম্বন্ধে মনে মনে খানিকটা দায়িত্বও অনুভব করেন।

চন্দ্রাও বলল, 'হ্যাঁ, বয়স হয়ে যাচ্ছে। এবার একটা বিয়ে কর।'

জয়া চুপ করে রইল। এই কথাটা আগেও ওরা, বিশেষ করে কর্নাল সিং অনেক বার বলেছেন।

কর্নাল সিং আবার বললেন, 'একটা কথার উত্তর দাও তো?'

জয়া জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'প্রেম ট্রেম করছ?'

জয়া প্রথমটা হকচকিয়ে গেল। ঠিক এই রকম একটা প্রশ্নের জন্য তৈরি ছিল না। একটু পর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল, 'অফিসের এত কাজ, তার মধ্যে ওসবের সময় কোথায়?' বেশ ক'বছর ধরেই অজয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু সে কথা তো কর্নাল সিংকে বলা যায় না। জয়া ও ব্যাপারটা গোপনই রাখল।

স্পোর্টসম্যান কর্নাল সিং বেশ মজার মানুষ। তিনি বললেন, 'আই সি, যে চাকরি করে সে বুঝি প্রেম করে না! অবশ্য সিনসিয়ারলি করতে গেলে একটার বেশি কিছু করা যায় না। আফটার অল, প্রেম একটা হোল-টাইম জব।'

জয়া হেসে ফেলল।

কর্নাল সিং বললেন, 'তোমার মতো একটা হ্যাণ্ডসাম ইয়াং লেডি এখনও একটা প্রেম করে উঠতে পারল না! স্ট্রেঞ্জ! ইউ আর টোটালি আনফিট ফর দি ওয়ার্ল্ড।'

জয়া হাসতেই লাগল।

'স্ট্যাটিসটিকস নিয়ে দেখ, বম্বে সিটিতে তোমার এজের যে কোনো মেয়ে প্রেমের সেঞ্চুরি কমপ্লিট করে ফেলেছে। আর তুমি? না, তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।' বলতে বলতে একটু থামলেন কর্নাল সিং। পরক্ষণেই আবার শুরু করলেন, 'এনিওয়ে, তোমার যখন ওদিকে কোনো ইনভলভমেন্ট নেই তখন ভালই হয়েছে। একটা খুব ভাল ম্যাচ তোমার জন্যে ঠিক করে রেখেছি। দি বয় ইজ ভেরি ব্রাইট, হিজ ফিউচার ইমেনসলি প্রসপেকটিভ।' চন্দ্রার দিকে ফিরে বললেন, 'জয়াকে ছেলেটার সম্বন্ধে ডিটেলস বল তো—'

চন্দ্রা যা বলল, সংক্ষেপে এই রকম। যে ছেলেটির সঙ্গে জয়ার বিয়ের কথা তারা ভেবেছে সে মহারাষ্ট্র ক্যাডারের একজন আই. এ. এস। বত্রিশ তেত্রিশের মতো বয়স। অত্যন্ত হ্যাণ্ডসাম। চার্মিং পার্সোনালিটি। বাবা গুজরাটি, মা মারাঠি। বাবা বম্বের বিগ বিজনেসম্যান। ওই একমাত্র ছেলে তাঁদের। মহারাষ্ট্র গর্ভনমেন্টের একটা কর্পোরেশনের সে চেয়ারম্যান। লাইফে রাইজ করার অনেক সুযোগ আছে তার। পাত্র হিসেবে এমন ছেলে খুবই লোভনীয়।

কর্নাল সিং বললেন, 'ছেলেটিকে আমাদের দারুণ পছন্দ। এখন তুমি রাজি থাকলেই হয়—'

বাইরে খুব সহজভাবে কথা বললেও ভেতরে ভেতরে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিল জয়া। সে বলল, 'বিয়ের ব্যাপারে এখনও আমি কিছু ভাবি নি।'

'এক্ষুনি কিছু বলতে হবে না। ইউ টেক ইওর টাইম। তাড়াহুড়ো নেই। আমরা আমেরিকা-টামেরিকা ঘুরে আসি; তুমি তার মধ্যে ডিসিসনটা নিয়ে নাও।'

'দেখি—'

'জয়া ডিয়ার, আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ দ্য বয় রমেশ ইজ ব্রিলিয়ান্ট। তুমি সুখী হবে।'

জয়া এবার উত্তর দিল না।

কর্নাল সিং বলতে লাগলেন, 'তুমি মনে করো না লুকিয়ে চুরিয়ে আমরা কিছু করব। তোমার বাবার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলে নেব। বাট দ্যাট ইজ আফটার আওয়ার রিটার্ন ফ্রম আমেরিকা অ্যাণ্ড ইওরোপ।'

জয়া বলল, 'এখনও অনেক সময় আছে।'

'তা আছে। তবে যাবার আগে আমি একটা কাজ করে দিয়ে যেতে চাই।'

'কী কাজ?'

'রমেশের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব।' বলে একটু ভেবে নিলেন কর্নাল সিং। তারপর আবার বললেন, 'আজ ছুটির পর কী করছ?'

জয়া তাঁর উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারছিল। সে জানে কর্নাল সিং ভয়ানক ছটফটে, ব্যাস্তবাগীশ মানুষ। তাঁর মাথায় কিছু একটা ঢুকলে সেটা তক্ষুনি না করে ফেলা পর্যন্ত রেহাই নেই। ব্যাপারটা পোকার মতো তাঁকে যেন কামড়াতে থাকে। অজয়ের মুখ এই মুহূর্তে মনে পড়ছিল জয়ার। আজ অজয় নিশ্চয়ই তাকে ফোন করবে। না করলেও সে নিজেই অজয়ের সঙ্গে যেমন করে হোক দেখা করবে। জয়া বলল, 'ছুটির পর একটা কাজ আছে।'

'আর্জেন্ট?'

'খুব।'

'কাজটা আরেক দিন করলে হয় না?'

'না।'

'ঠিক আছে, কাল অফিস আওয়ার্সের মধ্যে কোনো এক সময় তোমাকে ফোন করব। কাল কিন্তু কোনো রকম অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখবে না।'

'তা না হয় না রাখলাম। কিন্তু কেন বলুন তো—'

'বললাম না, রমেশের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব। নিজের এন্টারপ্রাইজে একটা প্রেমও তো করে উঠতে পারলে না। এ ব্যাপারে আমিই তোমাকে হেল্প করব। আর—'

'আর কী?'

'চন্দ্রা দু দুটো বিয়ে করেছে। তার কাছ থেকে প্রেমের টেকনিক্যাল নো-হাউটা জেনে নিও।'

চন্দ্রা চোখ কুঁচকে বলল, 'আঃ, কী হচ্ছে! আফটার অল জয়া ইজ মাই ডটার।'

কর্নাল সিং শব্দ করে হাসলেন, 'ডটারের সামনে য়্যু একখানা আইডিয়াল এগজাম্পল সেট করেছ! যাই হোক—' বলেই জয়ার দিকে তাকালেন, 'তা হলে ওই কথা রইল। রমেশের সঙ্গে কাল তোমার আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। আশা করি, তোমরা দু'জনে তিন সাড়ে তিন মাসের মধ্যে নাইনটি পারসেন্ট কাজ এগিয়ে রাখবে। বাকি টেন পারসেন্ট আমরা ফিরে এলে চুকিয়ে ফেলব। ও.কে?'

জয়া বলল, 'অত তাড়াহুড়োর কী আছে? আপনারা ফিরে আসুন; তারপর দেখা যাবে।'

'ও নো মাই ডিয়ার, অনেক আগেই তোমার ওপর আমাদের জোর করা উচিত ছিল। সেটা যখন করা হয় নি তখন আর ব্যাপারটা ফেলে রাখব না। কালই ও ব্যাপারটায় জিরো আওয়ার ডিক্লেয়ার করে গেলাম।'

জয়া বুঝতে পারছিল, আপত্তি করে কাজ হবে না। সে যত না না করবে, কর্নাল সিং-এর গোঁ ততই বেড়ে যাবে। জয়া ঠিক করে ফেলল, কর্নাল সিং যখন ফোন করবেন তখন কিছু একটা বানিয়ে বলে এড়িয়ে যাবে। সে বলল, 'কালকের ব্যাপার কাল দেখা যাবে।'

'তা হলে আজ ওঠা যাক।'

কর্নাল সিংরা চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর জয়া দেখতে পেল, নিচে ফিরোজ শা মেটা রোডে সেই ইমপোর্টেড আমেরিকান কারে ওঁরা উঠে পড়লেন। তারপর হাজার হাজার গাড়ির স্রোতে ওঁদের গাড়িটা একটা ফোঁটার মতো অদৃশ্য হয়ে গেল।

নয়

আবার ফাইলের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল জয়া। অবশ্য তার ফাঁকে ফাঁকে নানা এয়ার লাইনস অফিসে ফোন করে করে জেনুইন পাসপোর্ট হোল্ডার ক্লায়েন্টদের জন্য প্লেনের সিট বুক করেছে।

দুটোর সময় বেয়ারা এসে টিফিনের প্যাকেট আর চা দিয়ে গেল। অফিস থেকে বিনা পয়সায় তাদের টিফিন দেওয়া হয়। চা বা কফি যখন এবং যত বার ইচ্ছে চাইলেই পাওয়া যায়। তার জন্য

পয়সা দিতে হয় না।

খাওয়া শেষ করে সবে চায়ে চুমুক দিয়েছে জয়া, টেলিফোন বেজে উঠল। ক্রেডেল থেকে রিসিভারটা তুলে কানে লাগাতেই অজয়ের গলা শোনা গেল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে জয়া; আই অ্যাম ফিনিশড।'

জয়া চমকে উঠল, 'কী ব্যাপার?'

'মাদ্রাজ থেকে দাদা বৌদি ছেলেমেয়েদের নিয়ে দশ মিনিট আগে বাড়িতে এসেছে। এসেই আমাকে ফোন করেছে।'

'হঠাৎ ওঁরা চলে এলেন!'

'তোমার মেমোরিতে রাস্ট পড়ে যাচ্ছে দেখছি। মনে নেই, এবার আমরা ফাইনাল বিয়েটা করছি বলে ওদের টেলিগ্রাম করেছিলাম?'

শুকনো, কাঁপা গলায় জয়া বলল, 'ও—'

অজয় বলল, 'দাদাকে তো জানো, সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে নেমেই এক কান্ড বাধিয়ে দিয়েছে।'

'কী?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল জয়া।

'কোনো খবর না নিয়েই এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করে নটরাজ হোটেলে আমাদের বিয়ের ব্যাপারে একটা পার্টির ব্যবস্থা করে ফেলেছে! ওয়েস্টার্ন কমাণ্ডে ওর যে সব বন্ধু টন্ধু আছে তাদের সবাইকে পার্টিতে ইনভাইট করে তবে কোলাবায় এসেছে। বিয়ে হয় নি অথচ বৌ ভাতের ফাংশান অ্যারেঞ্জড হয়ে গেল! আই অ্যাম রিয়ালি কনফিউজড। বুঝতে পারছি না, এখন কী করব। ইমিডিয়েটলি তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার।'

জয়া ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। সে বলল, 'এখন আমি কী করে বেরুব!'

'বেরুতেই হবে।'

'ডোন্ট বী ইমপেশেন্ট; এখন বেরুবার অসুবিধা আছে।'

'অসুবিধা থাকলেও বেরুতে হবে। এটা লাইফ অ্যাণ্ড ডেথের ব্যাপার। আধ ঘন্টার মধ্যে তুমি স্টারলিং সিনেমার কাছে চলে এস। আই শ্যাল পিক আপ ইউ।' বলেই লাইনটা কেটে দিল অজয়।

অগত্যা খানিকটা অস্বস্তি নিয়েই জেনারেল ম্যানেজার ডি সুজা সাহেবের সঙ্গে দেখা করল জয়া। ডিসুজা কড়া টাস্ক মাস্টার কিন্তু ভেতর ভেতরে খুবই সহৃদয়। জয়া এমনিতে ছুটিছাটা নেয় না ; কাজের ব্যাপারে ভয়ানক সিরিয়াস। যদিও কাল ক্যাজুয়াল লিভ নিয়েছিল, আজও বলামাত্র ছুটি পেয়ে গেল।

স্টারলিং সিনেমার সামনে পাঁচ মিনিটও দাঁড়াতে হল না। অজয় তার অফিসের গাড়িতে এসে জয়াকে তুলে নিল। ড্রাইভারকে বলল, 'কোলাবা—'

জয়া চমকে উঠল, 'বাড়ি যাচ্ছ নাকি?'

অজয় বলল, 'আমার মাথার ভেতর জট পাকিয়ে যাচ্ছে। দাদাকে কী করে ফেস করব বুঝতে পারছি না। থার্ড টাইমেও বিয়ে করতে পারি নি শুনলে ও যা তা একটা কাণ্ড করে বসবে। তুমি সঙ্গে থাকলে একটা মরাল সাপোর্ট অন্তত পাব।'

হঠাৎ ঢোক গিলতে কষ্ট হল জয়ার। মুখের ভেতরটা তেতো লাগল যেন। বলল, 'কিন্তু—'

'কোনো কিন্তু না। বিয়েটা না হওয়ার ব্যাপারে তোমার ক্রেডিট ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট। দাদাকে ফেস তো তোমারই করা উচিত।'

জয়া দম বন্ধ করে বসে থাকল।

অজয় একটু ভেবে বলল, 'মা যদি এর মধ্যে সব বলে-টলে ম্যানেজ করে থাকে, আমরা বেঁচে যাব। নইলে বোথ অফ আস শ্যাল হ্যাভ টু ফেস দা মিউজিক।'

একটু চুপ। তারপর জয়ার দিকে খানিকটা ঝুঁকে গভীর গলায় অজয় বলল, 'একটা কথা বলব?'

জয়া তার দিকে তাকাল। অজয় বলতে লাগল, 'জোর করে কখনও তোমার কাছে জানতে চাই নি। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে এখন আর না জানলেই নয়। মায়ের কাছে, দাদা বৌদির কাছে বার বার বানিয়ে বানিয়ে যা খুশি একটা এক্সপ্লেনেশন দিতে হচ্ছে। অথচ আমি জানি না, কেন আমাদের বিয়েটা হচ্ছে না? আমাদের অসুবিধাটাই বা কোথায়?' থেমে আবার

বলল, 'আশা করি তুমি ভুল বুঝবে না। আমার মানসিক অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করবে।'

জয়া তক্ষুনি উত্তর দিল না। সে জানে অজয় ছটপটে আমুদে ধরনের ছেলে হলেও ভেতরে ভেতরে ভীষণ সিরিয়াস; বিশেষ করে জয়ার সম্পর্কে। তার আন্তরিকতার মধ্যে কোনোরকম জোলো ব্যাপার নেই। জয়া যেভাবে তিন তিন বার বিয়ের ফর্মে সই না দিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে চলে এসেছে, তাতে অন্য পুরুষ হলে কবেই সম্পর্কটা কেটে যেত। সে বুঝতে পারছিল, বিয়ের সম্বন্ধে তার দ্বিধাটা আর গোপন রাখা যাবে না। দিনে দিনে ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠছে। অজয়ের কাছে খোলাখুলি বললে সে হয়তো রাস্তাও বার করে ফেলতে পারে।

কিছুক্ষণ পর জয়া বলল, 'আজ তোমাকে সব বলব।'

গাড়িটা এক সময় কোলাবায় বিরাট এক হাই-রাইজ বিল্ডিং-এর সামনে এসে দাঁড়াল।

দশ

অফিসারদের জন্য অজয়দের এয়ার লাইনস কোলাবার এই বাড়িটার ফিফটিনথ আর সিক্সটিনথ ফ্লোরের সব ক'টা স্যুইট কিনে নিয়েছে। অজয়ের ভাগে পড়েছে ফিফটিনথ ফ্লোরের দক্ষিণ দিকের ফ্ল্যাটটা।

আগেও এখানে অনেক বার এসেছে জয়া। কিন্তু লিফট থেকে বেরিয়ে লম্বা প্যাসেজ ধরে অজয়ের ফ্ল্যাটের সামনে আসতে আসতে আজ গল গল করে ঘেমে যেতে লাগল সে। ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছে সে।

অজয় ততক্ষণে কলিং বেল বাজিয়ে দিয়েছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে বিজয় বেরিয়ে এল। হুবহু অজয়ের মতোই দেখতে; তবে হাইট আরেকটু বেশি। বয়সে বড় হওয়ার জন্য চেহারাটা ভারিক্কি। এক্সট্রা তার যা আছে তা হল ছাঁটা গোঁফ। অজয়ের গোঁফ নেই।

দরজার ফ্রেমের ভেতর দাঁড়িয়ে বিজয় ভাইয়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিল। ঠোঁট কুঁচকে বলল, 'ওয়র্থলেশ।' তারপর জয়ার দিকে ফিরে বলল, 'বোথ অফ ইউ।'

আগেই বিজয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে জয়ার। সে কিছু বলল না; মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

অজয় মুখটা করুণ করে অল্প একটু হাসল। তারপর বলল, 'তুমি তা হলে সব শুনেছ?'

'তাই তো মনে হয়। কাম ইন।' অজয় আর জয়াকে সঙ্গে করে ড্রয়িংরুমে চলে এল বিজয়। বলল, 'সিট ডাউন—' তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল নিষ্ঠুর জেনারেলের মতো সে কোর্ট মার্শালের অর্ডার দেবে।

অজয় আর জয়া চুপচাপ দুটো সোফায় বসে পড়ল। বিজয়ও তাদের মুখোমুখি বসল। তারপর বলল, 'মা আমাকে সব বলেছে। কিন্তু তার আগেই আমি তোদের ওয়েডিং রিসেপশানের জন্যে হোটেল বুক করেছি, বন্ধুদের ইনভাইট করেছি। আমার প্রেসটিজটা গেল।'

অজয় মিনমিনে গলায় বলল, 'ইনভাইট করার আগে সব ব্যাপারটা জেনে নিলে না কেন? তুমি তো জানোই, আগেও দু বার ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে আমরা ফিরে এসেছি।'

বিজয় গলার স্বর অস্বাভাবিক ভারি করে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'থার্ড টাইমেও যে দু'জনে মিলে একটা বিয়ে করে উঠতে পারবি না, এটা আমি ইমাজিন করতে পারি নি।' একটু থেমে অজয় এবং জয়া দু'জনকেই বলল, 'বল, বল—কবে থেকে প্রেম করছিস তোরা? ইউ ইয়ং লেডি, স্পিক আউট।' বিরুদ্ধ পক্ষের উকিলদের মতো জেরা শুরু করে দিল বিজয়।

বিজয়ের ধরনটাই এইরকম। জয়া তার দিকে তাকাতে পারছিল না। শরীরের সব রক্ত লাফ দিয়ে তার মুখে উঠে এসেছিল। সে কিছু বলল না, ঘাড় ভেঙে মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে থাকল।

অজয় বলল, 'তিন চার বছরের মতো—'

'তিন চার বছরে বাইশটা গ্রেট ওয়ারের ডিশিসান নেওয়া যায়।'

বিজয়ের চেঁচামেচিতে ভেতর থেকে মোহিনী, বিজয়ের দুই ছেলে রাম আর অর্জুন এবং অজয় বিজয়ের মা লীলাবতী এ ঘরে চলে এলেন।

অজয়ের মা বড় ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওদের অত বকাবকি করছিস কেন?'

বিজয় গলার স্বর তিন পর্দা চড়িয়ে বলল, 'বকাবকি! ওদের ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে কোর্ট মার্শাল করা উচিত। আচ্ছা মা—'

লীলাবতী এর মধ্যে বিজয়ের পাশে বসে পড়েছিলেন। মোহিনী জয়ার গা ঘেঁষে তারই সোফায় খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে। রাম আর অর্জুন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সবার মুখের ওপর দিয়ে মুভি ক্যামেরার মতো তাদের চোখ ঘুরে ঘুরে যাচ্ছিল।

লীলাবতী জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বলছিস?'

বিজয় বলল, 'তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, তখন মাদ্রাজে আমার কাছে ছিলে, একদিন সন্ধেবেলা তোমাকে নিয়ে মোহিনীর কত্থক ড্যান্স দেখতে গিয়েছিলাম। ড্যান্স রাবিশ, তবে মেয়েটা দেখতে মন্দ নয়। নাচের পর তোমার পারমিসান নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করে একটা ফুলের 'বোকে' কিনে ওকে কনগ্র্যাচুলেট করলাম—'

লীলাবতী বললেন, 'হ্যাঁ, মনে আছে।'

বিজয় বলতে লাগল, 'সেই ড্যান্সের পর আমাদের বিয়ে করতে ক'দিন লেগেছিল?'

জয়া জানে, লীলাবতীর সঙ্গে অজয় বিজয়ের সম্পর্ক পুরোপুরি বন্ধুর মতো। লীলাবতী বললেন, 'ক'দিন আর, মাস দুয়েকের মতো।'

'আর এই গাধাটা আমার ভাই হয়ে তিন চার বছর ধরে ঝুলেই আছে। কোনো ব্যাপারে ওর প্রম্পটনেস নেই।'

'সবাই তো তোর মতো মিলিটারি না। যা মাথায় এল দু মিনিটের ভেতর করে ফেললি!' লীলাবতী হাসতে লাগলেন।

বিজয় সেন্টার টেবলে দুম করে একটা ঘুষি মেরে বলল, 'করতে হবে। কোনো কিছুই বেশি দিন ঝুলিয়ে রাখতে নেই। ওয়ারের সময় দশ মিনিট দেরি হয়ে গেলে একটা স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট হাতের বাইরে চলে যেতে পারে।'

লীলাবতী বললেন, 'এটা ওয়ার না, এটা হল বিয়ে।'

'বিয়ে আর ওয়ার একই ব্যাপার। একবার হাতছাড়া হলে খুবই মুশকিল।'

এদিকে জয়ার কানের কাছে মুখ এনে মোহিনী খুব নিচু গলায় ফিসফিসিয়ে বলছিল, 'চার বছর ধরে প্রেম করছ! বিয়ে না করে আছ কী করে?'

জয়া আড়ষ্ট গলায় বলল, 'না, মানে—'

'অ্যাই, একটা কথা বলবে?'

'কী?'

'অজয় তোমাকে চুমু খেয়েছে?'

জয়া চোখের কোণ দিয়ে মোহিনীকে দেখতে দেখতে বলল, 'ধুৎ—'

মোহিনী বলল, 'হাত বুলোয় নি?'

'কিসে হাত বুলোবে?'

'শরীরের সেই সব জায়গায় যেখানে হাত দিলে ইলেকট্রিক শক লাগে।'

আগেও যখন দু চারবার দেখা হয়েছে মোহিনী এসব কথা জিজ্ঞেস করেছে। দক্ষিণী এই নাচিয়ে মেয়েটার মুখ ভীষণ আলগা।

জয়ার কানের লতি ঝাঁ ঝাঁ করছিল। সে বলল, 'তুমি ভীষণ অসভ্য মোহিনীদি।'

জয়ার কানের ডগায় পিঁপড়ের মতো কুট করে একটা কামড় বসিয়ে মোহিনী গলার স্বরটা আরো নামিয়ে দিল। বাতাসের মতো শব্দ করে বলল, 'অজয় আর কিছু করে নি?'

মোহিনীর ইঙ্গিতটা জয়া বুঝতে পারছিল। এমনিতে সে খুবই স্মার্ট কিন্তু সেক্স নিয়ে কথাবার্তা বলতে তার ভাল লাগে না। বিশেষ করে সেটা যদি নিজের সম্পর্কে হয়। সে চুপ করে রইল।

মোহিনী আবার বলল, 'বিয়ের আগেই বাবা আমাদের কিন্তু সমস্ত কিছু হয়ে গিয়েছিল। দু'জনে দু'জনের সব জেনে শুনে বুঝে তবে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে গেছি।'

জয়ার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা বরফ নেমে গেল। সে বলল, 'যদি কোনো কারণে বিয়েটা না হত?'

'হতই। সেটা বুঝেই তো আমরা এগিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে কিছুই করতে পার নি। একেবারে আনটাচড, আনকিসড, আনস্মেলট হয়েই আছ। সেই ইণ্ডিয়ান মাইথোলজিতে মুনিঋষিদের আশ্রমে পবিত্র পবিত্র ভার্জিন গার্লরা ঘুরে বেড়াত, তুমি বাবা অবিকল তাই।' দারুণ কথা বলতে পারে মোহিনী। একটু থেমে পরক্ষণেই আবার সে শুরু করে দিল, 'এত বয়স হয়ে গেল। টগবগে একটা পুরুষ জড়িয়ে ধরে না শুলে ঘুমোও কী করে?'

জয়ার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। সে বলল, 'কী হচ্ছে মোহিনীদি!'

দক্ষিণী মেয়েটা চোখ কুঁচকে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে হাসতে লাগল, 'তিন বারের অ্যাটেম্পটে বিয়েটা তো করতে পারলে না তোমরা। ভাবছি যাবার আগে অজয়কে একটা টপ সিক্রেট শিখিয়ে দিয়ে যাব। তিন দিনের মধ্যে যদি তখন বিয়েটা না হয় কুচ করে নিজের কানদুটো কেটে ফেলব।'

জয়ার কৌতূহল হচ্ছিল। তবে ভয়টাই বেশি। সে বলল, 'কী শেখাবে অজয়কে?'

'ওটা পুরুষদের প্রেসক্রিপশন।'

'তুমি জানলে কী করে?'

'বিয়ের পর মেয়েরাও জানতে পারে। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে জানবার জন্য রেস্টলেস হয়ে উঠেছ। ঠিক আছে, জেনেই নাও। অজয়কে বলে যাব, একদিন তোমাকে কোনো একটা ঘরের ভেতর নিয়ে ছিটকিনি আটকে যা ইচ্ছা যেন করে। তারপরেই দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।'

জয়া চমকে উঠল, 'মোহিনীদি! প্লিজ, এ সব অজয়কে শেখাবে না।'

মোহিনী আবার কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ওধার থেকে বিজয় ডেকে উঠল, 'জয়া—' জয়া তার দিকে ফিরতেই জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের বিয়েটা হচ্ছে না কেন? শুনছি ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে সই করার সময় প্রত্যেক বার তুমি কেঁদে ফেলছ। মিস্ট্রিটা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি কি ব্যাপারটা আমাকে পরিষ্কার করে বলবে?'

জয়া চুপ করে রইল। সে জানত বিজয় এ সব প্রশ্ন তাকে করবে।

লীলাবতী বিজয়কে বললেন, 'উকিল ব্যারিস্টারের মতো মেয়েটাকে তোর জেরা করতে হবে না। নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধা আছে। যখন ওর মনে হবে তখন ঠিকই বলবে।'

জয়া জানে লীলাবতী তাকে খুবই স্নেহ করেন। এর আগে দু দু বার যখন বিয়ের কাগজপত্র সে সই দিতে পারে নি, তখনও লীলাবতীর সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। কেন বিয়েটা হল না, এ নিয়ে তিনি কখনও কোনো প্রশ্ন করেন নি বা ক্ষোভপ্রকাশ করেন নি। মানুষের মনে কখন কোথায় জট পাকিয়ে যায় কেউ বলতে পারে না। সময়ই নিজের হাতে সেই জট খুলে দেয়। তার জন্য ধৈর্য দরকার। অজয়কে তিনি তাড়াহুড়ো করতে বারণ করেছেন। জয়ার ব্যাপারে সহানুভূতি নিয়ে অপেক্ষা করতে বলেছেন।

বিজয় বলল, 'আরে বাবা, জেরা করব কেন? জয়া যদি ওর অসুবিধার কথা বলে আমরা সে ব্যাপারে ওকে সাহায্যও তো করতে পারি। তা ছাড়া বার বার বিয়েটা হয়ে হয়েও হচ্ছে না; আমাদের সবার ওপরেই একটা বাজে রি-অ্যাকশান হচ্ছে।'

'ঠিক আছে। জয়া বড় হয়েছে; লেখাপড়া জানা মেয়ে। এসব ও নিশ্চয়ই বোঝে; মনে মনে কষ্টও পাচ্ছে। এ নিয়ে ওকে আর কিছু বলার দরকার নেই।'

বিজয় বলল, 'তোমার কথাই থাক, কিন্তু আমার চামড়া এখন কেমন করে বাঁচাই? সন্ধেবেলা নটরাজ হোটেলে পার্টির কী হবে?'

অজয় বলল, 'পার্টিটা ক্যানসেল করে দাও।'

'নো, কিছুতেই না। ওয়েডিং রিসেপশানের ব্যবস্থা যখন করেই ফেলেছি তখন ওটা হয়েই যাক। ওটা তো করতেই হত। একটা স্টেপ এগিয়ে থাকি। বিয়েটা পরে হবে।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে ভয়ে ভয়ে জয়া জিজ্ঞেস করল, 'পার্টিতে কি আমাকে থাকতে হবে?'

বিজয় খানিকক্ষণ অবাক হয়ে রইল। তারপর বলল, 'তোমার জন্যেই পার্টি, আর তুমিই থাকবে না! রিয়ালি স্ট্রেঞ্জ!'

'কিন্তু—'

'কী?'

কালও বাবাকে বন্ধুর ম্যারেজ অ্যানিভার্সারির কথা বলে রাত করে ফিরেছে জয়া। আজ রাত করে ফিরলে কী বলবে বাবা? রোজ রোজ বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বলতে গেলে নিশ্চয়ই সে ধরা পড়ে যাবে। তা ছাড়া আজ আবার সাধনা মাসি রয়েছেন বাড়িতে। তাঁকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। জয়া ঢোক গিলে বলল, 'পার্টি শেষ হতে তো অনেক রাত হয়ে যাবে।'

'কত আর রাত হবে! সাড়ে ন'টা দশটার মধ্যে ফিনিশ করে ফেলব। একদিনের ছুটি নিয়ে এসেছি। কাল মর্নিং ফ্লাইট ধরে মাদ্রাজ ফিরতেই হবে। পার্টিতে বেশি রাত করলে সকালে উঠতে পারব না।'

বাবার মুখটা সামনের সব কিছু ঢেকে দিয়ে ফুটে উঠছিল। জয়া বলল, 'কিন্তু বাবাকে আমি কিছু বলে আসি নি।'

'বম্বেতে ন'টা দশটা আবার রাত নাকি! এর জন্যে আবার বাবাকে বলে আসতে হয়! ইউ আর সাফিসিয়েন্টলি গ্রোন আপ।'

'মা, আমি রাত করে বাইরে থাকি না তো। বাবা ভাববেন।'

'এক কাজ করো না ; বাড়িতে ফোন করে বলে দাও ফিরতে দেরি হবে। আচ্ছা তোমাকে করতে হবে না। নাম্বারটা দাও, আমিই তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি।'

জয়া আঁতকে ওঠার মতো বলল, 'না না, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আমিই বলে দিচ্ছি। কিন্তু—'

'আবার কী?'

'পার্টির ব্যাপারটা আমি জানতাম না। এমনি একটা শাড়ি পরে চলে এসেছি। এই পোশাকে ঠিক —'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল বিজয়, 'ওটা আবার একটা প্রবলেম! একদিনের জন্যে মোহিনী মাদ্রাজ থেকে বম্বে এসেছে; সঙ্গে করে বোধহয় একটা কটন মিলের সারা বছরের আউটপুটই নিয়ে এসেছে। ওর কাছ থেকে যা যা দরকার নিয়ে নিও।'

নাঃ, কোনো ফাঁক দিয়েই বেরিয়ে যাবার উপায় নেই। ঘরের কোণে টেলিফোনের স্ট্যাণ্ড। সেখানে গিয়ে ডায়াল করতে লাগল জয়া। একটু পর ওধার থেকে শিবনাথের গলা ভেসে এল। প্রথমটা নার্ভাস বোধ করল সে। তারপর বলল, 'একটা খুব মুশকিলে পড়ে গেছি বাবা—'

'কী?'

'কাল যে বন্ধুর ম্যারেজ অ্যানিভারসারিতে গিয়েছিলাম,' তারা আজ ধরেছে ইভনিং শোয়ে সিনেমা দেখে যাবার জন্যে। টিকিটও কেটে ফেলেছে। অ্যাভয়েড করতে পারছি না।'

'সিনেমা দেখেই আসিস। কখন ফিরবি?'

'দশটা সাড়ে দশটা হয়ে যাবে। সিনেমা দেখার পর ওরা খাওয়ার কথা বলছে।'

'অ্যাভয়েড করতে না পারলে খাবি।'

'তুমি আর সাধনা মাসি আমার জন্যে ওয়েট করো না। খেয়ে নিও।'

'সাধনা নেই; চান্দেলিতে চলে গেছে।'

জয়া অবাক হল, 'হঠাৎ চলে গেল! এ সপ্তাহটা থাকবে বলেছিল!'

শিবনাথ বললেন, 'তুই চলে যাবার পর অফিস থেকে ফোন এসেছিল। কী একটা গোলমাল হয়েছে, তাড়াতাড়ি চলে যেতে বলল সাধনাকে। এই উইকে ও আর আসছে না।'

সাধনার অফিসে জয়াদের ফ্ল্যাটের ফোন নাম্বার আছে। ইমার্জেন্সি হলে অফিস থেকে তাঁকে ওই নাম্বারে ধরা হয়। জয়া বলল, 'ও, আচ্ছা। তারা ফিরেছে?'

'হ্যাঁ।'

তারাকে বলবে, 'ঠিকমত খাবার টাবার যেন গরম করে দেয়। মনে করে ওষুধ খাবে।'

'ঠিক আছে।' বলে শিবনাথ থামলেন একটু, পরে বললেন, 'তুই কোত্থেকে ফোন করছিস?'

জয়া হকচকিয়ে গেল। এরকম প্রশ্নের জন্য খুব সম্ভব সে তৈরি ছিল না। জড়ানো গলায় বলল, 'এই, মানে অফিস থেকে—'

'কিছুক্ষণ আগে সাধনার কথা বলার জন্যে তোর অফিসে ফোন করেছিলাম। ওরা বললে, তুই

নাকি ছুটি নিয়ে বেরিয়ে গেছিস!'

গলার ভেতরটা শুকিয়ে আসছিল জয়ার। সে বলল, 'ছুটি নিই নি তো। এমনি একটু বেরিয়ে ছিলাম।'

'তা হলে কি আমি ছুটির কথাটা ভুল শুনলাম?'

জয়া উত্তর দিল না। তার বুকের ভেতরটা কাঁপতে লাগল। জয়ার ভয় হল, বাবা যদি কোনো কারণে আবার অফিসে ফোন করে বসেন। শ্বাসরুদ্ধের মতো সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ছুটির কথাটা বলেছিলাম। তাই হয়তো তোমাকে জানিয়েছে। আমি কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ছি। আজ আর অফিসে ফিরব না।'

'আচ্ছা, তোর বন্ধুটির নাম কী রে?'

'কার কথা বলছ?'

'ওই যে যার ম্যারেজ অ্যানিভারসারি গেল।'

শিবনাথ কি কিছু সন্দেহ করেছেন? জয়ার মুখে যে নামটা এল তাই বলে ফেলল, 'শিরিন—'

শিবনাথ বললেন, 'কাল কি শিরিনের কথাই বলেছিলি?'

কাল কার নাম বলেছিল, জয়া মনে করতে পারল না। তার নাকমুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। সে বলল, 'আর কোন নাম বলব!'

'তা-ই হবে হয়তো। আচ্ছা তাড়াতাড়ি আসতে চেষ্টা করিস।'

লাইনটা কেটে গেল।

এগার

অজয়রা কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় নটরাজ হোটেলে চলে এল। লীলাবতী অবশ্য আসেন নি।

মোহিনী তার হীরের সেট, মাইশোর সিল্ক আর দামি দামি কস্‌মেটিকস দিয়ে জয়াকে রানীর মতো সাজিয়ে দিয়েছিল এবং নিজেও প্রচুর সেজেছিল।

ওরা যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যে নিমন্ত্রিতেরা একে একে এসে গেল।

বাড়ি থেকে বেরুবার সময় লীলাবতী বিজয়কে বলেছিলেন, সে যেন পার্টিতে মদটা কম খায় আর এমন কিছু না করে বা বলে যাতে জয়া কষ্ট পায়। বিজয় প্রথমেই জয়ার সঙ্গে আর্মির বন্ধুদের আলাপ করিয়ে দিয়ে বলেছে, আমার ভাবী ভ্রাতৃবধূ। এরই অনারে এই পার্টি।

বিজয়ের এক বন্ধু কিছুটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তবে যে তখন বললে এটা ওয়েডিং রিসেপশান—'

'আরে বাবা, বিয়েটা তো হবেই। নেমন্তন্নটা না হয় অ্যাডভান্স খেলে।'

অন্য এক বন্ধু বলল, 'মজাটা কিন্তু পুরোপুরি হচ্ছে না, মেজর। পার্টি, রিসেপশান—এ সব বিয়ের পরই হয়।'

বিজয় বলল, 'বুঝেছি। ওদের বিয়ের পর আবার একটা পার্টি চাইছ। ও.কে ডান। তাড়াহুড়োয় এবার আমাদের আত্মীয় স্বজন, অজয়ের বন্ধু টন্ধু, কাউকেই বলা হয় নি। পরের পার্টিতে তাদের সঙ্গে তোমাদেরও ডাকব।'

সবাই খুশিতে হুল্লোড় বাধিয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

বিজয়ের আর্মির বন্ধুরা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে করে এনেছিল। আর্মিতে যেমন হয়—ইণ্ডিয়ার সব প্রভিন্স থেকে বেছে বেছে লোক নেওয়া হয়। ফলে তাদের স্ত্রীরা কেউ পাঞ্জাবি, গুজরাটি, কেউ কুর্গি, কেউ মারাঠি, কেউ বা বাঙালি ইত্যাদি। ভারতের সব রাজ্যের দারুণ সুন্দরী সব মহিলা প্রজাপতির ঝাঁকের মতো জয়াকে ঘিরে ধরেছিল। তাদের সবার হাতে একটা করে উপহারের প্যাকেট। প্যাকেটগুলো একের পর এক জয়াকে দিতে দিতে তারা মজার কথা বলছিল, হাসছিল এবং নানারকম অশ্লীল 'জোক' করে যাচ্ছিল।

একটা ব্যাপার জয়া লক্ষ করেছে, আর্মির লোকের বউরা দারুণ রগরগে নোংরা গল্প করতে ওস্তাদ; তাদের জিভে কিছুই আটকায় না ; ওদের পর্নোগ্রাফির স্টকও অফুরন্ত। অজয় আর তাকে নিয়ে ওরা

যা সব বলছে শুনতে শুনতে মুখ লাল হয়ে উঠছিল জয়ার।

এর মধ্যে ঝকঝকে উর্দি-পরা হোটেল বয়রা ট্রে'তে হুইস্কি আর সফট ড্রিংক সাজিয়ে গোটা ব্যাঙ্কুয়েট হলে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আর্মি অফিসারদের সফট ড্রিংক ছোঁবার প্রশ্নই ওঠে না। জয়া দেখল, তাদের স্ত্রীরা দু একজন বাদে ট্রে থেকে হুইস্কিই তুলে নিচ্ছে।

হই-হুল্লোড়, চিৎকার, জোক, হঠাৎ হঠাৎ মেয়েদের গলায় ফিনকি দিয়ে ওঠা হাসি, ইত্যাদির মধ্যে ড্রিংক সেসান এবং ডিনার শেষ হল।

ঘড়িতে এখন ন'টা পঁচিশ। কোনো পার্টিই এত আগে আগে শেষ হয় না। বিজয়ই তাড়া দিয়ে শেষ করিয়েছে। কাল সকালে তাকে মাদ্রাজের প্লেন ধরতে হবে।

একে একে গেস্টরা জয়াকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে গেল। ফাঁকা ব্যাঙ্কুয়েট হলে এখন অজয়, বিজয়, জয়া আর মোহিনী। এক ধারে উপহারের প্যাকেটগুলো ডাঁই হয়ে পড়ে আছে।

রাত যত বাড়ছিল জয়া ততই অস্থির হয়ে উঠছিল। আর দেরি করা ঠিক হবে না। সে বলল, 'আমাকে এবার ফিরতে হবে। বাবাকে বলেছি দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে বাড়ি যাব। এখনও যদি বেরুই এগারটার আগে ফিরতে পারব না। বাবা খুব ভাববেন।'

অজয় বলল, 'ভয় নেই ; সাড়ে দশটার ভেতরই বাবার মেয়ে বাবার কাছে পৌঁছে যাবে। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে, তোমাকে জুহুতে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

অজয়ের কথার মধ্যে রগড়ের সঙ্গে সঙ্গে একটু খোঁচা ছিল। জয়া জানে, সেটা তার পাওনা। কিন্তু অজয় তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চাইছে; এতে খুবই ভয় পেয়ে গেল সে। বলল, 'তুমি আবার কষ্ট করে এই রাত্তিরে অতদূর যাবে কেন? আমি নিজেই চলে যেতে পারব।'

'তা পারবে। তবু আমি সঙ্গে যাব; দরকার আছে।'

মোহিনী পাশ থেকে ঠোঁট কামড়ে বলল, 'দেখো, যেতে যেতে জয়াকে একেবারে খেয়ে ফেল না। বাড়ি ফিরলে বাবা যেন চিনতে পারে সেটুকু অন্তত রেখ।'

অজয় হাসতে লাগল। আর জয়ার ঘাড় ভেঙে মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ল যেন। মুখ তুলে সে কারো দিকে তাকাতে পারছিল না।

অজয় অফিস থেকে দুটো গাড়ি নিয়ে এসেছিল। বিজয় বয়দের ডেকে উপহারের প্যাকেটগুলো গাড়িতে পাঠিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ পর বিল মিটিয়ে, বয়দের টিপস দিয়ে সবাই নিচে নেমে এল।

হোটেলের পার্কিং জোনে অজয়দের গাড়ি দুটো দাঁড়িয়ে ছিল। এত উপহার জয়া পেয়েছে যে একটা গাড়িতে ধরে নি। দুটো গাড়িরই ক্যারিয়ার বোঝাই হয়ে যাবার পর ফ্রন্ট এবং ব্যাক সিটের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রাখতে হয়েছে।

ঠিক হল, একটা গাড়িতে করে বিজয় আর মোহিনী কোলাবায় ফিরে যাবে। আরেকটা গাড়ি নিয়ে অজয় জয়াকে জুহুতে পৌঁছে দেবে।

বিজয় এবং মোহিনী সস্নেহে এবং আদরের ভঙ্গিতে জয়াকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমরা তা হলে যাই। এবার আর আমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। মাদ্রাজ যাবার দু সপ্তাহের মধ্যে যেন ট্রাঙ্ক কল বা টেলিগ্রাম পাই যে তোমাদের রিয়েল বিয়েটা হয়ে গেছে। আর ব্যাপারটাকে ড্র্যাগ করো না। কথাটা মনে রেখ।'

জয়া ওদের প্রণাম করে বলল, 'রাখব।'

বিজয়রা গাড়িতে উঠতে গিয়ে হঠাৎ বলল, 'আরে, এই গাড়িতেও প্রেজেন্টেশানের অনেক প্যাকেট রয়েছে। এগুলো তো জয়ার।' অন্য গাড়িটার দিকে দ্রুত এক পলক তাকিয়ে বলল, 'ওটাও তো গো-ডাউনের মতো ভর্তি হয়ে আছে। কী করা যায় বল তো?' এক মুহূর্ত ভেবে বলল, 'ঠিক আছে, আমরাও না হয় জুহুটা ঘুরে আসি। প্রেজেন্টেশানগুলো জয়াদের ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেওয়া যাবে।'

জয়া চমকে উঠল, 'না না, ওগুলো আমি নিতে পারব না।'

'ওসব তো তোমার জিনিস।'

জয়া জোরে মাথা নাড়তে লাগল। কিছুতেই সে নেবে না।

মোহিনী কিছু একটা ভেবে নিয়েছিল। পাশ থেকে সে বলল, 'জয়ার অসুবিধাটা জেনুইন। ওর

বাবা কিছু জানেন না। হঠাৎ প্রেজেন্টেশানের একশটা বাক্স নিয়ে হাজির হলে পজিশনটা ভীষণ অকোয়ার্ড হয়ে পড়বে।'

বিজয় ব্যাপারটা বুঝল। বলল, 'দ্যাটস রাইট। ঠিক আছে, প্রেজেন্টশানগুলো আপাতত অজয়ের ফ্ল্যাটেই নিয়ে যাই। তারপর তো জয়া একদিন না একদিন ওখানে পার্মানেন্টলি চলে আসছে।'

বিজয়রা একটা গাড়িতে উঠে পড়ল। অন্য গাড়িটার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে আচমকা জয়ার একটা কথা মনে পড়ে গেল। অজয়দের ফ্ল্যাটে নিজের অফিসের পোশাক ছেড়ে মোহিনীর শাড়ি-জামা জড়োয়া-সেট পরে পার্টিতে এসেছিল। মোহিনীর শাড়ি-টাড়ি তাকে ফেরত দেওয়া উচিত। সে কথা বলতেই মোহিনী ভয়ানক আপত্তি জানাল, বিয়েটা না হোক, তবু আজ সোসাল একটা এ্যাকসেপটান্স জয়া পেয়েছে। তার জীবনে আজকের দিনটা ডে অফ অল ডে'জ। আজ এই রানীর সাজ ছাড়িয়ে কিছুতেই মোহিনী তাকে সাধারণ একটা প্রিন্টেড শাড়ি পরিয়ে বাড়িতে পাঠাতে পারবে না।

মাঝরাতে রানীর সাজে বাড়ি ফিরলে বাবা কী বলবেন বা ভাবরেন, সেটা চিন্তা করতে গিয়ে নার্ভাস হয়ে পড়ল জয়া। মোহিনীর যেরকম আপত্তি তাতে এ ব্যাপারে আর কিছু বলে অবশ্য লাভ নেই। তবে দামি গয়নাগুলো দেখিয়ে জয়া বলল, 'এগুলো নিয়ে যাও মোহিনীদি—'

জয়া হার খুলতে যাচ্ছিল, মোহিনী এবার চেঁচিয়ে উঠল, 'নো-নো, কিছুতেই না। ওগুলো আমি তোমাকে অ্যাডভান্স প্রেজেন্টেশান দিলাম। অ্যাট লিস্ট প্রেজেন্টেশানের জন্যেও যদি তাড়াতাড়ি বিয়েটা করে ফেল।'

বিজয়রা চলে গেল।

জয়া আর অজয় অন্য গাড়িটায় উঠতেই ড্রাইভার স্টার্ট দিল। একটু পর ওরা মেরিন ড্রাইভে এসে পড়ল। তেলের মতো মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়িটা আরো কিছুক্ষণ পর মেরিন লাইনসের ফ্লাই-ওভারের তলা দিয়ে মালাবার হিলস বাঁয়ে রেখে, কামবালা হিল পেছনে ফেলে, পেডার রোডে চলে এল। হাই-রাইজ বিল্ডিংগুলোর মাথায় লাল নীল নিওন সাইনে নানা কোম্পানির বিরাট বিরাট বিজ্ঞাপন জ্বলছে, নিভছে। ফুটপাথের ধার ঘেঁষে কর্পোরেশনের উজ্জ্বল মার্কারি আলোগুলো সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে।

অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। একসময় হঠাৎ অজয় বলল, 'আমি কিন্তু একটা এক্সপেক্টেশন নিয়ে তোমার সঙ্গে জুহু যাচ্ছি।'

জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল জয়া। আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। আবছা গলায় বলল, 'কী?'

'আজ আমাকে বলবে, কেন বিয়েটা করতে পারছ না?'

কাল বাড়ি ফেরার পর থেকে আজ অফিসে আসা পর্যন্ত জয়া ঠিকই করে রেখেছিল, অজয়কে এ ব্যাপারে সব বলবে। কিন্তু আসার কিছুক্ষণ বাদেই এলেন কর্নাল সিং আর চন্দ্রা। তারপর এমন সব উলটোপালটা নাটুকে কাণ্ড ঘটে গেলে যাতে কথাটা আর মনে ছিল না।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না জয়া। কয়েক পলক চুপ করে থেকে বলল, 'সব বলব। তোমাকে না বললে আমি কোনো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না।'

অজয় জয়ার দিকে এগিয়ে এল এবং প্রায় দম বন্ধ করেই যেন অপেক্ষা করতে লাগল।

জয়া তার বাবার পারিবারিক ইতিহাস থেকে শুরু করে বিজলীর কাছে থাকা, গান শেখা, নাম করা, বোম্বাইতে আসা, চন্দ্রার সঙ্গে বিয়ে, নিজের জন্ম, সাধনার কথা, চন্দ্রার সঙ্গে ডাইভোর্স, কর্নাল সিং-এর সঙ্গে চন্দ্রার দ্বিতীয় বিয়ে—সব বলে গেল। খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দিল না। সে আরো জানাল, উইক-এণ্ডে সাধনা দু দিনের জন্য আসে ঠিকই, নইলে গত চব্বিশ পঁচিশ বছর বাবা আর সে একসঙ্গে একই সুখ-দুঃখের ভেতর কাটিয়ে দিয়েছে। সাধনাকে বাদ দিলে পরস্পরের সঙ্গী বলতে, বন্ধু বলতে তারা নিজেরা ছাড়া আর কেউ নেই। এত বছর একসঙ্গে থেকে থেকে তারা কখন যে অবিচ্ছেদ্য হয়ে গিয়েছিল, আগে টের পাওয়া যায় নি। বোঝা গেল, বিয়ে করতে এসে। পঁচিশ বছরের একটানা কমপেনিয়নশিপ যতবার ছিঁড়তে গেছে ততবারই নানা ঘটনা এবং দুঃখের টুকরো টুকরো স্মৃতির কোলাজ দিয়ে তৈরি বাবার বিরাট একটা পোরট্রেট সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেটাকে ঠেলে সরিয়ে অজয়ের

কাছে যাওয়ার মতো শক্তি তার নেই।

সব বলার পর দু হাতে মুখ ঢেকে আস্তে আস্তে, খুব নিঃশব্দে ফোঁপাতে লাগল জয়া। অজয় গভীর যত্নে এবং সহানুভূতিতে তার কাঁধে একখানা হাত রেখে গাঢ় গলায় বলল, 'কেঁদো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

জয়া বালিকার মতো কাঁদতেই লাগল। অজয় বাঁধা দিল না; জয়াকে নিজের দিকে আরেকটু নিবিড় করে টেনে আনল শুধু।

অনেকক্ষণ পর কান্নাটা থেমে এলে ভাঙা, ভারি গলায় জয়া বলল, 'কী করে সব ঠিক হয়ে যাবে বুঝতে পারছি না। আমি যে বড় দুর্বল।'

'এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

জয়া চুপ করে রইল।

বার

এক সময় অজয়ের গাড়িটা জয়াদের হাই-রাইজ বিল্ডিংটার সামনের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে গেল। গাড়িটাকে কমপাউণ্ডের ভেতর নিয়ে যাওয়া যেত। ইচ্ছা করেই অজয় নিল না।

আগে দু একবার অজয় জয়াকে এই রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেছে কিন্তু কখনও তাদের ফ্ল্যাটে যায় নি। অবশ্য মজা করবার জন্য শিবনাথের সঙ্গে দেখা করার কথা বলত সে। ভয়ে জয়ার গায়ে কাঁটা দিত; কিছুতেই সে অজয়কে বাবার কাছে নিয়ে যেত না।

অজয় বাঁ দিকের জানালার ধার ঘেঁষে বসে ছিল। দরজা খুলে রাস্তায় নেমে জয়ার বেরুবার জায়গা করে দিল। জয়া নামলে দু হাতের তালু উলটে দিয়ে অজয় বলল, 'বিয়ের পর সবাই বউ নিয়ে বাড়ি ফেরে। আমি প্রেজেন্টেশানের বাক্স নিয়ে যাচ্ছি।'

জয়ার মুখটা হঠাৎ ভারি করুণ হয়ে গেল।

অজয় তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে বলল, 'প্লিজ, ওটা একটা জোক। কিছু মনে করো না।'

জয়া উত্তর দিল না।

অজয় বলল, 'যাও, বাড়ি চলে যাও, কাল দেখা হবে।'

অজয় চলে গেল। কিছুক্ষণ পর লিফটে করে ইলেভেনথ ফ্লোরে এসে দরজার বেল টিপতেই শিবনাথ দরজা খুলে দিলেন। তারপর জয়ার দামি পোশাক এবং জড়োয়া গয়নার দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল যেন।

জয়ার বুকের ভেতরটা ঢেউয়ের মধ্যে দুলছিল।

শিবনাথ বললেন, 'এ সব শাড়ি-গয়না তুই কোথায় পেলি?' তাঁর গলা অনেক দূর থেকে হাওয়ার ভেতর দিয়ে ভাসতে ভাসতে এল যেন।

জয়া আর দাঁড়াতে পারছিল না। কোনোরকমে ঝাপসা গলায় বলল, 'আমার যে বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম সে-ই দিয়েছে। ও খুব সেজে বেরিয়েছিল; আমাকে কিছুতেই অফিসের শাড়ি জামা পরে যেতে দিল না। অনেক রাত হয়ে গেছে বলে আজ এগুলো ফেরত দিতে পারিনি; কাল দিয়ে আসব।' বলতে বলতে তার মনে পড়ে গেল আজও বাবার কাছে মিথ্যে বলতে হচ্ছে। ক্রমশ একটা ফাঁসের ভেতর সে যেন আটকে যাচ্ছে। জয়ার আরো একটা কথা মনে পড়ল, এইসব দামি দামি গয়না আর শাড়ি বিয়ের আগেই তাকে উপহার দিয়েছে মোহিনী। কিন্তু আপাতত এগুলো বাড়িতে রাখা যাবে না; কাল অজয়কে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের ফ্ল্যাটে রেখে আসবে।

শিবনাথ বললেন, 'তোর এই বন্ধু আম্ভেরিতে থাকে না?'

জয়া কাল বন্ধুর ম্যারেজ অ্যানিভারসারিতে নেমন্তন্নের কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছিল ওরা আম্ভেরিতে থাকে। বাবা আম্ভেরির কথা মনে করে রাখবেন, সে ভাবতে পারে নি। আস্তে করে সে বলল, 'হ্যাঁ।'

'কোথায় সিনেমা দেখলি তোরা?'

'এরোস হলে।'

কথাবার্তার মধ্যে কিচেন থেকে বাসন কোসন নাড়াচাড়ার শব্দ আসছিল। বোঝা যাচ্ছিল, ঘাটকোপারে ছুটি কাটিয়ে তারা ফিরে এসেছে। শিবনাথ বললেন, 'সে তো প্রপার বম্বেতে।'

জয়া বলল, 'হ্যাঁ।'

'তোর বন্ধু নিশ্চয়ই তোর সাজার জন্যে শাড়ি-গয়না নিয়ে তোর অফিসে যায় নি?'

বাবা ঠিক কী বলতে চান, জয়া বুঝতে পারছিল না। সে বিমূঢ়ের মতো মাথা নাড়ল, 'না।'

'তা হলে?'

'তা হলে কী?'

'প্রপার বম্বে থেকে আন্ধেরিতে এসে জামাকাপড় বদলে সিনেমা দেখার জন্যে আবার প্রপার বম্বেতে গেলি!'

বাবার কথার মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিল। সেটা বুঝতে পারছিল জয়া। তার গলার ভেতরটা শুকিয়ে বালির মতো খরখরে হয়ে যাচ্ছিল। কাঁপা গলায় সে জানালো, বন্ধুর স্বামীর গাড়ি আছে। গাড়িতে করে বম্বে থেকে আন্ধেরি হয়ে আবার বম্বেতে ফিরতে কতক্ষণ আর লাগে।

শিবনাথ অন্যমনস্কর মতো বললেন, 'তা অবশ্য ঠিক।' একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'দু দিন ধরে তুই খুব সাজছিস।'

জয়া উত্তর দিল না। মুখটা নিচের দিকে আরেকটু নুয়ে পড়ল।

শিবনাথ এবার বললেন, 'খেয়ে এসেছিস তো?'

'হ্যাঁ। তুমি খেয়ে নিয়েছ?'

'নিয়েছি।'

'ঠিক তো?'

'হ্যাঁ রে—'

জয়া আর দাঁড়াল না। আসলে শিবনাথের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না সে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, বাবার কাছে সব ধরা পড়ে যাচ্ছে। জয়া বলল, 'ভীষণ ঘুম পাচ্ছে—' বলেই বাবার পাশ দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

অন্যদিন শিবনাথকে নিজের হাতে ওষুধ খাইয়ে তাঁকে বিছানায় পাঠিয়ে, গায়ে পাতলা চাদর টেনে দিয়ে, বেশি পাওয়ারের লাইট নিভিয়ে জিরো পাওয়ারের আলোটি জ্বেলে তবে শুতে যায় জয়া। আজ মোহিনীর দেওয়া শাড়ি-গয়না বদলে একটা হাউসকোট পরে সারা গা এবং মুখ মাথা চাদরে ঢেকে দু মিনিটের মধ্যে শুয়ে পড়ল।

আরো কিছুক্ষণ বাদে তারা এল। রাত্তিরে এ ঘরের মেঝেতে ঘুমোয় সে। তার শতরঞ্চি-জড়ানো বিছানাটা থাকে সাধনার খাটের তলায়। আর থাকে তার একটা ক্যানভাসের বড় সুটকেস।

বিছানাটি পেতে সুটকেস থেকে স্নো-পাউডার আয়না-চিরুনি বার করল তারা। সারা দিনে সময় পায় না। রাত্তিরে সব কাজকর্ম চুকিয়ে বিছানায় বসে মাথায় সুন্দর গন্ধওলা তেলটি মেখে পরিপাটি করে চুল আঁচড়ায় সে; সারা গায়ে খুব যত্ন করে সেন্টপাউডার ঢালে। তারপর নানারকম মশলা দিয়ে একটি পান সেজে মুখে পুরে ঘুমোয়।

আজও চুলবাঁধা, পাউডার মাখা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো নিখুঁতভাবে শেষ করে আয়না-চিরুনি-সেন্টের শিশি-টিশি সুটকেসে পুরে আলো নিভিয়ে মশলাদার পানটি চিবুতে চিবুতে শুয়ে পড়ল তারা। ঘরে একটুও আলো থাকলে জয়ার ঘুমোতে অসুবিধা হয়। তাই জিরো পাওয়ারের বাল্বও এখানে জ্বালানো হয় না।

চাদর ঢাকা দিয়ে থাকলেও জয়া সব টের পাচ্ছিল। হঠাৎ এ পাশে ফিরে তারা ডাকল, 'দিদি—'

জয়া জানত, তারা তার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা-টথা না বলে ঘুমোবে না। ঘাটকোপারে ভাইয়ের বাড়ি গিয়ে কী করেছে, কী খেয়েছে, কোথায় বেড়িয়েছে, কে কী বলেছে, যাবতীয় খবর না দেওয়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই। কথাগুলো এখন তার পেটের ভেতর সোডার মতো ফেনাচ্ছে। শুধু তাই না, এই দু দিন জয়ারা কে কী করেছে, এই বিরাট অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের কোন ফ্ল্যাটে কী ঘটেছে, তা-ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইবে। একবার বকর বকর শুরু করলে তারা থামতে জানে না; লং-প্লেয়িং

রেকর্ডের মতো বাজতেই থাকে, বাজতেই থাকে। তার ওপর যদি সে ঘুণাক্ষরেও টের পেয়ে থাকে জয়া দুদিন রাত করে দারুণ সেজেটেজে ফিরেছে, তা হলে আজ আর ঘুমোবার কোনো আশাই নেই। সারারাত কতরকম কৈফিয়ত যে দিতে হবে! কাজেই জয়া উত্তর দিল না।

তারা আরো বারকয়েক ডাকাডাকি করল। জয়ার দিক থেকে কোনো রকম সাড়া নেই। জোরে জোরে শ্বাস ফেলে সে বোঝাতে চাইল, ঘুমিয়ে পড়েছে।

তারা কিছুটা বিরক্ত গলায় বলল, 'আজ তোমার কী হয়েছে গো! বাবার ঘরে গেলে না, আমার সঙ্গে দেখা হল না। ঘরে এসে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লে! এমনটা তো তুমি কখনও করো না।'

জয়ার নিশ্বাসের শব্দ আরো ভারি, আরো গাঢ় হতে লাগল।

অনেক রাত্তিরে গোটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটা যখন গভীর ঘুমে ডুবে আছে, দুধের মতো ধবধবে জ্যোৎস্নায় ভঙ্গুর বাদামি বালির বেলাভূমি অলৌকিক হয়ে উঠেছে, বাতাস কিংবা সমুদ্রের শব্দ ছাড়া যখন আর কোথাও কোনো আওয়াজ নেই, সেই সময় পাশের ঘর থেকে কোমল নিখাদে ভায়োলিনের, সেই বিষণ্ণ সুরটা ভেসে এল।

প্রথমে আবছাভাবে কানে এসেছিল। তার পরেই ঝট করে ঘুমটা ভেঙে গেল জয়ার। সঙ্গে সঙ্গে সে টের পেল বুকের গভীর থেকে অদৃশ্য এক যন্ত্রণা ছুঁচের মুখের মতো সমস্ত অনুভূতিকে বিঁধে চলেছে।

আস্তে আস্তে উঠে বসল জয়া। চোখে পড়ল, নিচে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে তারা।

পাশের ঘরে সেই সুরটা ক্রমশ কোমল নিখাদ থেকে সমস্ত চরাচরে অপার্থিব একটা কষ্ট ছড়াতে ছড়াতে ক্রমশ চড়ায় উঠে আসছিল।

জয়া আর বসে থাকতে পারছিল না। এলোমেলো পা ফেলে তারার বিছানার ধার দিয়ে পাশের ঘরে চলে এল জয়া।

শিবনাথ জ্যোৎস্না-ধোয়া বীচের দিকে ফিরে বুকের ভেতর ভায়োলিন আটকে ছড় টেনে যাচ্ছিলেন। স্পষ্ট তাঁকে দেখা যাচ্ছিল না; একটা সিলুয়েট ছবির মতো মনে হচ্ছিল।

জয়া নিশির ডাকের মতো কোনো এক অলৌকিক টানে পায়ে পায়ে শিবনাথের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর নিজের অজান্তেই কখন যেন ডেকে উঠল, 'বাবা—'

শিবনাথ বোধ হয় জানতেন জয়া আসবেই। বাজনা থামিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালেন।

জয়া আবার বলল, 'বাবা—'

শিবনাথ অনেকখানি ঝুঁকে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাঙা গলায় ফিসফিস করে বললেন, 'তুই কি আমাকে ছেড়ে চলে যাবি জয়া?'

আচমকা শিবনাথের বুকের ভেতর মুখ গুঁজে বালিকার মতো ফুঁপিয়ে উঠল জয়া, আর সমানে বলে যেতে লাগল, 'বাবা, বাবা, বাবা—'

শিবনাথ তার মাথায় কোমল আঙুল বুলিয়ে যেতে লাগলেন।

পরের দিন কাঁটায় কাঁটায় দশটায় অফিসে এল জয়া। তার ঠিক পঁচিশ মিনিট বাদে এল অজয়ের ফোন।

অজয় যে ফোন করবে এটা জানাই। রোজই করে। এমনিতেই খুব জরুরি কোনো ব্যাপার না থাকলে টিফিনের আগে অজয়ের ফোন আসে না। আজ হঠাৎ কী এমন হল, জয়া বুঝতে পারল না। কিছুটা উদ্বিগ্নের মতোই রিসিভারটা কানের কাছে ধরে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

ওধার থেকে হইচই বাধিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অজয় বলল, 'অল প্রবলেমস সলভড। কাল হোল নাইট একটুও না ঘুমিয়ে সলিউশনটা বার করে ফেলেছি। আই অ্যাম হ্যাপি প্রিন্স নাউ—' টেলিফোনের তারের ভেতর দিয়ে তার খুশি আর উচ্ছ্বাস ঢেউয়ের মতো তোড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল।

জয়া কিছুই বুঝতে পারছিল না। জিজ্ঞেস করল, 'কিসের প্রবলেম, কিসের সলিউশন?'

অজয় বলল, 'তোমার আর আমার বিয়ের।' একটু থেমে রগড়ের গলায় এবার বলল 'কোনো ইন্টারন্যাশনাল প্রবলেমও এত কমপ্লিকেটেড নয়। যাক গে, আর চিন্তা নেই।'

অজয় যা ছেলে, তাকে একেবারেই বিশ্বাস নেই। ঝোঁকের মাথায় সে কী ঠিক করে ফেলেছে,

কে জানে। কাল রাত্তিরে সব পারিবারিক কথা বলে ফেলা উচিত হয়েছে কিনা, জয়া এই মুহূর্তে বুঝতে পারল না। সে বেশ ভয়ে ভয়েই বলল, 'কী সলউশন ঠিক করেছ?'

অজয় বলল,'তার আগে আমার একটা কথার উত্তর দাও।'

'কী?'

'তুমি ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে এসে শেষ পর্যন্ত সইটা করতে পারছ না কেন? ট্রাবলটা কোথায়?'

জয়া নার্ভাস বোধ করল। দুর্বল গলায় বলল, 'মানে—'

অজয় বলল, 'আমি জানি বাধাটা কোথায়?'

'কোথায়?' জয়া শ্বাসরুদ্ধের মতো জিজ্ঞেস করল।

'বাধাটা হল তোমার বাবা। ঠিক বাবা না—' বলতে বলতে, থেমে গেল অজয়।

জয়া নিজের অজান্তেই বলে উঠল, 'তা হলে কী?'

'তোমার ভেতরকার একটা কমপ্লেক্স—'

'কিসের কমপ্লেক্স?'

'সেটা তুমি নিজেই জানো।'

জয়া তা জানে। বাবাকে ঘিরেই সেই কমপ্লেক্সটা জট পাকিয়ে আছে। সে চুপ করে রইল।

অজয় ওপার থেকে উচ্ছ্বাসের গলায় আবার বলে উঠল,'আমি যা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি, তোমার ওই কমপ্লেক্সটা আর থাকবে না। আগে যদি তোমাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা বলতে, কবে এই জট ছাড়িয়ে ফেলতাম। তিন বার ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে ডিফিটিস্টদের মতো ফিরে আসতাম না। যাক, বেটার লেট দ্যান নেভার।'

অজয়ের শেষ কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিল না জয়া। ভেতরে ভেতরে এক ধরনের উৎকণ্ঠা তাকে অস্থির করে তুলেছিল। সে বলল,'কী সলিউশন বার করেছ, তা বলছ না তো?'

'সেটা এখন না। ছুটির পর ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামের মেইন গেটের সামনে দাঁড়িও; তখন বলব। ততক্ষণ কিউরিসিটিটা থাক।' বলেই ঝট করে লাইন কেটে দিল অজয়।

জয়ার ভীষণ রাগ হচ্ছিল। ভাবল, এখনই অজয়কে ফোন করে জোরজার করে সলিউশন জেনে নেয়। কী ভেবে করল না।

ছুটির পর ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই অজয় একটা ট্যাক্সি করে এসে হাজির। জয়াকে তুলে নিয়ে সে চলে গেল চৌপাট্টির বীচে। এই জায়গাটা তার খুব পছন্দ। জয়াকে নিয়ে প্রায়ই এখানে চলে আসে সে।

জলের ধার ঘেঁষে পাশাপাশি বসে অজয় বলল,'মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আমার ওপর ভীষণ রেগে আছ। আর ঝুলিয়ে রাখব না। সলিউশনটা হল, আমাদের বিয়ের আগে আরেকটা বিয়ের ব্যবস্থা করা।'

জয়া চমকে উঠল,'কার বিয়ে?'

অজয় হাতজোড় করে কাঁচুমাচু মুখে বলল,' আমার ফাদার-ইন-ল'য়ের, মানে তোমার বাবার।'

'বাবার বিয়ে! কার সঙ্গে?'

'একেবারে ব্লাইন্ড তুমি। তোমার সাধনা মাসি এত বছর ধরে কেন প্রত্যেক উইক-এন্ডে চান্দেলি থেকে বম্বে আসছেন সেটা ভেবে দেখেছ?'

সাধনা মাসি আর বাবা পরস্পরকে যে ভালবাসেন, জয়া তা জানে। কিন্তু তাদের বিয়ের কথা কখনও ভাবে নি। অথচ এই বিয়েটাই সব চাইতে স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। অজয় না বললে কোনোদিন এটা চোখেও পড়ত না।

অজয় আবার বলল, 'তোমার বাবা যতক্ষণ না একজন কম্পেনিয়ন পাচ্ছেন তোমার পক্ষে আমাকে বিয়ে করা সম্ভব না। কী, কথাটা সত্যি তো?'

জয়া একটু চুপ করে থেকে বলল,'কিন্তু—'

'কী?'

'এই বয়সে ওঁদের বিয়ে!'

জয়া কী বলতে চায়, অজয় বুঝতে পারছিল। সে বলল, 'সেক্সের জন্যে বিয়েটা হবে না। বিয়েটা দরকার শেষ বয়সের একজন সঙ্গীর জন্যে। জাস্ট কম্পেনিয়ানশিপ।'

জয়ার মনে হল, অজয়ের কথাই ঠিক। বলল, 'ওরা কত বছর ধরে একজন আরেক জনকে চেনেন কিন্তু আমার ধারণা কেউ কাউকে কোনোদিন বিয়ের কথা বলেন নি। বললে আমি অন্তত জানতে পারতাম। বাবা আমার কাছে কোনো কথা লুকোন না। এখন, এতদিন পর বিয়েটা হবে কী করে?'

'ওটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার বেঞ্জামিন আঙ্কেলের সঙ্গে আজ সকালে পরামর্শ করে একটা রাস্তা বার করেছি। আই থিঙ্ক আই উড কাম আউট সাকসেসফুল।'

'কী ব্যবস্থা করেছ? শেষে আমাকে একটা বিচ্ছিরি অবস্থায় ফেলতে চাও?'

'কিচ্ছু ভয় নেই। কোনো কোনো সময় ড্র্যাস্টিক স্টেপ নিতে হয়। ইউ নীড নট ওরি। কিন্তু সবার আগে এখন যেটা দরকার তা হল তোমার সাধনা মাসির সঙ্গে দেখা করা। কিভাবে দেখাটা হতে পারে বল তো?'

'তাঁকে কী দরকার?'

'তিনিই তো আসল লোক; তাঁকে ধরতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

জয়ার কাছে সব ব্যাপারটা ধাঁধার মতো মনে হচ্ছিল। সে বলল,'সাধনা মাসি এই উইক-এন্ডে বম্বে আসছেন না। পরের সপ্তাহে দেখা করিয়ে দেব। কিন্তু আমার ভীষণ ভয় করছে।'

জয়ার নাকে আলতো করে একটা টুসকি মেরে অজয় বলল,'দুর বোকা মেয়ে, ভয়ের কী! কনেকে জপিয়ে জপিয়ে রাজি করিয়ে ফেলতে পারলে বরকে সে-ই কাৎ করে ফেলবে। তখন আমদের ঝামেলা 'নিল' হয়ে গেল।'

'কিন্তু—'

'আবার কী হল?'

'সাধনা মাসি কি রাজি হবেন?'

'খবর নিয়ে দেখো ম্যারেজ ফর্মে সই দেবার জন্যে পঁচিশ বছর ধরে উনি কলমে কালি পুরে বসে আছেন।'

'ইয়ার্কি হচ্ছে!'

'গুরুজনদের নিয়ে কেউ ইয়ার্কি করে? তবে এটা সত্যি। যাক গে এসব। সাধনা মাসি যখন এই উইকে আসছেন না, তুমি আর আমি চান্দেলি যাব।'

'এত তাড়া কিসের? নেক্সট উইকে তো আসছেই।'

'অনেক ওয়েট করেছি; আর না। রবিবার সকালে আমরা চান্দেলি যাচ্ছি। সন্ধেবেলা ফিরে আসব। অফিস থেকে একটা গাড়ি নিয়ে নেব। কোনো অসুবিধা হবে না। তুমি সাধনা মাসির কোয়ার্টারে আগে গিয়েছ তো?'

'গিয়েছি। কেন?'

'চেনা জায়গা হলে আর খোঁজাখুঁজি করতে হবে না।'

আরো কিছুক্ষণ আরব সাগরের জলে টকটকে লাল রং গুলে দিয়ে সূর্য ডুবে গেল। মিহি অন্ধকারে চারদিক যখন ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল সেই সময় জয়া বলল,'এবার আমায় ফিরতে হবে।'

'চল—'

অজয় আর জয়া উঠে পড়ল।

আরো খানিকক্ষণ বাদে চার্চগেট স্টেশনে জয়াকে ট্রেনে তুলে দিল অজয়। জয়া জানালার ধারে একটা সিট পেয়েছিল। বাইরে প্লাটফর্মে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অজয় বলল,'মেয়েকে বিয়ে করতে গিয়ে আগে যে তার বাবার বিয়ের অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে ভাবতে পারিনি।'

জয়া বলল,'আবার ইয়ার্কি!'

হাতজোড় করে রগড়ের ভঙ্গিতে অজয় বলল,'ক্ষমা—ক্ষমা—'

রাগ করতে গিয়ে জয়া হেসে ফেলল।

একটু পরে ট্রেন ছেড়ে দিল।

তের

আগে থেকেই ঠিক ছিল, রবিবার সকালে সান্তাক্রুজ স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে জয়া। অজয় এসে তাকে তুলে নিয়ে যাবে।

শনিবার রাত্তিরে শিবনাথকে চান্দেলি যাবার কথা বলেছে জয়া। শিবনাথ কিছুটা অবাক হলেও আপত্তি করেন নি। ভেবেছেন এ সপ্তাহে সাধনা আসবে না বলে হয়তো জয়ার ভাল লাগছে না; তাই চান্দেলি যেতে চাইছে।

কথামতো সকালে সান্তাক্রুজ স্টেশনে চলে এল জয়া। অজয় তাকে নিয়ে বম্বে-পুনা হাইওয়ে ধরে সাড়ে দশটার মধ্যে চান্দেলি পৌঁছে গেল।

বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের কমপাউন্ডের এক ধারে সাধনার সুন্দর একতলা কোয়ার্টার। সামনের দিকে বাগান; এই মরশুমে নানা রঙের ফুলে ফুলে বাগানটা ছয়লাপ।

সাধনা কোয়ার্টারেই ছিলেন। জয়া যে এভাবে আগে থেকে কিছু না জানিয়ে দুম করে চলে আসবে, সেটা তিনি ভাবতে পারেন নি। জয়াকে দেখে সাধনা দারুণ খুশি হলেন, আর অজয়কে দেখে অবাক। বললেন, 'এই ছেলেটি?'

জয়া লাজুক হেসে নতমুখে বলল, 'তুমি একটা কথা জানতে চেয়েছিলে। তাই ওকে নিয়ে এলাম। ওর নাম অজয়।'

সাধনা স্থির চোখে একবার অজয়কে দেখলেন, একবার জয়াকে। তারপর স্নিগ্ধ হেসে বললেন,'বুঝেছি।'

ততক্ষণে অজয় সাধনাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, 'আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে মাসিমা।'

'এখন না; দুপুরে খেতে বসে।'

জয়া আর অজয়ের আদর-যত্ন এবং খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সাধনা। কোয়ার্টারে দুটি কাজের লোক আছে তাঁর। একজন মধ্যবয়সী মারাঠি বাঈ, আরেকজন কম বয়সের ছোকরা —সেও মারাঠি। ছোকরা চাকরটিকে তখনই বাজারে পাঠালেন সাধনা আর বাঈকে সঙ্গে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন। জয়া তাঁর কাছে গিয়ে বসল। অজয় রান্নাঘরের সামনে একটা চেয়ারে বসে সাধনার অনুমতি নিয়ে সিগারেট খেতে খেতে নানারকম গল্প করে যেতে লাগল।

দু ঘণ্টা পর তিনজনে মুখোমুখি খেতে বসল ওরা। টেবলের এক পাশে বসেছেন সাধনা আর জয়া, উলটোদিকে অজয়। ডাইনিং স্পেসের একধারে বাঈ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারো পাতের ভাত, মাছ বা মাংস শেষ হয়ে গেলেই কিচেন থেকে পরবর্তী আইটেম নিয়ে আসবে।

সাধনা বললেন, 'এবার তোমাদের কথা বল—'

জয়ার সঙ্গে তিন চার বছর আগে তার আলাপ, পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা থেকে শুরু করে খুঁটিনাটি সব কিছু বলে গেল অজয়। এমনকি তিন তিন বার ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে কিভাবে মুখ চুন করে আসতে হয়েছে সেটাও বাদ দিল না।

সাধনা চোখের কোনো দিয়ে জয়াকে দেখতে দেখতে হালকা গলায় বললেন, 'কী চাপা মেয়ে রে তুই! এত দিন ধরে এই সব কাণ্ড করে যাচ্ছিস অথচ আমাকে কিছুই জানাস নি।'

মুখ নামিয়ে আঙুল দিয়ে প্লেটের উপর আঁকিবুকি কাটতে লাগল জয়া। কোনো উত্তর দিল না।

অজয় এবার বলল, 'আপনাকে সব কথা বললাম। এবার আপনি আমাদের বিয়ের ব্যাপারে হেল্প করুন; আমিও আপনাকে সাহায্য করব। ইউ ডু সামথিং ফর আস, আই ডু সামথিং ফর ইউ। এটা পারস্পারিক।'

'প্রথমে একটা কথার উত্তর দাও। আমি তোমাকে কিভাবে সাহায্য করব?'

'দেখুন, আমার ধারণা জয়া ওর বাবার সম্বন্ধে কোনোরকম একটা কমপ্লেক্সে ভুগছে।'

'কী কমপ্লেক্স?'

'বহুদিন ও ওর বাবার সঙ্গে আছে। এই থাকাটা একটা হ্যাবিটের মতো হয়ে গেছে। ওরা কেউ

যদি কাউকে ছেড়ে যায় দু'জনের পক্ষেই বিরাট ভ্যাকুয়াম হয়ে দাঁড়াবে। আমার সঙ্গে বিয়ে হলে জয়ার ভ্যাকুয়ামটা অনেকটা ফিল-আপ করে দিতে পারব। কিন্তু ওর বাবার পাশে যে শূন্যতাটা হবে সেটা ফিল-আপ করার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। আপনি যদি পারমিশান দেন একটা কথা বলব?'

সাধনা মুখ তুলে তাকালেন।

অজয় বলতে লাগল, 'আপনি জয়ার বাবার দায়িত্বটা পার্মানেন্টলি নিয়ে নিন। আপনি কাছে থাকলে জয়ার অ্যাবসেন্সটা উনি অনেকখানি সইতে পারবেন।'

সাধনা হকচকিয়ে গেলেন, 'কী বলছ তুমি!'

'মাসিমা, আপনি নিজের দিকে তাকিয়ে বলুন তো, যা আমি বললাম সেটা আপনি কোনোদিন চান নি?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সাধনা অন্যমনস্কর মতো আধফোটা গলায় বললেন, 'চেয়েছি। বার বার চেয়েছি।'

'সেইজন্যেই এত বছর ধরে প্রতিটি উইক-এন্ডে বম্বে চলে যাচ্ছেন।'

ঘোরের মধ্যে থেকে সাধনা বলে উঠলেন, 'যাচ্ছি। কিন্তু—'

'কী?'

'কেন কাউকে আমরা কিছু বলিনি? সংসারের দায়িত্ব শেষ করার পর যখন বলার ইচ্ছে হল, দেখলাম বয়স চলে গেছে। তারপর একটা অভ্যাসের মতো সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চান্দেলি থেকে বম্বে ছুটছি।'

গভীর সহানুভূতির গলায় অজয় বলল,'বয়স হয়ে গেছে কিন্তু মনটা তো আছে। সেটা থাকলেই হল। আপনি রাজি হয়ে যান; বাকি ব্যবস্থা আমি করব। অবশ্য শেষ সময়ে যদি দরকার হয় আপনাকে একটু জোর খাটাতে হবে।'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

অজয় জানাল, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার বেঞ্জামিন সাহেবের সঙ্গে এ বিষয়ে সে পরামর্শ করে ফেলেছে। ঠিক হয়েছে সাধনা আর শিবনাথের নামে অজয়রা বেঞ্জামিন সাহেবের কাছে একটা বিয়ের নোটিশ দেবে। সাধনা তাতে সই করবেন; আর শিবনাথের নামে নকল সই করবে অজয়। বিয়ের একটা ডেট স্থির করে সাধনা এবং শিবনাথ, দু'জনকেই জানিয়ে দেবেন বেঞ্জামিন সাহেব। তিনিই তিনজন বয়স্ক সাক্ষী যোগাড় করবেন। নির্দিষ্ট তারিখে সাধনা বেঞ্জামিন সাহেবের অফিসে যাবেন। আচমকা বিয়ের নোটিশ পেয়ে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবেন শিবনাথ কিন্তু কনের নামটা দেখে কৌতূহলের বশে শেষ পর্যন্ত বেঞ্জামিন সাহেবের কাছে না গিয়ে পারবেন না। সেখানে শিবনাথ যদি কোনো গোলমাল করেন, সাধনাকে একটু জোর খাটাতে হবে। পুরুষের ওপর কী করে জোর খাটাতে হয় সেটা নিশ্চয়ই সাধনাকে শিখিয়ে দেবার দরকার নেই। হিউম্যান সাইকোলজি অজয় যেটুকু জানে তাতে শিবনাথ কোনোরকম আপত্তি করবেন না বলেই তার ধারণা।

সব শুনে সাধনা লাজুক হাসলেন। আস্তে করে বললেন,'নটি বয়।'

বোঝা গেল, এ বিয়েতে তাঁর বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। অজয় বলল,'এবার আমাদের কথা বলি। আপনাদের ব্যাপারটা হয়ে গেলে জয়ার বাবার কাছে আমাদের ব্রিফ নিয়ে আপনাকেই দাঁড়াতে হবে।'

সাধনা হাসলেন।

চৌদ্দ

কয়েক দিন পর অজয়ের ছক অনুযায়ী সাধনা আর শিবনাথের বিয়েটা হয়ে গেল। শিবনাথ বেঞ্জামিন সাহেবের অফিসে গিয়ে কোনো রকম আপত্তি করেন নি; তবে খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তোমার যখন এই ইচ্ছা ছিল, আগে বল নি কেন?'

সাধনা অজয়ের পরিকল্পনা গোপন রেখেই বলেছিলেন,'এ সব কথা পুরুষদের আগে বলা নিয়ম। কিন্তু তুমি নিয়মের বাইরের মানুষ। তাই এতগুলো বছর ওভাবে কেটে গেল।'

'শেষ পর্যন্ত আর না পেরে আমার সই নকল করে নোটিশ দিলে বুঝি?'

'কী করব!'

বিয়ের পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে জুহুতে চলে এলেন সাধনা। আরো তিন চার বছর তিনি কাজ করতে পারতেন। সেই যৌবনের গোড়া থেকে সংসার বাঁচাবার জন্য চাকরিই করে গেছেন। জীবনের লম্বা দৌড় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। খুবই ক্লান্ত তিনি; এখন তাঁর প্রয়োজন অগাধ বিশ্রাম। তাছাড়া এখন নিজস্ব সংসার হয়েছে। এটাও তো একটা হোল-টাইম ডিউটি।

চাকরি ছাড়ার পর অফিস থেকে গ্রাচুইটি আর প্রভিডেন্ট ফান্ড মিলিয়ে লাখ চারেক টাকা পেয়েছেন। সেটা ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করা হয়েছে। সেখান থেকে যে ইন্টারেস্ট পাওয়া যাবে আর মিউজিক হ্যান্ড হিসেবে শিবনাথের যা আয়, সব মিলিয়ে দু'জনের পক্ষে যথেষ্ট।

পনের

শিবনাথ এবং সাধনার বিয়ের এক মাস পর জয়া আর অজয়ের বিয়ে হয়ে গেল। বেঞ্জামিন সাহেবই ছিলেন এ বিয়ের পুরুত। স্টেট গর্ভমেন্টের এমপ্লয়ীদের হোস্টেলে গিয়ে অজয় মধু, নবীন, অমল আর রমেশকে সাক্ষী হিসেবে ডেকে এনেছিল।

সই-সাবুদ হয়ে যাবার পর বেঞ্জামিন সাহেব আর্শীবাদ করলেন, 'গড ব্লেস ইউ। তোমরা সুখী হও।' একটু থেমে মজা করে বললেন, 'অ্যাট লাস্ট ইউ হ্যাভ রিচড জার্নিস এন্ড।'

বিয়ের পরের দিন জুহুর একটা হোটেলে একটা পার্টির ব্যবস্থা করলেন শিবনাথ। জয়া তার অফিসের কলিগদের নেমন্তন্ন করেছিল। শিবনাথ নেমন্তন্ন করেছিলেন অজয়ের আত্মীয়স্বজন এবং নিজের প্রফেসানের বন্ধুবান্ধবদের। এছাড়া বিয়ের উইটনেস ওই চারজন —মধু, অমল টমলদের ডাকা হয়েছিল।

উজ্জ্বল আলোকমালায় সাজানো বাঙ্কোয়েট হলে ছোটাছুটি করে সাধনা অতিথিদের আপ্যায়ন করছিলেন। সবার খাওয়া দাওয়ার দিকে নজর রাখছিলেন।

চারদিকে সুসজ্জিত পুরুষ এবং মহিলার ভিড়। টুকরো টুকরো হাসি, জোক, ঠাট্টা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ভিড়ের মাঝখানে থেকেও বার বার জয়ার চোখ গিয়ে পড়ছিল শিবনাথের ওপর। একধারে অপরিচিতের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে পলকহীন জয়ার দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। গাঢ় গভীরে এক বিষাদ তাঁকে ঘিরে ছিল।

এই পার্টির পর জয়া অজয়ের সঙ্গে চলে যাবে। বাবাকে দেখতে দেখতে বার বার তার মনে হতে লাগল, যে শূন্যতা বাবার কাছে সে রেখে যাচ্ছে তার অনেকটাই হয়তো কতটা সাধনা পূরণ করতে পারবেন।

এক সময় পার্টি শেষ হল। জয়া আর অজয় শিবনাথ এবং সাধনাকে প্রণাম করে বলল,'আমরা যাই।'

সাধনা বললেন, 'এস।'

শিবনাথ জয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে কিছু বলতে চাইলেন; ঠোঁট দুটো থরথরিয়ে কাঁপল শুধু।

কিছুক্ষণ পর গাড়িতে করে অজয়ের পাশে বসে কোলাবার দিকে যেতে যেতে জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল জয়া। রাস্তার আলো, ট্যাক্সি এবং প্রাইভেট কারের স্রোত, দুধারে ছিমছাম বাড়ি, দোকান, শো-উইন্ডো, কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছিল না। মধ্যরাতে কিংবা নিঝুম দুপুরে কোনো দুঃখের মুহূর্তে শিবনাথ কোমল নিখাদে ভায়োলিনে যে সুরটা বাজান এখন সেটাই কোথায় যেন বেজে যাচ্ছে। নিজের বুকের গভীরেই কী? জয়া বুঝতে পারল না। শুধু চোখ দুটো জলে ভরে যেতে লাগল।